মাসিকপত্র ও সমালোচনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

পঞ্চদশ বর্ষ।

১৩১১।
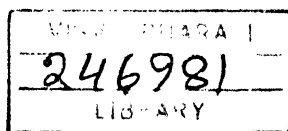
কলিকাতা;

১০৭ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২৮ নং বিডন্ রো, উইল্‌কিন্স মেসিন প্রেসে মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

ক

গ

চ

জ

দ

ন

প

ম

য

র

শ

স

সহযোগী সাহিত্য———

য়

———

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

চ

জ

দ

ন

১২

'পান কর—পান কর, পুনঃ কর পান'
কি দেবভাষায় তন্ত্র করিছে আহ্বান!
এই জীর্ণ-অহঙ্কার—ছিন্নবাস ফেলি'
এক শোষে জন্মাজন্ম কর অবসান।

১৩

ধর ধর হৃদি-পাত্র—একমাত্র রস!—
তিক্ত হোক—মিষ্ট হোক, চেতনা অবশ।
পড়িবে কুদৃষ্টি কার, বিলম্ব ক'রো না,
জগত ধূসর ক্রমে, নয়ন অলস।

১৪

এ বিলম্ব—মরীচিকা, মরণ মরুর,
পলে পলে খসে পাতা জীবন-তরুর।
দিবানিশি-দুই-পক্ষ বিস্তারি'—ছুটিছে
পলকে যোজন দূর সময়-গরুড়।

১৫

রজনীর প্রেমমালা বিচ্ছিন্ন প্রভাতে,
আর ফুটিবে না কভু শত বর্ষাপাতে!
অক্রূর সতত ক্রূর, ছলে লয় হরি'
বৃন্দাবন শূন্য করি বৃন্দাবন-নাথে।

১৬

কবে ধরা হবে স্বর্গ, কিংবা রসাতল,
দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে চির কোলাহল।
যে যাহার ভেরী তুরী বাজায় আপনি—
নগদে সন্তুষ্ট আমি, ধারে কিবা ফল!

১৭

নগর-প্রান্তরে চল, যেথা অরণ্যানী—
আকাশে বাতাসে কত করে কানাকানি!
কি-রহস্য চুপি চুপি ভ্রমিছে ছায়ায়!
চমকি' পলায় ঝরা শুনি নিজবাণী!

১৮

নদী-কূলে তরুতলে দূর্ব্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি সুধু চেয়ে রব মদিরা-আলসে—
সেই স্বর্গ—উঠে যাহে দেবত্ব বিকশি'!

১৯

সবে চায়। কেহ পায়, কেহ বা হারায়;
কারো জন্মে, কারে হাজে, আশা-বরিষায়;
বর্ষশেষে সযতন কৃপালু কৃষক
শুষ্ক ধান্যবৃক্ষমূলে আগুন লাগায়।

২০

প্রভাতে ফুটিয়া ফুল—হৃদয় খুলিয়া
সর্ব্বস্ব তাহার দেয় সমীরে ঢালিয়া।
আজীবন মধুকর করি আহরণ—
পড়ে থাকে মধুচক্রে সে মধু ভুলিয়া।

২১

ধনী যায় শ্মশানেতে—বাজে ঢাক ঢোল,
ছড়ায় সুবর্ণ, কত ক্রন্দনকল্লোল।
সেই অনির্দ্দেশ দেশে বংশখণ্ডে চড়ি
দুঃখী যায়—সেও পায় ধরণীর কোল!

২২

এক আসে আর যায়, কিবা তায় খেদ!
ক্রমশঃ হ'তেছে গাঢ় মেদিনীর মেদ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে চরিছে গোপাল,
পাণ্ডবে কৌরবে আজ কিবা অবিভেদ!

২৩

কে বলিবে সত্য নয়—এ পলাশমূলে
অর্জ্জুনের তপ্তরক্ত নাহি আজ দুলে!
কে বলিবে সত্য নয়—ফুটে নাই আজ
সীতার সে পদ্মচক্ষু এ পদ্মমুকুলে!

২৪

দাও প্রিয়ে! মাধবীটি তুলিয়া শিরীষে,
কে মানিনী লুটে ভূমে অভিমান-বিষে!
স'রে এস, ঝরণাটি যাক—বহে যাক,
কত বিরহীর অশ্রু আছে আহা মিশে!

২৫

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিলম্ব না সয়!
ঘুচুক অতীত দুঃখ ভবিষ্যত-ভয়।
আছে হাতে এ মুহূর্ত্ত—এ শুভ মুহূর্ত্ত,
এ মুহূর্ত্ত পরে কিছু নাহিক নিশ্চয়।

২৬

এই মুহূর্ত্তের পরে—কোন্ গ্রহদূরে
হয় তো কাঁদিব আমি কি করুণ সুরে!
কত যুগে কত কল্পে সে কাতরধ্বনি
কে জানে পৌঁছিবে কি না তব পুষ্পপুরে!

২৭

কল্য, অহো, গত কল্য ক'রেছে প্রস্থান—
লইয়া বঙ্কিম মধু বিহারী ঈশান!
আজ আমি আছি যবে, জগত-চষকে
প্রাণপণে প্রাণ ভরি' করি সুধাপান।

২৮

কল্য, হা আগামী কল্য—দক্ষ বাজিকর,
বিছাবে শ্মশানে মম কুসুম-আস্তর,
হবে কত নৃত্যগান! আর আমি—আমি—
কাঁপিবে না টলিবে না এ বক্ষ-পঞ্জর!

২৯

যাক তবে—দূরে যাক ভূত ভবিষ্যৎ!
শূন্যে—মহাশূন্যে ঘুরে এ দৃঢ় জগৎ।
সত্য শুধু বর্ত্তমান, অসত্য সকলি,
সুধু সুধা—সুধু গান—সুধু তুমি সৎ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কবিকল্পদ্রুম।

পাশ্চাত্য সুধীসমাজের যত্নে যে সকল হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকের বিবরণী সংকলিত হইয়াছে, তাহাতে বোপদেব-বিরচিত মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম, মুক্তাফল, হরিলীলাবিবরণসংগ্রহ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি ও শতশ্লোকী নামক গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে মুগ্ধবোধ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। অন্যান্য গ্রন্থ সেরূপ সুপরিচিত নহে।

শতশ্লোকী বৈদ্যক গ্রন্থ। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি স্মার্ত্ত গ্রন্থ। মুক্তাফল ও হরিলীলা-বিবরণসংগ্রহ ভক্তিগ্রন্থ। কবিকল্পদ্রুম ব্যাকরণোক্ত ধাতুপাঠ। বোপদেব কবিকল্পদ্রুমের একখানি টীকাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম—কাব্যকামধেনু। কবিকল্পদ্রুম ও কাব্যকামধেনু ব্যাকরণ শাস্ত্রের গ্রন্থ হইলেও, তাহাতে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দৌলতাবাদের নিকটবর্ত্তী দেবগিরি পর্ব্বতে বোপদেবের জন্ম হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুগ্ধবোধ এক্ষণে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা বঙ্গদেশেই সমধিক প্রচলিত। কোন সময়ে কি সূত্রে দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা একটি কৌতূহলাত্মক ঐতিহাসিক প্রশ্ন। তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, বোপদেবের আবির্ভাবকালের নির্ণয় আবশ্যক।

সংস্কৃত গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা সহসা সফল হয় না। যাহা বহু পুরাতন, তাহার রচনাকাল ক্রমে অজ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে; যাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহার রচনাকালও দুর্জ্ঞেয়। বোপদেব কোন গ্রন্থেই রচনাকালের নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। সুতরাং সহজে তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কবিকল্পদ্রুম ও কাব্যকামধেনু গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল পূর্ব্বতন গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদবলম্বনে কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

বোপদেবের পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষে যে সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হই-য়াছে, তাহার সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। যাহা কালকে পরাজিত করিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে, পাণিনীয় ব্যাকরণ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। পাণি-নির পূর্ব্বকালবর্ত্তী বৈয়াকরণগণের নামমাত্র চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাদের গ্রন্থের আদ্যন্ত প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। পাণিনি-সূত্র রচিত হইবার পর

তাহার সহিত কাত্যায়নের বার্ত্তিক সংযুক্ত হয়। কালক্রমে পতঞ্জলির মহাভাষ্য মিলিত হইয়া, তাহাকে ত্রিমুনিব্যাকরণ নামে পরিচিত করিয়াছিল। পতঞ্জলি-বিরচিত মহাভাষ্য অবলম্বন করিয়া ত্রিমুনিব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা সাধিত হইত। জৈয়টের পুত্র কৈয়ট মহাভাষ্যের প্রদীপ নামক টীকার রচনা করায়, তাহার অধ্যাপনাও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রদীপেরও টীকা ছিল; তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। ত্রিমুনিব্যাকরণ এইরূপে ভাষ্য ও টীকার সংযোগে বিপুলায়তন প্রাপ্ত হইবার পর, সংক্ষিপ্ত বৃত্তিরচনার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফল, বামনজয়াদিত্যের কাশিকাবৃত্তি। কাশিকার সংক্ষিপ্ত বৃত্তির ব্যাখ্যা করিবার জন্য ন্যাস নামক টীকা প্রচলিত হয়। ন্যাসের টীকা রক্ষিত, নন্দন ইত্যাদি পুনরায় কাশিকাবৃত্তির অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সময়ক্ষয়ের সূত্রপাত করিয়াছিল।

পাণিনি-সূত্রে বৈদিক ও লৌকিক উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য স্বরসূত্রের ব্যবস্থা আছে। স্বরসূত্র ও বৈদিকসূত্র পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ভাষাসূত্র শিক্ষা দিবার জন্য নানা ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার আর একটি নাম—কাতন্ত্র, অর্থাৎ ঈষৎ তন্ত্র। কলাপ ব্যাকরণের বর্ত্তমান সূত্র সর্ব্ববর্ম্মা-চার্য্যের নামে পরিচিত। দুর্গসিংহ তাহারই ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ত্রিলোচনদাস তাহা বিশদ করিবার জন্য পঞ্জী নামক টীকার রচনা করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। পঞ্জী প্রচলিত আছে; বররুচি-কৃত চিত্রকূটী বৃত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পঞ্জীর পর সুষেণ কবিরাজের টীকা ও শ্রীপতির কলাপ-পরিশিষ্ট প্রচলিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কলাপের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হইয়া ব্যাকরণশিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইলেও, সহসা পাণিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হয় নাই। বৈদিক শিক্ষা প্রচলিত থাকিতে পাণিনিব্যাকরণ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণকেও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য উত্তরকালে নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিষয়-বিভাগে সূত্র সংকলন করিবার জন্য রামচন্দ্রাচার্য্য প্রক্রিয়া-কৌমুদীর রচনা করিয়া পথপ্রদর্শন করেন। ভট্টোজী দীক্ষিত সেই পথে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদীর অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই গৌড়দেশে বৈদিক সূত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাষাসূত্র-সংকলনের জন্য লক্ষ্মণ সেন দেবের আজ্ঞায় পুরুষোত্তম দেবের ভাষাবৃত্তি

রচিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে বৈদিক সূত্র পরিত্যক্ত হয় নাই!

প্রাচীন বৈয়াকরণগণের সমাদররক্ষার্থ বোপবেদ স্বকৃত কবিকল্পদ্রুমের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে আট জন খ্যাতনামা শাব্দিকের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম,—ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, অপিশালি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র। যথা :—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নোঽপিশালিঃ শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাধিশাব্দিকাঃ॥"

অমর ও জৈনেন্দ্র পাণিনির পরবর্ত্তী, আর সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী। সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া জৈনেন্দ্রের নাম সকলের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জৈনেন্দ্র বলিতে কাহাকে বুঝিব? জৈনেন্দ্র নামে কোনও শাব্দিকের অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কাশিকাবৃত্তির "ন্যাস"-রচয়িতা জিনেন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ শাব্দিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পুত্রকে জৈনেন্দ্র বলা যাইতে পারে। পুত্রের প্রকৃত নাম জয়ন্ত। তিনি তত্ত্বচন্দ্র নামে এক ব্যাকরণটীকার রচনা করিলেও, পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং জিনেন্দ্র ন্যাসকারকে বোপদেব কর্ত্তৃক প্রশংসিত শাব্দিকবর্গের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। তদনুসারে বোপদেবকে কাশিকাবৃত্তির পরবর্ত্তী সময়ের বৈয়াকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাশিকা কোন্ সময়ের গ্রন্থ, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, উদাহরণ প্রত্যুদাহরণের বিচার করিয়া সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তার পরবর্ত্তী সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কারণ, কাশিকাবৃত্তিতে উদাহরণস্বরূপ বাসবদত্তার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাকরণের টীকায় কাশিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশিকা যে এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণিনিসূত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ হিয়ঙ্গথ্‌সঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্যে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ কবি কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় পর্য্যন্ত পাণিনিসূত্র ভিন্ন অন্য কোনও ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ নাই। এই সমুন্নত সাহিত্যযুগ বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবের পর পূর্ব্ব-গৌরব হইতে স্খলিত

হইয়া পড়ায় সুবন্ধু বাসবদত্তার আরম্ভে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কংকঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥"

সুবন্ধু যে পুরাতন রসবত্তার অন্তর্দ্ধান লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকরচনা করেন, সে রসবত্তা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সংক্ষিপ্তানুরাগ ক্রমে প্রবল হইয়াছে। তাহার পরিচয় সাহিত্যের ন্যায় ব্যাকরণেও পরিস্ফুট হইয়াছিল। কাশিকার সংক্ষিপ্ত বৃত্তি তাহার প্রথম ফল। ক্রমে ঈষৎতন্ত্র নামক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য অভিনব বৈয়াকরণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই সংক্ষিপ্তানুরাগের যুগে বোপদেব আবির্ভূত হইয়া সংক্ষিপ্ততন্ত্রের চরম সীমার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

কবিকল্পদ্রুমে ইহার অধিক আর কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কাব্যকামধেনু টীকায় বোপদেব বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া, তাঁহার আবির্ভাবকালনির্ণয়ের পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কামধেনুপাঠে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটীকে তাহার এক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়,—বোপদেব উক্ত টীকায় পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি, দুর্গসিংহ, ত্রিলোচন দাস, বর্দ্ধমান মিশ্র, হেম সূরি, অভিনব শাকটায়ন, জিনেন্দ্র, বামন, ভোজদেব, ব্যাঘ্রপাদ, কুশল ও সর্ব্ববর্ম্মার নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রিমুনিব্যাকরণ ভিন্ন আর সকল লেখকের গ্রন্থই সংক্ষিপ্ত তন্ত্রের পরিচয় প্রদান করে।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনা প্রবর্ত্তিত হইলে, তদ্দেশে পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমান শাসন প্রচলিত হইবার পর কিছুকাল আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই শাস্ত্রালোচনার অধিক প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালে মুগ্ধবোধের প্রভাবে পাণিনীয় ব্যাকরণেরও সংস্কারসাধনের চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। রামচন্দ্রাচার্য্য তাহারই পথপ্রদর্শক। তাহার পূর্ব্বে বিষয়ানুসারে পাণিনিসূত্র সংকলিত হয় নাই। অষ্টাধ্যায়ীর চিরপরিচিত পুরাতন পদ্ধতিই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণাচার্য্যের পুত্র ঋগ্বেদী কৌণ্ডিণ্যগোত্রসম্ভূত রামচন্দ্র অন্ধ্র দেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি ব্যাকরণ, বেদান্ত ও জ্যোতিষে পারদর্শী ছিলেন। "প্রক্রিয়া-

কৌমুদী” নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়া, রামচন্দ্র পাণিনীয় সূত্রগুলি বিষয়ানুসারে মুগ্ধবোধের প্রণালীমতে নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র বিঠ্‌ঠলাচার্য্য “প্রসাদ” নামক টীকা রচনা করিয়া “প্রক্রিয়াকৌমুদী”র অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মুগ্ধবোধের গতিরোধের চেষ্টা করেন। বোপদেবের কত দিন পরে রামচন্দ্র আবির্ভূত হন, তাহার প্রমাণ না থাকিলেও, বোপদেবের অব্যবহিত পরেই রামচন্দ্রের অভ্যুদয়কাল ধরিয়া লইলে, বিশেষ ভ্রান্তি ঘটিবার আশঙ্কা নাই। বিঠ্‌ঠলাচার্য্য টীকা-রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র মুগ্ধবোধের উল্লেখ করায়, মুগ্ধবোধের রচনাকাল অনুমান করাও সহজ হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে কাল নির্ণীত হয়, তাহা সংক্ষিপ্তানুরাগের চরম-যুগ।

"শাকে পঞ্চসমুদ্রবহ্নিকুমিতে সংবৎসরে শোভকৃৎ-
সংজ্ঞে ফাল্গুনিকে চ মাসি বিশদে পক্ষে দশম্যান্তিথৌ।
গুরুপাদনিরতরামচন্দ্রবিদুষঃ শ্রীবিঠ্‌ঠলে রাগিণঃ
সুব্রহ্মা লিখতি প্রযত্নত ইমং গ্রন্থং *সিংহাভিধম্‌॥”

প্রসাদ-টীকার এই শ্লোক-অনুসারে খৃষ্টীয় ১৪৫৩ অব্দে শ্রীবিঠ্‌ঠলাচার্য্যের টীকা-রচনার কালনির্দ্দেশ করিতে হইবে। বোপদেবের আবির্ভাবকালনির্ণয়ের একটি পুরাতন শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জানা যায়, কাশিকাবৃত্তি-কার বামনের প্রভাব বোপদেব কর্ত্তৃক নিরস্ত হইলে, মাধবসায়ন তাহা পুনঃসংস্থাপিত করেন। যথা :—

“বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তিরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥”

বেদভাষ্যকার চিরস্মরণীয় সায়নাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার মাধবীয়ধাতুবৃত্তি রচিত না হইলে, বোপদেবের কবিকল্পদ্রুম সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইত। তাহাতে কাশিকাবৃত্তির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া, মুগ্ধবোধের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইত। বোপদেব-কৃত সরলপদ্যনিবদ্ধ কবিকল্পদ্রুমাখ্য ধাতুপাঠই যে মুগ্ধবোধের বিজয়সাধনের প্রধান উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাধবসায়ন পাণিনীয়মতানুসারে ধাতুবৃত্তি রচনা করায়, বোপদেবের ধাতুপাঠ পরাস্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকের সহিত প্রসাদ-টীকার শ্লোক একত্র বিচার করিলে, বলিতে হইবে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বোপদেবের প্রাদুর্ভাব! তাহা ক্রমে দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে বৈদিক শিক্ষা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সায়নাচার্য্য তাহার গতিরোধের চেষ্টায় ভাষ্যরচনা করিয়াছিলেন, এবং পাণিনি-ব্যাকরণের উদ্ধারসাধনার্থ ধাতুবৃত্তিরচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। সায়নাচার্য্যের সাধু উদ্দেশ্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে; কিন্তু অধঃপতনের গতি অবরুদ্ধ হয় নাই। বৈদিক শিক্ষা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঠিক কোন্ সময়ে মুগ্ধবোধ বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, মুগ্ধবোধের বঙ্গীয় টীকাকারগণের চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাবকাল নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার নাম দুর্গাদাস। তাঁহার সুবোধিনী টীকা বিশ্ববিখ্যাত। এই টীকা খৃষ্টীয় ১৬১৫ অব্দে গৌড় নগরে রচিত হইবার প্রমাণপরম্পরা পাশ্চাত্য সুধীসমাজে সুপরিচিত। দুর্গাদাস, সম্রাট শাহজাঁহার শাসনসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার টীকা-পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বে রামানন্দ, কাশীশ্বর ও রাম তর্কবাগীশের টীকা প্রচলিত ছিল। মুগ্ধবোধের অন্যান্য টীকা তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে।

দুর্গাদাস মুগ্ধবোধের ন্যায় কবিকল্পদ্রুমেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগে ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্গাদাস-বিরচিত কবিকল্পদ্রুমের টীকা ক্রমে লুপ্ত হইতেছে বলিয়া, তাঁহার সুবোধিনী টীকায় জাতিনির্ণায়ক শব্দের অভাব দেখিয়া অধ্যাপক ওয়েবরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে অম্বষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গাদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাম তর্কবাগীশ এক জন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত। তিনি মুগ্ধবোধের যে টীকার রচনা করেন, তাহা বিচারবাহুল্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিলেও, ছাত্রগণের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় পাণিন্যাদি অন্যান্য বৈয়াকরণের মতালোচনা করিয়া মুগ্ধবোধের পক্ষসমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়েও বঙ্গদেশে পাণিনি ও কলাপের প্রাধান্য ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"পরেঽত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কলাপকোবিদাঃ।
একে বিদ্যানিবাসাঃ স্যুরন্যে সাংক্ষিপ্তসারকাঃ॥"

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয়দিনে গৌড়-রাজ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনার অভাব ছিল না। তৎকালে পাণিনি ও কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। জয়দেব, মুরারি, উমাপতি প্রভৃতি এই যুগের কবিকুলচূড়ামণিগণ সকলেই বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনদাস-বিরচিত কলাপ-টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়, জয়দেব একখানি কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। * উমাপতির কারিকা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। কাতন্ত্র ব্যাকরণে বৈদিকসূত্র স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; তাহা লৌকিক ভাষার ব্যাকরণ। তাহাও আবার সংক্ষিপ্ত বলিয়া নিতান্ত অসম্পূর্ণ। কাতন্ত্র ব্যাকরণের এই অভাব দূর করিবার জন্য শ্রীপতি দত্ত পরিশিষ্ট রচনা করেন। তাহা দুর্গাদাসের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বৈদিকসূত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোপদেবের সময়ে শ্রীপতির পরিশিষ্ট রচিত হয় নাই। তাঁহার সময় পর্য্যন্ত কাতন্ত্র ব্যাকরণের ত্রিলোচনের পঞ্জীই প্রচলিত ছিল।

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গৌড়রাজ্যে বৈদিক সাহিত্যালোচনা বিলুপ্ত হইতে থাকে। লক্ষ্মণসেন দেব তজ্জন্য বৈদিক সূত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কালক্ষয় করা অনাবশ্যক বলিয়া, ভাষাসূত্রসংকলনার্থ পুরুষোত্তম দেবকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ভাষাবৃত্তি রচিত হইয়া বৈদিক সূত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালী তাহার জন্য আর সময়ক্ষয় করিত না। বৈদিকসূত্র পরিত্যাগ করিলে পাণিনিসূত্র অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ভাষাশিক্ষার জন্য যে কোন সরল সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের অনুসরণ করিলেই চলিতে পারে। তজ্জন্য বঙ্গদেশে কাতন্ত্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল। জয়দেবাদি সেই পথে সংস্কৃত শিক্ষা জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন দেব পাণিনিব্যাকরণকে রক্ষা করিবার আশায় লঘু-বৃত্তি রচনা করাইয়াছিলেন। এই সকল চেষ্টার পর নব্য ন্যায়ের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গভূমি প্রাচীন সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা করায়, প্রাচীন ব্যাকরণের সমধিক চর্চ্চায় সময়ক্ষয় করা অনাবশ্যক বলিয়া ছাত্রগণ সংক্ষিপ্ত পথের পথিক হইয়াছিল। তজ্জন্য মুগ্ধবোধ সহজেই বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বঙ্গভূমি ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে এখন আর মুগ্ধবোধের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধের প্রচলন বাঙ্গালীর সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনার পূর্ব্বগৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহা স্মরণ করিয়া দুঃখপ্রকাশার্থ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"কথঞ্চিন্মুগ্ধবোধস্য পাঠমাত্রমদোদ্ধতৈঃ।
কাব্যমাত্রসমালোকাৎ ব্যুৎপত্তের্দর্শনং কথম্॥

---

* নন্বৈষতন্ত্রং কাতন্ত্রমিতি। জয়দেবাদিপ্রোক্তমস্তীত্যাহ সার্ব্ববর্ম্মিকম্।

উক্তশাস্ত্রৈকশরণাঃ সূরিসৌরভলোভতঃ।
কুমারাশ্চেৎ প্রবর্ত্তেরন্ প্রবর্ত্তন্তাং হটান্বিতাঃ॥
তদ্বাক্যেষ্বাদরকৃতঃ শোচনীয়াঃ পরংজনাঃ।
দৌর্ভাগ্যাৎ বত বঙ্গানাং বালবাক্যে সমাদরঃ॥"

তর্কবাগীশপাদ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রতি যেরূপ তাচ্ছীল্যের ভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎপ্রতি তত দূর তাচ্ছীল্যপ্রদর্শন করা অসঙ্গত। এ জগতে প্রয়োজন বুঝিয়া দ্রব্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এমন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যে যুগের প্রয়োজনসাধনের জন্যই মুগ্ধবোধ বিরচিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বকাল হইতেই সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণ নানা কারণে বৈদিক অপেক্ষা লৌকিক সাহিত্যের অধিকতর অনুরক্ত হইয়া, বিস্তৃত অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কাশিকাবৃত্তি কিছুকাল সংক্ষেপে বৈদিক লৌকিক উভয় ভাষায় শিক্ষাদান করিয়াছিল। কাতন্ত্র ব্যাকরণ বৈদিকসংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, সংক্ষেপে লৌকিক ভাষা শিক্ষা দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মুগ্ধবোধ সেই চেষ্টার পরিণত ফল। প্রয়োজনের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, যে প্রয়োজনে মুগ্ধবোধের অভ্যুদয়, তাহা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইয়াছে।

তথাপি মুগ্ধবোধে প্রাচীনসাহিত্যালোচনার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য পাণিনির সেবা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ কি ছিল, কি হইয়াছে, তাহা বুঝিবার সময়ে, পাণিনীয় ব্যাকরণ কিরূপে ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হইয়া মুগ্ধবোধের প্রভাব বিস্তার করিল, তাহার বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক হয়। সে চিন্তা নব্যবঙ্গের গৌরবঘোষণা করিতে অসমর্থ।

এই সকল ঐতিহাসিক কার্য্যকারণপরম্পরার বিচার করিয়া দেখিলে, কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ প্রচলিত হইয়াছিল, কোন্ সূত্রে এ দেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোনও প্রদেশে মুগ্ধবোধ এত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই কেন, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়।

মুগ্ধবোধ বৈদ্য বোপদেব গোস্বামীর অক্ষয়কীর্ত্তি। তাহা পুরাতন শিলালিপির ন্যায় এই সকল প্রত্নতত্ত্ব বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমির জ্ঞানালোচনার ইতিহাস সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। কবিকল্পদ্রুমে এই চিরস্মরণীয় বৈয়াকরণের আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পরিচয় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও, উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ—

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
তেনে বেদপদস্থেন বোপদেবদ্বিজেন যঃ॥"

সুপণ্ডিত ধনেশের শিষ্য, ভিষক্ কেশবের পুত্র "বেদপদস্থ" বোপদেব আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। "বেদপদস্থ" শব্দে কি বুঝিব? "বেদপদে স্থিত" বলিতে "বেদব্যবসায়ে নিযুক্ত" বুঝাইতেছে। সুতরাং বোপদেব এই শ্লোকে পিতার ব্যবসায়ে—আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ে—নিযুক্ত থাকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার পক্ষে মুগ্ধবোধ কীর্ত্তিকিরীট হইয়া রহিয়াছে। নবদ্বীপের নব্যন্যায়ানুরক্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকবর্গ তাঁহার ব্যাকরণের সমাদর করায়, তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাঁহার "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। কিন্তু কবিকল্পদ্রুমের কাব্যকামধেনুর মঙ্গলাচরণে বোপদেব গোস্বামী আদিত্যকে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। কবিকল্পদ্রুমের শ্লোকটি এইরূপ :—

"শব্দাকরকরগ্রামমর্থমণ্ডলমণ্ডনং।
জ্ঞানাত্মানমনাদ্যন্তমাদিত্যং তমুপাস্মহে॥"

ইহাতে জ্ঞানাত্মা অনাদি অনন্ত আদিত্যদেবের উপাসনা করিবার কথাই অভিব্যক্ত। কাব্যকামধেনুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এই ভাব প্রকারান্তরে পুনরুক্ত হইয়াছে। যথা:—

"যেন ত্রিয়দ্বিকরণৈরাখ্যাতধাতুলোহিতৈঃ।
প্রকাশৈঃ সংপ্রকাশ্যন্তে ক্রিয়াস্তং নৌমি গোপতিম্॥"

গোপতি শব্দে হরিহরাদিত্য দেবতাত্রয় তুল্যভাবে সূচিত হইলেও, এই শ্লোকের গোপতিশব্দ আদিত্যদেবকেই সূচিত করিতেছে। পুরাকালের গ্রন্থকারগণের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাসবদত্তা ও বেণীসংহারে শৈব বৈষ্ণব উভয় মতেরই মঙ্গলাচরণ শ্লোক বর্ত্তমান আছে।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত হইলেও, শৈবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে ইহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্য বোপদেব যে ব্যাকরণ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সে প্রতিভা সর্ব্বথা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার্হ।

নব্যনায়ানুরক্ত নবদ্বীপ প্রথমে পাণিনীয় ব্যাকরণেরই অনুরক্ত ছিল। স্বনামখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কার-কৃত শব্দশক্তি-প্রকাশিকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

যায়। কিন্তু বৈদিকশিক্ষা পরিত্যাগ করিবার পর বঙ্গভূমি যে অভিনব সাহিত্যের অতিরিক্ত চর্চ্চায় কালক্ষয় করিতে শিক্ষা করে, তাহাই মুগ্ধবোধের দিগ্বিজয়-সাধনের সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে কলাপ, মধ্যবঙ্গে মুগ্ধবোধ ও উত্তরবঙ্গে পানিনীয় ব্যাকরণ প্রচলিত থাকিয়া বৃটীশশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সময় পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়াছিল। এখন সেই শেষ স্পন্দনও শান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে!

সম্প্রতি পুরাতন সাহিত্য সমালোচনা করিয়া ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। পুরাতন সাহিত্য যে পুরাতত্ত্বের আকর, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারচেষ্টা সফল করিতে হইলে, যে ভাবে সে সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, তাহা শ্রমসাধ্য বলিয়া, অনেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মতামতের চর্ব্বিতচর্ব্বণে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্য জঞ্জালময় করিয়া তুলিতেছেন। সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মূলগ্রন্থপাঠের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হইলে, অনেক উপকার লাভ করিবার সম্ভাবনা। কাব্যের মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। সেইরূপ, ব্যাকরণের মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহারও আলোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

ব্যাকরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই পাণিনীয় ব্যাকরণের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। মূলসূত্র, বার্ত্তিক, ভাষ্য ও টীকার মধ্যে নানা যুগের নানা তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে তাহার আলোচনা প্রচলিত থাকায়, টীকাকারগণের বিচারবিতণ্ডায় নানা কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। বোপদেবের প্রভাবে বঙ্গভূমি পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপন পরিত্যাগ করায়, সে পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানশাসনের আরম্ভকালেই ইহার সূচনা হইয়াছিল; ক্রমে আমাদের জ্ঞানালোচনা সংক্ষিপ্তপথের অনুরাগী হইয়া পুরাতত্ত্বালোচনার পথ সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিভিন্নতা।

প্রকৃতি না পরিমাণভেদ? স্থানান্তরে দেখাইয়াছি যে, বনলতা ও গৃহকন্যার প্রভেদ প্রকৃতিতে নহে, পরিমাণে। পক্ষী ও সরীসৃপের পরিমাণভেদ সামান্য, প্রকৃতিভেদ নাই। বাঁশ ও ঘাস, বিড়াল ও বাঘ, কুকুর ও সিংহ, মনুষ্য ও বানর, প্রকৃতিতে এক, ব্যাবৃতির পরিমাণে বিভিন্ন। ফলগত সর্ষপবীজ ভবিতব্যে পরিপূর্ণ, বিশাল বিটপী পূর্ণব্যাবৃত, বীজ ও বৃক্ষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা নাই।

জটিলতা ব্যাবৃতিফল। অব্যাবৃত কীটশক্তি কেন্দ্রগত, ব্যাবৃত নরশক্তি বিকেন্দ্রগত। এক ইন্দ্রিয়ে কীটাণুর দর্শন শ্রবণ স্পর্শন সাধিত হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ে মনুষ্য পূর্ণতা পায় না, দিন দিন নূতন ইন্দ্রিয় বিকশিত হইতেছে। লক্ষান্তরে দশেন্দ্রিয়ে তৃপ্তি হইবে না। নিম্নস্তরে একই জীব স্বতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুত্ব প্রাপ্ত হয়; উচ্চস্তরে নরনারী। জীববিশেষে জননক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পুরুষকে হত্যা করা হয়, জীবনক্রিয়াসাধনে পুরুষের আবশ্যকতা নাই। মনুষ্যজাতিমধ্যে কোথাও জননী সন্তান প্রসব করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, পিতা সন্তানকে স্তন পান করায়।

প্রথমাবস্থায় নরনারীর পার্থক্য সামান্য ছিল। মানবপ্রকৃতি যতই ব্যাবৃত হইতেছে, দৈহিক ও মানসিক গঠনে নরনারী ততই বিভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষা বা সংসর্গের সমতাসাধন করিতে পারিলে এ বিভিন্নতা কোনও দিন দূর হইতে পারিবে, সম্ভব নহে। এ বিভিন্নতার আরম্ভ মনুষ্যের নিম্নতর জীবে। পুরুষ ও স্ত্রী পশু পক্ষী সরীসৃপ পতঙ্গ ও কীটে এ বিভিন্নতা দেখা যায়। শব্দ, বর্ণ ও সৌন্দর্য্যে নিম্নস্তরে পুরুষগণ স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠ। ভয় ভাবনা স্ত্রীর, সাহস ও গাম্ভীর্য্য পুরুষের। সহিষ্ণুতা ও চিন্তাশীলতা স্ত্রীর, বুদ্ধি ও কৌশল স্ত্রীর, পেশী পুরুষের। স্নায়ু স্ত্রীর, মন্ত্রণা স্ত্রীর, কার্য্যকারিতা পুরুষের। ফুলে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ আছে। স্ত্রী গাছ ও পুরুষ গাছেও প্রভেদ আছে। নারীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়—পুরুষকে হয় না। এই একটি কার্য্য হেতু নরনারীর দৈহিক ও মানসিক গঠনে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইবার কথা। বিভিন্নতা যে বেশী হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

আদিম কাল হইতে যে সকল কার্য্যে পেশী ও অস্থির চালনা বেশী হয়, তাহা পুরুষে করিয়া আসিয়াছে। সন্তানপালন ও গৃহকার্য্য রমণী করিয়া আসিয়াছে।

বেশী পরিশ্রম করিয়া বেশী বিশ্রাম পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, অল্প কিন্তু অনবরত পরিশ্রম স্ত্রীলোককে করিতে হইয়াছে। যুদ্ধকার্য্য পুরুষের, শিল্পকার্য্য নারীর। পশুহত্যা পুরুষের, পশুপালন নারীর। মৃৎসৎকার পুরুষের, রোগীর চিকিৎসা নারীর।

সভ্যতাবৃদ্ধি বা সামাজিক ব্যাবৃতি হেতু নরনারীর কার্য্যের বিভিন্নতার অনেক হ্রাস হইয়াছে সত্য, কিন্তু লক্ষ বৎসরে পারিপার্শ্বিক অবস্থানের বিভিন্নতা হেতু শারীরিক ও মানসিক গঠনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার বিপর্য্যয় ঘটিতে অন্ততঃ অনেক সহস্র বৎসরের প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থানের বিভিন্নতা না থাকিলেও, নরনারীর শারীরিক ও মানসিক গঠনের সমতা হইবার সম্ভাবনা কখনই ছিল না। সন্তান প্রসব করিবার জন্য নারীদেহের গঠনে বিভিন্নতা অনিবার্য্য। সামাজিক ব্যাবৃতির বিভিন্নতা হেতু বনবাসিনী ও নাগরিকার দেহগঠনে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বন্য পশুপক্ষী ও গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর গঠনেও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বন্যকুক্কুটের পায়ে যে খর-নখর পশ্চাৎভাগে লম্বিত থাকে, গৃহকুক্কুটের তাহা নাই। বন্য চা ও নীল ও কর্ষিত চা ও নীল বৃক্ষে কত প্রভেদ। বন্যকুকুর ও গৃহকুকুর, বনবিড়াল ও গৃহবিড়াল, বন্যকপোত ও গৃহকপোত কত বিভিন্ন। অসভ্য মনুষ্য অপেক্ষা সভ্য মনুষ্যের কামাতুরতা অধিক। অসভ্যসমাজে সতীত্বের মর্য্যাদা না থাকিলেও, সভ্যসমাজে ব্যভিচার যত অধিক, অসভ্যসমাজে তত নহে। স্তনের গঠন ও জননেন্দ্রিয়সংস্থানে এবং স্তন ও জননেন্দ্রিয়ের ব্যাবৃতিতে বননারী ও নাগরিকায় অনেক প্রভেদ। এ সকল কথার পরিচয়—ব্যাবৃতি হেতু বর্ব্বর ও সভ্য নরে, বনবাসিনী নাগরিকার দেহ ও মানসিক গঠনে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ কথার পরিচয় এখানে দিবার নহে। মানবপ্রকৃতি গ্রন্থে তাহার পরিচয় দিয়াছি। সভ্যসমাজে নরনারীর দৈহিক ও মানসিক গঠনে কি বিভিন্নতা উপলক্ষিত হয়, এ প্রবন্ধে কেবল তাহারই পরিচয় দিব। তাহারও সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না। পুস্তকে যে সকল কথা খুলিয়া বলা যায়, মাসিকপত্রিকায় তাহা বলা যায় না।

সন্তান-উৎপাদনের জন্য যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন, তাহাদিগকে প্রথম, তাহাদের সহকারিগণকে সাহায্যের পরিমাণানুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লৈঙ্গিক বিভিন্নতার পরিচায়ক বলিয়া গণনা করিলে, জননেন্দ্রিয় প্রথম শ্রেণীর, স্তন দ্বিতীয় শ্রেণীর, শ্মশ্রু গুম্ফ কেশ প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এ সকল বিভিন্নতা সাধারণের গ্রাহ্য।

পুরুষের পেশী ও অস্থির সংস্থান বড় স্পষ্ট—বল ও তেজের পরিচায়ক; স্ত্রীলোকের পেশী ও অস্থি আচ্ছাদিত, পুরুষের দেহগঠনে যত কোণ লক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকের তত হয় না। এ জন্য পুরুষের দেহগঠন কর্কশতা ও বলের পরিচয় দেয়; স্ত্রীলোকের দেহগঠনে কুসুমকোমল পেলবলতার পরিচয় পাই। পুরুষের দেহ ঋজু বা সরল। স্ত্রীলোকের দেহ তরঙ্গায়িত। পুরুষ যেন কাজের জন্য, স্ত্রীলোক সোহাগ ও বিরামের জন্য; একটি পদভরে তেজে দাঁড়াইতে, অপরটি পালঙ্কে বাহুপরে হস্তন্যাস করিয়া ঢলিয়া পড়িয়া থাকিতে যেন সৃষ্ট হইয়াছে।

সদ্যোজাত বালকবালিকার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বালকগণের গুরুত্ব ও দীর্ঘতা গড়ে বালিকাগণের গুরুত্ব ও দীর্ঘতা অপেক্ষা অধিক; এবং বুকের পরিধিও অধিক। বয়সের সহিত বালকগণের দীর্ঘতার বৃদ্ধিতে জোয়ার-ভাঁটা আছে, কিন্তু বালিকাগণের বৃদ্ধি সমভাবেই ঘটিয়া থাকে। যৌবনে ইহার বিপরীত ঘটে। তখন গুরুত্ব, দীর্ঘতা ও পরিধিতে স্ত্রীলোকেরা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। কুড়ি বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকেরা পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু পুরুষদিগের বৃদ্ধি তখনও সমাপ্ত হয় না। বর্ব্বর জাতির মধ্যে পনের ষোল বৎসরে স্ত্রীলোকের ও সতর আঠার বৎসরে পুরুষের বৃদ্ধি সমাপ্ত হয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ সভ্য ও বর্ব্বরসমাজের পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও গুরুত্বে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকল হীনতা সমান নহে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের মস্তক পুরুষের মস্তক অপেক্ষা দীর্ঘতর, গ্রীবা ক্ষুদ্রতর, দেহ দীর্ঘতর, হাত ও পা ক্ষুদ্রতর। দেহের—গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রতা ব্যাবৃতির নিদর্শন। শিশু, বর্ব্বর ও বানরের দেহের দীর্ঘতা সর্ব্বগ্রাহ্য। এই জন্য শিশুকে মাথা-ও-পেট-সর্ব্বস্ব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। প্রাচীন ভাস্কর ও চিত্রাচার্য্যগণ নাভিকে দেহের কেন্দ্র বলিয়া গণনা করিতেন। যে জাতি যত অব্যাবৃত, তাহার নাভি তত নিম্নে। জন্মমুহূর্ত্তে নাভি দেহের কেন্দ্র থাকে। দেহের বৃদ্ধির সহিত কেন্দ্র নিম্নগত হয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহকেন্দ্র পুংজননেন্দ্রিয়ের নিকটে, স্ত্রীলোকের দেহকেন্দ্র আর একটু উপরে। নাভি ও জননেন্দ্রিয়ের ব্যবধান পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক। কিন্তু ব্যাবৃতির সহিত এ ব্যবধান ক্রমেই কমিতেছে। নাভি নিম্নগত হইতেছে না, স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঊর্দ্ধগত হইতেছে। অব্যাবৃত জাতিতে মলদ্বার ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সংস্থান যত নিকটে, ব্যাবৃত জাতিতে তত নহে। কোন কোন বর্ব্বর জাতিকে পশুদিগের মত মিলিত হইতে হয়। মূত্রের গতি বর্ব্বর নারীর পশ্চাৎ দিকে, ব্যাবৃতির সহিত উহা সম্মুখগত হইতেছে। এ জন্য মূত্রনিঃসরণের প্রক্রিয়া ব্যাবৃত ও অব্যাবৃত জাতিতে বিভিন্ন।

স্তনের ব্যবধানেও স্ত্রী পুরুষে ভিন্নতা আছে। স্তনের শক্রতা চিত্রকরের আদর্শ। কেহ কাহারও পানে চাহিবে না। দক্ষিণ স্তন দক্ষিণমুখে, বাম স্তন বাম মুখে অবস্থিত রহিবে। দুইটি চুচুকের ব্যবধান স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অধিক। স্ত্রীলোকের স্তনের বৃদ্ধির আধিক্যহেতু স্ত্রীলোকের বুকে অধিক চর্ম্মের প্রয়োজন হয়। দুই পার্শ্বের চর্ম্ম যত, দুই স্তনের ব্যবহিত চর্ম্ম তত স্থিতিস্থাপক নহে। এ জন্য দুই পার্শ্বের চর্ম্ম টানিয়া লইয়া বর্দ্ধমান স্তনযুগল আবৃত করিতে হয়। এ জন্য স্ত্রীলোকের দুই স্তনের ব্যবধান কম হইয়া পড়ে। এই ব্যবধান যত অল্প, স্তনের ব্যাবৃতি তত অধিক।

বানর ও বর্ব্বরের বাহু খুব দীর্ঘ। স্ত্রীলোকের বাহু পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শিশুর বাহুও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণদিগের বাহু ক্ষুদ্রতর, সর্ব্বাপেক্ষা পীতবর্ণদিগের বাহু দীর্ঘতম। জাপানী রমণীর দীর্ঘ বাহুর ভঙ্গী নাচিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়।

অঙ্গুলী সম্বন্ধেও ভিন্নতা দেখা যায়। বানর ও বর্ব্বরের তর্জ্জনী অনামিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, স্ত্রীলোকের দীর্ঘতর। এ জন্য স্ত্রীলোকের অঙ্গুলী-সমাবেশ সুন্দর। পুরুষের তর্জ্জনী স্ত্রীলোকের তর্জ্জনী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, স্ত্রীলোকের বৃদ্ধাঙ্গুলি পুরুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বৃদ্ধাঙ্গুলির দীর্ঘতা অব্যাবৃতির লক্ষণ। গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিবার জন্য বানরে বৃদ্ধাঙ্গুলির দীর্ঘতা ব্যাবৃত হইয়াছিল। তাড়না ও বাক্‌ভঙ্গীর সহকারিতা করিবার জন্য স্ত্রীলোকে তর্জ্জনী অধিকপরিমাণে ব্যবহার করে, এ জন্য তাহাদের তর্জ্জনীর অধিকতর ব্যাবৃতি হইয়া থাকিবে।

পায়ের বৃদ্ধি সমানভাবে হয় না। এক বয়সে অধিক বৃদ্ধি, অন্য বয়সে অল্প বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিশুদিগের পা ক্ষুদ্র, কিন্তু বব্বরদিগের পা দীর্ঘ। বয়স্ক পুরুষের পা দেহের তুলনায় শিশুদিগের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। দীর্ঘতায় স্ত্রীলোকের জানু পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু স্থূলতায় অধিক, এবং দেহের সহিত জানুর সংযোগে কোণেরও ভিন্নতা আছে। কিন্তু পায়ের নিম্নভাগের ভিন্নতা অতি সামান্য। স্ত্রীলোকের পা পুরুষের অপেক্ষা অতি সামান্য দীর্ঘ। পুরুষের চরণ স্ত্রীলোকের চরণ অপেক্ষা দীর্ঘতর। এক স্কন্ধ হইতে অপর স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি পুরুষের অধিক, এক জানু হইতে অপর জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃতি স্ত্রীলোকের অধিক। নিতম্বের ব্যাবৃতি বর্ব্বর রমণী অপেক্ষা সভ্য রমণীর অধিক—স্থূল ও গোল—প্রসবকার্য্যে প্রকৃষ্টতার নিদর্শন। বস্তুতঃ দেহের উপরিভাগ ও অধোভাগ লক্ষ্য করিলে পশ্চাদ্দিক্ হইতে স্ত্রীপুরুষের বিভিন্নতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

দেহের ঋজুতা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষে ভিন্নতা আছে। বানর ও বর্ব্বর অর্দ্ধব্যাবৃত্ত দ্বিপদ, শিশুও এইরূপ। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকে উচ্চশ্রেণীর লোকের মত লম্বমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। লম্বমানতা শ্রেষ্ঠ বর্ণের নিদর্শন। বৃষস্কন্ধতা পুরুষকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করে, নিতম্বের প্রশস্ততা রমণীকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করে। চলিবার সময় স্ত্রীলোকের মস্তক সম্মুখভাগে, পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে হেলিয়া পড়ে, একটিতে দর্প, অন্যটিতে নম্রতার, একটিতে স্বাবলম্বন, অন্যটিতে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়।

যে দিন হইতে মনুষ্য সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে মনুষ্যের জীবরাজ্যে রাজত্বের আরম্ভ। দাঁড়াইলে মস্তক সুস্থ থাকে, মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি আশু সম্পাদিত হয়। কিন্তু চতুষ্পদে অবস্থানসময়ে যন্ত্র সকল যে ভাবে অবস্থিত ছিল, দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহা বিপর্য্যস্ত হইল। অন্ত্র, শ্বাসনালী প্রভৃতির সহস্র রোগ,—পাথুরী, হার্ণিয়া, যকৃৎ, ক্ষয়কাশের সেই দিন হইতে মনুষ্যদেহে সূচনা হইয়াছে। স্ত্রীলোকে পুরুষের সহিত এই দুর্ভাগ্যের ভাগী হইয়াছে। কিন্তু দাঁড়াইবার জন্য কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি রোগ ভিন্ন পুরুষের জননযন্ত্রের বিশেষ অপকার হয় নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রসবকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাঁড়াইবার হেতু শিশুর মস্তক দিন দিন বৃহৎ হইয়াছে; পক্ষান্তরে দাঁড়াইবার জন্য প্রসবযন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। চতুষ্পাদ অবস্থায় ভ্রূণ যত সহজে বহিষ্কৃত হয়, দ্বিপদ অবস্থায় তত হয় না। এ জন্য এখনও প্রসবকালে স্ত্রীলোককে চতুষ্পদভাব অবলম্বন করিতে হয়। ব্যাবৃতি উপলক্ষে স্ত্রীলোককে যত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, পুরুষকে তত হয় নাই। প্রসবযাতনায় যাহাদের মৃত্যু হয়, ব্যাবৃতির উন্নতিপথে আরোহণ করিতে তাহারা অক্ষম। জীবন-সংগ্রামে যে সকল স্ত্রীলোক বাঁচিয়া যাইতেছে, তাহাদের কন্যাগণ নূতন অবস্থার তত উপযোগী হইতেছে। লাইকার্গাসের আইনে পঙ্গু অন্ধ দুর্ব্বল শিশুকে জন্মমুহূর্ত্তে হত্যা করা হইত, স্পার্টার সামরিক জীবনের তাহারা উপযোগী হইত না। জীবন-সংগ্রামের যাহারা উপযোগী নহে, উর্দ্ধপথে অগ্রসর হইতে যাহারা অক্ষম, লাইকার্গাস অপেক্ষা কঠোর হস্তে বিধাতা তাহাদিকে উৎপাটিত করিয়া পৃথিবী হইতে অপসারিত করেন। কুসুম-ললাম পুত্রকন্যা এ ধূলিকর্দ্দমময় পৃথিবীর অপেক্ষা উচ্চতর স্থানের অধিকারী, তাই ভগবান স্বর্গে সরাইয়া রাখেন, এই বলিয়া যাঁহারা হৃদয়কে সান্ত্বনা দেন, বিজ্ঞানের এ কঠোর মীমাংসা তাঁহাদিগকে হতাশ্বাস করে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

অপেক্ষা।

১

কয় বৎসর পনের টাকা বেতনে নানা স্থানে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিসে পোষ্ট-মাষ্টারী করিয়া আমি উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলাম; কুড়ি টাকা বেতনে মধুপুর পোষ্ট-আফিসে ঠিকা পোষ্ট-মাষ্টার নিযুক্ত হইলাম। মধুপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। স্বাস্থ্য ও বেতন উভয়েরই উন্নতির আশায় আমার কল্পনা মধুপুরকে মধুপুরই দেখিতে লাগিল।

রাত্রির গাড়ীতে মধুপুরে উপনীত হইলাম। পরদিন কার্য্যভার লইব। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টারের সহিত ডাক কাটিলাম, চিঠি বাছিলাম। হরকরারা বিলি করিতে বাহির হইবে, এমন সময় সহসা আফিসঘরের বারান্দায় যেন মৃত্যু ও জীবন একত্র উপনীত দেখিলাম। দুই জন ইংরাজমহিলা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন; প্রথমা বৃদ্ধা—বিষন্নাননা; দ্বিতীয়া যুবতী, অনিন্দ্যসুন্দরী—সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের নিটোল সৌন্দর্য্য, কিন্তু নয়নে ও আননে চাঞ্চল্যচিহ্নমাত্র নাই—গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। উভয়েরই বেশ সাদাসিদা।

আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার কোনও পত্র আছে?"

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টার নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "না।"

বৃদ্ধা ও যুবতী এই সংবাদের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "আমি এ আফিসে আপনাকে যে সকল জিনিস বুঝাইয়া দিয়া যাইব, তাহার একটি এই।"

আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "চার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই আফিসে আসি, তখন আমার পূর্ব্ববর্ত্তীও আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর এই আফিসে ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীও তাঁহাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "আসল ব্যাপারটা কি?"

তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধা কোন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্রের আশায় প্রতিদিন পোষ্ট-

আফিসে সন্ধান লইয়া থাকেন। সে পত্র আইসে না। মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ কোন পত্র আসে, তাহাতে বৃদ্ধার মন উঠে না।”

“যুবতী কি বৃদ্ধার কন্যা ?”

“না—আত্মীয়া। বৃদ্ধার মস্তিষ্ক বোধ হয় বিকৃত।”—এই বলিয়া তিনি হাস্য করিলেন।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের বেদনাময় ব্যাকুলতায় এ উপহাস আমার ভাল লাগিল না। আমি বাল্যে মাতৃহীন। মৃত্যুশয্যায় মা আমার মুখে চাহিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছিলেন—এ অসহায় বালককে কে দেখিবে? তাঁহার মৃত্যুর পর পিতা আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতার ব্যবহারে আমি যাতনা পাইয়াছি, আমার জন্য পিতাও কেবল কাঁদিয়াছেন। তখনও বড় যাতনায় কাঁদিয়া ডাকিয়াছি,—“মা আমার, তুমি কোথায় ?” আজও সংসারের স্রোতে লঘু তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে যখন দুঃখাবর্ত্তে আর উদ্ধারের উপায় দেখি না, তখন কাঁদিয়া ডাকি,—“মা আমার, তুমি কোথায় ?” উদ্ধার পাইলে মনে করি, সেই স্নেহময়ীর পুণ্যবলেই আমি—অধম সন্তান—উদ্ধার পাইলাম। আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য জননীর ব্যাকুলতায় আমার হৃদয়ে সেই কথা জাগিয়া উঠিল ; আমি কথা কহিতে পারিলাম না।

স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমার এ ভাব আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়ের ভাল লাগিল না।

২

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত দুঃখ ও কঠোর কর্ত্তব্যের দারুণ যন্ত্রণায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল। বৃদ্ধা প্রতিদিন প্রাতে যুবতীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন, জিজ্ঞাসা করিতেন, “মহাশয়, আমার কোনও পত্র আছে ?” আমি উত্তর করিলে তাঁহারা ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিতেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার নামে দুই তিনখানি পত্র আসিয়াছিল। আমি সাগ্রহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, তিনি আসিলে সে পত্র দিতাম। কিন্তু পত্র দেখিয়া বৃদ্ধা বিষণ্ণভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিতেন, “এ পত্র নহে।” সে পত্র তিনি স্বয়ং পাঠও করিতেন না, যুবতীকে ডাকিয়া দিতেন, “মড, এই লও।” রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই—বৃদ্ধা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ পুত্রের পত্রের সন্ধানে আসিতেন। হায় মাতৃহৃদয় !

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, আমি তাঁহাকে যে শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতাম,

তাহাতে বৃদ্ধা আমাকে ধন্যবাদ দিতে ব্যগ্র হইতেন। বুঝিতে পারিলাম, এ সামান্য শ্রদ্ধাও তিনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ক্রমে এমনই হইল যে, ডাক আসিলে আমি সাগ্রহে তাঁহাবই পত্রের সন্ধান করিতাম, সে পত্র না পাইয়া হতাশ হইতাম। যদি এক দিন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র দিয়া মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবারিত করিতে পারিতাম! কিন্তু আমার দুর্দ্দশা-দাবানল-দগ্ধ জীবনের কোন আশা—কোন বাসনা পূর্ণ হইয়াছে? দীর্ঘ এক বৎসর ঘুরিয়া গেল—আমার সে আশা পূর্ণ হইল না—সে পত্র আসিল না।

বৃদ্ধা প্রতিদিন আসিয়া পত্রের সন্ধান লইতেন—জিজ্ঞাসাকালে আশায় ও উদ্বেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইত; সে পত্র আসিল না দেখিয়া ফিরিবার সময় তাঁহার বিষণ্ণ মুখে বিষাদের ছায়া যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিত।

এই মহিলাদ্বয়ের পরিচয় জানিবার জন্য মনে কৌতূহল জন্মিত; কিন্তু ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম না। হরকরারা স্থানীয় লোক। কিন্তু তাহারা, বা অন্য কেহই তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় বা অবস্থার বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারিত না। তাঁহারা যেন চারি দিকের সকল হইতে স্বতন্ত্র; সকলের মধ্যে থাকিয়াও স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত। আর যে কয় ঘর য়ুরোপীয় মধুপুরে ছিলেন, তাঁহাদের গৃহে কোনও কর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে ইঁহারা অতি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেন—পারিবারিক কারণে নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অক্ষমতা জানাইতেন। ক্রমে তাঁহারা ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। সকলেই ইঁহাদিগকে প্রহেলিকার মত মনে করিত।

যাহা হউক, এক বৎসর পরে তাঁহাদিগের পরিচয় জানিবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতরূপে উপস্থিত হইল।

৩

শীত কেবল গিয়াছে। বাতাস নাতিশীতোষ্ণ—মধুরস্পর্শ। পিক-কণ্ঠে বঙ্গের স্বল্পায়ু বসন্তের সাড়া পড়িয়াছে; গলিতপত্র রিক্তশাখ তরুর সর্ব্বাঙ্গে নবীন পল্লব-শ্রী কেবল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে—তখনও নবপল্লবে তরুলতার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। মাঠে শিমুলগাছগুলি উজ্জ্বল লোহিত কোমল পুষ্পে পূর্ণ—দূর হইতে এক একটি বৃক্ষ এক একটি লোহিত পুষ্পস্তূপ বলিয়াই অনুমিত হয়। অন্যান্য বৃক্ষেও কেবল দুই চারিটি ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধুপুরে উদ্যানে উদ্যানে গোলাপের আর অন্ত নাই। আমি আফিসের প্রাঙ্গণে যে কয়টি গোলাপগাছ লাগাইয়াছিলাম, তাহাদের নবীন শাখাও ফুলভরে নত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরাহ্নে আর আফিসঘরে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না, ভ্রমণে বাহির হইলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের যে দিকে উপনীত হইলাম, সে দিক অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সে দিকে কয় ঘর য়ুরোপীয়ের বাস। রাজপথ পরিচ্ছন্ন—উভয় পার্শ্বে সযত্ন-সংরক্ষিত উদ্যানমধ্যে সুদৃশ্য গৃহ—নয়নারাম। উদ্যানে কুসুম-শোভা। কোথাও বা তাহারই মধ্যে স্বাস্থ্য-লাবণ্য-শ্রী-সম্পন্ন সুন্দর বালকবালিকারা খেলা করিতেছে,—প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে; কোথাও বা শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিখণ্ডে পুরুষ ও মহিলারা ক্রীড়ারত, অথবা বেঞ্চে বা চেয়ারে বসিয়া হাস্যবহুল আলাপে নিযুক্ত। আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।

কয়টি গৃহ অতিক্রম করিয়া একটি কোলাহলহীন গৃহের দ্বারে উপনীত হই-লাম। বৃদ্ধা সেই গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে অভিবাদন করি-লেন, এবং আমি প্রত্যভিবাদন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রমণে বাহির হইয়া-ছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বুঝি আপনার গৃহ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এই আমার কুটীর।"

প্রাঙ্গণে উপবনে রাশি রাশি গোলাপ ফুটিয়াছিল। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "কি সুন্দর ফুল!"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আপনি ফুল ভালবাসেন? হাঁ, তাই ত। মড আমাকে বলিতেছিল, আপনি ডাকঘরের প্রাঙ্গণে উদ্যান রচনা করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ভিতরে আসুন। গুটিকতক ফুল লইবেন।"

আমি উদ্যানে প্রবেশ করিলাম।

এক জন মালী উদ্যানে গোলাপফুল কাটিয়া বাক্স পূর্ণ করিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে আমার জন্য একটি তোড়া বাঁধিতে বলিলেন।

নিকটে একখানি বেঞ্চ ছিল। বৃদ্ধা আমাকে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং স্বয়ং উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

দুই একটি কথার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে মহিলাটিকে আপনার সঙ্গে দেখিতে পাই, তিনি কি আপনার দুহিতা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মড আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে আমার দুহিতার অধিক।"

"আপনার সংসারভুক্তা?"

হাঁ। সে নহিলে আমি মুহূর্ত্ত থাকিতে পারি না। সহস্র দুঃখে সে আমার সুখ। তাহার গুণের অন্ত নাই।”

“আপনি কত দিন এখানে আসিয়াছেন?”

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, “সে অনেক দিন—নয় বৎসর হইল। ভগবান আমাদের দুই জনের দুঃখের জীবন এক পথে প্রবাহিত করিবার পরই আমরা এই স্থানে আসিয়াছি।”

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর দুঃখ-বিগলিত।

তিনি পুনরায় বলিলেন, “বাবু মড ও আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, আপনি এই দুঃখিনী রমণীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ দয়া দেখাইতেছেন। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব!”

আমি বলিলাম, “আমি শুনিয়াছি, আপনি আপনার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্রের আশায় পথ চাহিয়া আছেন। আমি অল্প বয়সে মাতৃহীন। মাতৃস্নেহের সুখস্বাদ-বঞ্চিত আমার পক্ষে জননীর বেদনা বড় দুঃখের।”

বলিতে বলিতে আমার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, “বৎস, সুখদুঃখ ভগবানের দান। দুঃখ করিয়া কি করিবে? তবে মন বুঝে না। শান্ত হও। আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিলে তুমি হয় ত তোমার দুঃখ সহনীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে। আমার দুঃখের কথা শুন।”

৪

বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন;—

“আমার স্বামী সেনাবিভাগে কর্ম্মচারী ছিলেন। একটি যুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও রণনিপুণতা দেখাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর আমার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমার ভ্রাতাও সেনাদলে ছিলেন; উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা।

“বিবাহের তিন বৎসর পরে আমার পুত্র এরিক জন্মলাভ করে। সে-ই আমার সব সুখ—সে-ই আমার সব দুঃখ।

“পাঁচ বৎসর পরে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার মাতৃ-হীনা কন্যা মডকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তখন মডের বয়স এক বৎসর মাত্র। আমি তাহাকে সন্তানেরই মত পালন করিতে লাগিলাম। আমার আর কোনও সন্তান হয় নাই। কিন্তু আমি এক দিনও কন্যার অভাব অনুভব

করি নাই। মডও আমাকে জননী জ্ঞান করিত। আমার ভ্রাতা মৃত্যুকালে কন্যার জন্য যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমার স্বামী সেই অর্থ বাড়াইবার উপায় করিলেন।

"আমার স্বামীর জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। একদিন একখানা সংস্কৃত পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া তিনি সংস্কৃতের প্রতি অনুরক্ত হয়েন ও সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে আসিলে সংস্কৃতচর্চ্চার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া ভারতবর্ষে বদলী হইয়া আসিলেন। তখন এরিকের বয়স সাত বৎসর, মডের তিন। উভয়েই আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিল।

"এরিক কিছু বড় হইলে স্বামী তাহাকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে অভিলাষী হইলেন। আমি স্নেহবশতঃ তাহাকে দূরে পাঠাইতে অসম্মত হইলাম। তিনি শেষে এরিক ও মডকে লইয়া আমার ইংলণ্ডে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যাঁহার বিরলপ্রাপ্ত অবসর দুর্ব্বোধ বিদেশীয় ভাষার জটিল তত্ত্বোৎঘাটনে নিঃশেষ হইয়া যায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের আবশ্যক। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। শেষে এরিককে এ দেশে পড়ানই স্থির হইল।

"স্বামীর এক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধুর পরামর্শ মতে বিশ বৎসর বয়সে এরিককে সাধারণ বিদ্যালয় হইতে ব্যবসায়-শিক্ষার্থ কলিকাতার একটি আফিসে দেওয়া হইল। দুই বৎসর পরে—সে শিক্ষিত হইলে, আমাদের যাহা কিছু ছিল, সব দিয়া তাহাকে একটি হাউসে দেওয়া হইল। এরিক নিকটে রহিল; আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার স্বামীও নির্ব্বিবাদে তাঁহার পণ্ডিতদিগের সঙ্গে জীর্ণতালপত্রের বা গলিতপ্রায় পুঁথির পাঠোদ্ধারে বা ব্যাখ্যাবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

"এক বৎসর পরে আমার স্বামীর মৃত্যু হইল। সে শোকে এরিকের অপেক্ষা মড অধিক কাতর হইয়া পড়িল।

"দারুণ শোকে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ও আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল, এরিক মডকে বিবাহ করিবে। তাহারাও এ কথা জানিত। বিশেষ মড যে এরিককে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে আমি যে কত সুখী হইয়াছিলাম, ত'হা বলিতে পারি না। সে এরিকের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিত; এরিকের প্রত্যাবর্ত্তনকাল অতিক্রান্ত হইলে ব্যস্ত হইত; এরিকের সামান্য পীড়ায় উৎকণ্ঠিতা হইত; এমন কি, কার্য্যের ব্যস্ততা জন্য তাহার সামান্য অবহেলায় অশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না। আমরা কতবার মনে

করিতাম, ইহাদের বিবাহ হইলে আমরা আর কোনও সুখ চাহি না; কতবার পরস্পর বলিয়াছি, তাহাই আমাদের একান্ত কামনা।

"সে কামনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই স্বামী চলিয়া গেলেন। সে শোক অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে দেখিলাম, এরিকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহে তাহার যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, তাহার হ্রাস হইয়াছে। নানা বন্ধুগৃহে নাচ, সমিতি প্রভৃতি ক্রমেই তাহাকে গৃহ হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল।

"শেষে একদিন আমি এরিককে স্পষ্ট বলিলাম, 'এরিক, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; পৌত্রপৌত্রীর মুখ দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা করি।'

"এরিক বলিল, 'মা, ব্যস্ত কেন?'

"আমি বলিলাম, 'বৎস, তুমি মডকে বিবাহ করিলেই আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়।'

"এরিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, 'সে কি?'

"আমি বলিলাম, 'তোমার পিতারও এই ইচ্ছা ছিল। মড আমাদের দুহিতারই মত।'

"জানি না, কেন সহসা যেন এরিকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে নিশ্চয় আর কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। সে বলিল, 'তোমরা তাহার অর্থের জন্য এ বিবাহে এত অভিলাষী।'

"মডের প্রচুর অর্থ ছিল সত্য, কিন্তু কৈ, সে কথা ত আমাদের মনেও হয় নাই! আজ এরিকের এ কথায় আমি বড় ব্যথা পাইলাম, বলিলাম, 'এরিক! একান্ত অধঃপতিত না হইলে তুমি তোমার জনক জননীকে এত নীচ মনে করিতে পারিতে না।"

"এরিক নির্ব্বাক হইয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'তুমি জান, মড আমার কন্যার অধিক, তোমা হইতেও অধিক প্রিয়।'

"এরিক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'ভালই, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।'

"ক্রোধে আমি সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

"ইহার পর দুই দিন আমি এরিকের সঙ্গে কথা কহিলাম না; এরিকও আমার সঙ্গে কথা কহিল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম,—সে গম্ভীর—চিন্তিত।

"তৃতীয় দিবস সে যথাকালে আফিসে গেল; কিন্তু আর ফিরিল না। আমরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রি হইল। সে আসিল না। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া আফিসের 'বড়সাহেবে'র নিকট

পত্র লিখিলাম। তাঁহার উত্তর পাঠ করিয়া আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এরিক তাহার ব্যবসায়ের অংশ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছে! সমস্ত রাত্রি আমরা দুই জন কাঁদিয়া কাটাইলাম

দারুণ দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল; ক্রমে দীর্ঘ দুই মাস কাটিল। এরিকের সংবাদ আসিল না। মডের দশা দেখিয়া আমি আমার দুঃখ চাপিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মডের মলিন মুখে আমি আর হাসি দেখি নাই।

"রাজধানীর ফেনিলোচ্ছল সমাজ আমাদের মত দুঃখিনী রমণীর জন্য নহে। জনসঙ্গ আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক। ছয় মাস পরে আমরা কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এক জন বন্ধু আমাদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এই কুটীর কিনিয়া দিলেন। আমি আমার স্বামীর বহুযত্নের ধন পুস্তকগুলি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলাম। মড কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। কলিকাতার পোষ্ট-অফিসে ঠিকানা রাখিয়া আমরা এই স্থানে আসিলাম। সেই সব পুস্তক ...হের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া আছে। মড সর্ব্বদা সেই সব পুস্তক নাড়ে, ঝাড়ে, ...য়। ঐ দেখ।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—একটি কক্ষের বাতায়ন মুক্ত, কক্ষমধ্যে টেবিলে ...লাক জ্বলিতেছে; মড টেবিলের উপর পুস্তক গুছাইতেছেন।

বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"মডের আগ্রহাতিশয়সত্ত্বেও আমি তাহার ...হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। তবে আমাদের অভাব অল্প। উদ্যানে যে ... হয়, তাহাতেই আমাদের অভাবমোচন হয়। আমি অধীর হইলে মড ...কে সান্ত্বনা দেয়—এরিক নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমি কত দিন ...য়াছি, এরিকের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাজাইবার গুছাইবার সময় সে নীরবে ...বিসর্জ্জন করিতেছে।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। আমিও চক্ষু শুষ্ক রাখিতে ...লাম না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে।

অল্পক্ষণ পরে আমি বিদায় লইলাম। বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার ভৃত্যকে বলি, ...ণ্ঠা লইয়া আপনাকে রাখিয়া আসুক।"

আমি ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "কাজ নাই। চন্দ্রালোক আছে। আমি ...কী ভ্রমণ করিতে ভালবাসি।"

মালী বেঞ্চের উপর তোড়া রাখিয়া গিয়াছিল। আমি আসিবার সময় তাহা

লক্ষ্য করি নাই। বৃদ্ধা আমাকে ডাকিয়া সেটি দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। জননীর স্নেহসিঞ্চিত ব্যাকুলতা ও যুবতীর সভক্তি প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার নির্জ্জন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

৫

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বুরযুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় কৃষক স্বাধীনতা ও স্বদেশের জন্য সলিলের মত দেহের শোণিত ব্যয় করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিতে লাগিল। একদিন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃদ্ধার নামে একটি টেলিগ্রাম কলিকাতা ঘুরিয়া আসিল।—"এরিকের শেষ প্রার্থনা, মা ও মড ক্ষমা কর।"

পড়িয়া আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, এ সংবাদ পাঠাইব না। কিন্তু হায়, সংবাদ গোপন করি কেমন করিয়া? অগত্যা পাঠাইয়া দিলাম।

অপরাহ্নে স্বয়ং যাইয়া মালীর নিকট সংবাদ পাইলাম, টেলিগ্রাম পাইয়া বৃদ্ধা ও মড উভয়েই অধীরা। আমি ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর বৃদ্ধা আর ডাকঘরে আসিতেন না। আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিতাম। আমার গমনবার্ত্তা পাইলে বৃদ্ধা ও মড আমাকে ডাকিতেন। বৃদ্ধার জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। মড শান্ত হইয়া অক্লান্তভাবে বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃদ্ধার নামে পত্র কলিকাতা ঘুরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ডাক বাছিয়া আমি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া বৃদ্ধার গৃহে উপনীত হইলাম। কয় দিন পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমার গমনবার্ত্তা পাইয়া মড পার্শ্বের কক্ষে আসিলেন। তিনি কম্পিতকরে পত্রখানি খুলিলেন, কিছু দূর পাঠ করিয়া নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে বৃদ্ধা ডাকিলেন,—"মড!" যুবতী ত্রস্তে আত্মসংবরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন, পত্রখানি পকেটে রাখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ কারলেন। তিনি দ্বার হইতে আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

যুবতীকে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "মড! তুমি কাঁদিয়াছ।"

যুবতী নীরব রহিলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমাকে কিছু লুকাইও না। কি হইয়াছে?"

নত-বদন হইয়া যুবতী বলিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পত্র আসিয়াছে।"

বৃদ্ধা সাগ্রহে বলিলেন, "পাঠ কর।"

এরিক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন। সেনাপতি জননীকে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ জানাইয়াছেন। যুবতী পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিতে লাগিল; বৃদ্ধার পাণ্ডুর আনন আরও পাণ্ডুর হইয়া গেল।

পত্রের শেষাংশে আসিয়া যুবতী বলিলেন, "আমাদের এরিক যোদ্ধার মত—বীরের মত মরিয়াছে; অপরের প্রাণরক্ষার্থ অসাধারণ সাহস দেখাইয়া আহত হইয়াছে। সেনাপতি লিখিতেছেন, তিনি তাহাকে সৈনিকের অত্যুচ্চ পুরস্কার ভিক্টোরিয়া ক্রস দিবার জন্য লিখিয়াছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া সৈনিক-সীমন্তিনীর পাণ্ডুগণ্ডে ও কপালে মুহূর্ত্তের জন্য রক্ত সঞ্চারিত হইল,—অশ্রু-সজল নয়নে আলোক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"ভগবানকে ধন্যবাদ।"

পরদিবস ইন্‌স্পেক্টর আসিলেন। আমার আর বৃদ্ধার সংবাদ লইতে যাওয়া হইল না। তাহার পরদিবস সংবাদ লইবার জন্য যাইয়া উদ্যানের দ্বার হইতে দেখিতে পাইলাম, বিকশিত উদ্যানের এক পার্শ্বে বিধবাবেশধারিণী মড একটি সদ্যঃসমাপ্ত সমাধির শিয়রে দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

উপেক্ষিত।

জগৎ কাব্যের মাঝে যত আছে শ্রেষ্ঠ গান,
বিপুল ধরার বুকে যত আছে রম্যস্থান,—
সবই সে চরণে তব ঢেলে দিয়ে মুগ্ধ কবি
আঁকিয়া গিয়াছে তব মনোজ্ঞ মধুর ছবি!
কোথায় তমসা-তীরে, চিত্রকূট-গিরি-শিরে,
মালিনীর স্বচ্ছনীরে চিরাঙ্কিত উপাখ্যান!

সাগরিকা, মালবিকা, বকুলিকা, নিপুণিকা,
প্রিয়ম্বদা, মাধবিকা,—শত নামে পূর্ণ প্রাণ।
জানিনাক কোন ভ্রমে ভুলে গিয়ে অন্ধ কবি
আঁকেনিক বন্ধুতার মহান্ সরল ছবি;
কোন দোষে উপেক্ষিত হে মিত্রতা, হে মহান্,
কোন গুণে তোমা হ'তে প্রেম উচ্চ গরীয়ান!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ভবানন্দের 'হরিবংশ'।

হরিবংশ একখানি সুবৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থ। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত ৯৮ পত্রে ইহা সমাপ্ত। ইহার লিপিকাল ১১৯২ মঘীর ২রা ফাল্গুন। সে আজ ৭৩ বৎসরের কথা। আমাদের নিকট এতদপেক্ষাও প্রাচীন ইহার আরও কয়েকখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে কোন কোনখানি সার্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কালের লিখিত বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রণেতার নাম দ্বিজ ভবানন্দ। গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভণিতা এইরূপ,—

"পরাশরসুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ॥ লোকে বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে॥"

গ্রন্থ-মধ্যে কবির যে সামান্য পরিচয়টুকু আছে, তাহা এই,—

"সত্যবতীসুত ব্যাস করিলেক প্রকাশ সর্ব্বলোকে বুঝিবারে পয়ার রচিল তারে
হরিবংশ শ্লোক পদবন্ধে। শিবানন্দ-সুত ভবানন্দে॥"

কবির পিতার নাম শিবানন্দ। আমরা ভবানন্দের গ্রন্থ হইতে তাঁহার আর কোনও পরিচয়ই পাই নাই। অন্য উপায়েও তাঁহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গীয় কবি-কুল নিতান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন। যে কয় জন প্রাচীন কবির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পুরাকালে যে সকল বঙ্গীয় কবি বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কীর্ত্তিকলাপও অদ্যাপি আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের সর্ব্বত্র এখনও বিলুপ্তপ্রায় পুঁথিগুলির উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে না।

এই গ্রন্থের রচয়িতা কোন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন; যদিও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দুর্লভ, তথাপি আমরা অনুমান করি, তিনি চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন। গ্রন্থের ভাষায় অনেক স্থলে চট্টগ্রামী বিভক্তি ও শব্দাদির প্রয়োগ দেখিয়াই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

ভবানন্দের রচিত আর কোনও গ্রন্থ আছে কি না, বলিতে পারি না। এত দিন আমরা তাঁহার রচিত বহুল বৈষ্ণব পদাবলী নানা পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেছিলাম; তাহার অধিকাংশ পদই এই 'হরিবংশে'র অন্তর্গত। চট্টগ্রামের প্রাচীন

রাগ-তাল-সম্বন্ধীয় পুঁথিতে ভবানন্দের এইরূপ অসংখ্য গীত পরিদৃষ্ট হয়। তাহার সবগুলিই যে 'হরিবংশে' আছে, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, তিনি 'হরিবংশ' ব্যতীত বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গীতেরও রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রীরাধার লীন হইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা সংক্ষিপ্ত নহে। ভবানন্দের কাব্য সংস্কৃত মূল হরিবংশের অবিকল অনুবাদ নহে। সে কালের অনুবাদে অনেক স্থলে নূতন সৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভবানন্দ কবিত্বসম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ কবিত্ব-হিসাবে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। ভাষা অনুগতা দাসীর ন্যায় তাঁহার লেখনীর অনুসরণ করিয়াছে। অশ্লীলতারও অভাব নাই। এই রুচি-বিকৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে হরিবংশের কবিত্বের মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। কবির রচনার লালিত্য ও মাধুর্য্য কর্ণে মধুবর্ষণ করে। কবি এই কাব্যে বিবিধ রাগ রাগিণীতে গেয় বহুবিধ মধুর সঙ্গীত বা 'পদে'র রচনা করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, কবি যদি রাধাকৃষ্ণের বিহারবর্ণনায় একটু সংযত হইতেন, তাহা হইলে হরিবংশ বঙ্গ-সাহিত্যে গণনীয় ও নিত্যপঠনীয় পুঁথি হইতে পারিত। বীভৎস আদিরসের এমন ছড়াছড়ি বাঙ্গালার আর কোনও গ্রন্থে আছে কি না, বলিতে পারি না। এই 'হরিবংশ' হিন্দুর পবিত্র গ্রন্থ। প্রসিদ্ধি আছে, না বুঝিয়া হরিবংশ পাঠ করিলে নির্ব্বংশ হইতে হয়। লোকে প্রকৃতই 'হরিবংশ' পাঠ করিতে ভয় করে। বোধ করি, আদিরসের বাহুল্যবশতঃ এইরূপ প্রবাদসৃষ্টি ও তাহার ফলে গ্রন্থের পঠন নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, কবির রচনাপ্রণালী ও কবিত্ব এত লোভনীয় যে, উক্ত অমার্জ্জনীয় দোষ সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। নিম্নে আমরা ভবানন্দের কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি।—

রাগ ধানশী।

কালার ভাবে সদাএ আকুল মোর হিআ। ধু

এ ধন যৌবন দিআ, শ্যামেরে সমুখে থুইআ,
দেখি রূপ নআন ভরিআ॥

যে বোল বোলউক লোকে, যার মনে যেই দেখে,
ননদীএ বোলউক অসতী।

গুরু গৌরবিত জনে, বোলউক যে লয় মনে,
ছাড়ে ছাড়উক্ নিজ পতি॥

শ্রবণে কুণ্ডল দিআ, যোগিনীর ভেশ* হইআ,
যথা তথা যাইমু মনদুঃখে।

কাণুর বিরহে মোর, তনু হৈল জর জর,
কি বলিব গোকুলের লোকে॥

মুই যদি এমত জানো, যমুনা পুলিনে কানু,
ত' কেনে ভরিতে যাই জল।

বেহানে পড়িছে বাধা, কুলের কলঙ্কিনী রাধা,
পাইলু তাহার প্রতিফল॥

---

* ভেশ—বেশ।

শুনহ পরাণের সই, তোহ্মাতে মরম কহি,
মোর রূপ কালার অধীন।
অবিরত মনে ভাবি, রাতুল চরণ সেবি,
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

রাগ বসন্ত।

আইস রে সোণার বন্ধু, রাখো হিআর মাঝে রে।
প্রাণ ছাড়ি গেলে বন্ধু কি করিব লাজেরে।
নআনে সদাএ দেখো ঐ মোর সাধ।
কেশে বান্ধিআ রাখো কালা পাট জাত॥
কাজল না হএ বন্ধু নয়ানে পরিতুম।
কালা পুতি নহে বন্ধু গলে গাথি দিতুম॥
সহজে হইলু্ দাসী না ভাবিঅ ভিন।
রাধার সংবাদ কহে ভবানন্দ দীন॥

রাগ—আহীর।

শ্যাম বন্ধু কালারে রতন।
কেমতে যাইমু্ ঘরে উদিত তপন॥
কাকে করে কলরব চিকুরে কোকিল।
মনুষ্য জাগিলে মোর যাইব জাতিকুল॥
দিনকর কিরণে জানি অবশেষ। (?)
আহ্মারে পৈরাও বন্ধু তোহ্মার জে ভেশ॥
মৃগমদ গন্ধ দিআ আহ্মারে কর কালা।
আহ্মার গলাতে দেঅ তোহ্মার বনমালা॥
তোহ্মার জে পীত ধাড়া আহ্মারে দেঅ পৈরি।
আহ্মার হস্তেতে দেওরে তোহ্মার মুরারি॥
কবরী খসাইআ বন্ধু বান্ধিআ দেঅ চূড়া।
দোস্বতী গাথিআ দেঅ মালতীর মালা॥
বরিহা বান্ধিআ দেয় তাহার উপরে।
এরূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোরে॥
তোহ্মার সমান ভেশ সাজাই মোরে দেঅ।
প্রেমসখা বলিমু্ লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ॥
বিলম্ব উচিত নহে শুন প্রাণবন্ধে।
ঘরে চলি যাও বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ ভূপালী।

প্রাণবন্ধুরে মুই ঝুরিমু কথ। (১)
গোয়ারি রাধার গাএ কথ সহিব এথ॥
শিশু হোতে তোহ্মার চরিত্র জানি ভালে।
বেহানের কথা কৈলে না রয় বিকালে॥
আগে মিঠা দিআ বন্ধু তিতা দিঅ পাছে।
রসবতীর মিত হেন কোনে বলিআছে॥
কুমারের পোথানি (২) তোহ্মার পিরীতি কেবল।
বাহিরে লেপনা দিআ ভিতরে আনল॥
ভাবিতে পাঞ্জর শেষ ঝুরিতে বিরহে।
হরিপদতলে দীন ভবানন্দে কহে॥

গ্রন্থে এরূপ সঙ্গীতের অভাব নাই। কিন্তু স্থানাভাবে আর উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বোধ হয়, কবি ভবানন্দ সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সকল রাগ রাগিণীর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীতশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের ব্যবহার সম্ভবপর হইত না। ভাটিয়াল, তুড়ি, বড়ারি, নট, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মায়ূরী, শাম (?), সারঙ্গ ভৈরবী, গান্ধার, নাগদন্তা, বেলোয়ার, প্রেমবারি, দুঃখী বড়ারি প্রভৃতি রাগ রাগিণীতে গেয় বহু গীত এই কাব্যে বিদ্যমান। 'ত্রিপদী' এই গ্রন্থে 'লাচারি' নামে অভিহিত। চতুর্দ্দশাক্ষরী পদগুলি কোথাও 'পয়ার' এবং কোথাও বা 'পদবন্ধ' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'পয়ার' শব্দটি কোথা হইতে

(১) কথ—কত।
(২) পোথানি—কুম্ভকারের ভাঁটি।

আসিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের মতে 'পাদ' শব্দ হইতে 'পয়ারের' উৎপত্তি হইয়াছে। বিরুদ্ধ-মত-স্থাপনে অক্ষম হইলেও উক্ত মতের সমীচীনতায় আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। 'পয়ার' শব্দটি সর্ব্বপ্রথমে কোন্ কবি কোন্ কাব্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা গেলে, সম্ভবতঃ এ তর্কের মীমাংসা হইতে পারে। পারস্য 'পয়কার' হইতে 'পয়ার' আসিয়াছে, এই-অনুমান করিয়া আমরা রমেশ বাবুকে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। রচনার নমুনাস্বরূপ নিম্নে 'পয়ার' হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রবণে শোভিছে ভালো অরুণ কুণ্ডল।
চন্দ্র জিনি শোভা করে দুই গণ্ডস্থল॥
নাসিকা শোভিছে যেন খগপতি জিনি।
চলিতে চঞ্চল কিবা খঞ্জনগমনী॥
লোচন কমল যেন অতি মনোহর।
কামের কামান যেন দেখিতে সুন্দর॥
ললাটে উজ্জ্বল তোর সিন্দূরের ফোটা।
শরতের চন্দ্র জিনি বিদ্যুতের ছটা॥
চিকুর চামর জিনি নাই তার মূল।
দোস্থতী গান্থিআ দিছ মালতীর ফুল॥

* * * *

মুকুতার হার তাতে অধিক শোভিত।
সুরেশ্বরী ধারা দেখি হইল লজ্জিত॥
ভাল ভুজদণ্ডে তোর কঙ্কণ সে সাজে।
পঙ্কে মৃণালদণ্ড প্রবেশিল লাজে॥
কনক দাড়িম্ব জিনি রঙ্গিমা অধর।
অমৃতের ধারা যেন ঝরে নিরন্তর॥
হেন লয় মোর মনে প্রাণি দিমু ডালি।
কেবা দিআছে তোরে বিমল কাঞ্চুলি॥
ইত্যাদি।

এই কাব্যে এমন অনেক নূতন শব্দ ও বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, যাহা অধুনা 'অপ্রচলিত' পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে সকলেই নারীগণের 'পতিনিন্দা' পাঠ করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও তাহার কতকটা বিদ্যমান, কিন্তু নিতান্ত অশ্রাব্য বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। সে কালের হিন্দুগণ স্ত্রীজাতির কিরূপ নাম রাখিতেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

"কামেশ্বরী শশিরেখা সুরেখা কমলা।
চন্দ্রাবতী চন্দ্রমালা আর চন্দ্রকলা॥
সাবিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা লজ্জাবতী।
কনকা কমলামুখী অম্বিকা যুবতী॥
অঞ্জনা খঞ্জনা দয়া চন্দ্রিকা মালতী।
বিষ্ণুপ্রিয়া মহাবিষ্ণু শ্যামা আরতি॥
অবর্ণা অপরাজিতা বিনতা চন্দ্রমুখী।
সুধাসুখী ক্ষমাবতী আর চন্দ্ররেখী॥
নেত্রাবতী কুরঙ্গাক্ষী আর ধন্যমানী।
অর্ককলা বিজয়া যে রোহিণী মোহিনী॥
রাধাবতী পূর্ণিমা চন্দ্রমা সুন্দরী।
অর্কজয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরিকা সুন্দরী॥
সীতা তারা পদ্মাবতী ঊর্ম্মিলা রূপসী।
মনোরমা কামাখ্যা জমনি (?) উর্ব্বশী॥
গঙ্গাপ্রিয়া পদ্মাবতী রম্ভা রূপেশ্বরী।
অহল্যা চন্দ্রিকা আর কালিন্দী সুন্দরী॥

যমুনা কামাখ্যা প্রভাবতী চিত্রাঙ্গদা। উষাবতী সুমঙ্গলা সুশীলা যুবতী।
হরিপ্রিয়া ভানুবতী জয়া অনুরাধা ॥ দময়ন্তী দেবজানি ভৈরবী জয়ন্তী ॥" ইত্যাদি।

প্রাচীন সকল গ্রন্থই ভাষালোচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেকালের ভাষা ইদানীন্তন কালের মত এমন বিদেশীয়-গন্ধ-যুক্ত ছিল না; ভাবরাজিও অকৃত্রিম ছিল। সরলতা সেকালের ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। অধুনা আমরা সারল্যকে বন-বাস দিয়া দুরূহতাকে আশ্রয় করিয়াছি।

এই গ্রন্থে আমি, তুহ্মি প্রভৃতি সর্ব্বনামের স্থলে আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সপ্তমী বিভক্তির 'তে' স্থানে 'ত' প্রায় সর্ব্ব স্থলেই আছে; যথা—পুছিএ তোহ্মাত,—রাধাত জিজ্ঞাসে, ইত্যাদি। ২য়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' ব্যবহৃত হয়; যথা,—'দেবতাক হিংসা করি রৈল ইন্দ্রপুর।' এবং,—'কর্ম্মদোষে আপনার বিধাতাক নিন্দে।' উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতী ক্রিয়ায় 'করিব' প্রভৃতির স্থলে করিম, করিমু, বর্ত্তমান কালে 'ধরি' প্রভৃতি স্থানে ধরম্, ধরো,* মধ্যম পুরুষের বর্ত্তমান কালে 'করিতেছ' ইত্যাদির স্থলে 'করসি' ইত্যাদির প্রয়োগও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। 'করিলাম' ইত্যাদি স্থলে 'করিলু' বা 'করিলুম,' এবং 'করিতাম' ইত্যাদি স্থলে 'করিতু' প্রয়োগ আছে।

অতীত কালে উত্তমপুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ প্রাচীন সকল কাব্যেই সুলভ। এই কাব্যেও আছে। নামপুরুষে 'করন্তি' ইত্যাদি প্রকারের ক্রিয়া-প্রয়োগ অনেক স্থানে আছে; যথা,—'সদাএ তোহ্মার গুণ করন্তি বাখান।' 'আমি' প্রভৃতি সর্ব্বনামের বহুবচনে আহ্মারা, আমার প্রভৃতির বহুবচনে আহ্মারার, তোহ্মারার প্রয়োগ আছে।

নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির আর দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধকলেবর বর্দ্ধিত করিলাম না :—কেহ্নে—কেন; কোভ—কভু; মেহ—মেঘ; মেলানি—বিদায়; দড়—দৃঢ়; কুঅর বা কুঞ্জর—কুমার; সমাই—('সমূহ'-শব্দ-জাত কি?) সকল; বওধিক্ (=বয়োঽধিক?)—বুড়া; আকুত—ইচ্ছা বা আগ্রহ; নিবিত্তে—নিমিত্তে; সাফল—সফল, ন্যায়—বিচার, নালিস; দেআন—কাচারি; অবুদ—অবোধ; ছাওআল—বালক; হোনে বা হনে—হইতে; বেলি—বেলা; গুমান বা গুমানি—গর্ব্ব; বাটোআরি—ডাকাতি; আছোক—থাকুক; নৌআলি—নূতন; আস্তাঙ্গিত—অস্তঙ্গত; লড়িল—চলিল; বাহুরিআ—ফিরিয়া; খাঁখার—কলঙ্ক; রাও—শব্দ; নেহালিআ—চাহিয়া; সাঅর—সাগর; বরিখে—বর্ষণ করে; একু—এক;

* কোন কোন পুঁথিতে 'ধরোঁ' রূপও চলিত আছে।

তোহর—তোর; গামারি—গাছ বিশেষ; ভৈন—ভগ্নী; নগরিআ—নাগরিক, 'নগরুআ'ও হয়।

প্রশ্নবোধক 'কি' স্থলে 'নি' অনেক কাব্যের মত এই কাব্যেও সাধারণ।

পতিআন—আশ্বাস।—

'এথেক রতির স্থানে দিআ পাতিআন। চলিলেক কামদেব হাতে পঞ্চবাণ॥'

ভাঙ্গরা—ভাঙ্গখোর, সুতরাং মাতাল।

'সহজে ভাঙ্গরা তুহ্মি কিবা আছে জ্ঞান। অহঙ্কারে আপনারে আপনে বাখান॥'

'মস্করা' শব্দটিও এই শ্রেণীর।

নাতি—পৌত্র; স্ত্রীলিঙ্গে নাতিন বা নাতিনী। নাতির পুত্র=পরিনাতি (প্রনাতি)।

গোহারি—নালিস। 'গোহারি করিম গিআ কংসের বিদিতে।'

স্থান—চতুর, চালাক। 'তোহ্মা মনে আহ্মা হোতে তুহ্মি বড় স্থান।'

উলিল—উদয় হইল। যথা,—'আকাশে উলিল ভানু।' 'উলা'র অর্থ 'নামা'ও হয়।

'বালক' অর্থে 'বালা' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে বহুল দৃষ্ট হয়। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'বালীর' প্রয়োগও দেখা যায়।

অথান্তর—বিপদ। 'রাধিকামঙ্গলে,' 'অন্যথা' অর্থেও ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি। 'মুই জানিতু এথা হৈব অথান্তর।'

হের—হে। এই অর্থে 'হের' শব্দের প্রয়োগ আরও অনেক পুঁথিতে দেখা যায়। 'শুন হের প্রাণসখি কহি বিবরণ।' অদ্যাপি চট্টগ্রাম নেজামপুর অঞ্চলে লোককে 'হেরই' বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

নায়ক—স্ত্রীলিঙ্গে—নায়কী। 'ভেদ নাই অঙ্গে অঙ্গে নাঅক নাঅকী প্রেমরস।'

সেকালের অনেক কবি বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গবিচার করিতেন না। তাহার প্রমাণ অনেক পাইয়াছি। পশ্চাদুদ্ধৃত পদে পাঠকগণ তাহার একটি নিদর্শন দেখুন।

'আর জথ গোপশিশু জাইব একাকিনী। তার আগে এই দুঃখে মরিব জননী॥'

তাঞি—তিনি, সে। (এখানে স্ত্রীলিঙ্গ।) 'কেমনে আসিব তাঞি তোহ্মার গোচর।' চট্টগ্রামে কথিত ভাষায় তিনি=তাঞি, সে=তে, স্ত্রীলিঙ্গে (হিন্দুমতে) সম্ভ্রমার্থে 'তাঞি' ও তুচ্ছার্থে 'তাই,' এবং মুসলমান-মতে সম্ভ্রমার্থে 'তাঞি' ও তুচ্ছার্থে 'তেই' প্রযুক্ত হয়।

হেনহি—নিশ্চয়ার্থক এই 'হি' এখন 'ই'তে পরিণত হইয়াছে। যেমন,—অদ্যহি=অদ্যই, ইত্যাদি।

'কেন' শব্দের 'কেহ্নে,' 'কেনে' ও 'কেনি' প্রয়োগ দেখিয়াছি ; কিন্তু 'কেহা' এই প্রথম দেখিলাম। চট্টগ্রামে 'কেহা' অদ্যাপি ভূরিপরিমাণে প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ অনেক। যেমনঃ—

'আমি সে প্রেমবতী, তুহ্মি সে প্রাণপতি, তবে মোরে ছাড়ি জাও কেহা।' 'জাতি যৌবন দিআ, পিরীতি বাড়াইল কেহা, অখনে হইব কোন গতি।'

দুলাল—এই শব্দটি 'আলালের ঘরের দুলাল' কথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এই বাক্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল ? 'হের রে দুলাল বাছা না যাইয় তুহ্মি কংসের ভুবন'—পদে 'দুলাল' শব্দটির দ্বারা মাতৃ-হৃদয়ের কতখানি স্নেহ অভিব্যক্ত হইয়াছে!

গাঠি—গাঁঠুরি, বোঁচ্‌কা।

'গাঠির মাণিক্য তুহ্মি হারাইলা হেলে। সুখে নিদ্রা জাও প্রভু মধুপুরে গেলে॥'

আকুল—আকুলতা। 'তোহ্মার আকুল দেখি হৈলু্‌ হতমতি।' বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে বিশেষণের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে।

খেওয়া দেওয়া—পার করা। 'কানু বাটোআর খেওআ দেহি সেই ঘাঠে।'

খেওআনি—যে পার করে, ঘাঠিআল।

কেরুআল—দাঁড়। অভিধানে 'কেরবাল' আছে।

পাতোআলা—হাইল।

ইহার একটি স্থানে একবারে চট্টগ্রামী অপভ্রষ্ট ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—'হিচে পানি,'—সিঁচে পানি। যাহা অধুনা 'মাইকেলী ক্রিয়া' নামে পরিচিত, এই গ্রন্থ হইতে তাহারও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছিঃ—'মথুরাতে গিআ আহ্মি কংস নিপাতিলে।'

বাঙ্গালায় পাদপূরণে, সম্প্রসারণে ও নিশ্চয়ার্থে কতকগুলি বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নোক্ত বাক্যে 'নাইক' পদের 'ক' পাদপূরণে ব্যবহৃত। যথাঃ—

প্রভুর অলঙ্ঘ্য বাক্য খণ্ডান নাইক। সেই হেন হেতু শোকে প্রাণ ছাড়ে পিক॥'

মোহর (=মোর), তোহর (=তোর), আউগে (=আগে), আউট (=আট), আওয়াস (=আবাস), হেনই প্রভৃতি স্থলে হ, উ, ওয়া এবং ই (প্রচীন হি) আমাদের উক্ত কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই গ্রন্থখানি যে চট্টগ্রামী কবির রচিত, তাহা এখন আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এই কয় বৎসরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, সাহিত্য বিষয়ে চট্টগ্রাম অধুনা যতই পশ্চাৎপদ হউক না কেন, প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রাম অগ্রগণ্য ছিল।

এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রায় দেড় শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহার একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট আছে। ভাষাতেও প্রাচীনতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। হরিবংশে 'গৌড়ীয় যুগে'র সাহিত্যের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং ইহা যে খুব প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক এক জন পরম কৃষ্ণভক্ত, অথচ চৈতন্যদেবের বন্দনা করেন নাই। কেবলমাত্র এই একটি কারণে সহজে তাঁহাকে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত করা যায় না। এক সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির অনুবাদের ধুম পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থখানিও তৎকালে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা যে অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, এরূপ অনুমান, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে।

শ্রীআবদুল করিম।

পল্লী ও নগর।

১

যেখানে "বুড়ী" স্কেচ্ (Sketch) করিতে বসিয়াছিল, সেটা পল্লীগ্রাম। ভ্রাতা প্রফুল্ল বিলাত যাইবার পূর্ব্বে বুড়ীকে স্কেচ্ করিতে শিখাইয়াছিল। বুড়ী পেন্সিল-স্কেচ্ ছাড়িয়া এখন তূলিকা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। গ্রামের কৃষক দীনবন্ধু দাসের কন্যা মালতী বুড়ীর পোর্টফোলিও ও তৈজসপত্র বহন করিয়া নদী-সৈকতে একটা বটবৃক্ষের তলায় বসিয়াছিল। স্কেচ্ হইয়া গেলে বুড়ী বৃক্ষতলে আসিয়া চিত্রখানি রঞ্জিত করিবে।

বুড়ী অনেক দূরে। সেখান হইতে সূর্য্যাস্তের শেষ বর্ণগুলি আকাশপটে ভাল করিয়া দেখা যায়। অতিশয় কৌশলে বুড়ী স্কেচখানি সমাপ্ত করিয়া সম্মুখস্থ দৃশ্যের দিকে শেষবার চাহিয়া দেখিল।

বুড়ী দেখিল, আকাশ অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবীর সন্ধি-স্থল মায়াময়। যত দূর যাওয়া যায়, আকাশও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানবের আশাও তাহাই।

বোধ হয়, আকাশের সহিত আশার কোনও সম্বন্ধ আছে। সাত বৎসর পূর্ব্বে বুড়ীর বয়স সাত বৎসর ছিল। তাহার তিন বৎসর পরে বুড়ীর অতুলনীয় সুন্দর

মুখখানি দেখিয়া ধনকুবের কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় পুত্রের সহিত বুড়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই বুড়ী শুনিল যে, তাহার বাসরঘরের সাধের বর এমন কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে এ জন্মে আর কেহ ফিরিয়া আসে না। কিন্তু সে কথা বাহিরে রাষ্ট হয় নাই।

কচি মেয়ে বুড়ী, গোলাপী মুখখানি শুভ্রবসনে ঢাকিয়া, অনেক দিন স্বামীর আশায় বসিয়া ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সে মুখখানি দেখিয়া অধিকদিন শোকে অধীর হইতে হয় নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর বুড়ী দাদার কাছে আসিয়াছিল। ভ্রাতা ভগ্নী উভয়েই পিতৃমাতৃহীন। শিবহাটীর জমিদারী বিচক্ষণা পিসীমা ও গোমস্তা ভজহরির হস্তে তত্ত্বাবধারণার্থ সমর্পণ করিয়া প্রফুল্ল সিভিলসার্ভিস পাস্ করিতে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বিলাত গিয়াছিল।

বুড়ীর হৃদয়ের আশা কোন অর্থ ও অবলম্বন না পাইয়া সখী মালতীর বাল্য স্নেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

যেখানে বুড়ী স্কেচ করিতে বসিয়াছিল তাহার নিকটেই দাহস্থান। একটি বালুকা-স্তূপের উপর বসিয়া বুড়ী সন্ধ্যা দেখিবার সাধে স্কেচখানি পদতলে রাখিয়া মাথার চুল ছড়াইয়া দিল। সম্মুখে ভরা নদী, এবং সিন্দুরভরা সন্ধ্যার ললাট।

বুড়ী আত্মহারা হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এমন সময় নদীসৈকতের নীরবতা ভাঙ্গিয়া মালতীর স্বর বুড়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।—

"সই, ঝড় আস্‌ছে,—পালা'।"

কথার অর্থ বুঝিবার অগ্রেই বৈশাখের ঝড়,—সন্ধ্যার আঁধার ও প্রবল নদীতরঙ্গ একত্রিত করিয়া বুড়ীর বালুকা-আসন নিমেষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সে আঁধারে বুড়ী কোথায় গিয়া পড়িল, তাহা কেবল এক জন অশ্বারোহী দেখিতে পাইল।

২

জরাগ্রস্ত শাখাপল্লববিহীন একটা বজ্রাহত, বৃদ্ধ, দগ্ধ ও ভগ্ন তরুর মূলে মিষ্টার চট্টোপাধ্যায় বুড়ীর তরুণ আহত দেহ সযত্নে রক্ষা করিয়া পৃথিবী ও আকাশের দিকে চাহিলেন।

শিশির চট্টোপাধ্যায় প্রশান্তহৃদয় যুবাপুরুষ। কিন্তু এমন বিপদে পূর্ব্বে পড়েন নাই।

ক্রমে কালো মেঘ ও প্রবল বায়ুর সহিত তাঁহার বজরা আসিয়া ঘাটে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত বুড়ীকে বজরায় লইয়া গিয়া নির্ম্মলার কোলে ফেলিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন।

নির্ম্মলা ও নির্ম্মলার মাতার শুশ্রূষায় বুড়ী নয়ন মেলিয়া চাহিল। ইতিমধ্যে মিষ্টার চট্টোপাধ্যায় গ্রাম হইতে পাল্কী ও বেহারা প্রভৃতি আনিয়া বুড়ীকে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

ঝড় থামিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিতেছিল। কালো মেঘ এক কোণে সরিয়া গিয়া গগনের তারকাখচিত প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল।

বুড়ীকে ধরিয়া পাল্কীতে রাখা হইল। মালতী পাল্কীর সহিত গেল। যাইবার সময় মিষ্টার চট্টোপাধ্যায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মালতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

শিশির। তুমি কে?

মালতী। আমি মালতী।

শিশির। ওঁর নাম কি?

মালতী। হিরণ্ময়ী। জমিদারদের মেয়ে।

শিশির। তা' আমি জানি। তুমি ওঁর কে?

মালতী। আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে। আমি ওঁর সই। আপনার নাম কি?

শিশির। বলিব না।

মালতী অবাক্ ও হতাশ হইয়া চাহিয়া রহিল। প্রাণদাতার কি নাম বলিতে নাই?

মিঃ শিশির চট্টোপাধ্যায় বজরায় আসিয়াই বজরা ছাড়িয়া দিলেন। নির্ম্মলা বলিল, "দাদা, মেয়েটি কে?"

শিশির। কেন, তোমরা কথা কও নাই?

নির্ম্মলা। তুমি কি আশ্চর্য্য লোক! মোটে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল, এমন সময় পাঠাইয়া দিলে, তোমার কি মনে নাই?

শিশির। তোমরাও আশ্চর্য্য লোক; প্রাণটা বাঁচাইলে, কিন্তু পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করিলে না?

নির্ম্মলা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা বলিলেন, "শিশির চিরকালই এক রকম।" নির্ম্মলা বলিল, "তুমি কি কঠিন; মেয়েটিকে দেখিয়াই আমার কেমন স্নেহ হইয়াছে। অন্ততঃ তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসা আমাদের উচিত ছিল।"

শিশির। তাদের অনেক লোক জন আছে।

নির্ম্মলা। বোধ হয় বড়লোক। মেয়েটি বড় সুন্দরী।

শিশির। বোধ হয়।

নির্ম্মলা। কি আশ্চর্য্য! কাদের মেয়ে, তা একবার জিজ্ঞাসা করিলে না? বোধ হয় ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল।

শিশির। নির্ম্মলা! জগতে কে কার মেয়ে, সে পরিচয়ে আবশ্যক কি? কোনও অজ্ঞাতমঙ্গলসাধনার্থ ঈশ্বর বালিকাটির প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

নির্ম্মলা ভ্রাতার স্বভাব জানিত। শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। নদীবক্ষে বজরা পাল তুলিয়া তীব্রবেগে ছুটিল।

মিষ্টার শিশির চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার। হুগলীর জজ-আদালতে প্রায় তিন দিন ধরিয়া একটি নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণতনয়ের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিয়া তাহাকে খালাস করাইয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণতনয় সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, "ঈশ্বর আপনাকে সুখী করিবেন।"

ভগ্নী নির্ম্মলা ও মাতা বজরায় করিয়া শিশিরকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা হইতে আসিতেছিলেন। মধ্যে শিবহাটী গ্রামের সম্মুখে ঝড় আসিয়াছিল। শিশির নির্ম্মলার পত্র পাইয়া অশ্বারোহণে বজরার প্রতীক্ষায় অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল।

৩

পল্লীগ্রামের ঝিল্লীকুল সারা রাত্রি ধান্যক্ষেত্রে পাহারা দিয়া সকালে ঘুমাইয়া পড়িল। দীনবন্ধু কৈবর্ত্তের কন্যা মালতী "সই"কে দেখিতে গেল।

পিসীমা ও ভজহরি গোমস্তা নিবারণ ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে জলডুবির যত প্রকার ঔষধ যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া বুড়ীর শিয়রে সারা রাত্রি বসিয়া ছিল। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে বুড়ী মিটি মিটি চাহিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

উদ্যানে মালতী বকুলবৃক্ষের তলায় ফুল কুড়াইতেছিল। বুড়ী বলিল, "সই, তুমি কখন আসিলে?"

মালতী স্নেহভরে জীবিতা বুড়ীর কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিল। বুড়ী বলিল, "সই, আমার স্কেচ্‌খানা কই?"

মালতী। নদীতে ভাসিয়া গিয়াছে।

বুড়ীর পক্ষে এই সংবাদ অতীব কষ্টকর হইয়া পড়িল। বারো দিন ধরিয়া শিবহাটী গ্রামের শ্মশানঘাটের "স্কেচ" প্রস্তুত হইয়াছিল।

উভয়ে পরস্পরের হাত ধরিয়া অনেক মাঠ পার হইয়া মালতীর বাটীতে গেল। গত নিশার ঝড়ের কাণ্ড দেখিয়া প্রভাত হাসিতেছিল। পল্লীগ্রামের জীবনটাই দুঃখময়। শ্মশান হইতে দরিদ্র-কুটীরের ব্যবধান অতি অল্প। মধ্যে কতকগুলি ধান্যক্ষেত্র, এবং একটা সোজা পথ।

সেই সোজা পথ দিয়া কৃষক-বধূ ও কৃষকবালকগণ ঘাট হইতে বাটী এবং বাটী হইতে ঘাটে আনাগোনা করিতেছিল।

জমিদারতনয়া বুড়ী মালতীর চুল বাঁধিয়া, এবং কৃষকবালকদিগকে "মুড়ি" খাইবার প্রাত্যহিক পয়সা দিয়া আনন্দিতমনে পূর্ব্বসন্ধ্যার দৃশ্যস্থলে "স্কেচ" খুঁজিতে গেল।

এক পাল কৃষকবালক সহ মালতী তন্ন তন্ন করিয়া স্কেচ খুঁজিয়া বেড়াইল। নদীতটে কত পাখী উড়িয়া গেল, কত গাভী বৎস লইয়া জল খাইয়া গেল। স্কেচের কোনও সন্ধান হইল না।

বুড়ী বলিল, "আমি দৃঢ়মুষ্টিতে স্কেচখানি ধরিয়া ছিলাম, ভাসিয়া যাইবার ত কোনও কারণ দেখিতে পাই না।"

মালতী বলিল, "তাঁর হাতে ত সাদা কাগজ দেখিতে পাই নাই।"

বুড়ী। কার?

মালতী। ও মা! সে কথা জান না? তোমাকে যিনি বজরায় লইয়া গিয়াছিলেন।

এক জন কৃষক বলিল, "সে একটা সাহেব।"

মালতী। দূর! তিনি বাঙ্গালী। আর বজরাতে একটি পরমসুন্দরী মেয়ে বসিয়া তোমার পায়ে ফ্লানেল দিয়া অগ্নির তাপ দিতেছিল।

বুড়ী সমগ্র ঘটনার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া একটু গম্ভীর হইল; পরে একটু ভয় পাইল। তার পর বুড়ীর সুন্দর মুখে আরক্তিম প্রভা ফুটিয়া উঠিল। বুড়ী বলিল, "তাঁহারা কে?"

মালতী। আমি নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন না।

বুড়ী। তাঁহারা আমার নাম জানিয়াছেন?

মালতী। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি।

বুড়ী। তুমি বোকা মেয়ে। এত দিন তোমাকে লেখাপড়া শিখাইলাম, কিন্তু তোমার একটু বুদ্ধি হইল না। অজানিত পুরুষের নিকট আমার নাম বলিতে গেলে কেন?

মালতী। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বুড়ী। সই, সহরের লোক বড় ধূর্ত্ত, তোমাকে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে দেখিয়া সব কথাগুলি জানিয়া গিয়াছেন। আমার আর একটা সন্দেহ হইতেছে।

মালতী বুড়ীর ভর্ৎসনায় মুখখানি ছোট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সই ?"

বুড়ী চুপি চুপি বলিল, "বোধ হয় স্কেচখানি তিনিই লইয়া গিয়াছেন। কি লজ্জার কথা !"

মালতী। তাঁহার ভারি অন্যায়।

বুড়ী। পরিচয় না দিয়া এইরূপ চলিয়া যাওয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার। যে মেয়েটি আমার নিকটে বসিয়াছিল, তার নাম কি ?

মালতী। তার-মা একবার "নির্ম্মলা" বলিয়া ডাকিয়াছিল।

বুড়ী হৃদয়ের সহিত সেই নামটি গাঁথিয়া রাখিল। কিন্তু বুড়ীর নিকট তাহার প্রাণদাতার ব্যবহার কুৎসিত ও অন্যায় বলিয়া বোধ হইল।

৪

মিষ্টার শিশির চট্টোপাধ্যায় কিছু কাল ইতালীতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা অসম্ভব। যাহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃতির ছবি অঙ্কিত হয় নাই, যাহারা আকাশে, বৃক্ষে, নদীর জলে, অস্তগামী সন্ধ্যায়, পূর্ণিমাপ্রসন্ন নিশীথিনীর শোভায় বিশ্বস্রষ্টার মহিমা নিরীক্ষণ করিতে এখনও শিখে নাই, তাহাদিগের পক্ষে চিত্র একটা আঁকা বাঁকা প্রতিলিপিমাত্র।

কিন্তু শিশিরের সে ভ্রম আজি দূর হইল। যখন বুড়ীর কোমল দেহ স্কন্ধে করিয়া বজরায় লইয়া আসিতেছিলেন,—তখন শিশিরের বোধ হইয়াছিল, একখানা সাদা কাগজ তাহার ব্রেষ্ট-পকেটের নিকট ঝুলিতেছিল। সেখানা তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এখন সেটাকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই অবাক হইতে লাগিলেন।

একটা ভরা নদীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার পরপারে বিস্তৃত শ্মশান, এবং সারি সারি কুটীর আলোকিত করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। সমগ্র দৃশ্যের সম্মুখে আশাপূর্ণনেত্রে একটি যুবাপুরুষ বসিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

চিত্রখানি কেবল স্কেচ মাত্র, কিন্তু সে স্কেচ সামান্য শিক্ষার ফল নহে। প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক আলোক ও আঁধারের রেখাবিন্যাসগুলি, যুবকের ভাবপূর্ণ মুখ ও আশাপূর্ণ দৃষ্টি, সকলই অপূর্ব্ব !

হঠাৎ শিশিরের বোধ হইল যে, চিত্রস্থ যুবককে কোথায় দেখিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে তাঁহার বাল্যসখা প্রফুল্ল!

কম্পিতহস্তে শিশির স্কেচখানি লইয়া নির্ম্মলার নিকট গেলেন। শিশির নির্ম্মলাকে বলিলেন, "নির্ম্মলা, দেখ ত, ছবির এই মুখ প্রফুল্লের মত বোধ হয় না?"

নির্ম্মলা নিমেষের মধ্যে চিনিল। দুই বৎসর ধরিয়া নির্ম্মলা যাহার মুখ দিবানিশি মানসপটে অঙ্কিত করিতেছিল, সে মুখ চিনিতে কতক্ষণ লাগে?

নির্ম্মলা। যাও! তোমার সকল বিষয়েই ঠাট্টা!

শিশির। ভগ্নী! কথাটা উপহাসের নয়। একটু গম্ভীর হইবার কারণ আছে। এ চিত্র আমার কারিকুরী নহে। পরশু রাত্রে শিবঘাটার ঘাটে যে জলমগ্না বালিকাকে লইয়া ব্যস্ত ছিলে, এ তাহারই অপূর্ব্ব শিক্ষার পরিচয়। তাহার পরিচয় জানাটা আবশ্যক ছিল।

নির্ম্মলা। বোধ হয় সে প্রফুল্লের কেহ হয়।

শিশির। কে হয়?

ভ্রাতা ভগ্নী কলিকাতায় প্রফুল্লকে প্রত্যহ দেখিত। বুড়ী বিধবা হইবার পর প্রফুল্লের জীবনে একটা কালিমার রেখা পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল শিশির ও নির্ম্মলার নিকট কখনও ভগ্নীর কথা উল্লেখ করে নাই। কাজেই উভয়ে জানিত যে, প্রফুল্লের সংসারে আর কেহই ছিল না।

নির্ম্মলার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। নির্ম্মলা কথায় কথায় একদিন প্রফুল্লকে বলিয়াছিল, "তোমার যদি ভগ্নী থাকে, আমি তাহার সহিত আলাপ করিব।"

তাহারই পূর্ব্বদিন বুড়ীর বৈধব্যসংবাদ পাইয়া প্রফুল্ল বজ্রাহতের ন্যায় অধীর হইয়াছিল। প্রফুল্ল অনেক কষ্টে হৃদয়ের ব্যথা লুকাইয়া নির্ম্মলাকে বলিয়াছিল, "না, আমার কোনও ভগ্নী নাই, আমার সংসারে কেহ নাই।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মিষ্টার চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "নির্ম্মল! আমি আর একবার হুগলীর দিকে যাইব। তুমি প্রফুল্লের কোনও পত্র পাইয়াছ?"

নির্ম্মলা কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কলিকাতা সহরটা তার শ্মশান বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মলা ভাবিল, পল্লীগ্রামই সুন্দর। নির্ম্মলার চখে জল আসিল।

৫

প্রফুল্ল সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভগ্নীকে লিখিল, "বুড়ী, আমি শীঘ্রই বাড়ী যাইব। তোমার স্কেচের কত দূর হইল?" বুড়ী লিখিল, "দাদা, স্কেচখানি

হয় ত জলে ভাসিয়া গিয়াছে, নয় ত কেহ চুরি করিয়াছে। দুঃখিনীর পক্ষে উভয়ই সমান। তুমি আসিয়া তদন্ত করিও।”

তাহার পর বুড়ী প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের সময় সেই ভগ্নতরুমূলে বসিয়া থাকিত। শ্মশানঘাটে একটি তরু ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে যাইতেছিল, অন্য স্থানে একটি অঙ্কুরের উদ্ভব হইতেছিল। হৃদয়ে একটা কোমল, সুন্দর, পবিত্র ক্ষেত্র আছে; সেখানে প্রেম অঙ্কুরিত হইলে বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রায় সার্থক হয়। ধীরে ধীরে দুঃখবারি সেচন করিয়া আশার ভাঙ্গা বেড়া দিয়া, নীরবে অলক্ষ্য সযত্নে কে যেন হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে সেই অঙ্কুরটি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

প্রতিদিন এক জন যুবাপুরুষ বৃক্ষরাজির অন্তরালে লুকাইয়া বুড়ীর চিন্তাপূর্ণ সুন্দর মুখখানি অনিমেষনয়নে দেখিত, এবং সন্ধ্যা হইলে নীরব নদীতট ভাঙ্গিয়া দূরস্থ বজরায় চলিয়া যাইত। এ কথা অন্য কেহ জানিত না।

সাত দিন ধরিয়া মিষ্টার শিশির বুড়ীর স্কেচখানি রং দিয়া সুন্দর বর্ণে আঁকিলেন, এবং প্রফুল্লের চিত্রের পার্শ্বে স্নেহবিজড়িত মুখে বুড়ীকে দাঁড় করাইয়া দিলেন।

শিশির কয় দিনের মধ্যে সমস্ত সন্ধান লইয়াছিলেন, কিন্তু নির্ম্মলাকে সে কথা বলেন নাই।

৬

বুড়ী মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা, বজরায় যে মেয়েটি ছিল, তারা কোথায় থাকে?’

মালতী। বোধ হয় কলিকাতায়।

বুড়ী। কলিকাতা মস্ত সহর। নচেৎ তাদের পত্র লিখিতাম। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। দাদা আসিলে জিজ্ঞাসা করিব।

মালতী। বোধ হয় সেই পুরুষটি মেয়েটির স্বামী।

বুড়ী। বোধ হয়, না।

মালতী। কেন সই?

বুড়ী। পুরুষটি চোর। চোর কখন স্ত্রী সঙ্গে করিয়া চুরি করিতে আসে না। চোর না হইলে সে পরিচয় দিত।

বুড়ী কয় দিন চিন্তার পর তাহার অজানিত প্রাণদাতার উপর রাগ করিয়াছিল। পরিচয় না দিয়া স্কেচ্‌খানি লইয়া যাওয়ার কথা মনে হইলে বুড়ী রাগ সংবরণ করিতে পারিত না।

সেই রাত্রিতে প্রফুল্লের বাড়ী আসিবার কথা। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বুড়ী উৎসাহ-সহকারে অপেক্ষা করিয়া পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ণিমার নিশি। গ্রাম, মাঠ, জলপথ ছাইয়া স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ সুধাবর্ষণ করিতেছিল। বহুদিনের স্মৃতির বোঝা মাথায় করিয়া একটি পথিক হুগলী ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে শিবহাটী গ্রামে আসিয়া পুরাতন ভদ্রাসনের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে বসিল।

প্রফুল্ল হ্যাট কোট ছাড়িয়া চাদর গায়ে দিল। খানিকটা মাথায় বাঁধিল। একটি সিগারেট জ্বালিয়া তাহার ধূম আম্রকাননের অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িতে লাগিল। প্রফুল্লের মতে মানবের দুইটিমাত্র বিশ্রামস্থান। জন্মভূমি ও স্বর্গ। যে জন্মভূমিতে বিশ্রামলাভ করে নাই, তাহার পক্ষে স্বর্গকল্পনা বৃথা।

প্রফুল্ল অনেকক্ষণ বাঁধাঘাটে শুইয়া থাকিল; কিন্তু ঘুম হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখীন হইয়া ভজহরি গোমস্তার বাতায়নপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ প্রভুভক্ত ভজহরি ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ শুভ্রবসনমণ্ডিতমস্তক একটা গোরা পুরুষের ন্যায় মানুষ দেখিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি ভজহরির গৃহে প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সকলে ভাল ত?"

ভজহরির চমক ভাঙ্গিল। ভজহরি বলিল, "দাদাবাবু! একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে বৃদ্ধাবস্থা, চিনিতে পারি নাই। সকলে ভাল আছে। বুড়ী দিদি এতক্ষণ বাহিরে বসিয়া ছিল, এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

"আচ্ছা, তুমি শয়ন কর!" বলিয়া প্রফুল্ল বৈঠকখানায় গেল। সেখানে জনক-জননীর দুইখানি বৃহৎ চিত্রপটের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া স্বর্গ হইতে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

মধুর মলয় বহিয়া প্রাঙ্গন প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ করিতেছিল। গৃহ হইতে বারান্দায় আসিয়া প্রফুল্ল দেখিল, একখানি সুন্দর ছবি দেয়ালে সংলগ্ন রহিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র-কিরণে চিত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নিম্নে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ছিল—"চোরা মাল।"

৭

অনেকক্ষণ ধরিয়া ছবিখানি দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল। প্রফুল্ল দেখিল যে, শিবহাটীর শ্মশানঘাটের পর পারে অস্তমিত সূর্য্যের আলোকে এক জন বসিয়া আশাপথ চাহিয়া আছে, অন্য জন তাহার পশ্চাতে চুপি চুপি ভুবনমোহন হাসি অধরে চাপিয়া অগ্রসর হইতেছে।

প্রফুল্ল ভাবিল, বুড়ী কি নিপুণ চিত্রকর! কিন্তু বুড়ীর মুখ কখনই বুড়ীর হাতের নয়। প্রফুল্ল স্বয়ং পাকা চিত্রকর। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহাতে দুই জনের কারিকুরি আছে।

প্রথম সূর্য্যকরের সহিত বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বুড়ী বলিল, "দাদা, তুমি সাহেবদের মত সুন্দর হইয়াছ।"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বুড়ী, ও ছবিখানা কি তোর টানা?"

বুড়ীর দৃষ্টি ছবির দিকে ধাবিত হইল। ছবি দেখিয়া বুড়ীর মুখমণ্ডল রক্তহীন হইয়া পড়িল। অবাক নিঃস্পন্দ হইয়া হিরণ্ময়ী ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্থিরভাবে বুড়ী বলিল,—"স্কেচখানি আমার।"

প্রফুল্ল। সমস্তটা?

বুড়ী। কেবল আমার ছবিটা নয়। রংও আমার নয়।

প্রফুল্ল। রং এবং তোমাকে দিয়া ছবিখানি সাজাইয়াছে কে?

বুড়ী। জানি না। বোধ হয় তিনি সেই—

প্রফুল্ল। সেই কে?

বুড়ী। আমি জলমগ্ন হইলে যিনি তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল। তিনি "স্কেচ" পাইলেন কোথায়?

বুড়ী। বোধ হয় আমার হাত হইতে চুরি করিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল। চোরা মাল রং করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কবে?

বুড়ী। বোধ হয় আজ সন্ধ্যার পরে।

প্রফুল্ল। অবশ্য, তুমি জান।

বুড়ী। না দাদা, আমি কিছুই জানি না।

প্রফুল্ল। আচ্ছা, ছবির রং দেখিয়া তোমার মুখের রং গেল কেন?

বুড়ী। দাদা, আমি তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, এবং মালতী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তা বলেন নাই।

প্রফুল্ল। দেখ্ বুড়ী, আমি ভিনিসের চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রাইজ পাইয়াছি। আমার সঙ্গে চালাকী খাটিবে না। আসল কথাটা তোকে বলিয়া দিই। যে চিত্র টানিয়াছে, সে বড়মানুষ; কেন না, ঐ কার্‌মিন্ রেডের প্রত্যেক কেক্‌খানির দাম পাঁচ টাকা। যে তুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার দাম অন্ততঃ দশ টাকা। তোর মুখের ভাব আনিতে তাহার অন্ততঃ দশ দিন লাগিয়াছে। তাহার সহিষ্ণুতা আছে, এবং সে কঠিন পরিশ্রমী। তোর ওষ্ঠাধরের পবিত্র রেখার প্রতিচ্ছবি তাহার হৃদয়ের পবিত্রতার পরিচয় দিতেছে। তোর আনন্দময় চক্ষুর মধ্যে একটু বিষাদের কজ্জল এমন ভাবে পরাইয়া দিয়াছে যে, আমার বোধ হয়, সে অন্ততঃ সাত আট দিন তোর মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়াছিল। এবং তুই তাহার দিকে

চাহিয়া দেখিস্ নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, তোর চোখের তারা দুটির দক্ষিণ পার্শ্ব-মাত্র সে Study করিয়াছিল।

বুড়ী। কি আশ্চর্য্য!

প্রফুল্ল। দাঁড়া, আরও দেখি। শোন্! বোধ হয় সে তোর Admirer, কেন না, তোর পা দুখানি অসম্ভব সুন্দর করিয়াছে; কিংবা হয় ত তুই বসিয়াছিলি, সে পা দুখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। সে বৃক্ষতলে বসিয়া চিত্রে রং দিত; কেন না, ভার্মিলিয়নটা (Vermillion) পরিষ্কার ফুটে নাই। এবং আমার বোধ হয়, এটা শিবহাটীর গ্রাম্য ঘাট; কেন না, শ্মশানের সম্মুখে নদীটা সোজা বহিয়া গিয়াছে, সে জায়গাটার Pencilling সে মুছিয়া দৃশ্যটার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তার নামের প্রথম অক্ষর "শি"।

বুড়ী অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রফুল্ল। এই দেখ্, প্রথমে তার নাম লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু Chinese white দিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। Water-colourএর ঐ প্রধান দোষ। বাকি ইতিহাসটুকু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে আমার বোধ হয়, তাহার হৃদয় প্রশান্ত, ধর্ম্মে ও স্নেহে ভরা, তাহার অহঙ্কার নাই, এবং সে কাহারও নিকট প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাহে না। লোকটা সহরের, কিন্তু পল্লীগ্রাম ভালবাসে। আচ্ছা বুড়ী! এমন কিছুই জানিস্ না, যাহাতে তার সন্ধান পাওয়া যায়?

বুড়ী। বোধ হয়, তাঁহার স্ত্রী কিংবা ভগ্নীর নাম নির্ম্মলা। তিনি বজরায় আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লের মুখ ও গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এ স্বভাবটা তাহার বিলাতে হইয়াছিল। প্রফুল্ল বলিল, "বুড়ী, তোর কি এখনও একটুও সংসারের জ্ঞান হইল না?"

বুড়ী। কেন দাদা?

"পরে জানিতে পারিবি। আজ আমার কতদিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে,"—বলিয়া, প্রফুল্ল বুড়ীর মুখের দিকে চাহিল। বুড়ীর জীবনের অন্ধকারভাগ প্রফুল্লের হৃদয়ের অর্দ্ধেকটা আচ্ছন্ন করিয়াছিল—আজি সুপ্রভাত সেটা মুছিয়া দিয়া স্বর্গ হইতে সুখের বারতা লইয়া আসিল।

প্রফুল্ল বাটীর মধ্যে গিয়া পিসীমাকে ডাকিল। প্রফুল্ল বলিল, "পিসীমা তুমি কচি লাউয়ের ঘণ্ট আবার রাঁধ।"

পিসীমার নয়ন অশ্রুজলে আঁধার হইয়া গেল, প্রফুল্ল পিসীমার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "পিসীমা, তোমার বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কি মত?"

পিসীমা। বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্র জেলার হাকিম হ'য়ে একটি রাঙ্গা বৌ ঘরে নিয়ে আয়।

প্রফুল্ল। আমি বুড়ীর বিবাহের যোগাড় করিয়াছি, তাই বলিতেছিলাম।

৮

প্রফুল্ল বুড়ীকে লইয়া কলিকাতায় গেল। সহরের নির্ম্মলা প্রকোষ্ঠে বসিয়া কুয়াসা দেখিতেছিল। নির্ম্মলার চক্ষুতে সকলই বর্ণহীন। সারি সারি কার্পেট, পুষ্পাধার ও ছবিগুবি ইতস্ততঃ অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলা চা খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। নির্ম্মলা আর হারমোনিয়ম বাজায় না।

নির্ম্মলা বুক বাঁধিয়াছিল। জীবনের শেষ সাধ মিটাইয়া সে প্রফুল্লের ফটোগ্রাফ-খানি দেখিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেখানা খামে মুড়িয়া প্রফুল্লকে ফিরাইয়া দিবে। পুরুষ জাতি কি প্রতারক, কি নিষ্ঠুর!

নির্ম্মলা কাঁদিল। প্রফুল্লের নাম লিখিতে গিয়া লিখিতে পারিল না। একটা ঘটি বাটি ছাড়িতে গিয়া যখন মানুষের কত মায়া হয়, তখন হৃদয়ের আরাধ্য মূর্ত্তি জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে কাহার না অতিশয় ব্যথা লাগে?

বাহির হইতে শিশির ডাকিল, "নির্ম্মল!" নির্ম্মলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদা, তুমি এখন এখানে আসিও না।"

মিষ্টার শিশিরচন্দ্র বলিলেন, "নির্ম্মলা! তোমার জন্য একখানা স্কেচ্ আনিয়াছি।"

নির্ম্মলা বলিল, "আমার স্কেচ্ দেখিবার সময় নাই।"

শিশির। কি আপদ! আমি জীবন্ত স্কেচ্ আনিয়াছি। একবার দেখ!

ইহা বলিয়া শিশিরচন্দ্র প্রফুল্ল ও বুড়ীকে লইয়া নির্ম্মলার ঘরে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। প্রফুল্ল বলিল, "নির্ম্মল! তোমার দাদা যাহাকে নদীগর্ব্ভে মৃত্যুমুখ হইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে এবং আমি তোমার পদতলে। বজরায় বসিয়া তোমার বুড়ীর চরণসেবাটা সাংসারিক হিসাবে ঠিক হয় নাই। বুড়ী আমার ছোট ভগ্নী।"

বুড়ী নির্ম্মলার কণ্ঠ জড়াইয়া বলিল, "দিদি, তুমি দেবী, তোমার স্নেহ অসীম,"—

নির্ম্মলার কাঁদিতে লজ্জা হইল। সে বুড়ীর মাথায় মুখ রাখিয়া প্রফুল্লকে বলিল, "তোমরা যাও।"

তাহার পর অন্তরালে দুই জনের কৈফিয়ৎ দুই জনে দিল, এবং বহির্বাটীতে দুই বাল্যবন্ধু তিনবার করিয়া চা খাইল। কিছু দিন পরে সহরের নির্ম্মলা পল্লীগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেটের পিসীমার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া স্বামী সহ তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল;

এবং পিসীমা কাশীবাস করিলেন। পল্লীগ্রামের বুড়ী মালতীর সহিত সহরে আসিয়া নির্ম্মলার ঘর অধিকার করিল, এবং স্বামীর অপর্য্যাপ্ত রঙ্গ তুলি ও ক্যানভাস্ পাইয়া সংসারের নূতন স্কেচ্ আরম্ভ করিল।

মায়ার বন্ধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। বকুল গাছ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। আম্রমঞ্জরীর অন্তরালে থাকিয়া কোকিল প্রাণপণে ডাকিতেছে। এমন দিনে হুগলী সহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে মাখ্‌না গ্রামে পর্ণকুটীরে একটি বালিকা ও বৃদ্ধায় কথোপকথন হইতেছিল। বালিকা সদ্যোবিকশিত গন্ধরাজ পুষ্পের ন্যায় পরিপূর্ণা সুন্দরী। বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। বালিকা স্নানান্তে আর্দ্রবসনে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া তুলসী গাছে ঝারা দিতেছিল। বৃদ্ধা দাওয়ায় বসিয়া সমস্ত দিনের গতিবিধির একটি খসড়া মালচিত্র মনে মনে আঁকিতেছিল।

"মা, আমি আর বাবুদের বাড়ী যাব না।"

"কেন লো কি হয়েছে—কেন যাবিনি ?"

"না, আমি কখনই যাব না। বাবুর রকম সকম আমার ভাল বোধ হয় না। কেমন ধারা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভঙ্গিমে করে—না মা, আমি কখনই যাব না।"

বৃদ্ধা মনে মনে কহিল, "তা বটে, স্বর্গীয় কর্ত্তা যেমন মহাদেবতুল্য লোক ছিলেন, ছেলেটা তেমনি একবারে অধঃপাতে গেছে।" (প্রকাশ্যে) "তা তুই ত গলে' যাচ্চিস্‌নে, আর সেও তোকে গিলে খাচ্চে না। চেয়ে দেখ্‌লেই বা! গরীবের অত শত কেন! পেটে ভাত নেই, এ দিকে কে চোখ ঠাওরালে, কে দুটো কানাঘুষো কল্লে—অমনি মেয়ে সরমে মরে গেলেন আর কি!

বালিকা স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, "গরীব বলে' তার কি আর ধর্ম্ম নেই!"

"সবি বুঝি পর্‌তিমে, কিন্তু পেট যে চলে না। তোর মা যখন তোকে সাত দিনের রেখে চলে' গেল, তোর বাপও আমার হাতে তোকে সঁপে দিয়ে সংসার ছেড়ে গেল। যাবার সময় তোর মায়ের গয়নাপত্র যা' কিছু ছিল, আমার হাতে

দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, 'দেখো বামার মা, তুমি অনেক কালের পুরোণো লোক—মেয়েটাকে যে রকম করে' হোক্—যত্ন করে' বাঁচিও।'—এতদিন গহনা বিক্রি করে' গতর খাটিয়ে তোকে মানুষ করে' এসেচি। এখন বুড়ী হয়েচি—যা' কিছু ছিল, তাও শেষ হ'য়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে যা' কিছু পাই, আর সেই সহরের গঙ্গার ধারে বট গাছের তলায় স্নানযাত্রার সময় যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল—তিনি আমাদের কষ্টের কথা শুনে দয়া করে মাঝে মাঝে শিষ্যি দিয়ে চালটা ডালটা এটা ওটা যা' কিছু পাঠান, তাতেই একরকম করে' চলে যাচ্চে। তুই সঙ্গে গেলে বাঁড়ুয্যে মশায়ের বেটা মহেন্দ্র খুসী হ'য়ে টাকাটা সিকেটা দেয়, তাই তোকে নিয়ে যাই। ওদের সঙ্গে আমার অনেক কালের আলাপ—ওরা হচ্চে গ্রামের মস্ত জমীদার।"

"তুমি যদি আমার আপনার মা হ'তে, এমন কথা কখনই মুখে আন্‌তে না! যা হোক্, আমার মরণই ভাল—আমি কখনই বাবুদের বাড়ী যাব না।"

আর কোনও কথা না বলিয়া প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া ভাঙ্গা তক্তার উপর পড়িয়া জন্মহারা মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দক্ষিণে দুয়ার দিয়া বৈশাখী বাতাস ঘরে ঢুকিয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় বালিকার নিবিড় আর্দ্র শ্লথ কেশ-জাল নাড়িয়া চাড়িয়া শুকাইয়া দিতে লাগিল। ঝল্‌ঝলে রৌদ্রকিরণ বালিকার মুখে আসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দশটার সময় প্রতিমা পুকুরে স্নান করিতে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, মহেন্দ্র তাহাদের বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে আসিতেছে। প্রতিমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র দুর হইতে তাহা দেখিতে পাইল। হিংস্র জন্তু যেরূপ লোলুপ ব্যগ্র দৃষ্টিতে শিকারের প্রতি চাহিয়া দেখে, মহেন্দ্রও সেইরূপ আশে পাশে তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। কুটীরে পৌঁছিয়াই বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁগা বামার মা, রকমটা কি—তোমাদের যে আর দেখাই নেই!"

বামার মা মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল। "অ্যাঁ! আপনি জমীদার বাবু আমাদের বাড়ীতে! কি পুণ্যি করেচি!—আসুন,—পোড়ার-মুখীটা আবার বেতের মোড়াটা কোথা রেখে' গেছে—আঃ কি আপদ!—আসুন, এই তক্তার উপর বসুন।"—এই বলিয়া ভাঙ্গা তক্তার উপর একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। "দেখ্‌চেন ত আমাদের অবস্থা!"

মহেন্দ্রের অত শত বাজে কথা শুনিবার ধৈর্য্য ছিল না। সে একেবারে আসল কথাটা পাড়িয়া ফেলিল।

"সব ত দেখ্‌ছি—কাল কেন যাওয়া হয়নি বল দেখি?"

বামার মা মহেন্দ্রের আসিবার উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল, "জানেন ত আজকালকার মেয়েরা কারো কথা শুনে না। মেয়েটা যত ডাগর হচ্চে, ততই যেন লজ্জায় ভেঙ্গে পড়চে। কোথাও বেরোতে চায় না। ক' দিন জোর করে' আপনাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিলুম। কাল কত করে' বল্‌লুম, কোন মতেই আর যেতে চায় না, কাঁদ্‌তে লাগল। মা-মরা মেয়ের চোখের জল দেখে আমারো চোখে জল এল, আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লুম না।" এই বলিয়া বামার মা চোখের কোণ মুছিতে লাগিল; "আর রোজ রোজ নিয়ে গেলে গিন্নিমাই বা কি মনে কর্‌বেন—না যাওয়াই ভাল।"

মহেন্দ্র অবিবাহিত। বৃদ্ধা মা ও একটি বিধবা ভগ্নী সংসারে ছিল। মহেন্দ্র মাতাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না। পুরাতন অনাবশ্যক সরঞ্জামের মত তিনি গৃহের এক কোণে পড়িয়াছিলেন। মহেন্দ্র বলিল, "সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার মেয়েকে দেখেছি—আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে, আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। যে রকম করিয়া হৌক্, তাহাকে চাই। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিব, তুমি এ বিষয়ে আমার সহায়তা কর। তাহাকে না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিব—ব্রহ্ম-হত্যার ভাগী তোমাকে হইতে হইবে। এখানে আসার পক্ষে আমার অনেক বিঘ্ন, চারি দিকে প্রজা, জানিতে পারিলে আমার মাথা হেঁট হইবে—তোমাদেরও কলঙ্ক।"

"আচ্ছা, আর একবার খুব চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"দেখো, ঠিক হয় যেন"—এই বলিয়া বামার মার হাতে দশটি টাকা দিয়া মহেন্দ্র গৃহাভিমুখে ফিরিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে বামার মা ভাবিতে লাগিল, "কি করি! উপায় কি?"

এ দিকে প্রতিমা মহেন্দ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেই ঘাটে আসিয়া খানিকক্ষণ বসিল; ভাবিতে লাগিল, "ভগবান যাহার কপালে দুঃখ লেখেন, তাহার দুঃখ লাগিয়াই থাকে। জন্মাবধি মা বাপের ত মুখ দেখিতে পাইলাম না। যিনি আমাকে মানুষ করিলেন—আমার পালয়িত্রী মাতৃস্থানীয়া—তিনি লোভে পড়িয়া আমার কি যে করিবেন, ঠিক নাই। লক্ষ্মীছাড়া ঐ জমীদারের ছেলেটা ত আমার শনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের দারুণ কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু একমাত্র

দাঁড়াইবার স্থান ধর্ম্মের উপর শয়তানের দৃষ্টি পড়িয়াছে—কি করিয়া সহ্য করি!" প্রতিমা উঠিয়া "হায় জগদম্বা!" বলিয়া উপর্য্যুপরি দুই চারিটা ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া মহেন্দ্রের ভয়ে গৃহে না ফিরিয়া একেবারে পুকুরপাড়ে পুরুৎঠাকুরুণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রতিমা যখন গৃহে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। বামার মা তখন আহারাদি শেষ করিয়া নাসিকাগর্জ্জনসহকারে নিদ্রা যাইতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"বৎস, ধর্ম্ম ঐ জলের মত স্বচ্ছ পরিষ্কার, ঐ ফুলের মত নির্ম্মল পরিমলপূর্ণ, এই বাতাসের মত লঘুপ্রাণ হিল্লোলময়, ঐ শিশুর মুখের মত সহজ সরল। প্রেম চাই, ভক্তি চাই, তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি অসীম জ্ঞানময় শক্তিময় করুণাময়। এই জগৎকৌশল তাঁহার অসীম জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে—সূর্য্য চন্দ্র, ফুল ফল, মাতৃস্তন্য তাঁহার অসীম করুণার সাক্ষ্য দিতেছে। যখনই মনে খটকা লাগিবে, তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতিক্রম বলিয়া মনে ধারণা জন্মিবে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রত্ব অসীমত্ব স্মরণ করিয়া সেই অসীম জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তিনি যেটুকু জ্ঞান, যেটুকু শক্তি দিয়াছেন, তাহা লইয়াই ত আমাদের স্পর্দ্ধা; তবে কেমন করিয়া সেই অসীমের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই! একখণ্ড তৃণ কি উপাদানে কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, যখন বুঝিবার আমাদের শক্তি নাই, তখন আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার কার্য্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কেমন করিয়া দেখিব, বুঝিব! সব বুঝিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করিও না, স্বীয় জ্ঞানের পরিমিতি উপলব্ধি কর। বৎস, তোমার বিক্ষিপ্ত বাসনা, তোমার সমস্ত কামনা সেই পরমাত্ম-বিন্দুতে নিক্ষেপ কর, সংহত কর, দেখিবে কি আনন্দ,—শান্তি, তাহা আর কিছুতেই পাইবে না। প্রেমানন্দ, তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ, ধর্ম্মের এই সার কথা।"

"বাবা, দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?"

"বৎস, জাগতিক দুঃখ চিরকালই থাকিবে। অবিশ্বাসী যাহারা, তাহারা দুঃখকে দুঃখই মনে করিয়া ভয় পায়—ভক্তেরা সেই দুঃখকে মাথার মণি করিয়া তাহারই মধ্যে আনন্দলাভ করে। রামায়ণ ত পড়িয়াছ,—সীতা এত দুঃখ সহ্য করিয়াও কেন জন্মজন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন? দুঃখের মধ্যেও বনবাসিনী সতী পতিপ্রেমে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যাহা হর্ম্ম্যবাসিনী রাজেন্দ্রাণীর পক্ষেও দুর্লভ। ভগবানে প্রাণ

মন অর্পণ কর, দেখিবে, যে আনন্দ পাইবে, তাহার নিকট জাগতিক সাংসারিক দুঃখ অতিশয় তুচ্ছ নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে।”

“বাবা, আমার আর একটি প্রশ্ন আছে—সংসারধর্ম্ম ভাল, না সন্ন্যাসধর্ম্ম?”

“এ বিষয়ে আমি আপাততঃ কিছু বলিব না। যখন সময় হইবে, পরে এ প্রশ্নের উত্তর দিব।”

সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীর আরও অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাহার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। জটাজূটশ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল বৃষ্টিবারিধৌত শরতের রৌদ্রের ন্যায় সহসা জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল। এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা প্রতিমা সেইখানে আসিয়া গলবস্ত্রে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিলে প্রতিমা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন, “মা, তুমি না আর একবার এখানে আসিয়াছিলে?”

“হ্যাঁ ঠাকুর, গত বৎসর স্নানযাত্রার সময় আমার মায়ের সঙ্গে আপনার চরণ দর্শন করতে এসেছিলুম।”

“মা, তোমার মুখখানি এত বিষণ্ণ কেন—তোমার কি কোন কষ্ট আছে?”

“হ্যাঁ ঠাকুর, আমার বড় দুঃখ। খাওয়া-পরার কষ্টের কথা বল্‌চিনে—আমার ভারি বিপদ!”

সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে উঠিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। তাহারা উঠিয়া গেলে কহিলেন, “তোমার যাহা বলিবার আছে, নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া বল। আমি তাহার বিধান করিবার চেষ্টা করিব।”

সন্ন্যাসীর স্নেহমাখা আশ্বাস-বচনে প্রতিমা যেন অনাস্বাদিত পিতৃস্নেহের স্বাদ পাইল, কহিল, “ঠাকুর, আমাদের গ্রামের জমীদারের জ্বালায় আর ধর্ম্ম থাকে না।”

সন্ন্যাসীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কহিলেন, “কে সে? তাহার নাম কি?”

“মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।”

“মহেন্দ্র! সেই পাষণ্ড! তোমার মা ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না? তিনি কেন তোমার সঙ্গে আসেন নাই?”

প্রতিমা অধোবদনে কহিল, “তিনি আমার আপনার মা নহেন—আমাকে মানুষ করিয়াছেন। তিনিও লোভে পড়িয়া এই কুচক্রান্তে যোগ দিয়াছেন।” প্রতিমার চোখ দিয়া জল পড়িল।

সন্ন্যাসী যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণেই আবার আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, “ইহার আমি প্রতীকার করিতেছি।” পরে

শিষ্যদিগের মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"ইহাকে লইয়া মঠে রাখিয়া আইস—আনন্দময়ীকে বলিয়া দিবে, ইঁহার পরিচর্য্যার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রেমানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাখ্‌না গ্রামে যে বৃদ্ধার নিকট আহারীয় দ্রব্য মধ্যে মধ্যে লইয়া যাও, সেই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।"

প্রেমানন্দ আদেশ পালন করিতে তখনই চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরের পর প্রেমানন্দ বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আমাকে কেন ডাকিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, বিশ্রাম কর, পরে বলিতেছি।"

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার কন্যা আজ প্রাতে আমার নিকট আসিয়াছে—সে এইখানেই আছে। শোন, তোমার কন্যার নিকট তাহার বিপদের কথা শুনিয়া স্থির করিয়াছি, কিছুকালের জন্য তাহাকে অন্যত্র রাখিব। তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে তোমার কষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সহ্য করিতে হইবে। আমি যাহা করিতেছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্য।"

"ঠাকুর, আপনি দেবতা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

"তোমার কন্যার সহিত দেখা করিতে চাও ত ইহার সঙ্গে যাও। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, সে সুখে থাকিবে। তুমি এই বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মে মতি রাখিও—হরিনাম করিয়া দিন কাটাইয়া দাও।"

বামার মা সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রতিমার সহিত দেখা করিতে মঠে গমন করিল। মাতা-কন্যার বিদায়-দৃশ্য পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন, বিস্তারিত লেখা বাহুল্য। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বামার মার নিতান্ত গর্হিত ক্ষমার অনুপযুক্ত অপরাধ সত্ত্বেও প্রতিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

বামার মা যখন একাকী গৃহাভিমুখে ফিরিল, তখন সূর্য্য প্রায় অস্তোন্মুখ। অন্ধকার সুপ্তি শ্রান্তিতে চরাচর আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। গাভীরা ধূসর ধূলিকণা উড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছে। পাখীরা একে একে কুলায়ে আসিয়া বসিতেছে। প্রতিমার জন্য বামার মার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। সে কাঁদিতে লাগিল,—"আমার দিনও শেষ হইয়া আসিয়াছে—ইহকাল পরকালের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কেন এমন কাজ করিতে গেলাম! আহা, বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আমারই

বুদ্ধির দোষে এমন ঘটিল!" দূরে দেখিল, একটা গাভী বৎসকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় একটা কুকুরকে তাড়া করিয়া গেল।—বৃদ্ধা মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, পশুদেরও বাৎসল্য আছে, ধর্ম্ম আছে, আর আমি মানুষ হইয়া এমনই অধম।"—বৃদ্ধা মাটিতে বসিয়া পড়িয়া সেই অদৃশ্য মহেশ্বরের চরণে বারবার মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সহর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে সন্ন্যাসীর মঠ। ছোট ছোট সারি সারি অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর—মাটির দেয়াল, উপরে খড়ের চাল। সন্ন্যাসী একাকী একটি ঘরে থাকিতেন—অন্যান্য ঘরগুলি শিষ্য ও অতিথিদিগের জন্য। মঠের জমী প্রায় বিশ ত্রিশ বিঘা হইবে—লতা গুল্ম জঙ্গলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। জমীর মধ্যভাগে একটি সুবৃহৎ কাঁঠাল গাছ—ইঁট দিয়া বাঁধানো। এই বৃক্ষতলে বসিয়া সন্ন্যাসী ধ্যান করিতেন।

বামার মা চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে একটু রাত্রি করিয়া সন্ন্যাসী মঠে ফিরিলেন। প্রতিমা তখন বসিয়া মঠের বৃদ্ধা পাচিকা আনন্দময়ীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সন্ন্যাসী আনন্দময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আজ আহার করিতে বিলম্ব হইবে, আমার আহার প্রস্তুত রাখিয়া তোমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে যাও; দেখিও মেয়েটিকে খুব যত্ন করিও।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী অতি অল্প সময়ই নিদ্রা যাইতেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতে অথবা ধ্যানমূর্ত্তিতে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। সমুদ্রের অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যেমন একটা চঞ্চলতা প্রবাহিত, সুদূর একতান ক্রন্দনধ্বনি নিরন্তর উত্থিত হইতে থাকে—সন্ন্যাসীর প্রশান্ত স্থির গম্ভীর মূর্ত্তির মধ্যেও তেমনই সর্ব্বদা একটা চঞ্চল ব্যাকুলতা প্রকাশমান—যেন কি ধরিতে চাহিতেছেন, সম্পূর্ণ ধরিতে পারিতেছেন না—যেন কি ছাড়াইতে চাহিতেছেন, সম্পূর্ণ ছাড়াইতে পারিতেছেন না—যেন অন্তরে অন্তরে জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছে।

সন্ন্যাসী আজ যেন সমধিক চিন্তাগ্রস্ত। স্তব্ধ বনানী। রজতশুভ্র জ্যোৎস্না ঘন নিবিড় চিক্কণ পত্র হইতে পত্রান্তরে পিছলিয়া পড়িতেছে। দূর হইতে বাঁশীর শব্দ আসিতেছে। ঝর্ঝর করিয়া বাতাস বহিতেছে। নারিকেল-তরুশির হইতে কাকেরা মাঝে মাঝে কা কা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। খড়ের চালের

উপর দুই একটা ইঁদুর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সকলই বিবশ বিকল—যে মদির-বিহ্বল প্রকৃতি-রাণী আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিতেছেন না। গ্রীষ্মহেতু কুটীরের সকল দ্বারই উন্মুক্ত। ঘরে জ্যোৎস্না ঢুকিয়াছে। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, প্রতিমা মাধবীলতার ন্যায় শুষ্কচর্ম্ম অস্থিপঞ্জরসার বৃদ্ধাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া শুইয়া আছে। বালিকার মুখখানি নিদ্রাতেও যেন বিষাদভরা। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

ভোর হইতে না হইতে সন্ন্যাসী প্রেমানন্দকে ডাকিলেন। প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী রাত্রে কিছুই আহার করেন নাই—আহারদ্রব্য পূর্ব্ববৎ সজ্জিত রহিয়াছে। প্রেমানন্দের প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "সন্তোষ-কুমারকে ত তুমি জান। মঠের সমস্ত ব্যয় সেই একরকম নির্ব্বাহ করে। ছেলেটি অতিশয় সৎ। ধনীর সন্তানকে এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রায়ই দেখা যায় না। সন্তোষের মাও যেন সাক্ষাৎ নারায়ণী। আমি স্থির করিয়াছি, উহাদের বাড়ীতে বালিকাকে রাখিব। তুমি কি বল?"

প্রেমানন্দ কহিল, "বাবা, অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাহা হইলে এখনি সঙ্গে করিয়া উহাকে রাখিয়া আইস, বিলম্ব করিও না। সন্তোষকুমারকে এই পত্রখানি দিবে।"—তাহার পর প্রতি-মাকে কাছে ডাকিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "মা, তোমাকে যাহার নিকট পাঠাইতেছি, সে আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র। তোমার কোনও ভয় নাই, সেখানে তুমি সুখে থাকিবে। সকলকে ভালবাসিও, সেবাশুশ্রূষা করিও, গৃহের কাজকর্ম্ম দেখিও। আমিও প্রায় তোমার খোঁজ লইব।"

প্রতিমা সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দের সহিত চলিল। তখনও ভাল করিয়া আলো ফোটে নাই। গাভীরা মাঠে রোমন্থন করিতেছে। কোঁচড়ে মুড়ি লইয়া রাখাল-বালকেরা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া আসিতে প্রতিমার কষ্ট বোধ হইতেছিল। অল্প দূরে গিয়া সে একবার মঠের দিকে ফিরিয়া চাহিল—দেখিল, সন্ন্যাসী তখনও তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

ক্রমে তাহারা সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সহর সবেমাত্র গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। দোকানদারেরা দোকানের ঝাঁপ্ খুলিতেছে। সমস্ত রাত্রি অন্যত্র কাটাইয়া ইয়ার-বাবুরা গলা-ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখে

ফিরিতেছেন। সন্ন্যাসীর সহিত প্রতিমাকে যাইতে দেখিয়া তাহারা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল—পরস্পরে বলিতে লাগিল, "ব্যাপারটা কি! সন্ন্যাসী বেটা এ কাহাকে লইয়া যাইতেছে!"—একটু দূরে গিয়া তাহারা গান ধরিল—"কে যায় ঐ নবীন সন্ন্যাসী।"

অবশেষে উভয়ে গন্তব্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। গঙ্গার উপরেই বাড়ী। কোমল শষ্পশয্যা নদীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। বাগানে নানাবর্ণের ফুল—মধ্য-ভাগে প্রস্তরমণ্ডিত একটি জলের ফোয়ারা। চতুর্দ্দিকে মেদিপাতার বেড়া। সন্তোষ বাগানে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতেছিল। প্রেমানন্দ প্রতিমাকে লইয়া সেই-খানে উপস্থিত হইল। সন্তোষ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ সাদরসম্ভা-ষণ করিয়া সন্ন্যাসীর পত্রখানি তাহার হাতে দিল। পত্রে লেখা ছিল,—"বৎস, ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। সহোদরার মত দেখিবে। মাকে বলিবে, ইহার দ্বারা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া লইতে। তুমি সুবিধামত একদিন মঠে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

সন্তোষ ছোট ভগ্নী মালতীকে ডাকিয়া কহিল, "ইহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যা,—মাকে বলিস্, সন্ন্যাসী ঠাকুর পাঠাইয়া দিয়াছেন।"—তাহার পর প্রেমানন্দের সহিত নানান্ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

প্রেমানন্দ চলিয়া গেলে সন্তোষ পাঠাগারে আসিয়া বসিল। প্রকাণ্ড হল—মস্ত মস্ত কড়িকাঠ পর্য্যন্ত উঁচু সেল্‌ফে বই সাজান রহিয়াছে—বইয়ে যেন দেয়াল সমস্ত যোড়া। নানারকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়িয়া আছে। টেবিলের উপর বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের ছবি। চারিধার হইতে বৈদ্যুতিক তার চলিয়াছে। ঘরে ঢুকিলে গন্ধেতেই যেন কবিত্বের দম্ আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হয়।

সন্তোষ বিজ্ঞানে এম্. এ. পাশ করিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তাহার বিজ্ঞা-নের প্রতি আন্তরিক টান। স্কুলে পাঠকালে সে রুম্‌কর্ফ্‌স্ কয়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞা-নিক যন্ত্র বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া সহপাঠীদিগকে চমৎকৃত করিত। পিতার অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া এক্ষণে সে বৈজ্ঞানিক কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ও অজস্র অর্থব্যয় করিতেছে—স্থির করিয়াছে, বিবাহ না করিয়া এই কাজেই জীবনপাত করিবে।

সন্তোষ বসিয়া বসিয়া এটা ওটা নাড়া-চাড়া করিতেছে, এমন সময় মালতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, দেখ্‌বে এস, এমন সুন্দর

মেয়ে কখনো দেখনি! তখন গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা ছিল, কিছুই দেখ্‌তে পাও নি,—লক্ষ্মী দাদা, তুমি পাশের ঘর থেকে লুকিয়ে দেখ্‌বে এস—তোমার পায়ে পড়ি।"—এই বলিয়া হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্তোষ মালতীকে বড় ভালবাসিত। তাহার কথা উপেক্ষা না করিতে পারিয়া উপরে গেল। সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে মুগ্ধ হইল। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে অতর্কিতভাবে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—"এমন মুখ ত দেখা যায় না!" ক্রমশঃ।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

আকবর।

ভারতের প্রধান মোগল সম্রাট জলাল-উদ্দিন আকবরের বিষয় এখন অনেকেই নানা ভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। কেহ আকবরকে এক নবধর্ম্মের পয়গম্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ তাঁহাকে ভারতের প্রধান সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিচিত করেন। গত অক্টোবর মাসের "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আকবরের সমাজসংস্কারচেষ্টার একটু পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পরিচয়পদ্ধতিতে আমরা আকবরকে চিনিতে পারি নাই। এ পরিচয় ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ না হইলেও, অত্যন্ত একদেশব্যাপী ও সঙ্কীর্ণ। সমাজ-সংস্কারক আকবরকে লোকসমাজে যথাযোগ্য-ভাবে পরিচিত করিতে হইলে, আকবর-চরিতের তিনটি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যা আবশ্যক।

১। আকবরের উদ্দেশ্য কি ছিল?

২। সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে তাঁহার চেষ্টা।

৩। আকবরের নিজের ব্যবহার ও কার্য্যপদ্ধতি।

লোকহিতার্থ আকবর কোনও কার্য্য করিতেন কি না, আমরা তাহা স্পষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু আকবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের সহিত একটা "বুঝা-পড়া" করিয়া না লইতে পারিলে ভারতে মোগল আধিপত্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেনানী-গণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। অনেক মোগল ওমরাহ আকবরের গুপ্ত শত্রু ছিলেন; অনেক প্রাদে-শিক সুবাদার আকবরের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিরোধ করিতে সংকোচ বোধ করিত না। পাঠানগণ পদে পদে মোগলদিগের শত্রুতা করিত, তাহারা মোগলের উচ্ছেদ করিবার কোনও অবসর ত্যাগ করিত না। একে ত সে সময়ে হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা অত্যল্প ছিল, তাহার উপর হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত সমকক্ষতা করিয়া, তাহাদিগকে সম্মুখসমরে পরাজিত করিয়া একটু উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানের প্রতি [illegible]—সমরকালে হিন্দুর [illegible] অতি অসম্ভোষে অবস্থিতি করিতেছিল। দিল্লীর সিংহাসন [illegible] প্রক্ষেপের উপর নির্ভর করিত। ফলে, হিন্দু-

মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত রাজা-প্রজার সম্বন্ধ ছিল না;—জেতৃ-বিজিতের ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছিল। আদর ছিল কেবল শক্তিমানের, প্রভাব ছিল কেবল রণ-নিপুণ সেনানীর।

আর্য্যাবর্ত্তের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মুসলমানদিগের নানা সম্প্রদায়কে এক করিয়া ভারতশাসনকার্য্যে ব্রতী হওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। মুসলমান তাঁহার শত্রু; তাঁহার বিরোধী। হিন্দু শত্রু নহে; বিরোধী নহে; পরাজিত—পদানতও নহে;—কেবল তাঁহার বল পরীক্ষা করিতেছে; তাঁহার ইচ্ছাশক্তির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। হিন্দু সংখ্যায় অত্যধিক, বলে অপরিমেয়, যোগ্যতায় অদ্বিতীয়। হিন্দুর ছিল না কেবল স্বাবলম্বন, দূরদর্শন ও প্রকৃত স্বদেশবাৎসল্য। হিন্দু চাহে নেতা, চাহে কর্ত্তা। চতুর আকবর এই নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন; হিন্দুকে আপনার করিয়া লইলেন; ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের বুনীয়াদ মজবুত হইয়া বসিল।

সমাজতত্ত্বের নিয়মই এই, যখন কোন প্রবল বাহ্যশক্তি একটা স্বতন্ত্র সমাজের উপর বিরূপভাবে কাজ করে, তখন ঐ স্বতন্ত্র ও পীড্যমান সমাজ যদি কঠোর স্থিতিশীলতার স্থূল অভেদ্য আবরণে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে সে সমাজ আরও কিছুকাল জীবিত থাকে। এই অবসরে যদি কোন অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়, তবে এই সমাজ আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, নিজের স্বাতন্ত্র্যও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। ভারতের হিন্দু সমাজ মুসলমান শক্তির প্রথম সংঘর্ষে বুঝিয়াছিল যে, এই সংঘর্ষ যোদ্ধৃবিশেষের দিগ্বিজিগীষা-জাত নহে—ইহা জাতিপ্লাবন; মানবসমাজের একটা উৎক্ষেপ। এই প্লাবনের মুখে কত দিগ্‌হস্তী ভাসিয়া গিয়াছে; কত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ বালুকায় পরিণত হইয়াছে; কত জনপদ মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। তাই হিন্দুসমাজ কচ্ছপ কমঠের ন্যায় স্থিতিশীলতার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত হইয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, প্লাবনতরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। আকবর এই আবরণটি উন্মুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাই তিনি সমাজসংস্কারক; তাই তিনি ধর্ম্মসংস্থাপক।

কিন্তু তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম তাঁহার স্বজাতীয়গণ তাঁহার বিষম বিরোধী ছিল। তাহারা বলদৃপ্ত ও মদান্ধ ছিল; আকবরের অভিসন্ধানের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুগণ আকবরের চাতুরী বুঝিয়াছিল। বিরাট হিন্দুসমাজের "Passive resistance" আকবরের সার্ব্বভৌম সামর্থ্যকে ব্যাহত করিয়াছিল। এক জাতিভেদ ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচারেই আকবরকে যথেষ্ট চাপিয়া রাখিয়াছিল।

আকবরই প্রথম মোগল বা মুসলমান, যিনি ইরাণী পোষাক ত্যাগ করিয়া, রাজপুতের শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিন্দুর জোড়া ব্যবহার করিতেন; হিন্দুস্থানী জুতায় চরণরক্ষা করিতেন। আকবর মুসলমান হইলেও দাড়ি কামাইয়াছিলেন, এবং হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আকবরের আদেশে ইস্‌লামী "সুন্নৎ" দিল্লীর রাজভবন হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। আকবরের পরে আর কোনও মোগল সম্রাটের যথাপদ্ধতি সুন্নৎ হয় নাই। আকবর রাজপুত বেগমের মহলে যাইয়া দেবতার প্রসাদ সাদরে ভোজন করিতেন। আকবর নিজে এতটা হিন্দুয়ানীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—তিনি আশা করিয়াছিলেন, হিন্দুগণও ততটা ইসলামীর দিকে অগ্রসর হইবে। আকবরের আশা পূর্ণ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আকবরকে আধুনিক ইংরেজী ঢঙ্গের সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। আধুনিক হিসাবে সমাজ-সংস্কারক তিনি ছিলেন না। আকবর রাজনীতিবিশারদ, দূরদর্শী, চতুর, স্বার্থপর সম্রাট ছিলেন। ধর্ম্ম, সংস্কার, দয়া, মায়া, ক্ষমা,—সকলই তাঁহার রাজনীতির আসবাব ছিল। তিনি নিজে তেরটি বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন; অন্যের বেলা একটি বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নিজে অত্যন্ত—অতিমাত্রায় বিলাসী ছিলেন, উপদেশ দিবার সময়ে সংযম ও ত্যাগের কথাই কেবল কহিতেন। তিনি যুবতীবিবাহ ও স্বেচ্ছাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ তাঁহার হারেম-কন্যাদিগের বিবাহের পথে তিনিই বাধাস্বরূপ ছিলেন। আকবর কাহাকেও জামাতৃপদে বরণ করেন নাই, আকবরের অনুসরণ করিয়া আলমগীরের শাসনকাল পর্য্যন্ত সম্রাটের সংসারের কোনও কন্যারই বিবাহ হয় নাই। তিনি সতীদাহ উঠাইতে চাহিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার "লালগোলী" "সবজা গোলী"র ব্যবহারে কত সতী মরিয়াছে, কত বিধবার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এমনই ভাবে, ইতিহাসের ঘটনার সহিত আকবরের উপদেশমালার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, আপনা-আপনিই আকবরের অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। আকবর যদি সত্যসত্যই ধর্ম্মপিপাসু, জাতিহিতেচ্ছু, সমাজসংস্কারপিপাসু হইতেন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইয়া যাইত। তিনি কেবল মাটির মোয়া দেখাইয়া হিন্দুকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন; আওরঙ্গজেবের কঠোর ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মপরায়ণতার প্রকোপে হিন্দুর এই বিমূঢ়তা নষ্ট হইয়াছিল। ভারতে মোগলরাজ্যও ধূলিসাৎ হইয়াছে।

জাহাঙ্গীর বাদশা অনেকটা পিতৃপদানুসরণ করিতেন। তাঁহারও দাড়ি ছিল না; তিনিও আচার-ব্যবহারে অনেকটা হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি খাঁটি মুসলমান; তাঁহার পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদ; তাঁহার রাজ্যের সকল মসজেদে তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া খোৎবা পঠিত হউক। জাহাঙ্গীরের পরে শা-জাহাঁ আরও একটু অধিকতরমাত্রায় মুসলমান ছিলেন। তিনি দাড়ি রাখিয়াছিলেন, নিয়মিত নমাজ পড়িতেন; এমাম—মোল্লার সহিত পরামর্শ করিতেন। শা-জাহাঁর পরে আওরঙ্গজেব ইস্লাম ধর্ম্মের মাত্রা অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের নিধন। আকবর যে শক্তি সমাজদেহে সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিপর্য্যস্ত সমাজ ধীরে ধীরে সেই শক্তি-ক্রিয়াকে একেবারেই স্তম্ভিত করিয়া দিল।

আমরা যে ভাবে আকবর-চরিত-কথার আলোচনা করিলাম, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সে ভাবে করেন নাই। তিনি আকবরকে রাজা রামমোহন রায়ের ইস্লামী Enlarged Editionএ পরিণত করিয়া, আকবর-চরিতের আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই ভাবে আকবরের কথা কহিলে, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায়ের সহিত সমাজসংস্কারকার্য্যে আকবরের তুলনায় সমালোচনা করিলে, বাঙ্গালী জাতির অপমান করা হয়—বিদ্যাসাগরের অমর্য্যাদা করা হয়, রামমোহন রায়কে কলঙ্কিত করিতে হয়। রাজনীতির মাপ-কাটিতে আকবরকে মাপিলে, আকবর অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অপূর্ব্ব। সামাজিক মনুষ্যের হিসাবে আকবরের আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আকবরে সে মহত্ত্ব নাই।

স্পেন্সার।

যে সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন মনীষী জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ মহামতি স্পেন্সার তাঁহাদের অন্যতম। কয়েক মাস পূর্ব্বে আচার্য্যপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ড যে একটি অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি? জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে প্রতিভায় যাঁহারা ইংলণ্ডকে কমলার মরকতপ্রদীপ্ত পীঠতল শ্বেতদ্বীপকে দেবী বীণাপাণির রম্য কুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাই সেখানে এখন এরণ্ডও দ্রুম নামে পরিচিত হইতেছে; এখন সেখানে চেম্বার্লেন ও ব্রডারিক গ্লাডষ্টোন ও ব্রাইটের আসনে উপবিষ্ট; কিপ্‌লিং সরস্বতীর বরপুত্র!

সম্প্রতি সুবিখ্যাত "ফোরম" পত্রে মিঃ স্পেন্সার সম্বন্ধে কয়েকটি অতি সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইতেছে। গ্রাণ্ট এলেনের লিখিত বলিয়া গল্পগুলির একটু বিশেষ মূল্য আছে। গ্রাণ্ট এলেনও কিছু দিন পূর্ব্বে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্পেন্সার সম্বন্ধে এই গল্পগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্পেন্সারের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ঐ সকল গল্প প্রকাশিত না হয়।

গ্রাণ্ট এলেন ও স্পেন্সার উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল; এবং রাজনৈতিক মতদ্বৈধ সত্বেও সে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। কেবল রাজনীতি কেন, আরও অনেক বিষয়ে এই বৃদ্ধদ্বয়ের মতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইত। স্পেন্সারের উপর গ্রাণ্ট এলেনের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মনে করিতেন, এমন উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক—এমন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনুষ্য-জগতে দুর্লভ।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি সচরাচর সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন না। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় বিরাট পুরুষ—যাঁহারা তরবারি হস্তে পৃথিবীর ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য সংসারের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা যোগী ও তপস্বীর ন্যায় নির্জ্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের সাধনা করেন, জনসাধারণ তাঁহাদের কয় জনের পরিচয় জানিতে ব্যস্ত হয়? কয় জন তাঁহাদিগকে জানিতে পারে?—গ্রাণ্ট এলেনের একটি গল্প হইতে আমরা জানিতে পারি,—মনোবিজ্ঞান রাজ্যের এই মহাযশস্বী কৃতিমান মহাপুরুষকে তাঁহার প্রতি-বেশিগণও চিনিত না।

বহুদিন হইতেই গ্রাণ্ট এলেনের সহিত স্পেন্সারের পত্রব্যবহার ছিল, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ পরিচয় ছিল না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট এলেন স্পেন্সারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে স্পেন্সার কুইন্‌স গার্ডেন্স বেসওয়াটার নামক পল্লীতে বাস করিতেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রাণ্ট এলেন যে গল্পটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি কুইন্‌স গার্ডেনে উপস্থিত হইয়া প্রতিগৃহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'এখানে হার্বার্ট স্পেন্সার থাকেন কি?' আমার প্রশ্নের কি ফল হইল, শুনিবেন? ইংরাজ দ্বাররক্ষকগণ সন্দেহাকুল-নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'স্পেন্সার! স্পেন্—সার? এ নাম ত পূর্ব্বে কখন

শুনি নাই মহাশয়! লোকটা হয় ত হোটেলে থাকিতে পারে।' আমি পুলিশ প্রহরীকে সেই প্রশ্ন করিলাম; সে বলিল, 'স্পেন্সার? না মশায়, ও নামের কোন লোক এ দিকে থাকে না, আপনি ঠিকানা ভুলিয়াছেন।'—ইহাদের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'হা পরমেশ্বর! ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে কি এমন অজ্ঞতা সম্ভব? বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই পল্লীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছেন, আর এখানকার একটি প্রাণীও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে না? কি আশ্চর্য্য!'

গ্রাণ্ট এলেন স্পেন্সারের মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় কিছু নিরাশ হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে স্পেন্সার যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার আকৃতি তদনুরূপ 'জঁাকালো' ছিল না; তাই গ্রাণ্ট এলেন লিখিয়াছেন,—এমন অনেক বড়লোক আছেন, যাঁহাদের আকার দেখিলেই প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন জর্জ্জ মেরিডিথ। কিন্তু স্পেন্সারকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে, তিনি অত বড় লোক। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি এক জন সামান্য কেরাণী। কিন্তু লোকটির সহিত ভালরকম পরিচয় হইলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত হয় না।

কুইন্‌স গার্ডেনের একটি বোর্ডিং হাউসে স্পেন্সার একাদিক্রমে বিশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বোর্ডিং হাউসে জলযোগ ও আহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তাঁহাকে দেখা যাইত না। বেস ওয়াটারে (Bays water) একটা দুধের দোকান ছিল, নীচের তলায় দুধ বিক্রয় হইত; দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, সেই কক্ষে বসিয়া তিনি দিবারাত্রি দর্শনালোচনায় রত থাকিতেন। রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে তিনি সমাধিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার জীবন যোগীর জীবন ছিল। একাগ্রচিত্তে তিনি দর্শনশাস্ত্রের যে আলোচনা করিতেন, সাধকের তপস্যার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। এই বিশ বৎসরের মধ্যে তিনি বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রীর নিকটও তাঁহার পাঠগৃহের ঠিকানা প্রকাশ করেন নাই; পাছে ভৃত্যেরা তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে ঠিকানা বলিয়া দিয়া তাঁহার নির্জ্জন চিন্তায় বিঘ্ন উৎপাদন করে; কিংবা তাঁহার ঠিকানা জানিয়াও 'জানি না' বলিতে বাধ্য হয়।

স্পেন্সার সকল বিষয়েরই সূক্ষ্ম আলোচনা করিতেন; যদি কেহ তাঁহাকে বলিত, 'আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার', তিনি উত্তর করিতেন, 'হাঁ, কাল হইতে যে পশ্চিমে বাতাস বহিতেছে, তাহা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আকাশ এমনই পরিষ্কার থাকিবে।' যদি কেহ বলিতেন, 'শ্রীমতী জোন্‌স্ বেশ সুন্দরী।'—তিনি উত্তর দিতেন, 'সুন্দরী ত হইবেনই, উঁহার পিতা ছিলেন পশ্চিমদেশীয় হাইল্যাণ্ডার, মাতা আইরিস রমণী, হাইল্যাণ্ডার পুরুষ ও আইরিস রমণীর সম্মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা দেখিতে সুশ্রী হয় বটে, কিন্তু উচ্চমনোবৃত্তি লাভ করিতে পারে না।' সকল বিষয়েই তিনি এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া কথা কহিতেন।

সেই জ্ঞানবৃদ্ধ সুপণ্ডিতের তিরোধান হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর গল্প ভক্তগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এখানে তাহারই দুই একটিমাত্র প্রকাশ করিলাম।

ডাক্তার স্যামুয়েল স্মাইল্‌স্।

হার্বার্ট স্পেন্সারের শোকস্মৃতি প্রদীপ্ত থাকিতে থাকিতেই অতীত বৎসরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে;—আমরা ডাক্তার স্যামুয়েল স্মাইল্‌সের কথা বলিতেছি।

ডাক্তার স্মাইলসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক 'সেল্‌ফ্‌ হেল্প'ও প্রথমে জনাদর লাভ করিতে পারে নাই। তিনি নিজেও জানিতেন না যে, তাঁহার 'সেল্‌ফ্‌ হেল্প' সাহিত্যজগতে সুচিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবে। কতকগুলি যুবক একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শিক্ষার্থিগণের কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করা উচিত। সেই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ তিনি এই গ্রন্থের রচনা করেন। কিন্তু এমন একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও প্রকাশক অর্থব্যয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই; তিনি ডাক্তার স্মাইল্‌স্‌কে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার এ বহি বিক্রয় হইবে না, এখন ক্রিমীয় যুদ্ধ চলিতেছে, রক্তপাতের বিবরণ ও জয়পরাজয়ের লোমহর্ষণ কাহিনী পাঠ করিবার জন্যই এখন এ দেশের পাঠকসমাজ উৎকণ্ঠিত। যুদ্ধবিষয়ক কেতাব ও সংবাদপত্র ভিন্ন সাধারণ পুস্তক এখন বিক্রয় হওয়া অসম্ভব।' কিন্তু প্রকাশকের কথা শুনিয়া ডাক্তার স্মাইল্‌স্‌ নিরুৎসাহ হইলেন না, নিজের ব্যয়ে তিনি 'সেল্‌ফ্‌' হেল্প' প্রকাশিত করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সেল্‌ফ্‌ হেল্পের আড়াই লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়া গেল। ক্রিমীয় যুদ্ধের লোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু 'সেল্‌ফ্‌ হেল্প' জীবনের যুদ্ধে জয়লাভেচ্ছু নবীন পাঠকমণ্ডলীর নিকট সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় চিরসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ প্রথমে উপেক্ষিত হইলেও এক দিন না এক দিন জনসমাজে তাহা আদরলাভ করে—ডাক্তার স্মাইল্‌সের 'সেল্‌ফ্‌ হেল্প' তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

'সেল্‌ফ্‌ হেল্পে'র পর ডাক্তার স্মাইল্‌স্‌ সেই পুস্তকের আদর্শে 'ক্যারেক্টার', 'ডিউটি', 'থ্রিফ্‌ট্‌' নাম দিয়া কয়েকখানি উপদেশমূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন। শিক্ষার্থিগণের নিকট সেই সকল পুস্তকেরও সম্যক আদর হইয়াছিল। ডাক্তার স্যামুয়েল স্মাইল্‌সের সুদীর্ঘ জীবন কেবল সাহিত্যালোচনাতেই অতিবাহিত হয় নাই। তিনি এক জন কাজের লোকও ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। চৈত্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর "সমাজ ও তাহার আদর্শ" নামক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এবার সপ্তম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিকপত্রে এরূপ সুবিস্তীর্ণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি না, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "বনপথে" তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-চিত্র,—রমণীয়; কিন্তু অসম্পূর্ণ। শ্রীযুক্ত শশধর রায় "উপনিষদ্‌-গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। এবার 'মুক্তিকোপনিষদে'র 'মর্ম্মানুবাদ' প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদ যদি যথাযথ না হয়, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াই যদি

অনুবাদক সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভাষা ও ছন্দের সৌষ্ঠবে অধিকতর অবহিত হইতে হইবে। 'যথাযথ অনুবাদে' অনুবাদকের স্বাতন্ত্র্য শৃঙ্খলিত থাকে; সুতরাং অনুবাদে অবিকৃত মূল ভাব প্রতিবিম্বিত করিয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, রচনার লাবণ্যবিধানের অবকাশ ও সম্ভাবনা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। স্বাধীন মর্ম্মানুবাদে ততটা দাসত্ব আবশ্যক হয় না,—সুতরাং অনুবাদক বাহ্য সৌন্দর্য্যেও মনোযোগী হইতে পারেন। শশধর বাবু সুকবি,—সুতরাং আশা করি, তাঁহার অনুবাদেও আমরা কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদচিহ্ন দেখিতে পাইব। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য "কুচবিহারে সাহিত্যচর্চ্চা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'প্রাচীন কালে' কুচবিহারে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা ছিল। ১৫৫৫ হইতে ১৫৮৭ পর্য্যন্ত রাজা নরনারায়ণ রাজ্য করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কুচবিহারে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'রত্নমালা' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও রাম সরস্বতী ভাগবতের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন। লেখক বলিতেছেন,—"কুচবিহার লাইব্রেরিতে এমন অনেক পুঁথি আছে, যাহা যত্নের সহিত রক্ষিত ও মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য।" লেখক আশা করেন, "কুচবিহারের মহারাজা ও রায় কালিদাস (কালিকাদাস?) দত্ত বাহাদুরের দৃষ্টি এই গ্রন্থগুলির দিকে পতিত হইবে।" যাঁহারা দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা জানেন, তাঁহারা এমন দুরাশা করিবেন না। কত প্রাচীন পুঁথি অযত্নে কীট-কবলিত ও ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার প্রতি সেরূপ অনুরাগ থাকিলে দেশের ও সাহিত্যের শ্রী অন্যরূপ হইত। স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বর্ণযুগ এখন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। মহাতাপচাঁদের বর্ত্তমান বংশধর, সাহিত্য-পরিষদের গৃহনির্ম্মাণকল্পে নগদ এক শত টাকা দান করিয়াছেন! অবশ্য সারস্বত ভিক্ষুকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া', তাহার বিচার এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। অন্নহীন দরিদ্রের রক্তসেচনে যদি পুষ্টি সম্ভবে, তবেই বাঙ্গলা সাহিত্যের এই ক্ষীণতম শীর্ণতম অঙ্কুরটি কালে মহাদ্রুমে পরিণত হইতে পারিবে। এ দুরাশা,—এই 'নিশার স্বপ্ন' কখনও সফল হইবে কি না, কে বলিবে? শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের "চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে নূতন কথা নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে এত রোমন্থন অসহ্য। "প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যে" শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন; কিন্তু রচনায় শৃঙ্খলা নাই।

ভারতী। চৈত্র। "বঙ্গমাতা" শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের একটি ক্ষুদ্র কবিতা। পুরাতন ভাবেরও নয়—কথার প্রতিধ্বনি। রচনাটি রমণী বাবুর যোগ্য নয়। কেবল,

"তা বলে' কি ভুলি' তোমা', ভুলি' আপনায়
মা বলিব বিমাতায়—অপরের মায়?"

এই দুইটি চরণ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "ভারতে য়ুরোপীয়" একটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ভারতের বন্দরে সেই প্রথম য়ুরোপীয় জাহাজ। সতীশবাবু সংক্ষেপে ভাস্কো-ডা-গামার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেব "জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড" প্রবন্ধে মাত্রাতীত 'লেক্চার' দিয়াছেন। 'লেক্চার' দিবার ও 'লেক্চার' শুনিবার একটা বয়স আছে। কল্যাণভাজন সত্যসুন্দরের এখনও 'লেক্চার' দিবার বয়স হয় নাই, মনে হইতেছে। আমরাও বোধ করি 'শুনিবার

বয়স' পায় হইয়াছি। জাপানের স্থায় সজীব জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক; সেই উচ্ছ্বাস পরিপাক করিয়া শিক্ষার ফল জীবনে পরিণত করুন,—একঘেয়ে 'লেক্‌চার'-রূপ ছিদ্রপথে তাহা বঙ্গদেশের 'নর্দ্দামা'র ঢালিয়া দিয়া ফল কি? শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস কি উদ্দেশ্যে "ভোরের স্বপন" নামক গল্পটি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। প্রাদেশিক ভাষার পার্থক্য লইয়া দন্তরুচিকৌমুদী প্রকটিত করিবার 'কাল' অন্তর্হিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু "প্রচারে" "সীতারামে"র প্রথমেই লিখিয়াছিলেন,—"এখনও এ প্রদেশে এমন অনেক স্থূলবুদ্ধি লোক আছেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গলা-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহাস করেন।" সেই "এখনও"র পর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপেন্দ্র বাবু এখনও সেই "এখনও"র জের টানিতেছেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চীনপ্রবাসীর পত্রে" বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে; কেবল চীনের প্রসঙ্গ নাই। কেদার বাবু চীনদেশে বসিয়া লিখিয়াছেন,—"এ সকল জাতির মহাসাধনার অন্যতম মূলমন্ত্র—শক্তিরূপা, তেজদৃপ্তা (ওকারলুপ্তা) জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী।" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "প্রাতিমোক্ষ" নামক বৌদ্ধশাস্ত্রীয় প্রবন্ধটি উপাদেয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত বিবরণে প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রার প্রণালী উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। রচনাটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "হরিহর বাইতি" একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। 'ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত।' বুঝিলাম, কিন্তু কাহার ধর্ম্মমঙ্গল? যখন একাধিক ধর্ম্মমঙ্গল বিদ্যমান, তখন রচয়িতার নাম দিলে ভাল হইত। ভাষা এখনও 'হামাগুড়ি' দিতেছে, কিন্তু হরিহর বাইতির চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশ বাবু সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্থান থাকিলে আমরা প্রবন্ধটির সারসংগ্রহ করিয়া দিতাম। উপসংহারে দীনেশ বাবু বলিতেছেন,—"ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লখ্যা ডুমুনী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপাখ্যান দ্বারা দৃষ্ট হয়, সত্য-রক্ষা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী এক সময়ে বঙ্গদেশে কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। * * * * ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য, নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জার অভ্যন্তর হইতে, সামাজিক যে চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহা আমাদিগের অতীত স্বাধীনতার কথা স্মৃতিপথে উজ্জীবিত করে—যে সমস্ত মহৎ গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবন সমুজ্জল হয়—এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপখ্যানের ভিতর আমরা সেই পৌরুষদৃপ্ত চরিত্রগৌরবের আভা দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও মিথ্যার প্রতি অখণ্ড ঘৃণা যখন পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুটীরেও এরূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত ছিল—তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই স্বর্গোপম ছিল।"

প্রবাসী। চৈত্র। "জাপান ও ভারতবর্ষ" একটি সাময়িক প্রবন্ধ। লেখকের অভিপ্রায়,—স্বাধীন জাগ্রত জাপান নব্য ভারতের আদর্শ হউক। "অসভ্য জাতির ধর্ম্মসংস্কার" নামক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সঙ্কলিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা "শ্রীমদ্বিজয়ানন্দ সূরী"র সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সামসুখা মহাশয় বাঙ্গালী না হইয়াও যে বাঙ্গলা লিখিতেছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "পুণা" বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেনের "পতিঘাতিনী সতী"র আখ্যানবস্তু চিত্তাকর্ষক। লিপিকৌশল ও গল্প-রচনায় হাত থাকিলে আলোচ্য আখ্যানবস্তুটি আরও উপাদেয় হইতে পারিত। "সৌন্দর্য্যের স্নান" একটি গল্প, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব,

কর্তৃক 'জর্ম্মন হইতে অনূদিত।' অনুবাদে অপপ্রয়োগের প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু ভাবাটি আশাপ্রদ। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ "শাস্ত্রবাদের বিনাশ" প্রবন্ধে 'নানা মুনির নানা মত' উদ্ধৃত করিয়াছেন। বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রতিপাদ্য এই, বেদ অভ্রান্ত বা অপরিত্যাজ্য নহে। নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ তাহা স্বীকার করিবেন না। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ "বাঙ্গলা ভাষার ইংরাজকৃত উন্নতি" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোনও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুর্গ" প্রবন্ধটি মন্দ নহে। কিন্তু "যত দিন না কৌলীন্য ও জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, ততদিন আমরা দুর্ব্বল ও কাপুরুষ নাম হইতে রক্ষা পাইব না"—ইত্যাদি অমূল্য সিদ্ধান্তগুলি অসহ্য। 'ধান ভানিতে শিবের গীত' কেন? শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "কামসূত্রে"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "সাহিত্য-সংহিতা"য় বিস্তৃতভাবে কামসূত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। আবার বিজয় বাবু সেই পথের পথিক হইতেছেন।—আলোচ্য প্রবন্ধে নূতন কথা দেখিলাম না। আশা করি, বিজয় বাবুর ভাবী প্রবন্ধে নূতন তথ্য ও সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইব।

বিবিধ।

"আর্য্য-দর্শন"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অসুস্থ ও প্রায় শয্যাগত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র নিরাময় হউন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

"দেরাদুন, মসূরী ও হরিদ্বার" নামক এক-খানি সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে। লেখকের অনিচ্ছাবশতঃ আমরা তাঁহার নাম প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। গ্রন্থখানি কেবল ভাবুকের উচ্ছ্বাসে ও প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ নহে। লেখক বহুযত্নে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে অনেক জ্ঞাতব্য কথার সমাবেশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি মাসিকপত্রে "রামায়ণ" সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় প্রবন্ধ একত্র সঙ্কলিত ও "রামায়ণী কথা" নামে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "রামায়ণী কথার" একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আপা-ততঃ দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, কৌশল্যা, সীতা ও হনুমানের চরিত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দীনেশ বাবু মধ্যে মধ্যে গল্প লিখিয়া থাকেন, সাহিত্য-সমাজে তাহা অবিদিত নাই। এবার তিনি কল্পনার কুঞ্জে আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন। দীনেশ বাবুর রচিত "তিন বন্ধু" নামক একখানি উপন্যাস মুদ্রিত হইতেছে। দীনেশ বাবুর "রামা-য়ণী" ও "তিন বন্ধু"—দুইখানি গ্রন্থই শীঘ্র প্রকা-শিত হইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র "ভারতী" "সাহিত্য" প্রভৃতি মাসিকপত্রে ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-ছিলেন। তাহার পর এতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য

মিত্র মহাশয়ের সারগর্ভ রচনায় বঞ্চিত ছিল। আনন্দের বিষয় এই, দশ বৎসর পরে তিনি আবার আমাদের সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গত মাঘের "প্রবাসী"তে সিদ্ধমোহন বাবুর "তিব্বতে হিন্দু পরিব্রাজক" ও ফাল্গুনের "সাহিত্যে" "সে কালের অকাল" প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, এবার সিদ্ধমোহন বাবুর অবলম্বিত ব্রত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সিদ্ধমোহন বাবু বহুকাল হায়দ্রাবাদে বাস করিতেছেন। তিনি নিজাম হাইকোর্টের একমাত্র বাঙ্গালী উকীল। হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশিত "ডেকান্ পোষ্ট" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সত্বাধিকারী। হায়দ্রাবাদের মুসলমান সমাজে মিত্র মহাশয় যেরূপ সমাদৃত, দাক্ষিণাত্যে "ডেকান পোষ্টে"র প্রতিপত্তি তদপেক্ষা অল্প নহে। মিত্র মহাশয় আরবী ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞ; বহুদিন ইসলাম্ সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছেন। ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য হইয়াছেন।

আরবী ও পারসী শব্দ বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রণালী বা পদ্ধতি নাই। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবে আরবী ও পারসী শব্দের 'বানান' লিখিয়া থাকেন। ঔরঙ্গজীব, ঔরংজেব, আরঙ্গজেব, অরংজেব,—কোনটি ঠিক? তাঁহার পিতার নাম অকবর না আকবর? বাঙ্গালায় transliterationএর কোনও নিয়ম নাই, এই জন্য লেখকগণের যথেচ্ছাচারে আরবী ও পারসী শব্দগুলির বাঙ্গলা ভাষায় দুর্দ্দশার সীমা নাই। "সাহিত্য-পরিষদ" এ বিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়। পরিষদ যদি সিদ্ধমোহন বাবুকে আরবী ও পারসী শব্দ বর্ণান্তরিত করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং সিদ্ধমোহন বাবু পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার একটি প্রকৃত অভাব বিদূরিত হইতে পারে। সিদ্ধমোহন বাবু আরবী, পারসী, ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। নিজামের রাজ্যে মুসলমান সমাজ ও মৌলবীসম্প্রদায়ের সাহচর্য্যে বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সফল হইবেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করিতেছেন। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত "ঐতিহাসিক চিত্র" বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। "চিত্রে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিখিল বাবুকে "ঐতিহাসিক চিত্র" নামটি ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে নিখিল বাবুর ঐতিহাসিক চিত্রের একটু প্রভেদ আছে। নিখিল বাবুর চিত্র প্রধানতঃ আমাদের ছাত্রসমাজে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য উদ্দিষ্ট। "প্রচারে"র সূচনায় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন, "জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে।" আজ সেই কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ "চড়ার ঠেকিয়া" অক্ষয় বাবুর ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজ বানচাল হইয়া গিয়াছে।—বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলি,—নিখিল বাবুর নূতন ঐতিহাসিক চিত্র "ডিঙ্গী এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, পুরাতন জাহাজের মালীম অক্ষয় বাবু ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের সাহায্যে নিখিল বাবুর এই সাধু সংকল্প সফল হউক।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

২২ শে শ্রাবণ। শ্রীমতী কামিনী সেনের "আলো ও ছায়া"র আলোচনা করিতেছিলাম। সেন-কন্যাকে বর্ত্তমান বাঙ্গালার মহিলা-কবিকুলের উপর নিঃসংশয়ে প্রাধান্য দিতে পারা যায়। কিন্তু কোনও কোনও সমালোচক তাঁহাকে যে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছেন, আমি কিছুতেই সে অপকর্ম্মের সমর্থন করিতে পারি না। "পঙ্কজ", "ভালবাসার ইতিহাস", "চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ", "যৌবন-তপস্যা" প্রভৃতি কবিতা যে এক জন প্রতিভান্বিত কবির পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, সর্ব্বস্থলে ভাষার ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য যে দেখিতে পাই না, সে ক্রটি, কবির স্বভাবকোমল জাতিত্বের কথা ভাবিয়া, উপেক্ষা করাই উচিত। তিনি যে এই অধম বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এতটাও করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরীর কথা। গ্রন্থকর্ত্রীকে সার্টিফিকেট দিতে গিয়া কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার "সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণের" প্রশংসা করিয়াছেন। *কিন্তু আমার বোধ হয়, গ্রন্থমধ্যে এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় গুণের একটু অভাব আছে।* আর একটা কথা ;—হেম বাবু বর্ত্তমান কবিকে ডিপ্লোমা দিবার কালে মহাকবি মাইকেলের নামোল্লেখ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। ইহা শুধু অন্যায় নহে, অদূরদর্শিতাও বটে। কারণ, ইহাতে শ্রীমতী *কামিনী সেনের বিশেষ ক্ষতি হই-য়াছে।* কেহ কেহ কামিনী-কবির অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত আখ্যান-কবিতা দুইটির অতিরিক্ত প্রশংসা করেন। কেহ বা এইখানেই নবীন কবির প্রবীণতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহাদের ছন্দের গঠন কতকটা অপরিপক্ক ; কারণ, অমিত্রাক্ষরের যে স্বাধীন, স্বাভাবিক স্রোতোগতি, উহাতে তাহার সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

২৩ শে শ্রাবণ। এমিয়েল তাঁহার জর্ণালের এক স্থলে বলিতেছেন,— "To hunt down consideration and reputation, to force the esteem of others,—seemed to me an effort unworthy of myself, almost a degradation. I have never thought of it." কাঙ্গালীর মত যশের আশায় দ্বারে দ্বারে বিচরণ করা, প্রকৃতির প্রিয় সন্তান কবির পক্ষে নিতান্ত

লজ্জা ও হীনতার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহা লিখিতেছি, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে সযত্নপরিপোষিত যে চিন্তারত্নগুলি সাধারণের সমক্ষে বাহির করিয়া দিতেছি, তাহা যদি কাহারও স্নেহ বা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম না হয়, তাহার মত দুর্দ্দশাও ত আর কিছু নাই। আমার প্রাণের প্রিয়তর কথাগুলিকে কেহ যদি সাগ্রহে হৃদয়ে তুলিয়া না লইল, তবে এই দুশ্চর সাহিত্য-ব্রতের প্রয়োজন কি? আমার জীবনের সারভূত শক্তি সঞ্চারিত করিয়া যদি কাহারও নির্জীব হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিতে না পারিলাম, তবে আমার জীবনেই বা কাজ কি? আমি যাহার প্রশংসা করি, পূজা করি, তাহাই হইতে চাই। আপনার জীবনকে সেই উচ্চ মহত্ত্বে উত্তোলিত করিতে চাই। আর, আমি যে আদর্শ পাঠক সাধারণের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি, আশা করি, তাহারাও স্বীয় স্বীয় জীবনকে তদনুসারে নিয়মিত করিবে। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার উদয় না হইলে উহা অসম্ভব। সুতরাং যাহাতে পাঠকেরা কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার আদর্শ-প্রতিমাকে পূজা করিতে শিখে, সে পক্ষে যত্ন করা সকল সাহিত্যসেবীরই কর্ত্তব্য। ইহা হীনতা বা দীনতা নহে। ইহা মহত্ত্বেরই অঙ্গ-স্বরূপ।

২৪ শে শ্রাবণ। আমার কাব্য-চর্চ্চার বয়ঃক্রম বড় বেশী নহে। বাল্য-কালে প্রচলিত সঙ্গীত সকলের সুরের অনুকরণ করিয়া কখনও কখনও গীতিরচনা করিতাম বটে, কিন্তু উহার কারণ নিজের মনের মতন গান গাহিবার অভিলাষ, প্রকৃত কাব্যানুরাগ নহে। একখানা গানের খাতা ছিল; উহার ভিতর অপরাপর সঙ্গীতের সহিত নিজের রচনাগুলিও লিখিয়া রাখিতাম। তখনকার রুচিটা বড় বিশুদ্ধ ছিল না। একটু বর্দ্ধিত বয়সে একদিন সেই যত্নরক্ষিত খাতাখানার আলো-চনা করিতেছিলাম। গানগুলির ধরণ দেখিয়া নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। একে একে সমগ্র পত্রগুলি ছিঁড়িয়া অগ্নিদেবকে উপহার দিলাম। তা'র পর কয়েক বর্ষ নীরবে কাটিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি শুভক্ষণেই ফার্ষ্টআর্টস্ পরীক্ষায় কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Excursion কাব্যের প্রথম সর্গ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! আমার প্রাণের সেই পুরাতন অনাদৃত উৎস নব ভাবে নব গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে আজ ১০।১১ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে কত ঝড় এই মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কত সময়ে এই প্রয়োজনশূন্য জীবনের বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু কবিতা আমাকে একবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে বিষাদের জলদরাশি অপসারিত করিয়া তাহার প্রশান্ত সান্ত্বনাময়

সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি হৃদয়-গুহায় প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছে। আমি তাহারই স্বর্গীয় আশ্বাসে এই দুর্ভর জীবনকে এত দূর টানিয়া আনিতে পারিয়াছি।

২৫ শে শ্রাবণ। বঙ্গীয় কবি হেমচন্দ্রের রচনা ও মহাকবি মাইকেলের কাব্যগুলি পাঠ করিয়াই আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল। বোধ হয়, সর্ব্বাগ্রে "মেঘনাদবধ" পাঠ করি। অপরিণতবুদ্ধি বালক তখন মাইকেলের মহত্ত্বে কেবল অভিভূত হইয়া পড়িত; প্রাণের ভিতর ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত না। তৎপরে "বীণা" নামক পত্রিকায় "সারদামঙ্গলে"র সমালোচনা পাঠ করিয়া উহার প্রতি আমার অনুরাগ আকৃষ্ট হইলে, একখণ্ড ক্রয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করি। ইহাই আমার বাঙ্গালা কাব্যপুস্তক-ক্রয়ের সূচনা। এখন স্মরণ হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ রায়ের "অবসরসরোজিনী" এক বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাঠ করিয়াছিলাম। তখন রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতা বড়ই মধুর লাগিত। মনে হয়, তাঁহার "শারদীয় জলদ" শীর্ষক "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত একটা কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, উহা নিজহস্তে একখানা কাগজে লিখিয়া লইয়া, তখনকার দুই এক জন বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম। তাঁহারা কাব্যরসের তেমন অনুরাগী ছিলেন না। তাঁহাদের বিরক্তি দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইত। "সারদামঙ্গল" পাঠ করিয়া রাজকৃষ্ণের প্রতি সেই অনুরাগ কোথায় ভাসিয়া গেল। মধুকর পুষ্পবিহীন দেশে আসিয়া পড়িলে অতিকষ্টে মৃত্তিকা হইতেও মধুসঞ্চয় করে। কারণ, মধু নহিলে তাহার দিন চলে না। কিন্তু বিবিধ কুসুমগন্ধে সুবাসিত চিরবসন্তময় কোন উদ্যানের সন্ধান পাইলে তাহার যে আনন্দ, যে অসীম উচ্ছ্বাস, তাহা কে বর্ণনা করিবে? ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদয় হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাঁহার কোনও খবর পাই নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। প্রথম প্রথম সর্ব্বস্থলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। তথাপি সেই উদীয়মান রবির অপূর্ব্ব আলোকে আমার হৃদয়াকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রসম্প্রদায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

২৬ শে শ্রাবণ। পুরাতনের জীর্ণকুটীর হইতে হঠাৎ নূতনের বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য্য-গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথকেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান কবিকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে মোহ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আমার প্রথমপ্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থে রবীন্দ্রের পদ্ধতি অনেকটা লক্ষিত হইবে। তবুও তখন তাঁহার এক আধটা কবিতামাত্র পাঠ করিয়াছিলাম। নূতন পদ্ধতির শিক্ষা আমি বঙ্গীয় কবি বিহারীলাল ও প্রধানতঃ ইংরাজী Romantic কবিদিগের নিকট প্রাপ্ত হই। Wordsworth, Shelley, Keats এবং Coleridge আমার সাহিত্য-

জীবনের আদিগুরু। মহাকবি সেক্ষপীয়র সকল প্রথারই সমাদর করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে সকল স্থলে Romantic পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার সেইগুলিই বেশী ভাল লাগিত। এখন আর পুরাতনের উপর নূতনকে ততটা প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নহি। সাধারণ মানবের অগোচর কবিহৃদয়ের গূঢ়তম ভাবরাশি, রহস্যময়ী প্রকৃতির গভীরতম কাহিনী প্রকাশ করিতে হইলে নূতন প্রথাই যে অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের তাদৃশ আয়ত্তাধীন নহে। অথচ সাধারণের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে কোনও কাব্যেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই এখন আমি উভয় প্রথার সম্মিলনের পক্ষপাতী। ভাব বা চিন্তা যতই রহস্যময় হউক না কেন, ভাষায় প্রকাশ করিবার কালে তাহাকে যত দূর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করিতে পারি, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

২৭ শে শ্রাবণ। * * * ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয় এই প্রকার নিমন্ত্রণে যৎকিঞ্চিৎ উপহার বা উপঢৌকনপ্রদান রূপ যে সামাজিক পদ্ধতি আছে, তাহার উচ্ছেদসাধনার্থ একখানা দস্তখতের খাতা খুলিয়াছেন। আমি অনুরুদ্ধ হইয়াও নামটা সহি করিতে পারিলাম না। হঠাৎ এরূপ বিষয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলা ভাল নহে। সম্প্রতি এই ত ম—নাথের সহোদরার বিবাহোপলক্ষে যৎসামান্য কিছু না দিয়া মনের তৃপ্তি হইল না। ভবিষ্যতের কথাও ভাবিতে হয়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এইরূপ ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট উপঢৌকন পাইবার আশা করেন, এবং না পাইলে অভিমানও করিয়া থাকেন। সামর্থ্য থাকিলে তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তা' ছাড়া, যাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমার গৃহে কোনও দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করাও ত নিতান্ত অভদ্রতার কাজ। সুতরাং আদান প্রদান বন্ধ করিবার বিষয়টা, যাঁহারা সহি করিতেছেন, কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে নিবদ্ধ হইলে ভাল হয়। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা দিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই; আর যাঁহারা সামর্থ্যহীন, তাঁহাদের বাধ্য হইয়া দেওয়া ভাল নহে; এবং তাঁহাদিগকে বাধ্য করাও ভাল নহে।

২৮ শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী" দেখিলাম। ইহাতেও সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়াস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু সকল স্থলে সংশোধনগুলি সমীচীন নহে। বর্ত্তমান সংস্করণে সঙ্গীত ও গদ্যাংশগুলি প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা মন্দ নহে। গ্রন্থের গদ্যাংশে কোনও

পরিবর্ত্তনই সংসাধিত হয় নাই। অমিত্রাক্ষরের উন্নতিসাধন করিতে গিয়া কবি অনেক স্থলেই খারাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। "এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথসাগরে" এই ছত্রের পরিবর্ত্তে "এ নিস্তব্ধ অন্তরের অনন্ত নিশীথে" এই কটমট লাইনটি দেখিয়া আমি উন্নতির স্থলে অধোগতিই অনুভব করিলাম। রবিবাবু আপন রচনা সম্বন্ধে আগে যেরূপ অন্ধ ছিলেন, এখন দেখিতেছি, তিনি ততোধিক মমতাবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কাটিয়া, ছাঁটিয়া, উড়াইয়া, গুঁড়াইয়া তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এত দূর নির্ম্মম হইয়াও তিনি যে সর্ব্বত্র সুবুদ্ধি ও সুবিচারশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহার নাটকীয় পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথচ, কয়েকটি ভাল লাইন মাঝখান হইতে মারা গেল। পাঠকেরা কত দূর সন্তুষ্ট হইবেন, বলিতে পারি না। আমি ত তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। পূর্ণ বিরামের স্থলে গুরু অক্ষর (যুক্তাক্ষর) ব্যবহার বিষয়ে আমি যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহার সুফল ফলিতে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। "রাজার সতর্ক দৃষ্টি পড়ুক্ সর্ব্বত্র" ইহার স্থলে "রাজার নিয়ত দৃষ্টি সর্ব্বত্র পড়ুক" তবু সহা যায়। কিন্তু এত করিয়াও রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ভাষাকে নির্দ্দোষ করিতে পারিলেন না।

২৯ শে শ্রাবণ। বিচিত্র চিত্রগুলি বাদ দিয়া রবীন্দ্রের "চিত্রাঙ্গদা"র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। "বিদায়-অভিশাপ" নামক সুন্দর কবিতাটিও ইহার সহিত সংযুক্ত দেখিলাম। চিত্রাঙ্গদায় রবীন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অনেকাংশে নির্দ্দোষ। ইহার স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বিষয়টিও বেশ চিত্তাকর্ষক। মহাভারতের মহাকবির অমর চরিত্র দুইটিকে কোনও অংশে হীন না করিয়া, কবি ইহাদের উপর আপনার কবিত্ব ও গুণপণার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম যখন গ্রন্থখানি পাঠ করি, মনে হইয়াছিল, ইহার বুঝি কোনও প্রকার গূঢ় উদ্দেশ্য নাই ;—কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ। কিন্তু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া আমার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। কবি ইহাতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের একটি ইতিহাস বর্ণিত করিয়াছেন। প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল, ইহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন বেশী দিন শান্তিলাভ করিতে পারে না। আর সে শোভা স্থায়ীও নহে। প্রেমিক স্বীয় বাঞ্ছিতের শারীরিক সৌন্দর্য্যোপভোগে অতি অল্প দিবসেই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মহীন

বিলাসলীলা প্রেমের আদর্শ নহে; কর্ত্তব্যপালনের পথে আমরা সাহচর্য্যই ইহার চরম উদ্দেশ্য। ইহাই প্রেমের বিষম পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দম্পতী তাঁহাদের মিলন বজায় রাখিতে পারিলেন, তাঁহারাই ধন্য। কারণ, "শ্রান্তিহীন সে মিলন চিরদিবসের।" এইরূপে প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের মোহ, যৌবনের ভ্রান্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপরে "ভূষণ-বিহীন" সত্যের অভ্যুদয়, ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস। যে কবি এই মহান্ ইতিহাস এমন সুন্দর ও মধুর করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনি সহস্র সাধুবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

"ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ,
তখন প্রকাশ পায় ফল।"—

এই একটিমাত্র বাক্যে সমগ্র গ্রন্থের উপদেশ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

৩০শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরীর" আলোচনা করিতেছি। ইহাতে কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে। "বসুন্ধরা" শীর্ষক কবিতায় কবির ভাবের বিশালতায় পাঠকের হৃদয় উদার ও প্রসারিত হইয়া উঠে। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া না পড়িলে এই কবিতাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। দীর্ঘতা-দোষ সত্ত্বেও ইহাই "সোনার তরীর" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। "সমুদ্রের প্রতি" আর একটি চমৎকার কবিতা। ইহা বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যে বায়রণের সমুদ্র-সম্বোধনের সহিত তুলনীয়। কিন্তু, কল্পনার নূতনত্বে এবং আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্বে ইহা বায়রণের রচনাকেও পরাজিত করিয়াছে। ইহার ভাষার গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রগর্জ্জনেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যে কবি মহত্ত্ব ও উদারতার এরূপ সমুচ্চ শিখরে আপনাকে উত্তোলিত করিতে পারেন, তিনি যে অনেক সময়ে অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ভাবের বর্ণনে তাঁহার মূল্যবান সময় ও প্রতিভার অপব্যবহার করেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে দুই একটি দুর্ব্বোধ কবিতা দেখিলাম। "ঝুলন," "অনাদৃত" প্রভৃতি কবিতার উদ্দেশ্য কি, তাহা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "প্রতীক্ষা" নামক কবিতায় কবি দেশ-কালের অতীত, সৃষ্টির পরপ্রান্তস্থিত সেই মহা-অন্ধকার রাজ্যের কি সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন! তাঁহার কল্পনার অনুগমন করিতে করিতে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই; এই মর্ত্ত্য-কারাগারের সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনাদিগকে যেন অন্তহীন মহাশূন্যে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই; মানব-জন্মের এই সমুচ্চ অধিকার স্মরণ করিয়া দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত সংসার-সংগ্রামে অগ্রসর হই। ইহা অপেক্ষা কবিতার সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

৩১শে শ্রাবণ। আজ জীবনটা নিতান্ত শৃঙ্খলময় ও গ্রন্থিহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। চার ধারে, অন্তরে ও বাহিরে, এই কঠোর নিয়ম ও সংযমের শাসন নিতান্ত কষ্টকর অনুভূত হইতেছে। দেখিতেছি, কত শত লোক আত্মবিস্মৃতির অভিলাষে সমস্ত শাসন অতিক্রম করিয়া আপনাদিগকে প্রমোদ-প্রফুল্ল প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে। পরিণাম যাহাই হউক, বর্ত্তমানটা ত তাহাদের এক-প্রকার স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতেছে। আর পরিণামের ভাবনারই বা প্রয়োজন কি? মৃত্যু ভিন্ন গতি ত কাহারই নাই। তবে বৃথা কেন সেই অনিশ্চিত ও অদৃষ্ট আদর্শের মুখ চাহিয়া নিশিদিন কেবল রোদন ও দীর্ঘশ্বাসে, পিপাসা-শুষ্ককণ্ঠে, ক্ষুধাতুরহৃদয়ে, নিরন্তর নিরানন্দে অতিবাহিত করি? আদর্শের চিন্তায় প্রাণের উদারতা সাধিত হইতে পারে; কিন্তু এই দারুণ বুভুক্ষা-নিবারণের উপায় কি? তাই ভাবি, শ্রাবণের এই বিষম বৃষ্টিধারাবিতাড়িত ঝটিকার ন্যায়, স্বাধীনহৃদয়ে, উদ্দাম উল্লাসে, আমিও কেন এই সংসার-সমুদ্রের উপর দিয়া বাহিয়া যাই না? আজ তোথায় তুমি, হে পুণ্য পবিত্রতার আকর, অনাদি আদর্শ পুরুষ! এই নিষ্ঠুর সংশয়-বৃশ্চিকের দংশন হইতে আমায় রক্ষা কর। যাহার জীবন পার্থিব বাসনার অতীত হইয়া পড়িয়াছে, সে কি তোমার চরণে আপনাকে নিরত করিয়া রাখিতে পারিবে না? যাহার প্রেমের গৃহ তুমি স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, সে কি তোমার মুখ চাহিয়া নূতনতর গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না? আজ একবার এই বর্ষাকাশের ভীষণ মেঘমন্দ্র নিমজ্জিত করিয়া তোমার অক্ষয় অভয়বাণী প্রতিধ্বনিত কর। এই মৃত্যুময় বিদ্যুৎ-বিভীষিকা পরাজিত করিয়া তোমার সেই জীবনদায়িনী পবিত্র মুখজ্যোতি বিভাসিত কর। আমার ধ্বংসোন্মুখ জীবনে শান্তি স্থাপিত হউক।

১লা ভাদ্র। আজ পূর্ণিমা; কিন্তু জ্যোৎস্নার দর্শন নাই। বর্ষার অন্ধকারে চাঁদের শোভা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনের অবস্থাও কি ঠিক এইরূপ নহে? এই দেবদুর্লভ যৌবন-কুঞ্জে বসিয়া আমি কেবল একটা বিষাদ-স্মৃতির অর্চ্চনা করিতেছি। আশার দিগন্তবিহারী মলয়-সমীর, প্রেমের সুস্নিগ্ধ অন্তহীন কিরণজাল, উৎসাহের উন্মাদকর পুষ্পসৌরভ,—সকলই যেন কোথায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর অপর পার্শ্ব হইতে গোধূলির অস্ফুট আরতি-ধ্বনি কোন দেবমন্দির ভেদ করিয়া কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আমারও প্রাণের ভিতর, হৃদয়ের অতি নির্জ্জন প্রদেশে, এইরূপ একটা অস্পষ্ট মঙ্গলধ্বনি মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হয়। অন্তর-রাজ্য আকুল হইয়া উঠে। হায়!

কে আমাকে বলিয়া দিবে, এ কিসের সঙ্গীত, কোথা হইতে আসিয়া এই দীন সংসার-পথিকের প্রাণে প্রবেশ করিতেছে। এ কি সেই বিশ্বদেবতার চিরোচ্চারিত আহ্বান-রব? ঐ কি সেই নিখিল-জগতের নিরন্তরোত্থিত রহস্য-সঙ্গীতের প্রতি-ধ্বনি? এই সঙ্গীত, এই গভীর কলতান কি একবার ভাল করিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না? আমরা হতভাগ্য সুকৃতিশূন্য মানব, এই মর্ত্ত্যধামে কেবল ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি। এই নিত্যদুঃখময় জীবনের মুহূর্ত্তমাত্র সেই মঙ্গল-গীতি শ্রবণ করিয়া জীবন কি সার্থক করিতে পাইব না? হায়! দুরাকাঙ্ক! হায় মূঢ়! সংসারের মৃত্তিকার ভারে তোর শ্রবণযুগল যে নিতান্ত বধির হইয়া গিয়াছে! তোর অনু-ভবের সে শক্তিই যে লোপ পাইয়াছে!

২রা ভাদ্র। "বর্ষার বোধন" আরম্ভ করিয়াছি। কয়েকটি লাইন এইখানে লিখিয়া রাখিলাম।—

বিষম বরষা আজি; সান্দ্র অন্ধকার
ঘন মৃত্যুছায়ারূপে এসেছে ঘেরিয়া;
ঝর ঝর ঝরে ধারা, বৃষ্টি অনিবার;
অশনি সাপিনী সব উঠিছে শ্বসিয়া;
গর্জ্জিছে জীমূত-মন্দ্র কম্পিত গগনে;—
আমি পান্থ সঙ্গিহীন সংসার গহনে।

ছিল একদিন, নাট্যশালা সম যবে
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে, উল্লাস-লালসে
উথলিত এ আলয়; আনন্দ-উৎসবে
কাটিত চঞ্চলকাল;—নিদ্রার পরশে
সুদীর্ঘ-প্রহর নিশি নিমেষের প্রায়;—
ছিল সেই একদিন, আজি নহে, হায়!

ছিল প্রেমসাথী এক; সন্ধ্যায় প্রভাতে
নিশ্বাস-মলয়ে যার উঠিত শিহরি'
ভাবরাশি, শর্ব্বরীর স্নেহবারি-পাতে
শুভ্রকান্তি শতদল সম; প্রাণ ভরি'
সে পুণ্যসৌরভ-সুধা মধু করি' পান
সংশয়, বিবাদ, ব্যথা হ'ত অবসান।

ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি।

ইংরেজদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সত্য অনেক সময়ে উপকথার অপেক্ষাও অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ হইয়া থাকে। অদৃষ্ট সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত খেলা খেলে, মানুষকে এমন অভাবনীয় অবস্থায় লইয়া যায়, যে তাহাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। যদি কোন দুর্ভাগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসকার ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘটনাবলীর সহিত কোন বাঙ্গালীর চরিত্র বিজড়িত করেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্ধুবর্গ, অন্ততঃ সমালোচকবর্গ, খুব সম্ভব তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থা পরীক্ষা করাইবার

জন্য চিকিৎসক ডাকাইবার ব্যবস্থা করিবেন। উপন্যাসেও যাহা অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা, প্রকৃতই তাহা একদিন ঘটিয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত এক জন বাঙ্গালীর জীবন বিজড়িত ছিল।

ফ্রান্সের নৃপতি পঞ্চদশ লুইর শেষ উপপত্নী মাদাম ডুবারীর কলঙ্কিত নাম জগদ্বিখ্যাত। বিলাসমগ্ন, রূপমুগ্ধ লুই ছয় বৎসর কাল ফ্রান্সের ঐশ্বর্য্যবৈভব অকাতরে এই বিলাসিনীর চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার যখনই যে সাধ; যে সখ, যে খেয়াল হইয়াছে, যতই অসঙ্গত; যতই ব্যয়সাধ্য হউক, তাহা পূর্ণ হইতে অণুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। তাহার কর্ম্মহীন জীবনের দীর্ঘ দিন কাটাইবার অসংখ্য উপকরণের মধ্যে জীবজন্তুও স্থান পাইয়াছিল—পাখী ছিল, কুকুর ছিল, বানর ছিল, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম একটি অল্পবয়স্ক ক্রীতদাস ছিল। তখনকার সাময়িক পত্রাদিতে ও সাহিত্যে এই বালক ক্রীতদাস, নামে 'জামর' এবং জাতিতে নিগ্রো বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাশী উপন্যাসলেখক আলেকজন্দর ডুমা তাঁহার একখানি বিখ্যাত উপন্যাসে ইহাকে স্থানদান করিয়া চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। মিষ্টার ক্রীন ইহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত নামও জামর নহে, জাতিও নিগ্রো নহে।

ভারতের সহিত বাণিজ্যকারী একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজের অধ্যক্ষ বঙ্গদেশ হইতে একটি বালককে ক্রয় করিয়া বা জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহাকে ফ্রান্সের রাজধানী পারীসে লইয়া গিয়া মাদাম ডুবারীর নিকট বিক্রয় করে। কৌতুক করিয়া তাহার ডাক-নাম রাখা হইয়াছিল জামর, এবং এই নামেই সে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রকৃত নামকরণ হইয়াছিল, লুই বেনেডিক্ট। ক্রীতদাস বলিয়া তাহার শিক্ষাবিধানের কোনও ত্রুটি হয় নাই। বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে সুশিক্ষিত করা হইয়াছিল, এবং সে নিজেও সাহিত্যানুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকীয় প্রভাবের মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও সে রুশোর একান্ত ভক্ত ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবের যাহা মূলমন্ত্র—সাম্য ও স্বাধীনতা—তাহা তাহারও বীজমন্ত্র ছিল। সেই জন্য সে তাহার পরমহিতৈষিণী প্রতিপালিকা মাদাম্ ডুবারীর নিকট অজস্র স্নেহ, প্রভূত অনুগ্রহ ও উপকার, এবং অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াও হৃদয়মধ্যে তাঁহার প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। ডুবারীর কৃপায় ও রাজানুগ্রহে তাহার আশাতীত পদোন্নতি হইয়াছিল—ডুবারীর ভৃত্য থাকিয়াও সে লুসিয়েন নামক রাজকীয় প্রাসাদ ও সম্পত্তির অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই পদ অভিজাতদিগের প্রাপ্য ছিল। ইহাতে, কি অভিজাতবর্গ, কি সহযোগী ভৃত্যবর্গ, অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ও বিরূপ হইয়াছিল। এই বিরাগে জামরের সাংসারিক ক্ষতি অবশ্যই ছিল না; কেন না, স্বয়ং রাজা তাহার সহায়, রাজার উপর যে রাজা, সেই সর্ব্বময়ী তাহার সহায়; কিন্তু ইহা সময়ে অসময়ে, অনেক সময়েই, কঠোর শ্লেষ ও মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিব্যক্ত হইত। তাহাতে জামরকে অনেক মর্ম্মবেদনা সহিতে হইত। এই সকল কারণে, রাজতন্ত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু, তাহারই প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্বেষ ও ক্রোধ তাহার চিত্তমধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল। কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এই অপমানিত, মর্ম্মাহত, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাস উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া রহিল। মন্দভাগিনী মাদাম্ দুবারী বুঝিতে পারিল না যে, নিজের চিতা নিজে সাজান হইতেছে—দুগ্ধদানে সর্পপোষণ হইতেছে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুইর মৃত্যু হইল। সচ্চরিত্র সাধুপ্রকৃতি ষোড়শ লুই গণিকাকে সিংহাসনসান্নিধ্যে থাকিতে দিতে পারিলেন না। দুবারীকে প্রথমে রাজসংস্রব হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইল; কিন্তু পরে আবার তাঁহাকে লুসিয়েনের প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সময়েও জামর পূর্ব্বের ন্যায় অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যভাবে তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এবং যাঁহার কৃপায় তাহার সর্ব্বস্ব, সেই স্নেহময়ী, ভৃত্যবৎসলা, বিশেষতঃ তাহার প্রতি অসীমবিশ্বাসশালিনী, কর্ত্রীর সর্ব্বনাশের জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রবিপ্লবের কালানল ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জামর দেখিল যে, তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবকারীদিগের মধ্যে যাহারা অতিমাত্র ভীষণ, নির্দ্দয়, পিশাচবৎ নৃশংস, হিংস্রজন্তুর ন্যায় শোণিতপিপাসু, এইরূপ এক মানব-রাক্ষসের দলে দুরাত্মা জামর যোগ দিয়া, অভিজাতবর্গের কার্য্যকলাপের উপর খর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভারসাইল নগরে বিপ্লবসংশ্লিষ্ট যে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সেক্রেটরি নিযুক্ত হইল। গ্রাভ্ নামে ইহার এক জন সহযোগী ছিল। এই ব্যক্তি বংশপরিচয়ে ইংরেজ। ফরাশী বিপ্লবের নর-রাক্ষসদিগের মধ্যে গ্রীভ্ এক জন প্রধান ছিল। জামর তাহার আশ্রয়দায়িনী প্রতিপালনকারিণী দুবারীর কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই গ্রীভের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল; এবং দুবারী জামরকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার কোন কার্য্যই তাহার অবিদিত ছিল না।

গ্রীভের আনীত অভিযোগমূলে ডুবারী ধৃত হইলেন; কিন্তু তাঁহার হীনাবস্থ প্রতিবাসীরা তাঁহার কৃত শত উপকার স্মরণ করিয়া অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। তাঁহার নির্দ্দয় শত্রুগণ কবলিত শিকারে বঞ্চিত হইয়া অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। গ্রীভ্ একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিল; তাহা মাদাম্ ডুবারীর বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগে ও দুষ্ক্রিয়ার আরোপে পূর্ণ। ডুবারী এই ব্যাপারে জামরের হস্ত পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। জামর এখন প্রকাশ্যে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। শোণিতপিপাসু গ্রীভের অবিরাম উত্তেজনায় ও নিষ্ঠুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভার্সাইলের বিপ্লব-সমিতি শেষে মাদাম্ ডুবারীকে ধৃত করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির করিলেন। গ্রীভ্ স্বয়ং গিয়া হতভাগিনীকে টানিয়া আনিয়া পারীসের সাঁপেলাজি নামক কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

এই কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, অভাগিনী যখন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রমাদ গণিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে বধ-যন্ত্রের বিভীষিকা দেখিতেছিল, সেই সময়ে নর-রাক্ষস গ্রীভ্ তাঁহার বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযোগ দাখিল করিল। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, মাদাম্ ডুবারী যে পুনঃপুনঃ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে; ইংলণ্ডপ্রবাসী ফরাশী অভিজাতদিগকে তিনি বিপুল অর্থসাহায্য করিয়াছেন; বিপ্লবের লক্ষ্য ব্যর্থ করিবার জন্য প্রতি-বিপ্লব ঘটাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। অভিযোগসমর্থনার্থ সাক্ষীদিগের যে দীর্ঘ তালিকা দাখিল করা হইয়াছিল, তাহাতে পাপিষ্ঠ জামর এক জন প্রধান সাক্ষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, জামরের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে যে, মাদাম্ ডুবারীর গৃহ অভিজাতদিগের একটা প্রধান আড্ডা; এরূপ দুষ্কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার জন্য জামর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। জামরের পরিচয় এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল;—"জামর এক জন ভারতবর্ষের লোক। তাহার শৈশবকালে, যখন তাহার বয়স চারি বৎসর সেই সময়ে, ডুবারীর রূপমোহমুগ্ধ আত্মবিক্রীত দাস পঞ্চদশ লুইর অনুচরেরা বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লী হইতে তাহাকে তাহার পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আসে, এবং লুই তাহাকে সামান্য কুকুর বিড়ালের ন্যায় চিত্তবিনোদনার্থ মাদাম্ ডুবারীকে উপহার প্রদান করেন। কিন্তু শিক্ষার কি আশ্চর্য্য শক্তি! রূশোর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া জামর রূশোর ভক্ত ও বিপ্লবের অকৃত্রিম অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে সে মাতার স্নেহ পাইবার অধিকারী,

সেই কি না তাহাকে অপমান করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তাহার অপরাধ এইমাত্র যে, সে স্বাধীনতাপ্রিয়। সর্ব্বজনপরিত্যক্ত নিরাশ্রয় জামর অবশেষে আমার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে।"

১৭৯৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর মাদাম্ ডুবারীর বিচার বা বিচারের প্রহসনাভিনয় হইল। তাঁহার প্রতিকূলে প্রধান সাক্ষী জামর। সে জবানবন্দিতে বলিল,—"আমার নাম লুই-বেনেডিক্ট জামর; বয়স একত্রিশ বৎসর; ভারতবর্ষের অন্তর্গত বঙ্গদেশ আমার জন্মভূমি। এক্ষণে আমি ভার্সাইল্ নগরীর রক্ষা-সমিতির (Committee of Public Safety) অধীনে নিযুক্ত আছি। একখানা জাহাজের অধ্যক্ষ আমাকে ফ্রান্সে লইয়া আসে, এবং দশ বৎসর বয়সে আমি আসামীর ভৃত্য নিযুক্ত হই। স্বদেশভক্ত সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার প্রতি কঠোর অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমি তাঁহাকে কতক সম্পত্তি দেশের কার্য্যে অর্পণ করিয়া বক্রী রক্ষা করিবার উপায় করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে অনেক লোক যাতায়াত করিত। সাধারণতন্ত্রের পরাজয়বার্ত্তায় তাহারা আনন্দপ্রকাশ করিত। তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম, তাহারা অভিজাত-শ্রেণীর লোক। এই ব্যাপারেও নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শুনেন নাই। উপরন্তু, যখন তিনি অবগত হইলেন যে, গ্রীভের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে, এবং গ্রীভ নিজে ফ্রাঙ্কলিন, মারাট প্রভৃতি স্বদেশভক্তদিগের সহযোগী, তখন তিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া তিন দিনের মধ্যে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আমাকে আদেশ করিলেন।"

মাদাম্ ডুবারীর বিচার বা অবিচার শেষ হইয়া গেল। সেই সময়ে ফ্রান্সে এই-রূপ অভিযোগের বিচারফল যাহা হইবার তাহাই হইল—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ-দণ্ডের হুকুম হইল। বধ-মঞ্চে অভাগিনী যখন উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে-ছিল,—"রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার প্রাণদান কর। আমার যাহা কিছু আছে, আমার যথাসর্ব্বস্ব, তোমরা গ্রহণ কর, কেবল আমার জীবনভিক্ষা দাও"—তখন তাঁহার এই মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া অবিচলিত ছিল কেবল পাপিষ্ঠ জামর। কিন্তু এত পাপানুষ্ঠান করিয়াও সে সন্দেহের হাত এড়াইতে পারে নাই। সে যে রাজকীয় প্রভাবের মধ্যেই বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াছে, বিপ্লবকারীরা তাহা ভুলিতে পারে নাই। মাদাম্ ডুবারীর মৃত্যুর তিন সপ্তাহমাত্র পরে সেও ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ছয় সপ্তাহ কারাবাসের

পর সহকারী বান্ধবদিগের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিয়া সে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

ইহার পর ফ্রান্সের উপর দিয়া, ইউরোপের উপর দিয়া, এক প্রলয়-ঝটিকা বহিয়া গেল। বিপ্লবের দোহাই দিয়া যাহারা স্বদেশীয়ের শোণিতে ধরিত্রী কলঙ্কিত করিতেছিল, বিপ্লবের নামেই তাহাদেরও শোণিতপ্রবাহ বহিয়া গেল। তাহার পর সংহার-ধূমকেতুর ন্যায় নেপোলিয়নের অভ্যুদয় হইল। দুর্ব্বল ডিরেক্টরির ধ্বংস-সাধন করিয়া তিনি স্বয়ং ফ্রান্সের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন—কন্‌সল্ হইলেন, সম্রাট হইলেন। ইউরোপময় ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কত যে অর্থনাশ, কত যে লোকক্ষয় হইল; কত পুরাতন রাজ্যের ধ্বংস, নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল; কত যে দীর্ঘশ্বাস হাহাকার পড়িয়া গেল, তাহার সীমা হয় না। বহুবর্ষব্যাপী অজস্র শোণিতপাতের পর অবশেষে সমগ্র ইউরোপের সমবেত চেষ্টায় নেপোলিয়নের পতন হইল। এতদিনের মধ্যে জামরের আর দেখা নাই, সন্ধান নাই—সে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্দেশ

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেণ্টহেলেনা শৈলদ্বীপে নেপোলিয়ন নির্ব্বাসিত; অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিরূঢ়; এই সময়ে জামরকে আবার লোকালয়ে দেখা গেল। পারীসের এক অতি দরিদ্র, অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময়, জঘন্য পল্লীতে একখানি ক্ষুদ্র, জীর্ণ, অন্ধকার ঘরে তাহার বাস। সে কখনও বিবাহ করে নাই; কিন্তু রমণীর আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিতেও পারে নাই। সেই মোহের বশেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। শেষে শিক্ষকতা করিয়া সে অতি কষ্টে দিনপাত করিত। কিন্তু এইরূপ জীবিকাও শেষে অপ্রাপ্য হইল। বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া তাহার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মন্দভাগ্য ছাত্রগণকে সামান্য অপরাধে বা বিনাপরাধে সে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিত যে, তাহাদের আর্ত্তনাদে সমস্ত পল্লী প্রতিনিয়ত উদ্বেজিত হইত। প্রহারবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ছাত্রগণ ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার দিন আর চলে না। এত বড় পৃথিবীটাতে তাঁহার বন্ধু বলিতে কেহ ছিল না। তাহার প্রকৃতির গুণে তাহার জন্য একটু সহানুভূতি, একটু সমবেদনা, একটু করুণাও কাহারও হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। ক্লেশে, অনাহারে, মর্ম্মপীড়ায় তাহার আয়ু শেষ হইল। হিংস্র পশুর ন্যায় সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল; ঘৃণিত পশুর ন্যায় তাহার মৃত্যু হইল। কুকুরটা বিড়ালটাও অনাহারে মরিলে লোকে একবার 'আহা' করে; হতভাগ্য জামরের জন্য কেহ 'আহা' করে নাই।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎকট ভক্ত সে চিরদিন ছিল। তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছিল; কিন্তু মারাট ও রোবেশপিয়রের দুইখানি মলিন প্রতিকৃতি ও রুশোর কয়েকখানি গ্রন্থ শেষ পর্য্যন্ত তাহার সেই বিকট কুটীরে ছিল। বাঙ্গালীর ছেলের কি বিচিত্র অদৃষ্ট!

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মায়ার বন্ধন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্তোষ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর এ কাহাকে পাঠাইলেন—পরিচয় কিছুই ত জানি না। মুখখানি কিন্তু ভারি সুন্দর! নিশ্চয়ই কোন উচ্চবংশে জন্ম হইবে।"

একটু পরে মালতী আসিয়া কহিল, "কেমন্ দেখ্‌লে দাদা, বড় সুন্দর—না?"

সন্তোষ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হুঁ।"

মালতী। মা বল্‌ছিলেন, তোমার যদি ঐ রকম সুন্দর টুক্‌টুকে একটি বউ হয় ত বড় খুসী হন।

সন্তোষ। যা! তোর আর অত জ্যাঠামি কর্‌তে হবে না।

মালতী। না দাদা, জ্যাঠামি নয়, আমারও ভারি ইচ্ছে—ঐ রকম আমার একটি বৌদিদি হয়।

সন্তোষ। আচ্ছা সে পরে হবে এখন। আপাততঃ দেখিস্, উহার যেন কোন বিষয়ে অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। তা' হলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ভারি রাগ কর্‌বেন।

সন্তোষ জানিত, সন্ন্যাসীর নাম করিলে মালতী আদেশপালনটা ভাল করিয়া করিবে—তাই তাঁহার নাম করিল। সন্তোষের পিতা সন্ন্যাসীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। সেই অবধি বাড়ীর সকলেরই সন্ন্যাসীর প্রতি অচলা ভক্তি। সন্তোষ কঠোর বৈজ্ঞানিক হইলেও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ। স্বর্গীয় পিতা যাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন, সন্তোষ প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছে।

মালতী কহিল, "সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না। আমি আসিবামাত্র জরির ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া দিয়াছি, আমার

লট্‌কানে রঙের শাড়ীটা তাহাকে পরাইয়াছি, আমার সোনার কয়গাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়াছি। আমার ঘরটাও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি—আমি মায়ের কাছে থাকিব এখন। হ্যাঁ, ভাল কথা, মা বলিতেছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে একদিন যাইতে চাহেন—তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।”

সন্তোষ কহিল, “তা’ বেশ, লইয়া যাইব।”

মালতী চলিয়া গেলে সন্তোষ একখানা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পাতা আর উল্টাইল না।

সম্মুখে গঙ্গা প্রবাহিত। ঘোলা জল ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উদাসীর মত চলিয়াছে। ও পারে ট্রেণের শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসিয়া লাগিতেছে। দুই একটা নৌকা তরঙ্গে দোল্‌ খাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। মাঝিরা গান ধরিয়াছে,—

যমুনার কালো জল
কালো রূপে ঢল ঢল্‌!
কোন্‌ খানে চোরাবালি—
সচতুর নাগরালি—
সাবধানে চল্‌!

মাঝিরা পাড়ি দিবার সময় কতবার এ গান গাহিয়াছে, সন্তোষ তাঁহাতে কর্ণপাতও করে নাই—আজ মাঝিদের এই গান যেন কত অর্থভরা হইয়া তাহার শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে জাহাজ যেমন তরঙ্গ দলন করিয়া সদর্পে চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গে আহত হইয়া বান্‌চাল হইয়া পড়ে—সন্তোষেরও তেমনি জীবনের উচ্চ আশা দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই আজি হঠাৎ যেন একখানি সুন্দর মুখের কাছে আসিয়া ঠেকিল। সন্তোষ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেল। সে কতবার যে এইরূপ অনাবশ্যক অন্তঃপুরে যাওয়া আসা করিল, তাহার ঠিক নাই। মাতা বুঝিলেন, একদিনেই পুত্রের নাড়ী বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অল্প দিনের মধ্যেই মালতী প্রতিমার সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল। সন্তোষের নিকট প্রতিমার সঙ্কোচও অনেকটা কমিয়া আসিল।

মধ্যাহ্নে বেলায় আহারাদি শেষ করিয়া মালতী প্রতিমার ঘরে আসিয়া বসিল। প্রতিমার মুখে একটা পান গুঁজিয়া দিয়া কহিল, “তোমার ত ভাই এখানে কোন কষ্ট হচ্চে না? দাদা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।”

প্রতিমা হাসিতে হাসিতে কহিল, "জিজ্ঞাসা করেন নিজে হইতে, না সন্ন্যাসী-ঠাকুরের খাতিরে?"

মালতী কহিল, "অত শত ভাই জানি নে, তিনি যা' বলেন, তাই বললুম।"

প্রতিমা কহিল, "তাঁহাকে বলিও, আমার কষ্ট এই যে, তিনি এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করেন।"

মালতী পানের ডিবেটা প্রতিমার কাছে সরাইয়া দিয়া কহিল, "যদি ভাই রাগ না কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার পরিচয়টা—"

মালতীর কথা শেষ হইতে না হইতে প্রতিমা কহিল, "আমার পরিচয় জানিতে চাও? আমার পরিচয় এই—মা নেই, বাপ নেই,—যিনি আমাকে জন্মাবধি মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কুঁড়েঘরে ছিলাম। তাহার পর কোনও কারণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রয়ে আসি—তিনি আবার আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া মালতীর কষ্ট হইল, কিন্তু সে সমস্তটা জানিবার লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া কহিল, "কারণটা কি ভাই আমরা শুন্‌তে পাই নে?"

মালতী কথাটা এমনই অভিমানস্বরে কহিল যে, প্রতিমা তাহাকে না বলিয়া আর থাকিতে পারিল না। প্রতিমা মহেন্দ্রের কথা সব খুলিয়া বলিল, কেবল এ বিষয়ে তাহার মাতার যোগদানের কথাটা চাপিয়া গেল।

মালতী স্বভাবতঃই একটু কৌতুকপ্রিয়। সে মজা করিবার জন্য কহিল, "দেখো ভাই, দাদাকেও যেন কোন দিন দোষী কোরো না।"

প্রতিমা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কাহার সহিত কাহার তুলনা! এক জন পশু, আর এক জন দেবতা!"

মালতী হাসিতে হাসিতে কহিল, "দাদাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি তাঁহাকে পশু বলিলে।"

প্রতিমা কহিল, "আর জ্বালিও না ভাই! তোমার কেবলি ঐ ঠাট্টা তামাসা! —এখন আমার একটা কাজ করিয়া দাও দেখি। আমার মাকে আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। তোমার দাদাকে বল না, সন্ন্যাসী ঠাকুরের অনুমতি লইয়া মাকে এইখানে আনাইয়া দিতে।"

মালতী কহিল, "দাদাকে বলিব এখন।"

প্রতিমা মালতীর চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর উঠিয়া গৃহকর্ত্রীর পাকা চুল তুলিয়া দিতে তাঁহার ঘরে গমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে সন্তোষ মাতাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী তখন শিষ্য-সমভিব্যাহারে সহরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

মাতাপুত্রে পদধূলি গ্রহণ করিলে, সন্ন্যাসী তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহারা বসিলে, সন্ন্যাসী সন্তোষকুমারকে কহিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ—তোমার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি ঠিক করিয়াছিলাম, আজই তোমাদের ওখানে যাইব। কথাটা এই—বৎস, এ যাবৎকাল তুমি আমার সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে আর এক বিষয়ে তোমার সহায়তা প্রার্থনীয়। আমি স্থির করিয়াছি, পুরুষদিগের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে এই মঠের জমীর মধ্যে অনাথা বিধবাদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব। যে বালিকাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে এইটি উদিত হইয়াছে। এখানে ঐরূপ আশ্রম থাকিলে উহাকে আর তোমাদের নিকট পাঠাইবার আবশ্যক হইত না।"

সন্ন্যাসীর কথায় সন্তোষ প্রতিমাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইল,—জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত কহিল, "আপনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিন, অর্থ যাহা লাগিবে, আমি দিব।"

সন্ন্যাসী তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "মেয়েটি ভাল আছে ত? তাহার মুখখানি বড় বিষণ্ণ।"

সন্তোষ কহিল, "ভাল আছে। তবে তাহার মাকে দেখিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত হইয়াছে। তাহা আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কল্যই আমি তাহার মাকে আনিতে পাঠাইব।"

সন্তোষের মাতা এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তিনি সন্তোষকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার ও দিকে যাও ত—ঠাকুরের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

মাতার অভিপ্রায় সন্তোষ বুঝিতে পারিল। যাহাতে কথাবার্ত্তা কানে আসিয়া পৌছায়—সে কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল।

মাতা কহিলেন, "ঠাকুর, এমন মেয়ে ত কখনো দেখি নি। যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব! আহা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "গৃহের কাজকর্ম্ম দেখে ত?

মাতা কহিলেন, "সে তাহাকে বলিতে হয় না, আপনা হইতেই সমস্ত করে। আহা, আমার কত সেবাশুশ্রূষা করে! এখন ঠাকুর সন্তোষের সঙ্গে উহার বিবাহ হয় না?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি খোঁজ লইয়া সব জানিয়াছি। মেয়েটি সদ্বংশজাতা ব্রাহ্মণকন্যা। উহার পিতা সংসারত্যাগী, মাতা জন্ম দিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন। গৃহের একটি পুরাতন পরিচারিকা উহাকে মানুষ করে। গোত্র কিংবা অন্যান্য বিষয়ে সন্তোষের সহিত উহার বিবাহ পক্ষে কোনই বাধা নাই। সম্প্রদান আমি স্বয়ং করিতে পারি। এখন সন্তোষ ঐ গরীব অনাথাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে?"

মাতা কহিলেন, "ঠাকুর, সে পাইলে এখনি লুফিয়া লয়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বিবাহ সম্বন্ধে ত আমি কোন আপত্তি দেখি না।"

মাতা কহিলেন, "তাহা হইলে কন্যার মনটা আমি একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি। তাহার পর ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমস্ত ঠিক্‌ঠাক করিব।"

সন্ন্যাসী "তথাস্তু" বলিয়া উঠিলেন। মাতাপুত্র উভয়ে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সন্তোষ সন্ন্যাসীর সহিত মাতার কথোপকথন সমস্ত শুনিয়াছিল। যতক্ষণ না গাড়ী বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, সে রুদ্ধদ্বার অন্ধকূপের মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে একটা সুখের ছবি আঁকিতে লাগিল।

দক্ষিণ দিকের অনতিপ্রশস্ত গলির মধ্যে গাড়ী আসিয়া থামিল। বাড়ীর ভিতর গাড়ী যাইবার পথ ছিল না। সন্তোষ আগে নামিয়া মাতার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। তাহার পর নবীন আশায় উৎফুল্ল হইয়া দ্রুতগতিতে পাঠাগারের দিকে চলিল।

সন্তোষ পাঠাগারে ঢুকিবে, এমন সময় দূর হইতে দেখিল, প্রতিমা ও মালতী ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এটা ওটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে। প্রতিমার লাবণ্যচ্ছটায় সেই শ্রীহীন মলিন ঘরও যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মস্তক অবগুণ্ঠনহীন—দীর্ঘ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র সঙ্কোচহীন সুন্দর নিষ্কলঙ্ক মুখের উপর পড়িয়া পীত আভায় মণ্ডিত করিয়াছে। সন্তোষ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর আপনাকে সংযত করিয়া মৃদুপদক্ষেপে সহজ শান্তভাবে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে গিয়া একেবারে কোণঠেসা হইয়া দাঁড়াইল।

মালতী গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু প্রতিমাকে তাহা জানিতে দেয় নাই। এক্ষণে সে প্রতিমাকে লজ্জাহত দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া, "লজ্জা কি, এস না!" বলিয়া হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিল।

সন্তোষ বিনয়নম্রস্বরে কহিল, "আমার নিকট অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র আছে—দেখাই আসুন।"—এই বলিয়া তড়িৎ ও চুম্বক সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য নানা-প্রকারের যন্ত্র সকল চালন করিয়া দেখাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মালতী ইচ্ছা করিয়া প্রতিমাকে একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। সে পূর্ব্বে এ সকল দেখিয়া-ছিল—তাহার আর দেখিবার কৌতূহল ছিল না। প্রতিমা মুস্কিলে পড়িয়া অধো-বদনে দেখিতে লাগিল।

সন্তোষ যন্ত্রচালনা করিয়া দেখাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ঘূর্ণ্যমাণ চক্রের মধ্যে তাহার অঙ্গুলি পতিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল; ঝরঝর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। প্রতিমা সেই মুহূর্ত্তে লজ্জা সঙ্কোচ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি শাড়ীর কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া সন্তোষের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দিল। সন্তোষ সেই কোমল অঙ্গুলির স্পর্শে, ঋজুতনুবেষ্টিত বস্ত্রাঞ্চলের গন্ধে, মুহুর্মুহু ত্যক্ত তপ্ত নিশ্বাসপাতে বালিকার কাতরতা দৃষ্টে আপনাকে আর সামলা-ইতে পারিল না।—জ্বালা যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রতিমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি তোমাকে বড় ভালবাসি—তুমি আমাকে ভাল-বাসো?—বল—বল—বল?"

প্রতিমা মুখের উপর বড় বড় দুই চোখ রাখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "ভালবাসি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিমাকে হারাইয়া বামার মার মনে আর সুখ নাই। সে তাহার ঐ জীর্ণ পতিতপ্রায় কুটীরের ন্যায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে প্রত্যহ দেখে—প্রতি-মার স্বহস্তনির্ম্মিত লাউমঞ্চে বড় বড় লাউ ফলিয়া আছে; কুলুঙ্গির উপর তাহার সেই সাধের সাজি শূন্য পড়িয়া আছে; ঘরের কোণে তাহার সেই বেগুন তুলিবার আঁকুশিটা তেমনই ভাবে দাঁড় করান রহিয়াছে; সে দেখে, আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, মানুষকরার টান গর্ভধারিণী মাতার স্নেহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

বেলা নয়টা। বামার মা দাওয়ায় বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে টিয়া-পাখীকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শিখাইতেছে। এমন সময় মহেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র। কি গো বামার মা, রকমটা কি! খুব ফাঁকি দিলে যা' হোক্!

বামার মা অন্য দিনের ন্যায় মহেন্দ্রকে খাতির যত্ন কিছুই করিল না, শুধু বেতের মোড়াটা পাড়িয়া বসিতে দিল। মহেন্দ্র বসিলে কহিল, "ও সব কথা আর মুখে আন্‌বেন না—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "বলি বামার মা, তোমার অত ধর্ম্মজ্ঞান কবে হইল?"

প্রতিমা বড় দুঃখে যে বলিয়াছিল, "গরীব বলিয়া তাহার কি আর ধর্ম্ম নাই!"—সে কথা এখন বামার মার কানে করুণ সুরে বাজিতে লাগিল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি! ইহাকে ধর্ম্মই বলুন, আর যাহাই বলুন!"

মহেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁগো সাবিত্রী ঠাক্‌রুণ, তোমার মেয়ে এখন কোথায় আছে বল দেখি?"

বামার মা। আমি জানি না।

মহেন্দ্র একখানা দশ টাকার নোট্ দেখাইয়া কহিল, "এই দেখিতেছ!"

বামার মা উঠিয়া ভূমিতে পদাঘাত করিয়া হুঙ্কার রবে কহিল, "উহাতে আমি থুতু ফেলি!"

মহেন্দ্রের ভারি রাগ হইল। সে উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "সাবধান! জান, আমি তোমাকে এখনি ভিটে-ছাড়া করিতে পারি!"

বামার মা নির্ভয়ে কহিল, "অক্লেশে পারেন, আমি ভয় করি না! আমার নিজের জন্য কিছুমাত্র ভাবি না। অধর্ম্ম যাহা করিয়াছি, তাহা কেবল ঐ মেয়ের কষ্ট দেখিতে পারি নাই বলিয়া।"

মহেন্দ্র কহিল, "শোন, আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—তোমাকে ত ভিটাছাড়া করিবই, উপরন্তু তোমার মেয়েকে যেখান হইতে হউক সন্ধান করিয়া কাড়িয়া আনিব!"—এই বলিয়া মহেন্দ্র দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বামার মা জানিত, নিশ্চয়ই প্রতিমার কূলকিনারা একটা কিছু হইয়াছে, তাহার কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই—তাই সে ধর্ম্মের বলে বলী হইয়া এত জোরের সহিত সমানে কথা কহিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মহেন্দ্রর শেষ কথায় তাহার মনে একটু ভয় হইল, ভাবিতে লাগিল, "হতচ্ছাড়া জমীদারের ছেলেটা শাসাইয়া গেল—না জানি কি করিবে।"—বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় প্রেমানন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবা তোমাকে তোমার কন্যার নিকট লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। প্রস্তুত হও।"

বামার মা আনন্দে আটখানা হইয়া কহিল, "হাঁ্যাগো, সে এখন কোথায় আছে ?"

প্রেমানন্দ কহিল, "সেখানে গেলেই জানিতে পারিবে।"

বামার মা তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল। প্রতিমার পরিবার কাপড় ও সখের জিনিসপত্র সঙ্গে লইল। তাহার পর দুয়ারে তালাচাবি লাগাইয়া প্রেমানন্দের সহিত চলিল।

সন্ন্যাসী প্রেমানন্দকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করাইয়া বামার মাকে একেবারে তাহার কন্যার নিকট পৌছাইয়া দিতে। প্রেমানন্দ সেই জন্য অন্য পথ দিয়া একটু ঘুরিয়া সন্তোষের বাড়ীতে তাহাকে একেবারে আনিয়া উপস্থিত করিল।

বাড়ীর রকম-সকম সাজসজ্জা দেখিয়া বামার মা অবাক্ হইল। মালতী দৌড়িয়া নীচে আসিয়া বামার মার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। প্রতিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বামার মা তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া কান্না থামাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। সন্তোষের মা ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বামার মার হাত ধরিয়া "এস, দিদি এস," বলিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন।

সুখদুঃখের নানান্ কথার পর সন্তোষের মাতা কহিলেন, "দিদি, তোমাকে আমরা ছাড়িতেছি না, এখানে বরাবর থাকিতে হইবে।"

বামার মা কহিল, "তাহাতে আপত্তি কি,—প্রতিমা ছাড়া সংসারে আমার কে আর আছে ?"

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকালে প্রকাণ্ড ছাতের একপার্শ্বে প্রতিমা ও মালতী বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নদীর ধারের ঝাউগাছগুলির মাথা ছাত ছাড়াইয়া উঠিয়াছে ;—তাহাদের মধ্যে বাতাস আট্‌কাইয়া শাঁ শাঁ শব্দ করিতেছে। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। নদীবক্ষে চাঁদ হাসিতেছে। মাঝিরা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছে ;—তাহাদের উননের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দূর হইতে চিতার মত দেখাইতেছে।

মালতী প্রতিমাকে কহিল, "এস ভাই, তোমাকে আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখাই।" এই বলিয়া কোন্‌টা সপ্তর্ষি, কোন্‌টা মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিল। সে দাদার নিকট এ সব শিখিয়াছিল। দেখাইতে দেখাইতে মালতী প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "তুমি ভাই কোন্ গ্রহ ?"

প্রতিমা হাসিতে হাসিতে মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমি ভাই তোমাদের গলগ্রহ।"

মালতী কহিল, "ঠিক কথা, তুমি ফুলের মালা, আমরা ভাই তোমাকে গলায় পরব।"

প্রতিমা কহিল, "সে ভাই তুমি, তোমার নামেই প্রকাশ পাচ্চে।"

মালতী কহিল, "তা হ'লে ভাই তুমি কি ?"

এমন সময়ে একটা কাগজের মোড়ক হাতে সন্তোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্তোষ বসিয়া কহিল, "ইহার মধ্যে কি আছে, যে বলিতে পারিবে, তাহাকে এই হীরার আংটিটা দিব।"

মালতী তাড়াতাড়ি কহিল, "ক্রীস্‌মাস কার্ড।"

প্রতিমা একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "লজঞ্জুষ।" কাহারও কথা ঠিক হইল না। মোড়কের মধ্যে সন্তোষের স্বহস্তে তোলা প্রতিমার ফটো ছিল। প্রতিমা যখন প্রাতে বাগানে বেঞ্চের উপর একলা বসিয়াছিল, সন্তোষ লুকাইয়া তাহার ছবি নিয়াছিল।

মালতী তাড়াতাড়ি দাদার হাত হইতে ছবি কাড়িয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া "কি সুন্দর!" বলিয়া প্রতিমার মুখের কাছে ছবিখানা ধরিল। প্রতিমা মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন মালতী উঠিয়া মাকে ছবি দেখাইতে নীচে নামিয়া গেল।

মালতী উঠিয়া গেলে সন্তোষ জ্যোৎস্নালোকে প্রতিমার মুখখানা একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। দেখিল,—চন্দ্রাকার বদ্ধবেণী হইতে বকুলফুলের মালাটি ঈষৎ খসিয়া পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; ঘনপক্ষ্মাচ্ছাদিত ভ্রূযুগের মধ্যভাগে কাঁচপোকার টিপ্ তারার মত জ্বল জ্বল্ করিতেছে; দীঘির কালো জলের মত স্বচ্ছ গভীর ঐ লজ্জামাখা নয়ন দুইটির কি সুন্দর চাহনি;—ওষ্ঠ ঈষৎ গোলাপী আভায় রঞ্জিত। সন্তোষ আস্তে আস্তে প্রতিমার অঙ্গুলিতে হীরক-অঙ্গুরীয়কটি পরাইয়া দিয়া কহিল, "এতদিনে আমার জীবন সার্থক হইল।—তুমি আমার জীবন-দায়িনী। জীবনে আমি কখনও এত সুখ পাই নাই।"

প্রতিমা কহিল, "আমিও কি কম সুখী হইয়াছি।"

সন্তোষ কহিল, "মা ত আমাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সন্ন্যাসী ঠাকুরের অনুমতি হইলেই হয়।"

প্রতিমা কহিল, "ঠাকুর কি বলেন ?"

সন্তোষ কহিল, "তিনি দিন স্থির করিয়া বলিয়া পাঠাইবেন বলিয়াছেন।"

প্রতিমা কহিল, "ঠাকুরের কৃপায় যখন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাঁহারই কৃপায় আবার আমাদের মিলন হইবে।"

এই সময়ে মালতী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, হীরক-অঙ্গুরী প্রতিমার অঙ্গুলিতে শোভা পাইতেছে। মালতী বুঝিয়াছিল, প্রতিমাকে দিবার জন্যই সন্তোষ আংটিটা আনিয়াছে, তবু সে কহিল, দাদা, তুমি বড় পক্ষপাতী। আমার আঁচ বরং কাছা-কাছি গিয়াছিল, তবু তুমি আংটিটা প্রতিমাকে দিলে।"

সন্তোষ হাসিতে লাগিল।

গল্পগুজবে অনেক রাত্রি হইল। ঝি আসিয়া খবর দিল, আহার প্রস্তুত হইয়াছে। সকলে উঠিল। মাথার উপর দিয়া একটা পেচক চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। ঝি "দূর্! দূর্! আঃ ম'লো যা!" বলিয়া গালি দিতে দিতে নীচে নামিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকালে মহেন্দ্র মোসাহেব-পরিবেষ্টিত হইয়া বৈঠকখানায় ঢালা বিছানার উপর বসিয়া আছে। সেতার তানপূরা বাঁয়া তবলা নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র চারি পাশে ছড়ান—সম্মুখে মদের বোতল এবং একটি গ্লাস রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে দেয়ালে কতকগুলি নগ্ন রমণীর চিত্র, এবং গিল্‌টির ফ্রেমকরা বড় বড় আয়না। কড়িকাঠ হইতে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। গেলাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে মহেন্দ্র কহিল, "আমাকে ধরে কা'র সাধ্য।"

মোসাহেবদিগের মধ্যে এক জন কহিল, "রামো! রামো! তাহাও কি হয়? আর যদি ধরাই পড়েন—টাকায় কি না হয়? খুনকে খুনই চাপা পড়িয়া যায়, এ ত অতি সামান্য কথা।"

আর এক জন কহিল, "ঠিক কথা। এই ত কিছু দিন পূর্ব্বে রামা বাগদীটাকে আধমরা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, কি হইল?"

অন্য এক জন কহিল, "আপনার প্রতাপে পুলিশসুদ্ধ থরহরি কম্পবান।"

এই সময়ে কদাকার কৃষ্ণবর্ণ গুণ্ডার মত একটি লোক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহেন্দ্র কহিল, "কি হে ভবানী, কি হইল?"

আগন্তুক কহিল, "সমস্তই ঠিক, রাত্রি দশটার পর যাত্রা করা যাইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্ল্যান্‌টা কি বল দেখি?"

ভবানী কহিল, "তবে শুনুন। আমি গিয়া প্রথমে জল তুলিবার বেহারার সহিত আলাপ করিয়া ফেলিলাম। তাহার হাতে দুইটা টাকা দিয়া শিখাইয়া

দিলাম—কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পুরাতন মনিব-বাড়ীর আলাপী ভৃত্য বলিয়া আমার পরিচয় দিতে। আমি একটা ময়লা কাপড় পরিয়া ছোটলোকের সাজে গিয়াছিলাম। বেহারার সহিত বাড়ীর চারি পাশ ঘুরিয়া দেখিলাম, পাঁচিলের এক জায়গা খানিকটা ভাঙ্গা আছে। সেইখান দিয়া অন্ততঃ চারি পাঁচ জন লোক এক সঙ্গে প্রবেশ করা যায়। যে ঘরে মেয়েটি রাত্রে শয়ন করে, তাহাও দেখিলাম—সেটি দোতালার উত্তর দিকের সর্ব্বশেষ কোণের ঘর। সেই ঘরের গা দিয়া একটি বাঁকানো লোহার সিঁড়ি নীচে নামিয়াছে। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছোট একটু বারান্দার মত,—তার পর ঘরের দরজা। আমি বেহারাকে আরও পাঁচ টাকা দিয়া ভিতর হইতে আজ দরজার হুড়কোটা খোলা রাখিতে বলিয়া দিয়াছি। খোঁজ লইয়া জানিলাম, সে ঘরে আর কেউ থাকে না—মেয়ের মা বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে প্রায়ই শয়ন করে।"—এই বলিয়া ভবানী বোতল হইতে মদ ঢালিয়া একনিশ্বাসে পান করিল। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, —"আমি আর রাম সিং উপরে যাইব ; পাঁড়ে আর হীরালাল পাঁচিলের ফাঁকের কাছে থাকিবে। আপনি—মস্ত একটা তেঁতুলগাছ আছে—তাহারি তলায় দাঁড়াইবেন। পাল্কী গলির মধ্যেই থাকিবে। শুনিলাম, মস্ত একটা কুকুর সমস্ত রাত্রি ছাড়া থাকে—ঐ যা' একটু ভয়।"

কুকুরের কথায় মহেন্দ্র ভীত হইয়া কহিল, "আমার কি না গেলে নয় ?"

ভবানী কহিল, "আপনি না গেলে চলিবে না। আপনি থাকিলে পুলিশ কিছু বলিতে সাহস করিবে না।"

মহেন্দ্র মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিল,—কহিল, "আচ্ছা, তবে যাওয়া যাইবে।"

ভবানী কহিল, "পাল্কী বেহারা আর ক্লোরোফরমের শিশিটা ঠিক আছে ত ?"

মহেন্দ্র কহিল, "সব ঠিক।"

ইহার পর অনেক্ষণ ধরিয়া গান বাজনা চলিল।

রাত্রি দশটার পর মহেন্দ্র দল বল সহ যাত্রা করিল। তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়াছে। বাতাস নাই, গাছের পাতা পর্য্যন্তও নড়িতেছে না। প্রকৃতি যেন কোন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় স্তব্ধ স্তম্ভিত। অন্ধকারে ক্ষেত মাড়াইয়া বন জঙ্গলের উপর দিয়া সকলে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মাথ্‌রা গ্রাম হইতে সহরে আসিতে হইলে মঠের পাশ দিয়া আসিতে হয়। সকলে মঠ অতিক্রম করিয়া নদীর পথ ধরিল। তৎপরে সহরে পৌঁছিয়া গলি ঘুঁজি দিয়া একেবারে গন্তব্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বকথামত সকলে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। পাল্কী গলির মধ্যে রহিল। ভবানী সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া রাম সিংকে লইয়া উপরে গেল।

মহেন্দ্র সেই তেঁতুল-গাছের তলায় দাঁড়াইয়া এ দিক ও দিক চারি দিক চাহিয়া দেখিল,—অন্ধকারে কোনও দিকে কিছুই দেখিতে পাইল না। মাথার উপর তেঁতুল-গাছের ভিতর দিয়া ঝোড়ো বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে বহিয়া যাইতেছে; আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছে; কুকুরের বিকট চীৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতেছে। মহেন্দ্র ভয়ে জড়সড় হইয়া ভাবিতে লাগিল, "কেন মরিতে ইহাদের সহিত আসিতে গেলাম!"

এ দিকে ভবানী সিঁড়ির উপর দিয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়া দরজা ঠেলিল—দরজা খুলিল না। আরও একটু সজোরে ঠেলিল, তথাপি খুলিল না। ভবানীর মাথায় বজ্রপাত হইল। সে মনে মনে বেহারাকে অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, বাহির হইতে দরজায় ছিট্-কানি লাগান রহিয়াছে। ভবানী তখন আনন্দিতমনে মেড়ুয়াবাদীর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইতে বন্ধ না করিলে ঝড়ে দরজা খুলিয়া যাইবে, এবং ভিতর হইতে প্রতিমা অর্গল বন্ধ করিয়া দিবে—এই বিবেচনায় সে ভিতরে খোলা রাখিয়া বাহিরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভবানী অতি সন্তর্পণে ছিট্‌কানি খুলিয়া রাম সিংএর সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দরজা ভেজাইয়া দিল। রাম সিং দরজায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। দূরে ঘরের এক কোণে একটা সেজ্ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই অস্পষ্ট দীপালোকে ভবানী চকিতের মধ্যে ঘরের চারি দিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দেখিল, খাটের মশারি তোলা রহিয়াছে। প্রতিমা—আকাশের গায় শুভ্র মেঘরেখার ন্যায়—নীচের বিছানায় কারুকার্য্যখচিত নীল আস্তরণের উপর শুইয়া আছে। ভবানীর অত শত ভাবিবার অবসর ছিল না। সে আস্তে আস্তে প্রতিমার কাছে গিয়া ক্লোরোফরম্-মিশ্রিত রুমালটা তাহার নাকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল। অল্পক্ষণ গোঁ গোঁ শব্দ, তাহার পর আর চেতনা রহিল না। দুই জনে দুই পার্শ্বে ধরিয়া বিছানাসুদ্ধ প্রতিমাকে পাল্কীতে আনিয়া তুলিল। মহেন্দ্রও তেঁতুল-গাছের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া আবার সকলে মিলিয়া ফিরিয়া চলিল। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতেছে; মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হইতেছে; এখনই যেন মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। চলিতে চলিতে দলের সহিত একটা

চৌকিদারের দেখা হইল। চৌকিদার কহিল, "বাবুলোক এৎনা রাতকো কাঁহা যাতি হো?"

মহেন্দ্র কহিল, "জানানা সওয়ারী—হাঁ, এ বরষমে তুমারা হোলিকা বক্‌সিস্ নেই মিলা।" এই বলিয়া তাহার হাতে দুইটা টাকা দিল। সে টাকা পাইয়া হাস্যমুখে সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে তাহারা মঠের কাছে আসিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আনন্দোৎফুল্ল হইয়া পাল্কীর দরজা ঈষৎ খুলিয়া জ্ঞানশূন্যা প্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "এখন্ প্রতিমাঠাকুরুণ, কি হইবে? পালাইবে কোথায়? কে তোমাকে রক্ষা করিবে?"

কথাটা নিদ্রাতন্দ্রাহীন যোগমগুপাসীন সন্ন্যাসীর কানে গিয়া পৌঁছিল। তিনি দ্রুতপদে ঘরে গিয়া প্রেমানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যদিগকে উঠাইয়া কহিলেন, "বড় বিপদ! তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি দলের সম্মুখে আসিয়া একবারে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই প্রলয়রাত্রে অন্ধকারে সন্ন্যাসীদের সেই ভৈরবমূর্ত্তি দেখিয়া, যে যেখানে পারিল, পাল্কী ছাড়িয়া পলাইল। কেবল মহেন্দ্র দৌড়াইতে না পারিয়া ধরা পড়িল। মহেন্দ্র সন্ন্যাসীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দনস্বরে কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া দিন। এমন কাজ আর কখনও করিব না!"

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কখনই না! আজ তোমাকে ছাড়িব না! কাল যাহা হয়, হইবে।" এই বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া আশ্রমে লইয়া চলিলেন। শিষ্যেরা পাল্কী স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

আশ্রমে আসিয়া পাল্কী নামাইল। আনন্দময়ী ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া প্রতিমাকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। প্রতিমার তখনও জ্ঞান হয় নাই। মুখখানি পাণ্ডুর বিবর্ণ; নিশ্বাস স্বল্প পড়িতেছে। সন্ন্যাসী তাহার শিয়রে বসিয়া জ্ঞানসম্পাদনের নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অনেক যত্নে ক্রমে প্রতিমার একটু একটু জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন প্রতিমা হাতের উপর ভর দিয়া ঈষৎ উঠিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারি দিকে তাকাইয়া কহিল, "এ কি! ও কে? আমি কোথায় আসিয়াছি?"

সন্ন্যাসী মহেন্দ্রকে সরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "মা, কোনও ভয় নাই। তুমি আমাদের নিকটে আছ। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

প্রতিমা তন্দ্রাবিজড়িত হইয়া আবার শুইয়া পড়িল।

মহেন্দ্রকে শিষ্যেরা একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মঠের সকলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

জীব ও জাতি।

অতি পুরাকাল হইতে মানবগণ পৃথক্ পৃথক্ জাতি বা সমাজে বিভক্ত। এই সকল জাত বা সমাজের সমষ্টিগত এক প্রকার জীবন আছে। পূর্ব্বে যে সকল জাতি ছিল, এখন তাহারা নাই; এখন যাহারা আছে, তাহারা পূর্ব্বে ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও যে চিরকাল থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যে সকল জীব ছিল, এক্ষণে তাহাদের অনেকেরই বিলোপ হইয়াছে; আবার এখন যে সকল জীব জলে বা স্থলে বাস করে, পুরাকালে তাহারা কল্পনায়ও আসিত না। ফলতঃ জাতিবিশেষের জন্ম, অভ্যুদয়, পতন ও বিলোপ কোনও না কোনও জীবজীবনের ঐ সকল ঘটনারই অনুরূপ। জীবের দেহে যে যে নিয়মে জৈবিক ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন হইলে তাহার কল্যাণ হয়, জাতীয় জীবনেও সেই সেই নিয়ম অনুসৃত হইলে জাতির অভ্যুদয় হয়। অন্যথা ক্রমে অবনতি ও পরিণামে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীতে জীব অসংখ্য;—মনুষ্যজাতিও বহুসংখ্যক। নিকৃষ্ট জীব ও শ্রেষ্ঠ জীবে বিস্তর প্রভেদ; অনুন্নত ও উন্নত মানবসমাজের প্রভেদও ত তদপেক্ষা অল্প নয়। এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে মানবসমাজ ও জীবের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌসাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জীবসমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়;—এক আদিজীব (Protozoa), দ্বিতীয় মিশ্রজীব (Metazoa)। আদি জীব অমিশ্র; কেন না, উহাদের দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহারাই জীবশ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন পদবীতে অবস্থিত। ইহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা কোনও প্রকার বোধশক্তি নাই; এমন কি, এত বড় আবশ্যক যন্ত্র যে উদর, তাহাও নাই। তোমরা হয় ত মনে করিবে—আঃ! কি আরাম! উহারা ত বড়ই সুখী, কেন না, পেটের জ্বালাই না সকল জ্বালার মূল!—কিন্তু বাস্তবিক তাহা বলা চলে না। উহাদের পেট

নাই বটে, কিন্তু আহারেও বিরাম নাই; আর সমস্ত দেহটাই পেটের কার্য্য করে। তবেই দেখ, ব্যাপার বরং আরও ভয়ানক। যখন সীমাবদ্ধ উদরের জন্য আমাদিগকে এতটা বেগ পাইতে হয়, তখন সর্ব্বশরীরব্যাপী উদরের জ্বালা না জানি কতই কষ্টকর! বাস্তবিক ঐ দুর্ভাগ্য জীবদিগকে সর্ব্বদা জলে বা তদ্বৎ কোনও তরল পদার্থে থাকিয়া সাঁতার কাটিতে হয়। ঐ তরল পদার্থে উহাদের আহারের উপযোগী যে কোনও দ্রব্য মিলিত থাকে, তাহা উহাদের উদররূপী শরীরকে স্পর্শ করিলে, তাহাই শোষণ করিয়া, উহারা জীবনধারণ করে। সন্তরণের জন্য তাই কি হস্তপদাদি আছে? সমস্ত শরীরটিকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়াই উহাদিগকে সাঁতার কাটিতে হয়। কত কত জীব উহাদিগকে খাইয়া জীবিত থাকে, তাহাদিগের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করা এই উপায়হীন আদিজীবদিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তথাপি সংখ্যায় ইহারা অগণিত; তাই অনেক মরিলেও, ইহারা শীঘ্র নির্ব্বংশ হয় না।

এখন দেখা যাউক, এই আদিজীবের সমকক্ষ মনুষ্যজাতি কিরূপ। যদি কোনও জাতি এরূপ থাকে,—যাহারা কখনও বিদ্যার চর্চ্চা করে না, সুতরাং যাহাদের জ্ঞান নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে প্রসারিত হয় না,—যাহারা সর্ব্বদা বুভুক্ষু, এবং খাদ্যের অভাবই যাহাদের চূড়ান্ত অভাব,—যাহাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কেবল নিজেরই ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত (প্রায়শঃ মৃগয়ান্বেষণে) ঘুরিয়া বেড়ায়,—যাহারা সমষ্টির নিমিত্ত বা অসময় ভাবিয়া আহরণ বা সঞ্চয় করে না,—অর্থাৎ না কৃষিক্ষেত্র, না দোকানপাট, না সাধারণ ধনাগারের আবশ্যকতা অনুভব করে, যাহাদের সামাজিকতার একেবারেই অভাব, অথবা সমাজবন্ধন একেবারেই শিথিল,—যাহারা স্বদেশ ও স্বভূমির রক্ষায় নিতান্ত অনুপায় বা নিশ্চেষ্ট,—যদি এই প্রকার মানবজাতি কোথাও থাকে, তাহাদিগকে ঐ নিম্নতম শ্রেণীর আদিজীবের সমতুল্য বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে কি? অদ্যাপি ভারতের স্থানে স্থানে, লঙ্কার পার্ব্বত্য প্রদেশে, আণ্ডামান দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যে সকল অনুন্নতাবস্থ মনুষ্যজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই ত তত্তদ্দেশের 'আদিজীব'। ইহাদের সম্বন্ধে একটা রহস্য এই যে, ইহারা সভ্যতর জাতির ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষে প্রায়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংস ঠিক্ রক্তারক্তির ফল নয়। অবশ্য প্রবল সভ্য জাতি মনে করিলে সহজেই উহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারে। অনাবশ্যক মনে করিয়া বা দয়াপরবশ হইয়া সেটা তাহারা করে না বলিয়া, আর কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে, সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া, উহারা টিকিয়া থাকিতে পায়। তথাপি ক্রমে উহাদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা

জাতীয় জীবনের শেষ সীমায় প্রায় পৌঁছিয়াছে। ভারতের "দস্যু"দিগকে আগন্তুক আর্য্যগণ প্রায় নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সর্ব্বনিম্ন পদবীর জীব ও জাতির কথা বলা হইল। এক্ষণে সর্ব্বোচ্চ পদবীর জীব ও জাতির কথার আলোচনা করা যাউক। শ্রেষ্ঠজীবসমূহ মিশ্রজীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ। যে হেতু মানুষই জীবসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই জন্য মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ণাঙ্গ জীবের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

নিম্নতম পদবীর জীবের দেহে যেরূপ একটিমাত্র কোষ থাকে, সেইরূপ পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ কোষের সমবায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীব বা মানবদেহ গঠিত। উভয়বিধ কোষের সাধারণ ধর্ম্ম,—যাহাকে জীবনী-শক্তি বলিতে পারা যায়,—তাহা একই প্রকারের। বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যেরও জীবনীক্রিয়াদি সম্বন্ধে পার্থক্য নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতা-তপাদিবোধ সকলেরই সমান। বস্তুতঃ মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। যা কিছু পার্থক্য, সমস্তই জাতিগত। সমষ্টির গুণের তারতম্যেই প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়।

মিশ্রজীবসমূহের কোষের আকার সাধারণতঃ অতিক্ষুদ্র, আর ঐ সকল কোষকে আহারান্বেষণের নিমিত্ত আদিজীবের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। স্থূলদৃষ্টিতে প্রধান প্রভেদ এইটুকু। কিন্তু বিশেষ পার্থক্য এই যে, মানবাদি শ্রেষ্ঠ জীবদেহের কোষসমূহ স্বাধীন ও স্বার্থপর নয়। যতদিন দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন প্রায় প্রত্যেক কোষকে অনবরত পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু কেহই স্বার্থের নিমিত্ত, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা পুষ্টির জন্য গতর খাটায় না;—সমষ্টির কল্যাণই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। ষোলআনার কল্যাণ হইতেই প্রত্যেক কোষ বা কোষপুঞ্জের ইষ্ট সাধিত হয়। সমকর্ম্মা বহুকোষের সংমিলনে প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের টিসু (Tissue) গঠিত হইয়াছে, এবং ঐরূপ বহু টিসুর সমবায়ে এক একটি শারীর যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এক একটি যন্ত্রের উপরে এক একটি কার্য্যের ভার অর্পিত আছে। যতক্ষণ যন্ত্রগুলি কার্য্যক্ষম থাকে, ততক্ষণই প্রাণ। পক্ষান্তরে, যতক্ষণ প্রাণের স্থিতি, ততক্ষণ একটি যন্ত্রও স্বকার্য্যে অবহেলা করে না।

হস্ত বহুপরিশ্রমে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া ও প্রাণপণ যত্নে উহার পারিপাট্য বিধান করিয়া মুখে তুলিয়া দিয়াই অবসর গ্রহণ করিল। স্থূলদৃষ্টিতে হাতকে বোকা বলিয়াই বোধ হইবে। সে তাহার পরিশ্রমার্জ্জিত সামগ্রীর সমস্তটা নিজেই ত উপভোগ করিতে পারিত? কিন্তু হাত নিঃসংশয়ে জানে যে, ঐ যে আহার্য্য

মুখবিবরকবলিত হইল, উহা হইতেই তাহার কল্যাণ সাধিত হইবে। এইরূপ প্রত্যেকে অপর যন্ত্রকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।

মুখে চর্ব্বণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে দন্ত ও রসনা প্রধান সহায় বটে, কিন্তু উহাদেরও সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বার্থ নাই। রসনা যেন একটু সৌখীন। সুখাদ্যের রসাস্বাদনসুখ একা তাহারই একচেটে; এটা ঝাল, ওটা নুনে পোড়া, অমুক জিনিসটা বাসী; ইত্যাদি নানাপ্রকারের খুঁটি নাটি সে সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কিন্তু দেহ-রূপ পুরীর প্রধান দ্বারের যে রক্ষক, সে অতটা সতর্ক না হইলে, অবাঞ্ছনীয় বহু পদার্থ অন্দরে চলিয়া যাইতে পারে। কেবল হাঁ করিলে ও ঢোক গিলিলে, কেবল ফাটক খুলিলে ও বিনাতর্কে আগন্তুককে শুদ্ধান্তে প্রবিষ্ট করাইলে, তাহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কাজেই দরোয়ানজীর মেজাজ অত খিট্‌খিটে। তাহার নিজের স্বার্থ কিছুমাত্র নাই, সকলই ষোলআনার জন্য।

তার পর উদর। ইহারও একটা ভারি দুর্নাম আছে।—নিজে দেহভূমির মধ্যস্থলটি অধিকার করিয়া সুদৃঢ় পঞ্জরপ্রাচীরপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। কখনও কোনও কাজে নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া অন্যের অর্জ্জিত ও আহৃত আহার্য্যের ধ্বংসসাধনই একমাত্র কার্য্য। অতএব উদর ঘোর স্বার্থপর; এবং উদরই আমাদের সকল যন্ত্রণার মূল! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদর নিতান্তই নিঃস্বার্থ ও পরমোপকারী। আহার্য্যকে নানা প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া পাকযন্ত্রের সাহায্যে তাহার সারাংশকে তরুণ শোণিতে পরিণত করিয়া শোণিতবহা নাড়ীর সূক্ষ্ম কৈশিকসমূহের মুখে পৌঁছিয়া দেওয়াই উহার প্রধান কার্য্য। অসারাংশকে অবিলম্বে নিষ্কাশিত করিয়া দেহভূমিকে নির্ম্মল রাখাও উদর যন্ত্রের অন্যতম কার্য্য। তা ছাড়া, তোমার শিরঃপীড়াই হউক, বা অঙ্গুষ্ঠের গ্রন্থিসমূহে মর্ম্মস্পর্শী বাতের বেদনাই হউক; অধিক কি, তুমি প্রসূতি, তোমার ঐ শিশুটি একটু বাল্‌সাক, বিকট বিস্বাদ দুর্গন্ধ ঔষধ খাইতে হইবে তোমার ঐ উদরকে। শরীর রাজ্যে উদর নামে যে একটা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ আছে, তাহার এক দিকে সাধারণ ধন বা আহার্য্যের ভাণ্ডার, অন্য দিকে রন্ধনশালা। রন্ধনশালার পার্শ্বেই কয়েকটি অত্যাবশ্যক মশলার কুঠরী আছে। ঐ সকল মশলার সাহায্যে রন্ধনক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। প্রকাণ্ড রাজ্যে কোষরূপী শ্রমজীবীরা যে যেখানে থাকিয়া থাটুক না, অন্যের জন্য তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না; যতক্ষণ ভাণ্ডারে কণিকামাত্র আহার্য্য থাকে, যতক্ষণ রন্ধনশালার উননে একটুও আগুন থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ উদর সকলেরই মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলিয়া না দিয়া থাকিতে পারে না।

শরীর-রাজ্যে 'দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে' যেরূপ সুশৃঙ্খলা দেখিলাম, অন্যান্য সমুদয় ব্যাপারে ঠিক ঐরূপ সুশৃঙ্খলাই বিদ্যমান। কোষদিগের কেবল আহার নয়, এমন কি, সকলের স্নানের নিমিত্তও সুব্যবস্থা আছে। স্নানাবশিষ্ট ক্লেদকলুষিত জল অবিলম্বে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া হয়। সকল কাজেই এইরূপ। যেখানে এরূপ সুনিয়ম, সেখানে নিয়ামকের সত্তা স্বতঃই অনুমিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, শরীর-রাজ্যের শাসনপ্রণালী বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

কোষসমূহকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। একশ্রেণী শাসক,—রাজার জাতি, ইহারা শ্বেতবর্ণ। অপর শ্রেণী শাসিত,—প্রজার জাতি, ইহারা বিবিধবর্ণ। রাজার জাতির রাজধানী রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে, সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকারে সুরক্ষিত। রাজধানীর সম্মুখে বড় বড় দুইটি ফটোগ্রাফের যন্ত্র বসান আছে। যে কোনও পদার্থ রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকৃতি তৎক্ষণাৎ উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রাজকীয় কোষগণসমীপে উপস্থাপিত হয়। রাজধানীর বামে ও দক্ষিণে দুইটি শব্দবহ যন্ত্র (telephone) স্থাপিত আছে। বাহিরে অতি দূরেও কোনও প্রকার শব্দ হইলে, সেই শব্দ রাজদুর্গাধীশ কোষসমূহে অবিলম্বে পৌঁছিয়া থাকে। এ ছাড়া দেশময় টেলিগ্রাফের তার বিস্তৃত আছে। অতি দূর প্রদেশে নখাদি সুদূর অন্তরীপ কেহ স্পর্শ করিলে, এমন কি, তেমন দূরের বনভূমিজাত কোনও একটি উদ্ভিজ্জের অগ্রভাগমাত্র কেহ একটু নমিত করিলে, সে সংবাদও তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে উপনীত হয়। যদি স্পর্শক্রিয়া অসদভিপ্রায়ে হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবিধানের উপায়ও তৎক্ষণাৎ অবলম্বিত হয়।

দেহ-রাজ্যে কিন্তু দুই প্রকার টেলিগ্রাফ আছে। এত ক্ষণ যাহার কথা বলিলাম, তাহা রাজকীয় তার, রাজার খাস বন্দোবস্তে চালিত। রাজধানীর পররাষ্ট্র-বিভাগ (Foreign Department) ইহার চালনা করিয়া থাকেন। বাহিরের সহিত সম্বন্ধই যে সমধিক গুরুতর। সমস্ত রাজনীতির উহাই ত একমাত্র ভিত্তি। সুতরাং রাজা এই টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত অন্যের হস্তে দিতে পারেন না। রাজ্যের হোম্ ডিপার্টমেণ্টের পরিচালনাধীন আর এক প্রকার তার আছে। এই শেষোক্ত তারের সহিত রাজার সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই—হোম্‌ডিপার্টমেণ্টের অনেক কাজই যে লোক্যাল্ সেল্‌ফ গবর্মেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির অধীন।—ইহাদের হেড্ অফিস সমূহ ঠিক রাজধানীতে না হইয়া, কশেরুকা নামক সহরতলীতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদূর বিস্তৃত—প্রায় ধর,—ধাপা পর্য্যন্ত। কোনও কোনও কার্য্যের অর্দ্ধেক ফরেন্ ডিপার্টমেণ্টের, আর বাকিটা হোম্ ডিপার্টমেণ্টের আয়ত্ত। এই দেখ না, দক্ষিণ

হস্তের ব্যাপারে হস্ত, মুখ, দন্ত ও রসনা দ্বারা যতটুকু কাজ হয়, তাহার জন্য ফরেন্ ডিপার্টমেণ্ট সম্পূর্ণ দায়ী ;—তাহার পরিচালনা হয় খাস রাজধানী হইতে। কিন্তু গলাধঃকরণ হইবামাত্রই উক্ত ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্ব রহিত হয়, আর তন্মুহূর্ত্ত হইতে ধাপায় পৌছান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই মিউনিসিপ্যালিটির অধীন। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যও শ্বেতকোষবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু উহারা রাজধানীর খাস শ্বেত-কোষ নয়। উহাদের কার্য্যাকার্য্যের বিবরণ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাজধানীতে পৌঁছে না। সাধারণতঃ, মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যবিশেষে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, রাজ-ধানী হইতে তাহার প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবিত হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রেষ্ঠজীব মানবের শরীরে নিখুঁৎ সমাজগঠনের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। কোনও মনুষ্যসমাজ বুঝি উন্নতির অত উচ্চশিখরে আজও উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা উন্নতি করিতেছেন, বা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে ঐ অভ্রান্ত আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে। এই আদর্শের আলোচনা করিলে আমরা সামাজিক অনেক গূঢ় ও জটিল সমস্যার সুমীমাংসায় অনায়াসে উপনীত হইতে পারি। কঠোর জীবনসংগ্রামে জাতিবিশেষ কেন ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেছে, আবার তাহারই প্রতিবেশী অন্য এক জাতি তরতর করিয়া উন্নতির পথে কেন অগ্রসর হইতেছে, অতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটু চিন্তা করিলে জাতীয় উন্নতির দুইটি মূলমন্ত্র সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়,—**কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ।** যদি কোনও জাতি সগৌরবে টিকিয়া থাকিতে অভিলাষ করে, তবে তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ঐ দুইটি মূলমন্ত্র জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে জাগরূক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দুইটিই বা বলি কেন? ধরিতে গেলে মূলমন্ত্র একটিমাত্র—'**স্বার্থত্যাগী হইয়া কর্ত্তব্য পালন কর।**' কথাটা ভারতে ভারতেরই মত পুরাতন, উহাই ত আমাদের গীতার মূলধর্ম্ম ; কিন্তু হায়! আমরা উহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। মুখে উহার আবৃত্তি খুবই করি, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!

ঠিক্ ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন অতি শুভমুহূর্ত্তে নিদ্রাবিহ্বল জাপানের কানে কানে কোনও অনুকূল ইষ্টদেবতা, কেমন করিয়া জানি না, ঐ মহামূলমন্ত্রটি নিষিক্ত করিয়াছিলেন ; সহসা সেই দিন সকলে সনাতন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি একেবারে ভুলিয়া গিয়া একপ্রাণে একটি প্রবল নূতন জাতি গড়িতে বসিয়া গেল। মহামন্ত্রী শোগুণ পূর্ব্বে সম্রাট্‌কে সাক্ষিগোপাল রাখিয়া নিজে বংশানুক্রমে রাজত্ব করিতেন ; তিনি তদ্দণ্ডেই আপনার সেই সুদুর্লভ

স্বত্ব অম্লানবদনে মিকাডোর হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভূস্বামী দাইমীগণ সমগ্র দেশটাকে আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকে স্বাধীন নৃপতির ন্যায় স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে পূর্ব্বে বিরাজ করিতেন; তাঁহারাও সেইদিন মিকাডোর পদপ্রান্তে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং 'দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতের জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে, প্রভো, আদেশ করুন!' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যুক্তকরে সম্রাট্‌সকাশে দণ্ডায়মান হইলেন। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া সেই প্রথম জন্মভূমিকে আকুলপ্রাণে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। কি চমৎকার শুভফল! সেই দিন যে জাতিটির জন্ম হইল, আজ তাহার বয়স সবেমাত্র ছত্রিশ বৎসর। এই শিশু জাতিটির শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম দেখিয়া এই মুহূর্ত্তে জগদ্‌বাসী স্তম্ভিত, বিমোহিত, বিস্ময়বিহ্বল। কিসে এমন হইল, স্বয়ং জাপান কিন্তু তাহা অভ্রান্ত ভাষায় সকলকে বলিয়া দিতেছেন। স্বদেশের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কুড়ি জন লোকের জীবন উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন হইলে যে জাতির দুই হাজার বীর তদ্দণ্ডেই সেই সম্মানের প্রার্থী হয়, সে জাতির গৌরবের মূলমন্ত্র অবোধ্য ভাষায় রচিত নয়।

দুইটি চরমসীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। জীব-জগতে এক সীমায় নিতান্ত হীনাবস্থ কোষৈকসম্বল অসম্পূর্ণ আদিজীব; অপর সীমায় পূর্ণতার আদর্শ মানবদেহ। জাতিসমূহের এক দিকে অষ্ট্রেলিয়ার বুশম্যান্ প্রভৃতি; অপর দিকে ইংরাজ, জাপানী প্রভৃতি বীরের জাতি।

এখানেই প্রবন্ধের 'ইতি' দিতে পারিলে আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। কিন্তু আমরা নির্ল্লজ্জ জাতি কি না, তাই এখন যে কথাটি তোলা আবশ্যক, কিন্তু না তোলাই উচিত ছিল, তাহা চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না, এবং চাপিয়া রাখিলে তোমরাও আমাকে সহজে ছাড়িতে না। কথাটি এই,—আমরা কোন্ পর্য্যায়ের? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবার পূর্ব্বে আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—মা ধরিত্রী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া কলঙ্কিত কালা মুখ চিরতরে ঢাকিয়া ফেলি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে আজও এমন এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বাহ্বাস্ফোটপূর্ব্বক অম্লান-বদনে বলিতে পারেন,—বাঃ, আমারই ত জগতের জাতিসমূহের শীর্ষস্থানীয়; আমাদেরই নিকট সমস্ত জগৎ একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছে, আমাদের সমাজগঠন নিখুঁৎ—ইত্যাদি ইত্যাদি,—'কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?' পর্য্যন্ত। ইহাদের কেহ কেহ বলেন, ভারত

ভৌতিক উন্নতি না করুক, প্রবলজাতিসমূহকে বৈদান্তিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারিলে, সকলের গুরুস্থানীয় থাকিয়া যথেষ্ট সম্মানার্হ হইবে। ইঁহাদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। ইঁহারা স্বচ্ছন্দে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত সুদীর্ঘ থলিয়া শেলাই করিতে থাকুন! আমি দূর হইতে নমস্কার করিতেছি, এবং দক্ষিণার মৎপ্রাপ্য অংশের সম্পূর্ণ স্বত্ব দ্বিধাশূন্য হইয়া ত্যাগ করিতেছি। কেবল শিক্ষা দিয়া, কেবল মাষ্টারী করিয়া, কি জীব-জগতে, কি মনুষ্য-সমাজে, কেহ বড় হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাই না।

কাহারও কাহারও মত একেবারে বিপরীত। ইঁহারা বলেন, আমরা আর জীবিত নাই,—অনেক পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে পৃথিবীতে এমন অনেক জীব ছিল, যাহাদের এক্ষণে অস্তিত্বলোপ হইয়াছে। আমরা তাহা হইলে উহাদেরই অন্যতমের সমস্থানীয়—আর্ম্মাডিলো, ম্যাষ্টোডন্ প্রভৃতির সমতুল্য। এইরূপ অনুমানের বৈজ্ঞানিক হেতু এই যে, মৃতদেহের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ আমাদের জাতীয়দেহে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। একটি লক্ষণ এই যে, সমস্তদেহব্যাপী একটা স্পন্দন আমাদের জাতিতে পরিলক্ষিত হয় না। জীবিতদেহে কোথায় নিভৃত বক্ষোগহ্বরে থাকিয়া হৃদ্‌যন্ত্র স্পন্দিত হয়, আর যুগপৎ সর্ব্বশরীরে সেই স্পন্দন ঠিক্ তালে তালে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। যাহার স্পন্দন নাই, তাহার মৃত্যু হইয়াছে বৈ কি? মৃতদেহের আর একটি লক্ষণ এই যে, শারীর উপাদানগুলি চিরন্তন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। সর্ব্বপ্রথমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তৎপরে মাংসপেশীগুলি গলিত হইয়া বহুবিধ পরপুষ্টজীবের আধারভূত হয়; ক্রমে রসভাগ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উড়িয়া যায়; অবশেষে অস্থিসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরার ধূলির সহিত মিশিয়া যায়। স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্লেষণের চূড়ান্ত উদাহরণ।

ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা অনেকগুলি মৃত ও মুমূর্ষু জাতির পরিচয় পাই। তাহাদের কাহারও কাহারও অস্থি পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে, যেমন ব্যাবিলনিয়ান, ফিনিশিয়ান, কার্থেজিয়ান প্রভৃতির। আজ ঐ সকল পুরাতন জাতির পরিচয় দিবার জন্য একটি প্রাণীও নাই। কাহারও কাহারও দেহের কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু জীবিত অবস্থার অবয়বের সহিত তুলনা করিলে চিনিতে পারা যায় না; আর প্রায়ই ইহাদিগকে পরপুষ্টগণ পাইয়া বসিয়াছে; যেমন গ্রীক্, মৈশর, পারসীক প্রভৃতি। যাঁহারা বলেন, আমরা মরিয়াছি, তাঁহারা আমাদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে চান। মুমূর্ষুদিগের মধ্যে তুরস্ক ও চীনের

এক্ষণে নাভিশ্বাস উপস্থিত; স্পেন ও পর্টুগালকে দৈন্য জবাব দিয়াছে; আর ফ্রান্স জরা অনুভব করিতেছে।

কি কি কারণে কোনও একটি জাতির মৃত্যু ও লোপ হয়, তাহারও মীমাংসা জীব-জগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোনও জীবের লোপ পাইবার প্রধান কারণ এই যে, উহারা পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপযোগিতার তারতম্যবিধান করিতে কালবশে অক্ষম হইয়া পড়ে। এই অসামর্থ্যে পদে পদে পদস্খলন হওয়ায় ক্রমে নিজে পশ্চাৎপদ ও প্রতিদ্বন্দিসমূহ প্রবল হইয়া উঠে,—চরম ফল অস্তিত্বলোপ।

তবে কি আমরা সত্য সত্যই মরিয়াছি? ইতঃপূর্ব্বে ভারত কি কখনও 'এক' হইতে পারিয়াছিল? একচ্ছত্রাধীন না হইলে কোনও দেশ 'এক' হইতে পারে কি? পুরাকালে ভারতকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য নরপতি রাজত্ব করিতেন; ইহারা প্রায় পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। এমন স্থলে সমগ্র ভারতে যুগপৎ স্পন্দন কখনও সম্ভবপর ছিল কি? পুরাকালে ভারতের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার কোনটি সমষ্টির চেষ্টার ফল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কদাচিৎ কোনও রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; কেহ বা স্থপতিশিল্পের উন্নতিকল্পে যত্ন করিতেন; কেহ বা ভাস্করশিল্পের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন;—এই প্রকার যা কিছু উন্নতির আজও নিদর্শন পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলমাত্র। ফলতঃ ইদানীং জাতীয়তা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কখনও ভারতে পরিস্ফুট হইয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ হিসাবে আমাদিগকে মৃত না বলিয়া অসম্পূর্ণ জীবের পর্য্যায়ে রাখিলে নিতান্তই অসঙ্গত হয় কি? তাহা হইলে একটু আশায় বুক বাঁধিবার অবসর পাই যে! যে মৃত, তাহার ত আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই, তার ত সব ফুরাইয়াছে। মরার উপরে যে আর গালি নাই!

না, না,—আমাদিগকে মরা বলিও না। ঐ যে জড়তা এখন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, উহা কৌষেয়-কীটের কুম্ভক অবস্থার বিকল্প হইতেও ত পারে? কে বলিতে পারে যে, জড়তা ও সংকীর্ণতারূপী ঐ দুশ্ছেদ্য আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া চারুচাকচিক্যশালী উড্ডয়নশীল নবশরীর দেখাইয়া একদিন আমরা জগৎকে বিমোহিত করিব না? কিন্তু মনে থাকে যেন, কৌষেয়-কীট যে আকারে কোষে প্রবেশ করিয়া কুম্ভকে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত পক্ষধারী নবশরীরের কিছু-মাত্র সৌসাদৃশ্য থাকে না। আমরা যা ছিলাম, আবার তাই হইতে চেষ্টা করিলে

সকলই পঙ্গু হইবার সম্ভাবনা। কোষে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সুশ্যামল মাতৃভূমিতে কীটের প্রিয়ভোজ্য পত্রপল্লব বহুলপরিমাণে ছিল—তখন ব্যাকরণ সাহিত্য ষড়্-দর্শনাদি মহীরুহের শ্যামলপত্রচর্ব্বণে পটুতা দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ হইত; কিন্তু ইতোমধ্যে জননী ধরিত্রী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—কিশলয়ের উপরে স্তরে স্তরে থরে থরে নববিকশিত কুসুমদাম সজ্জিত রাখিয়া, ঐ শুন, মা স্নেহভরে 'আয় রে বাছা সকল' বলিয়া ডাকিতেছেন,—এখন পত্রচর্ব্বণবৃত্তি পরিহার করিয়া, মধুচয়নপটু না হইলেই নয়। কীট হইয়া থাকিলে, ভাই, কেমন করিয়া মধুচয়ন করিবে?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

যে হেতু ও সে হেতু।

১

দীনু সরকারের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সংসারের ঘটনাবলীর সচরাচর একটা কারণ থাকে। কোন ঘটনার একটার অধিক কারণও থাকে, এবং কোনটার বিশেষ কারণ আপাততঃ থাকে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পায়।

যে হেতু বিবাহ করিলে প্রায় পুত্র কন্যা জন্মিয়া থাকে, অতএব দীনুর পিতার ভাগ্যে দীনু জন্মিয়াছিল। এবং সে হেতু দীনুর মাতার পুত্রসাধ মিটিয়াছিল। অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া দীনুও অপর্য্যাপ্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

যে হেতু মাতৃস্নেহ হইতে গাঢ়তর স্নেহ জগতে বিরল, অতএব দীনু আদরে বাড়িয়া 'বুদ্ধিতে খাট' হইয়াছিল। দীনু দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু তাহার পিতা মাতা কেহই সুশ্রী ছিল না। ইহার কারণ আপাততঃ কিছুই বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইবে।

দীনুর পিতার, দীনুর মাতার ও স্বয়ং দীনু সরকারের ও পাওনাদার প্রভৃতির যুক্ত অদৃষ্টক্রমে দীনুর পিতার হঠাৎ কাল হইয়া গেল। যে হেতু স্বামী মানবলীলা-সংবরণ করিলে স্ত্রী বিধবা হইতে বাধ্য, সে হেতু দীনুর মাতা বিধবা হইল।

সামান্যমাত্র অন্নের সংস্থান রাখিয়া দীনুর পিতা ভবধাম হইতে স্বর্গধামে গিয়াছিলেন। অতএব দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া অনাথা বিধবাকে দীনুর ভরণপোষণ ও অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দীনু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিল, "দীনু, লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও।" অতএব দীনু সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

দীনুকে সকলেই ভালবাসিত।

২

যে হেতু অতি বৃদ্ধ হইলে প্রায় বাঁচে না, সে হেতু দীনুর মাতা মরিয়া গেল। দীনুর মাতা মৃত্যুকালে দীনুকে দীনুরই হাতে সঁপিয়া গেল, যে হেতু আর কেহ ছিল না।

মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দীনু সন্ধ্যাকালে ভগ্ন বাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কাঁদিল। যে হেতু দীনুর বুদ্ধি নিতান্ত প্রখর ছিল না, এবং পূর্ব্ব হইতে দুঃখে, যত্নে, স্নেহে লালিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার অধিকমাত্রায় কাঁদিবারই কথা।

দীনুর যে গ্রামে বাস, সেই গ্রামের জমীদার অটল বসু ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। দীনুর পিতার জীবদ্দশায় বসুজা মহাশয় অনেকবার দীনুকে "ঘরজামাতা" করিবার অভিপ্রায়ে তস্য পিতার নিকট প্রস্তাবনা উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

ক্রন্দনাদি সমাধান করিয়া ও সংসারের শূন্যতা প্রভৃতি অনুভব করিয়া দীনু সরকার নত ও দুঃখ সন্তপ্ত-বদনে বসুজা মহাশয়ের বহির্বাটীতে মুণ্ডিত-মস্তকে উপনীত হইল। যে হেতু অনেক বাকী খাজনা জমীদারের প্রাপ্য ছিল।

অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর-মুখশ্রী-যুক্ত যুবকের পরিচিত মস্তকে ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশের অভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বসুজা মহাশয় দুঃখিত হইলেন; যে হেতু স্বার্থ ও নিঃস্বার্থভাব উভয়ই দুঃখস্রোত-পরিচালনার উপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল।

৩

অতএব বসুজা মহাশয় বলিলেন, "দীনু তোমার এই দুরবস্থার সময় আমি বাকি খাজনার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না।"

দীনু সে হেতু করযোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বসুজা মহাশয় পুনর্ব্বার বলি-লেন, "দীনু তোমার মাথার উপর এখন কেহই নাই, এবং সংসার বড় ভীষণ স্থান। তোমার বুদ্ধি কম, কিন্তু তুমি সুন্দর, সুশীল ও সচ্চরিত্র। এমন অবস্থায় তোমাকে পুত্রপদে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছি।

"যে হেতু আমার পুত্রসন্তান নাই, অতএব পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে সকলে পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে আমার একমাত্র আদরের কন্যা মাতঙ্গিনীর ভবিষ্যতের অবস্থা ভাল না হইতে পারে। সে হেতু আমার ইচ্ছা, তোমাকে গৃহ-

জামাতা করতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদিগের পুত্রসন্তানের মুখ দেখিয়া আমি মনের আনন্দে সংসার হইতে অপসৃত হই।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া বসুজা মহাশয় গোমস্তাকে বলিলেন, "দেখ, দীনু সরকার অদ্য হইতে আমার গৃহজামাতা, এবং বিষয়ের উত্তরাধিকারী; যে হেতু তিন কুলে আমার কোন আত্মীয় স্বজন নাই। সে হেতু দীনুর পুরাতন বাটী ভূমিসাৎ করতঃ অচিরাৎ তাহার মাল মশলা সংগ্রহ করহ। উহা দ্বারা বাকি খাজানা শোধ হইবে। দীনুর স্থাবর সম্পত্তি দুই এক টাকা মূল্যের যাহা আছে, বেচিয়া খাতায় জমা কর।

"যে হেতু দীনু এখন আমার উইল অনুসারে অত্রস্থ জমিদারীর মালিক হইবে, এবং আমার গৃহজামাতা হইবে, সে হেতু তাহার পূর্ব্বপুরুষের ও পূর্ব্ব বাসস্থানের চিহ্ন রাখা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

৪

গোমস্তা হুকুম পালন করিতে গেল। পিতৃ-মাতৃ-ভিটা-হীন দীনু স্বীয় অবস্থার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া বসুজার পুষ্করিণীর পাড়ে জল খাইতে গেল। যে হেতু এবংবিধ ব্যাপারে তাহার দারুণ তৃষ্ণা লাগিয়াছিল। দীনু বাল্যসখী মাতঙ্গিনীকে বড় ভয় করিত; কারণ, মাতঙ্গিনী বয়সে দীনু অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট হইলেও, আয়তনে ও বলবুদ্ধিতে দীনু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সময় পাইলে সে দীনুকে চড়টা, চাপটা, ইঁট পাট্‌কেলটা মারিত। যে হেতু তাহার স্মৃতি দীনুর মানসপটে অঙ্কিত ছিল, সে হেতু দীনুর অন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল।

সে হেতুই দীনু গাভীর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত জলপান করিয়া গ্রাম্য স্কুলের দিকে গেল, এবং ভূতপূর্ব্ব শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বেশ্বর দা', বিবাহ হইলে স্ত্রী কি মারিয়া থাকে?"

বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক তাবৎ বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দীনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দীনু বাবু, আপনার অদৃষ্ট ভাল। তামাক্ ইচ্ছা করুন।'

দীনু সরকার সে হেতু ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের সম্মুখে সভয়ে তামাকু পান করিল, এবং আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মাষ্টার পুনরপি বলিলেন, "যে হেতু আপনি ভবিষ্যতে পরগণা শিবহাটীর ষোল-আনার মালিক, আপনার স্ত্রীর নিকট মারি খাইতে কোন আপত্তি উত্থাপন করা উচিত হয় না, সে হেতু অধিক বলা বাহুল্য—"

দীনু আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিল, যে হেতু অন্য কোনও উপায় ছিল না।

৫

বহু আড়ম্বরে, ঘোরতর বাদ্যভাণ্ডের সহিত একদা রাত্রিকালে দীনুর বিবাহ হইয়া গেল। যে হেতু বিবাহ রাত্রিকালে হইয়া থাকে।

সকলে সে হেতু বলিল, "দীনুর কপাল ভাল। পথের ভিখারী হঠাৎ এত বড় উচ্চপদস্থ হওয়া, ইহা কি আমার তোমার পক্ষে সম্ভবে? এই জন্যই দীনুকে এত সুন্দর করিয়া বিধাতা গড়িয়াছিলেন; এই জন্যই দীনু এত সুধীর শান্ত; ওঃ! সেই হেতু।"

ইহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে দীনবন্ধুর শরণাগত হইল, এবং সে হেতু দীনু সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদি করিয়া চা খাওয়াইল। যে হেতু (ইহাও জানা থাকে যে) দীনু পূর্ব্বে অনেকের বাটীতে সকালে বিকালে চা খাইয়া আসিত।

বিবাহের কিছুদিন পরেই আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি দীনুকে বুঝাইয়া এবং কন্যা মাতঙ্গিনী দেবীকে দীনুর ভার সমর্পণ করিয়া, এবং গোমস্তা পরমবৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ দাসকে সাক্ষী রাখিয়া, বৃদ্ধ বসুজা বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দীনুর মুখ শুখাইয়া গেল, যে হেতু, তাহা বলা বাহুল্য। দীনু বলিল, "প্রতিপালক! এ সময়ে তীর্থে না গিয়া—"

মাতঙ্গিনী সরোষে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "চোপ্! বাবা তীর্থে যাবেন না ত আমাদের আঁচল ধ'রে বসে থাক্‌বেন?"

দীনু বলিল, "অবশ্য—সে কথা ঠিক—"

জামাতার উপর পুত্রীর প্রতাপ অন্তরে লক্ষ্য করিয়া বসুজা মহাশয় সানন্দে মালা জপ করিলেন, এবং বলিলেন, "দেখ নিতাই, আমাদের দীনু কি শান্ত ছেলে!"

নিত্যানন্দ সে হেতু বলিল, "প্রভুর ইচ্ছা—সকলই প্রভুর ইচ্ছা!" এবং চক্ষু উল্টাইয়া স্বর্গের দিকে আরোপিত করিল।

সেইদিনই বসুজা মহাশয় বৃন্দাবনে গেলেন, এবং যাইবার সময় কন্যাকে বলিলেন,—"মা, দীনুকে দেখো; তোমার পুত্রসন্তান হইলে আবার আসিব; দীনুকে দেখো, তার মাথার উপর কেহই নাই।"

কন্যা বলিল, "কোনও ভয় নাই, বাবা, তুমি যাও।"

সে হেতু বসুজা মহাশয় গেলেন।

৬

ক্ষীর, সর, নবনী, রোহিত মৎস্যাদি প্রচুরপরিমাণে সেবা করিয়াও দীনু ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। যে হেতু—কেবল খাইলেই যে সকলে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা নহে।

সেইদিন মাতঙ্গিনী দীনুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ তুমি রোগা হইতেছ, ইহার কারণ কি?"

দীনু। বোধ হয়—যে হেতু আমার রোগা ধাত্।

মাতঙ্গিনী। দেখ, আমার সঙ্গে চালাকী খাটিবে না—তুমি চা ছাড়িয়া দাও; আর অত রাত্রি জাগিয়া ইয়ারদের সঙ্গে পাশা খেলিও না। ফের যদি কথা না শুন, তবে বুঝা যাইবে।

বাটীর মধ্যে চা বন্ধ হইয়া গেল, এবং সেইদিন হইতে আজ্ঞাধীন পরমবৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ দাসের তদ্বিরে ইয়ারগণ সন্ধ্যার সময় ভদ্রাসনে আর প্রবেশ করিতে পারিল না।

সে হেতু দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় এবং পুনর্ব্বার সকালে, উপর্য্যুপরি নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিল। যে হেতু চা না খাইলে একটা কিছু খাওয়া চাহি, এবং তাহা না খাইলে নিদ্রাভিভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এ দস্তুর বন্ধ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর মাতঙ্গিনী দাসীর রোষ বর্দ্ধিত দেখিয়া দীনু পূর্ব্বাপেক্ষা ভয় পাইল। এবং একদিন নিদ্রার আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া দীনু দুইটা কঠিন চাপড় খাইল।

এবং মাতঙ্গিনী রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল, "তুমি নিতান্ত অকর্ম্মা এবং অলস। তোমার হাতে পড়িয়া আমার ইহকাল পরকাল গেল। হায়! হায়! বাবা কি অন্য পাত্র খুঁজিয়া পান নাই?"

যে হেতু মাতঙ্গিনী এবম্প্রকারে ঘোররবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে হেতু দীনুকে তাহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া কাতরস্বরে বলিতে হইল, "ওগো! তুমি কেঁদ না; আমি দরিদ্র, অভাগা, পথের ভিখারী; ইহার উপর অশান্তি ও ক্রন্দন প্রভৃতির যন্ত্রণা সহ্য করিতে আর পারি না, ওগো! থাম।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তবে তুমি অত ঘুমাইও না। বরঞ্চ আমি ঘুমাইলে মাথায় বাতাস করিও।"

৭

সে হেতু দীনু প্রতিদিন মাতঙ্গিনী শুইলে তাহার মাথায় বাতাস করিত, এবং বাতাস করিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িত।

তাহারই মধ্যে একদিন মাতঙ্গিনীর ঘোর নিদ্রাবস্থা লক্ষ্য করিয়া দীনু বিমল বাতাস খাইতে খিড়কী পুষ্করিণীর দিকে গেল। তখন দ্বিপ্রহর।

দীনু একটা কামিনীগাছের সুশীতল ছায়া দেখিয়া সেখানে গিয়া বসিয়া পড়িল,

এবং যে হেতু তাহার মনের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল, সে হেতু আকাশ পাতাল ভাবিয়া দীনু কাঁদিতে লাগিল।

দারুণ রৌদ্র, তাহার উপর জ্যৈষ্ঠ মাস। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই সন্তপ্ত। এমন সময় কামিনী বৃক্ষের তলে একটা লোককে কাঁদিতে দেখিয়া পুষ্করিণীর জলে অর্দ্ধমগ্না ও অর্দ্ধনগ্না একটি বালিকা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লুক্কায়িতভাবে বৃক্ষের দিকে গেল।

কিন্তু বিধির লিখন! দীনু তাহা দেখিতে পাইল, এবং বালিকাও তাহা বুঝিল।

দীনু ডাকিল, "কে ও, সরলা!"

সরলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল, "আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?"

দীনু বলিল, "যে হেতু আমি অভাগা।" সে হেতু কি ভাবিয়া সরলাও কাঁদিল।

অনেক দিনের কথা—দীনুর মাতা বলিয়াছিল, "বাবা, আমাদের যদি অবস্থা ভাল হয়, তবে তোর সঙ্গে সরলার বিবাহ দিব।"

সরলা মিত্রদিগের কন্যা। লাবণ্যভরা—সুন্দরী, স্নেহের আধার। তিন বৎসর পূর্ব্বে শিবহাটীর হাটে মাছ কিনিতে গিয়া সরলা বর্ষাকালে কর্দ্দমে আছাড় খাইয়াছিল, এবং দীনু তাহাকে স্কন্ধে করিয়া খাল পার করিয়া দিয়াছিল। সেই দিন হইতে দীনুর সুন্দর মুখ ও কোমল হৃদয়ের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে সরলার মনে জাগিত। সে হেতু বোধ হয় দীনুরও জাগিত।

দীনু বলিল, "সরলা! মাতঙ্গিনী আমাকে ধরিয়া মারে।"

সরলা বলিল, "তুমি পালাইয়া যাও না কেন?"

দীনু। কোথায় যাব?

সরলা ভাবিল, "তাই ত!"

সরলার রুচিমুখ ম্লান হইয়া গেল। দীনু সে হেতু চক্ষের জল মুছিল। অর্থাৎ—জগতে কেহ ভালবাসিলে কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা করে না।—

৮

সরলা দুই তিনবার অনিমেষনয়নে দীনুর মুখ পানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

তাহা ঊর্দ্ধ হইতে মাতঙ্গিনী দেখিয়াছিল। যে হেতু মাতঙ্গিনী নিদ্রাভঙ্গের পর বিস্ফারিতনয়নে ত্রিতল ছাতে আরোহণপূর্ব্বক দীনুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

মাতঙ্গিনী কম্পিতা হইয়া পড়িল। যে হেতু দৃশ্যটা কিছু অভাবনীয়, স্বপ্নের এবং চিন্তার অগোচর।

দীনু ফিরিয়া আসিলে মাতঙ্গিনী বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

দীনু। ঘাটের ধারে।

মাতঙ্গিনী। কেন ?

দীনু।—ঘুম পাইয়াছিল, সে হেতু রৌদ্রে বেড়াইতেছিলাম।

মাতঙ্গিনী। আর কে ছিল ?

দীনু। কৈ, তা আমি দেখি নাই।

এই অভূতপূর্ব্ব মিথ্যা কথায় মাতঙ্গিনীর আর সন্দেহ রহিল না। মাতঙ্গিনী ঘোর রবে বলিয়া উঠিল, "তোমার এই কাজ ? ওঃ বিশ্বাস ঘাতক !—"

এবং মূর্চ্ছাসংবরণ করিয়া মাতঙ্গিনী ডাকিল, "নিত্যানন্দ ! এস ত !"

পরম বৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ মালা হাতে করিয়া আসিল। যে হেতু বিপৎকালে জপ করাই উত্তম কল্প।

মাতঙ্গিনী বলিল, "উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধ।"

দীনু সে হেতু একটু অপমানিত বিবেচনা করিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "কেন, আমার দোষ কি ?"

"দোষ কি ?" বলিয়াই মাতঙ্গিনী একটা প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল, এবং সেই মুষ্ট্যাঘাত নিবারণ করিতে গিয়া নিত্যানন্দ দীনুর উপর পড়িয়া গেল, এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া মাতঙ্গিনীর আজ্ঞাক্রমে দীনুর হাত পা বাঁধিল, এবং রামসিংহ দরওয়ানের সাহায্যে সকলে তাহাকে ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে শিমুল বৃক্ষের গোড়ায় বাঁধিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "সকলে দেখুক, পরনারীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্বামীর কি শাস্তি হইয়া থাকে।—"

দীনু কাতরস্বরে বলিল, "ওগো ! আমি দৃষ্টিপাত করি নাই, আমি অশ্রুপাত করিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া সরলা কাঁদিয়াছিল।"

মাতঙ্গিনী বলিল "আচ্ছা, সরলা আবার কাঁদুক, এবং তুমি আবার কাঁদ। দেখি কে কত কাঁদিতে পার !"

এইরূপে শিবহাটীর ষোল আনা জমীদারীর মালিক শিমুল বৃক্ষের তলায় বন্ধনদশায় পড়িয়া রহিলেন।

৯

কেন যে এই দশা ঘটিল, তাহা সকলের জানা সম্ভবপর নহে। রামসিংহ বলিল, "উঁহার মেষ রাশি, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে মেষের বন্ধন-ভয়, এইরূপ পঞ্জিকায় প্রকাশ, সেই হেতু।"

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ বলিল, "ওঃ শাস্ত্র কি সত্য! এবং পঞ্জিকায় ইহাও প্রকাশ যে, আষাঢ় মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, সে হেতু কি বিবেচনা করহ?"

ঘোরা রজনী। মাতঙ্গিনী পরিশ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তা, এবং দ্বারবান রামসিংহ পুষ্করিণীর পাড়ে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত।

দীনু বলিল, "রামসিং! একটু চা খাওয়াইতে পার?" যে হেতু দীনুর তৃষ্ণা পাইয়াছিল।

রামসিংহ বিশ টাকায় রফা করিয়া দীনুর জন্য চা আনিতে গেল। উদ্যান পার হইতে না হইতে একটি বালিকা আসিয়া রামসিংহের পদযুগল জড়াইয়া ধরিল।

সরলা বলিল, "রামসিং! দীনুকে ছাড়িয়া দে, আমি তোর জন্য এই সোনার মালা এনেছি।"

রামসিংহ বহু চিন্তাপূর্ব্বক কহিল, "আচ্ছা, কিন্তু বাবুকে গ্রাম হইতে পলায়ন করিতে হইবে।"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বেশ।"

রামসিংহ চা আনিতে গেল, এবং সোনার মালা পাগড়ীর মধ্যে রক্ষা করিল; যে হেতু তাহার কোর্ত্তায় পকেট ছিল না।

ইত্যবসরে সরলা ধীরে ধীরে দীনুর নিকট গিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং একবার কম্পিতস্বরে বলিল, "পলাও।"

দীনু বলিল, "আমি এখনও চা খাই নাই।"

সরলা। আমাদের বাড়ীতে চা আছে, সেখানে খাবে চল।

দীনু সরলাদের বাড়ী গেল। সরলা তাহার অগ্রজ সুধীর মিত্রের পোর্টম্যাণ্টো হইতে চা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি জল গরম করিল, এবং রন্ধনশালা হইতে চিনি আনিয়া একবার হতাশভাবে বলিল, "দুধ নাই।" যে হেতু অত রাত্রিতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না।

১০

দীনু বলিল, "দুগ্ধের আবশ্যক নাই।" অতঃপর দীনুর চা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রায় দুই মাস ধরিয়া দীনু চা খায় নাই।

দীনু বলিল, "সরলা, তুমি আজ আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছ। আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু মনে রেখো—আমি সংসার হইতে চলিলাম—যেখানেই যাই, তোমার স্নেহ সহৃদয়তা অনুক্ষণ ধ্যান করিব।"

ইহার পর সেই রাত্রিকালে নব্য উকীল সুধীর মিত্রজা মহাশয়ের সহিত

দীনুর কি পরামর্শ হইল, এবং পরদিন প্রভাতে শিবহাটীর ষোল আনা মালিক নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন।

রামসিংহ চীৎকার করিয়া সকলকে বলিল, "কি প্রতাপ! বাবু দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছেন, এবং গ্রামশুদ্ধ লোক কি হারামজাদা! কেহ আমার আর্ত্তনাদ শুনিল না?"

সকলে বলিল, "বাকি খাজনার দায়ে লোকটা ঘরজামাতা হইয়াছিল, এখন যথাসর্ব্বস্ব সুবর্ণ ও জহরাৎ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

কেবল ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলিল, "না।"

যে হেতু সে সকল কথা জানিত।

১১

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ মাতঙ্গিনীর সহিত বৃন্দাবনে গেল, এবং যথাক্রমে উভয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত বসুজা মহাশয়কে জানাইল।

বসুজা মহাশয় মালা জপিতে জপিতে বলিলেন, "ব্যাটা কি হারামজাদা! উহার পেটে এত বুদ্ধি ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

নিত্যানন্দ! সে হেতুই এই ঘটনা।

বসুজা মহাশয় সরোষে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "কুছ পরওয়া নাহি, উহার নামে বাকি খাজনার নালীশ করহ, এখনও তামাদি হয় নাই।"

বসুজা মহাশয় তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং সে হেতু মাতঙ্গিনীও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; এবং বাকি খাজনার নালিশও হইল।

কিন্তু এ দিকে সুধীরচন্দ্র মিত্র অন্যায় উৎখাতের বর্ণনা করিয়া দীনুর তরফে বসুজা মহাশয়ের নামে নালিশ ঠুকিয়া দিল।

উভয় পক্ষের সমান অবস্থা, সে হেতু সকলে পরস্পর রফা করিতে বাধ্য হইলেন।

রফার সর্ত্ত এই,—দীনু মাতঙ্গিনীকে বৈষ্ণবধর্ম্মানুসারে খালাস দিবে, এবং মাতঙ্গিনী ইচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

অতএব আষাঢ় মাসে দীনু বৈষ্ণব হইল, এবং খালাস পাইয়া কলিকাতায় গেল। সেখানে কোন সাহেব দীনুর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিল, "যে হেতু তুমি নিরেট মূর্খ, অথচ সৎ, সে হেতু তোমাকে আমার হাউসের মুৎসুদ্দি করিয়া দিলাম।"

শুনা গিয়াছে, সুধীর মিত্র দীনুর জামিন স্বরূপ দশ হাজার টাকা হাউসে আমানত রাখিয়া দীনুকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সে হেতু কৃতজ্ঞতার আবেগে দীনু সরলাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত করিল। এই বিবাহের পর দীনুর ক্ষুধা বাড়িয়াছে, এবং সুন্দর মুখের চাপা অংশগুলি পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দীনুর বুদ্ধিও খুলিয়াছে, এবং প্রায় বিশ জন লোক প্রত্যহ দীনুর বাটীতে চা খায়; যে হেতু উদারচরিত্র, সৎ ও সহৃদয় লোকের বাটীতেই সকলে চা খাইয়া থাকে।

এই সব ঘটনা হেতু দীনুও সুখী, এবং পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের সহিত কণ্ঠীবদল করিয়া মাতঙ্গিনীও সুখী। বসুজার বিস্তীর্ণ জমিদারী এখন ঠাকুরের সেবায় লাগে, এবং সে হেতু অনেক দীনদুঃখী প্রতিপালিত হয়। যে হেতু সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

ভারতে পাশ্চাত্য বণিক।

রত্নপ্রসূ ভারতভূমির অতুল বৈভব-গৌরব সুচিরকাল সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া লোকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য খণ্ডে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রথম বিলাসবাসনা জাগিয়াছে, তখন হইতেই ভারত-জাত ধনরত্নের উপর লক্ষ্য পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের উষাগমেই দৃষ্ট হয় যে, কাল্ডিয়া বাবিলন, মিশর, চীন প্রভৃতি প্রাচীন কালের সভ্য জনপদ সকলে ভারতের পণ্য দ্রব্য সুপরিচিত ছিল। মহাভারত-বর্ণিত কালেও পশ্চিম এসিয়ার নবোদিত কাল্ডিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারতের দ্রব্যসম্ভার বহিয়া সার্থবাহ-সম্প্রদায় পশ্চিমোত্তর সাগরোপকূল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, ইহার প্রমাণ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন মিশরে গন্ধদ্রব্যাদিসহযোগে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শব-রক্ষণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গেই সেখানেও ভারতের সুগন্ধি দ্রব্যের যশঃ-সৌরভ প্রসারিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিশররাজ সিসস্ত্রীস পারস্য উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য প্রথম ঐতিহাসিক হিরোদোতাস তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। মিশরের প্রাচীন প্রবাদ-মূলে সিসস্ত্রীসের ভারতবিজয়ের কাহিনী বিশ্বাস না করিলেও, পশ্চিম এসিয়ার উক্তরূপ অধিকার দ্বারা তাঁহারই প্রভাবে ভারতীয় দ্রব্যজাত মিশরে প্রথম উপনীত

হয়, এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ট্রয়ের মহাযুদ্ধ-সংঘটনের কথা পণ্ডিতসমাজে অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। হোমার ভারতের নামোল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় সেকালেও পশ্চিম প্রদেশে ভারতজ পণ্যের প্রচার ছিল, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। মিশরের প্রাচীন রাজধানী যে থিব্‌সের শত সিংহদ্বার ও বিংশ সহস্র সজ্জিত রথের কথা হোমারের কর্ণগত হইয়াছিল, (১) তাহার শোভাসম্পদবর্দ্ধনে প্রাচীন ভারত কত দূর সাহায্য করিয়াছিল, কে বলিবে ?

কিঞ্চিদূন তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহুদী-রাজা দাউদ্ ও সলোমনের সময়ে কিয়ৎকাল এই বাণিজ্যেই তাঁহাদের ধনভাণ্ডার পুষ্ট হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ মরু দেশের এক প্রান্ত বহিয়া যে পথে পণ্যবাহী দল ভারতের দ্রব্যজাত লইয়া মধ্যসাগরের কূলে উপনীত হইত, তাহা ইহাদের অধিকারের মধ্য দিয়াই প্রসারিত ছিল। প্রাচীন বাইবেলে সলোমনের কীর্ত্তিগাথা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে, রাজ্যবিস্তারের সহিত বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধিও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। যূদার প্রথম বাণিজ্যপোত তাঁহার আদেশেই নির্ম্মিত হয়। বিশাল রাজসিংহাসনের প্রধান উপকরণ গজদন্ত, বহুবিধ 'মণিমাণিক্য', তিন শত 'সুবর্ণফলকের ঢাল,' 'কেলিকুঞ্জের শাখামৃগ ও ময়ূর ময়ূরী', 'গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী বণিক্,' এবং সম্ভবতঃ ভজননমন্দিরের বিপুলবপু চন্দনকাষ্ঠ গঠিত স্তম্ভ-সমূহের নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ সলোমন ভারতের নিকটেই ঋণী—এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

এসিয়া খণ্ডের প্রাচীন বণিক সুপ্রসিদ্ধ ফিনিশীয়গণের দ্বারাই ভারতজাত পণ্য দ্রব্য পাশ্চাত্য প্রদেশমধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল। এই ফিনিশীয় বণিকদলই এ দেশের দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে সভ্যতার প্রচার করিয়া প্রাচীন ইউরোপ ও আফ্রিকার উত্তরখণ্ডে মনুষ্যত্বের প্রসারবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহারাই প্রাচ্য মৃৎপাত্র-গঠন, ধাতুপাত্রের কলাই, কাষ্ঠের কারুকার্য্য, কাচনির্ম্মাণপ্রণালী, গজদন্তের দ্রব্য—সর্ব্বশেষে বর্ণমালার প্রচার করিয়া সুদূর প্রতীচ্য-জগতে প্রাচীর বালারুণের অমল কিরণপ্রকাশে প্রধান সহায় হইয়াছিল। যূদা রাজগণ প্রধান বাণিজ্য-পন্থার অধিকারী হইয়াও বাণিজ্যবিস্তারে ইহাদের সাহায্যগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্থল-পথের উৎপাত ও অত্যাচারে যখন ভারতের পণ্যদ্রব্য অর্ণবযানে পারস্য ও লোহিত সাগর হইয়া উত্তর-পশ্চিমে আনীত হইতে লাগিল, তখনও ফিনিশীয় বণিকগণের

---

(১) Iliad. IX. 381—84.

সহিত উহার বিনিময় হইত। লিবান্ত সাগরোপকূলে প্রাচীন টায়র, সিদন প্রভৃতি, এবং পরবর্ত্তী যুগের একর্, আস্কালন প্রভৃতি নগরবাসী বণিক্ জাতি পৃথিবীর যে উপকারসাধন করিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও, পৃথিবীর সভ্যসমাজ চিরকাল উহার স্মৃতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয়ে বহন করিবে।

তিনটি বিভিন্ন পথে সে কালে ভারতের পণ্যদ্রব্য বাহিত হইত। প্রথম বা মধ্যবর্ত্তী পথ পারস্য হইয়া প্রাচীন কাল্ডিয়া ও পরবর্ত্তী বাবিলোনিয়ার মধ্য দিয়া সমুদ্রতীরে ট্রয় টায়র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। দ্বিতীয় পথে উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন বাহ্লীক প্রদেশ হইয়া, পথে চীনদেশাগত দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া, পণ্যবাহী দল কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণ তীর বাহিয়া চলিত। তৃতীয় জলপথে পারস্য বা লোহিত-সাগর-মুখের বন্দর পর্য্যন্ত গিয়া, এক পথে পশ্চিমে মিশর ও অন্য পথে সিরীয়ার দিকে যাইত। এই তিনটি প্রধান বাণিজ্যপথের অধিকার লইয়াই প্রাচীন কালের সভ্য জাতিগণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়াছে, এবং ইহার কর্তৃত্বই পাশ্চাত্য জনগণের সুখসম্পদ-বৃদ্ধির প্রধান সহায় হইয়াছে। যে রাজবংশ যখন এই বাণিজ্য-পথের সহিত ভারতের ধন রত্নের অংশভাগী হইতে পারিয়াছিল, তাহারাই তদানীন্তন পাশ্চাত্যজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রাচীন কাল্ডিয়া ও মিশরের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে, যুদা টায়র প্রভৃতি খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ কিয়ৎকাল এই বাণি-জ্যের ফলভোগ করিয়াছিলেন। পালমিরার মরু প্রদেশের মধ্যে তড়মুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া যশোধন সলোমন মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্যপথের অধিকারী হইলেন। পশ্চিম প্রান্তে দামস্কস প্রভৃতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ দাউদের দ্বারাই অধিকৃত হইয়াছিল। টায়র-রাজ মহাপ্রবলের সহিত দ্বন্দ্ব না করিয়া সাম-দানের ব্যাবস্থা করিলেন; এমন কি, সলোমনের অর্ণবযান-নির্ম্মাণের নিমিত্ত সূত্রধরাদিরও সহযোগ করিয়া দিলেন। সমসাময়িক মিশররাজকেও অগত্যা ঐ পথে বাহিত গন্ধদ্রব্যের গুঁড়া পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। লোহিত সমুদ্রের পূর্ব্বোপকূলে বন্দর ও বাণিজ্যপোতের সৃষ্টি হইল। কিন্তু সলোমনের সঙ্গে সঙ্গেই দুই পুরুষের এই সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারতবাণিজ্যের প্রধান পথ তৎপরে যুদা রাজ্যের হস্তচ্যুত হইল বটে, কিন্তু গন্ধদ্রব্যের তীব্র স্মৃতি শীঘ্র বিলুপ্ত হয় নাই। মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল কিরণে ঝলসিত দৃষ্টি নিমীলিত হইয়াও অতীত সুখ বিস্মৃত হইতে পারিল না। পূর্ব্বার্দ্ধ—বাইবেলের নানা স্থানে নানা ভাবে এই কথার উল্লেখ বা গৌণভাবে অস্পষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়।

মধ্যযুগে বাবিলন ও পারস্ত রাজগণ, শেষে মাসিডন্‌ ও সুদূর পশ্চিমের রোম সাম্রাজ্য, উল্লিখিত মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্য-পথের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে ভূমধ্যসাগরের উপকূল রক্তাক্ত করিয়াছেন;—প্রবলের অত্যাচারে প্রাচীন খণ্ডরাজ্যগুলি মারা গিয়াছে। কিন্তু অধিকারীর পক্ষেও এ পথ চিরসুখের হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান বাবিলন পঞ্চমে পারসীকের পদানত হইয়াছে। পারস্তরাজগণ ক্রমে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিলে, শেষে পাশ্চাত্য বাণিজ্যাধিকারী এথেনীয়গণের সহিত সংঘর্ষে, সুপ্রসিদ্ধ সালামিস্‌ ও মারাথনের যুদ্ধব্যাপার ঘটিয়াছিল। ফিনিশীয়দিগের স্থাপিত নৌসাধনোন্নত কার্থেজের সহিত পরবর্ত্তী কালে রোমকগণের সংঘর্ষ হইয়াছে; শেষে পম্পীর সময়ে এসিয়ার এই উপকূল প্রদেশ রোমের হস্তগত হইয়া তাহাদের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে।

মাসিডনের অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধযাত্রার পর হইতেই ভারতের বিষয়ে ইউরোপীয়গণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে দৃষ্টি পড়ে। সিলিউকস্‌ ও টলেমীর দূতগণের বর্ণিত বিবরণে পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের সেকালের অবস্থা ইউরোপখণ্ডে বহুলপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লিখিত এক গ্রীক্‌ গ্রন্থে (২) দৃষ্ট হয়, গুজরাট, মালাবার উপকূলের কয়েকটি বন্দর, করমণ্ডল, মছলী-পত্তন ও বঙ্গোপসাগরের মুখে প্রাচীন প্রসিদ্ধ গাঙ্গ্য বন্দরের সহিত মিশরের গ্রীক নাবিকগণের পরিচয় ছিল। প্রায় সমকালবর্ত্তী টলেমীর গ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে যে, ভারতের উপকূলভাগের তদানীন্তন সমস্ত প্রধান বন্দরে ও বঙ্গোপ-সাগরের উভয় কূলের বন্দরসমূহে, এমন কি, দক্ষিণ-পূর্ব্বোপকূলের কয়েকটি বন্দরেও, সে কালের মিশরবাসী ও পাশ্চাত্য বণিকদিগের গতিবিধি ছিল। টলেমী পূর্ব্ব-দক্ষিণের যে স্থানকে সিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোচিন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ কালে ভারতের সর্ব্বপ্রকার মূল্যবান বস্তু যে ইউরোপে নীত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ যুগে উপকূল বহিয়া অর্ণবপোত সকল পারস্ত ও লোহিত সাগরের মুখের বন্দরে পণ্যদ্রব্য পৌঁছাইয়া দিত; তৎপরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে মধ্যসাগরের বন্দরে যাইত তথা হইতে ইউরোপীয় বণিকের সাহায্যে ঐ পণ্যজাত নানা স্থানে বিক্রীত হইত;—বামে মিশরের মধ্য দিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছিত।

---

(২) Periplus of the Erythrean sea (Mc. Rindle)=ভারতসাগর-পরিদর্শন।

রোম সাম্রাজ্যের উন্নতির দশায় বাণিজ্যের প্রধান পথ সকল রোমীয়গণের করতলগত হয়। উত্তর আরবের মরুদেশমধ্যে পাল্‌মিরা সেকালে সমৃদ্ধিগৌরবে বিখ্যাত হইয়াছিল। তথাকার রাজা রোমের মিত্ররাজগণের মধ্যে পরিগণিত হন। দামস্কসের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বসোরা নগর ট্রেজান নরপতির সময়ে রোমের নবাধিকৃত আরব্য প্রদেশের রাজধানী হইয়াছিল। সেকালে ঐ নগর সিরিয়া, হেজাজ্ প্রভৃতি দেশসমূহের "সমৃদ্ধ বিপণি" বলিয়া অভিহিত হয়। অদূরে রাব্বা নগরীতে অদ্যাপি রোমীয় নাট্যপ্রাঙ্গণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাণিজ্যই রোমকগণের উদ্দেশ্য না হইলেও, তাহাদের অধিকারবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য খণ্ডে ভারতের দ্রব্যজাত সমধিক পরিচয়লাভের সুবিধা পাইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত লোহিতসাগরোপকূলের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর গ্রন্থে (১) সেকালের মিশর ও ভারতের বাণিজ্যবৃত্তান্ত সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে কল্যাণের পিত্তল ধাতুপাত্র, কাষ্ঠ ও তুলা, সিন্ধুদেশজাত কস্তুরী ও গন্ধদ্রব্য, তাম্রপর্ণীর (সিংহল) সমীপবর্ত্তী দেশ হইতে রেশম, অগুরু, চন্দনকাষ্ঠ, লবঙ্গ, জয়িত্রী প্রভৃতি আহরণের উল্লেখ আছে।

পরবর্ত্তী কালে সারাসেন আরবগণ নবোদ্দীপ্ত উদ্যমে ভারতীয় বাণিজ্যের মধ্য-পথ ও ক্রমশঃ সমুদ্রপথও অধিকার করিয়া বসিল। সপ্তম শতাব্দীতে খলিফা-গণের প্রভাবে বোগদাদ বসোরা প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থান ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। একাধিকসহস্ররজনীর উপন্যাসে সিন্ধবাদ নাবিকের কাহিনী নবম শতাব্দীর কথা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সিন্ধবাদ প্রথম যাত্রায় এক মহারাজার দেশে উত্তীর্ণ হয়; সে রাজার রাজ্য ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইনি প্রাচীন বিজয়নগরাধিপ নরসিংহ বলিয়া অনুমতি হন। দ্বিতীয় যাত্রায় সিন্ধবাদ "রিহা" রাজ্যে উপনীত হয়; কেহ কেহ ইহা মান্নার উপকূলের স্থানবিশেষ বলিয়া মনে করেন। এখানে কর্পূর প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থবারে সে মালবার দেশে আইসে; সেখানে বন্যভূমিতে গোলমরিচ সংগ্রহের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। সিন্ধবাদ সিংহলের উপকূলেও গিয়াছিল; এখানে চন্দনের উল্লেখ আছে। সিন্ধবাদের পরবর্ত্তী জলযাত্রাগুলিতে কোথাও মান্নার উপসাগরে শুক্তিসংগ্রহের কথা, কোথাও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে অগুরু চন্দন প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে পারিস্ নগরীতে প্রকাশিত আবিরেণটের গ্রন্থে দুই জন প্রাচীন আরব ভ্রমণকারীর বিবরণ আছে;—তাঁহারা

(১) Cosmos Indicoplenstes.

নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারত ও চীন পর্য্যটন করেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে চাউল, মত্ত, চীনামাটীর বাসন ও সর্ব্বপ্রথমে চার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে সোলেমান্ বসোরাবাসী বণিক, ৮৫১ খৃষ্টাব্দের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার বিবরণীতে, চীন হইতে ভারতসাগরীয় দ্বীপাবলি পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রপথের অপেক্ষাকৃত নির্ভুল নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি পারস্য উপসাগরের কূলস্থিত সিরাফ নগরবাসী আবু সৈয়দ; ইনি দশম শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার সময় চীনদেশে বিদ্রোহবশতঃ আরবগণের চীনবাণিজ্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরও দুই এক জন পর্য্যটকের বিবরণ পাওয়া যায়। এ সকলে গন্ধদ্রব্য, সুপারি, মশলা, কর্পূর, চন্দন, অগুরুকাষ্ঠ ব্যতীত চীনামাটী, ইক্ষু, মৃগনাভি ও রেশমেরও উল্লেখ আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হস্তলিখিত একখানি আরবী পুস্তিকায় দশম শতাব্দীতে কনষ্টান্টিনোপলের রোমীয় সম্রাটের নিকট হইতে বোগদাদের খলিফার নিকট দূত-প্রেরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। খলিফার আড়ম্বরের বর্ণনা সলোমনের সভাবর্ণনার অনুরূপ। হিব্রুরাজের সভার মত এখানেও ভারতীয় মূল্যবান দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, ভারতজ মণিমাণিক্যে রাজসদন সমুজ্জ্বল।

একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজয়দৃপ্ত আরব মুসলমান দলের প্রবল প্রতাপে পারস্ত হইতে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী উপকূলভাগ বিধ্বস্ত হইলে, প্রধান স্থলপথে ইউরোপের দিকে পণ্যদ্রব্যের গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল। এই কালেই ভিনিস ও জেনোয়ার বণিক-সম্প্রদায় তৃতীয় পথে পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যবসায় আরম্ভ করে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণ-সাগর-বাহিত এই বাণিজ্যব্যাপারে তাহাদের ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল। সীরিয়া প্রদেশের অধিকার লইয়া তিন শত বর্ষ ধরিয়া মুসলমানের সহিত খৃষ্টীয়গণের যে অবিরাম ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তৎকালে ঐ বণিকদলের অনেকে যোদ্ধৃবর্গের আহার-সংস্থানের সহায়তা করিয়া ধর্ম্মোন্মত্ত রাজকুলের কার্য্যের সহিত আপনাদের বাণিজ্যাধিকারপ্রসারের যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণপ্রদর্শনে বিরত হয় নাই। সময়ে সময়ে খৃষ্টীয়দল প্রবল হইলে লোহিতসাগরের বাণিজ্যপথ মুক্ত থাকিত। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে খৃষ্টানগণ মুসলমানকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া একবার কনষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তখন পুনরায় ভারতের বাণিজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া, ইটালীয় বণিকগণের বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে

স্রোত ফিরিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেল্জুক্ তুর্কীসম্প্রদায় পারস্য জয় করিল। ত্রয়োদশের প্রথমে জঙ্গীস্ খাঁর প্রচণ্ড চমূ সৃষ্টিনাশী বাত্যাবিপ্লবের মত পশ্চিম এসিয়ায় উৎপতিত হইল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এক দিকে বোগদাদের সারাসেন্ খলিফাগণের অবশিষ্ট অধিকার বিধ্বস্ত হইল; অন্য দিকে জঙ্গীস্ খাঁর মোগল পঙ্গপালদল তাঁহার নেতৃত্বে ইউরোপখণ্ডে পোলাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলিল। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তৈমুর মুষ্টিমেয় খৃষ্টান নাইট্-দলকে এসিয়াখণ্ড হইতে উৎখাত করিলেন। একালে তাতার-দলের তাণ্ডব নৃত্যে দিগন্ত ধ্বনিত হইল; শান্তির সহচরী বাণিজ্যের আশা লোপ পাইল। পারস্যসাগর হইতে মধ্যসাগর পর্য্যন্ত বাণিজ্যের মধ্যপথ প্রথমেই আবদ্ধ হইয়াছিল; শেষে মোগলের হস্তে উত্তরের পথেও গোল বাধিল।

গ্রীক্ ও রোমক বণিকদল সমুদ্রপথে মিশর অথবা মধ্যসাগরোপকূলের বন্দর-সমূহে ব্যবসায় চালাইয়া যেমন প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল, পশ্চিমোত্তর পথ দিয়া কৃষ্ণসাগরের ব্যবসায়েও এককালে ইউরোপীয় বণিক্ সেইরূপ লাভবান হইত। তুর্কী তাতার দলের প্রাবল্যে স্থলপথ আবদ্ধ হইল। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে বিতাড়িত হইয়া ভিনিসীয় বণিকদল অলেকজাণ্ড্রিয়ায় প্রধান আড্ডা করিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে তুর্কী সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সকল মধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগ আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। ভিনিসবাসী বণিকদল ইতিপূর্ব্বে জেনোয়ার অধঃপতন সাধন করাইয়া স্বার্থসাধন করিয়াছিল; এক্ষণে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান সাম্রাজ্যের নিকট নতশিরে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া, অন্ততঃ মিশর হইতে বাণিজ্যতরণীগুলি যাহাতে অবাধে দেশে আসিতে পারে, কিয়ৎকাল তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাবে আর কতকাল চলিতে পারে? লাভের পন্থা কে কবে ক্ষমতা থাকিলে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে? ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে শতাধিক যুদ্ধজাহাজ ও দ্বিগুণসংখ্যক সহযাত্রী তরণী সংগ্রহ করিয়া তুর্কী দল ভিনিসের হস্ত হইতে নিগ্রোপণ্ট কাড়িয়া লইল; দশ বর্ষের মধ্যে ইটালীর সমগ্র উপকূলভাগ বিধ্বস্ত করিয়া ইউরোপীয় বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিল। ক্রমশঃ সকল পথ রুদ্ধ হইলে, বণিকসমাজে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইল। এই সময় হইতেই অন্য কোনও দিক দিয়া ভারত-যাত্রার উপায়-চিন্তার প্রয়োজন হইল। বাণিজ্য-পথ অবরোধের কথায় অবশ্য কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, একালে ভারতের আর কোনও পণ্যদ্রব্যই ইউরোপখণ্ডে নীত হইত না। নানা স্থান দিয়া নানা উপায়ে ভিনিস্ ও অন্য স্থানের ইউরোপীয় বণিক ব্যবসায়ের যথাসাধ্য আয়োজন

করিয়া যথাসম্ভব লাভবান হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন জর্ম্মনীর হান্‌সা সমিতির বণিকদলও বহুকাল ধরিয়া এ বাণিজ্যের অংশগ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বাণিজ্য-পথ অবরুদ্ধ হইলে লাভের ভাগ ক্রমেই অল্প হইয়া আসিল। এই লাভের পুনরুদ্ধারকামনাই পরবর্ত্তী ইউরোপীয়গণকে উৎসাহিত করিয়াছিল; ইহারই প্রেরণায় জেনোয়াবাসী প্রথিতনামা কলম্বস্ ভারতের পথানুসন্ধানফলে আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আবিষ্কার করিলেন। ভারতের বাণিজ্য-পথ আবিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় সমাজে পরবর্ত্তিকালে যে উদ্যম দেখা দিয়াছিল, যে ভাবে পর্ত্তুগীজগণ ভারতের পথ-নিরূপণ করিয়া দিয়া ইতিহাসে নবযুগের আবির্ভাব ঘটাইল, তাহা সময়ান্তরে বর্ণন করিবার অভিলাষ রহিল। (১)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠের পল্লী।

আলমপুর ক্ষুদ্র পল্লী। একদিন জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে কোনও বন্ধুর সঙ্গে এই পল্লীগ্রামে পদার্পণ করিলাম। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশ তখন প্রভাত-অরুণের লোহিত কিরণস্পর্শে কেবল অরুণাভ হইয়াছে। সংকীর্ণ গ্রাম্য পথ বিসর্পিতগতিতে চলিয়া গিয়াছে। উচ্চ পথের দুই ধারে ধান্যক্ষেত্র; ক্ষেত্রের পার্শ্বে উচ্চ আইল; আইলের পদতলে নয়ঞ্জুলি (নালা); নয়ঞ্জুলি সবুজ তৃণদলে সমাচ্ছন্ন। ধানগাছগুলি সমীরণে হিল্লোলিত হইতেছে; পথের ধারে বাবলাগাছের ডালে বসিয়া কতকগুলি ক্যাঁচকেঁচে পাখী কোলাহল করিতেছে; একটি কালো ষাঁড় ধান্যক্ষেত্রে নামিয়া একাগ্রচিত্তে পরস্বাপহরণ করিতেছে। খানদুই ছৈ-যুক্ত

---

(১) মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া সংক্ষেপে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

McCrindle's Ancient India Series.

Ancient Commerce of India. by G. Oppert. Ph. D.

commerce & Navigation of the Ancients &c. by Dean Vincent.

Journal of the Royal Asiatic Society.

Haklyut Society's publications.

Birdwood & Foster's Old Records &c.

Sir W. Hunter's latest work on British India.

গরুর গাড়ী 'ক্যাঁ কোঁ' শব্দ করিতে করিতে ভিন্ন গ্রামের দিক হইতে আসিতেছে। ঝোড়া কক্ষে লইয়া কয়েক জন মেছুনী দূরবর্ত্তী বিলে মাছ আনিতে যাইতেছে। অদূরবর্ত্তী আমবাগান নিস্তব্ধ; অন্ধকার তখনও সেখানে স্থানে স্থানে জমিয়া আছে। একটি শৃগাল একটা ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া উর্দ্ধমুখে হুয়া হুয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে বনান্তরালে পাঁচটি, সাতটি, ক্রমে দশ পনেরটি শৃগাল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'ক্যাহুয়া' 'ক্যাহুয়া'। এক স্থানে ভাগাড়ে কতকগুলা গোহাড় পড়িয়াছিল, দুই তিনটি গ্রাম্য কুক্কুর তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে যেমন শৃগালগুলির সমকণ্ঠের রাগিণী শুনিতে পাইল, অমনই তাহারা অস্থিচর্ব্বণ পরিত্যাগ করিয়া 'ভেউ—ভেউ' শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল।

গ্রামের মধ্যে আমাদের 'পুষ্পকরথ' অর্থাৎ গোশকট প্রবেশ করিতেই চমৎকার সৌরভে নাসিকা পূর্ণ হইল; দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ বকুলগাছের তলদেশ দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতেছে; প্রস্ফুটিত বকুলফুলগুলি নীরবে বৃক্ষমূলে ঝরিয়া পড়িতেছে। দুটি কৃষক-কুমারী মলিন বস্ত্রের অঞ্চল মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে ফুল কুড়াইয়া এক স্থানে স্তূপাকার করিতেছে; তাহাদের তৈলবর্জ্জিত বিবর্ণ কেশে দুই চারিটি শাখাভ্রষ্ট বকুল ফুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একটি চাষার ছেলে বকুল গাছের তলায় একটা আমকাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া বনজাত লতা দিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছে; তাহারও হৃদয়ে কোনও রকম কবিত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে?

গ্রামের ভিতরের পথও জঙ্গলময়—পথের দুইধারে আশ্‌শ্যাওড়ার বন, কোথাও শ্যাকুলের কাঁটা, কোথাও বেতবন। নিবিড় বেতবনের মধ্যে বসিয়া শ্যামা শিষ্ দিতেছে। থোকা থোকা সাদা বেতের ফল সতেজ সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইতেছে।

বাঁশের বন পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া প্রাতঃ-সূর্য্যরশ্মি ধূলিরাশি চুম্বন করিতেছে,—স্বর্গের কিরণ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। বাঁশবনের পাশে কয়েকটি খেজুরগাছ—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রের শুষ্ক আঘাতচিহ্ন, কিন্তু স্কন্ধদেশ কাঁদি কাঁদি পীতবর্ণ ফলে সুশোভিত; চাষার ছেলেরা কটিদেশে কাস্তে আঁটিয়া খর্জ্জুরগুচ্ছ-আহরণের সংকল্পে গাছে উঠিতেছে।

পথের দুই পার্শ্বে গৃহস্থের বাড়ী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় গৃহ, খড়ের চাল। অধিকাংশ

ঘরের 'মটকা'র উপর শ্রেণীবদ্ধ জলপূর্ণ কলস;—গৃহস্থেরা অগ্নিভয়নিবারণের অভিপ্রায়ে এই সকল কলসী স্থাপন করিয়াছে; দৈবাৎ চালে আগুন লাগিলেই ঢিল ছুঁড়িয়া কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়; সমস্ত জল চালের উপর গড়াইয়া চাল সিক্ত করে, অগ্নিকে প্রবল হইতে দেয় না। কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গনে দুই একটি গোলা, গোলার মুখ বন্ধ, চালের উপরটা চূড়াকার, সেই চূড়া এক একটি মৃণ্ময় গামলা দিয়া ঢাকা। পথের উপর স্থানে স্থানে দুই তিনখানি গরুর গাড়ী প্রসারিতবক্ষে পড়িয়া আছে। চাষী গৃহস্থবাড়ীর খোলা আঙ্গিনায় দুই তিনটা বলদ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তৃণচর্ব্বণে 'উপবাসভঙ্গ' করিতেছে। গৃহস্থবধূরা কেহ কেহ কলসপূর্ণ গোময়মিশ্রিত জল লইয়া প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া দিতেছে; কেহ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাঙ্গনে সম্মার্জ্জনী চালন করিতেছে। রাখালের দল এক এক পাল গরু লইয়া গোচারণের মাঠে চলিয়াছে। কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রে 'বিদা' দিতে যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে দুটি বলদ বা দুটি মহিষ,—স্কন্ধে 'বিদা'; ধানের জমীর ঘাস উন্মূলিত করিবার জন্য এ সময় ধান্যক্ষেত্রে বিদা দিবার আবশ্যক হয়।

গ্রামের মধ্যে সংকীর্ণ বনপথ এক পল্লী হইতে অন্য পল্লী পর্য্যন্ত প্রসারিত; পল্লী অতিক্রম করিয়া কোনও পথ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কোনও পথ গ্রামপ্রান্তস্থ বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। পথগুলি ছায়াচ্ছন্ন; কোথাও তেঁতুলগাছ, কোথাও জামগাছ, অশ্বত্থগাছ, আমগাছ ও কাঁঠালগাছ। তেঁতুলগাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য ফুল, অসংখ্য অতি ক্ষুদ্রাকার প্রজাপতি সেই সকল ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, উড়িতে উড়িতে এক দিক হইতে অন্য দিকে যাইতেছে। জামগাছে থোকা থোকা কালো জাম ফলিয়া আছে। এক একটি জামগাছে দুই তিনটি পল্লীবালক,—তাহারা কাঁধে এক একখানি গামছার থলি ঝুলাইয়া এক ডাল হইতে অন্য ডালে আরোহণ করিতেছে, থলি পূর্ণ করিয়া জাম পাড়িতেছে।—গাছের নীচে দুই তিনটি পল্লী-বালিকা,—পরিধানে মলিন বস্ত্র, কেশ রুক্ষ, কাহারও হাতে দুটি কালো কাচের চুড়ি, কাহারও হাতে ক্ষয়িতপ্রায় রৌপ্যবলয়,—তাহারা করুণকণ্ঠে বৃক্ষারোহী বালকগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে; কেহ বলিতেছে, "ও হারুদাদা, একটা জাম দে!" কেহ বলিতেছে, "বলা কাকা, আমি দুটো জাম নেব।" হারাধন বা বলরাম, দেখিলাম, অত্যন্ত দাতা! কেহ একটি সুপক্ক জাম খাইয়া তাহার আঁটিটা বালিকার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছে, "এই নে!" কেহ এক থোকা কাঁচা জাম নীচে ফেলিয়া দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

একটা রাস্তার ধারে গোটাকত কাঁঠাল গাছ; গুঁড়িতে বড় বড় কাঁঠাল ফলিয়া আছে। দুই পাঁচটা এত বড় যে, দেখিয়া মনে হয়, আধমন হইবে। কাঁঠাল পাকিবার সময় হইয়াছে। এক জন গৃহস্থ গাছে উঠিয়া প্রত্যেক কাঁঠালটির উপর 'টোকা' (অঙ্গুলির আঘাত) দিয়া দেখিতেছে, তাহা পাকিয়াছে কি না। যে কাঁঠালটির 'ঠক্ ঠক্' শব্দ হইতেছে, তাহা পাকে নাই, এবং পাকিতে বিলম্ব আছে বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেছে; কিন্তু যাহাতে টোকা দিতেই 'ঢপ্ ঢপ্' করিয়া শব্দ হইতেছে, তাহার আর পরিত্রাণ নাই, তৎক্ষণাৎ তাহার বৃন্তে কাস্তের আঘাত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধপাস্ করিয়া শব্দ! আবার যে কাঁঠালটি অধিক পাকিয়াছে, তাহা পাড়িবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। বৃক্ষমূল হইতে এক জন একগাছি মোটা দড়ি ঊর্দ্ধে গাছের উপর নিক্ষেপ করিল, বৃক্ষারোহী ব্যক্তি তাহা ধরিয়া তদ্দ্বারা কাঁঠালটা শক্ত করিয়া বাঁধিল, তাহার পর সেই দড়ি পাশের একটা ডালের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া কাঁঠালটির বোঁটা কাটিয়া তাহা ধীরে ধীরে নীচে নামাইয়া দিতে লাগিল। খুব বেশী পাকা হইলে এ ভাবে কাঁঠাল পাড়াও সুবিধাজনক নহে। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নামিতে নামিতে তাহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়, এবং 'ভুঁতুড়ি' ছাড়িয়া কোষগুলি মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে।

বেলা অধিক হইলে গ্রামের মধ্যে হাট বসিল। আমরা যখন হাটে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। গ্রামে শনিবারে ও মঙ্গলবারে হাট বসে। শনিবারের হাটকে 'চারের হাট' ও মঙ্গলবারের হাটকে 'তিনের হাট' বলে। 'তিনের হাট' অপেক্ষা 'চারের হাটে'ই অধিক জিনিসপত্রের আমদানি। আজ চারের হাট। দশটার সময়েই হাট লোকে লোকারণ্য। চারি দিকের দশ পনেরখানি গ্রামের লোক হাট করিতে আসিয়াছে। হাটে নানাবিধ তরিতরকারী, ফলমূল বিক্রীত হইতেছে। ফলের বাজারে আম কাঁঠালেরই প্রাধান্য অধিক। বাগ্দীরা ঝোড়াপূর্ণ আম লইয়া বিক্রয়ের জন্য বসিয়া গিয়াছে। কোথাও রাশীকৃত কাঁঠাল, কতক পাকা, কতক কাঁচা, কিন্তু পুষ্ট হইয়াছে। পাকা কাঁঠাল অপেক্ষা পরিপুষ্ট কাঁঠালেরই আদর অধিক; কারণ, তাহা দুই চারি দিন ঘরে রাখা চলে। হাটে কতরকম ফল বিক্রীত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।—কালো জাম, জামরুল, ফলসা, গোলাপজাম, লিচু, পাকা পেঁপে, বনকাঁঠাল, তরমুজ, খরমুজ, ফুটি,—আনারস বর্ষার ফল,—কিন্তু এখনই দুই চারিটি দেখা দিয়াছে। এক স্থানে একরাশি ডাব। তালশাঁস-বিক্রেতা কয়েক কাঁদি তাল কাটিয়া আনিয়া বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছে; কেহ ক্রয় করিতে আসিলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে শাঁস বাহির করিয়া দিতেছে। এক পয়সায় বারখানি

তালশাঁস, পাঁচ ছয় গণ্ডা আম। গরীব দুঃখীরা কোনরূপে দুটি পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিলে আর তাহাদের ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হয় না; পাঁচ গণ্ডা আম আর তিন গণ্ডা তালশাঁস উদরগহ্বরে প্রেরণ করিলে দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাও প্রশমিত হয়। দেখিলাম, পল্লীজননী তাঁহার অঞ্চল ভরিয়া দরিদ্র সন্তানগণের জন্য ফল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠমাসে পল্লীগ্রামে যত ফল, বৎসরের অন্য কোনও সময় এত ফল পাওয়া যায় না। অনেক পল্লীবাসী এ সময়ে একবেলা ভাত রাঁধে না, এক একটা কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া চারি পাঁচ জনে মিলিয়া তাহাই খাইয়া ক্ষুধানাশ করে। ইহারা বলে, পাকা কাঁঠাল দেশী সালসা।

নদীর ধারেই হাট। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ব্যবসায়ীরা নৌকায় গুড়, তামাক, লবণ, নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। ভিখারীরা দলে দলে নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া গোপীযন্ত্র ও খঞ্জনী বাজাইয়া মোটাসুরে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। নদীর অদূরে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া গ্রাম্য জোলারা দেশীয় তন্তুজাত মোটা কাপড়, গামছা বিক্রয় করিতেছে। আর একটা সুবিস্তীর্ণ অশ্বত্থগাছের ছায়ায় বসিয়া বেদেরা তালপাতের ছাতা বিক্রয় করিতেছে,—ছোট ছাতার দাম চারি পয়সা, অপেক্ষাকৃত বড় ছাতার দাম ছয় পয়সা; রাখাল কৃষাণেরা গেঁজে হইতে পয়সা বাহির করিয়া এক একটা ছাতা কিনিয়া লইয়া যাইতেছে; বেদেদের স্ত্রীলোকেরা গাছের আর এক পাশে বসিয়া কুলা, ঝুড়ি, ফুলের সাজি ও ডালা প্রস্তুত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিক্রয়ও করিতেছে। গ্রাম্য কুমারেরা রাশি রাশি হাঁড়ি, কলসী, জলের কুঁজো, মাটীর প্রদীপ, দীপগাছা থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছে; সেখানে স্ত্রীলোক ক্রেতার সংখ্যাই অধিক।

হাটের মধ্যে দুই চারিখানি সন্দেশ মুড়কির দোকান। এক পাশে শুঁড়ীর দোকান; সেই দোকানের সম্মুখে একখানি চাটাইয়ের উপর বসিয়া কয়েকটা নীচজাতীয় পুরুষ মদ খাইতেছে, মাতলামী করিতেছে, এক একবার রাসভ-বিনিন্দিত স্বরে একটা শ্যামাবিষয়ক গান ধরিতেছে, আবার তখনই গান ছাড়িয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইতেছে।

গ্রাম্য রমণীগণ সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কলসীকক্ষে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছে; এক একবার অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া চকিতদৃষ্টিতে জনসমাবেশ দেখিয়া লইতেছে।

গ্রাম ঘুরিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর বিশ্রামান্তে নদীতে স্নান করিতে চলিলাম। ক্ষুদ্র নদী। নদীগর্ভে অধিক জল নাই। তীরে কিছু দূর পর্য্যন্ত

বালুকারাশি প্রসারিত, প্রখরসূর্য্যরশ্মিসম্পাতে তাহা ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হইয়াছে। নদীতে যাইবার সংকীর্ণ পথটি কিছু দূর পর্য্যন্ত বেশ মনোহর। পথের দুই পার্শ্বে বাগান। আমরা আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে এক একটা উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটা আসিয়া বৃক্ষপত্র আন্দোলিত করিতেছে; বৃক্ষমূলে নিপতিত শুষ্কপত্র সর্ সর্ শব্দে উড়িয়া যাইতেছে। বাগানের ভিতর ভাঁট, বঁইচি, ময়না কাঁটা, আশ্‌শ্যাওড়ার জঙ্গল। এই সকল জঙ্গল বৎসরের অন্য সময় অত্যন্ত নিবিড় থাকে; এখন আম কাঁঠালের সময় বাগানে সর্ব্বক্ষণ লোক থাকে, তাহারা জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।—তত বেলাতেও দেখিলাম, ছোট ছোট ছেলেরা বাগানের মধ্যে আম কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। কেহ জামগাছে, কেহ ফলসা গাছে উঠিয়া জাম ও ফলসা খাইতেছে। বাগানের মধ্যে কণ্টকময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঁইচি-গুল্মে লালের আভাযুক্ত কালো কালো বঁইচি পাকিয়া আছে। চাষার ছেলেরা অতিকষ্টে পাকা বঁইচি সংগ্রহ করিতেছে; কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া যাইতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

বাগানের পাশেই ধানের জমী। ধানগাছ এখনও খুব বড় হয় নাই। নূতন ধানগাছের শ্যামলতায় চক্ষু জুড়াইয়া গেল। কোনও স্থানে চারাগুলি খুব ঘন, কোথাও অত্যন্ত পাতলা। ধান্যক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘাস জন্মিয়াছে; কৃষাণেরা দল বাঁধিয়া ঘাস নিড়াইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সুখ দুঃখের গল্প চলিতেছে। কৃষাণদের মাথায় 'মাথাল', কাঁধে গামছা, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত। অদূরে গোচারণের মাঠ। রাখালেরা তালপাতের ছাতি মাথায় দিয়া পাঁচনে ভর করিয়া ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়াইয়া 'বুঁদির' আগুনে থর্শান ধরাইয়া তামাক খাইতেছে। মাঠে ঘাস অধিক নাই; যাহা আছে, গরুগুলা ক্ষুধার জ্বালায় তাহাই খুঁটিয়া খাইতেছে,—লেজ নাড়িয়া মাছি তাড়াইতেছে। দুই একটা গরু বিরলপত্র বাবলাগাছের নীচে শুইয়া পড়িয়া রোমন্থন করিতেছে। ভেড়া ও ছাগলের পাল আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোটাকত পাতিহাঁস জলের ধারে দাঁড়াইয়া প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া ডাকিতেছে, আবার তখনই জলে নামিয়া জলের মধ্যে মুখ পুরিয়া দিয়া নতগ্রীবভাবে কি খাইতেছে, মুখ তুলিয়া সাঁতার দিয়া একটা টোপাপানার জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছে। নদী-তীরবর্ত্তী একটা আকন্দগাছের আড়ালে বসিয়া দুটি শৃগাল লুব্ধদৃষ্টিতে হাঁসগুলির গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে।

নদীতে স্নানার্থীর সংখ্যা এখন অধিক নহে। কয়েকটি ছেলে জলক্রীড়ায় জলরাশি পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। গ্রাম্য বৃদ্ধারা নদীজলে অর্দ্ধনিমগ্ন একটা

শালের গুঁড়ির উপর বসিয়া পিতলের বা পাথরের ছোট তেলমাখা বাটী হইতে তেল তুলিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছে; কেহ পিতলের কলস মাজিতেছে; কেহ এক বুক জলে দাঁড়াইয়া দুই কানে উভয় হস্তের তর্জ্জনী প্রবেশ করাইয়া অবনতমস্তকে ঝুপ ঝুপ করিয়া ডুব দিতেছে। কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্নানান্তে দুই হাতে পৈতা জড়াইয়া অস্ফুটস্বরে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' ইত্যাদি স্তবে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের অভিনন্দন ও মধ্যে মধ্যে প্রণাম করিতেছেন। 'পুখুরে' ঘোড়ায় চড়িয়া দুটি লোক তড়্ বড়্ তড়্ বড়্ শব্দে নদীর ধারে উপস্থিত হইল; তাহার পর এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া ঘোড়া দুটির সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাদিগকে শৈবালরাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া স্নান করিতে নামিল। ঘোড়া দুটি মহানন্দে শৈবালচর্ব্বণ আরম্ভ করিল। কয়েকটা মহিষ রাখালের পাঁচন অগ্রাহ্য করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, এবং জলের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া কেবল নাক ও চোক জলের উপর রাখিয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে নীলাকাশের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই একটি রাখাল, তীরে পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া রাখিয়া গামছা পরিয়া জলে নামিল; তাহার পর মহিষের পিঠের উপর চড়িয়া পাঁচন দিয়া মহিষগুলিকে তাড়াইতে লাগিল; কিন্তু মহিষগুলা তীরে না উঠিয়া আরও গভীর জলে চলিল; রাখালের শাসন তাহারা আদৌ মঞ্জুর করিল না।

জ্যৈষ্ঠমাসে পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্নের জলযোগের আয়োজন নিতান্ত সামান্য নহে। কলিকাতার ভীমনাগের আধাছানার গোল্লা, স্মিথ বা স্কটের বাড়ীর লেমনেড্, তাহাতে বরফের টুক্‌রা, বোম্বাই গোপালভোগ হিমসাগর প্রভৃতি আম্র, মজঃফর-পুরের আমদানী লিচু প্রভৃতি ফল সেখানে নাই। বন্ধুর পরিবারে নিত্য যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাই আমাদিগকে প্রদত্ত হইল। বেলফুলের কুঁড়ির মত শুভ্র সুগোল মুড়ি, তাহাতে সরবাটা ঘি ও চিনি মাখানো, কচি শশা চাকা চাকা করিয়া কাটা, অন্যান্য সাময়িক ফল কিছু কিছু, এবং সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধকর ডাবের জল; তদ্ভিন্ন দুধ ও চিনির সংযোগে প্রস্তুত অপুষ্ট নারিকেল বাটার একরকম গৃহজাত মিষ্টান্ন সন্দেশ ও মিঠাইয়ের অভাব পূর্ণ করিল। বন্ধু বলিলেন, এখন আম খাওয়া হইল না, বৈকালে বাগানে গিয়া ও রসের আস্বাদন ভাল করিয়া লওয়া যাইবে।

জলযোগের পর আহারাদি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বিস্তীর্ণ গালিচার উপর দেহ প্রসারিত করিলাম। কিন্তু নিদ্রার সম্ভাবনা দেখিলাম না। বৈঠকখানায় ক্রমেই গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণের সমাগম হইতে লাগিল। পায়ে খড়ম, কাঁধে গামছা ও

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রক্তচন্দনের স্থূল ফোঁটা ধারণ করিয়া শিরোমণি ঠাকুর বৈঠকখানায় পাশার আড্ডা ফেলিলেন; ট্যাঁক হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া নাসিকার উভয় ছিদ্রে প্রায় অর্দ্ধমুষ্টিপরিমাণ নস্য প্রবেশ করাইলেন; তাহার পর গম্ভীরস্বরে ভৃত্যকে ডাকিয়া তামাক দিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহার 'রিজার্ভড্' হুঁকাটির জন্য কলাপাতার একটি নল প্রস্তুত করিতে করিতে অন্যান্য খেলোয়াড়ের সমাগম হইল। আধ ঘন্টার মধ্যে 'ছ তিন নয়' ও 'কচে বারো' প্রভৃতি মামুলী শব্দে বৈঠকখানা মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কাহারও হাতে হুঁকা, কাহারও হাতে পাতা। কেহ বা গামছা দিয়া ক্রমাগত দেহের ঘর্ম্ম অপসারিত করিতে করিতে খেলা দেখিতেছেন। খেলার উৎসাহে শিরোমণি মহাশয়ের কাছা খুলিয়া গিয়া দত্তমহাশয়ের হাঁটুর নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অপরাহ্নে বাগানে চলিলাম। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, কিন্তু রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রবল। গ্রাম নিস্তব্ধ, পথ জনহীন, কেবল দুই একখানি গরুর গাড়ী মাল লইয়া চক্রশব্দে বিজন পল্লীপথ মুখরিত করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দুই একটা ঘুঘু পথের ধারে গাছের শাখায় বসিয়া সকরুণ মধুরশব্দে প্রেমালাপ করিতেছে, এবং কপোতের দল কোনও জলাশয় লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঘন পল্লবের অন্তরাল হইতে ফটীকজল শব্দ উত্থিত হইতেছে,—হতভাগ্য চাতকের পিপাসানিবারণের জন্য কোথাও একবিন্দু জল নাই। তাহার কাতর আর্ত্তনাদ নিস্তব্ধ বনভূমিতে যেন একটা বিষাদের সূচনা করিতে লাগিল।

আমরা আম্রকাননে প্রবেশ করিলাম। বহুদূর বিস্তীর্ণ বাগান। চারি দিকে উচ্চ মাটীর আইল; আইলের পাশে ধানের জমী। অপরাহ্ণ সমাগত দেখিয়া কৃষাণেরা সেদিনের মত কাজ বন্ধ রাখিয়া ঘাসের আঁটি মাথায় লইয়া গ্রামের দিকে চলিল; এই ঘাস তাহারা তিন চারি পয়সায় গৃহস্থগণের কাছে বিক্রয় করিবে। মাঠ হইতে ঘুঁটে কুড়াইয়া ঝোড়া বোঝাই করিয়া নিম্নশ্রেণীর বর্ষীয়সী রমণীগণ গৃহে ফিরিতেছিল। আমাদিগকে বাগানের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কেহ কেহ বাগানে আসিয়া দুই একটি আম চাহিল। বন্ধুর ইঙ্গিতে রাখালীরা তাহাদের দুই চারিটি করিয়া আম দিয়া বিদায় করিল।

বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত একটু পরিষ্কার জমীর উপর একখানি পর্ণকুটীর;—বাঁশের মাচা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর স্থাপিত। প্রহরীরা রাত্রে এই মাচার উপর শয়ন করিয়া বাগান পাহারা দেয়। মাচার নীচে কতকগুলি ভস্ম ও অঙ্গার, বাঘের ভয়ে রাত্রে রাখালীরা আগুন জ্বালিয়া রাখে।

আমাদিগকে বাগানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দুই তিন জন রাখালী ভাল ভাল গাছে আম পাড়িতে উঠিল। তাহাদের হাতে এক একটি ছোট আঁকুশি; আঁকুশির অগ্রভাগে ছোট জালের ঝোলা, এই ঝোলায় আম পাড়িয়া তাহারা কোঁচড় পূর্ণ করিতে লাগিল। আধঘণ্টার মধ্যে রাশি রাশি আম স্তূপাকারে টোঙ্গের ভিতর জমিয়া গেল। তথন বন্ধু বাছিয়া বাছিয়া এক একটি আমে ছুরি চালাইতে লাগিলেন। ছোট বড় নানা আকারের নানাজাতীয় দেশী আম, তাহাদের নামই বা কেমন অদ্ভুত!—কুমড়োজালি, দুধে, পেঁপে, তিলে, তেলাকুচো, নাকি, সিঁদুরে প্রভৃতি আমের ভিতর তীক্ষ্ণ ছুরি চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমালোচনা চলিতে লাগিল। সেই দোষগুণের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার কাছে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা কোথায় লাগে! বিধাতার পরমলোভনীয় দান এই আমগুলি যেন মাসিকপত্রিকার প্রবন্ধ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর! কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের রসনা অপরিতৃপ্ত থাকিল না।

সমস্ত দিন ভয়ানক গরম গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা গেল। তাহার পর অল্প ঝড় উঠিল। রাখালীরা অতঃপর গাছের উপর থাকা নিরাপদ নহে বুঝিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি আমের ভাগ করিতে লাগিল। চারি ভাগে আমগুলি বিভক্ত হইলে তিন ভাগ বাগানের মালিক পাইলেন, এক ভাগ রাখালীরা পাইল। দুই শত আড়াই শত আম এক এক ভাগে পড়িল।

রাশি রাশি ধূলি ও গাছের পাতা উড়াইয়া প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল। তাহার পর কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। ক্ষুদ্রকুটীরে ময়লা ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়া অধিককাল অপেক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে ভাবিয়া আমরা বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আমাদের সঙ্গে একটিমাত্র ছাতা ছিল, আমাদের ভৃত্য কোথা হইতে একটা তালপাতার ছাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। তাহা মাথায় দিয়া বৃষ্টিধারা হইতে মাথা বাঁচাইয়া আমরা বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। গ্রামের লোক 'বাবু'দের মাথায় তালপাতার ছাতা দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

বাড়ী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় মেঘগর্জ্জন। অন্ধকার আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত নীলাভ বিদ্যুতের জিহ্বা নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর চট্‌পট্‌ শব্দে শিলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা গামছা মুড়ি দিয়া শিলা-সংগ্রহের জন্য জলে ভিজিতে লাগিল। শীতল বায়ু-হিল্লোলে গ্রীষ্মের জ্বালা প্রশমিত হইল।

তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। ক্ষুদ্র গ্রামখানি সেই অন্ধকারের মধ্যে বৃক্ষ-পল্লব-সমাচ্ছন্নদেহে মৌনভাবে সিক্ত হইতে লাগিল। পথে জনমানব কেহ নাই। কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ জলের শব্দ! বিরলবসতি পল্লীর দূরে দূরে সংস্থিত মৃণ্ময় গৃহের বাতায়নপথে মৃৎপ্রদীপের ম্লান শিখা সেই ঘনবর্ষণের ভিতর দিয়া কি এক রহস্যময় কুহকের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল, এবং ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে বোধ হইতেছিল, ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্তসীমায় আরব্য-রজনীর-উপন্যাস-লোকবাসী কোনও দুর্দ্দান্ত যক্ষদল তাহাদের অদৃশ্য মায়াপুরী হইতে শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পরস্পরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে!

এক ঘণ্টার মধ্যেই ঝড়জল সমস্ত থামিয়া গেল। গ্রীষ্মের প্রতপ্ত প্রকৃতি সুশীতল হইল। গুল্মান্তরালে খদ্যোতের আলোক হীরকদীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিল, এবং সুপ্তপ্রায় অরণ্যের অন্তরাল হইতে ঝিঁঝিঁর দল অবিচ্ছেদে যে ঝিল্লীধ্বনি আরম্ভ করিল, তাহা যেন সেই দিগন্তব্যাপী নৈশ অন্ধকারের প্রান্ত হইতে পল্লী-প্রকৃতির মর্ম্মকাহিনী বহিয়া আনিতে লাগিল।

সহসা সেই শব্দ ডুবাইয়া শ্যামসুন্দরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে খোল করতালের মিশ্র ধ্বনির সহিত পল্লীর সংকীর্ত্তনের দল সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন,—

"সংকীর্ত্তন মাঝে আমার গৌর নাচে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

আর্য্যজাতির প্রসার ও দিগ্বিজয়।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ জানুয়ারী মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে "আর্য্যজাতির বিস্তার" বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কেমন করিয়া আর্য্যঋষিগণ ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত-বর্ষকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া ভারতবিজয়ী আর্য্যগণ ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারও ইতিহাস-কথা বিবৃত আছে। ঋগ্বেদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত আর্য্যগণের বিস্তৃতির পর্য্যায় ও ক্রমবিকাশের কথা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি নানা দেশে আর্য্যগণের বিস্তৃতির উল্লেখ নাই করিলাম। যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন,

ঋগ্বেদ ও গোভিলগৃহ্যসূত্রাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আর্য্যজাতির বিস্তারের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি জয়ের কথা লোকসমাজে তত প্রচারিত নাই। তাহারই বিবৃত আলোচনা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মে রাজবংশের একটা ইতিহাস আছে, উহার নাম মহাধাজাবিণ। উহাতে লেখা আছে যে, শাক্য-বংশজাত অভীরাজা ব্রহ্মে যাইয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তর ব্রহ্মে তাগাউঙ্গ নগরে তিনি রাজধানী স্থাপিত করেন। অভীর পরে বত্রিশ জন রাজা উত্তর ব্রহ্মে রাজত্ব করেন। পরে পূর্ব্বদেশ হইতে চীন আক্রমণকারিগণ আসিয়া শক-বংশকে পরাজিত ও পরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে। আরও এক জন শকরাজ ঠিক এই সময়ে উত্তর ব্রহ্মে গমন করেন। ইঁহার নাম দাজা সাজা। তিনি যে সময়ে উত্তর ব্রহ্ম জয় করেন, সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। খৃষ্টপূর্ব্ব নবম কি দশম শতাব্দীতে যে আর্য্যগণ ব্রহ্ম দেশ বিজয় করেন, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের ভাষায় পালির সহিত অনেক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। সপ্তাহের সাত দিনের সংস্কৃত নামই বজায় আছে। ব্রহ্মগণ পিতৃপুরুষের ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মেও মনু ব্যবস্থাপক ছিলেন। "ধম্মথাট্" ব্যবস্থাপুস্তক ব্রহ্মের মনু কর্ত্তৃক লিখিত। ব্রহ্মের পূজাপাঠের অন্যান্য আচার ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী হইয়া থাকে। এখনও হিন্দুর মত অনেক রীতিপদ্ধতি প্রচলিত আছে। গুপাদি খনন করাইলে পুরাতন দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ব্রহ্মে তৈলঙ্গ দেশ হইতে হিন্দুগণ যাইয়া বসতি করেন। টিহ বা টীশ রাজা দক্ষিণ ব্রহ্মে রাজা হয়েন। ইনি কণারক বা কর্ণাকের রাজা ছিলেন। এই সিহ, টিহ, টীশ, ফীহ রাজা খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে রাজত্ব করেন। ইনি সুবর্ণভূমি বা থাটন নগরে রাজ্য করিতেন। এই তৈলঙ্গ বংশের অনেক কীর্ত্তি এখনও দক্ষিণ ব্রহ্মে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম হইতে হিন্দুগণ শ্যামরাষ্ট্রে, ইন্দুচীন বা নব-কাম্বোজে, এনাম বা নব-কম্প বা কাম্পিল্য দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। শ্যামরাষ্ট্রের রাজধানীর নাম 'অযোধ্যা' বা 'আয়িথেয়া' হইয়াছিল। শ্যামে নব কোশল প্রদেশ ছিল। কৌণ্ডিল্য ঋষি বা ব্রাহ্মণ কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া দেশে যাইয়া রাজা হন। নবকাম্বোজে এখনও ব্রাহ্মণশাসনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কাম্বোজসাম্রাজ্য বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল। কাম্বোজে যে সকল মন্দির এখনও বিদ্যমান, তাহা হিন্দুগণের স্থপতিবিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শনস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একটি মন্দিরে পাঁচ হাজার প্রস্তরস্তম্ভ আছে। মন্দিরগাত্রে রামায়ণের নানা ঘটনার আলেখ্য ক্ষোদিত আছে। পাথরের গাঁথুনিই অপূর্ব্ব! এমন গাঁথুনি এখন হয় না। ইহার নাম অসোকর-বাট। যবদ্বীপে "বরোবাদর" বা বারদোয়ারী নামধেয় আর একটি অপূর্ব্ব মন্দির এখনও আছে। উহা অসোকর-বাটের প্রতিকৃতিস্বরূপ। সুমাত্রা ও যব দ্বীপকে প্রাচীন হিন্দুগণ যবদ্বীপ নামেই জানিতেন। সুমাত্রার একটা সংস্কৃত শিলালিপিতে আছে যে, "রাজা আদিত্যবর্ম্ম প্রথম যবভূ"। ইহা খৃঃ অব্দ ৬৫৬ সালে লিখিত হয়। যবদ্বীপের উল্লেখ রামায়ণেও আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, যবদ্বীপই রামায়ণের লঙ্কা; অন্ততঃ বিবরণসাদৃশ্য সম্পূর্ণ আছে। যবদ্বীপে ব্রাহ্মণশাসন অতি দৃঢ় ছিল। এখানে বৌদ্ধবিপ্লব বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। বালী, লম্বক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপেও এখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, অগ্ন্যুদগারে ও আগ্নেয় গিরির উৎপাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত

হইয়াছে। বোর্ণিও, সেলিবিজ প্রভৃতি দেশেও ব্রাহ্মণশাসনের, আর্য্য-প্রাধান্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। স্তূপাদি খনন করিয়া অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। রাজা ব্রুকের সময়ে বোর্ণিও দেশের একটা বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়। তাহাতে হিন্দু-প্রাধান্যের কথাই আছে। সিংহল দ্বীপে বিজয় সেন যাইয়া রাজ্যবিস্তার করেন। তবে অধ্যাপক রীস্ ডেভিড্স্ এ কথায় আস্থাস্থাপন করেন না। চীনের অনেক স্থানে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রাদির আবিষ্কার হইয়াছে। কোরীয়া দেশে প্রকৃতই এক শিবমন্দির দেখা গিয়াছে;—সেই গৌরীপট্ট, সেই শিবলিঙ্গ—সেই সবই বর্ত্তমান। কিম্বদন্তী আছে যে, জাপানেও বাঙ্গালী হিন্দু গিয়াছিলেন। অন্য দিকে—খোটান, বাদাক্শান্, সমরখন্দ প্রভৃতি দেশে ডাক্তার ষ্টীন হিন্দু ধর্ম্মের ও সভ্যতার নিদর্শন পাইয়াছেন। গোবী মরুদেশের বালুকানিমজ্জিত অনেক গ্রাম পল্লী উৎখাত হইয়াছে। সেই সব ভূগর্ভস্থ গ্রাম ও পল্লীতে হিন্দুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার ষ্টীন একখানি পুস্তক রচনা করিয়া এই সব কথার আলোচনা করিয়াছেন। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিমে পারস্যদেশ হইতে দক্ষিণে ভারত ও পূর্ব্বে জাপান পর্য্যন্ত হিন্দুত্বের বিস্তার এককালে ছিল। সম্প্রতি সোমালি প্রদেশে, ম্যাশোনাল্যাণ্ডে এবং মধ্য আফ্রিকায় হিন্দুয়ানীর নানা চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। বিখ্যাত পাইওনীয়র পত্রে এই বিলুপ্ত হিন্দুত্বের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। সোমালি দেশে কিম্বদন্তী আছে যে, এক প্রবলপরাক্রমশালী হিন্দুরাজা সে দেশে বহুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। পরে মুসলমানগণ তাঁহাকে পরাজিত করে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ মুসলমান হয়। যাহারা মুসলমান হইল না, তাহারা আদিমনিবাসীদিগের সহিত মিশিয়া গেল। এই সব নানা বিষয়ের অনুধাবন করিলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আজ যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান জাতি পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তেমনই এককালে এই ভারতের হিন্দুগণও সাগরাম্বরা ধরিত্রীকে করামলকবৎ আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

যুগ-প্রলয়।

গত জানুয়ারী মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে মিষ্টার গস্‌লিং "যুগ-প্রলয়" এবং ভূস্তরের প্রাকৃত পরিবর্ত্তনের বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। সে প্রবন্ধের মর্ম্ম বুঝিবার পূর্ব্বে, আমাদের গুটিকয়েক বিষয় প্রথমে জানা উচিত। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা অগ্রে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, পরে প্রবন্ধের কথা কহিব।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, সকল দেশের জলবায়ুর অবস্থা এখন যেমন আছে, পূর্ব্বে তেমন ছিল না, পরেও তেমন থাকিবে না। অর্থাৎ 'আব্-হাওয়া' নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অবস্থামাত্র। যে দেশ এখন চিরতুহিন-সমাবৃত ও জীববাসের যোগ্য নহে, সে দেশের ভূস্তরে, তুষার-বিস্তারের স্তরে স্তরে গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী জীবজন্তুর কঙ্কালমালা প্রোথিত রহিয়াছে; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃক্ষগুল্মলতার অঙ্গারক-চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। যে দেশ এখন নদনদী-পর্ব্বতপরিবৃত হইয়া নানা জনপদ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যায়, সে দেশ এককালে মেরুতুষারবিস্তারে অবগুণ্ঠিত ছিল। সমুদ্রগর্ভ পরিদর্শন করিয়াও বুঝা যায় যে, আট্‌লাণ্টিক, ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে দেশ ও মহাদেশ ছিল; এখন সে সব অতলতলে ডুবিয়াছে। কেন এমন হইল? কোন্ শক্তির প্রভাবে এমন খণ্ডপ্রলয় সংঘটিত হয়?

পৃথিবীর দুইটি মেরুর চারি দিকে দুইটি তুষার-কিরীট বিরাজ করিতেছে। উত্তরমেরুর অপেক্ষা দক্ষিণমেরুর তুষার-আস্তরণ বৃহত্তর ও বহুদূরব্যাপী। দক্ষিণমেরুর চারি দিকেই বিশাল সমুদ্র, অত বড়, অমন গভীর সমুদ্র পৃথিবীর আর কোনখানেই নাই। দক্ষিণ ভারতসমুদ্র ও প্রশান্ত সাগরের স্থানে স্থানে এত গভীর জল যে, অনেকে অনুমান করেন, বুঝি বা এ সমুদ্রের তলদেশ নাই। দক্ষিণ-মেরুর বিরাট 'গ্লেসিয়র' ভিত্তির উপর এই জলরাশি চল্ চল্ করিতেছে;—ভিতরেও জল, বাহিরেও জল, চারি দিকে জল,—অতল, অপার, অগাধ, অজের জলরাশি নানাশক্তিসামঞ্জস্যে স্থির হইয়া আছে, এবং এই জলরাশির উপর পৃথিবী—মহীমণ্ডলের মৃৎখণ্ডমাত্র যেন অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ভাসমান রহিয়াছে; বিরাট মৃৎপিণ্ড নিজের ভারে কিছু নিমজ্জিত, এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা কিছু বা সংহত ও সঙ্কুচিত। এখন যে পর্য্যায়, তাহাতে, উত্তরমেরুর দিকেই মৃৎপিণ্ড জলের উপরে জাগিয়া থাকিবে,—আছেও তাহাই। উত্তরে যেটুকু জাগিয়া আছে, সেইটুকুতেই জীবজগতের বিকাশ হইয়াছে। ভূমণ্ডলের দুইটি গতি আছে;—প্রথম দৈনিক-আবর্ত্তনগতি, দ্বিতীয় পরিক্রমণগতি—সূর্য্যের চারি দিকে পরিক্রমণগতি। সূর্য্য যদি স্থির থাকিত, সৌরমণ্ডলে যদি অন্য কোনও শক্তির ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর এই দুইটি গতির কোনও বিপর্য্যয় কখনও ঘটিত না। কিন্তু বিপর্য্যয় ঘটে; সে বিপর্য্যয়ঘটনার একটা পদ্ধতিও আছে; একটা কালনির্দ্দেশও আছে। কোনও ক্রমে এই ভাসমান পৃথিবীর শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই একটা ওলটপালট হইয়া যায়। দক্ষিণের জলরাশি উত্তরে যায়, দক্ষিণমেরুর তুষারকিরীট চূর্ণ হইয়া যায়, সেই বিচূর্ণিত খণ্ড সকল উত্তরমেরুর তুষার-আস্তরণের পুষ্টিসাধন করে। যেখানে জল ছিল, সেখানে স্থল হয়; যেখানে স্থল ছিল, সেখানে অগাধ নীলাম্বু উত্তালতরঙ্গে নাচিতে থাকে। ইহাই যুগ-প্রলয়, বা খণ্ডপ্রলয়।

চক্রধুরের দুইটি মুখে আমাদের পৃথিবীর দুইটি মেরু অবস্থিত। ইহা ছাড়া অন্য মেরু আছে। উহাকে ইংরেজীতে 'ম্যাগ্‌নেটিক পোল' বলে। পুরাণের এক আখ্যায়িকায় আছে যে, ধরাদেহের একটা 'তমুপ' শক্তি আছে; এই তমুপ ধরার ব্রহ্মরন্ধ্রে সঞ্চিত থাকে; এবং সেই স্থান হইতে চক্রাকারে—সর্পগতিতে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র বিসর্পিত ও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যখন ধরার ভার অসহ্য হয়,—অর্থাৎ শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তখন এই তমুপ শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। মনে হয়, এই 'তমুপ' ইংরেজী 'পার্থিব ম্যাগ্‌নেটিজম্' মাত্র। যাহা হউক, এই ম্যাগ্‌নেটিক পোলের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; ইহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তন—জলবায়ুর বিবর্ত্তনও সংঘটিত হয়। বিলাতের অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়া থাকেন যে, এই গোলক-পৃথিবীর গর্ভে আর এক গোলক আছে। উপরের গোলক যেমন ঘুরিতেছে, ভিতরের গোলকও তেমনই ঘুরিতেছে। কেবল উভয়ের গতি বিপরীত। এই দুই আবর্ত্তনগতির সংঘর্ষে পৃথিবীর 'ম্যাগ্‌নেটিজমের' উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধরাগর্ভস্থ গোলকের ঘূর্ণন-গতি সূর্য্য-পরিক্রমণ গতির দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। এই শাসনসামঞ্জস্যের বিপর্য্যয় মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। এই বিপর্য্যয়েই খণ্ডপ্রলয়।

এইবার মিষ্টার গস্‌লিংএর কথা বলিব। সহস্র বৎসর অন্তর মহাবিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণাংশে আবহবিকৃতি হয়। রাশিচক্রের বিন্যাস-বিপর্য্যয়ে এইটুকু হইয়া থাকে। ফলে, কখনও বা উত্তর দিকে আট দিন অধিক শীত বা গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, কখনও বা দক্ষিণাংশে আট দিন

অধিক শীত বা গ্রীষ্ম হয়। গত ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরখণ্ডে পূর্ণ-অষ্টাহ কাল অধিক গ্রীষ্ম ছিল; এখন সাড়ে সাত দিনও নয়। চারি শত বৎসর পরে. অর্থাৎ ২৩০০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাংশে শীতাধিক্য হইবে। পৃথিবীর মেরুশলাকা সূর্য্যের চারি দিকে ঘনকোণের হিসাবে (conical motion) ঘুরিয়া থাকে; ইহাকে ইংরেজীতে Precession cycle কহে। এই আবর্ত্ত ২৬০০০ বৎসরে পূর্ণ হইয়া থাকে;—এই গতিজনিত আবহ-বিপর্য্যয়ও ২৪০০০ বৎসরে হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে একটা কল্পের স্থিতি ৮৬৪০০০০ বর্ষ ব্যাপী, এবং মহাকল্পপ্রলয় সহস্র কল্পে পূর্ণ হয়;—অর্থাৎ, ৮৬৪০০০০০০০ বর্ষকালব্যাপী। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, উল্লিখিত দৈবদিনে কল্প ও মহাকল্প প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাদাসিধা হিসাবে ৩৬০ চান্দ্রদিনের দ্বারায় বিভাগ করিলে একটা কল্প ২৪০০০ বৎসর স্থায়ী হয়; এবং মহাকল্পপ্রলয় ২৪০০০০০০ বর্ষকাল স্থায়ী হয়। বর্ত্তমান কালের ভূতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্তের সহিত এক হইল।

কল্পান্তে কি হয়? দুই মেরুর তুষারকিরীটের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; আবার নূতন সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। আগামী কল্পে উত্তরমেরুর তুষার-আস্তরণ বর্দ্ধিত হইবে; দক্ষিণমেরুর তুষার-উষ্ণীষ এখন হইতেই ক্ষীয়মাণ। আর পাঁচ হাজার বৎসর পরে পূর্ণক্ষয় সম্ভাবিত হইবে। ফলে উত্তরদেশ জলে নিমজ্জিত হইবে, ইউরোপের অর্দ্ধেক জলে ও বরফে ঢাকা পড়িবে, ভারতের জলবায়ুর অবস্থা বর্ত্তমান ইতালীর মত হইবে; ভীষণ গ্রীষ্ম আর থাকিবে না। দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভ হইতে নূতন দেশ উত্থিত হইবে। পুরাকালের 'আটলাণ্টিস্' মহাদেশ আবার জাগিবে; আর দক্ষিণ-সাগরগর্ভস্থ 'লেমুরিয়া' আবার জীববাসযোগ্য হইবে। ভারতবর্ষ চিরস্থায়ী দেশ, ভারতবর্ষের কোনও বিকৃতি ঘটিবে না। ডাক্তার ব্লানফোর্ড বলেন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা পুরাতন, মনুষ্যের আদি বাসস্থান। সহস্র বৎসর পরে আবার বৈদিক ভারত জাগিয়া উঠিবে। আবার সরস্বতী দেখা দিবে, আবার লবণী ও মধুমতী প্রবলা হইবে, আবার প্রকৃত ত্রিবেণী পরিস্ফুট হইবে! আমাদের চারি যুগের স্থিতিকাল ১, ২, ৩, এবং ৪,—এই অনুপাতে নির্দ্ধারিত আছে। পঞ্জিকা প্রভৃতিতে যুগসকলের যে স্থিতিকাল নির্দ্ধারিত আছে, তাহাকে ৩৬০ চান্দ্রদিনে ভাগ করিলে, ভুতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত সকল পৌরাণিক সিদ্ধান্ত এক হইয়া যাইবে। প্রথমে হেলি, পরে ডাক্তার ওয়ালেস্, ড্রেসন, সার রবার্ট বল, গীকী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ যে সব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত সে সকলই এক হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগের প্রথমে দেহত্যাগ করেন। আরও ৪২৭০০০ বর্ষ পরে কলিযুগের শেষ হইবার কথা। অর্থাৎ, পৌরাণিক হিসাবে, ৪৩২০০০ বর্ষে কলিযুগের শেষ হইবে। এই ৪৩২০০০ কে ৩৬০ দিয়া ভাগ করিলে, ১২০০ বর্ষ হয়। গত ১২৪৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে কলির এক পর্য্যায় অতীত হইয়াছে; আরও ১২০০ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ২৪৪৮ খ্রীঃ অঃ পরে, অন্য পর্য্যায় শেষ হইবে। অর্থাৎ, মোট ৭০০০ বর্ষ কলিকল্পের স্থিতি আছে।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য হিন্দুগণ শীতপ্রধানদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার কথা এক হিসাবে ঠিক। যখন উত্তরমেরুর তুষার-উষ্ণীষ ইউরোপকে গ্রাস করিয়াছিল, তখন মধ্য-এসিয়া ক্ষেত্রে মেরু-শীতের প্রাদুর্ভাব ছিল। আর্য্যগণ উত্তরাখণ্ডে বাস করিয়া মেরুদেশের জলবায়ুর অবস্থা উপভোগ করিতেছিলেন। এখন নরওয়ে বা উত্তর-রুষের যে অবস্থা-

তখন পারস্য দেশের ও মধ্য-এসিয়ার সেই অবস্থা ছিল। সুতরাং আর্য্যগণ চিরদিনই আর্য্যভূমিতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, নরওয়ে বাল্টিক উপকূলে ছিলেন না। সে আজ সাত হাজার বর্ষের পূর্ব্বের কথা। তখনই মেরু-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। আর্য্যগণ প্রথমে দক্ষিণ দেশে আসেন; পরে আবার উত্তরদেশে গমন করেন। জলবায়ুর অবস্থাবিপর্য্যয়ের সহিত আর্য্যগণের গতাগতির নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে।

এই সব পরিবর্ত্তনের সূচনা ধীরে ধীরে হয়; কিন্তু প্রলয়কাণ্ড হঠাৎ হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রথম সূচনা মহাপ্লাবনে হইয়া থাকে। মাষ্টোডন, মামথ প্রভৃতি বিলুপ্ত বিরাট জীবগণের কঙ্কাল ও মাংসাস্থিবিশিষ্ট দেহ সাইবীরীয় তুষারস্তরে পাওয়া গিয়াছে। সকল জীবেরই মুখ দক্ষিণ দিকে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই হয় যে, উত্তর দিক হইতে জলপ্লাবন আসিতেছিল, তাহারা প্রাণভয়ে দক্ষিণে পলাইতেছিল; পরে বিশাল তুষারক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার মেক্সিকো দেশে এমন গাছপালা আছে, যাহা পশ্চিম আফ্রিকায় পাওয়া যায়। সুতরাং মধ্যে আটল্যাণ্টিক-গর্ভে যে একটা বিরাট দেশ নিমজ্জিত আছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। নহিলে মধ্য-আমেরিকার সহিত মধ্য-আফ্রিকার সকল বিষয়ে এত সাদৃশ্য থাকিবে কেন?

এই ভাবের নানা কথায়, মিষ্টার গস্‌লিং অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত জ্যোতিষী গণনার পরিচয় দিলাম না। গস্‌লিং সূক্ষ্ম গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমাদের পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব নিতান্ত গাল-গল্প নহে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর অবস্থিত। ব্যাপার এই যে, পৃথিবী আর একটা বড় পরিবর্ত্তনের দিকে যেন দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে। এ গতির লক্ষণ বুঝা যায়—প্রথম সমাজ-বিপ্লবে, পরে ধরা-বিপ্লবে। সমাজ-বিপ্লবের আরম্ভ হইয়াছে। ধরা-বিপ্লবেরও সূচনা হইয়াছে; কেবল অপেক্ষা প্রলয়কাণ্ডের। এই ত এত হিসাব-নিকাশ; আবার বে-হিসাবের ব্যাপারও আছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে, বিশাল সৌরমণ্ডলও তেমনই আর একটা কোন অজ্ঞেয় কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতেছে। সেই মহামণ্ডলের গতিবিধি মানববুদ্ধির অতীত। সৌরমণ্ডলে যেমন গ্রহগণের আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে, নানা সৌরমণ্ডলেরও তেমনই একটি আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধেরও বিপর্য্যয় ঘটে। বর্ত্তমান কালের জ্যোতিষি-গণ গগনমণ্ডলের একটা কেমন-কেমন ভাব দেখিতেছেন। ইহার ফলে কি হইবে, কে জানে!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। "মাঙ্গলিক" একটি ক্ষুদ্র গান। বৈঠকখানায় গুন্ গুন্ করিয়া গাহিলে ক্ষতি ছিল না; সাহিত্যের আসরে চীৎকার করিয়া গাহিবার যোগ্য নয়। কবি ভারতীকে বলিতেছেন,—

"তব বঙ্গমঙ্গলা মূরতিখানি জপিতে শিখাও বর্ষ বরষ!"

কিন্তু ভারতী ভক্ত কবির এই বিষম আবদার শুনিয়া কি মনে করিতেছেন, বলিতে পারি না। মূর্ত্তির ধ্যান বুঝিতে পারি, মূর্ত্তির জপ কিরূপ? যদিও ভারতী শব্দ ও অর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বোধ করি, তিনিও ইহা বুঝিতে পারিবেন না। চারি চরণ সম্পূর্ণ করিতে যখন এতটা ঘর্ম্মব্যয় এবং ভাষা ও

ভাবের এমন বিপর্য্যয় করতে হয়, তখন এ বিড়ম্বনা কেন? "অনুতাপ" শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত আর একটি গান। বিশেষত্ব নাই। আন্তরিকতার অভাবে রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "নারায়ণী" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতার জ্ঞানযোগে" নূতন কথা দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 'ঘুমঘোরে অচেতন' ছিলেন; 'সহসা কোকিলকণ্ঠ' তাঁহাকে 'বসন্তের শুভ আগমন' জানাইয়া দিল, সুতরাং তিনি জাগিয়া দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া লিখিতে বসিয়া দেখিলেন, তাঁহার "ব্যাকুল হিয়া দিক্‌বিদিক্ হারাইয়া ডুবে গেল অজ্ঞাত অতলে!" এই ঘুম-ভাঙ্গার কাহিনীটি ছন্দের খাঁচায় পুরিয়া, "আবেশ" এই লেবেল দিয়া ভারতীর কুঞ্জে টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "কুমারজীব" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "লখ্যা" শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা। এবারকার ভারতীর কবিতায় সুরের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কর্ত্তব্যের সহচরী রমণী দুর্ব্বার, প্রেতাত্মার পদে তব করি নমস্কার।"

'এড্‌মিরেশন' ও ভক্তির এমন 'হাড়জ্বালানে' অভিব্যক্তি সচরাচর দুর্লভ। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চীনপ্রবাসীর পত্রে"র দ্বিতীয় দফা বহুবিধ 'আগড়ম্ বাগ্‌ড়মে' পরিপূর্ণ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "উর্ব্বশী ও তুকারাম" নামক ক্ষুদ্র নাটকের যতটুকু এবার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "কালীকট্ট" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেনগুপ্ত "প্রথম বসন্ত" নামক কবিতাটিতে এক নিশ্বাসে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি এই,—

"কাননে প'ড়েছে দাগ শত চুম্বনের?"

আমরা খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু বসন্তের নাক্-খতের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই নাই। এমন কবিতার বিষয়ীভূত হইলে অনেককেই নাকে খত দিয়া পলাইতে হয়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিলাদিত্য" নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখকের কলাকৌশল প্রশংসনীয়। 'চলিত ভাষা'র অনাবশ্যক আতিশয্য না থাকিলে গল্পটি বোধ হয় আরও মনোরম হইত।

প্রবাসী। 'বৈশাখের' প্রথমেই শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের রচিত "কুমারী" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাসের কিয়দংশ। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "চিত্রে দর্শন" নামক প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর ওয়াটসের চিত্রকলার পরিচয় দিয়াছেন। সূচীপত্র দেখিয়া জানিলাম, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "যথার্থ প্রেমিক" নামক রচনাটি একটি ক্ষুদ্র গল্প। নতুবা গল্প বলিয়া চিনিতে পারিতাম না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "বৌদ্ধ সংন্যাস" নামক সংকলিত প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত "রত্ন-পরীক্ষা" নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "অসভ্য জাতির দেবতা" নামক সংকলিত প্রবন্ধটির বিশেষত্ব নাই। লেখক কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, পরিপাক করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "কাউয়েল-কৃত চণ্ডীর অনুবাদ" নামক প্রবন্ধে দেখিলাম, প্রফেসার ই. বি. কাউয়েল কবিকঙ্কণচণ্ডীর অনেকাংশ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যালের অতিরিক্ত সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "অদৃষ্টের পরিহাস" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু তেমন 'ঘোরালো' বা

'জমকালো' নয়। সহজ পল্লীজীবনের বৈচিত্র্যহীন সরল কাহিনী। গল্পটির চরিত্র-চিত্র অপেক্ষাকৃত ম্লান বটে, কিন্তু গল্পের রঙ্গভূমি বঙ্গপল্লীর সৌন্দর্য্যের আলোকে সমুজ্জ্বল। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত গবর্ণমেণ্টের নবপ্রচারিত শিক্ষানীতি" নামক সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটি এবারকার প্রবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। "প্রবাসী বাঙ্গালী বিদ্বেষ" নামক প্রবন্ধটি হিন্দী মাসিক ও সাপ্তাহিকে আলোচিত হইলে শুভ ফলের ভরসা করা যায়। আশা করি, আমাদের হিন্দী সহযোগি-গণ স্ব স্ব পত্রে অনুবাদ করিয়া দিবেন। "বালবিধবা" নামক প্রবন্ধে লেখক বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "সামাজিক পবিত্রতার, করুণার, ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়া সকলকে বলি, লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয় অগ্রাহ্য করিয়া সকলে বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।" রচনায় ও রসনায় অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। এখন কাজ চাই। এ দেশে সৎকার্য্যের চেষ্টাই দেখা যায় ; সে চেষ্টা কখনও কার্য্যে পরিণত হয় না। বিধবা-বিবাহই বা আমাদের এই সনাতন জাতীয় রীতির বহির্ভূত হইবে কেন? "বর্ষ-আবাহন" শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর একটি কবিতা। ছেলেবেলা 'ঐ জুজু!' বলিলে যত না ভীত হইতাম, এখন "আসে ঐ নূতন বরষ" শুনিলে তদপেক্ষা অধিক শঙ্কিত হই। কেন না, নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বন্যায় ভাসিয়া যাইবার ভয় থাকে। আলোচ্য কবিতাটি তত ভয়ানক নয়।

"কুলু কুলু ধ্বনি করি স্মৃতির বাহিনী মরি তরঙ্গে রঞ্জিয়া রবিকর,
পিছে রাখি কুয়াসারে ছুটে আসে অভিসারে নব আশে প্রফুল্ল অন্তর।

সুদীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে এই চারিটি চরণ উপভোগ্য। অবশিষ্ট নববর্ষসুলভ মামুলী কবিত্বের সুদীর্ঘ 'ক্যাটালগ্'। দুঃখের বিষয় এই, এমন সুকুমার ভাবটিকে কবি অনুরূপ ভাষায় অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। "তরঙ্গে রঞ্জিয়া রবিকর" অর্থ কি? তরঙ্গ রবিকরে রঞ্জিত, বা 'তরঙ্গ মাখিয়া রবিকর' ইহাই বোধ হয় কবির অভিপ্রেত। কিন্তু তাঁহার ভাষায় সেরূপ অন্বয় হয় না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "প্রবাসী"তে বিশেষত্ব নাই। দুনিয়া আমাদের প্রবাসভূমি, ইহা নূতন কথা নয়। বিজয় বাবু সেই পুরাতন কথাটি নূতন করিয়াও বলিতে পারেন নাই। সুতরাং কবিতাটির জন্মই বিফল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "অভিশপ্তা" নামক কবিতায় বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলার অভিশাপচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রচনাটি দেখিয়া মনে হয়, শব্দ-চিত্র আঁকিবার অনেক উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এত ক্ষুদ্র পটে অত বড় চিত্র টানিবার শক্তি নাই। লেখকের শব্দসম্পদ আশাপ্রদ।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ। "বিদ্যাপতির প্রকাশিত পদাবলী" নামক প্রবন্ধটি প্রীতিপ্রদ। আদিকবি বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ কাহার না প্রীতিকর? শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের "স্মৃতিমন্দির" সুখপাঠ্য। কিন্তু রচনাটি কোন্ শ্রেণীর? কেহ বলেন, মহারাজার মন্দির দার্শনিক পাথরে গাঁথা। কেহ বলেন, ইহা কবিতার ঈথরে ভাসিতেছে। 'অপ্রকাশিত বিদ্যাপতি' বলিতেছেন,—

"দর্শন কবিতা দুঁহু মিলি গেল।
প্রবন্ধক পদ দুঁহু মাসিকে নেল॥"

মন্দিরের উপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "হনুমান" উপবিষ্ট। আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা নাই।

মঞ্জুষা।

এই গ্রন্থে তেরটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। অনেকে তাঁহাকে সুকবি বলিয়া জানেন ও তাঁহার কাব্যের অনুরাগী।

"মঞ্জুষা" গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু কবি তাঁহার কন্যা শ্রীমতী রমা দেবীর সুহস্তে সাদরে ও সোহাগে যে একটি সুন্দর উৎসর্গরূপী ফুলের তোড়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যভাগে একটি কবিতার পদ্মকরবী বসান আছে—তাহা অতি সুন্দর।

রমার বয়স যখন চারি বৎসর, তখন কবি তাহার নামে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। কন্যাবৎসল পিতা কন্যাকে বলিতেছেন,—"এখন তুই বড় হইয়াছিস্ ও গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিস্, তাই এই বইখানা তোকেই স্নেহের উপহার দিলাম।"

আমরা বলি, শুধু রমা কেন—এই দুঃখদৈন্যপরিপূর্ণ মুল্লুকে ছেলে বুড়া, স্ত্রীপুরুষ, অনেকেই "গল্প শুনিতে খুব ভালবাসে।" কিন্তু আমরা গল্পের মত গল্প পড়িতে পাই কই? সেই ত আপশোষ। অন্নচিন্তা ও গোলামী করিতে করিতেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত। আর Art is long and time is fleeting—Clarissa Harlowe-র মত Brobdignang আকারের বৃহৎ উপন্যাস পাঠ করিবার না অবকাশ আছে, না প্রবৃত্তি আছে। অতএব, যাঁহারা আমাদিগকে সুরুচিপূর্ণ, মনোজ্ঞ, ভারতীর সুপবিত্র ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য ছোট গল্প দেন, তাঁহারা আমাদের উত্তমর্ণ—আমরা তাঁহাদের কাছে ঋণী।

অদ্য আমরা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথের কাছেও এই জন্য সবিশেষ ঋণী। যাদুকর কবি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পর এমন সুমিষ্ট ছোট গল্প পাঠ করি নাই। সব গল্পগুলিই সুন্দর—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দর। বইখানি একবার ধরিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। বাস্তবিক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাঠ শেষ করিতে ইচ্ছা করে। যে বাটীতে "মঞ্জুষা" প্রবেশলাভ করিবে, আমাদের বিশ্বাস যে, তথায় ছেলে বুড়ো সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া বইখানা পড়িবেই পড়িবে।—রুচিভেদে কেহ বলিবে, "বুড়ী" গল্পটি গল্পের সেরা; কেহ বলিবে, "লাঠির কথা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কেহ বলিবে, "খ্রীষ্টানের আত্মকথা" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফল কথা, সব গল্পগুলিই সুন্দর। সহৃদয় পাঠক পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিবেন, ইহা অত্যুক্তি নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য যে, এই রসলীলাময়ী "মঞ্জুষা" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গদ্য লীলাময়, ছন্দোময়। বড় আক্ষেপের বিষয় যে, গদ্য লিখিতে বসিয়া অনেকেই ভুলিয়া যান যে, গদ্যেরও ছন্দ আছে।

বড় গল্পে গোঁজামিলন চলে; ছোট গল্পে তাহা চলে না। বলা বাহুল্য, খুব পাকা হাত না হইলে ছোট গল্প লেখার প্রয়াস করা বিড়ম্বনামাত্র। যে যে মাল মশলায় ছোট গল্প প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসমস্তই সুনিপুণ "মঞ্জুষা"-প্রণেতার আয়ত্তাধীন। নিখুঁৎ ছোট গল্পের কি বিশেষত্ব ও তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য কি কি উপাদানের প্রয়োজন,—পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া সে সব লিপিবদ্ধ করিলে প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ ও 'কোটেশনে' কণ্টকাকীর্ণ হইবে, এই ভয়ে তৎপ্রয়াসে বিরত হইলাম।

লেখকের রচনাভঙ্গীতে নূতনত্ব ও মৌলিকতা আছে। উপদেশ দিবার ভান নাই, ধর্ম্মের গোঁড়ামি নাই, অথচ পাঠান্তে মন পবিত্র ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। লেখাগুলি যেন ফুল-গুলি। যেন কতকগুলি শিউলি ফুল সাজির মধ্যে হাসিতেছে।

পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই গার্হস্থ্য চিত্র। অই সোনায় সোহাগা হইয়াছে; তাই গল্পগুলি আমাদের সহানুভূতি সহজেই আকর্ষণ করে। সহৃদয় প্রকাশক মহাশয় যথার্থ কথাই বলিয়াছেন,—"অল্পপরিসরে আড়ম্বরহীন সহজ ভাষায় একটি সমগ্র চিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করিয়া হৃদয়কে দ্রব করিবার ক্ষমতাতেই লেখকের শিল্পনৈপুণ্য ও বাহাদুরী।" আমরাও বলি, সুধীন্দ্রনাথের লেখনী জয়যুক্ত হউক।

গ্রন্থের নামনির্ব্বাচনেও বাহাদুরী আছে। অপর কেহ হইলে "উপন্যাসসমষ্টি", অথবা ঐ প্রকারের কোন ক্যামেশ্‌কাট্‌কা গোচের নাম দিয়া পাঠককে বিপন্ন করিতেন।

"মঞ্জুষা"র অর্থ বাক্স। কিসের বাক্স? সম্ভবতঃ নামদাতা তাহা জানেন না। এ ক্ষেত্রে কালিদাস অপেক্ষা মল্লিনাথ বড়। আমরা সুধীন্দ্রবাবুকে ও সহৃদয় পাঠকদিগকে 'বাৎলাইয়া' দিতেছি।—"মঞ্জুষা" একটি আঙ্গুরের বাক্স। হাঁ,—আঙ্গুরের বাক্সে যেমন থাকে থাকে আঙ্গুর সাজান থাকে, এই "মঞ্জুষা"তেও তেমনই থাকে থাকে মধুররসপূর্ণ গল্পের আঙ্গুর সাজান আছে। ইহাতে ভ্যাজাল নাই, কারচুপি নাই। সবগুলিই টাট্‌কা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিবিধ।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ "সাহিত্য-পরিষদে"র বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভাষার ইঙ্গিত" নামক যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা "ভারতী"তে প্রকাশিত হইতেছে।

পরদিন রবিবার "পরিষদের" মাসিক অধিবেশনে, পরিষদের অন্যতর সহকারী সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র "শ্রীচৈতন্যের উৎকল-যাত্রা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সারদা বাবুর রচনাটি "প্রবাসী" পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

"পরিষদে"র সহকারী সভাপতি স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক বৎসরের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কংগ্রেসওয়ালাদের মত পরিষদ-ওয়ালারাও বলিতে পারেন, গবর্মেণ্ট "সাহিত্য-পরিষদ" হইতে দুই জন হাইকোর্টের জজ নির্ব্বাচিত করিলেন! সারদা বাবু ও আশু বাবু উভয়েই পরিষদের সহকারী সভাপতি।

পরিষদ হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রকাশিত করিবার কল্পনা ছিল। এত দিনে পরি-

ষদের সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত দেখিতেছি। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় কাশীদাসী মহাভারতের সম্পাদনভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারত-মুদ্রণের ব্যয়ভারও তিনি স্বয়ং বহন করিবার আশা দিয়াছেন। পরিষদের ও বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই।

নববর্ষে বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যে নাটকের বন্যা উপস্থিত। শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন পলী পড়ুক, সাহিত্যক্ষেত্র উর্ব্বর হউক, ভবিষ্যতে সাধনার ফল ফলিবে। নাট্য-জগতে সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক নাটক-কার নূতন নাটক লইয়া সমাগত। আশা করি, ইঁহাদের চেষ্টায় আমাদের নাট্যশালার শ্রী ফিরিবে।

প্রথমেই সুপ্রথিত নাটক-কার শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষের "সৎনাম" নাটকের উল্লেখ করিতে হয়। "সৎনাম" ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল; 'মুসলমান ভ্রাতাদের অনুরোধে' ও তৃতীয় অভিনয় রজনীতে 'নিরীহ' মুসলমান 'মবে'র 'সবিনয় হল্লা'র প্রভাবে "সৎনামে"র অভিনয় স্থগিত হইয়াছে। "সৎনামে"র চরিত্রবিশেষের মুখে মুসলমানের গালি ছিল। তাই মুসলমান সাধারণ বিচলিত হইয়াছিলেন।

সহোদর ভ্রাতাকেও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গালি খাইতে অনুরোধ করা যায় না। বৈমাত্রেয় মুসলমান ভায়াদিগকেও আমরা কাবাবের পরিবর্ত্তে কাহারও গালি নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিতে বলিতে পারি না। গিরিশ বাবুর নাটকের সমালোচনা ও গালিবিচারের এ স্থল নহে। আমরা কেবল গালাগালি বন্ধ করিবার যে উপায়টি মুসলমান-সমাজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। সে উপায়টি সমীচীন ও শিষ্টসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেসের কল্যাণে শিখিয়াছি, মুসলমান আমাদের ভ্রাতা; "সৎনামে"র কাণ্ডে জানিলাম, তাঁহারা আমাদের জ্ঞাতিও বটে। উভয় গোষ্ঠীরই মাথার উপর যখন বিদেশীর নিরপেক্ষ চাবুক সমানভাবে সমুদ্যত, তখন কি এরূপ জ্ঞাতিবিরোধ আত্মকলহ শোভা পায়? এই উপলক্ষে মুসলমানী পত্রবিশেষ যে বিষ উদ্গার করিতেছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের সখ্যই জর্জ্জরিত হইতেছে। যে পত্রের ও যে প্রসঙ্গের প্রতিবাদ করিয়া আমরা সাহিত্যকে কলঙ্কিত ও আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে কুণ্ঠিত, সেই পত্র ও সেই প্রসঙ্গ যে শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের অভিমত ও অনুমোদিত হইতে পারে, ইহা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের অনেক বন্ধু এই ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই শোচনীয় ঘটনার আলোচনা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সহিষ্ণু হইতে বলি। কোনও সম্প্রদায়েই গালিবিশারদের অভাব নাই। তাহাদের উক্তি "হাসিয়া উড়াইয়া" দিতে হয়। যাহারা শিষ্টতার প্রথম সূত্রেও বঞ্চিত, তাহারা কৃপার পাত্র। এখন আমাদের আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করিবার সময় নয়।

শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "কাল-পরিণয়" লিখিয়া নাট্য-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ক্ল্যাসিক থিয়েটারে তাঁহার নূতন নাটক "পেয়ার" অভিনীত হইতেছে। "পেয়ারে"র অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ তুষ্টিলাভ করিয়াছেন। রামলাল বাবুর সাফল্যে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "পেয়ার" মুদ্রিত হইতেছে।

ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ইতিহাস-চর্চ্চার অবসরে গল্প লিখিয়া শ্রান্তিবিনোদ করিতেন। এখন তিনি নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ঔরঙ্গজেব" নাটক ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত

হইতেছে। "ঔরঙ্গজেব" মুদ্রিত হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের প্রায় সমগ্র জীবন হরিসাধন বাবু নাটকের বিষয়ীভূত করিয়াছেন! ইতিহাস, উপন্যাস ও নাটক, তিন পথেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গতি প্রসৃত হইতে পারে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। দু' নৌকায় পা প্রসিদ্ধ আছে। হরিসাধন বাবুর পক্ষে তিন নৌকা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামীর "সংসার" নামক একখানি নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। শুনিলাম, "সংসারে"র অভিনয়ে সাধারণের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইয়াছে। রঙ্গালয় দর্শকে পূর্ণ হইতেছে। নূতন ব্রতীর পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। "সংসার" মুদ্রিত হইয়াছে। মনোমোহন বাবুর আর একখানি নাটক "মুরলা"ও মিনার্ভায় অভিনীত হইতেছে।

নবপ্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশবাবুর "সৎনাম" ও হরিসাধন বাবুর "ঔরঙ্গজেব" ঐতিহাসিক নাটক। রামলাল বাবুর "পেয়ারে"র আখ্যানবস্তু রোম্যাণ্টিক। এখানি ট্র্যাজিডী। মনোমোহন বাবুর "সংসার" সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটক। "মুরলা" শুনিতেছি ঐতিহাসিক। অল্প দিনের মধ্যে পাঁচখানি দৃশ্যকাব্যের আবির্ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, রঙ্গালয়ে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। প্রকাশিত ও অভিনীত নাটকের কথা শেষ হইল। ভাবী নাটকের পরিচয় ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখিলাম।

"উৎকল-চিত্রে"র লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "সাবিত্রী লাইব্রেরী"র বার্ষিক অধিবেশনে "বিশ্বামিত্রের তপস্যা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবিধ সমস্যা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

বসুমতীর সহকারী সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় পাঠকসমাজে সুপরিচিত। দীনেন্দ্র বাবু বঙ্গভূমির সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর চির-উপাসক। বাঙ্গালার পল্লীশ্রীর অনেক চিত্র ও পল্লীবাসীর বিবিধ সুখ দুঃখের বহু কাহিনী এই ভাবুক ভক্তের ঐন্দ্রিজালিক তুলিকার স্পর্শে সমুদ্ভাসিত ও সাহিত্যভাণ্ডারের চিরন্তন সম্পদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ পল্লীচিত্রচয়নে দীনেন্দ্রবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। দীনেন্দ্রবাবুর এই শ্রেণীর রচনাগুলি এতদিন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। সুখের বিষয়, সম্প্রতি দীনেন্দ্রবাবু এইরূপ কতিপয় চিত্র একত্র সঙ্কলিত করিয়া "পল্লীচিত্র" নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। আশা করি, দীনেন্দ্রবাবুর "পল্লীচিত্র" সাহিত্যসমাজে সাদরে অভিনন্দিত হইবে।

সার চার্লস ষ্টীভেন্স কিছু দিন বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন। সার চার্লসের দুহিতা কুমারী নিনা ষ্টীভেন্স "The Perils of Sympathy" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইতেছে, অচিরে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের কিয়দংশে রাজধানীর সমাজের প্রসঙ্গ আছে। কুমারী ষ্টীভেন্স কলিকাতার সমাজে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "প্রবাস-চিত্রে"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। "প্রবাস-চিত্র" সুপাঠ্য সুরুচিসঙ্গত নির্দ্দোষ গ্রন্থ, সুতরাং এ দেশে এত শীঘ্র তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইবার কথা নহে।

উপবেদ ও উপাঙ্গ।

এ দেশে পূজনীয়তায় বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোনও পণ্ডিতের মত সেশ্বর হউক, বা নিরী-শ্বর হউক, তিনি যদি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহা হইলেই তাঁহার মতবাদ আর্য্যসমাজে স্থানলাভ করিল। বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও নাস্তিক-নাম লাভ করিতে হইত। প্রাচীন ভাষায় নাস্তিকতার অর্থ Atheism নহে; "অদৃষ্ট" লোক, বা পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের নাম নাস্তিকতা। কিন্তু বেদ অগ্রাহ্য করিলেও লোককে নাস্তিক বলা হইত; কারণ, ঐ ব্রহ্মনিশ্বসিত বাণী হইতেই "অদৃষ্ট" বিষয়ের স্থিতির জ্ঞান উপলব্ধ হয়। এই জন্যই সাংখ্যদর্শন বেদবিহিত ধর্ম্মানশাসননিরত সমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং ত্রিপিটক উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যে সকল বিদ্যা, শাস্ত্র, বা মতবাদের সহিত বেদের কোনও সংস্রব নাই, যে সকল পৌরাণিক কথা বেদের ভিত্তিতে আদৌ প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক, সেগুলিকেও কোনও প্রকারে বেদের ছায়াস্পর্শে পবিত্র করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে হইয়াছিল। এই জন্য বৈদিকযুগের বহুপরবর্ত্তী অনেক রচনা বেদের শাখাবিশেষের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল।

মহাভারতের সময়ে, অথবা মহাভারত গ্রন্থের মধ্যে, যে সকল উপবেদ ও উপা-ঙ্গের নাম পাওয়া যায়, মনোযোগপূর্ব্বক সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ দেশের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের জন্য অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে।

মহাভারতে তিনটি উপবেদ সুস্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,— আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদ। মহাভারতের যে অনুক্রমণিকাটি নানা কারণেই পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, উহাতে বাস্তুবিদ্যার কথা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে উপাঙ্গের মধ্যে ঐ বিদ্যাটি স্থাপত্যবেদ নামে অভিহিত হই-য়াছে। মহাভারতে কিন্তু উহা উপবেদ বলিয়া স্থান পায় নাই, কেবল বাস্তুবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহাকে স্থাপত্যবিদ্যা বলে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে তাহা ছিল; মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়ে উহা উপবেদের মধ্যে গণিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে এত বড় বিদ্যাটা উপবেদ সংজ্ঞা পায় নাই কেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে স্থলে বিশেষ করিয়া বেদাঙ্গ ও উপবেদের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেখানে বাস্তুবিদ্যার, বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই।

শান্তিপর্ব্বের ২১০ অধ্যায়ে বৃহস্পতিকে সর্ব্বপ্রকার বেদাদের কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। উপবেদগুলি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদের (চিকিৎসা) প্রবর্ত্তক কৃষ্ণাত্রেয়, ধনুর্ব্বেদের (যুদ্ধবিদ্যা) প্রবর্ত্তক ভরদ্বাজ, এবং গান্ধর্ব্ববেদের (সঙ্গীতশাস্ত্রাদি) প্রবর্ত্তক নারদ। ষষ্ঠ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে ভরতকে গান্ধর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। এই প্রকারের ক্ষুদ্র প্রভেদও লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন আছে।

১ম, আয়ুর্ব্বেদ। শারীরিক প্রকৃতি, বিকৃতি, দ্রব্যগুণ প্রভৃতির কথা মহাভারতে অত্যন্ত অধিকপরিমাণে উল্লিখিত আছে। আস্তিক পর্ব্বের সাগরমন্থন-উপাখ্যান যে পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত রচনা, তাহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ নাই। (১) সমগ্র মহাভারতের মধ্যে অন্য কোনও সাগর-মন্থনের কথা নাই; (২) সাগরমন্থন উপাখ্যানে শিব ও বিষ্ণুর যে সকল চরিত্র ও প্রকৃতির কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ দেবতাদ্বয়ের অন্য স্থলের বর্ণনার সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়; (৩) মূল মহাভারতে মহাদেবের নীলকণ্ঠ হইবার ইতিহাস প্রভৃতি ও দেবতাদিগের অমরত্বের কথা যে ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সাগরমন্থনের কথা প্রচলিত থাকিলে, তাহা অনুল্লিখিত থাকিত না, অথবা অন্যবিধ ইতিহাস প্রদত্ত হইত না; (৪) অনুক্রমণিকার আস্তিক পর্ব্বটাই মহাভারতের অঙ্গ কি নহে বলিয়া সৌতি নিজে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন; এরূপ স্থলে ঐ পর্ব্বের অন্তর্গত একটা অসংলগ্ন, অপ্রয়োজনীয় ও নিকৃষ্ট ভাষায় রচিত অধ্যায় যখন মূল মহাভারতের বিবৃত কথার বিরোধী, তখন তাহা কদাচ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সাগরমন্থনকথার মধ্যে ধাতু ভস্ম করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিদ্যা সূচিত হয়; অন্য কুত্রাপি তাহা পাওয়া যায় না। মহাভারতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্য প্রমাণের দ্বারা ইহা হয় ত নিশ্চিত হইতে পারে, যে ধাতুভস্ম কোন্ সময় হইতে প্রথম ব্যবহৃত। তাহা জানিতে পারিলে প্রক্ষিপ্ত রচনাটার সময়নির্ণয় হইতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কিছু পাইলাম না। সভাপর্ব্বের যে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতেরা অভিহিত করিয়াছেন, সেই অংশে এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট বা খিলভাগ হরিবংশে, চিকিৎসাশাস্ত্র অষ্টাঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত আছে। অন্য কুত্রাপি ঐ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাবধানতার জন্য সন্দেহযুক্ত অংশ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াও দেখিতে পাই, যে, মহাভারতের মধ্যে রক্তসংক্রমণ-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বের ১৮৫ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে;—"প্রস্থিতা হৃদয়াৎ......বহন্ত্যন্-

রস্মান্ নাড্যঃ।" যে সকল প্রাণবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ঐ কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই বায়ুগুলি কি অর্থে কল্পিত হইয়াছিল, তাহা এ কালের চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদেরা স্থির করিতে পারেন। কিন্তু নাড়ীগুলি হৃদয় হইতে প্রস্থিত অন্নের রস বহন করিয়া লইয়া যায়, ইহা সুস্পষ্ট।

২য় ধনুর্ব্বেদ। প্রাচীনকাল হইতে যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ বিদ্যাসম্বন্ধীয় সূত্র ও গ্রন্থ নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল। এ কালে ঐ উপবেদ স্বতন্ত্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতে ঐ বেদ ও বিদ্যার প্রাধান্য যে ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীনকালে উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল, সন্দেহ নাই। মহাভারত ও রামায়ণে যুদ্ধের কথা ও বর্ণনা পড়িলেই এমন অমানুষিক অসম্ভব কথার অবতারণা পাওয়া যায় যে, প্রাচীন যুদ্ধরীতি ও ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি অনুমান করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যে সময়ে যথার্থই আর্য্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যশস্বী হইতেন, সে সময়কার যুদ্ধপ্রণালী জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অতি প্রাচীনকালের দৈববলে বলী পুরুষদিগের যুদ্ধবর্ণনায় যাহা লিখিত হইয়াছে, হয় ত ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে অনৈসর্গিকতা আরোপিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই রচনাকালের যথার্থ যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি কুত্রাপি সুস্পষ্ট হয় নাই।

৩য় গান্ধর্ব্ববেদ। সঙ্গীতের মধ্যে, গীত, নৃত্য বাদিত্র-বাজনা পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া সপ্তস্বর ও তিনটি গ্রামেরও উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত সভাপর্ব্বে ব্রহ্মার সভার বর্ণনায় নাটক অভিনয়ের কথা আছে। গান্ধর্ব্ব-বেদের প্রবর্ত্তক সর্ব্বত্রই যখন নারদ বলিয়া উল্লিখিত, এবং অন্যত্র কোথাও যখন ভরতের কথা ঐ প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া যায় না, তখন স্বয়ং নারদ কর্ত্তৃক বর্ণিত সভাকথায়, "নাটক" উল্লিখিত দেখিলে সাবধানপূর্ব্বক মীমাংসা করিতে হয়। নাটক প্রথমতঃ নৃত্য হইতে উদ্ভূত। তাহার পর উহার বিকাশ সূত্রধারের সূত্রসংযুক্ত পুত্তলিকার অভিনয়ে। সূত্রধার-কৃত অভিনয়ের কথা সুবিস্তৃত মহাভারতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাণিনিতে যখন নটসূত্রের উল্লেখ আছে, তখন, সগীত নৃত্যাভিনয় ও পুত্তলিকা দ্বারা অভিনয় যে মহাভারত-রচনা-কালে অপরিচিত ছিল, তাহা মনে হয় না। মহাভারতে সকল প্রচলিত পুরাণ, আখ্যায়িকা, বিদ্যা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইবে বলিয়া অনুক্রমণিকায় যখন নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন উল্লেখযোগ্য স্থলে নাটকের কোনও উল্লেখ না থাকায়, কালিদাসাদির নাটকের মত জিনিসের তখন সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। যে অধ্যায়ে অতিপরবর্ত্তী

সময়ের ৬৪ কলার কথা আছে, তাহা গ্রহণ করিতে গেলে মহাভারতকে অর্ব্বাচীন করিতে হয়। ঐ উল্লেখ যে পরবর্ত্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করিয়াছেন।

তাহা হইলে মহাভারতে তিনটি উপবেদের কথাই কেবল পাওয়া গেল। আয়ুর্ব্বেদের কথায় এ কালের কফ পিত্ত শ্লেষ্মাদিভাগ ঠিক তেমনই পাওয়া যায়; এবং অনেক আভ্যন্তরিক জ্ঞান বিশদ ছিল বলিয়া ধরিতে পারা যায়। গান্ধর্ব্ব-বেদের প্রসঙ্গেও নৃত্য, গীত, ত্রিগ্রাম, সপ্তস্বর, সাধারণ বাদ্যযন্ত্র ও তন্ত্রীযুক্ত যন্ত্রের পরিচয় পাইতেছি। ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; অথচ সমগ্র মহাভারত বিপুল যুদ্ধের কথা লইয়া রচিত। মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, খড়্গাদি অস্ত্রযুদ্ধ, বাণনিক্ষেপ, যুদ্ধসময়ে অশ্বযুক্ত-রথ-চালনা প্রভৃতি কথায়ও যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত কল্পনা করা চলে। গোলা বারুদ ব্যবহারের পূর্ব্বে কোন দেশের যুদ্ধের বৃত্তান্ত হইতে এতদধিক কথা পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালের আগ্নেয়াস্ত্র জিনিসটা সত্য কি কল্পনা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জিনিসটির যখন বিশেষ বিবরণ নাই, তখন ঐ অস্ত্র সত্য সত্য ছিল কি না, এবং থাকিলেও উহা সাধারণ কোনও অগ্নি-উৎপাদক পদার্থ কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করা কঠিন। শুক্রা-চার্য্যের নামে প্রচলিত নীতিগ্রন্থের 'নলিকা' কথা লইয়া যে সকল তর্ক বিতর্ক হইয়াছে, তাহা হইতেও কোনও প্রত্যয়যোগ্য সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মৃত্যুমুখে।

১

নিদাঘের দীপ্ত রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন কেবল অপরাহ্নে পরিণত হইয়াছে। একটি বৃহৎ অট্টালিকার অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষে বসিয়া গৃহস্বামিনী ভাবিতেছেন, যখন স্বামী মফঃস্বলে জেলার আদালতে নব্য উকীল ছিলেন, তখন ভাল ছিল, কি এখন ভাল হইয়াছে। তখন অর্থের অভাব ছিল সত্য, কিন্তু স্বামীর অবসরের অভাব ছিল না। মোকদ্দমার অভাবে স্বামীকে প্রায় কোন দিনই আদালত উঠা পর্য্যন্ত আদালতে থাকিতে হইত না। বাড়ীতেও মক্কেল দুর্লভদর্শন ছিল। সেই যৌবন-উষায় শতআশা-মুকুলিত-হৃদয় স্বামী স্ত্রীর অবসরের অন্ত ছিল না।

সংসারেও আর কেহ ছিল না। অর্থ যেমন অল্প ছিল, অবসরও তেমনই সামান্য ছিল। পতি পত্নীর পরস্পরের সঙ্গলাভসুখের সীমা ছিল না। মধ্যে মধ্যে কারণে অকারণে অভিমানে প্রেম কেবল সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। ইহার পর জেলার আদালতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, স্বামীর আশাও প্রসার প্রাপ্ত হইল। শেষে জেলার আদালতের সর্ব্বোচ্চ উকীলের সম্মান আর তাঁহার উচ্চাশাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। যে বেষ্টনের সীমালাভ একদিন তিনি অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে সে বেষ্টন একান্ত সংকীর্ণ বোধ করিয়া বাহিরে বৃহত্তর স্থান ও মানজয়ের আশায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আসিলেন। আসিয়া তাঁহার যশ ও অর্থ উভয়ই পর্য্যাপ্তপরিমাণে লাভ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবসরের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। পল্লীগ্রামের সেই অজ্ঞাত যুবক, আজ কলিকাতার ফেনিলাবর্ত্তবহুল সমাজের এক জন অলঙ্কার। স্বীয় ক্ষমতায় প্রভাতচন্দ্র আজ কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকীলদিগের মধ্যে এক জন। প্রভাত হইতে গৃহে মক্কেলের ভিড়; তাহার পর আদালত। আদালতের পর সভা, সমিতি, সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করিয়া শ্রান্ত প্রভাতচন্দ্র গৃহে ফেরেন। কিন্তু তখনও বিশ্রাম নাই—কোন কোন নাছোড়বান্দা মক্কেল, তখনও সাক্ষাৎ না করিয়া ছাড়ে না; তদ্ভিন্ন পরদিবসের মোকদ্দমার নথিপত্র ঘাঁটিতে হয়—আইন ও নজীর পাঠ করিতে হয়। এক এক দিন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত না হইলে প্রভাতচন্দ্রের শয়নের অবসর ঘটে না। স্বামীর যশ, অর্থ ও সম্মান,—সবই যথেষ্ট হইয়াছে। লোকে কুসুমকুমারীর সৌভাগ্যের কথা বলে; স্বামীর সৌভাগ্যে কুসুমকুমারীও আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করেন; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার মনে হয়, স্বামীর অন্য সকল কার্য্য তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। তখন হৃদয় কেমন বেদনাচঞ্চল হইয়া উঠে।

আজ নিদাঘের রৌদ্রতপ্ত দিবসে বৃহৎ অট্টালিকার সুসজ্জিত মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষে বসিয়া কুসুমকুমারী সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় সপ্তবর্ষবয়স্ক পুত্র অশোক ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, জামাইবাবু আসিয়াছেন।"

জামাই! যে ধনীর পুত্র জামাতাকে বহুবার নিমন্ত্রণ করিয়াও তাঁহারা প্রায় আনিতে পারেন নাই—যাহার পিতার নিকট গর্ব্বিত প্রভাতচন্দ্রকে উচ্চ শির নত করিতে হইয়াছে, সেই জামাতা আজ বিনা নিমন্ত্রণে অসময়ে স্বয়ং শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে—এ সৌভাগ্যে কুসুমকুমারীর নয়ন আনন্দ-দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার নয়নে সে দীপ্তি ফুটিতে না ফুটিতে, নিদাঘের মেঘে বিদ্যুতের মত মিলাইয়া

গেল। তিনি আপনার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর কুসুমকুমারী জামাতাকে আনিবার জন্ত পুত্রকে পাঠাইলেন।

২

অতি অল্প বয়সেই প্রভাতচন্দ্র ইংলণ্ডে যাইবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন; তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী কেহই ছিলেন না। কিন্তু যে দোষে গুণীর গুণ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য—সকলই অজ্ঞাত রহিয়া যায়, সেই দারিদ্র্য দোষেই তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু প্রভাতচন্দ্রের ইংলণ্ড-গমন সম্ভব না হইয়া উঠিলেও, তিনি আপনার মেজাজটিকে যথাসম্ভব ইংরাজী করিয়া তুলিয়াছিলেন। আপনাকে নেক্‌টাই ও হ্যাটের পরিবর্ত্তে চাপকান ও শামলা পরিতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি ছেলেদের ইংরাজী বেশেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ছেলেদের ইংরাজী বিস্তালয়ে পড়িতে দিয়াছিলেন, এবং কন্তা নির্ম্মলাকেও ইংরাজী বিস্তালয়ে পাঠাইয়া পিয়ানো ও পশমের কাজে অভ্যস্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ দিকে এত করিয়াও শেষকালে বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন; বিবাহদানকালে কন্তার শিক্ষা ও সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া "বড়লোকে"র সহিত কুটুম্বিতা-সংস্থাপনের দারুণ দুরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। জামাতা ললিতমোহনের পিতা প্রসিদ্ধ সুদখোর—বণিগ্‌বৃত্তিতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, তিনি আপনার বাড়ীটি পাড়ার আর সকল বাড়ী অপেক্ষা উচ্চ করিতে ও আপনাকে আর সকলের অপেক্ষা উচ্চ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্ট-সংস্থষ্ট ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিয়া তিনি প্রথমে "রায়বাহাদুর", ক্রমে "রাজা" উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করেন। তিনি আপনাকে অসাধারণ ব্যক্তি মনে করিতেন, এবং বৈবাহিক প্রভাতচন্দ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন শ্বশুরালয়ের অনুমতি ব্যতীত তিনি কন্তাকে কোথাও নিমন্ত্রণাদিতে না পাঠান।

আজ কুসুমকুমারী সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া—স্বামীকেও না জানাইয়া, কন্তা নির্ম্মলাকে প্রভাতচন্দ্রের কোনও বন্ধুর গৃহে একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই কন্তা ফিরিয়া আসিবে; ইহারই মধ্যে যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার ঘটিবে—জামাতা আসিবেন, ইহা তাঁহার কল্পনাতেও আইসে নাই। সেই জন্ত ভয়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

তবুও কুসুমকুমারী প্রকৃত কথা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যেখানে নির্ম্মলাকে নিমন্ত্রণে পাঠাইয়াছিলেন, জামাতা ললিতমোহনও সেই গৃহে নিমন্ত্রণে

গিয়াছিল। ললিতমোহন যখন দ্বারে অবতরণ করিতেছিল, সেই সময়ে যে গাড়ী বাড়ীর অন্তঃপুরের দিকে যাইতেছিল, তাহার অধিকারিণীকে দেখিয়া ললিতমোহনের সন্দেহ হয়;—সেই সন্দেহভঞ্জনার্থই তাহার শ্বশুরালয়ে পদার্পণ।

ললিতমোহন শ্বশুরালয়ে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল না; কুসুমকুমারীর সযত্ন-সজ্জিত আহার্য্য "অসময়" বলিয়া আহার করিল না; সত্বরই গৃহে ফিরিয়া গেল। সে বুঝিল, তাহার সন্দেহ সত্য। কারণ, নির্ম্মলা গৃহে থাকিলে তাহার সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ ঘটিত। অধিকন্তু গাড়ীতে যাইবার সময় শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলে সরল বালক বলিল, "দিদি নিমন্ত্রণে গিয়াছে।"

উপরের জানালা হইতে কুসুমকুমারী পুত্রের এই উত্তর শুনিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

ললিতমোহন গাড়ীতে উঠিয়া যান-চালককে গৃহে যাইতে আদেশ করিল। কুসুমকুমারী মেজেয় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কেন এ দুষ্কর্ম্ম করিলাম? না জানি ইহাতে কি অনর্থ ঘটিবে! স্বামী কি বলিবেন? লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে? মেঘবৃষ্টি-ভয়ঙ্করী নিশায় পার্ব্বত্য পথে পথভ্রান্ত পথিক সহসা বিদ্যুদালোকে সম্মুখে গভীর গহ্বর দেখিলে যেমন শিহরিয়া উঠে, আপনার কৃত কর্ম্মের ফল চিন্তা করিয়া কুসুমকুমারী তেমনই শিহরিয়া উঠিলেন।

৩

গৃহে আসিয়া বস্ত্রাদিপরিবর্ত্তন করিয়া ললিতমোহন সকল কথা বলিবার জন্য জননীর নিকট গমন করিল।

এ দিকে রাজাবাহাদুরের সেদিন কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার কথা। বাড়ীর নিকটে নিমন্ত্রণ; পুত্র নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগত হইলে তিনি সেই গাড়ীতে যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। সহিসদের উপর আদেশ ছিল, "কুমারবাহাদুর" ফিরিয়া আসিলে তাহারা ঘোড়া না খুলিয়া সংবাদ দেয়, তিনি গাড়ীতে যাইবেন। সহিস আসিয়া নিবেদন করিল, বড় জুড়ী তিন চার দিন জোতা হয় নাই, আজ বড় ধূপ—অনেকটা ঘুরিয়া আসিয়াছে; আর খাটান নিরাপদ হইবে না। অনেকটা কোথায় ঘুরিয়া আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় সহিস বলিল, কুমারবাহাদুর শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন।

সহিসকে অন্য জুড়ী জুতিবার আদেশ দিয়া রাজাবাহাদুর পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। ভৃত্য ললিতমোহনের খাস খানসামার নিকট সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, "কুমারবাহাদুর অন্তঃপুরে।"

পুত্রের নিকট সকল কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "বটে!" এমন সময় রাজা-বাহাদুর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কিছু গম্ভীরস্বরে পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, "ললিত, তুমি আজ বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলে?"

পুত্রের জননী পুত্রের নিকট শ্রুত বিবরণ বিবৃত করিলেন, এবং বৈবাহিক ও বৈবাহিকার দুঃসাহসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন।

পুত্র তাঁহার "রাজ"সম্মানের হানি করিতেছে ভাবিয়া রাজাবাহাদুর তাহার প্রতি যে পরিমাণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, সে তাঁহার "রাজ"সম্মান-রক্ষায় সচেষ্ট জানিয়া, তিনি তাহার প্রতি সেই পরিমাণ সন্তুষ্ট হইলেন। পিতার আশা হইল, তাঁহার আদর্শে চলিলে পুত্র তাঁহার অর্জ্জিত সম্মান বর্দ্ধিত করিতে না পারিলেও, (কারণ দিনকাল বড়ই খারাপ পড়িয়াছে) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতে পারিবে। সেই কি সামান্য কথা? বৈবাহিককে পত্র লিখিয়া, পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে পিতা গৌরাঙ্গদর্শনে গমন করিলেন।

৪

কুসুমকুমারীর বিশেষ ভয় ছিল, স্বামী কি বলিবেন? কিন্তু তাঁহার শঙ্কিত দিক হইতে বিপদ আসিল না। প্রভাতচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বৈবাহিকের পত্র পাইলেন,—

"আমি আপনাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, আমার অনুমতি ব্যতীত বধূমাতাকে নিমন্ত্রণাদিতে পাঠাইবেন না। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, আপনি সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমি ইহার জন্য আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চাহি। আমার পুত্রের সহিত বিবাহ হওয়ায় আপনার কন্যা, সমাজে আপনার অপেক্ষা উচ্চ স্তরে উন্নীতা হইয়াছেন। আপনি যদি তাঁহার উপযুক্ত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারেন, এবং আপনা হইতে আমার সম্মানের হানি হয়, তবে আমি আপনার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইব। আপনার অদ্যকার অপরাধ ইচ্ছাকৃত, আমি ইহার কারণ জানিতে চাহি।"

পত্র পাইয়া প্রভাতচন্দ্র একান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। গণ্ডারের ক্রোধ যেমন সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই উৎখাত করে, ক্রোধের কারণ পার্শ্বে থাকিলেও তাহাকে স্পর্শ করে না, প্রভাতচন্দ্রের ক্রোধও তেমনই প্রথম যাহাকে পাইত, তাহারই উপর আপনার বেগ ব্যয়িত করিত। অন্য দিন বা অন্য সময় হইলে প্রভাতচন্দ্র পত্নীকেই নিতান্ত অপরাধিনী বিবেচনা করিতেন; কিন্তু আজ এই পত্র পাইয়া তিনি পত্নীর অপরাধ একান্ত মার্জ্জনীয় মনে করিলেন, এবং সমস্ত দোষই বৈবাহিকের স্কন্ধে অর্পিত করিয়া উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন,—

"আপনার ঔদ্ধত্য ও অবিনয় প্রকাশক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনি পত্রে পদে পদে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আপনার নিকট আমি কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি—সেরূপ সর্ত্তে কন্যার বিবাহ দিই নাই। আমার কন্যাকে আমার বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণে পাঠানয়, আপনার কোনরূপ অপমান হয় নাই। আমার বন্ধু বা আমি আপনার অপেক্ষা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখি না। আপনি যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া খেতাব পাইয়াছেন, সে পরিমাণ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা আমার যে নাই, এমন নহে। তবে আপনার মত তোষামোদে ব্যয় করি, এত দূর আত্মসম্মানজ্ঞানহীন—অধঃপতিত হই নাই। আপনি যে অভিমানে সম্ভবতঃ খেতাবহীন পূর্ব্বপুরুষের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিবেন, সে অভিমান আমার ও আমার মত অন্য ভদ্রলোকের বিবেচনায় প্রশংসনীয় নহে—পরন্তু বর্জ্জনীয়। আমি আপনার ঈপ্সিত সম্মান ঘৃণায় পরিহার করিবার মত ক্ষমতা ও মানসিক বল রাখি। আপনি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে আমার দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ দেখি না। পত্রে যে অবিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সৎসাহস থাকে, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিবেন; নচেৎ আপনার সহিত পত্রব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না।"

এই পত্র পাইয়া রাজাবাহাদুর একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বৈবাহিকের স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—ভাল, কন্যার পিতার এত স্পর্দ্ধা! সাধিয়া আনিয়া কন্যা আমার বাড়ী রাখিয়া যাইতে হইবে। তখন দেখিব, এত স্পর্দ্ধা কোথায় থাকে!

প্রভাতচন্দ্রও স্থির করিলেন, কন্যা আমার এমনই গলগ্রহ হয় নাই যে, আমি সাধিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিব। তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে তাহার মান থাকিবে না। সে কার্য্য আমি কিছুতেই করিব না।

কুসুমকুমারীর সামান্য অনবধানতায় যে এত অনর্থ ঘটিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল?

৫

এক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজাবাহাদুর পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন না, এবং বৈবাহিকের দ্বারে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইবার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া রহিলেন, কখনই যাচিয়া বধূকে আনিবেন না। কেবল 'সাহেব'রা কি বলিবে বলিয়া তিনি পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতে পারিলেন না।

এ দিকে কুসুমকুমারীর সহস্র অনুরোধ ও অজস্র ক্রন্দনেও প্রভাতচন্দ্রের সঙ্কল্প টলিল না; তিনি কিছুতেই সাধিয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিতে সম্মত হইলেন না।

কুসুমকুমারীর বক্ষে যেন গুরুভার চাপিয়া রহিল; তাঁহারই দোষে কন্যার এ দুর্দ্দশা!

* * * * *

নির্ম্মলা গৃহে আসিয়া সব শুনিল। শ্বশুরের আদেশের কথা সে জানিত না; জানিলে সে নিমন্ত্রণে যাইত না। একবার তাহার মনে হইল, স্বামীকে লিখিয়া দেয়, তাহার অপরাধ নাই। পরক্ষণেই মনে হইল, কেমন করিয়া সে স্নেহশীলা মাতার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া আপনার স্বার্থের সন্ধান করিবে? শেষে সে স্থির করিল, স্বামীকে পত্রের উত্তরে প্রকারান্তরে এ কথার উত্থাপন করিয়া ক্রমে সব বুঝাইয়া বলিবে। কিন্তু হায়!—স্বামীর পত্র আর আসিল না।

ললিতমোহনের ইচ্ছা হইয়াছিল, সে পত্নীকে পত্র লিখিয়া জানিবে, নির্ম্মলা জানিয়া অপরাধ করিয়াছে কি না? হায়! সে যুবক, তাহার অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা সেই সদ্যঃপরিণীতা পত্নীকে বেষ্টন করিয়া ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চে সহস্র মায়ালোকের রচনা করিয়াছিল। কিন্তু কি লিখি, কেমন করিয়া লিখি—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে কয় দিন কাটিয়া গেল। তত দিনে ললিতমোহন বুঝিতে পারিল, স্ত্রী নিরপরাধা হইলেও পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত সে তাহাকে আনিতে পারিবে না। তখন সে আপনার কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিল। সে আপনাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া বুঝিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িতে লাগিল—অথচ উভয়েই মিলনলালসায় ব্যাকুল। অদৃষ্টের এমনই উপহাস!

নির্ম্মলা দিন দিন শুকাইতে লাগিল—যেন নিদাঘসন্তাপে অচিরোদগত মঞ্জরী ম্লান হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, কোনও অসুখ নাই। চিকিৎসকও পরীক্ষা করিয়া কোনও রোগের লক্ষণ দেখিতে পান না; কিন্তু সে দিন দিন শুকাইতে লাগিল। সে রোগ চিকিৎসক ধরিতে না পারিলেও কুসুমকুমারীর মাতৃহৃদয় তাহা বুঝিতে পারিল। কুসুমকুমারী স্বামীকে বলিলেন, "মেয়ের দশা ত দেখিতেছ। আর কি হইবে,—নিজে গিয়া মেয়েকে রাখিয়া আইস।" প্রভাতচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি সাধিয়া দিতে যাইলে যদি তাহারা না লয়, বা লইয়া কথায় কথায় মেয়েকে বলে যে, সে আদরের নহে, অনাদরের,—আমি সাধিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছি, তবে সে অপমান মেয়ের সহিবে না। আমি সে কার্য্য

করিতে পারিব না।" কুসুমকুমারী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু মাতৃহৃদয়ে অহরহঃ বেদনা জাগিতে লাগিল। কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রভাতচন্দ্র অবসর পাইলেই কন্যার সহিত গল্প করিতেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন,—সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; কন্যা দিনদিন শুকাইতে লাগিল;—তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসি শরতের বর্ষণশীর্ণ লঘু মেঘে বিদ্যুতের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল—রক্তাভ পূর্ণ গণ্ডে অস্থি দেখা দিল।

এমনই করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল। এক বৎসর পরে চিকিৎসকগণ গম্ভীরমুখে বলিলেন, "যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।" প্রভাতচন্দ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

৬

এই সময় ঈপ্সিত "মহারাজা" খেতাব লাভ করিবার পূর্ব্বেই অপূর্ণসাধ রাজা-বাহাদুরকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। ললিতমোহন পিতৃহীন হইল। যে 'সাহেব'দের সেবায় রাজাবাহাদুর জীবনে যত্নের অবধি রাখেন নাই, তাঁহারা মৃত রাজাবাহাদুরকে বিস্মৃত হইলেন না; যথাকালে ললিতমোহন তাঁহাদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনা ও সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র পাইল।

শেষকালে রাজাবাহাদুর পুত্রকে আপনার অভ্যস্ত কার্য্যে যৌবরাজ্যে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই। কোনও কাযেই ললিতমোহনের মন বসিত না। সে বুঝিয়াছিল, তাহার এক দিনের ভ্রমে সে জীবনের সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়াছে,—তাহার জীবন-বসন্তের কুসুম বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যে স্থানে পুষ্পিতদ্রুমলতাচ্ছাদিত বিহগ-বিরাবিত রম্য উপবন রচনার আশা করিয়াছিল, সে স্থানে অনলশ্বাসী দগ্ধ মরুমাত্র রচিত হইয়াছে। এই দারুণ দুশ্চিন্তায় ললিতমোহনের আর কোনও কাযেই মন বসিত না। নির্ম্মলার সেই সারল্যভূষণ অসঙ্কুচিত মুখচ্ছবি সে মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় হইতে অন্তরিত করিতে পারিল না।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে ললিতমোহন মনে করিতেছিল, প্রভাতচন্দ্রকে পত্র লিখিবে। কিন্তু এতদিন পরে সহসা কি লিখিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল। শেষে সে স্থির করিল, পিতার শ্রাদ্ধের পর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

শ্রাদ্ধের পরদিন ললিতমোহন প্রভাতচন্দ্রের পত্র পাইল। প্রভাতচন্দ্র নির্ম্মলার স্বাস্থ্যের আশায় সপরিবারে পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া আশানুরূপ দূরে থাকুক, তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতিই লক্ষিত হয় নাই।

দিন নিতান্তই ফুরাইয়া আসিল। তখন কন্যার শেষ ইচ্ছার কথা শুনিয়া পত্নীর অনুরোধে প্রভাতচন্দ্র ললিতমোহনকে পত্র লিখিলেন। কন্যার পীড়ার কথা, বর্ত্তমান অবস্থা—লিখিয়া প্রভাতচন্দ্র লিখিলেন, "নির্ম্মলার শেষ ইচ্ছা বলিয়া আমি এত দিন পরে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তাহার বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। নহিলে তাহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতাম। কিন্তু তাহার আর পথশ্রম সহিবে না। সেই জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে একবার এখানে আসিবে। আশা করি, অবস্থা বিবেচনা করিয়া তুমি এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। আসিবার সময়নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে সংবাদ দিলে ষ্টেশনে আমার লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে।"

পত্র পড়িয়া ললিতমোহনের চক্ষুর সম্মুখে জগতের আলোক যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে কি তাহার ভ্রমসংশোধনের অবকাশও পাইবে না—মিলনমুখে চিরবিচ্ছেদের অন্ধ অন্ধকার তাহার জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে? সে কীটদষ্ট কুসুমের দশাপ্রাপ্ত পীড়িতা পত্নীর পাণ্ডুর মুখচ্ছবির কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল। হৃদয় দারুণ বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পর দিবস কাহাকেও আপনার গন্তব্য স্থানের কথা না বলিয়া ললিতমোহন যাত্রা করিল।

৭

ললিতমোহন যখন প্রভাতচন্দ্রের বাঙ্গলোয় প্রবেশ করিল, তখন মেঘহীন গগনে চিত্রার্পিতবৎ গিরিশৃঙ্গমালায় নিদাঘদিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। বর্ণের পর বর্ণ গিরিশৃঙ্গে—নর্ত্তকীর চঞ্চল অঞ্চলের বর্ণমালার মত—আপনার অস্থায়ী সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়া যাইতেছিল।

বারান্দায় একখানা আরাম-কেদারায় 'র‍্যাপে' ও 'রগে' অঙ্গ আবৃত্ত করিয়া নির্ম্মলা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় মেঘের দিকে চাহিয়া ছিল। ললিতমোহনকে গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার নয়নে আনন্দদীপ্তি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

ললিতমোহন বারান্দায় উঠিল—নির্ম্মলার চেয়ারের পাশ দিয়া গেল। সেই

উষ্ণবসনে আবৃতা রোগিণী যে তাহার সুন্দরী পত্নীর রোগজীর্ণ শীর্ণ অবশেষ, প্রথম দর্শনে সে তাহা বুঝিতে পারিল না,—কল্পনাও করিতে পারিল না।

ললিতমোহন চলিয়া গেল। নির্ম্মলা বক্ষে কেমন বেদনা অনুভব করিল। সে দুই করতলে বক্ষ চাপিয়া ধরিল; নয়ন মুদিত হইয়া আসিল।

প্রভাতচন্দ্র ড্রয়িংরুমে জামাতার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার সহিত অল্পক্ষণ কথা কহিয়াই তিনি বুঝিলেন, জামাতার চঞ্চল চক্ষু কক্ষের চারি দিকে আর কাহারও সন্ধান করিতেছে। "চল, নির্ম্মলাকে দেখিবে"—বলিয়া তিনি উঠিলেন; ললিতমোহন তাঁহার অনুসরণ করিল।

উভয়ে নির্ম্মলার নিকটে আসিলেন। নির্ম্মলা নড়িল না। তখনও তাহার উভয় করতল বক্ষের উপর; নয়নযুগল মুদিত; শীতল ও পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে যাতনাচিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে। অভাগিনী ব্যর্থসুখস্বাদ জীবনে যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, সে যখন আসিল, তখন সে সুখদুঃখের অতীত।

তাহার গতপ্রাণ শবদেহপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রভাতচন্দ্র অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার গর্ব্ব অশনিরূপে তাঁহারই হৃদয়ে পড়িয়াছে,—হৃদয় দীর্ণ। ললিতমোহন মনে করিল, তাহাকে দুর্ব্বহ দুঃখভার বহন করিয়া সুদীর্ঘ জীবনপথ অতিবাহিত করিতে হইবে,—জগতের উৎসারিত সুখ-উৎস তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ,—জগতের আনন্দে তাহার অংশ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বারভুঁইয়া।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে, বঙ্গভূমির অধিকার লইয়া মোগল, পাঠান, মগ, পর্টুগীজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহারই একটি সামান্য চিত্রপ্রদর্শনের জন্য এই প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করা যাইতেছে। এই বারভুঁইয়া প্রবন্ধটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম।

বাঙ্গলা দেশ বহুদিন হইতে বারভুঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় যে সমস্ত পরাক্রান্ত ভুঁইয়া আপনাদিগের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে কেবল তাঁহাদেরই বিবরণ প্রকটিত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা বারভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা দেশ বহুদিন হইতে বারভুঁইয়ার মুলুক নামে কথিত হইয়া থাকে; এবং আসাম প্রদেশেও এই বারভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও আরাকাণের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বারভুঁইয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। (১) যে বারভুঁইয়ার সহিত বাঙ্গলা, আসাম ও আরাকাণ প্রভৃতির সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমরা প্রথমে বারভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ স্থির হয় যে, পালরাজগণের রাজত্বকালে এই বারভুঁইয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বারভুঁইয়াগণ প্রাচীন রাজনীতিসম্মত রাজমণ্ডলান্তর্গত দ্বাদশ নৃপতির (২) স্থানে পরবর্ত্তী কালে দ্বাদশ সামন্তরাজ-রূপে গণ্য হইয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার বারভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে;— কোনও এক সময়ে বার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির

---

(১) "The kings of Aracan and Commillah were constantly striving for the mastery, and the former even conquered the greatest part of Bengal. Hence to this day they assume the title of Lord of the twelve bhuoiyas, bhatties, or principalities of Bengal."—*Wilford; Ancient Geography of India. vol XIV., of Asiatic Researches. P. 451.*

(২) মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং। এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ॥ অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ॥

—মনুসংহিতা; ৭ম অধ্যায়।

নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণীখননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বারভুঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। (৩) এবং সেই সময়ে পালরাজগণ সমগ্র বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর থাকায়, সম্ভবতঃ ভুঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সামন্তরাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে পালরাজগণের সঙ্গে বারভুঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহাদের রাজত্ব ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বারভুঁইয়াগণ অনেকদিন

(৩) "The Kocchis then gave a line of princes to Kamrup; at this time a part of Upper Assam was under a mysterious dynasty called the Bhara Bhuya, of which no one has ever been able to make anything but it is in all probability connected with the following tradition which Buchanon gives in his Account of Dinajpur :—'On a certain occasion twelve persons of very high distinction and mostly of the Pal family came from the west country to perform a religious ceremony on the Karotya river (the boundary between the ancient divisions of Matsya and Kamrup), but arrived too late, and as the next season for performing the ceremony was twelve years distant, they in the interval took up their abode there, built palaces and temples, dug tanks, and performed many other great works. They are said to have belonged to the tribe called Bhugyas to which the Rajahs of Kasi (Benares) and Bhettiah also belong."—*Dalton's Ethnology of Bengal.*

বুকানন হামিল্টনের মতে, ইঁহারা বর্ত্তমান ভূমিহারগণের সমজাতি। কিন্তু ডাল্টন তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভুঁইয়াগণের সহিত একজাতি বলিতে চাহেন। ডাল্টনের সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য, বলিতে পারি না; কারণ, উক্ত ভুঁইয়া জাতি আর্য্যবংশীয় কি না সন্দেহ। অথচ বুকাননের মতে, বারভুঁইয়ার অধিকাংশ পালবংশীয় ছিলেন। পালবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ আর্য্যবংশীয় হওয়াই সম্ভব। বুকানন যে কাশী ও বেতিয়ার রাজাদিগকে বারভুঁইয়াগণের একজাতি বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য বটে। বর্ত্তমান ভূমিহারগণকে অনেকে মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়া থাকেন। মূর্দ্ধাবসিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হন। কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ 'বাভণ'ও বলে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসামের শিলালিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাভণ শব্দ ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ তাঁহারা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ার কিঞ্চিৎ হেয়। ফলতঃ, বারভুঁইয়ারা সেন-বংশীয় হইলে যে আর্য্যবংশীয় জাতি, সন্দেহ নাই। পালবংশীয় হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমরা এ স্থলে অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। ভুঁইয়া শব্দ, সংস্কৃত ভৌমিক, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ, বা পালি ভূমিয্যো, ভূমিপালো, ভূমিশো, বা ভূম্যো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিবেন। আমরা সাধারণ ভুঁইয়া শব্দকে ভৌমিক শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করিয়া থাকি।

পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় তিন জন প্রাচীন ভুঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। (৪)

পাল-বংশের পর সেন-বংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভুঁইয়াগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু সে সময়ে মূল বারভুঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভুঁইয়া নিযুক্ত হন। বোধ হয়, তাঁহাদের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাঁহারা বারভুঁইয়া নামেই অভিহিত হইতেন। পাঠান-রাজত্বকালে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। ইঁহারা রাজকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন; এবং কয়েক জন হিন্দু ভুঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বারভুঁইয়া নামে কথিত হইতেন। মোগল-বিজয়ের সময় উক্ত বার জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু ছিলেন, জানা যায়। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ব্যাপিয়া তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু, পশ্চিম বঙ্গে কোনও ভুঁইয়ার অধিকার ছিল কি না, জানা যায় না। (৫) হিন্দু তিন ভুঁইয়া

---

(৪)"The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, and in that portion of it lying to the north of the Boorigonga and Dulluserry, where the sites of their capitals are still to be seen. Just Pal resided at Moodabpore in the pargunnah of Toollipabed. Harischonder at Cotebarry near Sabar, and Sinopal at Copassia in Bhowal. * * * *

"The Rungpore branch of Booneahs, it is well known, ruled at one time the ancient kingdom of Kamroopa."—*Taylor's Topography of Dacca.*

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Booriganga, and Dhaleswari, where the sites of their capitals are still to be seen."—*Hunter's statistical Account of Dacca.*

(৫) প্রতাপাদিত্যচরিত্র-রচয়িতা রাম রাম বসুর মতে, উক্ত বারভুঁইয়াগণের অধিকার বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃতির কথায় বোধ হয়, আসামের প্রাচীন বারভুঁইয়াগণের কথা তখনও বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার শেষ বারভুঁইয়াগণের অধিকার যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না।

শ্রীপুর, বাকলা ও যশোরের অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমান নয় জনের মধ্যে খিজিরপুরের ইশাখাঁ মসনদ আলি সর্ব্বপ্রধান; তিনি অপর একাদশ জন ভুঁইয়ার উপর কর্তৃত্ব করিতেন। বৌটন রোজ ও জেম্‌স ওয়াইজ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে বারভুঁইয়ার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত জেস্থইট প্রচারক বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, উক্ত বার জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান ছিলেন। (৬) এই বার জন ভুঁইয়া অনেক সময়ে মিলিত হইয়া মোগলগণকে বাধা প্রদান করিতেন, এবং তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহারা পরস্পরের সহিতও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। মুসলমান নয় জনের মধ্যে সকলেই পাঠান ছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণও বঙ্গভূমিতে অধিকারবিস্তারের জন্য অল্প চেষ্টা করেন নাই। এইরূপে মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর মধ্যে সেই সময়ে বঙ্গরাজ্য লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগলেরাই বিজয়লাভ করে। বারভুঁইয়ার মধ্যে যে তিন জন হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের নাম

(৬) "The king of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogoll slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of Aristocraccy and vanquished the Mogolls (it seems this was in the time of Emmadan paxda) and still notwithstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur, and of Ciandecan, and above all Moasudalim. Nine of them Mahametans."—*Purcha's Pilgrims, The fourth Part. Book V. P. 511.*

ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণে শ্রীপুর ও চণ্ডিকান বা যশোহরের রাজাকে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অন্য নয় জনকে মুসলমান বলা হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট হিন্দু ভুঁইয়া কে ছিলেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। ডুজারিক সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, অপর হিন্দু ভুঁইয়া বাকলার অধীশ্বর।

"According to Dee Janie, the three Hindu princes were those of Sripur, Chandican and Bacala."—*Beneridge's District of Bakargunj. P. 29, Note.*

ফার্ণাণ্ডেজ কেবল ক্ষমতাশালী ভুঁইয়াদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দলভুক্ত প্রচারক ফনসেকার বিবরণ হইতে রামচন্দ্র ও তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। পরে তাহা লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বঙ্গজকায়স্থ। লক্ষ্মণমাণিক্য ও মুকুন্দরাম রায়,—যাঁহারা কাহারও কাহারও মতে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন,—তাঁহারাও বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। কিন্তু উপরি-উক্ত দুই জন যে বারভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন না, আমরা পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। ভুলুয়ার রাজগণ চিরদিন ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন। এবং আকবরনামায় মুকুন্দরাম রায়কে এক জন জমীদারমাত্র বলিয়া দেখা যায়। বিশেষতঃ, জেসুইট প্রচারকগণ যখন সে সময়ে বাঙ্গলা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নয় জন মুসলমান ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিবরণ কোনও মতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত বার জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান হওয়ায় তাঁহারা সুচারুরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন নাই। (৭) এই নয় জন মুসলমানের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্ কিচ্ ও জেসুইট প্রচারকগণ তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অপর আট জনের বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ ভাওয়ালের গাজী বংশকে অন্যতম ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৌটন রোজের গ্রন্থে চাঁদপ্রতাপের জোনা গাজী ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জোনা গাজী সম্ভবতঃ সোনা গাজী হইবেন। কিন্তু ওয়াইজ ভাওয়ালের ফজল গাজীকে ভুঁইয়া বলিয়াছেন। ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ গাজী-বংশের অধীন ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত বংশের দুই জন দুই ভুঁইয়া হইতে পারেন। হিজলীর মসনদআলিগণও পরাক্রান্ত ছিলেন। হিজলী তৎকালে ভাটী বা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য হিজলীর মসনদআলিগণ অন্যতম ভুঁইয়া হইলেও হইতে

---

(৭) "Pimenta commences by giving a short sketch of the history of Bengal, and states that the government of it was at that time in the hands of twelve princes who had formed a secret league among themselves, and had got the better of the Moghals. He adds that the most powerful of the twelve were the lords of Sripur and Chandecan, but above all the Moasadali, or Masauddin (?) Perhaps this is Isukhan Masudd-i-Ali of Khizrpur, described by Dr. wise as the most celebrated of the twelve bhuyas. Nine of the twelve, says Pimenta, are Mahomedans, and this circumstance very much retards the work of conversion."—*Beneridge's Bakargunj. P. 29.*

পাইমেণ্টা গোয়ার পাদরী ছিলেন। তাঁহার নিকট কার্ণাওেজ প্রভৃতি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত পত্র পরে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাইমেণ্টার বিবরণ কার্ণাওেজ প্রভৃতির পত্র হইতেই সংগৃহীত।

পারেন। কিন্তু জেস্থইট প্রচারকগণের আগমনের পূর্ব্বে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল। তবে মোগলবিজয়ের সময় তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা জেস্থইট প্রচারকগণের উল্লিখিত নয় জনের অন্যতম হইতেও পারেন। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না। উক্ত নয় জনের মধ্যে অনেকে ঘোড়াঘাট বা রঙ্গপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। কারণ, তৎকালে ঘোড়াঘাট প্রদেশ পাঠানদিগের অন্যতর প্রধান বাসস্থান ছিল, এবং মোগলদিগকে ঘোড়াঘাট জয় করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ফলতঃ, আমরা বিশিষ্ট প্রমাণে কেবল চারি জন ভুঁইয়ার বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। সুখের বিষয়, তন্মধ্যে তিন জন হিন্দুরই বিবরণ জানা গিয়াছে। সেই তিন জন বাঙ্গালী ভুঁইয়া কিরূপে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণপ্রদানের চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমতঃ আমরা ভুঁইয়াগণের সর্ব্বপ্রধান ইশাখাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠানেরা বঙ্গদেশে মোগলদিগকে কিরূপ ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। ইশাখাঁর বিবরণের পর আমরা তিন জন হিন্দু ভুঁইয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

মায়ার বন্ধন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যুষে রামার মা প্রতিমার ঘরে আসিয়া দেখিল, প্রতিমা নাই।—নীচের বিছানার লেপ চাদর পর্য্যন্ত নাই; উত্তর দিকের দরজা খোলা; ঘরের মেজেয় লম্বা লম্বা কাদামাখা পায়ের দাগ। রামার মার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে বসিয়া পড়িল; দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিতে লাগিল—"আমার প্রতিমা, আমার চোখের মণি কোথায় গেল! এ আর কারো কাজ নয় গো—সেই মহেন্দ্ররি কাজ! কি হ'ল গো!—"

সন্তোষের মা তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন, "দিদি, এমন করিতেছ কেন? কি হইয়াছে?"

বামার মা দ্বিগুণমাত্রায় কাঁদিয়া কহিল, "হবে আর কি—আমার মরণ হয়েচে! আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে! মাথ্‌নার জমীদার বেটা আমাকে শাসিয়েছিল;—আগে কেন তোমাদের বলি নি গো!"

সন্তোষের মা বামার মা'র কথা শুনিয়া এবং ঘরের অবস্থা দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন কি হইয়াছে, তখন তিনিও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। মালতীও আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্তোষ ছাতে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। সে হঠাৎ এই কান্নার স্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি হইয়াছে?" মা বলিবার আগে বামার মা কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত খুলিয়া বলিল, এবং মহেন্দ্ররই যে এই কাজ, তাহা বারংবার বলিতে লাগিল।

সন্তোষ প্রতিমার নিকট মহেন্দ্রর দুরভিসন্ধির কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। মহেন্দ্রর প্রতি তাহার সন্দেহ হইল, কিন্তু কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বে সে আপনাকে সংযত করিয়া এবং অন্যান্য সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বাড়ীর ঘরগুলা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। কোথাও না পাইয়া অবশেষে বাগানে আসিয়া চারিপাশ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল,—এমন কি, বাগানে জলসেচনের জন্য যে কূপ আছে, তাহার মধ্যেও লোক নামাইল। নদীর ধারে লোক ছুটিল। কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিলিল না। সন্তোষ তখন চাকর-বাকর দরওয়ানকে ডাকিয়া বকাবকি আরম্ভ করিয়া দিল। সকলে একবাক্যে কহিল, তাহারা কিছু জানে না, রাত্রে কাহাকেও বাড়ীতে আসিতে দেখে নাই।

সন্তোষ নিরুপায় হইয়া বিষণ্নমনে অবসন্নদেহে লাইব্রেরীতে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, "কি করা যায়?" সকলের সমক্ষে যে দুর্ভাবনাকে সে এতক্ষণ অন্তরে চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, তাহা এক্ষণে তাহাকে একলা পাইয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার সেই বিচ্ছেদ-বিষাদ, নৈরাশ্য আশঙ্কা সমস্ত আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া এক বৃহৎ আকার করিল। সন্তোষ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "পুলিশে খবর দিই।" এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, "প্রেমানন্দ বাবাজী আসিয়াছেন।" সন্তোষ তাঁহাকে ঘরে আনিতে বলিল।

প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকিয়া সন্তোষের সেই শুষ্ক বিশুষ্ক উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া সমস্ত ঘটনা একেবারে খুলিয়া বলিলেন। সন্তোষ ছুটিয়া উপরে গিয়া মাকে সংবাদ দিল। দুঃখের পর সুখের সংবাদে যেরূপ হইয়া থাকে,—সকলে হর্ষ-স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল

সন্তোষ কহিল, "আমি এখনি মঠে চলিলাম।"

মাতা কহিলেন, "আমিও যাইব।"

মালতী কহিল, "আমরাও যাইব।"

ইহার অল্পক্ষণ পরে দুইখানা গাড়ী কর্দ্দমাক্ত পথ দিয়া ঝটিকা-নিক্ষিপ্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ভগ্ন শাখা মাড়াইয়া সশব্দে চলিতে লাগিল।

একখানা গাড়ীতে সন্তোষ ও প্রেমানন্দ, এবং অন্য গাড়ীতে সন্তোষের মা, বামার মা ও মালতী ছিল।

বামার মা কহিল, "আমি কিন্তু শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলুম,—ঝড়বৃষ্টিতে অত ঠাহর কর্‌তে পারি নি।"

সন্তোষের মা কহিলেন, "আমি অর্দ্ধেক রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিলুম—গা ছম্ ছম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।"

মালতী কেবল চুপ করিয়া ছিল। সে বসিয়া ভাবিতেছিল, প্রতিমার সহিত দেখা হইলে তাহাকে কি বলিবে। সন্তোষ থাকিয়া থাকিয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া "জোর্‌সে হাঁকাও! জোর্‌সে হাঁকাও!" বলিয়া কোচ্‌ম্যান্‌কে উৎখাত করিয়া তুলিতেছিল।

গাড়ী মঠে আসিয়া থামিল। প্রতিমা তখন উঠিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সে যেন কিছু ঠিক্ করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতি যেমন গত রাত্রে ভীষণ প্রলয়খেলা খেলিয়া আর্দ্র সিক্ত শ্রান্ত ভাবে এলাইয়া পড়িয়াছে,—প্রতিমার শিথিল তনুকে আচ্ছন্ন করিয়া তেমনই কি যেন এক স্বপ্নের মত, তন্দ্রার মত চারি দিকে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে চাহিয়া আছে, অথচ কিছুই দেখিতে পাইতেছে না; ভাবিতেছে, অথচ মাথায় কিছু প্রবেশ করিতেছে না। তাহার মুখখানি মলিন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; চোখে কালি পড়িয়াছে; অবিন্যস্ত চূর্ণকুন্তল অশ্রুসিক্ত মুখের উপর আসিয়া উড়িতেছে। অদূরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী আনন্দময়ীকে প্রতিমার শুশ্রূষা সম্বন্ধে আদেশ দিতেছিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া বামার মা দৌড়িয়া আসিয়া প্রতিমাকে বুকের মধ্যে লইয়া "মা আমার, তোর কপালে এত দুঃখ ছিল!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্তোষের মাও কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিমার কাছে বসিয়া অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে লাগিলেন। সন্তোষ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বামার মা হঠাৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে সেই অলপ্পেয়ে লক্ষ্মীছাড়া জমীদারের বেটা!"—

বামার মার কথা শেষ হইতে না হইতে সন্তোষ একলম্ফে মহেন্দ্রর কাছে গিয়া ঘুঁসি তুলিয়া মারিতে উদ্যত হইল।

প্রতিমা কহিল, "উহাকে ক্ষমা করুন, আর মারিবেন না। সকাল হইতে কান্নাকাটা করিতেছে।"

সন্তোষ কহিল, "প্রতিমার কথায় আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম—নচেৎ পাষণ্ড, এখনি তোমাকে মারিয়া ফেলিতাম।"

বামার মা মহেন্দ্রর কাছে আসিয়া কহিল, "তা' হচ্ছে না, প্রতিমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া উহার কাছে মাপ চাও, নহিলে ছাড়িব না।"

মহেন্দ্র প্রতিমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া ক্ষমা চাহিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"সন্তোষ, উহাকে ক্ষমা করিয়া ভাল করিলে। ইহাতে উহার আরও শিক্ষা হইবে।" মহেন্দ্রকে কহিলেন, "জানিও, অধর্ম্মের কখনও জয় হয় না। এমন কাজ আর কখনও করিও না।" ইহার পর সন্ন্যাসী সন্তোষের মাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, ভাল দিন দেখিয়া উহাদের বিবাহ যাহাতে শীঘ্র হয় চেষ্টা করিবেন।"

সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া সকলে প্রস্থানোদ্যত হইলে সন্ন্যাসী প্রতিমাকে সস্নেহে কহিলেন, "মা, তোমার পদে পদে দুঃখ। ধৈর্য্য হারাইও না। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকলে সুস্থ হইলে সন্তোষ যখন দেখিল, প্রতিমার কাছে আর কেহ নাই, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল। প্রতিমা শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

সন্তোষ প্রতিমার কাছে বসিয়া কহিল, "প্রতিমা, আমাদের দোষে তুমি এতটা কষ্ট পাইলে!"

প্রতিমা কহিল, "আপনাদের দোষ কিসে?—আমার অদৃষ্টের দোষ বলুন।"

সন্তোষ। মহেন্দ্র ওরকম লোক জেনে শুনে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

প্রতিমা। কে জানিত—উহার অতটা সাহস হইবে।

সন্তোষ গদগদভাবে কহিল, "প্রতিমা, তোমাকে প্রথম দেখিয়াই আমি ভালবাসিয়াছি। প্রথমদিনেই তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, তোমার অন্তরে দুঃখ

নাই,—তোমার বিষণ্ণতা আমার প্রাণে বড় বাজিয়াছিল ;—ভাবিয়াছিলাম, আমার এ ভালবাসা দিয়া তোমার বিষাদ-কালিমা মুছিয়া ফেলিতে পারিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এখানে আসিয়া অবধি তোমার সেই দুঃখ, সেই কষ্ট!”

প্রতিমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, কহিল, “অনাথার সুখ কবে! বাপ মাকে যে চক্ষে দেখিল না, পৃথিবীতে যে আত্মীয়হীনা—তাহার অন্তরে ব্যথা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এমন কথা বলিবেন না,—আমি যা' সুখী হইয়াছি, তাহা দেখাইবার হইলে দেখাইতাম! আমি ত এখানে রাণীর হালে সুখভোগ করচি। আপনারা আমাকে যে আদর যত্ন করিতেছেন, নিজের লোকেও এমন করে না! বাপমায়ের অভাব অনেকটা ভুলাইয়া দিয়াছেন। তবে বেশী দিন যে দুঃখভোগ করে, সুখের রেশ তাহার মুখে সহজে প্রকাশ পায় না। আমারও তাই।”

সন্তোষ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “তাহা হইলে প্রতিমা, সত্যসত্যই তুমি আমাকে ভালবাস?”

প্রতিমা কহিল, “সে কথা আর কতবার বলিব।”

সন্তোষ কহিল, “তুমি আমাকে ভালবাস শুনিলে আমার মনে এতটা সুখ হয় যে, নিজেকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না,—তাই শতবার ঐ একই প্রশ্ন, তোমার মুখে ঐ একই কথা শুনিবার বারংবার ইচ্ছা।”

প্রতিমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তাহা হইলে এক কাজ করুন। আমাকে একটা খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখুন। আমি দিনরাত ঐ একই বুলি আওড়াইব।”

সন্তোষ কহিল, “আমি ত তোমাকে হৃদয়-পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি,—সেইখানে থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব।”

মালতী দরজার আড়াল হইতে সব শুনিতেছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “দাদা, এ রত্নটিকে আর কখনও আল্‌গা রেখো না—বাক্সয় চাবিবন্ধ করে' রেখে দাও।”—তাহার পর প্রতিমাকে কহিল, “আমাদের ত ভাই কেউ চুরি করে না।”

প্রতিমা কহিল, “তোমাদের এখানে এত ছিঁচ্‌কে চোর আছে, তাহা ত জানিতাম না। তোমাদের মত মহামূল্য রত্ন নিলে পাছে ধরা পড়ে, তাই আমার মত সামান্য জিনিসই চুরি করে,—জানে যে, তা' হ'লে খোঁজ হবে না। এতদিন ত কুঁড়েঘরে পড়েছিলুম—কেউ ত ভাই চুরি করে নাই।”

মালতী এ কথার কোনও জবাব না দিয়া কহিল, "মা বলিতেছিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমাদের শীঘ্র বিবাহ দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। মা তাই ভট্‌চায্যি মশায়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।"

প্রতিমা কথাটা চাপা দিয়া "যাই, মায়ের কাছে গিয়া একটু বসিগে" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। সন্তোষও আনন্দবিহ্বলচিত্তে বাহিরে আসিয়া বসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাসময়ে ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিধানে থানধুতি; গলদেশে লম্বমান শুভ্র উপবীত; শিরোগিরিশিখরে প্রকাণ্ড শিখাতরু; হস্তে শম্বুক-নস্যদান। সন্তোষের মা প্রণাম করিয়া আসন-খানি বিছাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপবেশন করিয়া এক-চিম্‌টি নস্য গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রয়োজন কি?"

সন্তোষের মা কহিলেন, "এই ছেলের বিয়ে দিব—আর কি।"

ভট্টাচার্য্য। ভাল ভাল, শুভ শুভ; শাস্ত্রেই আছে,—'প্রাপ্তে চ ষোড়শে বর্ষে পুত্রং পরিণীয়েৎ।'—অর্থাৎ, ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হইলে পুত্রের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। শ্রীমান সন্তোষকুমারের বয়স কত হইল?"

মাতা। এই মাঘ মাস আসিলে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবে।

ভট্টাচার্য্য। পঞ্চবিংশ বর্ষ! নারায়ণ! নারায়ণ! আর কালবিলম্ব কদাপি উচিত নয়। শুভস্য শীঘ্রং।"

মাতা। সেই জন্য ত আপনাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। এই সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে কাজটা হয়—একটা ভাল দিন স্থির করিয়া দিন।"

ভট্টাচার্য্য নস্যগ্রহণান্তর বসনাগ্রভাগে নাসিকা মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "ভাল, ভাল,—অবশ্য আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব। পাত্রী মনোনীত হইয়াছে?"

মাতা। পাত্রী এইখানেই আছে। দেখিতে পরমসুন্দরী, আর গুণের কথা কি বলব?—তবে সংসারে তার মা বাপ আত্মীয় কেহই নাই।

ভট্টাচার্য্য। তাহাতে কিছু ব্যত্যয় ঘটিবে না। শাস্ত্রে আছে,—'অনাথাং সনাথাং কুর্য্যাৎ'—অর্থাৎ, অনাথা যে বালিকা, সে শ্বশুরকুলে আসিয়া সনাথা হয়।

মাতা। মেয়েটির উচ্চবংশে জন্ম; মাখ্‌নার রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা; কুলশীল সমস্তই ভাল। হাঁ, আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুর কন্যা-সম্প্রদান করিবেন, বলিয়াছেন। তাঁর কাছেই মেয়েটি প্রথম আসিয়া উপস্থিত হয়—তিনি আবার আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন। মেয়েটির আর কেউ নাই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজেই সম্প্রদান করিতেছেন। আহা, ঠাকুরের কি দয়া!

ভট্টাচার্য্য। আমাদের মহানন্দ স্বামীর কথা বলিতেছেন? হাঁ, তিনি অতিশয় দয়াপরতন্ত্র। মনুতে আছে, গৃহী চ সন্ন্যাসী চ অভিভাবকঃ স্যাৎ কন্যাং সম্প্রদদ্যাৎ।—অর্থাৎ গৃহীই বল, সন্ন্যাসীই বল, অভিভাবকস্বরূপ হইয়া সকলেই কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারে। মহানন্দ স্বামী সন্ন্যাসী হইয়াও এতাবৎকাল উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অনায়াসেই সম্প্রদানকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন। রাজীবলোচন ত ফুলের মুকুটি—তাহারই কন্যা! সদ্বংশসম্ভবা—অতি উত্তম, অতি উত্তম।

সন্তোষের মা উঠিয়া গিয়া প্রতিমাকে ডাকিয়া আনিলেন। বামার মা মালতীও সঙ্গে আসিল। সকলে প্রণাম করিয়া বসিলে, ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "এই কন্যা? কিঞ্চিৎ বয়ঃস্থা দেখিতেছি। তা' ভাল, ভাল; অম্বে, তোমার হাতখানি একবার দেখি;—অতিশয় সুলক্ষণা, অতিশয় সুলক্ষণা,—পতিকুল উজ্জ্বল করিবে।—কন্যার কোষ্ঠী আছে?"

বামার মা কহিল, "হাঁ, আমার নিকটে এইখানেই আছে;—মেয়ের বাপ আমার কাছে দিয়া গিয়াছিলেন।"

বামার মা কোষ্ঠী আনিল। সন্তোষের মাও সন্তোষের কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য দুই জনের কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিলেন, "এ যে রাজচটক্ যোগ দেখিতেছি! অতি চমৎকার।—সাধু! সাধু! এমন যোগ কদাচ পরিলক্ষিত হয়!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় নস্যগ্রহণানন্তর সম্মুখস্থিত পাঁজি দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া কহিলেন, "আশ্বিনস্য শুক্লপক্ষে বুধবাসরে ষোড়শ-দিবসে বিবাহের প্রকৃষ্ট দিন আছে। দ্বিপ্রহর রাত্রে লগ্ন। তাহা হইলে আর অষ্ট দিবসমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে।"

সন্তোষের মা কহিলেন, "তাহা ঠিক হইবে। তাহা হইলে ঐ দিনই স্থির রহিল?"

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, অবশ্য, অবশ্য,—গুরুদেব! গুরুদেব!

সন্তোষের মা একটি মোহর রাখিয়া পদধূলি লইলেন। ভট্টাচার্য্য মোহরটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া "চিরউম্নবতী হউন, সাধু! সাধু!" বলিতে বলিতে ভুঁড়ি দোলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হুহু শব্দে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বাটীর বহির্দ্দেশে চুণকাম আরম্ভ হইল; বাগানে আটচালা বাঁধিতে লাগিল; ঘরদুয়ার ঝাড়াপোঁছা, ভাঁড়ারঘর ঠিক করা, জিনিসপত্র আনান গোছান,—সমস্তই তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া হইতে লাগিল।

সন্তোষের মাতুল ও পিতৃব্য পত্র পাইয়া পূর্ব্বাহ্নেই আসিয়াছেন। ক্রমে আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীতে যেন মেলা বসিয়া গেল। কোথাও কোন যুবতী ছেলে কোলে করিয়া চেঁচাইতেছে,—"ওগো, ছেলের একটু দুধ দিয়ে যাও;" কোথাও দুই চারি জন প্রৌঢ়া মশলা বাটিতেছে; কোথাও অনেকে জটলা হইয়া সমালোচনা করিতেছে; কোথাও কোনও পতিসোহাগিনী অন্যের নিকট আপনার সুখের কথা কহিতেছে; কোথাও কেহ বা প্রতিমার কাছে আসিয়া "বাঃ! দিব্য মেয়ে হইয়াছে!" মুখে বলিতেছে, কিন্তু মনে মনে কহিতেছে, "ইহার অপেক্ষা আমার বেটার বউ শতগুণে ভাল;" কোথাও কেহ আর কিছু না পাইয়া দাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতেছে। সন্তোষের মা পুত্রের ইষ্টার্থ প্রাণপণে সকলকে সমানভাবে আদর যত্ন করিতেছেন।

বহুমূল্যবস্ত্রাদি দাসদাসী সকলকে বিতরণ করা হইল; সামাজিক অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হইল না; আইবড়ভাতও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবদারুপত্রশোভিত উচ্চমঞ্চে নহবৎ আনন্দোৎসব ঘোষণা করিতে লাগিল; দ্বারদেশে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল; চতুর্দ্দিক পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত হইল; বেলোয়ারি ঝাড় লণ্ঠনের ঠুং ঠাং শব্দ আরম্ভ হইল; ভারে ভারে দই সন্দেশ আসিতে লাগিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবকেরা নানাবর্ণের বিচিত্র কাপড় পরিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই ব্যস্তসমস্ত ভাব।

লোকজনের সমারোহে, অপরিচিত সহস্র লোকের সকৌতূহল দৃষ্টিপাত ও জিজ্ঞাসাবাদে, এবং অজানা নবীন জীবনযাত্রারম্ভের উৎকণ্ঠায়, ক্লান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, প্রতিমা বিকালের দিকে লুকাইয়া ছাতে চিলের ঘরে আসিয়া একবার বসিল। পুষ্পের মৃদু গন্ধ বাতাসে উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছে; দূর হইতে সানাইয়ের করুণ সুর জনতার কোলাহল ভেদ করিয়া কানে আসিয়া লাগিতেছে; শরতের ক্লান্ত পীত রৌদ্র উদাসভাবে দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।—প্রতিমা

বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "কাঙ্গালিনী আমি ত রাজরাণী হইতে চলিলাম। কিন্তু আমার এ সুখ আপনার জন কেহই দেখিল না! এত লোক জন আসিল, আমার কেহই নাই! বাপ মা থাকিলে আজ তাঁহাদের কি আনন্দ হইত!"—প্রতিমা একবার আকাশের দিকে চাহিল, মনে মনে কহিল, "হয় ত ঐখান হইতে তাঁহারা আমাকে দেখিতেছেন, আশীর্ব্বাদ করিতেছেন!"—প্রতিমা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে সহস্রবার প্রণাম করিল; তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে বামার মা কাপড় তুলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কাছে বসিয়া কহিল, "কাঁদিস্ নে মা! তোর এমন দেবতুল্য স্বামী হ'ল—তোর সবি ত বজায় রইল মা। আমিও তোর মায়ের মত আছি। আর কেঁদে অকল্যাণ করিস্ নে। চল্!"—এই বলিয়া প্রতিমার চোখ মুছাইয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া নীচে নামাইয়া আনিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সহস্র দীপালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল। সজ্জিত গৃহে কিংখাপমণ্ডিত শয্যায় বরবেশে সন্তোষ আসিয়া বসিল। চারিপাশে কৌচ, চৌকি, সোফা। প্রস্তরমণ্ডিত টেবিলের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে রাশি রাশি ফুলের মালা ও তাম্বুল স্তূপাকারে বিরাজ করিতেছে;—আতরদান গোলাপপাশও রহিয়াছে। দেয়ালে বড় বড় আয়না;—তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া ঘর দ্বিগুণ চতুর্গুণ বড় দেখাইতেছে।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্তোষের পিতৃব্য ফুলের মালা আতর গোলাপ দিয়া সকলের যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। সোনার রূপার মুখনলদেওয়া বড় বড় আল্‌বোলায় অম্বুরী তামাক চলিতে লাগিল।

আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা গল্পগুজব চলিতেছে—রাত্রি প্রায় দশটা, এমন সময়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিলাসগৃহে সেই সহস্র চঞ্চল দীপালোকে সন্ন্যাসীর সেই গম্ভীর অচঞ্চল মূর্ত্তি, তাঁহার সেই নয়নের প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিপাত, তাঁহার সেই গৈরিক বসন, সকলের মনে এমনই একটি স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিল, যাহা, যাঁহারা প্রাতে সন্ধ্যায় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া রক্তথাল উদয়াস্তের সূর্য্যকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সকলে উঠিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলেন।

ক্রমে সময় হইয়া আসিল। অন্তঃপুরে বরণক্রিয়া শেষ হইলে সন্তোষের পিতৃব্য সন্তোষের হাত ধরিয়া নীচে পূজার দালানে লইয়া গেলেন। সকলে

সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেল। বামকণ্ঠের হুলুধ্বনি উঠিল। ভাটেরা বংশকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

কন্যার আগমন-প্রতীক্ষায় সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, এমন সময়ে রক্তাম্বর পরিয়া, অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া, চন্দনচর্চ্চিতভালে প্রতিমা পীঁড়ার উপর আসিয়া বসিল। সে মুখশ্রী, সে রূপসৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি স্নেহার্দ্র,—অতিশয় করুণ, অতিশয় কোমল, অতিশয় মধুর,—সে দৃষ্টি পাষাণভেদিনী, মর্ম্মস্পর্শিনী,—সে দৃষ্টি অভ্যাগত সকলকে স্পর্শ করিয়া অচেতন আকাশকেও স্পর্শ করিল।

সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী অর্চ্চনাদি শেষ করিয়া পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণহস্তোপরি স্থাপন করিয়া যখন কম্পিতকণ্ঠে "শ্রীমতী প্রতিমা দেবীং এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া অনাথা প্রতিমাকে সম্প্রদান করিলেন, তথনকার সেই দৃশ্যে সভাস্থ সকলকারই চক্ষে জল আসিল।

বিবাহ শেষ হইলে সকলে আহারাদি করিতে বসিলেন। সন্ন্যাসী আর এক মুহূর্ত্তও অবস্থান না করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে সেই নিস্তব্ধ মাঠ ভাঙ্গিয়া মঠের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর বহুদিন ধরিয়া থিয়েটার নাচ যাত্রা চলিল। ফুলশয্যা, পাকস্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী সঙ্কল্পমত মঠের একপ্রান্তে অনাথা বিধবাদিগের থাকিবার জন্য সাত আটটি ঘর তুলিয়াছেন। সন্তোষ বিবাহোপলক্ষে এই নূতন আশ্রমের জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। সন্তোষের ইচ্ছামতে সন্ন্যাসী এই আশ্রমের নাম "প্রতিমালয়" রাখিলেন।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন সন্ন্যাসী দীনদরিদ্র অনাথা বিধবাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্তোষও পরিবারস্থ সকলকে লইয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আদরপূর্ব্বক সকলকে আহার করাইল।

আহারান্তে সন্ন্যাসী প্রতিমাকে দেখাইয়া সকলকে কহিলেন, "ইহার নামে আশ্রম উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।" সকলে প্রতিমার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া দুই হস্ত তুলিয়া কহিল, "মা, তুমি চিরঞ্জীবী হও!"

উৎসবশেষে সন্ন্যাসী সন্তোষ ও প্রতিমাকে যোগমণ্ডপে লইয়া গিয়া উভয়কে বসাইয়া এই উপদেশ দিলেন;—সন্তোষকুমারকে কহিলেন, "বৎস, তোমার পত্নীর সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনে সতত যত্নবান্ থাকিবে; সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিবে; সকল অবস্থাতেই শান্তচিত্ত হইয়া সেই পরাত্মার পাদপদ্মে মন রাখিবে; অহঙ্কারকে কদাচ মনে স্থান দিবে না; নিত্য ভগবানের পূজার্চ্চনা করিবে; সদা সৎকর্ম্মশীল হইবে।"—প্রতিমাকে কহিলেন, "বৎসে, তুমি সদাচারা পতিহিতকারিণী হইবে; কায়মনোবাক্যে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবে; গুরুজনকে ভক্তি এবং তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিবে; দাসদাসীর প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিবে; স্নেহভাজনদিগের কল্যাণকামনা করিবে; ভগবানে মন রাখিবে। বৎসে, তুমি এত দিন যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া আসিয়াছ—অন্যকে সেই দুঃখভাগী দেখিলে তাহার সেই দুঃখমোচন করিতে সতত যত্নশীলা হইবে। আর কি বলিব।"—সন্ন্যাসী উভয়ের মস্তকের উপর হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্তোষ ও প্রতিমা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিয়া সন্তোষ প্রতিমাকে কহিল, "এ ঘরে যে কত দিন আসি নাই! তোমাকে দেখিয়া অবধি এ ঘর একরকম পরিত্যাগ করিয়াছি।"

প্রতিমা কহিল, "ঘরের কি দোষ হইল?"

সন্তোষ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঘরের দোষ কিছু নাই, তোমার ঐ মুখের দোষ।"—এই বলিয়া প্রতিমাকে চুম্বন করিল।

দুই জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্তোষ কহিল, "আমি ভাবিতেছি, তোমাতে আমাতে পশ্চিমে কোথাও বেড়াইতে যাই।"

প্রতিমা কহিল, "আর কেহ যাইবে না? মালতী, মা,—সকলকে লইয়া চল।"

সন্তোষ কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুই চারি দিন পরে সন্তোষ সকলকে লইয়া গিরিধি অভিমুখে যাত্রা করিল।

প্রতিমা পূর্ব্বে কখনও রেলগাড়ীতে চড়ে নাই,—এই তাহার প্রথম যাত্রা। গাড়ী যখন বাঁশী বাজাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে ষ্টেশন ছাড়িয়া হুহুঃ শব্দে চলিতে লাগিল—প্রতিমার আনন্দ দেখে কে! বাঁশঝাড়, কদলীবন, পানাপুকুর, পর্ণকুটীর, গ্রাম্যচিত্র সে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু জমীসুদ্ধ তাহারা যে পশ্চাতে

ঝোঁ ঝোঁ করিয়া হটিয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনায় কখনও আসে নাই। মাঝে মাঝে বিপরীত দিক হইতে আর একটা ট্রেণ ঝড়ের মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যায়;—প্রতিমা ভয়চকিত হইয়া ছুটিয়া গাড়ীর অপর পার্শ্বের বেঞ্চে গিয়া বসে। রিজার্ভ কামরায় তাহাদের সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ ছিল না।

ক্রমে যখন গাড়ী রাণীগঞ্জের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, পাহাড় দেখিয়া প্রতিমা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ দেখ পাহাড়, ঐ দেখ পাহাড়,—কি সুন্দর!"—কোনও পাহাড় তরুতৃণাচ্ছাদিত হরিৎবর্ণ, কোনটা বা তৃণসম্পর্কহীন দগ্ধ অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যে মধ্যে কয়লার খনি —ছোট্ট এঞ্জিন, ছোট ছোট কয়লা-বোঝাই গাড়ী লইয়া রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। প্রতিমা দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিল।

গাড়ী মধুপুরে আসিয়া পৌঁছিলে সন্তোষ জিনিসপত্র নামাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া গিরিধির গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় গাড়ী গিরিধিতে আসিয়া থামিল। সকলে নামিয়া পুনরায় ঠেলা-গাড়ীতে চড়িয়া অর্দ্ধঘণ্টার দারুণ ঝাঁকানির পর আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলোয় আসিয়া পৌঁছিল। সকলেই শ্রান্ত। জিনিসপত্র যেমন-তেমন করিয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া, যে যেখানে পাইল, শুইয়া পড়িল।

পরদিন জিনিসপত্র গুছাইতে কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার পর পূর্ণবেগে আনন্দ-পর্য্যটন আরম্ভ হইল। কখনও অন্ধকার শালবনের মধ্যে গিয়া লুকোচুরি খেলা, কখনও হরীতকী-বাগানে গিয়া হরীতকী কুড়ান, কখনও বাজি রাখিয়া শুষ্ক বালুময় নদীর উপর দিয়া ছুটিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া, কখনও গিরিশৃঙ্গে ওঠা, কখনও বটগাছের তলায় বসিয়া রান্না করা,—দিনগুলা সুখে জলের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন পুস্‌পুসে করিয়া সকলে মিলিয়া পচম্বায় গেল, একদিন ঝরণা দেখিতে গেল, একদিন কয়লার খনিতে নামিল।

ক্রমে যখন সমস্ত দেখাশুনা শেষ হইয়া আসিল, তখন মধ্যাহ্নটা ঘরেই কাটিতে লাগিল। সন্তোষ নিজের ঘরে বসিয়া প্রতিমাকে লইয়া কখনও তাস খেলে, কখনও বই পড়িয়া শোনায়, কখনও নির্জ্জনে দু'জনে প্রাণের কথা কহিতে থাকে।—দূর হইতে রাখালের বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসে; আম্রতরুচ্ছায়াখচিত পথ দিয়া পুস্‌পুস খট্‌খট্‌-শব্দে চলিতে থাকে; সম্মুখের ঐ পর্ণকুটীরবাসিনী

রাশীকৃত শুষ্কপত্রে আগুন লাগাইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; দীর্ঘচঞ্চু ভরত-পক্ষী বৃক্ষ হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিয়া বসে;—কি এক নবীন মাধুর্য্যে আনন্দ-রসে নব-দম্পতীর তরুণ প্রেম সিঞ্চিত হইতে থাকে।

প্রতিমা অপরাহ্ণে অভ্যাসমত শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদসেবা করে, গৃহের কাজকর্ম্ম দেখে, হিসাবপত্র রাখে।

এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহে বামার মা খাওয়ান-দাওয়ান কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই; তাই সে আজ সন্তোষ ও প্রতিমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে,—স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাহা-দিগকে খাওয়াইবে। সন্তোষ ও প্রতিমা সেই জন্য অন্যদিন অপেক্ষা আজ কিছু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াছে।

পর্য্যটনক্লান্ত উভয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আসিয়া বসিয়াছে। মালতী আজ বেড়াইতে যায় নাই;—সে একটা শাবল লইয়া সম্মুখের বাগানে ছোট একটা কূপখননের চেষ্টা করিতেছিল। গল-ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে গাভীরা দলে দলে বাগানের সম্মুখস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিয়াছে,—রাখাল তাহাদের সঙ্গে না পারিয়া একবার গর্ত্তে নামিতেছে, একবার রাস্তায় উঠিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া সে একেবারে হায়রাণ হইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে দু' একটি গ্রাম্য-স্ত্রীলোক চুবড়ি-মাথায় তরি-তরকারী বিক্রয়ার্থ আসিতেছে।

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং অলসভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে এক জন সাঁওতাল প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্রচর্ম্ম লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমা তাড়াতাড়ি সন্তোষকে কহিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্যে এইটে কেন না—তিনি খুব খুসী হবেন।" সন্তোষ প্রতিমার কথামত তখনই ব্যাঘ্রচর্ম্মটা কিনিয়া সন্ন্যাসীর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

স্নানাহার শেষ করিয়া উভয়ে ঘরে আসিয়া বসিলে বামার মা আসিয়া কহিল, "প্রতিমে, তোর বিয়েতে কিছুই দিতে থুতে পারি নি,—তোর মায়ের চারগাছা মল আমার কাছে ছিল, তোরি জিনিস আবার তোকেই দিলুম—এই নে।" সন্তোষকে কহিল, "বাবা, এই বোতামটা তোমার জন্যে গড়িয়েছিলুম,—গরীব মানুষ, যা' পারলুম, তাই দিলুম।"

প্রতিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বাটিতে জল ঢালিল, এবং মল কয়গাছি তাহাতে ডুবাইয়া সেই জলটা অতি ভক্তিসহকারে পান করিল।

সন্তোষ কহিল, "প্রতিমা, ও কি করিতেছ?"

প্রতিমা কহিল, "মায়ের চরণধূলি ত কখনও পাইলাম না, তাই তাঁর পায়ের মল কয়গাছা ধুইয়া চরণামৃত খাইলাম।" প্রতিমা মল কয়গাছি অতি যত্নের সহিত বাক্সয় তুলিয়া রাখিল।

সন্তোষ প্রতিমার ভক্তি দেখিয়া অবাক হইল।—বামার মা চলিয়া গেলে কহিল, "প্রতিমা, সত্যি সত্যি আমার একবার মরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, তুমি আমার জন্য কি কর।"

প্রতিমা কহিল, "তা' বই কি! তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া আমিই আগে মরিব।" এই বলিয়া—সন্তোষের কপোলে সজোরে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

এইরূপে দাম্পত্যপ্রেমের মিলনানন্দে দুই মাস কাটিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বসিয়া আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন,—এমন সময়ে প্রেমানন্দ তাঁহার হাতে একখানি ডাকের পত্র দিল। সন্ন্যাসী চিঠি খুলিয়া পড়িলেন;—"ঠাকুর, আপনা হইতেই আমার সব। আপনার কৃপায় প্রতিমাকে পাইয়াছি। কিন্তু সে যায় যায়; এ যাত্রা বুঝি আর বাঁচিল না। আমার বিপদ আপদ আপনাকে জানান বিধেয়, তাই এই পত্র লিখিলাম। শ্রীশ্রীচরণে কোটি প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

সেবক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়।"

সন্ন্যাসীর মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রেমানন্দকে কহিলেন, "আমি এখনই গিরিধি চলিলাম। তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।"

প্রেমানন্দ কহিল, "আজ যে সনাতন-পূজার দিন।"

সন্ন্যাসী রুক্ষস্বরে কহিলেন, "চুলায় যাক! তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

প্রেমানন্দ অবাক হইয়া গেল,—সন্ন্যাসীর মুখে এরূপ তীব্র কথা সে কখনও শোনে নাই।

সন্ন্যাসী আর ঘরে ঢুকিলেন না। প্রেমানন্দকে সঙ্গে লইয়া একেবারে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট্ কিনিয়া রওনা হইলেন।

সন্ন্যাসী গাড়ীতে প্রেমানন্দের সহিত একটিও কথা কহিলেন না। গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনে খোঁজ লইয়া খড়ম-পায়ে বাঙ্গলোর অভিমুখে একেবারে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার সেই তখনকার মুখের ভাব ও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান দেখিয়া লোকে হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী বাঙ্গলোয় আসিয়া পৌঁছিলে সন্তোষ তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমার এরি মধ্যে সব শেষ হ'তে চ'ল্ল! আমার প্রতিমা—আমার সর্ব্বস্ব গেল যে!—

বামার মা সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "ঠাকুর, দয়া করুন, রক্ষা করুন, মেয়েকে বাঁচান!"

সন্ন্যাসী সন্তোষকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সন্তোষ কম্পিতকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল,—"পাহাড়ে উঠিতে গিয়া পড়িয়া মাথায় আঘাত লাগে। তাহার পর হইতে খুব জ্বর। ডাক্তাররা বলে, মাথার ভিতর কিছু হইয়াছে। জ্ঞান আছে, কিন্তু আজ নাড়ী অত্যন্ত মন্দ।"—সন্তোষের আর কথা বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, প্রতিমা পাশ ফিরিয়া মালতীর কোলের উপর একখানি হাত রাখিয়া শুইয়া আছে। সন্তোষের মা শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন। দূর হইতে প্রদীপের স্তিমিতালোকে সন্ন্যাসী বুঝিলেন, প্রতিমার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে;—তাহার কোটরগত চক্ষুর চাহনি মন্দ, তাহার ওষ্ঠদ্বয় শ্বেত বিবর্ণ, এই দারুণ শীতে তাহার নাসিকাগ্রভাগে স্বেদবিন্দু।—সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে প্রতিমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আপনি এসেছেন!" এই বলিয়া উঠিয়া পদধূলি লইতে গেল—কিন্তু পারিল না,—শুইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যায়, কি এক অসহ্য দারুণ তীব্র বেদনায় তাঁহার হৃদয় শতধা স্ফুটিত হইতেছে। সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না;—মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিয়া প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "প্রতিমা, বুকের ধন, মা আমার,—আমিই তোর বাবা, আমিই তোর জন্মদাতা! আমি সন্ন্যাসী হইয়াও তোর মায়া কাটাইতে পারি নাই; তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তোকে দেখিতে পাইব বলিয়া তোর কাছাকাছি, আসিয়াছিলাম। দিনরাত তোরই ভাবনা ভাবিয়াছি, তোরই মঙ্গলকামনা করিয়াছি; তাই নিজে তোর বিবাহ দিয়াছি। অসহায় তোকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, তাই কি ভগবান আমাকে এত শাস্তি দিলেন! মা আমার, ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্, তোর বাবাকে ফেলে যাস্ নে মা!"

সন্ন্যাসী শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতিমা অস্পষ্ট উচ্চারণে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি বাবা! মা কোথায়?—বোসো।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে হাত দিল। খানিকক্ষণ পরে আবার কহিল, "আমি চল্‌লুম্; ওঁকে দেখো,—কাছে কাছে রেখো।"—প্রতিমার মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল, চোখের তারা উপরে উঠিল, শ্বাসরোধ হইল।

ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সন্ন্যাসী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বাস্পবিজড়িতকণ্ঠে প্রেমানন্দকে কহিলেন, "হতভাগ্য আমি! আমার সংসারধর্ম্মও হইল না, সন্ন্যাস-ধর্ম্মও হইল না। সব গেল, সব গেল,—আমার সকলই ব্যর্থ হইল।—আমি চলিলাম। তোমার উপর মঠের ভার দিলাম। দেখিও।"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী নিবিড় অন্ধকারে দেখিতে দেখিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। নৈশবায়ু গৃহোত্থিত সেই গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনিতে যোগ দিয়া হা-হাঃ শব্দে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন পরে হুগলী ষ্টেশনে যখন মেল ট্রেণ আসিয়া থামিল, একটি কামরা হইতে মলিনবেশে শোকার্ত্ত তিনটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ প্লাটফরমে নাবিল। ইহারা কে, পাঠকবর্গকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

সন্তোষ পরিত্যক্ত লাইব্রেরী-ঘরে পুনরায় আপনাকে নিমজ্জিত করিল। কখনও কখনও তাহাকে অন্ধকার রাত্রে 'প্রতিমালয়ে'র কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। সন্ন্যাসীকে কিন্তু আর কেহ দেখিতে পাইল না।

বর্ষ-নারী।

বসন্ত

ফোটো-ফোটো যৌবন-মুকুল;
অজানা ভাবের ঘোরে হৃদয় আকুল;
এলো-চুলে, হাসি-মুখে, চঞ্চল-চরণে,
খেলে বালা কুসুম-কাননে।

নিদাঘ

তীব্র মদিরার মত ঝাঁঝাল যৌবন!
কটাক্ষে হানিছে বাণ, দহিছে তৃষিত প্রাণ,
অষ্টাদশী-রূপতেজে ঝলসে নয়ন,—
পদপ্রান্তে প'ড়ে আছে মূর্চ্ছিত মদন!

বর্ষা

আহা! কি করুণ আঁখি আনত সজল!
প্রেম-ভরা হৃদি'পরে পয়োধরে ক্ষীর ঝরে,
কোলে শিশু হাসে খল্ খল্;—
সুস্নাতা বিমুক্তকেশী, শোভে চল চল।

শরৎ

যৌবন-গৌরব-রবি হেলেছে পশ্চিমে;—
বেশ ভূষা, অঙ্গরাগ
ঢেকেছে উপরিভাগ,
অন্তরে যৌবন-শোভা যেতেছে অন্তিমে।

হেমন্ত

প্রৌঢ়ার অঙ্গের শোভা নহে আর মনোলোভা,
শুষ্কপত্র সম সব যেতেছে ঝরিয়া;
সখেদে পশ্চাতে চায়, অগ্রে চাহি' শিহরায়,
মরমে রমণী মরি, মরে গুমরিয়া।

শিশির

স্তব্ধ জীবনের ঘনঘটা,
মহিলার শুভ্র শিরে ত্রিদিবের ছটা।
মগ্নপ্রায় ভগ্ন দেহ তরী,
লগ্নপ্রাণ ধ্রুব-তারা বিষ্ণু-পদোপরি।

রত্নপরীক্ষা।

আজকাল বাঙ্গলায় অনেক পুস্তক,—কবিতা, নাটক, নভেল, গল্প বাহির হইতেছে। তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পুস্তক অত্যন্ত অল্প। সেই স্বল্প বৈজ্ঞানিক পুস্তকের মধ্যে আলোচ্য রত্নপরীক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

রত্ন অনেকের ঘরে আছে; না থাকিলেও অনেকেই দেখিয়াছেন, বা তৎসম্বন্ধে কিছু পড়িয়াছেন, বা শুনিয়াছেন। কিন্তু কয় জন রত্ন চিনেন? মুক্তা ভাল কি মন্দ, ঝুটো কি সাঁচা, আঙ্গটীর পাথর হীরা কি কাচ, কোন রঙ্গের পাথর কোথায় বসান যুক্তিযুক্ত, পাথরের কি গুণ, কি দোষ, ও তাহার ফলে মূল্যের কি তারতম্য হয়, রত্ন কিসে ভাল থাকে, বা খারাপ হয়, তাহা কয় জন জানেন? অথচ এই সকল বিষয় ধনীরও জানা উচিত; অধনীরও মনিব, বন্ধু, বা বন্ধুর পরিবারের জন্য জানা আবশ্যক।

রত্নপরীক্ষায় এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। পুস্তকখানি গবেষণাপূর্ণ ও বহুপরিশ্রম-কৃত, সুতরাং বিশ্বসনীয়। লেখক সরকারী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ও সংস্কৃতের চর্চ্চা রাখেন। সুতরাং মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত বিবরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাগ্নিতে শোধন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। বহুমূল্য রত্নাদি ক্রয় করিবার সময় "রত্নের পরীক্ষা" নামীয় অষ্টম অধ্যায় ক্রেতার অনেক সাহায্য করিবে।

"রত্নপরীক্ষা" ২১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ও আট পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত ইহাতে উপসংহার, অনুক্রমণিকা ও বাঙ্গলা পুস্তকে যাহা সুদুর্লভ,—"সূচি" আছে। সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় লেখক সুপণ্ডিত, সুতরাং বহুতর উদ্ধৃত শ্লোকাদিতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। আর, কোনও কোনও বাঙ্গলা লেখকের পথ না ধরিয়া, তিনি নিজের উক্তি ও উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে পার্থক্য রাখিয়াছেন।

রত্নের সংস্কৃত নাম ও তাহার ইংরেজী নাম কি হওয়া সম্ভব, তাহা লেখক ঠিক দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা সর্ব্বত্র ঠিক হইয়াছে। স্থানাভাবে উপসংহার হইতে বর্ণানুসারে রত্ন-সমূহের সংস্কৃত নাম ও ইংরাজী প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারিত করিতে পারিলাম না।

এইরূপ পুস্তক যত প্রকাশিত হয়, দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের ততই মঙ্গল। এইরূপ গ্রন্থ হইতেই প্রতিপন্ন হয়, বাঙ্গালী জ্ঞানসাগরে সাঁতার দিতে শিখিয়াছে, এবং ডুব দিয়া নিজের পরিশ্রমে রত্নসংগ্রহ করিতে পারিতেছে। বইখানি এত তথ্যে পূর্ণ ও এত উপকারী যে, আশা হয়, শীঘ্র ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে। লেখকের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে। ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার সময় লেখক তাহার বিচার করিবেন। "রত্নপরীক্ষা" নামে হিন্দীতে আর একখানি পুস্তক আছে, সুতরাং অন্য নাম দিতে পারিলে গোল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, আদৎ রত্নপরীক্ষা পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদমাত্র। অতএব, রত্নতত্ত্ব, রত্নবিবরণ, রত্নশাস্ত্র, এইরূপ কোনও নাম দিলে গ্রন্থের নাম সার্থক হয়।

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্. এ. প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ,—রত্নের ইতিহাস ও সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ—ধাতুর ইতিহাস, অনেক পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র বৈদিক সাহিত্য, তাহা হইতে একটিমাত্র ঋক্ উদ্ধৃত (পৃঃ ১৫৪) হইয়াছে, এবং তাহাও ডাক্তর পি. সি. রায়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রি হইতে। কিন্তু রত্ন সম্বন্ধে ও বিশেষ ধাতুসম্বন্ধে চতুর্বেদে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে হিরণ্য (সুবর্ণ) ও অয়স্ (লৌহ) এই দুই ধাতুর ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে সীসের নাম পাওয়া যায়। আমার স্মরণ হয়, তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্বেদে) স্থানে স্থানে মণির উল্লেখ আছে। বেদের ব্রাহ্মণসমূহে মণি ও ধাতুর উল্লেখ কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে রজতের ও পাণিনীয় গণপাঠে রজত, সীস ও লৌহের উল্লেখ আছে।

রামায়ণে, বিশেষতঃ মহাভারতে, নানা মণির নাম ও তৎসংক্রান্ত অনেক কথা আছে; তাহা হইতে বাছাই করিলে রত্নবিচার সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে। এক সভাপর্ব্ব হইতেই আমি তিন চারি স্থানের উল্লেখ করিতে পারি। তৃতীয় অধ্যায়ে ময়-কৃত যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ-বর্ণনায়, মণি, বৈদূর্য্য, মুক্তা, স্ফটিক ও মহামণির নাম আছে। ভীমের দিগ্বিজয়-যাত্রায় "সাগরতীর প্রভৃতি জলপ্রধানদেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে বিবিধরত্ন·········মণিমুক্তা কাঞ্চন রজত বিদ্রুম প্রভৃতি" "কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন" (বঙ্গবাসী, ৩০ অঃ, ২৭-৮ শ্লোক)। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে খস, পারদ, তঙ্গন প্রভৃতির ভূপতিগণ "পিপীলিকা-সমুদ্ধৃত পিপীলিকা নামক দ্রোণ-পরিমিত রাশি রাশি সুবর্ণ আহরণ করিয়াছিলেন।" (বঙ্গবাসী, ৫১ অঃ, বোম্বাই ৫২ অঃ, ৩—৪ শ্লোক)। সেই উপলক্ষে "সিংহলেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাকলাপ······উপহার দিয়াছিলেন" (ঐ, ৩৫—৬ শ্লোক)।

সংস্কৃত সাহিত্যে, অন্ততঃ তাহার মধ্যে যেগুলি প্রাচীন, তাহাতে, স্থানে স্থানে রত্নসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মৃচ্ছকটিক কাব্যাদর্শের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন। তাহার চতুর্থ অধ্যায়ে বিদূষক বসন্তসেনার গৃহপ্রবেশসময়ে ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে নীলরত্ন, বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, প্রবালক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্নের নাম করিয়াছেন। আর জাতরূপ দ্বারা মাণিক্যের বন্ধন, রক্তসূত্রের দ্বারা মৌক্তিকাভরণসমূহের গ্রন্থন, বৈদূর্য্য মণির ধীরঘর্ষণ, শঙ্খের ছেদন, প্রবালকের শাণে ঘর্ষণ ইত্যাদি ক্রিয়ার বর্ণনা তথায় বর্ণিত আছে। (গাডবোলের সংস্করণ, ২০০—২ পৃষ্ঠা)। *

বৌদ্ধত্রিপিতকা ও জাতকমালা, জৈনসূত্রাবলী এবং প্রাচীন প্রাকৃত ও পালি পুস্তক হইতে রত্নবিষয়ক কতক বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। ষষ্ঠজাতকে লিখিত আছে যে, একটি মণির জন্য এক শত নিষ্ক মূল্য প্রদত্ত হয়।

প্রাচীন সময়ে ভারতের স্বর্ণাদি ধাতু ও নানা মণির পাশ্চাত্যে রপ্তানি হইত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রীক ও রোমক লেখকগণের রচনায় পাওয়া যায়। হিরোডোটসে (পঞ্চম শতাব্দী খ্রীঃ পূঃ) প্রকাশ যে, বাবিলন (Babylon) ভারতবর্ষ হইতে কুকুর ও মণির আমদানি করিত। তাঁহার মতে, পারস্যসম্রাট ডেরায়স্ সাম্রাজ্যের ভারতাংশ হইতেই ৩৭০ টালেণ্ট (talents) বা ১,২৯০,০০০

---

* যশস্তিলকচম্পূ কাব্যে লিখিত "শুকনাশ ইব রত্নপরীক্ষাসু" (পৃঃ ২৩৭)। শুকনাশ কে?

পাউণ্ড কর সোনাতে পাইতেন। হিরোডোটস্ মহাভারতীয় স্বর্ণোৎখননকারী পিপীলিকাগণের (gold-digging ants) নাম করিয়াছেন। টেসিয়স্ (৩৯৮ খ্রীঃ পূঃ) ভারতের স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহখড়্গ, পন্তর্ব নামে মণি, রুধিরাখ্য ও পালঙ্কের নাম করিয়াছেন। ডাওডোরস্ মেগাস্থিনিস্ (৩০২ খ্রীঃ পূঃ) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ ব্যতীত টিন্ ও অন্যান্য ধাতু ভারত হইতে রপ্তানি হয়।

রোমক সময়ে প্লিনী, পেরিপ্লস্ ও টলেমী ভারতীয় রত্নের বিবরণ দিয়াছেন। পেরিপ্লসে (১ম খ্রীঃ) প্রকাশ যে, হীরক, পালঙ্ক, গন্ধশস্ত, আকাশমণি, নীলমণি ও কালিএনস্ (? kalleanos) ভারতীয় পশ্চিম বন্দরসমূহ হইতে রপ্তানি হইত।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, রত্নেতিহাসের পরিচ্ছেদ অনেক বর্দ্ধিত হইতে পারে।

রত্নের সাধারণ ও বিশেষ বিবরণ পরিচ্ছেদেও (২—৭) এইরূপ কতক যোগ চলিতে পারে। হিন্দুস্থানে রত্নসমূহ ফার্সী নামেই প্রচলিত। সুতরাং ফার্সী নামগুলি দিলে হিন্দুস্থানে ও মুসলমানগণের কতক সুবিধা হইতে পারে পুনশ্চ, কলিকাতা, বোম্বাই ও সিংহল রত্নের প্রধান ক্রয়-বিক্রয়-স্থান। এই সকল স্থানের ক্রয়-বিক্রয়-পদ্ধতি, বিক্রয়ের মান, ঠকাইবার সাধারণ উদাহরণ ইত্যাদি গ্রন্থে সংযোগ করিলে গ্রন্থখানি উপকারী ও অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে।

এখানে পাঠককে আমার নিজের একটি ঘটনা বলি। ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে বেড়াইতে যাই। দুইটি মুক্তা কিনিবার সাধ হয়। সেই উদ্দেশে কয়েকটি দোকানে ঘুরি। ছোট ছোট বাড়ী, উপরে দোতালায় দোকান। মুক্তা চাওয়ায় এক এক দোকানে বিশ রকম মুক্তা বাহির করিল। পরস্পরের পার্থক্যনিরূপণ আমার অসাধ্য হইল। দাম ৫০, হইতে ৫০০, টাকা। শেষে আমার এক পার্শী আলাপীর আশ্রয় লইলে, তিনি এক জন সুর্ত্তী (surat) জহুরীকে আমার সঙ্গে দেন। তাহার সাহায্যে অনেক দেখা শুনার পর ১৫০, টাকায় এক যোড়া মুক্তা খরিদ হয়। মুক্তাদ্বয় দেখিতে মাঝারি আকারের চেয়ে ছোট, জাত পারস্যদেশীয়, ঈষৎ লাল, প্রায় গোল। বোম্বাই জহুরীগণের মতে পারস্যদেশীয় মুক্তা অন্যদেশীয় মুক্তার অপেক্ষা গুরুতর, অধিক উজ্জ্বল ও তাহার রঙ্গ অধিককালস্থায়ী। কেহ কেহ বলিলেন যে, পারস্যমুক্তা নূতন হইলে ব্যবহারে ইহার রঙ্গ ঘোরাল হয়। এখন মনে হয় যে, তখন "রত্নপরীক্ষা" থাকিলে অনেক নূতন কথা শিখিতে ও নিজে ভালরকম পরখ করিতে পারিতাম।

কয়েক বিষয়ের সময় সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। মহাভারতের "অধিকাংশ খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের" (পৃঃ ৪) ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। হিন্দী পৃথ্বীরাজরাসো চাঁদ-বার-দাইর রচনা নয়, সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর নয় ; ইহার অনেক প্রমাণ বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণ্যালে প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরুতে যখন ভোজমতের উল্লেখ আছে, (পৃঃ ৭) তখন একাদশ শতাব্দীর পর হইবে, পূর্ব্বে সম্ভব নয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ অফ্রেক্টের মতে যুক্তিকল্পতরু লক্ষ্মীধর-কৃত ও লক্ষ্মীধর গোবিন্দরাজের আশ্রিত ছিলেন। রসরত্নসমুচ্চয়-লেখক বাগ্‌ভট যদি অষ্টাঙ্গহৃদয়-কার হন, তবে দ্বাদশ শতাব্দীর না হইয়া (পৃঃ ৮) একাদশ শতাব্দীর হইবেন। বাৎস্যায়ন-নামধারী কয়েক জন ঋষি পাওয়া যায়। কামসূত্র-রচয়িতা বাৎস্যায়ন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী (পৃঃ ১০), এমন কোনও প্রমাণ নাই। কামসূত্রের বর্ত্তমান আকার অনেক আধুনিক।

নবগ্রহ সম্বন্ধে ১৫—১৭ পৃষ্ঠায় নোটে যাহা লিখিত আছে, তাহার কতক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সুবন্ধুর বাসবদত্তায় নায়িকার রূপ-বর্ণনার সময় নবগ্রহের বর্ণনা আছে ; যথা,—

"ভাস্বতালঙ্কারেণ: চন্দ্রেণ বদনমণ্ডলেন লোহিতেনাধরপল্লবেন সৌম্যেন দর্শনেন গুরুণা নিতম্ব-বিম্বেন বিকচেন নেত্রকমলেন শনৈশ্চরেন পাদেন তমসা কেশপাশেন গ্রহময়ীব।"—জীবানন্দ, পৃঃ ৩৫।

সুবন্ধু বাণের পূর্ব্ববর্ত্তী ; উদ্যোতকর ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী ; অতএব, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ বা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অবস্থিত। নবগ্রহজ্ঞান তৎকালের প্রাচীন।

লেখক Ball's Economic Geology of India দেখিয়াছেন কি না, প্রকাশ নাই। ভারতীয় মণি ও ধাতুর বিস্তৃত বিবরণ, বিশেষতঃ তাহাদের আকর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ঐ পুস্তকে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকের উন্নতি-কামনায় দুই চারিটি কথা বলিলাম। পরিবর্দ্ধিত ও পরিসংস্কৃত আকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইলে আনন্দিত হইব।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন।

আমারে হরণ করিয়া লও হে
নিখিল-চিত্ত-চোর!
নিগূঢ় কমল-ভুজ-বন্ধনে
বাঁধ হে চিত্ত মোর।
আমার আকাশ, আমার তারা,
আমার স্বর্গ, আমার ধরা,
আমার হরষ, আমার সুখ,
দিবস রজনী মোর,
সকল ব্যাপিয়া সর্ব্বময় হে
নিখিল-চিত্ত-চোর,
বেড়িয়া কোমল ভুজবন্ধনে
মোরে অধিকার করিয়া লও হে
রাজার রাজা মোর,
বিদ্রোহী চিতে করিয়া দমন
প্রেম-শৃঙ্খলে কর বন্ধন,
নিজ অধিকার কর হে প্রচার
দমি' অশান্তি ঘোর!
হে মহারাজা! হৃদয়-রাজা!
রাজার রাজা মোর!
চরণসেবিকা কর হে গ্রহণ
স্বামী মোর, প্রভু মোর!
ব্যর্থ জীবন সফল কর হে
স্বামী মোর, প্রভু মোর!
বহুদিন হ'তে আছি এই আশে,
তোমার রাতুল-চরণ-পরশে—
অনল হইবে তুষারশীতল,
বিভাবরী হবে ভোর,
কোর না বঞ্চনা জীবন-ঈশ্বর!
স্বামী মোর, প্রভু মোর!

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার।

কর্ম্মবীর টাটা।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গত জানুয়ারী মাস হইতে মিষ্টার টাটা ইয়ুরোপে বাস করিতেছিলেন। গত মে মাসে জর্ম্মাণীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। জামসেটজী নাসেরয়ানজী টাটার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ করা অসম্ভব। বোধ হয়, বর্ত্তমান কালে আর কোনও এক ব্যক্তির মৃত্যুতে ভারতবর্ষের এত ক্ষতি হয় নাই। ভারতভূমি বহু ধ্যানযোগীর প্রসবিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের বহুমহাজনের আবির্ভাব-পূত বক্ষে কর্ম্মবীরের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। সেই জন্যই ইহলোকে আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য তাঁহার ত্রিশ লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আমরা অনেকেই তাঁহার নাম জানিতাম না। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেশের উন্নতির জন্য, দেশের সম্পদবৃদ্ধির জন্য অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন। এক জন লোকের বিরল অবসরে, এক জনের দ্বারা, এত কার্য্যের সম্পাদন স্বপ্নবৎই বোধ হয়।

টাটার নাম দেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত; য়ুরোপ আমেরিকাতেও অপরিচিত নহে। "ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রের সম্পাদক বড় দুঃখেই বলিয়াছেন,—"There are many cotton mills in India, but there was only one Jamsetji Nusserwanji Tata. There is one Taj Mahal Hotel, and may there be at least one Research Institute." ভারতবর্ষের যে পার্শী সম্প্রদায় মহাজনের খেরোর খাতাকে উপনিষদের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়েই টাটার জন্ম। প্রথম হইতেই তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যাইতে পারে,—

"আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ॥"

তাঁহার ব্যবসায়ের কল্পনাও যেমন বিশাল, সিদ্ধিও তেমনই সম্পূর্ণ। বস্ত্রবয়ন, রেশম-উৎপাদন, গৃহগঠন, ধাতুতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, জাহাজের ব্যবসায়, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ। কিন্তু তবুও টাটা কেবল ব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি দেশহিতৈষী। তিনি অর্থে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের মত সম্পদশালী করিবার উপযোগী বিদ্যালাভের পথরচনায় সচেষ্ট ছিলেন। তাই বিদেশে তাঁহার মৃত্যু আমাদের পক্ষে দুঃখের কারণ হইলেও, জর্ম্মণীতে তাঁহার মৃত্যু সঙ্গত ও শোভন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত নাওশারীতে টাটার জন্ম হয়। পিতা নাসের-য়ানজী টাটা পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, কিন্তু সূতার বাজারে share-maniaর প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজার প্রথম চড়িয়া পরে নিতান্ত মন্দা হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক ক্রোরপতি সর্ব্বস্বান্ত হয়েন—অনেকের ব্যবসায় বন্ধ হয়। ইহাতেই টাটার সর্ব্বনাশ হয়। পরে আবিসিনিয়ার অভিযানে ঠিকাদারী করিয়া তিনি পুনরায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান নাসেরয়ানজী পার্শীদিগের উপকারার্থ ধর্ম্মমন্দির ও সৎকারাগার নির্ম্মাণে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

পুত্র জামসেটজী ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে শিক্ষার্থ বোম্বাই সহরে নীত হইয়া স্কুলের পাঠসমাপনান্তে এলফিনষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন। সেই কলেজে চার বৎসর অধ্যয়নের পর ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার সহিত সেনাদলের রসদঠিকাদারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হয়েন।

অল্পদিন পরে তিনি ব্যবসায়সৌকর্য্যার্থ চীনে প্রেরিত হয়েন, এবং উত্তরকালে জাপান, হংকং, সাংহাই, প্যারিস ও নিউইয়র্কে শাখা সহিত প্রসিদ্ধ টাটা এণ্ড কোম্পানীর ভিত্তি সংস্থাপিত করেন। চীন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া একটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের প্রয়াস করেন। প্রসিদ্ধ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের তাঁহার অংশী হইবার কথা ছিল। এই সময় পূর্ব্বোল্লিখিত তুলার বাজার মন্দায় টাটার পিতা ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ উভয়েরই সর্ব্বনাশ হওয়ায় সে প্রয়াস সফল হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে লব্ধ শিক্ষার ফলে তিনি পরে চিঞ্চপুগ্‌লী তৈলের কল ক্রয় করিয়া তাহা কাপড়ের কলে পরিণত করেন। কিছুদিন ঐ কল চালাইয়া লাভবান হইবার পর, তিনি উহা বিক্রয় করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের বিশেষতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। ফিরিয়া কল সংস্থাপনের উপযোগী স্থান পরীক্ষা করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কোম্পানী গঠন করিয়া নাগপুরে এম্প্রেস মিল্‌স্ স্থাপন করেন। ভারতে আর কোনও কাপড়ের কলে এত লাভ হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই Back Bayতে জমী সংস্থান করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন।

ফরাসী উপনিবেশে বৈদেশিক পণ্য আমদানী করিতে হইলে অত্যধিক শুল্ক দিতে হয়। সেই জন্য টাটা ফরাসীর অধিকৃত পণ্ডিচারীতে কাপড়ের কল সংস্থাপিত করিয়া শুল্ক হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করেন। বিশেষ বিবেচনার পর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি ধরম্‌সি মিল্‌স্ ক্রয় করেন। ইহাই এক্ষণে স্বদেশী মিল্‌স্ নামে

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। টাটাই প্রথমে এ দেশে কলে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করেন, তাহাতেই ভারতের সর্ব্বত্র দেশীয় কলের কাপড়ের কাটতির আরম্ভ।

সূক্ষ্মসূত্রের বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করিয়া টাটা এ দেশে মিশরের দীর্ঘআঁশ কার্পাস-বপনের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে গভর্মেণ্ট তাঁহার সহিত একমত হইলেন না। শেষে তিনি স্বয়ং মিশরে যাইয়া, ঐ কার্পাসের বপন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিলেন, এবং বিনামূল্যে কৃষকদিগকে বীজ দিতে লাগিলেন। এক্ষণে নাগপুরে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ঐ কার্পাসের চাষ বিশেষ আশাপ্রদ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শব্‌নম্ (ঢাকাই মসলিন) প্রভৃতি সূক্ষ্মসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত হইত; তাহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে এ দেশে দীর্ঘআঁশ কার্পাস ছিল। ক্রমে সেইরূপ বস্ত্র অনাদৃত হওয়ায় কার্পাসের চাষও উঠিয়া গিয়াছে।

কলের মজুরেরা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই চলিয়া যায়, তখন নূতন লোককে শিখাইয়া লইতে আবার বিলম্ব ঘটে। ইহার প্রতিবিধানার্থ টাটা মজুরদিগকে লাভের অংশ দিবার ও শিক্ষানবীশদিগকে বেতন দিবার প্রথা প্রচলিত করেন।

বোম্বাই কলের বস্ত্রাদি প্রধানতঃ চীনে ও জাপানে বিক্রীত হইত। পি. এণ্ড ও. ষ্টীমার কোম্পানী বোম্বাই হইতে সূত্র ও বস্ত্র লইয়া যাইতে প্রতি টনে ১৭৲ টাকা ভাড়া লইতেন। যখন অষ্ট্রীয়ান লয়েড ও ইটালীর রুবাত্তিনো কোম্পানী বোম্বাই হইতে চীনে ও জাপানে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন, তখন পি. এণ্ড ও. কোম্পানী তাঁহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন;—তিন কোম্পানীই টন প্রতি ১৭৲ টাকা ভাড়া স্থির রাখিলেন। টাটা জাপানের প্রধান ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বোম্বাই হইতে জাপানে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলেন। সে কোম্পানী টন প্রতি ১৩৲ টাকা ভাড়া স্থির করিলেন। য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলি জাপানী কোম্পানীর ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে, টন প্রতি প্রথমে ২৲ টাকা ও পরে ১৲ টাকা ভাড়া নির্দ্ধারিত করিলেন। তবুও জাপানী ব্যবসায়ীরা জাপানী কোম্পানীকেই মাল দিতে লাগিলেন দেখিয়া, পি. এণ্ড ও. কোম্পানী বে-সরকারী ভাবে এ কথা ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জানাইলেন। জনরব, লর্ড রোজবেরী স্বয়ং জাপানী দূতকে বলেন,—এরূপ হইলে ইংলণ্ড জাপানের প্রতি বিরূপ হইবেন। এ কথা জাপানে প্রকাশিত হইলে, জনসাধারণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এবং জাপানী সংবাদপত্রসমূহ স্বার্থত্যাগ ও দেশহিতৈষণার জন্য জাপানী কোম্পানীকে রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। পি. এণ্ড ও. কোম্পানী বিলাতী ডাক

বহনের জন্ত ভারতীয় রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকেন। সেই অর্থবলে বলী হইয়া কোম্পানীর পক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া টাটা এক পুস্তিকা প্রকাশিত, এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রচারিত করেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলি নামমাত্র ভাড়া লওয়া ছাড়িয়া জাপানী কোম্পানীর সহিত সমান ভাড়া লইতে আরম্ভ করেন। টাটার জয় হইল ; কিন্তু তিনি জাপানী কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের দায়ী ছিলেন ; তাঁহার দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল।

টাটা বোম্বাই ও অন্যান্ত স্থানে ভাড়ার জন্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহীশূরে রেশমের চাষ হইত, কিন্তু সে রেশমের বিশেষ কাটতি বা দর ছিল না। বাজারে জাপানী রেশমের আদর দেখিয়া টাটা জাপান হইতে নিজ ব্যয়ে রেশমতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আনাইয়া মহীশূরে রেশমের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন, এবং মহীশূর গভর্মেণ্টের ধন্তবাদভাজন হয়েন।

এ দেশে ভাল হোটেল নাই। টাটা য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভাল হোটেলের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেল সংস্থাপিত করেন। এসিয়ায় এরূপ হোটেল আর নাই। হোটেলের প্রত্যেক বিভাগের জন্ত টাটা য়ুরোপের প্রধান প্রধান হোটেল হইতে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আনিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, টাটা হোটেলের সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। হোটেল খোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু যেদিন হোটেলের সৌধচূড়ায় গম্বুজের শেষ প্রস্তর সন্নিবেশিত হয়, টাটা সেদিন বহুদূরে—মৃত্যুশয্যায়। অল্পদিনে লাভের আশায় টাটা এ হোটেল সংস্থাপিত করেন নাই। এই হোটেলের আদর্শে দেশে এইরূপ উৎকৃষ্ট হোটেল স্থাপিত হইবে, এবং কালে তাঁহারও লাভ হইতে পারিবে, এই আশায় তিনি হোটেল খুলিয়াছিলেন।

প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে মধ্যভারতের লৌহে টাটার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। তিনি কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইবার লোক ছিলেন না। কয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যাইয়া তিনি এ বিষয় ভারতসচিব লর্ড জর্জ্জ হামিল্টনের গোচরে আনিলে, লর্ড জর্জ্জ এ প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া টাটাকে বলেন, ভারতে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে অগ্রণী। এ কার্য্যে দেশের বিশেষ উপকার ও উন্নতি হইবে, সুতরাং দেশহিতৈষীর পক্ষে এ কার্য্য সুসিদ্ধ করা অবশ্তকর্ত্তব্য। ফলে তিনি

দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ভারতসচিবের আগ্রহহেতু গভর্মেণ্টের ঔদাস্য ও আপত্তি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহে পরিণত হইল; সর্ব্বত্র রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার অনুকূল হইয়া উঠিলেন।

টাটার বিশ্বাস ছিল, কার্য্য আরব্ধ হইলে সপ্রমাণ হইবে যে, মধ্যভারতেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য লৌহখনিজ বিদ্যমান। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, এক ক্রোর টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরব্ধ করিলে বৎসরে ন্যূনকল্পে ৩০০ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই কার্য্যের জন্য তিনি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রধান প্রধান লৌহের কারখানার কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে জর্ম্মনীতে লৌহের কারখানায় কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। মধ্যভারতে চান্দা জেলায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাম্রের খনিতে তাম্র উত্তোলিত হইত। টাটা সেই কার্য্যের পুনরারম্ভের আয়োজন করিতেছিলেন। এই দুই কার্য্যের জন্য তাঁহার লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ও হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অসমাপ্ত কার্য্য এখন কি হইবে, বলিতে পারি না। তবে ভরসা এই যে, তাঁহার পুত্রদ্বয় কৃতী।

শেষে তিনি আরও দুইটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন;—তদুভয় কার্য্যের ফলের বিষয় আমরা অবগত নহি। তিনি বোম্বাইয়ে সমুদ্রের খাঁড়ি জমা লইয়া তাহাতে মৎস্যের চাষ করিতেছিলেন, এবং বিস্তৃত পতিত জমী লইয়া পাশ্চাত্য প্রথায় গোচারণের মাঠ করিয়া দুগ্ধ পনিরাদির ব্যবসায় করিতেছিলেন।

যে কার্য্যের জন্য আজ টাটার নাম প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ও সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, এক্ষণে তাহার কিছু পরিচয় দিব। পার্শী যুবকদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাশ্চাত্যদেশে প্রেরণ করিবার জন্য টাটা কিছু দিন পূর্ব্বে একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপিত করেন। পরে যাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিমাত্রই অর্থসাহায্য পাইতে পারেন, তাহার জন্য, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবাসিমাত্রেরই পক্ষে ভাণ্ডারদ্বার মুক্ত করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বর তাঁহার বিজ্ঞানগবেষণামন্দির সংস্থাপনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। টাটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশনে লর্ড রিয়ে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার ফলেই তাঁহার মনে এ কল্পনা উদিত হয়। দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার প্রস্তাবের কার্য্যাধ্যক্ষ মিষ্টার পাদশা এই বিষয়ে য়ুরোপীয় শিক্ষাবিদ্গণের পরামর্শ লইতেছিলেন।

গবর্মেণ্ট প্রথমাবধি টাটার প্রস্তাবে সন্দিহান! অন্ত যে কোনও সভ্যদেশে শিক্ষাবিস্তারার্থ এক ব্যক্তির ৩০ লক্ষ টাকা দান গভর্মেণ্ট কর্তৃক ধন্যবাদের সহিত সাগ্রহে গৃহীত হইত। কিন্তু এই সাত বৎসরে টাটার প্রস্তাবের কথা শেষ হইল না। অথচ বড় লাট লর্ড কর্জ্জন দীর্ঘসূত্রিতার বিরোধী। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি এ প্রস্তাবের অনুকূল নহেন। অনেকের বিশ্বাস, টাটা যদি অর্থ গভর্মেণ্টের হস্তে দিবার প্রস্তাব না করিয়া স্বয়ং বিজ্ঞানমন্দির সংস্থাপিত করিতেন, তবে কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। ভারতবাসীদিগের দ্বারা এইরূপ একটি শিক্ষামন্দির সংস্থাপিত ও পরিচালিত হইলে, সমবেত চেষ্টায় এরূপ অনুষ্ঠানের পরিচালন বিষয়ে ভারতবাসী-দিগের যে শিক্ষালাভ হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, পরিণতব্যবসায়বুদ্ধি টাটা এইরূপ শিক্ষাদানের বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। আমাদের অনুমান, টাটার আশা ছিল, তাঁহার অর্থে বিজ্ঞানগবেষণামন্দির সংস্থাপিত হইয়া, দেশীয় রাজন্যবর্গ-দত্ত সাহায্যে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন যখন ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিসৌধসংস্থাপনকল্পে সংগৃহীত অর্থের অংশ-মাত্রও এই অনুষ্ঠানে দান করিতে অস্বীকার করিলেন, তখনই টাটার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল।

প্রথমাবধিই এই প্রস্তাবে লর্ড কর্জ্জনের সহানুভূতি নাই। ভারতে বড়লাট রূপে প্রথম পদার্পণকালে তিনি টাটার ভাণ্ডারের কার্য্যকারকদিগের অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, এ দেশে দেশীয়গণ উচ্চ রাজপদ পাইবার আশা করিতে পারে না। সে অবস্থায় এরূপ শিক্ষাগারের উপযোগিতা কোথায়? প্রথমাবধি টাটার ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে যুরোপীয়দিগকে শিক্ষকপদে বৃত করা হইবে; পরে যত সত্বর সম্ভব, দেশীয়দিগকে কর্ম্মনিপুণ করিয়া তাঁহাদিগকেই অধ্যাপক করা হইবে। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে ভারতবর্ষীয়গণ অল্পদিনেই নিপুণ হইয়া সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানশিক্ষাদানের উপযুক্ত হইয়া উঠেন। লর্ড কর্জ্জন গত বজেট-বিচারকালে ও তাহার পরেও স্পষ্টই বলিয়াছেন, এ দেশে দেশীয়গণ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ পাইবে না। তবে যাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া প্রতিযোগী পরীক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের ফিরাইবার উপায় নাই। তিনি যে টাটার প্রস্তাবে অমত করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। যে সকল সর্ত্তে টাটা বিপুল অর্থদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গভর্মেণ্ট সে সকল সর্ত্তে অসম্মত হইয়া বলিলেন, টাটা অর্থ গভর্মেণ্টকে দিন, গভর্মেণ্ট যথেচ্ছ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

এই ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে টাটা তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া ন্যাস করিবার জন্য গভর্মেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। এ প্রস্তাবও নূতন নহে। ইহার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুই জন ধনী পার্শীর জন্য গভর্মেণ্ট এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অথচ এবার গভর্মেণ্ট এই প্রস্তাব লইয়াই বলিলেন যে, টাটা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া শিক্ষাবিস্তারকল্পে টাকা দিতেছেন; সুতরাং অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না পাইলে গভর্মেণ্ট টাকা লইবেন না। সদুদ্দেশ্যের সততায় এই সন্দেহে টাটা মর্ম্মাহত হয়েন, এবং ভারত গভর্মেণ্টের এই প্রস্তাবের প্রত্যাহার করাইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইয়া ভারতসচিবের শরণাপন্ন হয়েন।

এইরূপ একটি ব্যাপারে প্রস্তাবিত শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য স্থির করা প্রধান কার্য্য। তাহাতে মতভেদ উপস্থিত হইল। টাটার ইচ্ছা যে, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোত্তীর্ণ প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু কয়েক জন ছাত্র এই শিক্ষাগারে নিয়মিত শিক্ষা পাইবে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে আনীত বিশেষজ্ঞ সার্ উইলিয়ম র‍্যামজে শিক্ষা-গারের গতি ও প্রকৃতির যেরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাতে সাধারণ শিক্ষাবিদ্যালয় হইতে এই গবেষণামন্দিরের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাহাতে গবেষণামন্দিরের বিশেষত্বই থাকে না। এই মতভেদ বড় সাধারণ নহে। টাটার প্রস্তাবমত কার্য্য হইলে ভারতবাসীরা শিক্ষার ফলে আপনাদের শিল্পশিক্ষার উপায় উদ্ভাবিত করিয়া তাহার সার্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতাসাধনে সমর্থ হইত। সার্ উইলিয়ম র‍্যামজে তাঁহার মন্তব্যের শেষভাগে স্পষ্টই বলিলেন যে, গভর্মেণ্টের প্রস্তাবে অসম্মত হইলে মিষ্টার টাটা তখনও আপনার দান প্রত্যাহার করিতে পারেন।

অধ্যাপক র‍্যামজের প্রস্তাবিত শিল্পাগারে গভর্মেণ্ট বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাতে সাধারণ শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে মাত্র—টাটার প্রথমপ্রস্তাবিত উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপায় হইবে না।

মহীশূরের মহারাজা বয়সে নবীন হইলেও, টাটার প্রস্তাবের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাঙ্গালোরে শিক্ষামন্দির সংস্থাপিত হইলে, মহীশূর গভর্মেণ্ট গৃহাদিনির্ম্মাণকল্পে প্রথমতঃ এককালীন দান করিবেন, পরেও বর্ষে বর্ষে অর্থসাহায্য করিবেন। অন্যান্য বিষয়েও সুবিধা বলিয়া বাঙ্গালোরেই শিক্ষামন্দির সংস্থাপিত হইবে, স্থির হয়। এখন দাতার মৃত্যুতে প্রস্তাব ত্যক্ত না হইলেই মঙ্গল। ভারতগভর্মেণ্ট টাটার মত এক জন দেশহিতৈষীর বিপুল দানের ও জনহিতকর প্রস্তাবের সততায় সন্দেহ করিয়া তাঁহার জীবনের অন্তিমকাল হতাশাদাবানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ টাটা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এখনও দীর্ঘকালের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টই বিশেষ উপযোগী। সচরাচর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সহিত তাঁহার মতান্তরও হইত না। কিন্তু যখনই তিনি গভর্মেণ্টের কোনও কার্য্য দেশের ধনোন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তখনই তাঁহার ক্রোধ তীব্র প্রতিবাদের তপ্ত অগ্ন্যুদগমের মত বাহির হইত। যখন টাকশালে সাধারণের জন্য মুদ্রাগঠন বন্ধ করিয়া গভর্মেণ্ট নূতন অর্থনীতির অবতারণা করেন, তখন একবার টাটার প্রচণ্ড ক্রোধ বহ্নিশিখার মত প্রকাশ পাইয়াছিল। গভর্মেণ্ট যখন দেশীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করেন, তখন আর একবার কর্ম্মবীরের প্রতিবাদপ্রবাহ ভীমবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। টাটার মতে, এ সকল কার্য্য Adding insult to injury। কেহ কেহ বলেন, শেষোক্ত ব্যবস্থায় টাটাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আটগুণ অধিক শুল্ক দিতে হওয়াতেই এত প্রতিবাদ। কিন্তু স্বার্থহানিকেই প্রতিবাদের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, টাটাই প্রস্তাব করেন, এ দেশে যাঁহাদের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজারের অধিক, তাঁহাদিগের উপর শতকরা কুড়ি টাকা আয়কর নির্দ্ধারিত হউক।

আজ মৃত্যুর করস্পর্শে কর্ম্মবীরের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হইয়াছে। সব গেল,—রহিল কেবল স্মৃতি। আর রহিল ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানারূপ কীর্ত্তির পরিচয়। আশা করি, টাটার উপযুক্ত বংশধরগণ বিজ্ঞানগবেষণামন্দিরের কার্য্য শেষ করিয়া, তাঁহার কীর্ত্তিমন্দিরের স্বর্ণচূড়া সমাপ্ত করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রোমিও জুলিয়েট।

কবি-চিত্ত-নন্দনের মন্দাকিনীকূলে
কবে উঠেছিলে জাগি' প্রেমের কূজনে
হে দম্পতি, বসন্তের কুসুমে, মুকুলে;
উচ্ছলিত পিক-রবে; মলয়-বীজনে,
মধুপ-ঝঙ্কারে মুগ্ধ প্রকৃতি সেদিন
আপনা ভুলিয়াছিল? প্রেমের প্রভায়
নয়ন উজল তার; সরমবিহীন
অসংবৃত কেশরাশি, অঞ্চল লুটায়।

বিশ্ব ভুলি' আত্মদান; নিভৃত মিলনে
বাক্য হ'তে অর্থভরা প্রেমের চুম্বন;
বিকশিত হৃদি-পদ্ম প্রেমের কিরণে,
প্রেম লাগি' সর্ব্বত্যাগী; প্রণয়—জীবন!
জীবনের প্রেমরাশি সফল মরণে।
কবির মানস রাজ্যে সার্থক সাধন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মেঘাসীনা।

১

অঞ্জননীল মঞ্জুল মেঘ-শয়নে
বসি সুন্দরী চিরযৌবন-মধুরা,
হেমঘট ধরি' লীলাচঞ্চলনয়নে
বরষিছে বারি কল্যাণী দিক্‌বধূরা!
রণ রণ রণ কঙ্কণ ঘন বাজিছে,
ঝর ঝর ধারা ঝরিছে শিরষে উরসে;
দোদুল মৃদুল কুন্তলদল নাচিছে,
সরস অঙ্গ শিথিল স্নিগ্ধ পরশে!
স্বপ্নবিবশ হৃদয়ে গভীর তৃপ্তি,
করুণমুগ্ধ আননে মধুর দীপ্তি।

২

কোমল মালতী মালিকা কণ্ঠকলিত,
চরণপদ্মে মঞ্জীর উঠে গুঞ্জরি',
মৃণাল-বলয় ভুজযুগ লতাললিত,
শ্রুতিমূলে ফুটে অভিনব নীপমঞ্জরী!
ফুল্ল কমললোচনে মদির দৃষ্টি,
স্নেহ-ছলছল বিহ্বল দূরগামিনী—
দগ্ধ ভুবনে করিছে অমিয়-বৃষ্টি,
অধরে হাস্য, বিলাসচপলা দামিনী।
ঘিরেছে অঙ্গ মেঘমায়াময়ী সন্ধ্যা,
চারু করতলে রজত-রজনীগন্ধা!

৩

বিনোদ-অঙ্গ-সঙ্গ-সুরভি নীরদে
হাসে জলধনু সপ্ত উজল বরণে,
সিনান-পুণ্য নীর নিরত, বরদে,
আতপতপ্ত নিখিলের গ্লানিহরণে।
ছায়াপথ ধরি' মায়ারথ তব চলিছে
গুরুগর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া,
মেঘতরঙ্গে রঙ্গে দামিনী জ্বলিছে
বিপুল আলোকে বিশ্বকালিমা হরিয়া!
সকল ভুবন তব অলক্ষ্য ইঙ্গিতে
ধ্বনিয়া উঠিছে মেঘমঙ্গল-সঙ্গীতে!

৪

যেখানে যখন উদিছ দ্যুলোকে ভূলোকে,
দিশি সুরম্য নব অঞ্জনবর্ণে;
কাঁপে অরণ্য সলিল-পরশ-পুলকে,
নীর-নিক্কণ ক্লান্ত কুসুমপর্ণে!
ঘন-বন-তলে চমকে চপলা হরিণী,
গরজে পবন বিতত বল্লীবিতানে,
হরষমত্তা সরসে সনাথ করিণী,
উতলা উৎস উচ্ছ্বসি' উঠে কি তানে!
ঘনবর্ষণে পঙ্কিল বন সরণী,—
কমলাঙ্কিকা সাজিছে বিপুলা ধরণী।

৫

বরষা-সরসা প্রকৃতি গাহিছে হরষে,
ধারা-সঙ্গীত সুমধুর মেঘমল্লারে;
শিহরে লহরী আতটপূর্ণ সরসে,
হাসিছে সলিল কত কুবলয়-কহ্লারে!
নৃত্যনিপুণ ময়ূর নাচিছে কুঞ্জে—
ঝক ঝক চারু চন্দ্রক শত কলাপে,
দিশি দিশি মিশি' রাজিছে তিমিরপুঞ্জে,
বিরত কোকিল অমৃতগীতি-আলাপে।
নিবিড় বিপিনে সুরভিবিভোরা কেতকী,
ঊর্দ্ধগগনে গাহিছে চাতক-চাতকী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

অবরোধ-প্রথা।

ভারতের স্ত্রীজাতি অবরোধপ্রথার জন্য ইংরেজ রমণীগণের পক্ষে এক অজ্ঞেয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের নারীজাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতির বিষয়ে অনেক ইংরেজরমণী অনেক কথাই লিখিয়াছেন। অনেকে ভারতনারীকে অবরুদ্ধ বিহঙ্গীর সহিত তুলিত করিয়া ক্ষোভপ্রকাশ করিয়াছেন; অনেকে তাহাদের লিখনপঠনের অভাব দেখিয়া বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অধুনা কোনও কোনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না ইংরেজরমণী অবরোধপ্রথার ও অবরুদ্ধা নারীগণের একটু আধটু প্রশংসাও করিয়াছেন। কুমারী এনা ষ্টীল, কুমারী ষ্টীভেন্স, শ্রীমতী কর্ব্বেট প্রভৃতি অনেকেই ভারতীয়ার প্রশংসা করিয়াছেন, এবং অবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইউরোপীয়া অপেক্ষা ভারতনারীর শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সম্প্রতি কাউন্টেস্ জার্সি "পেল্‌মেল ম্যাগাজিনে" ভারতরমণীর মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার সারাংশ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

ভারতে অবরোধপ্রথা হিন্দুগণ মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অতি নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত অন্য সকল মুসলমানের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের কেবল উচ্চশ্রেণীর ও উচ্চ জাতির ভিতরেই অবরোধপ্রথা প্রচলিত আছে। পার্শী রমণীগণ এখন স্বচ্ছন্দে ইংরেজদের সহিত প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কহে। মুসলমান বা হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল নারী পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন, তাঁহারা ইংরেজরমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখবোধ করেন। আমি হায়দরাবাদের মৃত স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুরের বাটীতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সালার জঙ্গের আবাসভবন রাজপ্রাসাদ-বিশেষ; যেমন কক্ষ সকলের সাজসজ্জা, তেমনই প্রাসাদের নির্ম্মাণকৌশল সুন্দর। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা নিমন্ত্রণরক্ষার্থ উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সে সময়ে কেহই আসেন নাই। অগত্যা একটি কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে গৃহকর্ত্রী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর দুইটি রমণী ছিলেন। আর সালার জঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুনীর-উল্‌-মুল্ক ছিলেন। গৃহকর্ত্রীর পরিচ্ছদ অপূর্ব্ব।—দেহে একটি লাল মখমলের জ্যাকেট, তাহাতে উত্তম সল্মাচুমকীর কাজ করা; তাহার উপর একখানি আস্‌মানি রঙ্গের ওড়্‌না; আর পরিধানে লাল রঙ্গের পায়জামা,—হাঁটু পর্য্যন্ত খুব আঁটা ও কসা, উপরে বেশ ঢিলা; ইহাকে চুড়িদার পায়জামা বলে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদও প্রথমার ন্যায়, কেবল বর্ণের পার্থক্য। এক জনের বেশ লোহিতবর্ণ, অন্যের পীতবর্ণ। এক জন রক্তাম্বরা, অন্যা পীতাম্বরা। আর তৃতীয়া বিধবা, তাই শ্বেতবসনা। অলঙ্কারের কথা কি বলিব, সে ত কত রকমের। মুক্তা, মণি, হীরা, পান্না, নীলা, চুণি স্বর্ণালঙ্কারের সহিত খচিত ও বিজড়িত। চরণ-আভরণটি বড়ই মজার।—স্বর্ণনির্ম্মিত বটে, কিন্তু এত ভারী যে, উহা পায়ে দিয়া সহজে দীর্ঘকাল পদচারণা করিবার উপায় নাই। ইহার উপর আর একটা গহনা আছে, প্রতিপাদক্ষেপে তাহা হইতে মধুর শিঞ্জিতধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। এই দুইটিকে পঞ্জরী ও পায়জর বলে।

একটা লম্বা জলচৌকীর মত পাঁচ ছয় ইঞ্চি উচ্চ টেবিলের উপর আহার্য্যসামগ্রী সজ্জিত ছিল। চেয়ারে বসিয়া খাইবার উপায় নাই। গৃহকুট্টিমে গালিচার উপর 'আসন' করিয়া বসিতে হয়। আমার ত তেমন অভ্যাস নাই, সুতরাং সে চেষ্টায় আমাকে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করিতে হইয়াছিল। আমার গতিক দেখিয়া গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় খুব একচোট হাসিয়া লইলেন! ইঁহারা বড় সরল, সদা হাস্যমুখ, সদা আমোদপ্রিয়—সামান্য কথায় হাসিয়া ঢলিয়া পড়েন। দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা বড় সুখী—সদানন্দময়ী, সরলা, নিত্যতুষ্টা; অবরোধের দুঃখবোধ ইঁহাদের অণুমাত্র নাই। হয় ত বলিতে পার, ইঁহারা অন্তঃসারশূন্যা; কিন্তু ইঁহারা সুখী নিশ্চিত। মেহেদ আলি সাহেবের পত্নীকে আমি দেখিয়াছিলাম। তিনি শিক্ষিতা রমণী। কিন্তু তিনি আনন্দময়ী নহেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় একটা অবসাদের—একটা নৈরাশ্যের ভাব বিদ্যমান। তিনি উদাস ও নিরাশভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কি নারী? আমি পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী।' আমারও মনে হয়, মেহেদী আলির শিক্ষিতা নারী অপেক্ষা, হাস্যময়ী, আনন্দময়ী নবাবগৃহিণী ও তাঁহার দুই সঙ্গিনী আমাকে অধিকতর আনন্দদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, দক্ষিণে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে। মুসলমানদের ছোট ছোট মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেছে। তাহারা একটু ইংরেজী শেখে, একটু অঙ্ক কষে, একটু ভূগোল ও ইতিহাস পড়ে। অনেকের বিশ্বাস, এই অল্প শিক্ষার প্রভাবে মুসলমান-গৃহে ভাল গৃহিণী হইতেছে। অবরোধে অবরুদ্ধা হইলেও ভারতরমণী অধিকারবর্জ্জিতা নহেন। তাঁহাদের অনেক অধিকার আছে, গৃহস্থালীর ব্যাপারে অনন্ত প্রতাপ। ত্রিবাঙ্কুরের রাজ্যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে হইলে 'রাজমাতা'র অধিকারসূত্রে আরোহণ করিতে হয়। রাজমাতা না থাকিলে রাজমাতা গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে একবার রাজমাতার অভাবে রাজাকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া 'রাজমাতা' গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুরে পত্নীত্যাগের ব্যবস্থা বড় কৌতুকাবহ। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে একটি আচ্ছাদনবস্ত্র দিয়া থাকেন, সেইটি ফেরৎ দিলে, বা চাহিয়া লইলে, বিবাহ-সম্বন্ধ কাটিয়া যায়।

মান্দ্রাজে 'হোবার্ট স্কুল' আছে। এইখানে মুসলমান বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিখান হয়। প্রথমে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ অনেকেই করিয়াছিল। কর্ত্তারা ভাবিয়াছিলেন যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কেবল প্রণয়লিপি লিখিবে, আর প্রাচীরের অপর দিকে ফেলিয়া দিবে। এখন এ ভাবের বিরোধ নাই। এই শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথার একটু সঙ্কোচ হইয়াছে। আমার কোনও বন্ধু মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি এক অপরূপ দরখাস্ত পাইয়াছিলেন। এক মুসলমান নবাব তাঁহাকে আবেদন করেন, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! এ অধীনকে রক্ষা করুন। আমার তিন পত্নী, যে দুইটিকে হউক, আপনি বাছিয়া লইয়া আন্দামান দ্বীপে চালান করিয়া দিন। একাধিক পত্নীর ন্যায় পাপ কি আর আছে!"

হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা কতকটা ভদ্রতার নিদর্শন। নিন্দাভয়ে,—অন্যে কি বলিবে, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা অবরোধপ্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন। আমার কোনও বন্ধু তাঁহার মান্দ্রাজী মুন্সীর বাড়ীর মেয়েদের দেখিতে চাহেন। মুন্সী নিজের বাড়ীতে দেখাইতে পারেন নাই,—প্রতিবেশীদিগের নিন্দাভয়ে। তবে এক নির্জ্জন পথে উভয় পক্ষের দেখাসাক্ষাৎ সংঘটিত করিয়াছিলেন।

ইহাতেই বুঝা যায় যে, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রকৃত অবরোধ ছিল না, এখনও নাই। মুসলমান দেশের রাজা ছিল, প্রজার পক্ষে রাজার অনেক ব্যবহার আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে। মুসলমানের অবরোধ-প্রথা হিন্দুর ভদ্রতার নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দুরমণীদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অধিক। তাঁহারা যেন একটু শান্ত ও সংযত। তাঁহারা বেশ সরলভাবে বিদেশিনীর বস্ত্রাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হাসি বড় মধুর। আমার মনে হয়, ভারতরমণী যেমন হাসিতে পারেন, তেমন হাসি আর কোনও দেশের মেয়েরা হাসিতে পারে না।

ভেরেশ্‌শাগীন।

রুস দেশের সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর,—সভ্যজগতের সর্ব্বজনমান্য চিত্রকর, ভেরেশ্‌শাগীন পিট্রোপাভ্‌লস্ক জাহাজ-ডুবিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জগন্মান্য চিত্রকরের অমন ভীষণ মৃত্যু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় বটে।

ভেরেশ্‌শাগীনের এত প্রখ্যাতি, এত মর্য্যাদা কেন হইয়াছিল? তিনি যুদ্ধের ছবি সুন্দর আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার রুস-তুরস্ক যুদ্ধের খানকয়েক ছবি এখনও আদর্শস্বরূপ হইয়া আছে। যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনাটি তিনি নির্দ্দোষ করিয়া আলেখ্যে অঙ্কিত করিতে পারিতেন। বলিতে পার, ফটোগ্রাফেও ত ঐ কাজ হইতে পারে, তবে ভেরেশ্‌শাগীনের এত মান কেন? উত্তরে অনেক কথা বলিবার আছে। ভেরেশ্‌শাগীন ঠিক যেমনটি দেখিতেন, ঠিক তেমনটি আঁকিতেন না। তিনি দেখিতেন অনেক, নিবিষ্টচিত্তে রণক্ষেত্রের নানাবিধ অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, শেষে সর্ব্ববিধ দর্শনের সমবায়ে এমন একটি চিত্রের রচনা করিতেন, যাহা যুদ্ধের সমস্ত ঘটনার,—সুখ দুঃখের, আনন্দ অবসাদের, জয় পরাজয়ের, উৎসাহ উৎপীড়নের, বীরত্বের পশুত্বের একাধারে নিদর্শনস্বরূপ। সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বজাতির মধ্যে যখন মানুষ মানুষকে মারিতে উদ্যত হয়, তখন যেমন ভাবের ঘটনা সকল অবশ্যম্ভাবী, ভেরেশ্‌শগীনের চিত্র সকলে তাহাই পরিদর্শিত হইয়াছে। উহাকে চিত্র-কাব্য বলিতে হইবে। যিনি রণবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ সকল অবস্থায় অভিজ্ঞ, তিনি ভেরেশ্‌শাগীনের চিত্র দেখিয়া উহাতে ভাব্য ও ভাবিত ঘটনানিচয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইবেন। ইহাই ভেরেশ্‌শাগীনের প্রাধান্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। দান্তের নরকবর্ণনা যেমন আদর্শ, মিল্টনের পতিত এঞ্জেলগণের ভাবোন্মেষ যেমন আদর্শ, সেক্সপীয়রের লেডী ম্যাক্‌বেথের অনুতাপ যেমন আদর্শ, কালিদাসের শকুন্তলার ব্রীড়া ও সংকোচ যেমন আদর্শ, র‍্যাফেলের ম্যাডোনার মুখভাব যেমন আদর্শ, ভেরেশ্‌শাগীনের সমরচিত্রও তেমনই আদর্শ—জগতের আদর্শ। উহার ভীষণতা, নির্ম্মমতা, বিকটতা,—আবার কারুণ্য, মাধুর্য্য, মালিন্য,—বীর্য্য, শৌর্য্য, স্থৈর্য্য তেমনই সকল রণক্ষেত্রের—অতীত, আগত, অনাগত,—সকল আহবের আদর্শ; কেন না, অবশ্যম্ভাবী।

চিত্রকর মানবচরিত্র ও মানববুদ্ধির পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন। মানুষ সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বাবস্থাতেই মানুষ। কেবল পার্থক্য বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় দেশ-কাল-পাত্র-প্রভাবে, মনুষ্যত্বের আপেক্ষিক বিকাশে ও সঙ্কোচে। যে কবি বা চিত্রকর মনুষ্যত্বের আধেয়-তত্ত্ব অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মূলতত্ত্ব বুঝিতে ও ধরিতে পারিয়াছেন,—ভাবসাগরের তলে ডুবিয়া প্রবালমুক্তাদি আহরণ করিতে পারিয়াছেন, এবং অতলচারী নক্রাদিরও দর্শন পাইয়াছেন,—তিনিই জগতের কবি, মনুষ্যজাতির কবি, সনাতন কবি, বা চিত্রকর। ভেরেশ্‌শাগীন আহবালেখ্যচিত্রণে মহাপ্রতিভাশালী

ছিলেন,—তিনি এ বিষয়ে অদ্বিতীয় ও অতুল্য। তাঁহাকে রণবিষয়ে জগতের চিত্রকর বলিলেও বলা চলে। তাই তাঁহার মৃত্যুতে জগদ্ব্যাপী শোকের মর্ম্মন্তুদধ্বনি শুনা যাইতেছে।

ডাক্তার মোরস্ জোকাই।

হঙ্গেরী অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অধীন ও সামন্ত রাজ্য। ডাক্তার জোকাই এই হঙ্গেরী দেশের প্রধান ঔপন্যাসিক। কেবল ঔপন্যাসিকই বা বলি কেন,—কবি, নাট্যকার ও সন্দর্ভলেখক। কেবলই কি লেখক,—রাজনীতিবিশারদ, তেজস্বী, দেশহিতৈষী, কৃতকর্ম্মা বীর। এমন বুঝি আর ইউরোপের কোনও দেশেই নাই। জোকাই ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই জীবনে দুই শত গদ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার রচিত পদ্য ও কাব্য সকলের সংগ্রহপুস্তকের সংখ্যা সাড়ে তিন শত। এত লেখা আধুনিক কোনও লেখক লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এত লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাব, ঘটনা, বর্ণনা, আখ্যানভঙ্গী, বা চরিত্রবিশেষের পুনরুল্লেখ বা পুনরুক্তি নাই। সবই নূতন, সবই অপূর্ব্ব। ষোড়শ শতাব্দীর হিস্পানী লেখক লোপ-ডা-লা-ভেগা যেমন ভাবের লেখক ছিলেন, ডাক্তার জোকাইও কতকটা সেইভাবের লেখক ও ভাবুক। জোকাই নয় বৎসর বয়স হইতে লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই বয়সে দুইটি পদ্য লিখিয়া কাগজে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি সতর বৎসর বয়সে একখানি বিয়োগান্ত নাটক লেখেন।

ডাক্তার জোকাই জীবনে বিবিধ অবস্থাবিপর্য্যয় ভোগ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধে কখনও বা জয়ী হইয়া সুখভোগ করিয়াছেন, কখনও বা পরাজিত হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। একবার তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল ; তাঁহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে গভর্মেণ্ট পারিতোষিক দিবেন, বলিয়াছিলেন। তিনি প্রাণের দায়ে জলাভূমিতে লুকাইয়া ছিলেন। একবার তাঁহাকে দেশত্যাগীও হইতে হইয়াছিল। জোকাই সংসারের অপূর্ব্ব অসাধারণ দুঃখ কষ্টও ভোগ করিয়াছেন,—দুষ্প্রাপ্য ও আরাধ্য সুখভোগও করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর নানা দেশের, নানা অবস্থার, নানা জাতির লোক দেখিয়াছেন। যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ভুলেন নাই। গল্পাকারে সে সকল ঘটনা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাই জোকাইর লেখার ভাব ও ভাষা নিতুই নূতন। জোকাই হঙ্গেরীর জাতীয় লেখক। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙ্গালীর ভাবের সহিত ইংরেজী ঢং মিলাইয়াছিলেন, জোকাই তাঁহার ভাব ও ভাষায় সেরূপ খাদ মিলান নাই। তাঁহার ভাষা আবেগময়ী, উচ্ছ্বাসময়ী, অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যে রঙ্গভঙ্গময়ী। সে ভাষায় আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়, সে ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

জোকাই বহুভাষাবিদ্ ;—জর্ম্মণ, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী, রুস্ প্রভৃতি নানা ভাষা জানিতেন, নানা ভাষার সাহিত্যের পরিচয় রাখিতেন। জোকাই সুরসিক ও ব্যঙ্গরসনিপুণ। একবার ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি জেলে ব্যর্থ বাস করেন নাই ; কারণ, জেলের বর্ণনায় ও ঘটনায় তাঁহার একখানি পুস্তক পূর্ণ এবং, সে পুস্তক বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত। জোকাইর এই কয়খানি পুস্তক সর্ব্বজনসমাদৃত,—The Lion of Janina, Midst the wild Carpathians, Pretty Michel, Black Diamonds, The Green Book, ইত্যাদি। বিসমার্ক, কস্থ, ভেরেশ্‌শাগীন, মুসো ডুমা, লীজৎ, ইবসেন প্রভৃতি জোকাইর সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া সম্মানিত বোধ করিতেন।

ডাক্তার জোকাই তাঁহার স্বদেশে যেমন সম্মানিত, ইউরোপেও তেমনই সমাদৃত। বিদ্বজ্জনসমাজ তাঁহার রচনার গুণে মুগ্ধ।

স্পেন্সারের আত্মজীবনচরিত।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার নিজের জীবনবৃত্তান্ত নিজেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্পেন্সারের জীবনের সকল ঘটনার কথা লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপের সুধীমণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। যিনি বিবর্ত্তনবাদকে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি ইউরোপের প্রধান ও প্রকৃত দার্শনিক বলিয়া জগন্মান্য, যাঁহার "Synthetic Philosophy" নামক বিরাট গ্রন্থে মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তিনি নিজের জীবনের কথা নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—ইহা একটু বিস্ময়জনক, একটু কৌতুহলোদ্দীপক নহে কি? রহস্য এই,—স্পেন্সার তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ সকলে যে বিশ্লেষণপটুতার পরিচয় দিয়াছেন, নিজের জীবনের ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইয়াও সেই বিশ্লেষণপ্রবৃত্তির বিকাশ করিয়াছেন মাত্র।

স্পেন্সার পিতার এক পুত্র ছিলেন; তাঁহার অন্য ভাই ভগিনী ছিল না। স্পেন্সারের পিতা একটু উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি কাহারও আনুগত্য করিতে পারিতেন না; বরং অবসর পাইলেই লোকের কথার প্রতিবাদ করিতেন। স্পেন্সার নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি একেই ত পিতামাতার এক পুত্র; তাহার উপর উদ্ধতস্বভাব ও স্বাধীনপ্রকৃতি জনকের পুত্র; আমিও তাই শৈশব হইতেই বড়ই উদ্ধত, 'একগুঁয়ে', মর্য্যাদাবুদ্ধিহীন ছিলাম। ছেলেবেলায় অন্যের সহিত তর্ক করিতে, এবং তর্ক করিয়া অন্য কাহাকেও পরাজিত করিতে আমার বড়ই আমোদ বোধ হইত। আমি কাহারও কোনও কথায় বেমালুম 'সায়' দিয়া যাইতে পারিতাম না; একটা-না-একটা দোষ বাহির করিতাম। এই কারণে, আমার সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইত। এ সব স্বভাবের দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাহা সহজ, তাহা অপরিহার্য্য। আবার যদি সহজ দোষ বা গুণ অবস্থাবশে বিকাশের ও পুষ্টির অবসর পায়, তাহা হইলে উহা একেবারেই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।"

এই ভাবে স্পেন্সার নিজেই একটি একটি করিয়া খুঁত বাহির করিয়াছেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্পেন্সার ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে এপ্রেল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পরে আরও পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু আট দশ দিনের অধিক কেহই বাঁচে নাই। দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন কেবল স্পেন্সার। ছেলেবেলায় স্পেন্সারকে লেখাপড়া শিখান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। একে ত এক সন্তান, তাহার উপর দুষ্ট ও 'একগুঁয়ে', সর্ব্বোপরি অভিনিবেশের অত্যন্তাভাব। পাঠশালায় স্পেন্সার সকল বালক অপেক্ষা জোরে দৌড়াইতে পারিতেন; অন্য বালকদিগের উপর যথেষ্ট প্রাধান্যও করিতেন। শৈশবে স্পেন্সার তাঁহার জননীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার পিতা স্পেন্সারকে স্থানান্তরে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকিলে স্পেন্সারের যে কিছুই লেখাপড়া হইবে না, তাহা পিতা বুঝিয়াছিলেন। স্পেন্সারের এক খুড়া হিণ্টন নগরে পাদ্রী ছিলেন; স্থির হইল যে, তাঁহারই নিকট স্পেন্সার থাকিবেন। যাইবার সময় স্পেন্সার কোনও কথাই বলেন নাই। প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, খুড়া মহাশয়ের নিকট

বেড়াইতে যাইতেছি। বালক স্পেন্সার দশ দিন খুল্লতাতের নিকট আমোদেই ছিলেন। পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে আর মায়ের নিকট যাইতে দেওয়া হইবে না। তখন উদ্ধত বালক মাতৃবিচ্ছেদশোকে অধীর হইলেন, এবং কাহাকেও কোনও কথা না কহিয়া, পকেটে দুই শিলিং সম্বল লইয়া, পদব্রজে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথম দিন তিনি আটচল্লিশ মাইল পথ হাঁটিয়া গেলেন, পরদিন সাতচল্লিশ মাইল, এবং তৃতীয় দিনে কুড়ি মাইল পথ হাঁটিয়া বালক স্পেন্সার বাটী যাইয়া পঁহুছিলেন। আগাগোড়া পথটা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছেন, পথে বিশ্রাম করেন নাই! স্পেন্সার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে এই কাণ্ড করিয়াছিলেন। এই এক ঘটনাতেই স্পেন্সারের চরিত্রের একাগ্রতা, উদ্যমশীলতা ও দৃঢ়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পেন্সার যৌবনেও ভাল লেখাপড়া শেখেন নাই। তিনি ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণের কোনও সমাচারই রাখিতেন না; কখনও সুমিষ্ট, সংযত ও সাধু গদ্য ইংরেজী লিখিতে পারেন নাই। তিনি ইতিহাস-গ্রন্থও পড়িতে পারিতেন না। কেহ কিছু বলিলে, তিনি উত্তর করিতেন, "পড়িব কি, ইতিহাসে কেবল মিথ্যা কথা পোরা থাকে। বৃথা মিথ্যার আলোচনা করিয়া লাভ? যদি ইতিহাসে মনুষ্যসমাজবিশেষের ক্রমবিকাশের পর্য্যায়-ব্যাখ্যান থাকিত ত পড়া যাইত।" মোট কথা, যাহাকে সচরাচর পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে পারা যায়, স্পেন্সার তাহার কিছুই ছিলেন না। কবির মধ্যে শেলী, দার্শনিকের মধ্যে প্লেটো, সন্দর্ভকারের মধ্যে কার্লাইলের একটু আধটু তাঁহার ভাল লাগিত। স্পেন্সার জানিতেন অঙ্কশাস্ত্র; সিবিল এঞ্জিনিয়ারের সহযোগী হইয়া চারি পাঁচ বৎসর তিনি রেল-লাইনে কাজও করিয়াছিলেন—সংসারে আর বড় কাহারও ধার ধারিতেন না।

স্পেন্সার কখনও বিবাহ করেন নাই। বিবাহ না করিবার, বা না হইবার কারণ তিনি নিজেই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"আমার ভগিনী ছিল না; আমার বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আমাদের বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। আমাদের বাড়ীতে, তাই, পল্লীর কোনও যুবতী বা প্রৌঢ়া কখনও আসিতেন না। আমি স্ত্রীজাতির সঙ্গপ্রভাব কখনও অনুভব করিতে পাই নাই। অবস্থাও মন্দ ছিল; বিবাহের ভাবনার তেমন অবসরও ছিল না। পরে যখন অবস্থা স্বচ্ছল হইল, তখন আমার উৎকট শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল, তখন আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। পাত্রীরও জোগাড় হইয়াছিল। আমার 'Social Statics' পাঠ করিয়া আমাকে দেখিতে এক যুবতী আসেন। উভয়ে দেখাসাক্ষাৎ হইল, কিন্তু উভয়েই উভয়কে পছন্দ করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম, এমন অত্যন্ত বিদুষী নারী লইয়া আমি কি করিব! ছোট্ট একটু মাথায় এতটুকু মস্তিষ্ক, তাহা অনবরত পরিচালিত হইতেছে। এ যুবতী আমারই মত উদ্ধত, স্বাধীনপ্রকৃতি হইবে। কি জানি, কি করিতে কি হইবে,—এই আশঙ্কায় আমাকে পিছাইয়া আসিতে হইল। যুবতীও আমাকে পছন্দ করেন নাই।" স্পেন্সারের বিবাহোদ্যোগের এই প্রথম ও এই শেষ। এই যুবতী আর কেহই নহেন, মিস্ এভান্স্—জর্জ্জ এলিয়ট্। পরে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়; এ ঘনিষ্ঠতাটুকু বার্দ্ধক্যেই ঘটিয়াছিল।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রথম যৌবনে নাস্তিক ছিলেন, এবং নাস্তিক্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দার্শনিক কথার আলোচনা আরম্ভ করেন। কার্লাইল ও মিল তাঁহার বিশেষ বন্ধু হইয়াছিলেন। স্পেন্সার

কখনও কোনও উপাধি গ্রহণ করেন নাই, কখনও রাজদর্শনে যান নাই, কখনও ধনীর সেবা করেন নাই, কখনও কোনও সভার সভাপতি হন নাই, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নাই, কখনও নিজের গ্রন্থ কাহাকেও সমালোচনার জন্ম দেন নাই, কখনও সমাজ বা মণ্ডলীবিশেষের নিকট হইতে কোনও সম্মান বা মর্য্যাদার পদ গ্রহণ করেন নাই, কখনও উপযাচক হইয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতে যান নাই, কখনও কোনও বন্ধুর নিকট হইতে অর্থসাহায্য বা দান গ্রহণ করেন নাই! সামাজিকতা ও লৌকিকতা তাঁহার এতটুকুও ছিল না। হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত; তিনি কঠোর ও কর্কশ স্বভাবের লোক। কিন্তু মিত্র স্বজনের নিকট তিনি স্নেহময়—ভাবময় ছিলেন। তিনি শিশুদের লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র আমোদ ছিল।

বার্দ্ধক্যে স্পেন্সার ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। সংসারের অনন্ত কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে তিনি একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইলেন। সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহা যেন কাহার জন্ম, কিসের জন্ম, আর একটা কি হইবার জন্ম, ঘটিয়া থাকে। আর মানুষ যতই মুগ্ধ থাকুক না কেন, তাহার মনে মনে একটা আত্মানুভূতি সদাই জাগরূক থাকে। সে অনুভূতি জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে একটা অনন্তের ব্যাপ্তি বুঝাইয়া দেয়। কেন এমন হয়? এই জিজ্ঞাসা হইতেই স্পেন্সার ঈশ্বরানুভূতি করিলেন, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের উপযোগিতাও বুঝিলেন। কাণ্টের পরে স্পেন্সারের স্থায় দার্শনিক ইদানীং আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

উন্মত্ততার কারণ।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি উন্মত্তের সংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইতেছে। অনেকে ইহার কারণানুসন্ধানে ব্যস্ত। কয়েকখানি মাসিকপত্রে ইহার আলোচনাও চলিতেছে। উন্মত্ততা কোনও প্রকারের দৈহিক রোগ নহে; উহা মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ঘটিয়া থাকে। এ রোগ যে কেন হয়, এবং কোন পদ্ধতি অনুসারে হয়, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে,—

১। যাহারা অত্যধিক মদ্যপ ও যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য হইয়াছে;

২। যাহারা অত্যন্ত লম্পট, এবং লাম্পট্য-চিন্তায় দিনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করে, আর এই কারণে যাহাদের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে;

৩। যাহারা হঠাৎ কোনও একটা গর্হিত কাজ করিয়াছে, এবং তাহার চিন্তায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিয়াছে;

৪। যাহারা অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মগ্ন থাকে, এবং জীবনে নানা কারণে যাহাদের কোনও আকাঙ্ক্ষাই মিটে নাই;—

তাহারাই প্রায় পাগল হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উন্মাদের প্রধান উপাদান অতিস্বার্থপরতা, অতি-সংকীর্ণতা। যে অহরহ কেবল নিজের চিন্তা করে, কেবল নিজের সুখ দুঃখের আলোচনা করে, নিজের দোষ বা ত্রুটি দেখিতে পায় না, যাহার সংসারের কোনও কিছুতেই আস্থা বা বিশ্বাস নাই, প্রায়ই সেই উন্মত্ত হয়। নিতান্ত সংকীর্ণ আত্মসুখলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারিলে, নানা দেশে ভ্রমণ করিতে পারিলে, নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে, উন্মাদের ভাব দূর হয়। মাদকতা ও লাম্পট্যজনিত উন্মাদরোগ কিছুতেই আরোগ্য হয় না। মনে মনে অহরহ কুৎসিত চিন্তাতেই উন্মত্তা

ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইংরেজ-সমাজের অভাবের মাত্রা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে; সহসা কেহ আর বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে চাহে না। ইহার উপর ধর্ম্মবিশ্বাস, আত্মসংযম একেবারেই নাই। ফলে, লাম্পট্যের বৃদ্ধি, অশান্তি ও উদ্বেগের উৎপত্তি; আর পরিণামে উন্মত্ততা। এক জন লেখক বলেন যে, আবার যদি ইংরেজ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হন, বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে চেষ্টা পান,—তাহা হইলে বিলাতে নরনারীর মধ্যে উন্মাদের সংখ্যা কমিয়া যায়। সংযম ও সাধনাশূন্য কৌমার্য্য উন্মত্ততার প্রত্যক্ষ হেতু।

যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব কেন?

বিলাতেও যেমন যক্ষ্মারোগের আতিশয্য, ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার ততোধিক প্রাদুর্ভাব। এই উভয় দেশেই এ রোগ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে হঠাৎ কেন বাড়িল? ল্যান্সেট উত্তর দিতেছেন,—

১। বিলাতী বিলাসের বৃদ্ধি। উষ্ণপ্রধান দেশে অত্যধিক ও অনবরত গাত্রাবরণ ব্যবহার করা দোষের;

২। কায়িক পরিশ্রমের অভাব; পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব; পরিপাকশক্তির অভাব;

৩। মেহাদি রোগের প্রাদুর্ভাব, এবং ঐ সকলের বিষম বিষের নানা দেহে বিস্তার;

৪। লাম্পট্য—অতিমাত্র শুক্রক্ষয়;

এই কয়টি কারণেই যক্ষ্মা বা টিউবারকিউলোসিস্ রোগ হইয়া থাকে। ইহা একবার হইলে পুরুষানুক্রমে বিসর্পিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিগণ যতদিন নগ্নদেহে শীতাতপ সহ্য করিয়া বিচরণ করিত, এবং কোঠাবাড়ীতে না থাকিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে কুটীরে বাস করিত, তত দিন তাহাদের ফুস্‌ফুস্ বা ক্লোমের কোনও রোগই হইত না। ভারতের হিন্দুগণ যতদিন নগ্নদেহে থাকিতেন, নিত্য নদীস্নান করিতেন, দেহে পর্য্যাপ্ত তৈলমর্দ্দন করিতেন, খড়ের ঘরে বাস করিতেন, এবং গ্রামে থাকিতেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যেও এ রোগের আতিশয্য ছিল না। পাকা আঁটা ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বালিয়া রাখিয়া নিদ্রা যাইলে যক্ষ্মাকাশ হয়। অম্লজনিত যক্ষ্মাও হইয়া থাকে আহার্য্য-সামগ্রী যথারীতি পরিপাক না হইলে, পাকস্থলীতে একটা বিষের উদ্ভব হয়; সেই বিষ মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ দূষিত করিয়া দেয়। আর যক্ষ্মার প্রধান কারণ, বীর্য্যগত দৌর্ব্বল্য—ক্ষয় ও অপচয়জনিত দৌর্ব্বল্য। এই এক কারণ যে কত উৎকট রোগের মূল, তাহা বলা যায় না।

তাই বিলাতের বহুজ্ঞেরা বলেন যে, যদি আবার পুরাতন চালচলন আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমাদের রক্ষা সম্ভব। নহিলে কালে আমাদের বংশনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আমাদের দেহে এত তৈজস পদার্থ নাই যে, এই সভ্যতার ক্ষয় ও অপচয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। বিলাতে এই দুই রোগের নিদান লইয়া খুবই আলোচনা চলিতেছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেব যে পথে পুরীধামে গিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া লেখক তদানীন্তন উৎকলের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবিধ তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। বহুকাল পরে সারদা বাবুর ন্যায় কৃতী সাহিত্যিক বঙ্গভাষার সেবায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সাধারণতঃ প্রবন্ধটির ভাষা মনোজ্ঞ ও বিশুদ্ধ, তবে দুই এক স্থলে আমরা অর্থবোধ করিতে পারি নাই। যথা,—"রূপনারায়ণের জলকল্লোল ও জলবেগ মন্দিরের নিকটে অঙ্গীভূত হয়।" সে যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু "ঠানা জেলা" প্রবন্ধে বোম্বাই প্রদেশের ঠানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সোম "বলী দ্বীপ" প্রবন্ধে তত্রত্য ধর্ম্ম ও উপাসনার বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন।—"হিন্দুধর্ম্মই বলী দ্বীপের ধর্ম্ম ; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ধর্ম্মমত এখানে প্রচলিত। বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অল্প ; *** শৈবসম্প্রদায় ভিন্ন অপর সম্প্রদায় বলী দ্বীপে নাই ; এখানকার শৈবধর্ম্মাচরণ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; পুরোহিতগণের নিত্য নৈমিত্তিক পারিবারিক উপাসনা ও আপামর সাধারণের সম্মিলিত উপাসনা। পণ্ডিতদের গৃহে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপ দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, তাহারা বৈদিক পূজাপদ্ধতিরই অনুসরণ করে। সূর্য্যসেবন (সূর্য্যপূজা) ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত। *** তাহারা বলে, সূর্য্য মানে শিব। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, তাহারা প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস বিস্মৃত হইয়া এখন সাধারণ শিবপূজাই গ্রহণ করিয়াছে।" নগেন্দ্র বাবুর মতে বলী দ্বীপের শৈবধর্ম্মাচরণ দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জন ক্রফোর্ড "History of the Indian Archipelago" নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The followers of Siwa in Bali are, as in weastern India, divided into four great classes or casts, namely, a priesthood, a soldiery, a mercantile class and a servile class respectively called *Brahmana, Satriya, Wisiya and Sudra.*" জন ক্রফোর্ড কর্ম্মসূত্রে যাবা ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে ৯ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্স-অফ্-ওয়েল্স দ্বীপে উপনীত হন। তথায় তিন বৎসর বাস করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যাবায় যে অভিযান হয়, আরল্ অফ্ মিণ্টোর অনুগ্রহে তিনি সেই অভিযানের অন্যতর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে তিনি প্রায় ছয় বৎসর যবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। ক্রফোর্ডের যাবায় অবস্থিতিকালে বলী দ্বীপে রাজনৈতিক অভিযান প্রেরিত হয়। সেই সূত্রে তিনি স্বয়ং বলী দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তাঁহার অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফল পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ক্রফোর্ডের গ্রন্থ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় মুদ্রিত হয়। সে আজ ৮৪ বৎসরের কথা। দেখা যাইতেছে, কিঞ্চিদুন শতবর্ষ পূর্ব্বেও বলী দ্বীপের হিন্দু শৈবগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল। বলী দ্বীপ প্রবন্ধের লেখক

ক্রফোর্ডের গ্রন্থ দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধসঙ্কলনে কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁহার অবলম্বন, প্রবন্ধে তাহাও প্রকাশ নাই। ক্রফোর্ড-রচিত ইতিহাসের আলোচনা করিলে, লেখক শতবর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী বলী দ্বীপের অবস্থা অবগত হইতে পারেন। শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, লেখক যদি স্বীয় প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে, প্রবন্ধটির উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য "পর্ব্বতনির্ঝর" নামক কবিতায় নির্ঝরকে "দগ্ধ মরুভূমে যেন উর্ব্বর প্রান্তর, অনন্ত গগনে যেন স্নিগ্ধ সুধাকর, উজল অরোরা যেন সুদূর উত্তর ও বিজন বিপিনে যেন পান্থ তরুবরে"র সহিত তুলিত করিয়াই তৃপ্ত হয়েন নাই, অবশেষে কবিত্ব-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"নিরাশার বুকে তুমি স্ফুট পয়োধর।" নবীন কবি বোধ করি পয়োধর দেখিয়াই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, পয়োধরের ক্ষীরধারা অবধি পঁহুছিতে পারেন নাই। "সুস্মিত ধারায়", "তৃষান্ধ জীবনের" প্রভৃতি অধুনাতন কবিত্বের মামুলি বৈভবগুলি "নির্ঝরে"র প্রবাহমধ্যে বন্ধুর শৈলখণ্ডের ন্যায় মাথা তুলিয়া ব্যাসকূটকে উপহাস করিতেছে। হেঁয়ালি ও কবিতার ব্যবধান ক্রমে লুপ্ত হইতে চলিল। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "চীন দেশের বসন্তোৎসব" বিষয়গুণে সুখপাঠ্য। লেখক লিখিতে জানিলে আরও মনোরম হইত। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় "কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কথা"র অবতারণা করিয়াছেন। 'কথা'র অপেক্ষা কথার ভাষা গুরুতর। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষের "য়ুরোপপ্রবাসী বাঙ্গালী" নামক প্রবন্ধটি চলনসই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগের "বাবর-রচিত আত্মজীবনের আখ্যায়িকা"য়—উক্ত নামধেয় পুথির বিবরণ; বাবরের কোনও বিবরণ নাই। এই সংখ্যায় গডওয়ার্ডের অঙ্কিত "বিদায়-গ্রহণ" নামক একখানি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার সেই চিত্রের ভাষ্যস্বরূপ "বিদায়" নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বিজয় বাবু 'মানসীর' 'অকালবোধন' করিয়াছেন, তাহার ফলে চিত্রখানির প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ছন্দোময়ী প্রতিমায় দেবীর আবির্ভাব হয় নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋগ্বেদ হইতে "বরুণস্তোত্রে"র অনুবাদ করিয়াছেন। ছন্দে ও ভাষায় বৈদিকবাণীর গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য নাই। "আমার পাখী" একটি কবিতা। "হৃদয় পিঞ্জরে পাখী হিরণ্ময় প্রণয়-শিকলে বাঁধা আছিল," এবং "উদাসী পথিকে দেখি শান্ত বনতলে, আপনি সে ছিল ধরা", তাহার পর এক দিন অলক্ষ্যে নিষধ আসিয়া "শাণিত শায়কে তার বিঁধিল পরাণ!" সুতরাং "পড়ে আছে সে অবধি শূন্য সে পিঞ্জর"। আর কবি বলিতেছেন, "থেমে গেছে চির তরে প্রণয়ের গান"। বাদ্যযন্ত্রবিশেষের ন্যায় কোনও কোনও গান, বিশেষতঃ এই একঘেয়ে প্রণয়ের গান থামিলেই মিষ্ট লাগে। কিন্তু থামে কৈ? "অসভ্য জাতির পরলোক" এখনও চলিতেছে। লেখকের ভাষায় একেবারে অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "আমার জীবন" নামক একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনায় ভাষার দুর্দ্দশার সীমা নাই। সমালোচনার মর্ম্ম ত—'নিহিতং গুহায়াম্'। "সার্কাসওয়ালী" একটি চলনসই গল্প। গল্পটিতে লেখকের নাম নাই। নাম না থাকুক—চারুচন্দ্রালোকে বাউরী দম্পতির চিত্রটি উদ্ভাসিত দেখিয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "চাঁদ" নামক কবিতাটি যদিও কবিবরের কল্পনাবৈভবে বঞ্চিত—তথাপি উপভোগ্য।—

"সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায় ?
শিখিপুচ্ছে নাহি হেন রূপ !
সাধে কিহে স্বর্ণপদ্ম তোমারেই চায়,
শিশু-আঁখি-ভ্রমর লোলুপ ?"

অতি সুন্দর। দেবেন্দ্র বাবুর একটি চরণ—"সুনীল সাগরে তুমি সোনার কমল" পড়িয়া স্বর্গীয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "চন্দ্র" নামক কবিতার "নভ-নীল-হ্রদে তুমি সোনার কমল" মনে পড়িল; পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে পড়িয়াছিলাম।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "মাঙ্গল্য" নামক কবিতাটির বিষয় মহনীয়। কবি উপযুক্ত ভাষায় উচ্চ ভাবের আবাহন করিয়াছেন। "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে দেশের লুপ্ত ইতিহাস-উদ্ধারের আশায় শ্রীমতী সরলা দেবী কতকগুলি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীদাস সান্যালের "স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের শিল্পানুষ্ঠান" নামক প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের "নেহাল ওস্তাদ" নামক অতিপ্রাকৃত ক্ষুদ্র গল্পটি রমণীয়। আখ্যান-বস্তু বিচিত্র, কিন্তু গল্পের একটানা ভাষায় বৈচিত্র্য ও কলাকৌশলের অভাব। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "শিশুরহস্য" নামক কবিতাটির নামটি সার্থক হইয়াছে। রচনাটি 'শিশু-কবি'র রহস্য-লীলা বলিয়াই মনে হয়। কবি বলিতেছেন, "ভাল মন্দ নাহি বুঝে যা পায় তা খায়!" ইহাও যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে গদ্য কি? তাহার পর, "ধর্ম্মের ধারে না ধার কৃষ্ণ কিম্বা যীশু" শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ধর্ম্মসংস্থাপক কৃষ্ণ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশু ধর্ম্মের ধার ধারিতেন না,, এ কথা পদ্যে না লিখিয়া গদ্যে লিখিলে লেখকের জন্য মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু ইহা কবিতা, এবং কবিরা নিরঙ্কুশ। মল্লিনাথ বলিতেছেন, ইহার অর্থ—শিশু কৃষ্ণ কিংবা যীশু কাহারও ধর্ম্মের ধার ধারে না। কিন্তু যাহাদের মল্লিনাথ নাই, তাহাদের উপায়? এরূপ অসম্বদ্ধ অসংস্কৃত রচনা মুদ্রিত করিয়া ফল কি, বলিতে পারি না। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "উর্ব্বশী ও তুকারাম" নামক দৃশ্যকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাণহীন অমিত্রাক্ষরে যতির বৈচিত্র্য বা ধ্বনির গাম্ভীর্য্য নাই। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রহরাজ "উৎকল ভাষা ও সাহিত্য" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, উৎকল ভাষা ও সাহিত্য, কাহারও প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। এত ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে বোধ করি তাহা সম্ভবও নহে। আশা করি, প্রহরাজ মহাশয় ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে উৎকল ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় দিবেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গোহ" নামক গল্পটি সুন্দর। ক্ষুদ্র গল্পে এমন সুচারু ও সূক্ষ্ম কারুকৌশল সচরাচর দেখা যায় না। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গসাহিত্যের মাসিক বিবরণী"—সমালোচনার প্রহসন। মূল পালার পরই সং আসে বটে।

বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র "ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্য" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ওকাকুরা রচিত "Ideals of the East" নামক নবপ্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সার-সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী" ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসুর "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র" উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

৪ঠা ভাদ্র। সন্ধ্যার পর চুণীবাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটাইলাম। অভিনয়ের বিষয়, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের নূতন নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"। বসিয়া বসিয়া দুইটা অঙ্ক অভিনীত হইতে দেখিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যও তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। গিরিশবাবুর পৌরাণিক বা ঈশ্বর-ভক্তিমূলক নাটকগুলি মন্দ হইত না। নাটকত্ব তেমন থাক বা নাই থাক: সেগুলি তবু দেখিতে পারা যায়। আর দেখিয়া প্রাণের ভিতর উচ্ছ্বাসও অনুভূত হয়। * * * অদ্যকার অভিনীত নাটকের ভিতর কীচকের মুখে এমন কতকগুলো কথা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা প্রকাশ্য রঙ্গস্থলে কোন মতেই মার্জ্জনীয় নহে। আর কীচক তাহার ভগিনী বিরাটমহিষীর সমক্ষে যেরূপে তাহার কামতৃষ্ণা বর্ণিত করিল, তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। রঙ্গালয়ে অনেক ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়া থাকে; অন্ততঃ তাঁহাদের মুখ চাহিয়াও গিরিশবাবুর এই সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। * * * *

৫ই ভাদ্র। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর এক কবিতা লিখিয়া শ্রাবণ মাসের "নব্যভারতে" প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিতাটি তেমন ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ, মাইকেলের মৃত্যু উপলক্ষে যে কবির হস্ত হইতে সেই মহান্ স্বর্গীয় সঙ্গীত বহির্গত হইয়াছিল, বর্ত্তমান কবিতা তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। "দশমহাবিদ্যা" প্রকাশের পর হইতে হেমবাবুর প্রতিভার অন্তর্ধান না হউক, অধঃপতন যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরণ প্রতিভার সমান স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি অতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটে, স্বীকার করি। কিন্তু, কবির হৃদয়বাসিনী সেই দেবী যাহাকে কাঁদাইয়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান, তাঁহার কি ভীষণ দুর্দ্দশা! যাহার সৌন্দর্য্যকিরণে কবির জীবনব্যাধিরূপ দৈত্য ভীত হইয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলম্বন করে; একমাত্র যাঁহার চরণসেবাই কবির স্বর্গসুখ, সেই সৌন্দর্য্যরূপিণীর বিরহে তিনি যে কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তবে, এ জগতে মরিয়াও বাঁচিয়া থাকার কথা শুনিয়াছি। জীবন্মৃত কথা যদি কাহারও উপর প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সে যে এইরূপ প্রতিভাদেবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কবি, তাহা সুনিশ্চিত। যিনি স্বয়ং জীবিতস্বরূপিনী, তাঁহার বিরহে আবার জীবন কি? হায়! এ জগতের কবিকুলকে কত দুঃখই সহ্য করিতে হয়।

৬ই ভাদ্র। "সাহিত্যের" জন্য রুশীয় কবি কলটসফের একটা কবিতা অনুবাদ করিলাম। অনুবাদের অনুবাদ। সুতরাং ইহা পড়িয়া কলটসফের শক্তির পরিমাণ করা যায় না। তবে, প্রকৃত হৃদয়গত কবিত্বের চিরসহচর যে গাম্ভীর্য্য ও সুমধুর ধ্বনি, তাহা অনেকাংশে অনুভূত হয়। অনুবাদটি এথানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

(World-weariness.)

জীবন-ভার।

(১)

ঘন ঘোর মেঘ আইল ছাইয়া,
পাগলের মত বহিল বায় :
ঝটিকা-তাড়িত, শ্রান্তি-শাসিত
দুখ-গুহা-মাঝে পশিনু, হায়!

(২)

বিভীষিকা-ময় এ জরা-জীবন,
চিরদিন তরে ঘুচেছে আশ,
টুটে গেছে মোর প্রভাত-স্বপন,
ভাঙ্গিয়া পড়েছে প্রেমের বাস।

(৩)

দলে দলে শোক আসিছে ঘেরিয়া,
যুঝিবারে নাহি শকতি আর :
তবু বার বার ভাসিছে জগৎ,
চেয়ে আছি ল'য়ে বাসনা-ভার।

(৪)

গেছে সুখ-নিশি, স্বভাব চপল,
আর কিরে তা'র পাব না দেখা ?
উষা না আসিতে পোহা'ল যামিনী
অভাগারে রাখি ফেলিয়া একা।

(৫)

সাহসে আবার পাখা প্রসারিয়া
চল, চল সেই নির্ঝর-ধারে,
হয় ত আবার মিলিবে সেথায়
হৃত সুখ গিরি-গহন-পারে।

(৬)

অথবা নীরবে বসি' এই কূলে
তুষারের ঢেউ লাগিছে যথা,
সুখ-প্রেম-হারা, তবুও সাহসে
বীর সম বহ জীবন-ব্যথা।

কবিতাটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিষাদরূপ বিশেষত্ব বিলক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু, বিষাদ ও অন্ধকারই ইহার পরিণাম নহে। বিপদজালের সহিত যুঝিবার সাহস ও শক্তিও ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং ইহার নীতি প্রশংসনীয়। প্রতিভাশালী মহাজনের লক্ষণ, শক্তিশালিতা। অতএব ইহাই কি কবির শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচায়ক নহে ?

৭ই ভাদ্র। রুশীয় কবি লারমনটফের দুইটি গীতি অনুবাদ করিলাম। কলটসফের ন্যায় ইঁহারও জীবন দুঃখ শোকে পরিপূর্ণ। সেই রোদনের সুর নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।—

সংবাদ।

(১)

তব সাথে সখা! মিলিতে আবার
কি বাসনা জাগে পরাণে মোর;—
শুন, সবে বলে আজি অভাগার
ছিঁড়িয়া এসেছে জীবন-ডোর।

(২)

যাবে তুমি কাল স্বদেশে ফিরিয়া,
দু'টি কথা ক'য়ে দিতেছি তাই;
অথবা মিছা এ আশার স্বপন,
মোর কথা কেবা শুনিবে, ভাই?

(৩)

তবু, তবু, সখা, প্রিয়জন কেহ,—
নামে কিবা কাজ,—সুধায় যদি,
বোলো, বোলো তা'রে এসেছি দেখিয়া
সমর-শয়নে টুটিত-হৃদি।

(৪)

বোলো সে করেছে বীরের মতন
স্বদেশের কাজে জীবন-দান:
আর বোলো, এক মধুর মুরতি
ছিল সুখে তা'র ভরিয়া প্রাণ!

সাধ।

(১)

জীবনে আমার নাহি কোন সাধ,
অতীতের লাগি বেদনা নাই,
আজিকে ছিঁড়িয়ে যতেক বাঁধন
বিস্মৃতি-ঘোরে ঘুমাতে' চাই।

(২)

নহে সে শীতল সমাধিশয়ন
শোণিতের স্রোত বহে না যায়;
নিশ্বাস-ভরে হিয়া দুরু দুরু,
কাঁপিয়া উঠিবে পড়িবে তায়।

(৩)

দিবা নিশি এক মধুর সুরব
প্রেম-সংগীতে জুড়াবে প্রাণ:
চির-পল্লবে ছায়া-ঘন বট
মর্ম্মর-রবে তুলিবে তান।

৮ই ভাদ্র। রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" কবিতাটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলাম। এখন ইহার রচনা-পদ্ধতির বিবিধ দোষ লক্ষিত হইতেছে। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্ধতির এরূপ সম্মিলন বড় সহজসাধ্য নহে। মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া, অমিত্রাক্ষরের প্রধান অবলম্বন ও প্রাণস্বরূপ যে অনায়াস স্রোতোগতি, তাহা রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কবিতার অনেক স্থলেই স্রোতোভঙ্গ হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, এ বিষয়ে "বসুন্ধরা"র অপেক্ষা "বিদায়-অভিশাপ" শ্রেষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষা "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যেই পূর্ণ না হউক, প্রকৃষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ, "চিত্রাঙ্গদা"য় মিলের শৃঙ্খলে কবির হস্তপদ বদ্ধ নহে; তিনি স্বাধীন ভাবে, স্বচ্ছন্দে আপনার শক্তি প্রকাশিত করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন,— নিজের উপরে একটা সংযম ও বন্ধন রাখিবার জন্যই তিনি অমিত্রাক্ষরের সহিত মিত্রাক্ষর মিশাইয়াছেন। সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিলে, ইহাতে ভালই হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু, সে সাফল্য বহুলসাধনসাপেক্ষ। সে যাহাই হউক,

এখন "বসুন্ধরার" কথা। এই কবিতার প্রধান দোষ এই যে, ইহা অতীব দীর্ঘ। আদ্যোপান্ত পুনরুক্তি ও ভাববিস্তৃতি-দোষে পরিপূর্ণ। নহিলে, কবিতার মৌলিক ভাবটি যেরূপ মহান্ ও সুন্দর, ভাষার যেরূপ গাম্ভীর্য্য, ইহা একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপাটী, শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। সমগ্র "সোনার তরী"র ভিতর আমি এক্ষণে "সমুদ্রের প্রতি"কেই প্রাধান্য দিতে চাই। কারণ, একমাত্র "ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ" ছাড়া ইহাতে অপর কোথাও কোনও দোষ লক্ষিত হয় না। গ্রন্থের মধ্যে "বসুন্ধরা" দ্বিতীয় স্থান পাইবার যোগ্য। "জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি, যুগল মিলিছে আগে।" কবিতা সম্বন্ধে সেই যুগল, কবির কবিতাও পাঠকের হৃদয়। কবি কতকটা নিজে বলিয়া কতকটা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ কবিতার সৃষ্টি করেন। সব কথা বলিয়া দিয়া কখনও বা সব কথার অপেক্ষাও বেশী কথা বলিয়া কবিরা অত্যন্ত অবিবেচনার পরিচয় দেন। রবীন্দ্র বাবুর এ বিষয়ে সাবধানতা প্রার্থনীয়। কবিতাটির আর এক দোষ এই যে, ইহাতে জড় প্রকৃতির প্রতি কবির সহানুভূতি যেরূপ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অন্তর্জগতের প্রতি সেরূপ হয় নাই। প্রকৃত কবিতায় আধ্যাত্মিকতারই প্রাধান্য থাকা উচিত।

৯ই ভাদ্র। অদ্য ৪টার সময় স্কুলের পারদর্শী ছাত্রদিগকে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ করা হইল। শ্রীরামপুর হইতে চারি জন সাহেব বিবি আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদিগকে স্বহস্তে পুরস্কার প্রদান করিলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকেও পারিতোষিক দেওয়া হইল। সে কার্য্য একটি বিবি-বরাঙ্গনা সম্পন্ন করিলেন। বালিকাদিগের শিল্পকার্য্য দেখিবার সময় দু' একটা উলের টুপী দেখিয়া বিবি মহাশয়া একটুকু রহস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শিশুদিগের ব্যবহার্য্য এইরূপ জিনিসগুলি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বালিকাগণ ভবিষ্যতে গৃহস্থালীর জন্য শিক্ষিত হইতেছে, বিবি এই কথা মনে করিয়া হাসিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। দুই এক জন ভদ্রলোক বিবির মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার হাসি প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পাদরী সাহেব শিক্ষক ও বালকদিগকে দুই চারিটা উপদেশ দিয়া আমাকে সে দায় হইতে রক্ষা করিলেন। বক্তৃতার কাজটা আমার একেবারেই আসে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অপমানের ভয়ে, দুই চারিটা কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কি জানি, যদি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হঠাৎ হেড্‌মাষ্টারের উপর বক্তৃতার ভারটা চাপাইয়া দেওয়া হয়! কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ; তিনি আমাকে এবার রেহাই দিয়াছেন।

১০ই ভাদ্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাইলাম। পরিবর্ত্তিত নূতন নিয়মানুসারে এই পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। প্রথম সংখ্যা তত ভাল বলিয়া বোধ হইল না। দেশের প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবী পরিষদের সভ্য। সেই হিসাবে পত্রিকাখানা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই, এই কথাই বলিতেছি। চারিটি প্রবন্ধের মধ্যে দুইটি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতার আকারে পাঠ করা হইয়াছিল। সে কথা প্রবন্ধের সহিত স্বীকার করা উচিত ছিল। পরিষদের পত্রিকায় এরূপ প্রকাশিতের পুনঃপ্রকাশের পরিবর্ত্তে আমরা আসল ও খাঁটি নূতন জিনিসের আশা করি। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ক প্রস্তাবে দেখাইয়াছেন যে, সাহিত্যসেবী মহাপুরুষেরা যেমন সময়ের ফল-স্বরূপ, তেমনই আবার সময়ের ও সমাজের সংস্কারক। সাহিত্য-ক্ষেত্র বঙ্কিম-চন্দ্রের উদয় সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক নূতন ভাবে কর্ষিত হইয়া নূতন ফলোৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে। এ কথা সকল দেশের সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উদীয়মান প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে অন্ধ হইয়া, আমরা মনে করিতে পারি, ব্যাপারটি অকস্মাৎ সম্পাদিত হইল; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঊষার অসংখ্যরশ্মি জগতের অন্ধকার অনেকটা অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "তিন বন্ধু" নামক আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছে।

দীনেশ বাবুর "রামায়ণীকথা" এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু "ভারতী" পত্রে শ্রীমতী সরলা দেবী তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। রাম না হইতেই রামায়ণ হইয়াছিল; অতএব বিস্ময়ের কারণ নাই।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতার সন্নিহিত বালী গ্রামে 'মোহন-উদ্যানে' শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বালীর অধিবাসিগণ ১৩০৬ সালে স্বর্গীয় দত্ত মহোদয়ের স্মরণচিহ্নস্বরূপ "বালী শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত স্মৃতি-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্প্রতি লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন, অক্ষয় বাবুর স্মরণার্থ প্রতিবৎসর 'অক্ষয় দত্ত পদক' নামক একটি রৌপ্যপদক দান করিবেন। 'স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় দত্তের প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম-ত্যাগ' সম্বন্ধে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, এই বৎসর তিনি অক্ষয় দত্ত পদক প্রাপ্ত হইবেন।

চৈতন্য লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণও এ বৎসর তিনটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধের বিষয়,—"আমাদের দেশীয় শিল্প, শ্রমজাত দ্রব্য ও বাণিজ্যের উপায়"।

মান্দ্রাজের "হিন্দু" পত্রে প্রকাশ, বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার এম্. এ. লণ্ডনের রাজকীয় ঐতিহাসিক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আয়াঙ্গার মহাশয় ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। এই সম্মান তাহারই পুরস্কার। "দক্ষিণ ভারতে চোল রাজ্যের শাসনপ্রণালী" ও "চোল রাজ্যের প্রাধান্য" সম্বন্ধে 'মান্দ্রাজ মেল' পত্রে দুইটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া এই নূতন ঐতিহাসিক যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মায়ার বন্ধন" আষাঢ়ের সাহিত্যে সম্পূর্ণ হইল। "মায়ার বন্ধন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। 'সাহিত্যে'র অনুরোধে গ্রন্থকার পুস্তকের প্রচার বন্ধ রাখিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ. "ভারতচন্দ্র" সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিতেছেন। এই গ্রন্থে ভারতচন্দ্র-যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা, কবির জীবনচরিত ও তদীয় গ্রন্থের সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

রাজসাহীর প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বৃদ্ধবয়সে নবীন উৎসাহে পদ্যে রামায়ণের অনুবাদ করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রামায়ণের রচনাকাল-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রাজসাহীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য পাণিনিতন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"বাণী" নামক গীতিকাব্যের প্রণেতা কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনের "কল্যাণী" নামক একখানি নূতন গীতিকাব্য মুদ্রিত হইতেছে।

"ত্রিদিব-বিজয়" ও "রাঘব-বিজয়ের" কবি শ্রীযুক্ত শশধর রায় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন।

রাজসাহী কলেজে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। এই টোলের একটু বিশেষত্ব থাকিবে।—চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নাহরণ করিয়া পুস্তক রচনা করিতে বাধ্য থাকিবেন। আশা করি, এই পবিত্র উদ্যম সফল হইবে।

প্রসিদ্ধ নাটক-কার ও ক্লাসিক থিয়েটারের বর্ত্তমান নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ দুর্ভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার শেষ জীবন ও পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিতেছেন, শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ অজাতশত্রু হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সার' উপাধি লাভ করিয়াছেন। 'সার'-সংযোগে গুরুদাস বাবুর মহিমা বর্দ্ধিত হইবার নহে। বরং তাঁহার নাম-সংযোগে উপাধিরই সম্মানবৃদ্ধি হইল। পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যচর্চ্চায় অবসরকাল অতিবাহিত করিতেছেন। সে দিন বিজ্ঞান-সভায় "বিজ্ঞানের অনুশীলন" বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষণে স্বাস্থ্যের অনুরোধে মজঃফরপুরে প্রবাস করিতেছেন।

শ্রাবণে।

তুমিই কি রাখনি ভুলায়ে হিমশীর্ণ মৃত্যুর মূরতি ?
তবে কেন ভাবিব তাহারে, যার প'রে ঢেলেছ বিস্মৃতি।
হোক্ শুক্ল কৃষ্ণ কেশদাম, রেখান্বিত হয় হোক্ ভাল,
যত দিন এই আঁখিযুগ রবে দীপ্ত হে বিশ্বভূপাল!
তোমারে হেরিব আঁখি ভরি',এই ভিক্ষা মাগি বিশ্বপতি,
জলে স্থলে কুসুমে শাদ্বলে ওই তব মধুর মূরতি।
বসি' এই নিভৃত কুটীরে, এই ক্ষুব্ধ-নীল-সিন্ধুকূলে,
কে স্মরিবে তামস-মৃত্যুরে? গুপ্ত ফণা থাক্ না সে তুলে।
আঁখি মুদি' অন্ধ-পরকাল ধেয়ান সে মুক্ত যোগী জন,
চেয়ে চেয়ে আমি চিরকাল রচি যেন সুন্দর-দর্শন ;
সে সুপথ ধরি' চলে যাবে তর্কশ্রান্ত ক্লান্ত পান্থজন,
পুষ্পবাসে ঘননীপচ্ছায়ে, নিরুদ্বেগে, তোমার ভুবন।

আজি প্রাতে মেঘ গেছে কেটে, ঝলমল স্বর্ণময় বারি,
পট্টবাসা পূর্ব্বাশার দ্বারে দিগঙ্গনা লয়ে হেম-ঝারি
ঢালিতেছে কনক-উদক নীলকণ্ঠ শ্রাবণের শিরে,
আর্দ্র করি' ঘন-নীল-জটা, স্বর্ণধারা পড়িতেছে ঝরে।
শ্যামছত্র তালীবনরাজি সিন্ধুশিরে ধরিয়াছে খুলে,
ঢুলাইছে হরিত চামর নারিকেল, কূলে কূলে দুলে!
হরিত সুপুচ্ছ ঝুলাইয়া ঝাউ-শাখে বসি' শুকদল,
নব-রবি-করে ফুল্লহিয়া, গায় সুখে প্রভাতী-মঙ্গল।
শ্রাবণের সঘন-বর্ষণমুক্ত আজি লঘু মেঘদল
উড়ে উড়ে গগনেতে ফিরে পান করি' কনক তরল।
দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে শুভ্র পোতখানি—
ও পারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে না জানি!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ফিরোজ শাহ তোগলক।

এক জন ইতিহাসলেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দিল্লীর পাঠানরাজত্বকাল অরাজকতার যুগ। এই নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। অধিকাংশ পাঠান নরপতিই দুর্ব্বলচিত্ত ও কুক্রিয়ান্বিত ছিলেন; এই জন্য পাঠান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচার বদ্ধমূল হইয়াছিল। পাঠানগণ হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা দেবালয় ভগ্ন ও দেবমূর্ত্তি বিকলাঙ্গ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন, এবং তরবারির সাহায্যে হিন্দুর জাতিনাশ করিতেন। যাঁহার রাজত্বকালে মোসলমান-কৃত অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাঁহার নাম মহম্মদ তোগলক। মহম্মদ দিল্লীর পঞ্চদশতম মোসলমান নরপতি। তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত ও রক্তপিপাসু ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে পাঠান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছিল। মহম্মদের পর ফিরোজ তোগলক দিল্লীর রাজসিংহাসন লাভ করেন। ফিরোজ প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়দর্শী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে বহুকাল পরে হিন্দু প্রজাবর্গ শান্তিলাভ করে।

ফিরোজ মহম্মদ শাহ তোগলকের পিতৃব্যপুত্র। (১) মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে ঐকান্তিক প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে তাঁহাকে আপনার

---

(১) ফিরোজ হিন্দু রমণীর গর্ভজাত ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার পরিণয় ব্যাপারে একটু 'রোমান্সে'র গন্ধ আছে। "গিয়াসউদ্দীন তোগলক যখন লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা, তখন তাঁহার ভ্রাতা (ফিরোজের পিতা) তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তিনি রাণামল ভট্টির কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু রাণা এ প্রস্তাবে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি রাণার রাজ্য আক্রমণ করেন। একদিন সেই রাজকুমারী রাণার মাতাকে বিলাপ করিতে শুনিয়া তাদৃশ বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজমাতা বলিলেন, তোমার জন্য মোসলমান সৈন্যগণ এদেশের অধিবাসীদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে; ইহাই আমার বিলাপের কারণ। তাহা শুনিয়া রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, যদি আমাকে দিলেই লোকে উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে আমাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন; মনে করিবেন, মোসলমানেরা আপনাদের একটি কুমারীকে বন্দিভাবে লইয়া গিয়াছে। রাণা স্বীয় কন্যার অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া তাঁহার বিবাহে সম্মত হইলেন এবং তদনুসারে রাজকুমারীকে দিপালপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই রাজপুতকুমারীর গর্ভে ফিরোজের জন্ম হয়।"—ভারতবর্ষে মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। (১) কিন্তু ফিরোজের রাজ্যলালসা ছিল না। তিনি মক্কায় গমন ও তথায় ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনযাপন করিবার অভিলাষী ছিলেন। এই জন্য মহম্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণ ফিরোজের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বলেন, "আমি মক্কায় গমন করিব; রাজসিংহাসনের প্রার্থী নহি।" সমবেত অমাত্যগণ তাঁহাকে একবাক্যে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন অমাত্যশ্রেষ্ঠ তাতার খাঁ ফিরোজের হস্তধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। ফিরোজ বলিলেন, "বিপদপূর্ণ বহুযত্নসাধ্য শাসনকার্য্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিতেছেন, আপনারা কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করুন; আমি উপাসনা শেষ করিয়া আসিতেছি।" তার পর তিনি তদ্গতচিত্তে নমাজ পাঠ করিলেন, এবং উপাসনান্তে অবনতমস্তকে অশ্রুসিক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, রাজ্যের স্থায়িত্ব, শান্তি ও শৃঙ্খলা মানুষের উপর নির্ভর করে না। তোমার আদেশেই রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর, তুমিই আমার আশ্রয়স্থল ও বলবিধানকর্ত্তা।" উপাসনা শেষ হইলে অমাত্যগণ তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন।

ফিরোজ রাজপদ-গ্রহণকালে যে সুদৃঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন, রাজ্যশাসনকালেও তাহা কিঞ্চিন্মাত্র শিথিল হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা নিরলসভাবে রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু কখনও তিনি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইতেন না। রাজনীতি বা বিলাসিতার জন্য তিনি এসলামশাস্ত্রের বিরোধী কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেন না। (২)

ফিরোজ বিলাসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব ছিল না। সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী ও উদ্যানমালার নির্ম্মাণে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের ভগ্নপ্রায় সমাধিমন্দিরসমূহের আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে বহুসংখ্যক সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল। সুলতান আলতমাসের বিপুলায়তন শিক্ষামন্দির ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছিল। ফিরোজ তাহা পুনর্নির্ম্মিত করেন। পুরাতন দিল্লীর মসজীদ-ই-জামি নামক বিখ্যাত উপাসনামন্দির ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। ফিরোজের সময়ে এই মসজিদও পুনর্নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ, তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লী নগরী মনোহর প্রাসাদ, সমুচ্চ মসজিদ, কারুকার্য্যখচিত

(১) মহম্মদের পুত্রসন্তান ছিল না।

(২) *Tarikh-i-Firoz-Shahi.*

সমাধিমন্দির ও নির্ম্মলবারি সরোবরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সজ্জিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বর যে সকল গুণে আমাকে ভূষিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমারত-নির্ম্মাণের বাসনা অন্যতর। আমি বহুসংখ্যক শিক্ষামন্দির, মসজিদ ও সত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছি। এই সকল স্থানে পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ভক্ত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরোপাসনা করিয়া নির্ম্মাতাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। * * * পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতান ও আমীর ওমরাহগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভগ্নপ্রায় এমারত-সমূহের সংস্কার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে সুমতি দিয়াছিলেন। এ জন্য আমি প্রথমে ঐ সকল এমারতের সংস্কার সম্পন্ন করিয়া, পরে নূতন এমারত সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছি।"

আর একটি কার্য্য সুলতানের অতি প্রিয় ছিল। মৃগয়ায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় মৃগয়ায় লিপ্ত থাকিতেন; এবং তাহাতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন।

কিন্তু লোকহিতসাধনই ফিরোজের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। তদীয় স্বরচিত-জীবনবৃত্ত-ধৃত নিম্নলিখিত কবিতানিচয়ে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।—

Labour to earn for generous deeds a name,
Nor seek for riches to extend thy fame.
Better one word of praise than stores of gold,
Better one grateful prayer than wealth untold.
The practice of the great should be,
    To Succour honest man ;
And when a good man dies, to see
    His children find a friend.
Kings should make their rule of life
    To love the great and wise :
And when death ends this mortal strife
    To dry their loved ones' eyes.

এই লোকহিতপরায়ণ শাসনকর্ত্তার আমলে বহুসংখ্যক বৃদ্ধ কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল কর্ম্মচারী বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজকার্য্য-নির্ব্বাহে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্য অন্যতম দেওয়ান মালিক ইসাফ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে সুলতান উত্তর করেন, "এমন কথা বলিও না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বৃদ্ধ বলিয়া কাহাকেও অন্নদানে

বিরত নহেন। অতএব আমি তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া কিরূপে আমার জরাগ্রস্ত কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিতে পারি?" রাজধানীতে কেহ কর্ম্মপ্রার্থনায় উপস্থিত হইলেই তাহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করিবার আদেশ ছিল। কেহ কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ফিরোজের দয়ালুতার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। মহম্মদ শাহ তোগলক দেব-গিরিতে রাজধানীস্থাপনের কল্পনায় দিল্লীর অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক তথায় লইয়া যান। কিন্তু পরে তাহাদিগকে পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ করেন। এইরূপ যাতায়াতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত মহম্মদ শাহ বহু অর্থ ঋণপ্রদান করেন। ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই ঋণ আদায় করিবার আদেশদান করেন। কিন্তু তিনি পরে শুনিলেন, রাজাদেশ প্রতিপালিত হইলে ঋণী প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। তখন তিনি প্রজাবৃন্দকে ঋণদায় হইতে একবারে অব্যাহতি দান করিলেন। মহম্মদ তোগলকের নৃশংসতায় অসংখ্য লোকের হস্ত পদ নাসা কর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল। ফিরোজ তাহাদিগকে অর্থবলে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা সন্তোষজ্ঞাপক লিপি লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই সকল লিপি একটি ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত করিয়া মহম্মদের সমাধির শিরোদেশে রাখিয়া দেন। ফিরোজের বিশ্বাস ছিল যে, এই কার্য্যে ঈশ্বর প্রীতিলাভ করিয়া মহম্মদের নৃশংসাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, এবং অত্যাচারপীড়িত প্রজাগণ মহম্মদের অপরাধ বিস্মৃত হইবে। তিনি মহম্মদের নিকট দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন। উপকারের প্রতিদানকামনায় তিনি পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৈন্যগণের সহিত ব্যবহারকালেও সুলতানের পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি নবতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পালন করিতেন। সৈন্যগণকে নিজব্যয়ে অশ্ব রাখিতে হইত। অনেকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার সময় নিকৃষ্ট অশ্ব লইয়া আসিত। রাজকর্ম্মচারিগণ সেই সকল নিকৃষ্ট অশ্ব কার্য্যোপযোগী বলিয়া গণ্য করিয়া লইতেন। এই সকল কথা সুলতানের কর্ণগোচর হইলেও তিনি কিছু বলিতেন না। সৈন্যগণকে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া স্ব স্ব অশ্ব দেখাইতে হইত। যে সকল সৈন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অশ্ব প্রদর্শন করিতে পারিত না, তাহাদিগকে আর দুই মাস সময় দিবার নিয়ম ছিল। একবার এক জন অশ্বারোহী সৈন্য অশ্ব প্রদর্শন করিতে না পারিয়া আক্ষেপ করিতেছিল। সুলতান গোপনে তাহার আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং

তাহাকে কেরাণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে সৈনিক বলিল, আমার অর্থের অভাব; নতুবা একটি সুবর্ণতঙ্কা হইলেই এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। ফিরোজ তাহার উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটি সুবর্ণতঙ্কা প্রদান করিলেন।

ফিরোজ সাম্রাজ্যের সুশাসন ও এসলামশাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে কতিপয় অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া মোসলমান-সমাজের প্রশংসাভাজন ও অক্ষয়-কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

১ম। ভারতবর্ষের মোসলমান সুলতানগণ সৈনিকদিগকে পারিশ্রমিকস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিতেন। আলাউদ্দীন নগদ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। ফিরোজ শাহ আলাউদ্দীনের নিয়ম রহিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

২য়। কোনও সেনানায়কের মৃত্যু হইলে তদীয় শূন্য পদে তাঁহার পুত্রকে, পুত্রের অভাবে তাঁহার জামাতাকে, জামাতার অভাবে তাঁহার গোলামকে, গোলামের অভাবে তাঁহার নিকটতম আত্মীয়কে, তদভাবে তাঁহার স্ত্রীকে নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার নিয়ম ছিল।

৩য়। দেওয়ান-ই-খয়রাত নামক একটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কন্যার বিবাহকালে নিঃস্ব প্রজাকে অর্থসাহায্য করাই এই বিভাগের কর্ত্তব্য ছিল।

৪র্থ। মোসলমান রাজত্বকালে অপরাধীকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে নাসাচ্ছেদ, কর্ণ-কর্ত্তন প্রভৃতি নানারূপ নিষ্ঠুর দণ্ড দিবার প্রথা ছিল। ফিরোজ এই সকল বর্ব্বর দণ্ড রহিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—

Thanks for God's mercies I will show,
By causing man nor pain nor woe.

তিনি এসলাম ধর্ম্মবিশ্বাসীকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার নিয়ম করেন। কাহারও অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে, অপরাধীর প্রতি শাস্ত্রানুমোদিত দণ্ড বিহিত হইত।

৫ম। ফিরোজ নিজ নামের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের নামে খোতবা পাঠ করিবার আদেশ প্রচারিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—

Would'st thou enjoy a lasting fame ?
Hide not the merits of an honoured name.

৬ষ্ঠ। ফিরোজ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ প্রকার রাজকর তুলিয়া দেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—

Better a people's weal than treasures vast,
Better an empty chest than hearts downcast.

৭ম। ফিরোজ শাহের পূর্ব্বে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ৪/৫ রাজকোষে গ্রহণ করিয়া ১/৫ লুণ্ঠনকারী কর্ম্মচারীকে প্রদান করা হইত। এই নিয়ম এসলামশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তিনি শাস্ত্রের অনুশাসনানুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ১/৫ রাজকোষে গ্রহণ ও ৪/৫ অংশ লুণ্ঠনকারী কর্ম্মচারীকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন।

৮ম। পর্ব্বদিনে মোসলমান মহিলাগণ পাল্কীতে অথবা অন্য কোনও প্রকার যানে আরোহণ করিয়া সমাধিমন্দিরে গমন করিতেন। এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল। লম্পটদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিবার অনুকূল বলিয়া ফিরোজ এই প্রথা রহিত করেন।

৯ম। ফিরোজের পূর্ব্বে আমীর ওমরাহের বেশ স্বর্ণখচিত রেশমী বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। এই প্রকার বস্ত্রের ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এ জন্য সুলতান শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত পরিচ্ছদ পরিধান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

ফিরোজ শাহ এই সকল অভিনব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হন নাই; প্রজার হিতার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। তিনি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসালয়ে প্রজাবর্গ ঔষধ ও পথ্য প্রাপ্ত হইত। সুলতান চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ন্যূনাধিক এক শত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের সুবিধার্থ দেশের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহ স্থানে স্থানে সরাই, বিদ্যালয়, মসজিদ, স্নানাগার, সেতু, উদ্যান, কূপ, বাঁধ, সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত করিয়া প্রজাহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত পূর্ত্তকার্য্যের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এই সকল ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিলে, তদীয় পূর্ত্তকার্য্যের বিপুলতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। যমুনা যেখানে পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমতলভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে স্থান হইতে সূচিত হইয়া কারনাল

অতিক্রম করিয়া এই কৃত্রিম প্রবাহ হালসী ও হিসার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শতদ্রু ও ঘরঘরার সঙ্গেও উহা সংযুক্ত ছিল।

ফলতঃ, ফিরোজের যত্নে ও চেষ্টায় সুবিস্তীর্ণ মরুতুল্য দেশ শস্যশ্যামল হইয়াছিল। এই সকল ভূমির করে রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। দিল্লীর আফগান-বংশীয় কোনও নরপতিই রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্বসম্বন্ধীয় কার্য্য বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য কার্য্য-সৌকর্য্যের অনুরোধে স্বতন্ত্র রাজস্ব-কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। (১)

রাজস্বের এইরূপ উন্নতি ও বৃদ্ধি প্রজার বৈষয়িক স্বচ্ছলতার ফলস্বরূপ বলা যায়। সুলতানের ঐকান্তিক যত্নে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল; প্রকৃতিপুঞ্জ সুখে কালযাপন করিত। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের সর্ব্বত্রই জীবনধারণের উপযোগী সামগ্রীসমূহের প্রাচুর্য্য ছিল। তাঁহার ত্রিংশৎবৎসরব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে কখনও দুর্ভিক্ষের করালছায়াপাতে প্রকৃতিপুঞ্জের সমুজ্জ্বল সমৃদ্ধি মলিন হয় নাই। আলা-উদ্দীনের সময়েও দ্রব্যাদি সুলভ ছিল। কিন্তু দ্রব্যাদি সুলভ রাখিবার জন্য তাঁহাকে বিবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ফিরোজের শাসনকালে সুশাসন ও প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহে শস্যাদি স্বতঃই সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত; তজ্জন্য কোনও-রূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার আমলে শস্যাদি এরূপ সুলভ ছিল যে, দিল্লী নগরীতে চারি জিতলে এক মণ যব, আট জিতলে এক মণ গম ও চারি জিতলে এক মণ দাল পাওয়া যাইত। সকল প্রকার বস্ত্রই সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত। সমস্ত দোয়াব প্রদেশ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। এই প্রদেশের একখানি গ্রামও দুর্দ্দশাপন্ন ছিল না; এক বিঘা জমিও পতিত ছিল না। সমগ্র দোয়াব ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল; এই ৫২ পরগণাই সমৃদ্ধ ছিল। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থাও এইরূপ ছিল। সামান্য জেলায় এক ক্রোশের মধ্যে চারিখানি ধনধান্যপূর্ণ গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ এত সুলভ ও প্রচুর ছিল যে, অতি দরিদ্র ব্যক্তিও বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ দিতে পারিত।

ফিরোজের রাজত্বকালে, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের অবস্থারই উন্নতি হইয়া-ছিল। সুলতান আমীর ওমরাহ ও সৈনিকদিগকে প্রচুরপরিমাণে বৃত্তি প্রদান করিতেন। উজীরের বৃত্তির পরিমাণ ১৩ লক্ষ তঙ্কা ছিল। উজীরের পুত্র,

---

(১) The revenues of the Doab in this reign amounted to 80 laks of tankas, and under the fostering care of this religious sovereign, the revenues of the territories of Dehli were six krors and eightyfive laks of tankas.—*Shams-i-Siraj Afif.*

আত্মীয় স্বজন ও অনুচরগণের নিমিত্ত পৃথক বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। অন্যান্য আমীর ওমরাহগণের বৃত্তির পরিমাণও এইরূপ হারেই নির্দ্ধারিত হইত। কাহারও বৃত্তির পরিমাণ চারি লক্ষ তঙ্কার ন্যূন ছিল না। মজলিস-ই-খাস বিভাগের নায়েব আমীর মালিক শাহিন দানা মৃত্যুকালে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত রাখিয়া যান। এই নগদ অর্থ ব্যতীত তাঁহার ভাণ্ডারে প্রচুরপরিমাণ মণি-মুক্তাও সঞ্চিত ছিল। ইমাদ-উল্-মুল্কের বিপুল বৈভবের কথা প্রবাদবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল।

সুলতান ফিরোজ শাহের মত ন্যায়দর্শী ও জনহিতৈষী নরপতির রাজত্বকালেই দেশের উন্নতি সম্ভবে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় নরপতিও ধর্ম্মের নামে প্রজাপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন, এসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে তাদৃশ উৎপীড়ন আবশ্যক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য এক জন ব্রাহ্মণকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া বধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এক জন ব্রাহ্মণ দিল্লী নগরীতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকাশ্যভাবে পূজা অর্চ্চনা করিতেন। এই দেবমন্দিরে বহু লোকের সমাগম হইত। কোনও কোনও মোসলমানরমণীও পারত্রিক-কল্যাণ-কামনায় হিন্দুর দেবমন্দিরে আগমন করিত। এই সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ কাজির হস্তে অর্পণ করেন। কাজি মত প্রকাশ করেন,—এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে অপরাধী ব্রাহ্মণের অপরাধের খণ্ডন হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মপরিত্যাগে অস্বীকৃত হন। তখন কাজি তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়া তদীয় অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবার ব্যবস্থা দিলেন। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মপরিত্যাগ অপেক্ষা প্রজ্বলিত পাবকে দেহত্যাগ শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। সুলতানও তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া বধ করিলেন। ফিরোজের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণ ব্রাহ্মণ জাতিকে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ ব্রাহ্মণ জাতিই পৌত্তলিকতার উৎসস্বরূপ মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে জিজিয়া করভারে উৎপীড়িত করিতেন। দেবালয়সমূহ ভূমিসাৎ করিয়া তদুপরি মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেন,—তাহার বিবরণে তদীয় স্বরচিত জীবনবৃত্ত পূর্ণ রহিয়াছে। সুলতান যে একমাত্র হিন্দুকেই ধর্ম্মের নামে উৎপীড়িত করিতেন, তাহা নহে; ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমানগণের উৎপীড়নেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ফিরোজ সুন্নিমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সময়ে শিয়ামতাবলম্বী মোসলমানের মাথা তুলিবার ক্ষমতা ছিল না। সুলতান তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিবার উদ্দেশ্যে একবার শিয়াসম্প্রদায়ের পুস্তকাবলী বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। আহম্মদ বহারী নামক

এক জন শাস্ত্রজ্ঞ মোসলমান তাঁহার সময়ে অভিনব ধর্ম্মমতের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সুলতান তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন, এবং তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে দূরদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। তিনি রোকন উদ্দীন ও মারু নামক দুই জন ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যুদণ্ড বিধান করেন। ফলতঃ তিনি স্বমতের বিরুদ্ধবাদী হিন্দু, মোসলমান, সকলের সাধ্যমত নির্য্যাতনের ক্রটী করেন নাই। সুলতান বিরুদ্ধবাদী-দিগের নির্য্যাতন করিয়াই আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি চরিতার্থ করেন নাই; নিজের বিশ্বাসানুগত সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে বিকীর্ণ করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনচরিতের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আমি বিধর্ম্মী প্রজাদিগকে পয়গম্বরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছি; যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এসলাম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইবে, তাহাদিগকে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে, এই ঘোষণা প্রচারিত করিয়াছি। এই সংবাদ প্রকৃতিপুঞ্জের কর্ণগোচর হইলে বহুসংখ্যক হিন্দু উপস্থিত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক গৌরবলাভ করে। প্রত্যহ বহুসংখ্যক হিন্দু সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি ও সঙ্গে সঙ্গে রাজসম্মান ও রাজদত্ত উপঢৌকন লাভ করিয়াছে।"

রাজ্যশাসন, প্রজারঞ্জন, পূর্ত্তকার্য্য, ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মপ্রচার ও তথাকথিত অপধর্ম্মাবলম্বী পাষণ্ডদিগের দলনেই ফিরোজের সমগ্র রাজত্বকাল অতিবাহিত হয় নাই। সন্ধিবিগ্রহেও তাঁহার রাজত্বকালের কিয়দংশ যাপিত হইয়াছিল। তাঁহাকে বাঙ্গলা, গুজরাট ও ঠাঠ প্রভৃতি দেশে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি ঠাঠে সৈন্য প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে প্রধান অমাত্যের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রিবর যে দুইটি কারণে তথায় সৈন্যপ্রেরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন, আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।—

১ম। জাঁহাপনা সুলতান মহম্মদের উত্তরাধিকারী। তাঁহার ঠাঠ বিজয় করিবার প্রবল বাসনা ছিল। অতএব, তাঁহার রাজ্যের ন্যায় এ বাসনাতেও জাঁহাপনার উত্তরাধিকার বর্ত্তিয়াছে, এবং এ সম্বন্ধেও উত্তরাধিকারীর কর্ত্তব্য পালন করাই সঙ্গত।

২য়। দেশজয় করাই রাজধর্ম্ম। কারণ সাদি বলিয়াছেন,—'ধার্ম্মিক ব্যক্তি একখানি রুটীর অর্দ্ধখণ্ড আহার করিয়া অপর খণ্ড ভিক্ষুককে দান করেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াও এক জন নরপতির তৃপ্তি হয় না; তিনি জয় করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি পৃথিবীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।'

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

দর্শনশাস্ত্র ও মহাভারত।

১। মহাভারত-সংহিতার সময়ে মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন অতীব প্রাচীন ছিল। সাংখ্য-কার কপিল দার্শনিকদিগের মধ্যে পুরাতন ও মহর্ষি বলিয়া পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং অগ্নি ;—"অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ।" (বন, ২২১, ২১)। তিনি শিব ;—(শান্তি, ২৮৫, ১১৪ ; অনুশা, ১৭, ৯৮, ও ১৪, ৩২৩); তিনি বিষ্ণু ;—(বন ৪৭, ১৮ ও ভীষ্ম ইত্যাদি); এবং তিনি প্রজাপতি ; (শান্তি, ২১৮, ৯-১০)।

মহাভারত-সংহিতার পরবর্ত্তী সময়েও অনেক দিন পর্য্যন্ত কপিলের এই সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। মীনাদি দশাবতার কল্পিত হইবার পূর্ব্বে, যখন চারি যুগে বিষ্ণুর চারিটি অবতার কল্পিত হইয়াছিল, তখন কপিলকেই আদি-অবতার-রূপে পাই। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে যে, বিষ্ণু সত্যযুগে কপিল-রূপে জ্ঞানদাতা, ত্রেতায় চক্রবর্ত্তি-রূপে দুষ্টদমনকারী, দ্বাপরে বেদব্যাস-রূপে বেদবিভাগকর্ত্তা, এবং কলিতে কল্কি-রূপে ধর্ম্মসংস্থাপক।

২। যোগজ্ঞান, যোগদর্শন ও যোগশাস্ত্রের কথাও মহাভারতে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কিন্তু কপিল যেমন সাংখ্যদর্শনের কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইরূপ ভাবে যোগশাস্ত্রকর্ত্তা বলিয়া পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায় না। শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ে, যেখানে কপিলকে সাংখ্যকর্ত্তা বলা হইয়াছে, ঠিক সেই স্থলেই যোগ-কর্ত্তার নাম রহিয়াছে হিরণ্যগর্ভ। আমার মনে হয় যে, মহাভারত-সংহিতার সময়ে যোগানুশাসনকর্ত্তা পতঞ্জলির নাম, অতি প্রাচীনতার মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া, এইরূপ ঘটিয়াছে। শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ের ৬৪ ও ৬৫ শ্লোক পড়িলে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, যোগশাস্ত্রকর্ত্তা অন্য লোকের নামের সহিত রচয়িতা পরিচিত ছিলেন ; নহিলে এ কথা লিখিলেন কেন যে, যোগশাস্ত্রকর্ত্তা-অন্য কোনও ব্যক্তি নহেন, তিনি স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ? 'অন্য কেহ নহেন' বলিলে অন্য ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সূচিত হয়েন ; এবং এই প্রকার উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার জ্ঞানের দৈব-উৎপত্তি-প্রদর্শনের জন্যই হিরণ্যগর্ভের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। (বঙ্গবাসীর সংস্করণে এইটি ৩৪৯ অধ্যায়)।

৩। সভাপর্ব্বের নারদ-সংবাদে বৈশেষিক দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ; কিন্তু ঐ অংশ অর্ব্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। আদিপর্ব্বের ৭০ অধ্যায়ের

৪৩-৪৪ শ্লোকেও কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের কথা পাওয়া যায়। কেন না, তত্রত্য উল্লিখিত 'সমবায়' বৈশেষিক দর্শনের 'সমবায়' বলিয়া পণ্ডিতেরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন।

৪। শান্তিপর্ব্বের ৩২১ অধ্যায়ে, সৌক্ষ্ম্য, সাংখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন বলিয়া যে পাঁচটি বিভাগ আছে, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের বিভাগের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রে উহাদের যে প্রকার সংজ্ঞা আছে, মহাভারতের সংজ্ঞাও তদনুরূপ। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় দেখাইয়া দিয়াছেন, যে মহাভারতে 'প্রয়োজনে'র যে সংজ্ঞা আছে, তাহা গৌতমের সূত্রের অনুরূপ। গৌতম হইতে উদ্ধৃত সূত্রটি এইরূপ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ;—"যং অর্থং অধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্"। "নির্ণয়" কথাটির সংজ্ঞাও গৌতমসূত্রের অনুরূপ। "ন্যায়" শব্দটি মহাভারতে সাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত আছে, এবং বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র অর্থেও উল্লিখিত আছে। (আদি, ৭০অ, ৪২ ; শান্তি, ১৯ অ, ১৮ ; ঐ ২১০ অ, ২২)। শান্তিপর্ব্বের ১৮ অধ্যায়ে আত্মায় ইচ্ছাদি আরোপিত হইবার মতটি সুস্পষ্টভাবে ন্যায়দর্শনের মত, ইহা দর্শনজ্ঞ সমালোচকেরা বলিয়াছেন।

৫। পূর্ব্বশাস্ত্র বা পূর্ব্বমীমাংসায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ ও প্রয়োজন প্রদর্শিত আছে। শান্তিপর্ব্বের ১৯ অধ্যায়ে যেখানে হেতুমন্তা নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা করা হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও পূর্ব্বশাস্ত্রের বিরোধী বলা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বমীমাংসার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

৬। অনুশাসনপর্ব্বে সূত্রকার ও সূত্রাদির কথা অনেকবার উল্লিখিত আছে। গীতায় স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্রের নাম রহিয়াছে। কিন্তু গীতা মহাভারত-সংহিতা রচিত হইবার পরে মহাভারতে সংযুক্ত বলিয়া, গীতার উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য করিব না। মহাভারতে বেদান্তের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত দেখিতে পাই। কিন্তু উহাতে ব্রহ্মসূত্র সূচিত হয়, সাহস করিয়া এরূপ বলিতে পারা যায় না। গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ে ও মূল মহাভারতে বেদান্ত-শব্দে উপনিষদ গ্রন্থগুলি বুঝায়, এমন প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। শাস্ত্রাদির কথা বিশেষ করিয়া শান্তিপর্ব্বেই বলিবার সুবিধা হইয়াছে ; ঐ শান্তিপর্ব্বে বেদান্তশব্দ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদ-গ্রন্থাবলী ব্যতীত স্বতন্ত্র একখানি জ্ঞানশাস্ত্রই সূচিত হয়। (শান্তি, ৩০২ অ, ৭১ ; বঙ্গবাসী সং ৩০১ অধ্যায়)।

বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিনা ভাষ্যে বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য আছে, রামানুজের ভাষ্য আছে, এবং বেদান্তের

নামে আরও কত প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। কাজেই মূল বেদান্তসূত্র ঠিক কি অর্থ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হয় ত আর বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। মহাভারতে বেদান্ত-তত্ত্ব বলিয়া যাহা উক্ত আছে, তাহার সহিত শঙ্করভাষ্যের মিল নাই। মহাভারতের স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা পাই, তাহাই কি আদিম অর্থ?

মহাভারতের দার্শনিকতত্ত্বে মানব-আত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র; মানব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য; মানব মুক্তি বা সদ্‌গতির প্রার্থী, এবং ব্রহ্ম করুণা করিয়া তাহার বিধান করেন। আপনার আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিনিয়া বা অনুভব করিয়া লইবার অর্থ মুক্তি নহে। ঈশ্বরের করুণা হইলেই মানব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। "যস্য প্রসাদং কুরুতে, স বৈ তং দ্রষ্টুম্" ইতি (শান্তি ৩৩৭, ২০)। গীতায়ও কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। সাংখ্যের মুক্তি "কেবলত্বং"; প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে "অস্তিত্বং কেবলং", তাহাই মুক্তি। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে একতা লাভ করিয়া নহে। স্বতন্ত্র হইয়া অস্তিত্বমাত্রলাভই এই কেবলত্ব। যোগশাস্ত্রেও মানব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রণিধান দ্বারা মনুষ্যের বা আত্মার যে যোগপরিচর্য্যা, তাহারই ফলে কৈবল্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কুত্রাপি ঈশ্বর ও মনুষ্যের আত্মা এক বলিয়া কথিত হয় নাই, অথচ ঈশ্বরপ্রণিধানের কথা, শক্তিলাভের কথা ও মুক্তিলাভের কথা আছে। সকল প্রকার লক্ষ্যহীন গুণাদিশূন্য হইয়া আপনার আত্মাতে আপনার অবস্থিতিই কৈবল্য বা Isolation মুক্তি। "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি"।

সংসার বা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, উহা আমার স্বীয় মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তিমাত্র, আমার মন ছাড়া উহার অস্তিত্ব নাই; অতএব মায়াময় আমিই বিকৃত ব্রহ্ম, বা ঈশ্বর, বা জগৎস্রষ্টা; এ তত্ত্ব মহাভারতে নাই। এই দর্শনটা বৌদ্ধদের দর্শনের উপর কেবল "আত্মা" জুড়িয়া লওয়া মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের এই বেদান্তদর্শন, শঙ্করের নিজের নূতন দর্শনশাস্ত্র। এই জন্যই এ দেশের অনেক প্রাচীন পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন।

মহাভারতের দর্শনে ঈশ্বর মায়ামুক্ত, এবং সেই মায়াতীত ব্রহ্মই সকল পদার্থের স্রষ্টা। "সর্ব্বভূতান্যুপাদায় তপসশ্চরণায় হি। আদি কর্ত্তা স ভূতানাং তমেবাহুঃ প্রজাপতিম্॥" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়েও গোবিন্দকে সর্ব্বভূতের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টা, মহাভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত

মহাভারতে যে "মায়া" পাওয়া যায়, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মায়া নহে। মায়া কথাটা সাধারণ ভ্রান্তি, ছল, ছদ্ম প্রভৃতি অর্থে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। ঈশ্বর মায়া অবলম্বন করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন; মায়া করিয়া যে জিনিসটি যেমন নয়, তেমনই করিয়া দেখাইলেন; মায়া করিয়া শত্রুবধ করিলেন; ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মায়াটা যেন ঠিক যাদুকরের ভেল্কী। (উদ্যোগপর্ব্ব, ১৬০ অ; বঙ্গবাসী ১৫৯, ৫৪-৫৮; এবং দ্রোণপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়, ইত্যাদি)

দ্রৌপদী বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, ঈশ্বর তাঁহার মনকে মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়া (মোহয়িত্বা), কার্য্যক্ষমতাহীন করিয়াছেন। মানুষ যাহা করিতে চাহে, ঈশ্বর তাহা (ছদ্ম কৃত্বা) অন্যরূপ ঘটাইয়া দেন। বালকেরা যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, ঈশ্বর তেমনই মনুষ্য লইয়া খেলা করেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এমন কথা বলিও না; কেন না, ঈশ্বরের করুণাতেই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে।" (৩১ অ—৪২)। যুধিষ্ঠিরের বিবেচনায় এ সকল "দেবগুহ্যানি"; কেন না, "গূঢ়মায়া হি দেবতাঃ" (৩১ অ, ৩৫—৩৭)।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এবং মায়া কথাটার প্রথমপ্রদর্শিত অর্থই সূচিত হয়।

গীতা মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ হইলেও, উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই জন্য ঐ গ্রন্থের শঙ্করভাষ্য গ্রহণ করা উচিত নহে বলিয়া অনেক পণ্ডিত অভিমতি দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে এখানে অধিক কথা বলা চলে না।

মহাভারতে যে পাশুপত (শৈব) এবং ভাগবত (বৈষ্ণব) মত বিবৃত আছে, তাহাতেও ঈশ্বর ও মনুষ্য স্বতন্ত্র; এবং ঈশ্বর উপাস্য ও মুক্তিদাতা, আর মনুষ্য উপাসক ও মুক্তিপ্রার্থী।

পরবর্ত্তী যুগেও সুপণ্ডিত কবিরা আমি ও ঈশ্বর এক বলিয়া বেদান্তের তত্ত্ব বুঝেন নাই। "বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং" ইত্যাদি শ্লোকে মুমুক্ষু ব্যক্তি যোগ-বলে আপনার আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিয়া মুক্তিলাভ করিতে চাহিতেছেন। শঙ্করের অর্থ প্রচলিত থাকিলে, বলিতে পারা যাইত যে, বেদান্তে যাহাকে আমি হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন, এবং যথার্থ জ্ঞান হইলে যাহাকে আমি বলিয়া বুঝিয়া খালাস পাই, ইত্যাদি কথা থাকিত। পূজ্য-পূজক ভাব থাকিত না। "ব্যাপ্য স্থিতং" কথাও থাকিতে পারিত না। কারণ, ঐ সকল শব্দ দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্ট আত্মার পার্থক্য বুঝায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

সিংহলে।

অনুরাধপুর।

এই ত সেই ভারতবর্ষ; সেই অরণ্য; সেই জঙ্গল।

দিনের অভ্যুদয়ে, শাখা-পল্লবময়, তৃণ-গুল্মময় একটি নূতন জগৎ যেন আমার সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইল। চির-হরিতের অসীম সমুদ্র, অনন্ত রহস্য, অনন্ত নিস্তব্ধতা দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার পদতলে প্রসারিত হইল।

সাগর-সম্ভূত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের ন্যায়, ধরণী-সমুত্থিত এই ক্ষুদ্র শৈল-শিখর হইতে, আমি এই হরিতের নীরব অসীমতা সন্দর্শন করিতেছি। এই সেই মেঘাম্বরা ভারতভূমি, অরণ্য-সঙ্কুলা ভারতভূমি—জঙ্গলাকীর্ণা ভারতভূমি; সিংহল মহাদ্বীপের কেন্দ্রবর্ত্তী এই সেই স্থান, যেখানে গভীর শান্তি বিরাজিত,—যাহা তরুশাখার দুর্মোচনীয় জটিল বন্ধন-জালে সর্ব্বদাই সুরক্ষিত। এই সেই স্থান, যেখানে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরাবধি, অনুরাধপুর নামক একটি পরমাশ্চর্য্য নগর, ঘননিবিড় শাখাপল্লবের নৈশ-অন্ধকারের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

বৃষ্টি-ঝটিকার উদ্ভব-ক্ষেত্র সেই নীলাকাশ ভেদ করিয়া দিবার অভ্যুদয় হইতেছে। এই সময়ে আমাদের ফরাসীদেশে দ্বিপ্রহর রাত্রি। ধরণী পুরন্ধ্রী, সূর্য্যালোকের সাহায্যে, সেই ধ্বংস-রাজ্যের চিত্রটি আর একবার আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সেই ধ্বংসরাজ্য, যাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

এখন সেই অদ্ভুত নগরটি কোথায়? * * * জাহাজের মাস্তুল-মঞ্চ হইতে বৈচিত্র্যহীন সাগর-মণ্ডল যেরূপ দৃষ্ট হয়, আমি সেইরূপ এখান হইতে চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি;—কুত্রাপি মনুষ্যের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইতেছি না। কেবলই গাছ—গাছ—গাছ। গাছের মাথাগুলি সারি সারি চলিয়াছে—সব এক সমান—সব প্রকাণ্ড। সেই তরুপুঞ্জের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, সীমাহীন দূরদিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। ঐ অদূরে কতকগুলি হ্রদ দেখা যাইতেছে, যেখানে কুম্ভীরগণের একাধিপত্য, এবং যেখানে সায়ংকালে বন্যহস্তিগণ দলে দলে আসিয়া, জলপান

---

* পিয়ের-লোটি-কৃত।

করে। ঐ সেই অরণ্য—ঐ সেই জঙ্গল, যেখান হইতে বিহঙ্গগণের প্রাভাতিক আহ্বান-সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া আমার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই পরমাশ্চর্য্য নগরটির চিহ্নমাত্রও কি আর দেখিতে পাইব না? * * *

কিন্তু এ কি দেখি?—কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়—অতীব অদ্ভুত, তরু-সমাচ্ছন্ন, অরণ্যের ন্যায় হরিৎবর্ণ—কিন্তু একটু যেন বেশী সুষমা-বিশিষ্ট—কোনটা বা পিরামিডের ন্যায় চূড়াকার, কোনটা বা গম্বুজাকার—ইতস্ততঃ সমুত্থিত; আর সমস্ত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পল্লবপুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

* * * এইগুলি পুরাতন মন্দিরসমূহের চূড়াদেশ—প্রকাণ্ড "দাগোবা"। খৃষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এইগুলি নির্ম্মিত হয়। অরণ্য ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই—স্বকীয় হরিৎ-শ্যামল শব-বসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র;—উহাদের উপর অল্পে অল্পে, মৃত্তিকা, শিকড়, ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম ও কপিবৃন্দ ক্রমশঃ আনিয়া ফেলিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে যেখানে ভক্তগণ আরাধনাদি করিত, এই "দাগোবা"-গুলি তাহারই মুখ্য নিদর্শন; সেই স্থান—সেই পুণ্য নগরীটি আমার নিম্নদেশে পল্লব-মণ্ডপ-তলে প্রচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

আমি যে ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহাও একটি পবিত্র দাগোবা। যিনি যীশুর ভ্রাতা ও অগ্রদূত, সেই মহাপুরুষের লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ, তাঁহার মহিমার উদ্দেশেই, এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে। প্রস্তর-খোদিত কতিপয় হস্তী ও পুরাকালীন দেবমণ্ডলী ইহার তলদেশ রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে, প্রতিদিনই এখানে ধর্ম্মসঙ্গীতের কলধ্বনি শ্রুত হইত; এবং উহাই তখন প্রার্থনা ও আরাধনার শান্তিময় আনন্দাশ্রম ছিল।

"অনুরাধপুরে অসংখ্য দেবালয়, অসংখ্য অট্টালিকা। উহাদের গম্বুজ, উহাদের মণ্ডপ সকল সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত। রাজপথে, ধনুর্ব্বাণধারী এক দল সৈন্য; গজ অশ্ব রথ, লক্ষ লক্ষ মনুষ্য, অবিরত যাতায়াত করিতেছে। তাহার মধ্যে বাজিকর আছে, নর্ত্তক আছে, বিভিন্ন দেশের বাদক আছে। এই বাদকদিগের ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত।"

কিন্তু এখন এখানে কেবলই নিস্তব্ধতা, তিমির-ছায়া, হরিৎময়ী রজনীর পূর্ণ আবির্ভাব। মানুষ চলিয়া গিয়াছে, অরণ্য ইহার চারি দিক বেষ্টন করিয়াছে।

পৃথিবীর সুদূর অতীতে, সেই আদিম মহারণ্যের উপর যেরূপ প্রশান্তভাবে প্রভাতের অভ্যুদয় হইত, এই সদ্যোবিনষ্ট নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর এক্ষণে সেইরূপ প্রশান্ত প্রভাত সমুদিত।

* * * *

ভারত-মহাদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, সিংহল দ্বীপের কোন সদাশয় পরম-কৃপালু মহারাজার নিকট হইতে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আমাকে কিছুদিন এখানে থাকিতে হইল। আমি তাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়া থাকিব, এইরূপ কথা ছিল। যতদিন না সেই উত্তর পাই, ততদিন এই স্থানেই থাকিব, স্থির করিলাম; কেন না, উপকূলবর্ত্তী সার্ব্বজাতিক নগরগুলির প্রতি আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণা।

যে পথটি ধরিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার আলোচনা ও উদ্যোগ-আয়োজন অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল। এই স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্য উপ-ভোগের পক্ষে এই পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল।

"কান্দি" হইতে পূর্ব্বাহ্নেই ছাড়িতে হইল। এই কান্দি নগর প্রাচীন সিংহল-রাজদিগের রাজধানী ছিল। যাত্রার আরম্ভভাগে, সুপারি-নারিকেল-ভূয়িষ্ঠ প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। বিষুব-রেখাবর্ত্তি-প্রদেশ-সুলভ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য আমার সম্মুখে এক্ষণে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহার পর অপরাহ্নে, দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল। নারিকেল ও সুপারির প্রসারিত শাখা-পক্ষরাজি অল্পে অল্পে দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হইল। আমরা এইক্ষণে নাতি-উষ্ণ-প্রদেশ-সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখানকার অরণ্য, অনেকটা অস্মদ্দেশের অরণ্যের ন্যায়।

অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টির জল উষ্ণ ও সুরভিত; ভিজা মাটির রাস্তা দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ডাক-গাড়ীটি চলিয়াছে; প্রায় প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদ্‌লি হইতেছে; আমরা ঘোড়াদের ইচ্ছামত চলিয়াছি। ঘোড়া চার-পা তুলিয়া ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে লাথিও ছুঁড়িতেছে। অনেকবার গাড়ী হইতে আমাদিগকে লাফাইয়া পড়িতে হইয়াছে, দুই একটা "অ-ভাঙ্গা" বুনো ঘোড়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলিতে উদ্যত;—উহারা গাড়ী টানার কাজে সবেমাত্র শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছে। এই দুষ্ট ঘোড়াদের ক্রমাগত বদ্‌লি করা হইতেছে; ইহাদের চালাইবার জন্য দুই জন ভারতবাসী নিযুক্ত। এক জন রাশ ধরিয়া থাকে, আর এক জন তেমন তেমন বিপদ উপস্থিত হইলে, ঘোড়ার মাথার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তত। আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, সে ভেঁপু বাজায়; ভেঁপু বাজাইয়া শ্লথ-গতি গরুরগাড়ীগুলাকে পথ হইতে সরাইয়া দেয়; অথবা,

নারিকেল-কুঞ্জ-প্রচ্ছন্ন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যখন গাড়ী চলে, তখন গ্রামবাসী-দিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। আট ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায়, আমাদের ক্রমাগত বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে, গ্রামের বিরলতা ও অরণ্যের নিবিড়তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, এক দল মানুষ যাইতেছে, দেখিয়াছিলাম। মহাশক্তিমান তরুকুঞ্জের মধ্যে উহারা কি ক্ষুদ্র!—উহারা যেন তাহাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভেঁপুওয়ালার কোন কাজ নাই। লোক নাই ত কাহার জন্য ভেঁপু বাজাইবে?

তালজাতীয় তরুগণ এইবার স্পষ্টরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। দিবাবসান-সময়ে যাত্রা আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন, এই অনন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে আমাদের য়ুরোপীয় পল্লীগ্রামের কোন বিজন বনময় প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে, এখানকার অরণ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলায়তন, এবং ইহার লতা-গুল্ম-বন্ধন-জাল আরও জটিলতর। কিন্তু সময়ে-সময়ে যখন শেয়ালকাঁটার গাছ দেখিতে পাই, সরোবরে রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত দেখি, কিংবা যখন দেখি,—একটি অপূর্ব্ব প্রজাপতি আমার যাত্রা-পথের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, আর বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্গের কোন একটি পাখী তাহার অনুসরণ করিতেছে, তখন আবার বিদেশভূমিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার, আমাদেরই সেই পল্লীগ্রাম, আমাদেরই সেই অরণ্যভূমি—এইরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয়।

সূর্য্যাস্তের পর, গ্রাম পল্লী আর দেখা যায় না, মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কবোষ্ণ বৃষ্টিজলের স্নেহ-স্পর্শ উপভোগ করিতে করিতে, গভীর অরণ্যের অফুরন্ত পথ দিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। চারি দিকেই গভীর নিস্তব্ধতা।

ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নিস্তব্ধতাকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া কীট-সঙ্গীত সমুত্থিত হইল। আর্দ্র অরণ্য-ভূমির উপর সহস্র সহস্র ঝিল্লীর পক্ষ-স্পন্দন-জনিত অনুরণন-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর আরম্ভকাল হইতে প্রতিরাত্রিই এই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। * * *

ক্রমে ঘনঘোর অন্ধকার; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। ক্রমে চারি দিকের দৃশ্য ঘোরতর গম্ভীরভাব ধারণ করিল। লতাবন্ধন-জালে আপাদ-জড়িত দুই সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমরা

চলিয়াছি। নগর-উপবনে যেরূপ একজাতীয় বড়-বড় বৃক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ বৃক্ষ একটার পর একটা আসিতেছে—তাহার আর শেষ নাই।

কতকগুলি স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ পশু অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তাহারা আমাদের পথরোধ করিয়াছিল। এই বুনো গরুগুলা নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ; চীৎকার শব্দ করিয়া দুই চারিবার চাবুক আস্ফালন করিবামাত্রই উহারা ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল। আবার পথের সেই বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা; আবার সেই নিস্তব্ধতা—যাহা কেবল ঝিল্লীর আনন্দ-রবে মুখরিত।

অরণ্যের এই মহা-নিস্তব্ধতার মধ্যে, নৈশজীবনের স্পন্দন ও বিকাশ বেশ অনুভব করা যায়। এই অরণ্য কত শত মৃগের বিচরণভূমি;—কেহ বা শত্রুভয়ে সতর্ক হইয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, কেহ বা আহার-অন্বেষণে প্রবৃত্ত। একটু ছায়া নড়িলেই না জানি কত মৃগের কান খাড়া হইয়া উঠে—কত মৃগের চক্ষু-তারা বিস্ফারিত হয়। * * * এই রহস্যময় বনপথটি বরাবর সিধা চলিয়াছে; ইহা ম্লান ধূসর-বর্ণ, আর ইহার দুইধারে কৃষ্ণবর্ণ তরু-প্রাচীর। উহার সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে যোজন-ব্যাপী দুর্ভেদ্য জটিল শাখাজাল বিস্তৃত হইয়া অরণ্য-ভূমিকে কিরূপ পীড়ন করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রজনীর অন্ধকারে আমাদের চক্ষু এখন অভ্যস্ত হইয়াছে; তাই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট কখন-কখন দেখিতে পাই, ইঁদুর-জাতীয় একপ্রকার জীব মখ্‌মল-কোমল-পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াই আবার অন্তর্হিত হইতেছে।

অবশেষে প্রায় ১১টার সময় দেখা গেল, স্থানে স্থানে অল্প অল্প আগুন জ্বলিতেছে, ভগ্নাবশেষের দীর্ঘায়তন গুরুভার প্রস্তর-ফলকসমূহ পথের দুইধারে বিকীর্ণ; এবং গাছের মাথা ছাড়াইয়া, দাগোবা-সমূহের প্রকাণ্ড ছায়া-চিত্র আকাশ-পটে অঙ্কিত। এগুলি যে পর্ব্বত নয়—ভূগর্ভনিহিত নগরের মন্দির-চূড়ামাত্র—তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম।

আজ রাত্রে, এইখানকার একটি কুটীরে আশ্রয় লইলাম। নন্দন-কাননের ন্যায় সুন্দর একটি ক্ষুদ্র বাগানে এই কুটীরটি অবস্থিত। যাইবার সময় ল্যাণ্ঠানের আলোকে দেখিতে পাইলাম, ফুল ফুটিয়াছে।

* * * *

এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। আমি যে স্থানে আছি, তাহার নীচে, অরণ্যের মধ্যে বিহঙ্গগণের জাগরণ-কোলাহল শুনিতেছি। আমি এই মন্দির-চূড়ার উপরে, জঙ্গল-সুলভ তৃণ-গুল্মে পরিবেষ্টিত। আমি আসিয়া চামচিকাদিগের শান্তিভঙ্গ

করিয়াছি—তাহারা এক্ষণে প্রভাতের আলোকে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ধ্বংস-স্থানেরই জীব; ইহাদের ডানাগুলা ছাইরঙ্গের। আর, কতকগুলি কাঠবিড়ালী তরুপল্লবের অন্তরাল হইতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে; উহাদের কি চটুলতা! কি শোভন গতিভঙ্গি! বড়-বড় গাছগুলা এই মৃত নগরের শবাচ্ছাদনরূপে বিরাজমান। কিন্তু উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ, আমার পাদ-দেশে, বসন্তোৎসবের সাজসজ্জায় সুসজ্জিত;—রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, গোলাপী বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সকল সুন্দর পুষ্পিত তরুশিরের উপর পর্জ্জন্য-দেব তাড়াতাড়ি এক-পস্‌লা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াই দূরত্বের করাল-গর্ভে মিলাইয়া গেলেন। কিন্তু প্রচণ্ড সূর্য্য শীঘ্রই আবার মেঘ ও বৃষ্টির পশ্চাতে উদিত হইয়া আমার মস্তককে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। যেখানে কতকগুলি মনুষ্যের বসতি আছে,—সেই অরণ্যের নিম্নস্থ একটি ছায়াময় প্রদেশে—হরিৎ-শ্যামল রাজ্যের মধ্যে এইবার আমরা প্রবেশ করিব। এখানকার একটি শাখা-সোপান দিয়া আমি নীচে নামিতেছি।

* * * *

নীচে, লোহিত মৃত্তিকার মধ্যে, আঁকা-বাঁকা সর্পের মত অদ্ভুতাকার শিকড়-জালের মধ্যে, এই ধ্বংস-জগৎটি অবস্থিত। ধ্বংসাবশেষের ভাঙ্গাচুরা দ্রব্য সকল বিশৃঙ্খলভাবে এক স্থানে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে।

শত শত দেবতার ভগ্ন প্রতিমা, প্রস্তরময় হস্তী, যজ্ঞবেদিকা, কল্পনা-প্রসূত কত কি মূর্ত্তি—সেই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালা-বার-প্রদেশবাসী আক্রমণকারীরা এই সুন্দর নগরটিকে ভূমিসাৎ করে।

এই সকল দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজার্হ, সেই সমস্ত, একালের বৌদ্ধেরা, অবিনশ্বর দাগোবার চারিধার হইতে ভক্তিভাবে সযত্নে কুড়াইয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন-মন্দিরের সোপান-ধাপের দুইধারে পুরাতন দেবতাদিগের ভগ্ন প্রতিমাগুলি সারি-সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে পুরাতন যজ্ঞবেদিকা-গুলি বিলুপ্তমুখশ্রী ও অঙ্গহীন হইলেও, তাঁহাদেরই যত্নে কোন প্রকারে ভূমির উপর খাড়া রহিয়াছে। এখনও ভক্ত বৌদ্ধেরা ভক্তিসহকারে প্রতিদিন প্রাতে এই বেদীগুলি সুন্দর ফুল দিয়া সজ্জিত করে, এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। তাহাদিগের চক্ষে অনুরাধপুর পুণ্যতীর্থ; অনেক দূর হইতে যাত্রিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হয়, এবং শান্তিময় তরু-ছায়াতলে বাস করিয়া পূজা অর্চ্চনা করে।

গুরুভার প্রস্তর-ফলক-সমূহ সারি সারি পড়িয়া রহিয়াছে; মন্দিরচূড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্তম্ভশ্রেণীগুলি ক্রমশঃ বনের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে;—এই সমস্ত নিদর্শনের দ্বারা সুবৃহৎ ভজনা-শালার আয়তন ও রচনা-প্রণালী কতকটা অনুমান করা যায়। অসংখ্য বহির্দ্দালান পার হইয়া তবে সেই ভজনা-শালায় উপনীত হওয়া যায়। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেবতারা ঐ দালানগুলির রক্ষিরূপে অবস্থিত। দেবতাদের এই পাষাণ-প্রতিমাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও শত শত ভগ্ন চূর্ণ মন্দির ও প্রাসাদের চিহ্ন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। বৃক্ষকাণ্ডের সহিত অসংখ্য প্রস্তর-স্তম্ভ এই অরণ্য-গর্ভে নিহিত; এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে আবার সেই অনন্ত অসীম হরিৎ-রাজ্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

অস্মৎ-যুগের প্রারম্ভে, রাজকুমারী—"সঙ্ঘমিত্তা", যিনি একজন মহাযোগিনী ছিলেন—তিনি মহাবোধি-বৃক্ষের একটি শাখা—(যাহার তলায় বসিয়া বুদ্ধদেব বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন) ভারতের উত্তর-খণ্ড হইতে আনাইয়া এইখানে রোপণ করিয়াছিলেন। সেই শাখাটি এক্ষণে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; এবং বটবৃক্ষের নিয়মানুসারে তাহার শাখা প্রশাখা হইতে অসংখ্য শিকড় নামিয়াছে। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে পুরাতন বেদিকাসমূহ স্থাপিত; তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূজা-প্রদীপ দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে, এবং নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম বিকীর্ণ রহিয়াছে। প্রতিদিনই এইখানে টাট্‌কা ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

যখন দেখি, এই অরণ্যের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বারপথগুলি সাদা মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত ও ভাস্করের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যে আচ্ছন্ন; যখন দেখি, স্বাগত-স্মিতমুখে দেবতারা কত কত সোপান-ধাপের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; যখন দেখি, এই দ্বারপথগুলি দিয়া কোথাও উপনীত হওয়া যায় না, তখন মনোমধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

গৃহগুলি সম্ভবতঃ কাঠের ছিল। কিন্তু এত শতাব্দীর পর, তাহাদের কোন চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল সোপানের ধাপ ও দ্বারদেশগুলি রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই বিলাসময় সুসমৃদ্ধ দ্বারপথগুলি বরাবর প্রসারিত হইয়া গাছের শিকড়, লতা-গুল্ম ও মৃত্তিকায় গিয়া শেষ হইয়াছে।

কিয়ৎ বৎসর হইতে, অনুরাধপুরের এক কোণে, একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বসিয়াছে। সেখানে কতকগুলি লোক বাস করে। গ্রামটি তেমন বর্দ্ধিষ্ণু নয়—উহা একটি গোপ-পল্লী মাত্র। ভগ্নাবশেষ নগরটির ন্যায় এই গ্রামটিও তরুশাখায় আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানেও সেই বিষাদের রাজত্ব। যে সকল ভারতবাসী এই ধ্বংস-নগরে

আসিয়া আবার বাস করিতেছে, তাহারা অরণ্যের বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে ছেদন করে নাই; পরন্তু, আগাছা ও কণ্টক গুল্ম প্রভৃতি কাটিয়া সাফ্ করিয়া, দিব্য শাদ্বল-ভূমি বাহির করিয়াছে। সেখানে এখন তাহাদের গো মহিষ ছাগল প্রভৃতি পালিত পশুগণ ছায়াতলে সুখস্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়ায়। মন্দিরসংলগ্ন ভূমিতে বিচরণ করে বলিয়া সেখানকার লোকেরা ইহাদিগকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে।

যে সকল ভারতবাসী এই পবিত্র ভগ্নাবশেষের মধ্যে জীবনযাপন করে, এই সকল ভগ্নপ্রাসাদসংলগ্ন পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহাদের বিশ্বাস, রাজা ও রাজ-কুমারদের "ভূত" সন্ধ্যার সময় এখানকার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; এই জন্য তাহারা জোৎস্না-রাতে বড়-বড় দাগোবার ছায়াতলে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহে না।

তা ছাড়া, এই সুচ্ছায় স্থানটিকে তপস্যা ও ধ্যান ধারণার অনুকূল, পবিত্র আশ্রম বলিয়া উপলব্ধি হয়। দেবালয়-সুলভ একটি শান্তির ছায়া এই সকল পথের উপর, এই সকল গালিচা-বৎ তৃণভূমির উপর বিরাজমান। একজাতীয় বড়-বড় ফুল ইহার উপর বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তিদিগের সম্মুখে, অরণ্যের মধ্যে, ছোট-ছোট প্রদীপ অষ্ট প্রহর জ্বলিতেছে; বহু পুরাতন পাষাণের উপর টাট্কা ফুল প্রতিদিন নিত্য-নিয়মিত স্থাপিত হইতেছে—এই দৃশ্যটি কি মর্ম্মস্পর্শী!

ভারতবর্ষে, দেবতাদিগকে ফুলের তোড়া উৎসর্গ করা হয় না; পরন্তু যূথী জাতি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি শুভ্রবর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্পরাশি পূজা-বেদিকার উপর অজস্র বিকীর্ণ হইয়া থাকে,—তাহার উপর দুই-চারিটি বঙ্গদেশীয় গোলাপ ও রক্তজবাও ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই পূজোপহার ভগ্ন চূর্ণ মন্দিরের প্রস্তর-ফলকের উপর স্থাপিত হয়—যে প্রস্তরফলকগুলি ধীরে-ধীরে মৃত্তিকা-গর্ভে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারভুঁইয়া।

ইশা খাঁ।

বাঙ্গালার শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদের অবসানের পর যদিও মোগলেরা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাঠানেরা ও

অন্যান্য ভুঁইয়ারা প্রথমে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে পাঠান-বংশীয়েরা আপনাদিগের ক্ষমতাসঙ্কোচের কোনপ্রকার চেষ্টা করেন নাই। উক্ত পাঠান-বংশীয়গণের মধ্যে উড়িষ্যার কোতল খাঁ ও বঙ্গের ইশা খাঁই প্রধান। ইশা খাঁর পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম কালীদাস গজদানী। ইহারা বাইশ রাজপুত শ্রেণী। (১) হোসেন খাঁর রাজত্বসময়ে তিনি অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে মুসমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সালিমান খাঁ নামধারণ ও এক পাঠানরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের (২) অধীশ্বর হন। সেলিম খাঁ ও তাজখাঁ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় ইশা ও ইস্মাইল দাসরূপে বিক্রীত ও দূরদেশে নীত হন। (৩) সাউয়েসা নামে তাঁহার এক কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ইশা ও ইস্মাইল খাঁ পরে তাঁহাদের মাতুল কুতুবউদ্দীন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। ক্রমে ইশা আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতার বলে পূর্ব্ববঙ্গের ভুঁইয়া হইয়া উঠেন, এবং খিজিরপুর পরগণার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি হোসেনশাহ-বংশীয়া ফতেমা খানম নাম্নী কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের

---

(১) Elliot's History of India, also Blochman's Ain-i-Akbari.

(২) ভাটি সম্বন্ধে আকবরনামায় যাহা লিখিত আছে, ইলিয়টের ইতিহাসে তাহার এইরূপ মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে।—

"Bhati is the low-lying country and is called by that Hindi name, because it lies lower than Bengal. It extends nearly 400 kos from east to west, and nearly 300 from south to north. On the east lies the sea and the country of Jessore ; on the west lies the hillcountry south of Tanda ; on the north the Salt sea, and the extremities of the hills of Tibet."—*Elliot's History of India,* Vol. VI. ভাটির চতুঃসীমা-পাঠে নানারূপ গোলযোগ বোধ হয়, সেই জন্য বেভারিজ Tandaর স্থলে Landa ও Jessore এর স্থলে Jesa বলিতে চাহেন। লাণ্ডা রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে উড়িষ্যার সীমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জেসা আইন-আকবরীতে জয়ন্তীয়ার স্থলে লিখিত আছে।—*Journal of the A. S. of Bengal Vol. LXXIII. Pt I. No I.—1904—P. 62.* Grant সাহেব সুন্দরবন ও তন্নিকটস্থ নিম্নভূমি সকলকে ভাটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিজলীও উক্ত ভাটির অন্তর্গত ছিল।

(৩) বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ইশার পিতা হিন্দুই ছিলেন ; কারণ, মুসলমান-পুত্র দাসরূপে মুসলমান কর্ত্তৃক বিক্রীত হইত না।

একাধীশ্বর হইয়া অপর একাদশ জনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। (৪) ইশা খাঁ প্রথমতঃ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি করিমদাদ ও ইব্রাহিম প্রভৃতি আফগানগণের সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মোগল সুবেদার খাঁজেহান আর কতকগুলি আফগানের সাহায্যে ৯৮৬ হিজরী (১৫৭৮ খৃঃ অব্দে) ভাটি প্রদেশ অধিকার করেন। (৫) তাহার পর হইতে ইশা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-প্রকাশের চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ভাটি প্রদেশে উপস্থিত হন, এবং ইশার সাহায্য গ্রহণ করেন। আজিম খাঁর সুবেদারীর সময়ে তার্সন খাঁ মাশুম খাঁর দমনের জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিনি তাজপুরের দুর্গে বিপক্ষগণ কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, সাহাবাজ খাঁ কুম্বুর প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি তার্সন খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ১৫৮৫ খৃঃঅব্দে মাশুম খাঁর অনুসরণ করিয়া ইশার অধিকারে উপস্থিত হন, এবং মাশুমকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে বলিয়া পাঠান। ইশা সেই সময়ে কুচবিহার-অধিকারে গমন করিয়াছিলেন। (৬) সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরের নিকট নদীতীরস্থ দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁ প্রভৃতি হস্তগত করিলে, মাশুম একটি দ্বীপে আশ্রয় লয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি মাশুমকে প্রায় ধৃত করিয়াছিলেন,

---

(৪) "Isa by his intelligence and prudence, acquired a name, and he made twelve zemindars of Bengal to become his dependants."—*Elliot's History of India. Vol VI. Akbornama.* আকবরনামার বিবরণে বোধ হয়, যেন ইশা খাঁ বারভুঁইয়া হইতে পৃথক। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বারভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন।

(৫) Blochman's Ain-i-Akbari.

(৬) Gait সাহেব ১৮৯৩ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় Koc Kings of Kamrup নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও আকবর মিলিত হইয়া 'গৌড় পাশা'কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিলারায় পূর্ব্ব ও মানসিংহ পশ্চিম হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গেট সাহেব উক্ত গৌড় পাশাকে দায়ুদ শাহা বলিতে চাহেন। বেভারিজ তাঁহাকে ইশা খাঁ স্থির করেন। দায়ুদের সময়ে মানসিংহ আসেন নাই। অধিকন্তু ইশা কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরোধী পাটকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। ইশার সহিত কোচবিহার-রাজের যে বিবাদ ঘটিত, শাহাবাদ খাঁর সময়ে ইশার কোচবিহার হইতে প্রত্যাগমন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু সহসা ইশা কুচবিহার হইতে অনেক সৈন্য ও রসদ লইয়া উপস্থিত হইয়া মাশুমের সাহায্যে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহী সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারা জলপথ ও স্থলপথ উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হয়। তার্সন খাঁ মাশুম খাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া হত হইলে, সাহাবাজ খাঁ বিপক্ষগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। ইশা খাঁ প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সাত মাস ব্যাপী যুদ্ধের পর বাদশাহী সৈন্যেরা জয়লাভ করিলে বিদ্রোহীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে ওমরাদিগের সহিত সাহাবাজ খাঁর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, বিপক্ষগণ ১৫ স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায়, বাদশাহীসৈন্যশিবির জলে প্লাবিত হইয়া যায়। পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণের নেতা বন্দুকের গুলিতে হত হয়। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

ইশা সুযোগ বুঝিয়া বন্দী হোসেনের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সাহাবাজ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সন্ধিতে এইরূপ স্থির হয় যে, ইশা বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিবেন, সোনার গাঁয়ে এক জন দারোগা নিযুক্ত হইবেন, এবং মাশুম মক্কায় গমন করিবেন; বাদশাহের নিকট রীতিমত কর প্রেরিত হইবে। ইহার পর বাদশাহী সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিলে ইশা খাঁ পুনর্ব্বার নূতন প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সুতরাং আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁর সহিত ওমরাগণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হন। পরে আগরায় যাইবার ইচ্ছা করিলে বাদশাহ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সৈয়দ খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। অবশেষে তাঁহারা পুনর্ব্বার ভাটির দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইশা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; তিনি নিজে স্বরাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মাশুমকে সেরপুরের অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলে, মাশুম তথা হইতে ভাটি, পরে উড়িষ্যার অভিমুখে পলায়ন করে। বাদশাহী সৈন্যেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ত্রিবেণীতে তাহাকে পরাস্ত করে। এই সময়ে ইশা কিছু দিনের জন্য শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে ওয়াজির খাঁর হস্তে বাঙ্গলার শাসনের ভার প্রদান করিয়া সাহাবাজ বিহারের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ওয়াজির একাকী বাঙ্গলার বিদ্রোহদমনে

অশক্ত হইলে, বাদশাহ সাহাবাজ খাঁকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় যাইতে আদেশ দেন। সেই সময়ে ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে ইশাঁও পুনর্ব্বার স্বাধীনতা-অবলম্বনের প্রয়াস পান। এক দল বাদশাহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদশাহ-দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাশুমও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর কিছু দিনের জন্য বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর মানসিংহের সুবেদারীর সময়েও ইশা আপনার প্রভুত্ববিস্তারের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সহিত নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ পরাস্ত ও হত হইয়াছিলেন। ১০০৮ হিজরী বা ১৫৯৯—১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১) তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের পাঠানেরা শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। (২) আমরা ইতিহাস হইতে ইশা খাঁ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তিনি শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের কন্যা সোনাই বা স্বর্ণময়ীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণময়ী পরে সোনা বিবি নামে অভিহিত হন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য শ্রীপুর, ত্রিপুরা ও আরাকাণের অধিপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে মগদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ তাঁহার অধিকারস্থ এগারসিন্দুর দুর্গ অধিকার করিলে, ইশা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। মানসিংহ নিজে যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া স্বীয় জামাতাকে প্রেরণ করেন। জামাতা যুদ্ধে হত হইলে ইশা খাঁ তাহা জানিতে পারেন। পরে তিনি মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় শিবিরে চলিয়া যান। মানসিংহ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া যায়; ইশা তাঁহাকে স্বীয় তরবারিপ্রদানের ইচ্ছা করিলে মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, ইশাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হন। মানসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ইশাকে বন্দী না করায় মানসিংহের অনুচরেরা ও তাঁহার রাণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অনন্তর ইশা মানসিংহের

(১) Elliot's History. vol. VI. Inayatulla's Takmilla-i-Akbar-namar মতে ১০০৭ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আকবরনামার মতে ১০০৮ হিজরী।

(২) Blochmann's Ain-i-Akbari.

অনুরোধে তাঁহার সহিত আগরায় গমন করেন। বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, পরে এগারসিন্দুর যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন; এবং দেওয়ান ও মসনদ আলি উপাধি ও অনেক পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। মানসিংহের জামাতৃবধের প্রবাদ সম্ভবতঃ তৎপুত্র দুর্জ্জন সিংহের নিধন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায় সবংশে নিহত হইলে, তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র রাঘব রায় বা কচুরায় পলায়ন করিয়া ইশা খাঁর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইশা খাঁকে রামরাম বসু হিজলীর মসনদ-আলি বলিয়াছেন। কিন্তু হিজলীতে ইশা খাঁ নামে কোনও মসনদআলি ছিলেন না। উক্ত ইশা খাঁ যে সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইশা খাঁ সমস্ত ভাটি বা সুন্দরবনের একাধীশ্বর হওয়ায় ও অন্যান্য ভুঁইয়ারাও তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করায়, তাঁহারই নিকট রাঘব রায়ের সাহায্যার্থ উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। আমরা প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত অলোচনা করিব। ইশা খাঁ যেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ মহানুভবও ছিলেন। ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হন। তিনি ইশা খাঁর মহত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সোনার গাঁ প্রদেশের অবস্থার বিষয়ও অনেকপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। (১) আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, খিজিরপুর পরগণা ইশা খাঁর জমীদারী ছিল। খিজিরপুর সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অনেক স্থানে আপনার

---

(১) "Sonargao is a town six legaues from Serripore where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India. The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all the other kings, and is a great friend to all christians. The houses here as they be in the most part of India, are very little and covered with strawe, and haye a fewe mats round about the walls. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh nor kill no beast. They live on rice milke and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked. Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, where with they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca, Sumatra, and many other places."—*Harlon Ryley's Ralph Fitch P. 118.*

অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কত্রাভূ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, তিনি বক্তারপুরে বাস করিতেন। (১) এই কত্রাভূ বা বক্তারপুর কোথায়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বেভারিজ সাহেব সাবারের নিকটস্থ ক্ষেতবাড়ীকে কত্রাভূ বলিতে চাহেন। খিজিরপুর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে বক্তারপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও অট্টালিকাদির চিহ্ন নাই। ইশার পুত্র দায়ুদও কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া মানসিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা ইশা খাঁ সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে তিন জন হিন্দু ভূঁইয়া সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

১৩১০ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ।

১৩১০ সালের ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" ১৩০৯ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার ১৩১০ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। এবারেও কোন পুস্তকের সমালোচনা করি নাই। তাহা প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নহে। প্রতিবর্ষে সাহিত্যের গতি ও পুষ্টি কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার আলোচনাই আমাদের অভিপ্রেত।

১৩০৯ সালের সাহিত্য-বিবরণে এ সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম, এই এক বৎসরে তাহার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহা বোধ করি সম্ভবও নহে। তথাপি, গত বর্ষের তুলনায় এ বর্ষে সাহিত্যের প্রবাহে যে যৎসামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই নির্দ্দেশ করিবে।

বাঙ্গলা সাহিত্য একপ্রকার স্থিতিশীল। ইহার গতি নাই বলিলেও চলে। গত বর্ষেও সাহিত্যের যে কয় বিভাগে যে ভাবের গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, এবারেও ঠিক সেই সেই বিভাগে তেমনই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং অনুমান করিতে হয়, বাঙ্গলা-গ্রন্থকারগণ নূতন বিষয় লইয়া পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত নহেন। অনুকরণ অনেক সময়ে উন্নতির পথ-প্রদর্শক বটে, কিন্তু অনেক স্থলে আবার ব্যর্থ অনুকরণচেষ্টায় উন্নতির গতি প্রতিহত হইয়া থাকে। উপকারী

(১) ইলিয়ট Katrapur বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া, অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সংশোধনের অবকাশ লক্ষ্য করিয়া নূতন নূতন বিষয়ের অনুকরণ করিলে, সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গালীসমাজে এ ভাবের অনুকরণ অত্যন্ত বিরল। সাহিত্যেও অনুকরণের সেই দুর্দ্দশা, তাহা না বলিলেও চলে।

কাব্য-নাটক-উপন্যাসের প্রণেতা বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক আছেন; দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যাও বাড়িতেছে; কিন্তু অনেকেই উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন না। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের ব্যর্থ অনুকরণেই অনেকে ব্যস্ত। সূক্ষ্ম-সমালোচকের সমালোচনার অস্ত্রে এই ভাব যত দিন না দূরীভূত হয়, ততদিন সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির আশা করা যায় না।

পরিষদের পুস্তকালয় আছে। সেই পুস্তকালয়ের বার্ষিক বিবরণও লিখিত হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস, পরিষৎ-পুস্তকালয়ের বিবরণের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। পরিষৎ-পুস্তকালয়ের যিনি গ্রন্থ-রক্ষক, তাঁহারই হস্তে, আমার মতে, এই বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ লিখিবার ভার থাকা উচিত।

এই বিবরণ সুসম্পন্ন করিবার পক্ষে যাহা প্রধান অন্তরায়, যাহার কথা আমি গত বৎসরেও উল্লেখ করিয়াছিলাম—অর্থাৎ নবপ্রচারিত সমস্ত পুস্তক দেখিবার উপায়ের অভাব—এবারেও সে বাধা অন্তরিত হয় নাই। গত বর্ষের ন্যায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ও সাময়িক পত্রাদির সমালোচনাস্তম্ভের বিবরণাদি ব্যতীত আর কোনও উপাদান আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

গতবর্ষে যে কারণে ১৩০৯ সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের পুস্তকাদির বিবরণ দিতে পারি নাই, এ বৎসরেও সেই কারণে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। গত বৎসরে নয় মাসের পুস্তকের বিবরণ দিয়াছিলাম; এ বৎসর গত বর্ষের অবশিষ্ট তিন মাসের বিবরণসহ বারো মাসের, অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০৩ সালের (পূর্ণ এক বৎসরের) বিবরণ দিব। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও আমি পুস্তক-গণনায় কেবল প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলিই ধরিয়াছি; একাধিক সংস্করণ, নূতন সংস্করণ, সংশোধিত সংস্করণ, বা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের পুস্তকাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। গত বারের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির পথে বিতরণীয় পুস্তিকাগুলি ও ধরি নাই।

এইরূপ গণনায় গত বৎসরে মোট ৭৫৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে,—

বিশুদ্ধ বিমিশ্র বাঙ্গলায়	৫৪৭	বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও ইংরাজীতে	১
মুসলমানী বাঙ্গলায়	১৯	বাঙ্গলা, উর্দ্দু, হিন্দী ও ইংরাজীতে	১
বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে	৭২	বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে	৭৬
বাঙ্গলা ও উড়িয়ায়	১	মুসলমানী বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও আরবীতে	১
বাঙ্গলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে	২	মুসলমানী বাঙ্গলা ও পারসীতে	৯
বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে	২০	মুসলমানী বাঙ্গলা ও আরবীতে	৩
বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসীতে	১	বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পালিতে	১
বাঙ্গলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে	১	মোট—৭৫৫ খানি পুস্তক	

প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিমিশ্র বাঙ্গলা, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী, এবং বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে প্রকাশিত ৭১৫ পুস্তকের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে,—

কলাবিদ্যায়	৩	চিকিৎসায়	২৫
জীবনচরিতে	১৭	দর্শনে	৬
নাটকাদিতে	৪২	কবিতায়	৮৫
উপন্যাসে	৫৯	ধর্ম্মবিষয়ে	৯০
ইতিহাস-ভূগোলে	১২	বিজ্ঞান বিষয়ে	৩৭
সাহিত্যে	১৫৯	বিবিধ বিষয়ে	১৭০
আইনে	৬	ভ্রমণ বিষয়ে	৪
		মোট ৭১৫ খানি	

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে,—

ইতিহাস ও ভূগোলের ১২ খানির মধ্যে	১১	বিজ্ঞানের ৩৭ খানির মধ্যে	৩৭
সাহিত্যের ১৫৯ খানির মধ্যে	১৫৯	বিবিধবিষয়ক ১৩২ খানির মধ্যে	৫৭
কবিতার ৮৩ খানির মধ্যে	১২	মোট ২৭৬ খানি	

স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। এই স্কুলপাঠ্য ২৭৬ খানি গ্রন্থ বাদ দিয়া যে ৪৭৯ খানি গ্রন্থ অবশিষ্ট থাকে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প। যাহা হউক, যে শ্রেণীতে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলির নাম ও তাহাদের রচয়িতার নাম উল্লিখিত হইতেছে।—

(ক) কলাবিদ্যা—এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রন্থই উল্লেখ যোগ্য।

১। পিয়ানো-হারমোনিয়ম-শিক্ষা — পার্ব্বতীচরণ দাস।
২। সূচী-শিল্প — মিসেস মেরী।
৩। সঙ্গীত-প্রবেশিকা — মুরারিমোহন গুপ্ত।

গত বৎসরে কলাবিদ্যায় কেবল তৌর্য্যত্রিক শিক্ষার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বৎসর অন্তর্বিধ কলা সম্বন্ধেও একখানি শিক্ষাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

সূচী-শিল্পের লেখিকা বিদেশিনী।—ভিন্নদেশীয়া মহিলারাও আমাদের মাতৃভাষায় গ্রন্থ লিখিতেছেন, এবং তাহা সূচী-শিল্পের শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয় বটে। মুরারিমোহন গুপ্তের গ্রন্থখানি বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত, ত্রিবিধ ভাষার মিশ্রণে লিখিত। সঙ্গীত-প্রবেশিকার রচয়িতা হিন্দু-সঙ্গীতের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। তিন সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে এক জন সুদক্ষ পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন। ইংরাজীতে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। অন্যান্য কলাবিদ্যা সম্বন্ধেও ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থের অভাব নাই। সে কালে ভারতবর্ষে এই সকল কলাবিদ্যার আদর ছিল। সেকালের চতুঃষষ্টিকলার বিবরণ তাহার নিদর্শন। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'। মৌলিক পুস্তক না হউক, ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়া ঐ সকল কলাবিদ্যার আলোচনা স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। মুরশিদাবাদ, কাশী ও কটক অঞ্চলে রেশমের বিস্তৃত কারবার আছে। রেশম রঞ্জিত করিবার নানাপ্রকার দেশীয় প্রথা আমাদের দেশে অদ্যাপি বিদ্যমান। যদি এই রঞ্জন-শিল্পের দেশীয় প্রথার বিবরণ সঙ্কলিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির প্রভূত উপকার হইতে পারে।

(খ)। জীবন-চরিত,—এই বিভাগের ১৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১২ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনচরিত	রেভঃ গিরিশচন্দ্র সেন।
২।	অদ্বৈতবিলাস	বীরেশ্বর প্রামাণিক।
৩।	আনন্দী বাঈ	সখারাম গণেশ দেউস্কর।
৪।	ওমর-চরিত	মৌঃ আলাউদ্দীন আহম্মদ।
৫।	বিশ্বাসী সাধক গিরীন্দ্রনাথ রায়	রেভঃ গিরিশচন্দ্র সেন।
৬।	স্বর্গীয় মহাত্মা রামচরণ বসুর জীবনচরিত	ষোড়শীবালা দাসী।
৭।	ঝান্সীর রাণী	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮।	মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র	নবকৃষ্ণ ঘোষ।
৯।	বীরাঙ্গনা	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
১০।	মহর্ষির আত্মজীবনচরিত	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১।	শঙ্করাচার্য্য-চরিত	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
১২।	৺রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত ও বাঙ্গালী সমাজ	শিবনাথ শাস্ত্রী এম্‌. এ.
১৩।	দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত	কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

এতদ্ব্যতীত "বিশ্বজীবন" নামক চরিতাবলী-প্রকাশক খণ্ডশঃপ্রকাশ্য সাময়িক পুস্তকে উইলিয়ম কেরী নামক বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম ইংরাজ বন্ধুর জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইতেছে। উল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রথম দুইখানি ও চতুর্থখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ঝান্সীর রাণীতে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু কতক নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। গত বারের উল্লিখিত ৺পিয়ারীচরণ সরকারের জীবনচরিতের প্রণেতা নবকৃষ্ণ বাবু এ বৎসর আবার আর এক জন ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মবীরের জীবনচরিত সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। রেভারেণ্ড গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় অনেকগুলি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। সখারাম বাবুর লিখিত আনন্দীবাঈ-এর জীবনবৃত্তে মহারাষ্ট্রমহিলার কর্ম্মজীবনের সুন্দর চিত্র আছে। শেষ গ্রন্থখানি, অর্থাৎ মহর্ষির আত্মজীবনচরিত শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ধর্ম্মময় জীবনের প্রথমাবস্থার স্বলিখিত ইতিহাস। নিজের জীবনের ঘটনা নিজে বিবৃত করিবার প্রথা এ দেশে নূতন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং নিজের জীবনচরিত লিখিবার সূত্রপাত মাত্র করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। মহর্ষির জীবনের ইতিহাসও অসম্পূর্ণ।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়ের আত্মজীবনচরিত লইয়া আমরা এই সাহিত্যে দুইখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাইলাম।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের শঙ্করাচার্য্যচরিতে অনেক ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য কথা আছে। রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় সত্যবীরের জীবনচরিত লিখিয়া পণ্ডিত শিবনাথ বাঙ্গালী সমাজের একটা অভাব দূর করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত অসম্পূর্ণ রহিল। শিবনাথ বাবু প্রায় কথোপকথনের ছন্দে এই জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করিয়া ভালই করিয়াছেন; কিন্তু কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। লোকবিশেষের জীবনচরিত লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তির সমসাময়িক সামাজিক বিবরণ লিখিবার চেষ্টা করিয়া শিবনাথ বাবু এই গ্রন্থে আর এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ জীবনচরিত-লেখকেরা শিবনাথ বাবুর অনুসৃত পথের অনুসরণ করিলে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ সঞ্চিত হইতে থাকিবে।

যাহা হউক, এ বৎসরও জীবনচরিত বিভাগে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ। নাটকাদি বিভাগে ৪২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৪ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	প্রতাপাদিত্য	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
২।	তারা বাই	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
৩।	কালপরিণয়	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪।	বিদ্ধশালভঞ্জিকা	
৫।	ধনঞ্জয়-বিজয়	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬।	রজত-গিরি	
৭।	সংসার	মনোমোহন গোস্বামী।
৮।	কমলকিশোর	যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৯।	ইন্দু	কাঙ্গালীকৃষ্ণ দত্ত।
১০।	মুরলা	উমাকান্ত হাজরা।
১১।	নিরুপায়ে চিকিৎসক	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২।	হরি-দা	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩।	পরিতোষ	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।
১৪।	তেজোময়ী	কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্য-সাহিত্যের গতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব। গত বৎসর প্রতাপাদিত্য নাটকের অভিনয়ে রঙ্গালয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তারা বাই প্রভৃতির অভিনয়েও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দর্শক বা পাঠকের রুচি এখনও একবারে বিকৃত হয় নাই। ব্যর্থ-অনুকরণে লিখিত অপ্রাসঙ্গিক নৃত্য গীত ও 'সং'এ পূর্ণ নাটকাদির পরিবর্ত্তে মৌলিক ও ঐতিহাসিক নাটকাদি রচিত ও অভিনীত হইলে, তাহাও যে সাধারণের বরণীয় হয়, তাহা প্রতাপাদিত্যের সফল অভিনয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও জ্যোতিরিন্দ্র বাবু আর দুইখানি সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। গত-পূর্ব্ব বৎসরে তিনি এক-খানি ফরাসী দৃশ্য-কাব্যের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ বৎসর "রজত-গিরি" নামক একখানি ব্রহ্মদেশীয় নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার সার্থক লেখনীর কৃপায় বাঙ্গলা সাহিত্য বিভিন্ন ভাষার অনেকগুলি রত্নের অধিকারী হইয়াছে। গত বৎসরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একখানি ফরাসী দৃশ্যকাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি যে গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার আরও অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত "গোবৈদ্য", শ্রীযুক্ত রাজ-কৃষ্ণ দত্তের "যেমন রোগ তেমনি রোঝা" ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্রের "অম্লমধুর" ঐ একই পুস্তকের অনুবাদ। ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" উপন্যাসের প্রথমাংশ নাটকাকারে পরিণত হইয়া ষ্টার থিয়েটারে "সরলা" নামে অভিনীত

হইবার পর হইতেই বাঙ্গালীর গৃহচরিত্র-অবলম্বনে অনেকগুলি সুপাঠ্য সামাজিক নাটক প্রণীত হইয়াছে। গত বৎসরেও এরূপ সামাজিক নাটকের অভাব হয় নাই, এবং সুখের বিষয়, গত বৎসরের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি ব্যর্থ অনুকরণে লিখিত নহে। গত বৎসরে উল্লেখযোগ্য প্রহসনাদি প্রকাশিত হয় নাই। আজ-কাল যে সকল প্রহসন লিখিত হয়, তাহা কেবল অভিনয়ের জন্য, সমাজের জন্য বা দর্শক-পাঠকের জন্য নহে। নাটক অপেক্ষা প্রহসনগুলিতে আজ কাল অনুকরণ-প্রবৃত্তিটা বেশী ফুটিতে দেখা যায়। সম্প্রদায়-বিশেষের উপর টিটকারী বা ব্যক্তি-বিশেষের উপর আক্রোশ প্রকাশ করাই যেন আজ-কালকার প্রহসনগুলির প্রধান বর্ণনীয় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যাত্রার পালা-রচনায় যে সকল লেখক ব্রতী আছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। গত বৎসরে প্রকাশিত কয়েকখানি গীতাভিনয়ের উল্লেখ করিতেছি; তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, পালা-রচয়িতারা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, যা' তা' বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া গানের পালা বাঁধিতেছেন। তাঁহাদের উপযোগিতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।—যথা,—পরশুরামের মাতৃহত্যা-গীতাভিনয়, মগধ-বিজয়-গীতাভিনয়, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ-গীতাভিনয় ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে গত বৎসরেও হাস্যজনক নামের একখানি নাটক বাহির হইয়াছে;—সেখানি শ্রীজগদ্বন্ধু হাজরা মোক্তার প্রণীত বেশ্যার সতীত্ব-রক্ষা নাটক—জন্ম বর্দ্ধমানে।

ঘ। উপন্যাস—এই শ্রেণীর ৫৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১১ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	উড়িষ্যার চিত্র	যতীন্দ্রমোহন সিংহ।
২।	কর্ম্মফল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩।	মহিমময়ী	দীনেন্দ্রকুমার রায়।
৪।	জীবন্মৃতরহস্য	পাঁচকড়ি দে।
৫।	শান্তিলতা	প্রেমলতা-রচয়িত্রী।
৬।	লক্ষ্মী বউ	বিধুভূষণ বসু।
৭।	সতী শোভনা	পাঁচকড়ি দে।
৮।	স্নেহময়ী	সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।
৯।	মোহিনী	রাধানাথ মিত্র।
১০।	পরিণয়-কাহিনী	ভবানীচরণ ঘোষ।
১১।	সাবিত্রী	সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

গত বৎসর একখানিও উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রবাবুর কর্ম্মফল উপন্যাস নহে, দৃশ্যকাব্য বলিলে বরং সঙ্গত হয়। গত বৎসর উপন্যাসের

মধ্যে ডিটেক্‌টিভ গল্পেরই প্রাধান্য গিয়াছে। ফরাসী-গোয়েন্দা, আমেরিকান-গোয়েন্দা, গুপ্তচর, দারোগার দপ্তর, এবং মনোরমা, প্রভাতকুমারী, লুকোচুরি, দিনে-ডাকাতি, হত্যাকারী কে? প্রভৃতি পুস্তকই তাহার প্রমাণ। বটতলার উপন্যাসরাশিতে দিন দিন কুৎসিত প্রেমের গল্প অজস্র প্রচারিত হইতেছে; তাহার ফলে উপন্যাসের আদর্শ কতকটা অধঃপাতে গিয়াছে; তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নাম করিতেছি। প্রেমের-চাতক, যুবতী বা বিষাদরাশি, গুপ্তপ্রেম, গুপ্তচুম্বনের প্রতিফল, ইত্যাদি। অনুকরণপ্রিয়তা উপন্যাস বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একই গল্প বিভিন্ন নামে যে কত শতবার ছাপা হইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ দুর্ঘট! একই রকমের চরিত্র প্রতি পাঁচখানি উপন্যাসের মধ্যে বোধ হয় দশটা পাওয়া যায়। কোনও একখানা তথাকথিত উপন্যাসের দু এক পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই মনে হয়, এইরকম গল্প বা এইরকম একটা ছবি কোথাও পড়িয়াছি। কাজেই প্রতিবৎসর উপন্যাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেও প্রকৃত পুষ্টি হইতেছে না। উপন্যাস সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার আছে। প্রত্যেক উপন্যাসে তরল ভাষায় কেবল প্রেমের বর্ণনা, বাঞ্ছিতের আশা, বিরহ-মিলনের বর্ণনা, হতাশ প্রেমিকের আক্ষেপ পরিস্ফুট। প্রেমের দায়ে সামাজিক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিবার কৌশল পড়িয়া মনে হয়, যেন বাঙ্গালীর মনে দাম্পত্য সুখের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরেই এই সকল কদর্য্য গ্রন্থের বিষ অধিকমাত্রায় বিকীর্ণ হইতেছে; ইহার পরিণাম কখনও শুভাবহ হইতে পারে না। এই সকল কদর্য্য গল্প পাঠ করিয়া সাধারণের রুচি এত বিকৃত হয় যে, তাহাদের অন্যবিধ গ্রন্থ-আলোচনায় প্রবৃত্তি থাকে না।

আধুনিক অনেক সমালোচক সেকালের সাহিত্য-সমালোচনায় বলিয়া থাকেন, সেকালে বিদ্যাসুন্দর-জাতীয় সাহিত্যেরই আদর ছিল, তাহারই প্রসার হইয়াছিল, সুতরাং তখনকার লোকের রুচি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত ছিল। এখনকার অনেকগুলি উপন্যাস সম্বন্ধে যদি কোনও অপক্ষপাতী সমালোচক ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে যে বিশেষ অন্যায় হয়, এমন বোধ হয় না। এখনকার কোনও উপন্যাসে বিহারবর্ণনা না থাকিলেও, যে ভাবে পূর্ব্বরাগ, বিশ্রম্ভালাপ, গোপনে চুম্বনাদি বর্ণনার আতিশয্য লক্ষিত হয়, এবং সমাজ-বিগর্হিত-প্রথায় নায়ক-নায়িকার প্রেমের দায়ে গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ থাকে, তাহা যে প্রাচীন সাহিত্যের অশ্লীলতা অপেক্ষা অধিকতর দোষাবহ, অমঙ্গলের আকর, বিকৃত রুচির পরিচায়ক, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। সেকালের কাব্যাদিতে

বিদেশী নায়ক ও বিদেশিনী নায়িকার মধ্যে দৈব-ইচ্ছা, জন্মান্তর-দাম্পত্য প্রভৃতি কোনও না কোনও অনৈসর্গিক কারণে কেবল রূপজ মোহ হইতেই প্রেমের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখনকার উপন্যাস পড়িলেই মনে হয়, যেন কাহারও বাড়ীতে প্রাইভেট-টিউটার রাখিবার উপায় নাই, প্রতিবেশী সুদর্শন যুবকের গ্রামে থাকা চলে না; কারণ তাহা হইলেই, গৃহকর্ত্তার কন্যাটি নির্ব্বিচারে অকস্মাৎ প্রেম করিয়া বসেন! আর তাহার সহিত মিলনের বাধা ঘটাইতে পারিলেই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু গাঢ়তর হইয়া থাকে। মিলন না হইলেই, হয় সূর্য্যমুখীর ন্যায় গৃহত্যাগ করেন, নয় ত আয়েষার মত বলিয়া বসেন, "এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর"।

অক্ষম লেখকেরা ধৈর্য্যসহকারে বিবেচনা করিয়া বা বিজ্ঞজনের উপদেশ লইয়া লিখিতে চাহেন না, বা পারেন না। ক্ষমতাশালী লেখকেরাও আপনাদের লেখার গুণে পাঠক গড়িয়া লইতে আজকাল যেন প্রস্তুত নহেন।

৬। ইতিহাস ভূগোল। এই শ্রেণীর ১২ খানি গ্রন্থের মধ্যে স্কুলপাঠ্য ১১ খানি বাদে একখানিমাত্র গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীহট্টের ইতিহাস — শ্রীমোহিনীমোহন দাসগুপ্ত।

আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে বাঙ্গালী লেখকেরা কোনও চেষ্টা করেন নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে উপকরণ নাই, এরূপ উক্তি শোভা পায় না। ইতিহাস-ভূগোল সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধান নিতান্ত দুরূহ বা দুঃসাধ্য নহে। সুদূর মফস্বলস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষেও যে অসম্ভব নহে, তাহা কালীপ্রসন্ন বাবু বাঙ্গলার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহা হউক, যাঁহারা ইতিহাস ভূগোলের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের আলোচনার ফলে মাতৃভাষার আশানুরূপ পুষ্টি হইতেছে না, ইহাও অল্প আক্ষেপের কথা নহে। আমার মনে হয়, যাঁহারা ঐতিহাসিক সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ বহুবিধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ-প্রকাশেরও চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও মাতৃভাষার প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। গুপ্তরাজগণ, পালরাজগণ, গঙ্গাবংশীয় ও কেশরিবংশীয় উৎকলরাজগণ, কলিঙ্গরাজগণ, কাছাড়রাজগণ, মণিপুর, আরাকান, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতির রাজগণের বিবরণ, আসামের আহম ও হিন্দু রাজগণের ইতিহাস ও নেপালের লিচ্ছবি রাজগণের ইতিহাসের ইংরাজীতে অভাব নাই; কিন্তু বাঙ্গলায় কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৈলাস বাবুর সেন-রাজগণের ও লিচ্ছবিরাজগণের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি মাত্র পুস্তক আছে। এক

বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেই এতগুলি রাজবংশের বিবরণ লিখিবার আছে। অন্ততঃ এতৎসম্বন্ধীয় ইংরাজী ইতিহাসগুলির অনুবাদ করিলেও চলিতে পারে। খোদিত লিপি ও মুদ্রালিপি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক কথা ইংরাজীতে বিদেশীয় ঐতিহাসিকেরা প্রকাশ করিতেছেন, বাঙ্গালায় তাহার কয়টার কথা আলোচিত হয়? দিন কয়েক মাসিকপত্রগুলিতে এইরূপ প্রবন্ধের আধিক্য দেখা গিয়াছিল। আজ ৫।৬ বৎসর কোথা হইতে ক্ষুদ্র গল্পের স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে, এখন অনেকের অক্ষম-লেখনী-প্রসূত গল্পাবলীতেই মাসিকপত্রগুলি প্লাবিত হইতেছে। বাঙ্গালী লেখকেরা এ বিষয়ে অবহিত না হইলে ঐতিহাসিক সাহিত্যের উন্নতি সুদূর-পরাহত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চ। সাহিত্য,—এই শ্রেণীর ১৫৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৫৮ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ বাদ দিলে একখানিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেখানিও প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য-গ্রন্থ নহে, স্কুলের ছাত্রদিগের উপযোগী অভিধানমাত্র। তাহার রচয়িতা বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, গত বর্ষের তালিকায় খাঁটি গদ্যসাহিত্য আদৌ নাই। প্রবন্ধ-পুস্তক একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সাহিত্যিক-সমালোচনা সম্বন্ধেও কোনও পুস্তক বাহির হয় নাই। যে দেশের লেখক পাঠক সকলেই মহা বিজ্ঞ সমালোচক, সে দেশে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে একখানিও সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! পূর্ণ বাবুর "কাব্য-সুন্দরী" ও "দেবসুন্দরী", ৺গিরিজা বাবুর তিন খণ্ড "বঙ্কিমচন্দ্র", বীরেশ্বর বাবুর "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত", যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণির "মেঘনাদবধ প্রবন্ধ" ব্যতীত নাম করিবার মত সমালোচনার গ্রন্থ আর নাই বলিলেও চলে। গিরীশ বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতির নাটকাবলী, রবীন্দ্রনাথ, ৺হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য ও কবিতা, দামোদর বাবু, রমেশ বাবু প্রভৃতির উপন্যাসাবলীর সমালোচনা-গ্রন্থ কেন যে প্রকাশিত হয় না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল মনীষী লেখকের রচনার সমালোচনা হইলে সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত মার্জ্জনাও হইতে পারে। ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "সাহিত্য-মঙ্গলে"র মত প্রবন্ধপুস্তকও আর প্রকাশিত হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ছ। চিকিৎসা—এই শ্রেণীর ২৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৭ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	পশুচিকিৎসা	শশিভূষণ পাত্র।
২।	রসেন্দ্রসারসংগ্রহ	উপেন্দ্রনাথ সেন।
৩।	শার্ঙ্গধর	ঐ

৪। ঔপদংশিক রোগচিকিৎসা। (হোমিওপ্যাথী) — বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়।
৫। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় — চন্দ্রশেখর কালী।
৬। খোকার মা — দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৭। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা মন্তব্য, অত্যাগী তরুণ জ্বর — প্রভাতচন্দ্র সেন।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রোগবিশেষের চিকিৎসা-শিক্ষার বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিন এক ওলাউঠা ভিন্ন অন্য কোনও রোগের চিকিৎসা বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক অধিক প্রকাশিত হয় নাই। এখন দু এক-খানি হইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ। শারীর-তত্ত্বের গ্রন্থ সম্বন্ধে এবারেও কেবল নাড়ী-বিজ্ঞান অনেকগুলি ছাপা হইয়াছে। ইংরাজী শারীরতত্ত্বের পুস্তকগুলির অনুবাদ আবশ্যক। যাহা হউক, চিকিৎসাবিষয়ক-গ্রন্থ-প্রণয়ণে অনেক কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ডাক্তার কবিরাজ যত্ন লইয়া থাকেন, ইহা আশাপ্রদ বটে।

জ। দর্শন,—এই বিভাগের ৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৪ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১। পঞ্চমবর্ষীয় শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপের লেকচার
২। সাংখ্যতত্ত্বাবলোক } মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
৩। ন্যায়শাস্ত্র (সটীক) — নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।
৪। সৌভাগ্যস্পর্শমণি — মীর্জ্জা মহম্মদ ইউসুফআলি।
৫। সরল বেদান্তদর্শন — সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শনের অনুবাদাদি দুই একখানি প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দের বিষয় এই, এ বৎসর এক জন মুসলমান দার্শনিক বাঙ্গলা ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে লেখনীধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের ফলে মুসলমান শাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করিতে পারি।

ঝ। কাব্য ও কবিতা,—এই বিভাগের ৮৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১২ খানি স্কুল পাঠ্য বাদে ৭৩ খানির মধ্যে ১৬ খানি উল্লেখযোগ্য.—

১। অমৃতমদিরা — অমৃতলাল বসু।
২। বঙ্গদর্পণ — শশধর রায়।
৩। বৈভ্রাজিকা — ইন্দুপ্রভা।
৪। গাথা — রমেশচন্দ্র সিংহ।
৫। বঙ্গের কলঙ্ক কাব্য — কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
৬। রাধিকা — ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। ঝঙ্কার — সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।
৮। অভিমন্যুবধ — মথুরানাথ সাহা।

৯।	কাননিকা	ইন্দুপ্রভা।
১০।	হজরত মহম্মদ	মোজাম্মেল হক।
১১।	রাঘববিজয় কাব্য	শশধর রায়।
১২।	অজ্ঞাতবাস কাব্য	যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
১৩।	যোগ ও বিয়োগ	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১৪।	ধবলেশ্বর কাব্য	নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
১৫।	পরিত্রাণ কাব্য	শেখ ফজলল করিম।
১৬।	স্মৃতি	পাঁচুরাণী দাসী।

গত বারে কাব্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, বিষয়-বিশেষ লইয়া বিস্তৃত কাব্য-রচনার প্রথা যেন লুপ্ত হইয়াছে। এবার সে আক্ষেপের অবকাশ অল্প। উপরিলিখিত ১৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৭ খানি বিস্তৃত কাব্য। মুসলমান-কবিশ্রেষ্ঠ মুন্সী মোজাম্মেল হক্ সাহেব যে "হজরত মহম্মদ" নামক একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিয়াছেন। খণ্ডকবিতাময় কাব্যের সেই একটানা স্রোত চলিয়াছে। অমৃত বাবুর "অমৃত-মদিরা" কোষ-কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অনেক কবিতা পড়িয়া সেকালের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সরলতা, প্রাঞ্জলতা স্মরণ হয়। গত বর্ষে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু, দিল্লী দরবার, অভিষেক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বাঘা তেঁতুল"ও বাহির হইয়াছে! গত বৎসর একখানি সৎকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; —ঈশান বাবুর "যোগেশ" আবার ছাপা হইয়াছে। গত বৎসর প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে নরোত্তম দাসের কবিতাবলী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও বাঘাম্বরের পালা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কাশীদাসের মহাভারত, শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা, গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল, উদ্ধবসংবাদ, সঙ্গীততরঙ্গ, নরোত্তমের আশ্রয়নির্ণয়, জগদ্রামের রামায়ণের প্রথমাংশ, ও সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তর কাণ্ড উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসী ছাপাখানা হইতে এবারেও কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ ভাল কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

ঞ। ধর্ম্ম-বিষয়ে ৯০ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৪ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ)	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
২।	ধম্মপদ	চারুচন্দ্র বসু।
৩।	শ্রীচৈতন্যচরিত	কালীহর বসু।
৪।	মৌলুদ শরিফ	মীর মশারফ হোসেন।
৫।	অদ্বিতীয় উপদেশ—প্রাণপ্রিয় তাপস	সৈয়দ মুন্সী আপতাবউদ্দীন আহম্মদ।

৬।	ইস্‌লাম-দর্পণ	সৈয়দ আবদুল গফর।
৭।	সোঽহং-তত্ত্ব	পরমহংস সোঽহং স্বামী।
৮।	তীর্থসম্বন্ধে শাস্ত্রমত	শঙ্করনাথ পণ্ডিত।
৯।	সাধনরহস্য	কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী।
১০।	ভক্তিযোগ	পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু।
১১।	ব্রতমালাবিধান	বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ।
১২।	হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ	পূর্ণচন্দ্র বসু।
১৩।	বীরভদ্রদীপিকা	কবিরাজ গোস্বামী।
১৪।	তীর্থতরঙ্গিণী	কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে খণ্ডশঃপ্রকাশ্য গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। "মৌলুদশরিফে" মহম্মদের জন্মকথার ইতিহাস ও তত্ত্বকথার আলোচনা আছে।

এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানি "ধম্মপদ"। এখানি পালিভাষায় রচিত। গীতা যেমন হিন্দুর পূজ্য, ধম্মপদ বৌদ্ধের তেমনই পূজ্য। ইহার উপদেশগুলির অধিকাংশ অসাম্প্রদায়িক। চারুবাবু এই গ্রন্থের সংস্কৃত পাঠ, অন্বয় ও বাঙ্গলা অনুবাদ দিয়া, মূল সহ প্রকাশ করিয়া, বাঙ্গলা ভাষার যেমন পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন, সমাজেরও তেমনই উপকার করিয়াছেন।

ট। বিবিধ বিষয়ের ১৬৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৫৭ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ বাদে ১১২ খানির মধ্যে ৩৮ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	৺স্বামী বিবেকানন্দ।
২।	জিজ্ঞাসা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
৩।	ভারতবর্ষে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪।	আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ	যোগেশচন্দ্র রায়।
৫।	রত্নপরীক্ষা	ঐ
৬।	বেতালে বহু রহস্য	চন্দ্রনাথ বসু।
৭।	ধর্ম্মানন্দপ্রবন্ধাবলী	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
৮।	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ভাষাপরিচ্ছেদ	রাজেন্দ্র শাস্ত্রী।
৯।	সহানুভূতি	তারিণীচরণ সেন।
১০।	বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার	সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
১১।	মহম্মদী ও মজহবী	সত্যমোহন দে।
১২।	বৌদ্ধকাহিনীসংগ্রহ	নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া।
১৩।	বিবাহ	আচার্য্য বিনোদবিহারী রায়।
১৪।	প্রেমের বিকাশ	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১৫।	মৃত্যুপরীক্ষা	উমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৬।	বিনয়বোধ	চন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৭।	পারিবারিক জীবন	প্রসন্নতারা গুপ্তা।
১৮।	বঙ্গদেশ ও বঙ্গমঙ্গল	মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি।
১৯।	জাতকবিজ্ঞান	প্রসন্নচন্দ্র সিংহ।
২০।	তীর্থদর্শন	যতীন্দ্রমোহন দাস।
২১।	অদ্ভুত প্রশ্নবিদ্যা	জগন্নাথ জ্যোতির্ভূষণ।
২২।	কৃষিপ্রণালী	ভুবনচন্দ্র কর।
২৩।	অকলঙ্ক যোগ	কৃপানাথ শর্ম্ম বিশ্বাস।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সানুবাদ ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রকাশ করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতির অনেক প্রাচীন সংস্কৃত মূল, অনুবাদ ও নূতন দার্শনিক গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়দর্শনের দুরূহতা ও দুরবগাহতাবশতঃ এত দিন ইহার কোন গ্রন্থের অনুবাদপ্রকাশে কেহ প্রবৃত্ত হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় সে অভাব দূর করিলেন। অপর দর্শনাদির গ্রন্থেরও এইরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুনিয়াছি, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় মীমাংসা-দর্শন সম্বন্ধে বাঙ্গলায় গ্রন্থ লিখিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থও এই সঙ্গে গণনীয়,—

১। কায়স্থতত্ত্বতরঙ্গিণী। ২। ক্ষত্রিয়বংশতালিকা। ৩। জাতিতত্ত্ববারিধি। ৪। আদি কৈবর্ত্ত ইতিহাস। ৫। মাহিষ্য-দীধিতি। ৬। গন্ধবণিক্-তত্ত্ব। ৭। হালিক দাস বা মাহিষ্য জাতি। ৮। জাতিতত্ত্বজ্ঞানদায়িনী। ৯। যোগিতত্ত্বনির্ণয় (জুগী)। ১০। যোগিতত্ত্বসার (জুগী)। ১১। তাম্বূলবণিক্। ১২। কায়স্থ মহাসভায় চারি শ্রেণী মিলন সম্বন্ধে বক্তৃতা। ১৩। কায়স্থ-কুলপদ্ধতি। ১৪। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ। ১৫। মাহিষ্য-দীপিকা। ১৬। জাতিসম্বন্ধনির্ণয়। ১৭। জাতিতত্ত্ব (বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য)।

ঠ। ভ্রমণ-বিষয়ক চারিখানি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য।

১।	ভারত-প্রদক্ষিণ	দুর্গাচরণ রক্ষিত।
২।	অধ্যাপক বসুর ভ্রমণবৃত্তান্ত	প্রিয়নাথ বসু।
৩।	দার্জ্জিলিঙ্গে দিন দুই	গোপালনারায়ণ মজুমদার।
৪।	পুরী যাইবার পথে	ডাঃ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর।

মুসলমান-শিক্ষা-সমিতি ও বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি মুসলমানী বাঙ্গলা ভাষার প্রচার রহিত করিবার যতই চেষ্টা করিতেছেন, আমরা দেখিতেছি, ততই এই

ভাষায় নব্য ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দিন দিন অধিক প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে উপন্যাস বিভাগে—

১।	কমলা পরীর পুথি	মহম্মদ আবদুল গণি।
২।	দেলসাদ	জামালুদ্দীন মিঞা।
৩।	সহিবিচ্ছেদ প্রকাশ	মুন্সী মুকিম।
৪।	শিরি ফরহাদ ও শিরি খস্রু	মহম্মদ অবদুলগণি।
৫।	সাহ ঠাকুর বরের কেচ্ছা	নসিমুদ্দিন।
৬।	ত্রিলোকসুন্দরী পরী	নিজামুদ্দীন আহম্মদ।
৭।	বিশ্বম্ভরবধের বিবরণ	মৈজুদ্দীন মুন্সী।
৮।	সাহারঙ্গ বাদশা ও তুলাপতি কন্যার পুথি	দৌলত আমেদ মজুন্দার।

ধর্ম্মগ্রন্থ বিভাগে—

১।	ছহি গল্পে সহিদ-এ-কারাবালা	সৈয়দ সাদ আলি।
২।	কাছুটি	মহম্মদ আব্বাশ আলি।
৩।	বাহারুস্থানে রৌফী বা স্বর্গসোপান	আবদর রৌফ।
৪।	সহিদনামা	সেখ জনাব আলী।
৫।	মেহতাহ-উল্-কাবা	সদরুদ্দীন।
৬।	সহি রেদায়ে এলাহি	মহম্মদ এলাহিবক্শ্।
৭।	এর্শাদে-ই-খালেফি বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব	মৌঃ আবদুল করিম।
৮।	সহি তহকিক মস্লেমিন	নাজির আলী টেণ্ডেল।
৯।	হেদায়ে তস্ সাহে লোবিন	মুন্সী নসিমুদ্দীন।

বিবিধ বিষয় বিভাগে—

১।	জীবনহত্যা	এনাজুদ্দীন।
২।	রেঙ্গুণের কাব্য কবিতা	নাজির আলী টেণ্ডেল।

প্রভৃতি নব্যলেখকের লিখিত নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর আরবী ও মুসলমানী বাঙ্গলায়,—সহি-রদ্দাত-ই-তক্লিদ, নেশাভঞ্জন, ধর্ম্মকার্য্যের হিতোপদেশ; আরবী, মুসলমানী বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতে,—মফিদল আহ্নাক্; মুসলমানী বাঙ্গলা ও পারসীতে—তহ্ফিক-উল-হক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তক বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় প্রচারিত হইলে, বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সমাজে তাহা সমাদৃত হইবে কি না, বলা যায় না। পশ্চিমের মুসলমান, যাঁহারা অল্প বাঙ্গলা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ভাষা দ্বিভাষীর কার্য্য করে। মুসলমান-শিক্ষাসমিতির ও বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ইহা বিবেচ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গলা ও উড়িয়া ভাষায়—মনোহর ফাসিয়াড়া বা রঙ্গলতা-পালা অর্থাৎ মনোহর ফাঁস্থড়ে (ঠগ) ও রঙ্গলতার কথা নামে একখানি, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে সপ্তরত্ন নামে একখানি ও বাঙ্গলা, ইংরাজী ও উর্দ্দুতে, ধর্ম্মের লাঠি নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আরবী, উর্দ্দু, উড়িয়া, পারসী বা হিন্দী ভাষার সদ্‌গ্রন্থের একখানি অনুবাদও প্রকাশিত হয় নাই; কেবল হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণের একখানি অনুবাদ বিশুদ্ধ বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কান্দীর হরিনারায়ণ মিশ্র এই অনুবাদ করিয়াছেন।

গতবর্ষে মোট ৬৫ খানি বাঙ্গলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে গুরুদর্পণ, ময়মনসিংহ, নবনূর, বঙ্গভাষা, ধূমকেতু, যমুনা, বার্ত্তা, মহম্মদী, পারিজাত, স্বভাব, গৌড়ভূমি, পল্লীসুহৃদ, রেণু ও হিতবার্ত্তা, এই কয়খানি নূতন। নূতন মুসলমান পত্র “নবনূর” ও ত্রিপুরার “বঙ্গভাষা” উল্লেখযোগ্য।

গতবর্ষের বাঙ্গলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। বাঙ্গলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের গতি সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পরিষদের মতামত বলিয়া কেহ গণনা করিবেন না।

উপসংহারে একটি নিবেদন আছে। যদি পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সভা হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা অঙ্গহীন হইলে চলিবে না। অথচ বিস্তৃতভাবে বিবরণ লিখিতে হইলে, সমস্ত নবপ্রকাশিত পুস্তক পরিষদের পুস্তকালয়ে আসা চাই। পরিষদের গ্রন্থকার সভ্য, পুস্তক-প্রকাশক সভ্য, সম্পাদক সভ্য, ছাপাখানার অধিকারী সভ্য ও হিতৈষী সভ্যের অভাব নাই। ইহাঁরা সকলে অনুগ্রহ করিয়া স্বরচিত, স্বপ্রকাশিত, স্বসম্পাদিত, স্বমুদ্রিত ও স্ব স্ব বন্ধুবান্ধবের মুদ্রিত পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে পাঠাইয়া দিলে, অনায়াসে এ অভাব বিদূরিত হইতে পারে। গুরুদাসবাবুর ন্যায় প্রকাশক মনে করিলেই অর্দ্ধেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফী।

প্রায়শ্চিত্ত।

১

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা ও আজিকার বাঙ্গলা, এ উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। বাঙ্গালী-জীবনও এখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। “না জাগিলে যত

---

* সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না"—এই মর্ম্মের গান তখন পথে ঘাটে শুনিতে পাইতাম। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের যেমন উৎসাহ, অন্য দিকে গীতাও তেমনই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তখনও ইংরাজের অনুকরণের মোহ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংরাজীশিক্ষিত ডেপুটী হরিশচন্দ্র সান্যাল যে Mr. Horace C. Sandell নামগ্রহণ পূর্ব্বক হ্যাট কোট ও টাই কলারের সম্মানরক্ষা করিতেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ ছিল না। হোরেস্ স্যাণ্ডেল সাহেবকে যাহারা নামে মাত্র জানিত, তাহারা তাঁহাকে জন-বুষেরই বংশাবতংশ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিল, ডেপুটী সাহেবের বর্ণ ও বাক্য হইতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তিনি 'নেটিভ' ক্রিশ্চিয়ান।

ডেপুটী সাহেব কখনও শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ না করিলেও তাঁহার সাহেবিয়ানার ত্রুটী এ দেশের সাধারণ সাহেব বা বাঙ্গালীর চক্ষে ধরা পড়িত না। আসল সাহেবিয়ানার লক্ষণ কি, তাহা তাঁহার জুরিস্‌ডিক্সনের জমীদার হইতে পেয়াদা পর্য্যন্ত জানিত না, এবং তিনি যে সকল সাহেবের সহিত আত্মীয়তাস্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, তাহারাও আবশ্যক হইলে পৃষ্ঠে জয়ঢাক তুলিয়া লইতে পারিত।

তিনি বাড়ীতে, সার্কিট-হাউসে বা তাম্বুর মধ্যে যে পরিমাণ সাহেবিয়ানা করিতেন, তাহার সহিত সাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার সে সাহেবিয়ানায় খানসামা ও আরদালীর দলই সময়ে সময়ে বিপন্ন হইত। কিন্তু তিনি আদালতে যে আঠারআনা সাহেবিয়ানা করিতেন, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের গল্পই মনে পড়িত। তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী-গ্রহণের সময় ইংরাজীতে প্রশ্ন করিতেন; পেস্কার সেই প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ সাক্ষীর কর্ণগোচর করিত; আবার সাক্ষী যাহা বলিত, তাহা হাকিম বাহাদুরকে ইংরাজী করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইত; নতুবা তিনি সাক্ষীর কথা বুঝিতে পারিতেন না!—বাঙ্গালী খৃষ্টানেরা ত বঙ্গভাষায় এমন অনভিজ্ঞ হয় না, তবে তিনি বাঙ্গলাটা এমন করিয়া ভুলিবার সুবিধা কোথায় পাইলেন? ইহার উত্তরে স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের মোক্তার ভজহরি ভৌমিক বলিয়াছিলেন, ডেপুটী সাহেব বাল্যকালে গাধার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মাতৃস্তন্যের আস্বাদন কখনও তিনি পান নাই। যাহা হউক, সাহেবিয়ানার উপসর্গগুলি কখনও হাকিম বাহাদুরের ধৈর্য্য নষ্ট করিয়াছে,—এরূপ শুনি নাই।

নিজের অন্তঃপুরেও তিনি সমাজসংস্কারের দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারই প্রখরালোকে ডেপুটী-গৃহিণী শাড়ী ও মল ফেলিয়া গাউন ও জুতা বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি চিরকালই দৃঢ় হইয়া থাকে। ডেপুটী বাবুর একমাত্র আদরিণী দুহিতা সুমতি ওরফে সোফী, বিবিয়ানায় পিতা মাতাকেও পরাস্ত করিয়াছিল। সহিস, কোচম্যান, আর্দ্দালী, বেহারা, সকলের কাছেই সে "মিস্ বাবা।" টেবিলে না বসিলে সোফীর আহার হইত না, কাঁটা চাম্‌চে ভিন্ন মুখের গ্রাস মুখে যাইত না; রেলের গাড়ীর গাড়োয়ান ও নীল-কুঠীর প্রহরী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সাহেব-ললনাদিগের আদর্শে সোফী এমন মেম বনিয়া গিয়াছিল যে, সে মনে করিত, সাবান ঘসিয়া পোড়া রংটাকে যদি কোনও রকমে বদলাইতে পারে, তাহা হইলে কোনও ইংরাজী উপন্যাসের নায়িকার মত প্রেমের অভিনয়ে কত নীল-কুঠীর সাহেবদের টুপিসমেত মাথাগুলা ঘুরাইয়া দিতে পারিবে।

২

বাঙ্গালীর মেয়ে হাজার মেম সাজুক, আর শুইয়া বসিয়া নবেল পড়িয়া দিন কাটাক, যৌবন তাহার দেহে আপনার আধিপত্যের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে বিস্মৃত হয় না। মিস্ সোফী যখন সতের বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল, তখন একদিন সান্যাল-গৃহিণীর হৃদয়ে বাঙ্গালিনীসুলভ চাঞ্চল্যের উদয় হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অনুযোগের স্বরে ঝঙ্কার দিয়া ডেপুটী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতে দেখতে মেয়েটি কলাগাছের মত বেড়ে উঠেছে, ওর বিবাহের কি করচো?" স্যাণ্ডেল সাহেব সে সময় একটি গরু চুরীর মামলার রায়ে নিজের বিদ্যাপ্রকাশের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি গৃহিণীর ঝঙ্কারে তাঁহাকে গরুচোর অপেক্ষাও অধিক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে হইল।

তাহার পরই সোফীর বিবাহের জন্য বরের সন্ধান আরম্ভ হইল। ডেপুটী বাবু অনেক চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বি. এল্. ও পাঁচটি এম্. এ. বর সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু সোফী একে একে সকলকেই নামঞ্জুর করিল। সে তাহার মায়ের সঙ্গে তর্ক করিতে বসিল,—একটি বি. এল্. তিন বৎসর আদালতে গর্দ্দভের বোঝা বহিয়া বিশেষ সুকৃতি থাকে ত মুন্সেফী লাভ করিতে পারে; একটি এম্. এ.র মূল্য এক শত টাকা, (এখন অনেক কম) এ অবস্থায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীমাত্রসম্বলবিশিষ্ট কোনও 'ইয়ংম্যান'কে তাহার জীবনের 'পার্টনার' করিতে পারে না। ইহাতে তাহার 'লাইফ্‌টাই 'ব্লাষ্টেড্' হইয়া যাইবে।—যথাকালে এ কথা ডেপুটী সাহেবের কর্ণগোচর হইল।

তখন অগত্যা ব্যারিষ্টারের দিকে স্যাণ্ডেল সাহেবকে দৃষ্টিপাত করিতে হইল। কলিকাতার হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী নামক মানস সরোবরের সহিত তাঁহার ন্যায় মফস্বলবাসী ক্ষুদ্র ডেপুটীর কোনও পরিচয় ছিল না। তিনি সে টক্ আঙ্গুরের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদালতে মামলা করিবার জন্য কোনও কোনও ধনবান মক্কেল দুই এক জন জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের আমদানী করিত। সেই জুনিয়ার যদি 'ব্যাচিলার' হইতেন, তাহা হইলে স্যাণ্ডেল সাহেব তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ত্রী কন্যার সহিত তাঁহার পরিচয় না করাইয়া ছাড়িতেন না। বাবুর্চিদের কাজ অনেক বাড়িয়া যাইত, এবং মুসলমানপল্লীতে মুরগী ও আণ্ডা দুর্লভ হইয়া উঠিত। কিন্তু ডেপুটী সাহেবের অর্থব্যয় ভিন্ন তাহাতে আর কিছু ফল হইত না। তাঁহারা সোফীর সহিত শিষ্টাচারসুলভ করমর্দ্দন করিয়াই আতিথ্যের সম্মানরক্ষা করিতেন।

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া মিঃ স্যাণ্ডেল এক বৎসরের ফার্লো গ্রহণ করিয়া কিছু দিনের জন্য কলিকাতার বাসেন্দা হইয়া বসিলেন। বিলাতফেরত যুবকদের সঙ্গে যে সকল ক্লবের অধিক ঘনিষ্ঠতা, সেই সকল ক্লবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; বিলাতফেরতদের সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপন করিয়া অনেককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেও ত্রুটী করিলেন না। এই উপলক্ষে তাঁহার এক মাসের বেতন দশ দিনে খরচ হইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা ব্যয়! বিলাতফেরত সিভিলিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, বা ডাক্তার দূরের কথা, প্রোফেসারের মত নিরীহ প্রাণীরাও মিস্ সোফীর আইবুড়ো নাম ঘুচাইতে অগ্রসর হইলেন না। দুই একটি ব্রিফ্-শূন্য ব্যারিষ্টার ও রোগিশূন্য ডাক্তারকে তিনি একটু প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা চক্ষুলজ্জায় হাঁ না কোনও জবাবই দেন নাই; শেষে বাধ্য হইয়া বন্ধুমুখে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার মেয়েটি বর্ণে ও সামাজিক শিষ্টাচারে ভদ্রসমাজে অচল। হতাশ হইয়া মিঃ স্যাণ্ডেলের ক্রোধ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এক বৎসরের ফার্লো শীতকালের বেলার মত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

অবশেষে ডেপুটী সাহেবের মাথায় একটি নূতন ফন্দি গজাইল। তিনি বুঝিলেন, তৈয়ারী ব্যারিষ্টার পাওয়া কঠিন, অতএব ব্যারিষ্টার তৈয়ারী করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি ষ্টেট্‌সম্যান ও ডেলি নিউসে বিজ্ঞাপন দিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনও উচ্চশিক্ষিত যুবক তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, তাহাকে তিনি ব্যারিষ্টারী শিখিবার জন্য নিজব্যয়ে বিলাতে পাঠাইবেন। বিজ্ঞাপনটি তিনি নিজের নামে প্রকাশ করিলেন না, A. B. C. C/o Manager এই ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে, বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল।

এইবার ডেপুটী সাহেব আশানুরূপ ফল লাভ করিলেন। বেকার গ্রাজুয়েটগণ দলে দলে দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিল। সোফী স্বয়ং স্বামিনির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিল। অনেকেই উমেদার-বেশে ডেপুটী সাহেবের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমান্ অখিলভূষণ বাগ্‌চী এম্. এ.র ভাগ্য প্রসন্ন হইল; অনেক দেখিয়া শুনিয়া সোফী তাঁহাকেই স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইল।

বিবাহটা হিন্দু মতে হইল, কি ব্রাহ্ম মতে হইল, বলিতে পারি না। অখিলভূষণের সঙ্গে মিস্ সোফী অর্থাৎ কুমারী সুমতির বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু মিলন হইল না। মিসেস্ বাগ্‌চী তাঁহার এম্. এ. স্বামীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সামাজিক হিসাবে তিনি মিসেস্ বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে না। মিঃ বাগ্‌চী এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ না করিয়া এক পক্ষের মধ্যেই ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। মিঃ স্যাণ্ডেল কর্ম্মস্থান যশোহরে যাত্রা করিলেন। বিবাহটা কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

৩

এমন গোরার মত মেজাজের ধর্ম্মপত্নীলাভ ভাগ্যে আছে, শ্রীমান অখিলভূষণ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই; পারিলে হয় ত এ বিবাহে তিনি সম্মত হইতেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন, মেয়েটি একটু কালো, কিন্তু দশ হাজার টাকা মূল্যে এমন কালো মেয়ে ক্রয় করা খুব ঠকা নয়। কিন্তু সেই কালো মেয়ে যে শেষে তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিয়া বসিবে, ইহা কে জানিত? অখিলভূষণের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, ঢাকা জেলায়; সুতরাং তিনি এ অপমান সহজে ভুলিতে পারিলেন না; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

জাহাজে পা দিয়াই অখিলভূষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি এ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন। কিরূপে যে প্রতিশোধ দিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। তখন মন একটু প্রসন্ন হইল।

বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য খরচের অভাব হইল না, ডেপুটী সাহেব নিয়মিতরূপে মাসে মাসে তাঁহাকে আড়াই শত টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। অখিলভূষণ আন্তরিক যত্নের সহিত আইনশাস্ত্রের অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিলেন।

সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে অখিলভূষণ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া স্ত্রীকে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে সোফী তাঁহাকে জানাইয়াছিল,

তাহার পিতা তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন; এখন তাহার মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার পূর্ব্বে সে তাঁহার নিকট হইতে প্রেমপত্র পাইবার জন্য উৎসুক নহে। অখিলভূষণ যথাসময়ে সেই পত্র পাইলেন। তিনি পত্রখানি সযত্নে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিলেন; সে পত্রের উত্তর লিখিলেন না। সোফীও তাঁহাকে আর পত্র লিখিল না। ডেপুটী সাহেব মাসান্তে একখানি পত্রে সংক্ষেপে তাঁহার পারিবারিক কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেন।

দুই বৎসর পরে মিঃ বাগ্‌চী বিশেষ প্রশংসার সহিত ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি শ্বশুরকে তার করিয়া সে সংবাদ জানাইলেন; এবং দেশে ফিরিবার খরচ চাহিয়া পাঠাইলেন। মিঃ স্যাণ্ডেল সেইদিনই টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

পরের মেলে সোফীর এক পত্র বাগ্‌চী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। তখন তিনি ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিতেছেন। অখিলভূষণ হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিলেন, সোফীর পত্র। পত্রখানি তিনি দুই চারিবার উল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর খামের উপর লাল কালি দিয়া মোটা হরফে লিখিলেন, "Refused.—A. Buckchie" কলিকাতার ডেড্‌ লেটার আফিসের চৌকা মোহর ঘাড়ে লইয়া পত্রখানি যখন সোফীর নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন সে একবার কল্পনাও করিতে পারিল না, তাহার সুদীর্ঘ প্রেমপত্রের এমন শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। যাহা হউক, ডেড্‌ লেটার আফিসের বাদামী রঙ্গের লেফাফাখানি ছিঁড়িতেই সোফী তাহার বাঁকা বাঁকা অক্ষরে ভূষিত অখিলভূষণের শিরোনামাঙ্কিত পত্রখানি বাহির হইয়া পড়িল। সোফী মনে করিল, এ পত্র বিলাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অখিলভূষণ স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন, তাই পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। কিন্তু সে ভ্রম অধিক কাল স্থায়ী হইল না; পত্রের উপরে লাল কালিতে মোটা মোটা অক্ষরে "Refused" ও তাহার নীচে A. Buckchie নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই সোফীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। অখিলভূষণের নামের সেই সাহেবী-মার্কাধারী সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি যেন এক সারি দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

সোফী পত্রখানি হাতে লইয়া স্খলিতপদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতেছিল; চক্ষুর সম্মুখে জগতের আলো নিবিয়া গিয়াছিল।

সোফী পত্রখানি বিছানার উপর ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বাতায়নপথে চাহিয়া থাকিল। সোফীর পিতা তখন সবডিবিজনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী হাকিম। নদীতীরে বাঁধের উপরেই সবডিবিজান অফিসারের বাঙ্গলো। সে দিন শারদীয় সপ্তমীর প্রভাত, পীত রৌদ্র নদীজলে পড়িয়া তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে; নদীতীরস্থ পথ দিয়া কত পুরুষ ও রমণী গল্প করিতে করিতে হাটে যাইতেছে; প্রবাসী বিদেশ হইতে আশাপূর্ণহৃদয়ে নৌকাযোগে গৃহে ফিরিতেছেন; পেলব কুসুমদলে সমাচ্ছন্ন একটা শিরীষ গাছের ডালে বসিয়া কতকগুলি পাখী বিচিত্র কলধ্বনি করিতেছে; আর দূরে পূজাবাড়ীতে ঢাকের শব্দে এক একবার উৎসবের বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু কোনও দিকে সোফীর দৃষ্টি নাই; কোনও শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে সকল চিত্তবিমোহিনী আশার কুসুমে সে তাহার বিশ বৎসরের অপরিতৃপ্ত যৌবনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনাগত সুখের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়াছিল, অদৃষ্টদেবতার এক নিশ্বাসে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে।

৪

দুই তিন মাসের মধ্যে ব্যারিষ্টার অখিলভূষণের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। ডেপুটী সাহেব বড় চিন্তিত হইলেন। লণ্ডনপ্রবাসী দুই তিন জন আইন-পরীক্ষার্থী বাঙ্গালী যুবকের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, অখিলভূষণের সংবাদ পাঠাইবার জন্য তাহাদিগকে Prepaid টেলিগ্রাফ করিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল, অখিলভূষণ দুই মাস হইল লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছেন; যদি তিনি দেশে না ফিরিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতেছেন। কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণে তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহারের সম্ভাবনায় মিঃ স্যাণ্ডেল বড় ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে একদিন ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের একটি স্তম্ভে পাঠ করিলেন, তিন দিন পূর্ব্বে অখিলভূষণ বাগ্‌চী নামক একটি যুবক মার্শেলিস্ হইতে 'মিসিল' জাহাজে চড়িয়া বোম্বে নগরে অবতরণ করিয়াছেন। এই সংবাদপাঠে ডেপুটী সাহেব অনেকপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কৃতবিদ্য জামাতার অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে স্ত্রী কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

কিন্তু কলিকাতা রূপ সমুদ্র হইতে অখিলভূষণ নামক রত্নটি বাছিয়া বাহির করা সহজ নহে। অখিলের একটি আত্মীয় চাঁপাতলার একটা মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন, ডেপুটী সাহেব হ্যাটকোটে সজ্জিত হইয়া সেই মেসে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্বদিন প্রভাতে বোম্বে মেলে অখিলভূষণ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিলেন, এবং সেই মেসেই আহারাদি শেষ করিয়া সেই রাত্রেই গোয়ালন্দ মেলে ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দাদা বিনয়ভূষণ বাবু ঢাকার কালেক্টরের অধীনে কেরাণীগিরি করিতেন।

ডেপুটী শ্বশুরের কর্ম্মস্থানে না গিয়া অখিলভূষণ ঢাকায় তাহার সহোদরের সঙ্গে আগে দেখা করিতে চলিয়াছে শুনিয়া ডেপুটী সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে যেন কে সবলে বেত্রাঘাত করিল। জামাতার অকৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিবিড়শ্মশ্রুশোভিত কৃষ্ণবর্ণ মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। এ মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ভ্রমে পড়িয়া গত তিন বৎসরে সাড়ে দশ হাজার টাকা জলে ফেলিয়াছেন। কতদিনের উপার্জ্জনে তিনি সে টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, এবং টাকাগুলি এ ভাবে অপব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা কোম্পানীর কাগজ কিনিলে বাৎসরিক কি পরিমাণ সুদ তাঁহার পকেটে আসিত, তাহা সহসা তাঁহার মানসনেত্রে সমুদিত হওয়ায়, তিনি দুর্ভাগিনী কন্যার কষ্টের কথাও বিস্মৃত হইলেন।

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে মর্ম্মাহত হইয়া নববর্ষদিবসে ডেপুটী সাহেব কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই কোথা ?", তখন তাঁহার সুবিপুল ডেপুটী-গর্ব্ব একেবারে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই বোম্বাই হইতে আজও কলিকাতায় পৌছেন নাই।" সোফীর মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

৫

ঢাকা বিভাগে ডেপুটী সাহেব অনেকদিন হাকিমী করিয়াছেন। ঢাকার কালেক্টরীতে অনেকের সঙ্গেই তাঁহার জানাশুনা ছিল। একটি বন্ধুকে অখিলভূষণের গতিবিধির বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের উত্তরে তিনি যে সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কে পিনাল কোডের সকল ধারা একত্র জমাট বাঁধিয়া গেল। তিনি জানিতে পারিলেন, অখিলভূষণ বাগ্‌চী তাঁহার দাদার গৃহে ফিরিয়া হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তিনি চটিজুতা পরেন, এবং সর্ব্বাঙ্গে হ্যাটকোট চড়াইয়া বসিয়া থাকেন না। বিলাতফেরতের এমন শোচনীয় অধঃপতনবার্ত্তা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং অখিলভূষণের প্রকৃতিস্থতায় তিনি অত্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন, অখিলভূষণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে

সম্মত আছেন, এবং তাঁহার দাদা সুন্দরী কন্যার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়শ্চিত্তপ্রথার ও চটিজুতার উপর হাড়ে চটিলেন; কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না।

সেইদিন ডেপুটী সাহেব অখিলভূষণের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। বাঙ্গালা ভাষায় পত্রখানি লিখিত হইলেও ডেপুটী সাহেব তাহা পড়িবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণেষু,

"সবিনয় নিবেদন,—

"শাস্ত্রানুসারে আপনি আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং সামাজিক হিসাবে আপনি আমার শ্বশুর, আমার পূজনীয় ব্যক্তি; সেই জন্য আপনাকে দেশীয় প্রথা অনুসারে শ্রীচরণেষু পাঠ লিখিয়া যদি পাশ্চাত্যসভ্যতাসুলভ শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি আমার সে ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। আপনার অনুগ্রহেই আপনার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে আমি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছি, এ জন্য আমি আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

"কিন্তু আমার ব্যবহার আপনার নিকট কিছু অকৃতজ্ঞের ন্যায় বোধ হইয়া থাকিবে, সেই জন্য আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া উচিত; আমার কথাগুলি শুনিলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

"আপনি যখন আপনার কন্যার বিবাহের বিবজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন, সে সময়ে যদি আপনি বিজ্ঞাপনে এ কথাও লিখিতেন যে, আপনার নির্দ্ধারিত জামাতা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আপনার কন্যার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না, তাহা হইলে আপনার বিজ্ঞাপিত প্রলোভন সত্ত্বেও বোধ করি কোনও ভদ্রসন্তানই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইত না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে আমি সে কথা জানিতে না পারিলেও, বিবাহের পর সেই রাত্রেই তাহা জানিতে পারিয়াছি;—আপনার সুশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না তেজস্বিনী কন্যা আমাকে স্পষ্টাক্ষরে এ কথা জানাইয়াছেন। তখন ফিরিবার পথ ছিল না।

"ফিরিবার পথ থাকিলে হয় ত ফিরিতাম। দাদার অনুমতি না লইয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণের অজ্ঞাতসারে গোপনে আপনার কন্যাকে যে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে কেবল বিলাতে যাইবার প্রলোভনে। দরিদ্রের সন্তান আমি, আমার

সেই আশা পূর্ণ হইবার আর কোনও উপায়ই ছিল না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়েই টাকা লইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছিলাম; তাহাই যথেষ্ট আত্মাবমাননা, তাহার উপর আপনার কন্যা-কৃত এই অপমান;—সকল দিক চাহিয়া আমি নীরবে এ অপমান সহ্য করিয়াছি।

"এ অপমান সহ্য করিয়াছিলাম বলিয়াই ইংলণ্ডে পৌছিয়া আপনার কন্যাকে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। যাহাকে আমি শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিয়াছি, তাহার বুদ্ধির কোনও ত্রুটী থাকিলে উদারভাবে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ভবিষ্যৎজীবনের সুখের পথ একটু প্রশস্ত করিবার আগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। স্নেহে ও প্রেমে, কোমলতায় ও সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করিবার চেষ্টা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া আমার মনে হয় নাই। কিন্তু আপনার কন্যা আমাকে আমার পত্র পাইয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ প্রায় তিন বৎসর তাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। সে পত্র আজ আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনার কন্যার শিক্ষা ও শিষ্টাচারের এই নিদর্শনটি নানা কারণে আপনার নিকট পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইলাম না। আমার বয়স হইয়াছে, লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছি, কিন্তু আমার প্রধান অপরাধ, আমি দরিদ্র। আমার এই দরিদ্রতার প্রতি ভাগ্যবানের দুহিতার এইরূপ মর্ম্মান্তিক উপহাস আমি নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিব, এতখানি উদারতা আমার নাই।

"আপনি আমার বিলাত-প্রবাসের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আমি তাহার কড়া ক্রান্তির হিসাব রাখিয়াছি। আমি যত শীঘ্র পারি, এই টাকা বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হারে সুদসমেত পরিশোধ করিব। এই সঙ্গে যথারীতি হ্যাণ্ডনোট পাঠাইলাম। আপনার ঋণপরিশোধের জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

"শাস্ত্রানুসারে আপনার কন্যা আমার পরিত্যাজ্যা নহেন; আমি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দায়ী। যদি তিনি আমার গৃহে আসিয়া হিন্দুমহিলার মত থাকিতে সম্মত হন, হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক নীতির লঙ্ঘন না করেন, তাহা হইলে আমি প্রসন্নমনে আমাদের দরিদ্রকুটীরের এক অংশে তাঁহাকে স্থানদান করিতে সম্মত আছি। আর যদি তিনি দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতে অসম্মত হন, বা তাঁহার শিক্ষা ও শিষ্টাচারসুলভ রুচির পরিত্যাগে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আমার অবস্থানুসারে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিব। আমি দরিদ্রের সন্তান—যাহাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে পারি, যে

আমাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে না, এরূপ কোনও গৃহস্থকন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইব। দাদাও তাহারই আয়োজন করিতেছেন।

"আমি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; বিলাতী পোষাক ত্যাগ করিয়া দেশী ধুতী চাদর পরিতেছি; বিজাতির ও বিধর্ম্মীর নামের নকল করা নাম পরিত্যাগ করিয়া পিতা মাতার প্রদত্ত শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার গাউনপরিহিতা কন্যা সম্ভবতঃ এ সকল সহ্য করিতে পারিবেন না। গরীব গৃহস্থের বধূর মত লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া পরিজনবর্গের সেবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকিলে, আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই,—এ কথা আপনি তাহাকে বলিতে পারেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

"প্রণত

"শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী।"

পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া ডেপুটী সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করতলে মস্তক-স্থাপন করিয়া কি ভাবিলেন; তাহার পর পোষাক বদলাইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া আবার ফিরিলেন, এবং আরদালীর হস্তে পত্র দুইখানি দিয়া তাহা সোফীকে প্রদান করিতে বলিলেন।

স্থানীয় পোষ্টআফিসে উপস্থিত হইয়া তিনি ঢাকায় টেলিগ্রাফ্ করিলেন,—যেন তাঁহার জামাতা এক সপ্তাহ কাল বিবাহ বন্ধ রাখেন।

দুই তিন ঘণ্টা নদীতীরে পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে ডেপুটী সাহেব বাঙ্গলোয় ফিরিলেন। ধীরে ধীরে সোফীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরে একটা হারিকেন-লণ্ঠন মিট্ মিট্ করিতেছে—সোফী বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে; তাহার মাতা বিষণ্ণভাবে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছেন।

কোনও কথা না বলিয়া ডেপুটী সাহেব একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সোফীর শিয়রে বসিলেন, এবং ধীরে ধীরে সোফীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সোফী সেই স্নেহকরস্পর্শে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ডেপুটী সাহেব করুণার্দ্রস্বরে বলিলেন, "কাঁদিস্ কেন মা? তোর তো কোনও দোষ নাই। যদি কেহ অপরাধী হইয়া থাকে ত সে আমি। তুই এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিস্?" সোফী প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। ডেপুটী সাহেব পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সোফী মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে ঢাকাতেই যাইতে হইবে।"

ডেপুটী বলিলেন, "তোমাকে মেমসাহেব করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তোমার জন্মকাল হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালী গৃহস্থকন্যার—গৃহস্থবধূর শিক্ষা তোমাকে শিখাই নাই। অখিল যেমন চায়, সে ভাবে চলিতে পারিবে ?"

সোফী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

পরদিন প্রভাতে অখিলভূষণের নিকট টেলিগ্রাম গেল,—"আমরা যাইতেছি; তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"

সুতরাং অখিলভূষণের আর বিবাহ করা হইল না। যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে শ্রীমতী সুমতি দাসী শাঁখা ও শাড়ী পরিয়া সিঁথায় সিঁদুর দিয়া অবগুণ্ঠনবতী হিন্দু-বধূর ন্যায় পাকস্পর্শের ভোজে কুটুম্বগণের পাতে অন্নব্যঞ্জন দিতে লাগিল।

মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল অতঃপর হ্যাট কোট ছাড়িয়া চোগা চাপকান ধরিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি আর অখাদ্য খান না, এবং মাথায় একটি খাটো টিকি রাখিয়াছেন !

কিন্তু সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল পঞ্চদশ বৎসরের সার্ভিসের পর গবমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—সার্ভিস-লিষ্টে তাঁহার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নাম বসান হউক—"বাবু হরিশচন্দ্র সান্যাল।"

শ্রীজলধর সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজ ও সামাজিকতা।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশে ও ইউরোপের অধিকৃত প্রায় সকল উপনিবেশে জন্ম ও মৃত্যুর সামঞ্জস্য থাকিতেছে না ; অর্থাৎ, যত লোক প্রতিবৎসর দেহত্যাগ করিতেছে, তত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে না। আবার যত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদের দশ আনা ভাগ অতি শৈশবেই কালকবলিত হইতেছে। সমাজে যাহাদের স্বচ্ছল অবস্থা, তাহারাই সন্ততিবৃদ্ধির বিরোধী, যাহাতে সন্তানোৎপাদন অল্প হয়, অথবা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, সে পক্ষে অনেকেরই চেষ্টা। এই কারণে সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকহিতৈষী অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন। এই ভাবে চলিলে, তাঁহাদের আশঙ্কা যে, কালে জাতির লোপ সম্ভব হইতে পারে। সুস্থ সবলকায় নরনারীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে, জাতির পুষ্টি সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, দারিদ্র্যের ভাবনাও আছে। ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ ব্যক্তিগত বিলাসবৃদ্ধি ও ভোগায়তন দেহের ভোগপুষ্টি। কাজেই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি

হইলেই ব্যক্তিগত বিলাসের সঙ্কোচসম্ভাবনা ঘটে। এই সঙ্কোচের ন্যূনাধিক্যে দারিদ্র্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। ফলে, ইউরোপের সুসভ্য নরনারী বংশবৃদ্ধির প্রতি একেবারেই উদাসীন হইয়াছেন। এই ঔদাস্যের জন্য ইউরোপের সকল প্রদেশেই লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে কমিতেছে, সেনাবিভাগে যোগ্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির অভাব অনুভূত হইতেছে, সেনাসংগ্রহের কার্য্যে বৎসরে বৎসরে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটিতেছে। তাই, ইউরোপের সর্ব্বপ্রদেশেই এবং বহু উপনিবেশেই এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে।

সম্প্রতি ইউরোপে এই কথা লইয়া চারিখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিখানি বহি লইয়া খুব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে।

(১) Eugenics, paper read before the Sociological Institute by Francis Galton.

(২) The Confessions of a Physician, by V. Veresaeff.

(৩) The Fertility of the Unfit, by W. A. Chapple.

(৪) Unconcious Therapeutics, by Dr. Schoefield.

উপরে ইংরেজীতে চারিখানি বহির নাম প্রদত্ত হইল। লেখক চারি জন ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিযার বিখ্যাত পণ্ডিত ও দেহতত্ত্ববিদ্ বলিয়া পরিচিত।

নানা প্রদেশের জন্মসংখ্যার সংকোচক্রমের হিসাব দেখাইয়া বুঝাইব, কেমন ত্বরিতগতিতে ইউরোপের লোকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে।

হাজারকরা জনসংখ্যার হিসাব।

	১৮৭৫।	১৮৯৯।	সঙ্কোচ।	
জর্ম্মনী	৪০	৩৫.৯	৪.১	[illegible]
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	৩৫	২৯.৩	৫.৭	
আয়ারল্যাণ্ড	২৬	২২.৯	৩.১	
ফ্রান্স	২৬	২১.৯	৪.১	
	১৮৮০।	১৮৯০।		
মার্কিণ দেশ	৩৬	৩০	৬.০	
		১৯০০।		
নিউজীল্যাণ্ড	৪০.৮	২৫.৬	১৪.৪	
	১৮৬০।	১৯০২।		
কুইন্সল্যাণ্ড	৪৭.৮	২৭.৭	২০.১	
	১৮৮৮	১৯০৩		
এডিলেড	২৭.৭২	২২.২৮	৫.৪৪	

কেবল জন্মসংখ্যার যদি এমন হ্রাস হইতে থাকিত, তাহা হইলে তেমন ভাবনার কথা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হার খুব বাড়িয়া যাইতেছে; দুর্ব্বলদেহ, রুগ্ন, প্রমাদগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি অপটু

জনের সংখ্যা বাড়িতেছে। সেনাবিভাগের জন্য লোকনির্ব্বাচন করিতে গেলে শতকরা চল্লিশ জন বাদ পড়িতেছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোককেই চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

এইবার চারিখানি পুস্তকের পরিচয় দিব। উহার চারি জন লেখক চারি-জাতীয়। প্রথম ইংরেজ; ডাক্তার গ্যাল্টন এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ও শারীরতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসক। দ্বিতীয়, রুসীয়; ডাক্তার ভারসেফ ইউরোপবিখ্যাত চিকিৎসক, এবং নির্ভীক স্বাধীনচেতা পুরুষ। তৃতীয়, নিউজীল্যাণ্ডের ইংরেজ; ডাক্তার চ্যাপ্‌ল্ এনাটমী ও চিকিৎসা শাস্ত্রে দেশপ্রসিদ্ধ। চতুর্থ, মার্কিন দেশের হইলেও; জাতিতে জর্ম্মণ; ডাক্তার শফিল্ড মার্কিণে সর্ব্বজনপ্রশংসিত নিদানবিদ্ ও লক্ষণজ্ঞ বলিয়া পরিচিত।

ডাক্তার গ্যাল্টন বলেন, আমরা গো-অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের বংশবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ যত্নবান, আর মনুষ্যবংশবৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন। জীবসৃষ্টি পশু ও মানুষের পক্ষে এক নিয়মে পরিচালিত; কারণ, উহা জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। ফরাসী পণ্ডিত লামার্কের জীবতত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি যদি সর্ব্বজনমান্য হয়, তবে উহা মনুষ্যোৎপত্তি বিষয়ে প্রযোজ্য হইবে না কেন? লামার্কের সিদ্ধান্তানুসারে, তথা ইংরেজ প্যারী নিস্‌বেটের নির্দ্দেশ মত, গো-অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুজাতির পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হইতেছে; মানুষেরও ঠিক সেইভাবে হওয়া উচিত। গ্যাল্টন বলেন যে, মানুষ সামাজিক জীব, জন্মপারম্পর্য্য হিসাবে মানুষের অস্তিত্ব অনাদি বলিলেও চলে; মানুষ চিরজীবী হইয়া থাকিতে চাহে, চিরসুখী হইয়া থাকে। জীবন ও সুখভোগ দেহের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সুসন্তান-উৎপাদন মানুষের প্রধান ধর্ম্ম ও একমাত্র কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে, মানুষ সমাজের দায়ে দায়ী—ভগবানের দৃষ্টিতেও পাপী। বিবাহ এই কর্ত্তব্যসাধনের প্রশস্ত উপায়। এই বিবাহপদ্ধতি সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া লামার্কের সিদ্ধান্তানুসারে নরনারীকে সম্মিলিত হইতে দিলে, অচিরে মনুষ্যসমাজে সবলকায় লোকের প্রাদুর্ভাব হইবে।

রুসীয় ডাক্তার ভরসেফ ও নিউজীল্যাণ্ডের ডাক্তার চ্যাপ্‌ল্ এই দুই জনের প্রায় এক মত। তবে কার্য্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ডাক্তার ভরসেফ বলেন যে, বিলাসের অতিমাত্র বৃদ্ধিতে সমাজের এমন দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সুরাপানে ও অসংযত ও অবাধ ব্যবহারে বংশপরম্পরায় কত রকমের উৎকট রোগ যে সমাজদেহে প্রসারিত হইয়া যায়, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। সুরাপানে উন্মাদ, অপস্মার, যক্ষ্মা, দৃষ্টিহীনতা, মন্দাগ্নি, শিরঃপীড়া, যকৃতের দোষ, উদরাময়, প্লীহাবৃদ্ধি ও হৃদ্রোগ জন্মে। সুরাপায়ীর বংশে হাবা, কালা, বোবা, ক্রোধন, নিত্যশঙ্কিত ও বিহ্বল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অবাধ ও অসংযত সহবাসবিলাসে বিবিধ কুৎসিত রোগ, কুষ্ঠ, উন্মাদ, অন্ত্ররোগ, যক্ষ্মা, উদরাময়, বিস্ফোটক, দৃষ্টিহীনতা, যকৃত ও প্লীহার বিকার, অনিদ্রা, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, বাধক, পুরুষত্বহানি, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। লম্পটের বংশে ন্যুব্জদেহ, খর্ব্বকায়, চিররোগী, দুর্ব্বলচিত্ত, শ্বিত্রী, কুষ্ঠী জন্মিয়া থাকে। ডাক্তার ভারসেফ বলেন, এই সকল রোগগ্রস্ত লোকের সন্ততি সকল অবশ্যই অন্নভোগী, অল্পায়ু হইবে। এই যে অতিমাত্রায় শিশুর মৃত্যু ঘটিতেছে, 'ইনফ্যান্‌টাইল লীভারে'র প্রকোপ বাড়িয়াছে, ইহার কারণই পিতামাতার অত্যাচার। এই ভাবে যাহারা মরিবার, তাহারা মরিবেই; চিকিৎসায় তাহাদের বাঁচাইয়া রাখা চলিবে না। চিকিৎসক শত চেষ্টা করিলেও, এমন অপূর্ণ বিকৃত মানুষের শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না। সৈন্যসংগ্রহ করিবার সময়ে সেনাবিভাগে এখন শতকরা চৌদ্দ জন যোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়। কাজেই বাছা

শতকরা আশী জনকে সমাজের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে। প্রকৃতি দেবীও নিজের অনতিক্রমণীয় ব্যবস্থানুসারে অযোগ্যকে বাদ দিতেছেন। যে বিষ সমাজদেহে অনুস্যূত হইয়াছে, তাহা আপনা-আপনি নিঃসৃত না হইলে, মানুষ এখন নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারিবে না। তবে দেহের বল ও গঠনপ্রণালী বুঝিয়া পৈতৃক রোগের অল্পাধিক্যের সামঞ্জস্য বুঝিয়া, নর-নারীকে সম্মিলিত হইতে দিলে, কালে মনুষ্যসমাজ উন্নত হইতে পারে। বিবাহটা খাস 'লভে'র ও লোভের বিষয় না রাখিয়া, উহা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার অধীন করিলে, মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ডাক্তার চাপ্‌ল্‌ উল্লিখিত মতের সহিত একমত হইলেও, জাতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথমে নারী জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। অযোগ্য, রুগ্ন, বা বিকৃতবুদ্ধি দরিদ্র স্বামীর হস্তে যে নারী পড়িবে, তাহাকে জোর করিয়া বন্ধ্যা করিতে হইবে। তাহার পক্ষে বংশবৃদ্ধি করা সামাজিক হিসাবে মহাপাপ। তিনি একরূপ অস্ত্রচিকিৎসা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন; উহার নাম Tubo-ligature of The Fallopian Tubes. অর্থাৎ, জরায়ু-পুষ্পের বিশোষন; ভবিষ্যতে আর যাহাতে নারী-জরায়ু হইতে জীব-জন্মহেতু জীব-পরাগ (ovum) বাহির হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্মেণ্ট এ ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বে ডাক্তার ভারসেফ সুরাপান ও অতিলাম্পট্যজনিত যে সকল রোগের কথা কহিয়াছেন, সেই সকল রোগ যে সকল নর বা নারীর দেহে আছে, সন্তানোৎপাদন ও গর্ভধারণ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহার উপর যাহারা সহজেই চুরী ডাকাতী প্রভৃতি পাপকার্য্যে রত, যাহারা উপার্জ্জনে অক্ষম ও স্বভাবতঃ অলস ও স্থূলবুদ্ধি, তাহাদিগকেও বাদ দিয়া রাখিতে হইবে।

ডাক্তার শফীল্ড বলেন, এক পক্ষে সমাজে অতি ধনবৃদ্ধি, এবং অন্য পক্ষে অতি দারিদ্র্যই এই ভয়াবহ অবস্থার মূলীভূত কারণ। যাহারা অতি ধনী, তাহারা অতি বিলাসী; সুতরাং তাহারা কর্ত্তব্যভার বর্দ্ধিত করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহারা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, পেটের দায়ে তাহারা সব করিতে পারে, সব করিয়া থাকে। তাহাদের কর্ত্তব্যও নাই, কর্ত্তব্য-বোধও নাই। তাহারা একরকম সুখে দিনের পর দিন কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করে। যে সমাজে মানুষ বর্ত্তমানে মুগ্ধ, সে সমাজে সমাজিকতা হীন হইয়া পড়িবেই। ধর্ম্মই কেবল মানুষকে ভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারে; ধার্ম্মিক না হইলে আশুতৃপ্তিকর ও পরিণামবিরস বিষয় হেলায় কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষ এখন প্রবৃত্তির তৃপ্তির দিকেই অধিক মনোযোগী; কেন না, উহাতে আশুতুষ্টিবোধ আছে, সুতরাং মানুষ যতক্ষণ না বর্ত্তমান সুখে উপেক্ষা করিয়া ভাবী ও ভাব্য কর্ত্তব্য ও সুখের প্রয়াসী না হইবে, ততক্ষণ যতই কিছু কর না, এ অধঃপতনের স্রোত কেহই বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। ডাক্তার শফিল্ড হাসিয়া, যেন বিদ্রূপ-চ্ছলে বলিতেছেন,—ইউরোপীয়গণ কি মনে করেন, তাঁহাদের এই বিলাসপ্রধান, নশ্বর সভ্যতা চিরকাল জগতের আদর্শ হইয়া থাকিবে? আর একটাও ওল্‌ট্‌ পাল্‌ট্‌ হইবে না? তবে একটা উপায় আছে,—মানসশক্তি। মনঃশক্তির বৃদ্ধি করিতে পারিলে আপনা-আপনি সব ঠিক হইয়া যাইবে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব মনঃশক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে; নহিলে মানুষ আর পশু এক জীব। মনঃশক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি অনেক উৎকট-রোগ আরোগ্য হয়, আপনা-আপনি বংশবৃদ্ধি

হয়, বংশরক্ষা হয়। ডাক্তার শফীল্ড আরও বলেন যে, পিতৃত্বের (Heredity) হিসাব বুঝিয়া কথা কহিতে হইলে, দুই তিন পুরুষের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিলে চলিবে না। পিতৃত্ব-প্রবাহ অনাদি; উহার ক্রমবিকাশও অনাদি। দ্বিতীয় চার্লসের সময় গণিকা নেলগুইন ইংলণ্ডে ছিলেন। চারি শত বৎসর পরে তাঁহারই বংশে ঠিক সেই নেলগুইন আবার জন্মগ্রহণ করিল। সেই চেহারা, সেই প্রকৃতি, সেই হাবভাব,—সবই এক। এই এক ঘটনায় ত পিতৃত্বের বিজ্ঞান তৈয়ারি হয়; কিন্তু এমন অপরিলক্ষিত কত ঘটনা ত আছে! দুই পুরুষ হইতে ইউরোপের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে; পূর্ব্বে ত ভাল ছিল। সেই ভাল অবস্থার বিকাশ সমাজে ত অসম্ভব নহে। মনঃশক্তি এই অতীতগর্ভস্থ অথচ বর্ত্তমানে সংসৃষ্ট মানব-প্রকৃতির নানা ভাবভঙ্গী পুনরভ্যুত্থিত করিতে পারে। দৃষ্টান্ত,—বর্ত্তমান গ্রীস ও ইতালী, মিশর ও জাপান। শেষে মার্কিন্ ডাক্তার বলেন, যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটক, তাহার এক একটা বিস্ফোটক লইয়া স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা করিলে চলিবে না; সে ক্ষেত্রে যাহাতে শোণিত শুদ্ধ হয়—ভিতর হইতে একটা ক্রিয়া হয়, তাহাই করিতে হইবে। ইচ্ছাশক্তি বা মনঃশক্তি এই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া।

এই ব্যাপার লইয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ডে বিষম বাদ-প্রতিবাদের আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন পরে প্রকৃত সমাজ ও সামাজিকতা কি, তাহা ইউরোপবাসী বুধগণ বুঝিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এ বিষয়ের আলোচনা আমাদের মধ্যেও হওয়া উচিত। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফল আমরাও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

জরাণু।

জরা রোগের—বার্দ্ধক্যেরও একটা 'ব্যাসিলস্' বা 'মাইক্রোব' আছে। এই জীবাণুকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে জরা মনুষ্যদেহকে আর জীর্ণ করিতে পারিবে না, বার্দ্ধক্যপ্রভাবে মনুষ্যদেহ আর স্থবিরতা প্রাপ্ত হইবে না। ফরাসী রাজধানী পারী নগরের পাস্তুর বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেচ্নীকফ সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, জীবদেহ তথা মনুষ্যদেহ নানাবিধ জীবাণুর যুদ্ধক্ষেত্র। মনুষ্যদেহে অহরহ একটা সংগ্রাম চলিতেছে। এক প্রকারের মাইক্রোব অন্য প্রকারের ব্যাসিলসকে খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে,—এ চেষ্টা সামান্য চেষ্টা নহে, প্রাণান্তপণ চেষ্টা। ফ্যাসোসাইট নামক এক প্রকারের কীটাণু আমাদের দেহে নিত্য বিরাজমান; দেহরক্ষার পক্ষে ইহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। বাহিরের নানা প্রকারের জীবাণু দেহে প্রবেশলাভ করিলে, ফ্যাসোসাইট, উহাদের তাড়া করিয়া,—রণচাতুরীর পদ্ধতি-অনুসারে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলে। ফ্যাসোসাইট দেহে আছে বলিয়া আমরা অহরহ রোগাক্রান্ত হই না। কিন্তু এই ফ্যাসোসাইট প্রথমে আমাদের দেহরক্ষার হেতু হইলেও, ইহারাই পরে উহার নাশের কারণ হইয়া উঠে। ফ্যাসোসাইটের দুইটি স্বতন্ত্র জাতি আছে। এক মাইক্রোফেজ, অপর ম্যাক্রোফেজ। ম্যাক্রোফেজ ফ্যাসোসাইটই মানুষকে বার্দ্ধক্যে উপনীত করে। উহাদের প্রকৃতি রাক্ষসসদৃশ; নরদেহে উহাদের আহার্য্য না পাইলে শেষে উহারা নরদেহকেই ভক্ষণ করিতে বসে। প্রথমে মস্তিষ্কের কক্ষগুলিতে উহারা গিয়া আড্ডা করে। উহাদের প্রভাবে স্নায়ব দৌর্ব্বল্য ঘটে। তখন উহারা যৌবনসামর্থ্যসূচক সকল পদার্থই আহার করিতে থাকে। ইহাই মনুষ্যদেহে বার্দ্ধক্যের কারণ।

ম্যাক্রোফেজ ত রাক্ষস, কিন্তু মাইক্রোফেজ রক্ষক। মাইক্রোফেজ নরদেহ রক্ষা করিবার সবিশেষ চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলেই মানুষ সহজে বৃদ্ধ হইতে চাহে না, এই চেষ্টার জন্তই মানুষের সহসা বার্দ্ধক্যবোধ হয় না। স্নুতরাং বলিতে হইবে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি বার্দ্ধক্যের প্রতিকূল। তাহা হইলেই বলিতে হয়, জরারোগ চিকিৎসার অধীন, বা বিষরীভূত অবস্থা। এখন কথা হইতেছে, এই ম্যাক্রোফেজগুলিকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে নরদেহে আর জরার অবস্থান সম্ভব হয় না। অধ্যাপক মহাশয় এই কীটাণুগুলিকে মারিবার উদ্‌যোগে আছেন। যদি উহাদিগকে মারিবার প্রকৃষ্ট উপায় বাহির হয়, তাহা হইলে মানুষ আর বৃদ্ধ হইবে না। পারী নগরের পুরুষদিগের মধ্যে এই বিষয় লইয়া অল্পবিস্তর আলোচনা হইতেছে, কিন্তু নারীসমাজে অধ্যাপক মেচনীকফের কথা লইয়া খুব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। যাহা হউক, শীঘ্রই পাস্তুর ইনষ্টিটিউট হইতে মেচনীকফের এই সিদ্ধান্তের আলোচনা হইবে।

সমাজসংস্কার।

মিঃ এস্. এচ্. সুইনী "পজিটিভিষ্ট রিভিউ" পত্রে ভারতের সমাজসংস্কারচেষ্টার সমালোচনা করিয়াছেন। কোনও বিদেশী ইউরোপীয়কে এমন সকল দিক দেখিয়া—সর্ব্বসামঞ্জস্ত করিয়া কথা কহিতে আমরা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত সুইনী বলেন, ভারতের হিন্দুদিগের মধ্যে সমাজসংস্কারচেষ্টা এমন মন্থরগতিতে চলিতেছে কেন? হিন্দুদিগের সমাজসংস্কার চারি পাঁচটি কার্য্যে শেষ হইয়া যায়। বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিভেদের উচ্ছেদ, বাল্যবিবাহবিরোধ ও আন্তর্জাতিক বিবাহ। এই কয়টি ব্যবস্থা অনায়াসে হিন্দুসমাজে চালাইতে পারা যায়। কিন্তু একটা বড় অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা সমাজসংস্কারক, তাঁহারা ইংরেজী প্রেমে সদা প্রমত্ত। তাঁহারা ইংরেজসমাজের সকলই ভাল দেখিয়া থাকেন, এবং ইংরেজসমাজের আদর্শে নিজেদের সমাজ গড়িতে চাহেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছা সাধু ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু এই মনোগত ভাব হিন্দু সামাজিকগণের নিকটে প্রকাশ করিলে ফল বিপরীত হয়। সকল জাতিরই একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধ আছে। এই অস্তিত্বজ্ঞানে জাতীয় অহঙ্কারের পুষ্টি হইয়া থাকে। হিন্দু প্রাচীন জাতি; দীর্ঘ অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতি জাতীয়তা-স্পর্দ্ধাকে সুপুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজ যেমন নিজের জাতীয় সকল পদ্ধতিকে সুন্দর দেখিয়া থাকেন, হিন্দুও তেমনই নিজের জাতীয় পদ্ধতি মমতার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সুতরাং ইংরেজের সমাজশৃঙ্খলাকে সুন্দরতর বলিয়া পরিচিত করিলে হিন্দুর জাতীয়স্পর্দ্ধাবুদ্ধিতে একটু আঘাত লাগিবেই। ফলে সমাজসংস্কারকের চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। মিষ্টার সুইনী আরও বলেন যে, হিন্দু যতই কেন ইংরেজী শিখিয়া সভ্য ভব্য হউক না, হিন্দুসমাজ এখনও সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রাহ্মণশাসিত। এই ব্রাহ্মণশাসন কেবল ধর্ম্মকর্ম্মে—পারলৌকিক মঙ্গলচেষ্টায় পরিস্ফুট নহে; সংসারের তাবৎ সুখদুঃখজনক কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের বন্ধনপ্রথা অপূর্ব্ব; উহাতে বিষয় ও ধর্ম্মকর্ম্ম পৃথককৃত নহে। বিষয় ও ধর্ম্ম এক পারলৌকিক বন্ধনে বিজড়িত। কাজেই ব্রাহ্মণশাসনকে সহসা কেহ ব্যাহত করিতে পারে না। আরও একটু কথা আছে। হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত অধিকার চুক্তিজাত নহে;—সহজাত। জাতিভেদ এই সহজাত অধিকারের অভিব্যক্তিমাত্র। এই সহজাত অধিকার পিতৃত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। ব্রাহ্মণগৃহে, ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণের অধিকারে অধিকারী হওয়া যায়। যোগ্যতা এই

অধিকারের বিস্তারপক্ষে সহায়তা করে বটে, কিন্তু অযোগ্যতা উহার তেমন সঙ্কোচ করিতে পারে না। সকল দেশের সকল সমাজে এই সহজাত অধিকারপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু হিন্দুসমাজে উহা পদ্ধতীকৃত; তাই অতি দৃঢ় ও বিচ্যুতিসম্ভাবনাশূন্য।

এই সব বিষয় ভাবিয়া দেখিয়া শেষে মিষ্টার স্থইনী বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে এখন রাজনীতিক সাম্যের আন্দোলন হইতে থাকিলে, পরে আপনা-আপনিই সমাজসংস্কারের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। তিনি সংস্কারকগণকে দেশীয়ভাবাপন্ন ও দেশাচারপরায়ণ দেখিতে চাহেন। তিনি বলেন, হিন্দুর আদর্শেই হিন্দুসমাজের সংস্কার কর্ত্তব্য।

নূতন আবিষ্কার।

মিশর দেশে বটলার প্রমুখ জন কয়েক ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিত পুরাতন স্তূপ সকল উৎখাত করিয়া অনেক নূতন সামগ্রীর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম আবিষ্কার

যীশুর লুপ্ত বাণী।

যীশুখ্রীষ্ট বাইবেলে যে সব কথা কহিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ছাড়া তাঁহার অনেক উপদেশ লুপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ, বর্ত্তমান বাইবেল পুস্তক অসম্পূর্ণ,—পুরাতন বৃহত্তর গ্রন্থের ছিন্নাংশমাত্র। মিশর দেশের স্তূপ সকল হইতে পুরাতন ভূর্জ্জপত্রে লিখিত যীশুর যে সকল উপদেশকথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রচলিত বাইবেলের উক্তি সকল হইতে পৃথক ভাবের না হইলেও, উহাতে বেদান্তের মায়াবাদের ছায়া যেন পরিস্ফুট আছে। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাধারত্ব এবং সৃষ্ট জগতের নশ্বরত্ব এমন ভাবে বলা আছে যে, যাঁহারা ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যার কথা জানেন, তাঁহারা দুই উক্তির সৌসাদৃশ্য বেশ দেখিতে পাইবেন। এই সকল ভূর্জ্জপত্রলিখিত অতি প্রাচীন যীশুবাণী লইয়া বিলাতে ও জর্ম্মণীতে দুইখানি সুন্দর সন্দর্ভপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। জর্ম্মণ লেখক যীশুর হিন্দু দর্শনের অবগতির কথা প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সচেষ্ট; ইংরেজ লেখক যীশুর স্বাতন্ত্র্য ও সার্ব্বভৌম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত। এখনও সকল উৎখাত ভূর্জ্জপত্রের সকল বাণীর অনুলিপি বাহির হয় নাই।

দ্বিতীয় আবিষ্কার।

এই খনন ব্যাপারে আর এক নূতন ব্যাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে গুপ্তজাতীয় এক বৈদ্য ছিলেন; তিনি নরদেহের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দেখা যায়। শোণিতের গতি, হৃৎপিণ্ডের গতি, পরিপাকক্রিয়া, ফুস্‌ফুস্ ও ক্লোমের ক্রিয়া প্রভৃতি বহু বিষয়ের তিনি প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-তত্ত্ব আমাদের আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। ঔষধপ্রণয়ণপদ্ধতি, অস্ত্রচিকিৎসা, রোগের নিদান-বিচার প্রভৃতি চিকিৎসা কার্য্যের সকল ব্যাপারই হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুযায়ী বলিয়া মনে হয়। যে সকল ভূর্জ্জপত্রলিখিত চিকিৎসাতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনুমান হয় যে, মিশরের গুপ্ত কবিরাজ হয় আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন, নয় আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মিশর হইতে আনীত। মিশরের এই চিকিৎসকপ্রবরকে দেবতার আসন দেওয়া হইয়াছে; তাঁহার সমাধিক্ষেত্র পরে একটা মহামেলার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক, মিশরের এই উৎখাত ভূর্জ্জপত্রলিখিত সকল বিষয়ের যতই অধিক আলোচনা হইতেছে, ততই ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে, পুরাকালে ভারতের হিন্দুদিগের সহিত মিশরের গুপ্তগণের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। খনন কার্য্য এখনও চলিতেছে; নিত্য নূতন নূতন ভূর্জ্জপত্র পাওয়া যাইতেছে। যখন কার্য্য শেষ হইবে, তখন যে আমরা কত নূতন কথা জানিতে পারিব, তাহা অনুমান করা যায় না। অতীতের অবগুণ্ঠনে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বর্ষা।

হাসিমুখে নাহি হাসি—নয়নে বারি।
আমোদিনী! সেজেছ কি বিষাদ-নারী?
বাসন্তী-বসনখানি চাঁদিনীর আশ্‌মানি
দূরে ফেলি' নেছ টানি ধূসর শাটী।
অধোমুখী, আঁখিজলে ভিজিছে মাটী।

ভ্রমরীকবরীগুচ্ছ দিয়াছ খুলে;
সুকণ্ঠে কোকিল-কুহু গেছ কি ভুলে?
বিরাগে বিভলচিত্ত শিখীরে শিখালে নৃত্য,
ফেলে দিলে অঙ্গরাগ কপোল-তুলি,
কদম্ব-কেতকী তাই তরুতে ঝুলি!

নিবিড় কুন্তলে তোর নিবিড় দিশি,
তোরি অশ্রু ঝরিতেছে দিবসনিশি;
তোরি বেদনার বাণী দূর গুড়্ গুড়্ ধ্বনি,
তুমি শিহরিলে নভে বিজরী চমে।
প্রাবৃট্ তুমি কি—না এ নয়ন ভ্রমে?

এ কি সাজে এলে আজ বসন্তবধূ!
আননে আননি কেন আমোদ-মধু?
কুশকাশভূষা করি' এলে নন্দনের পরী,
কোথা তোর মালাকার মদন-রতি?
ব্যথিতে মরম কেন এ বেশে সতী?

খোল খোল বর্ষাসাজ লো যাদুকরী,
অশোক-ফোটান দুটি চরণে ধরি!
বসন্তবধূর বেশে, এস তুমি হেসে হেসে,
এ ঘোর বরষা যাক্ পলকে টুটি,—
অন্তরে বাহিরে থাক্ বসন্ত ফুটি'!

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। "আমার কাচনির্ম্মাণশিক্ষা" উল্লেখযোগ্য। "মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ওয়াগ্‌লে বি. এ. গত ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাচের কাজ শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। তিনি সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কলিকাতার সন্নিকটস্থ টিটাগড়ে কাচের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি যেরূপ অধ্যাবসায় ও দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাচ-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নিজ মুখে বর্ণিত তদ্বিবরণী উপন্যাসের

জার কৌতূহলপ্রদ।" "ভারতী"-সম্পাদিকা সেই বিবরণ প্রবন্ধে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ওয়াগ্‌লে উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ, প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রেও ওয়াগ্‌লের এই অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "মহর্ষির জন্মোৎসব" পারিবারিক সম্পত্তি। পিতৃভক্ত পুত্রের ভাবোচ্ছ্বাস সমালোচনার তৌলে ওজন করিবার নহে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "বেদান্ত" নামক ক্ষুদ্র দার্শনিক প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভাষার ইঙ্গিত" নামক প্রবন্ধটি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "শূন্যবাদ" নামক প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—"ধনী ব্যক্তির সুসজ্জিত গৃহের পরিষ্কার ফরাসে ধূলিমাখা পা লইয়া কোন ইতর ব্যক্তি প্রবেশ করিলে সভ্যগণ যেরূপ বিরক্ত ও বিস্মিত হন, অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চলিত বাঙ্গলা ভাষার কোন রূপ প্রশ্রয় দেখিলে তেমনই চমৎকৃত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন, এ ক্ষেত্রে [রবীন্দ্র বাবুর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধ-পাঠের আসরে] কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের সাপক্ষতা করিতে যাওয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল।" ইহাই কি চলিত বাঙ্গলার নমুনা? "ভাষার প্রশ্রয় দেখিলে" ব্যাপারটা কি? "সাপক্ষতা" কি চলিত বাঙ্গলার দেবোত্তর, না দীনেশ বাবুর মৌরসী? স্বীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রসঙ্গ না তুলিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষসমর্থন অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারিত। সুতরাং বলিতে হইতেছে,—"বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষসমর্থন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক" না হউক, নিতান্ত অক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছিল। দীনেশ বাবুর এই ওকালতী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আশা করি, অতঃপর রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা-সভায় দীনেশ বাবু আর কাহাকেও প্রতিবাদ-রূপ অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে দিবেন না। দীনেশ বাবু যে ভাষায় প্রবন্ধটির রচনা করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, ঔষধ দিবার স্থান নাই। সাহিত্যের দরবারে এমন অপরূপ অপভাষার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সঙ্কোচ হয় না, তাঁহারাও যখন ভাষার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 'অশ্রুজলৈর্ধরাতলমভিষিঞ্চন্' রোদন করিতে থাকেন, তখন বিষ্ণু শর্ম্মার কুলীরকের অশ্রুজল মনে পড়ে। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে "বাঙ্গলা ভাষার স্বাধীন উদ্দাম গতি" নামক একটি অশ্রুতপূর্ব্ব পদার্থের উল্লেখ দেখিলাম। দীনেশ বাবুর রচনাতেই এই "স্বাধীন উদ্দাম গতি"র সন্ধান ও পরিচয় পাইয়াছি, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্গদর্শন। প্রথমেই সম্পাদকের "নৌকা ডুবি।" তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।" ওকাকুরার গ্রন্থে যাহা সূত্রাকারে বিদ্যমান, অক্ষয় বাবু তাহাই ফেনাইয়া সুবিস্তৃত প্রবন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তদতিরিক্ত কোনও নূতন তথ্যের সমাবেশ নাই। আমাদের আশা ছিল, অক্ষয় বাবুর নিজের অনুসন্ধানের ফল এই প্রবন্ধেই দেখিতে পাইব। সে আশা পূর্ণ হইল না। "প্রার্থনা" প্রবন্ধে লেখক মানবের 'যথার্থ প্রার্থনা'র সন্ধান করিয়াছেন। এই বিপুল ও জটিল বচন-গহনের মধ্যে 'যথার্থ প্রার্থনা'র লক্ষণ খুঁজিয়া পাইলাম না। শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক লেখক অনেকবার নাসিকা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহার ফলে হেঁয়ালিটি ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, এবং বক্তব্য বিষয়টি বিশদ না হইয়া ভাষার ঘূর্ণাবর্ত্তে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায় "বেদান্তের প্রথম কথা"র অবতারণা করিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান,—বেদান্ত-ব্যবসায়ী সার্ব্বভৌমিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইবার বেদান্তবাগীশ মহাশয় বঙ্গদর্শনে "খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম কথা"র সূত্রপাত করুন। "সাময়িক প্রসঙ্গ—য়ুনিভার্সিটি বিল" প্রবন্ধে অপর্য্যাপ্ত হতাশের আক্ষেপ আছে। আপাততঃ আমরাই য়ুনিভার্সিটি গড়িয়া তুলিব, এবং সেই য়ুনিভার্সিটি গবমের্ণ্টের মার্কামারা য়ুনিভার্সিটির স্থান গ্রহণ করিবে, ইহা কবির স্বপ্ন। প্রবন্ধটি ভাবের স্রোতে ভাসমান,—ইহাতে উক্তির সমর্থনে যুক্তির বদলে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অতিরিক্ত বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

প্রবাসী। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচিত "কৃষ্ণলীলা"য় অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সকল সিদ্ধান্ত প্রত্নবিৎসমাজে পরিগৃহীত না হউক, তাঁহার সত্যনির্দ্ধারণচেষ্টা প্রশংসার্হ। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত,—"পৌরাণিকযুগে যখন আর্য্য-অনার্য্য মিশ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল, নিম্নস্তরের ধর্ম্ম উচ্চস্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ দেবতাবর্গে স্থানলাভ করিয়াছিলেন।" প্রমাণ কি? লেখক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিপুল প্রতিপাদ্যের অবতারণা করিয়াছেন, এই জন্য অনেক স্থলে কেবলমাত্র সামান্য ইঙ্গিত করিয়াই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ইঙ্গিতের ভিত্তির উপর এমন গুরুতর সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আশা করি, এ বিষয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণসংগ্রহে তিনি কার্পণ্য করিবেন না। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য,—শাস্ত্রের ন্যায় সুপথ্য। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "পূর্ব্ববাঙ্গালায় দাসত্বপ্রথা" উল্লেখযোগ্য। "অসভ্য জাতির পুরোহিত" চলনসই। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের রচিত "তিব্বতে ছদ্মবেশী নিকল্‌স্‌ সাহেব" নামক প্রবন্ধটি লিপিকৌশলশূন্য হইলেও কৌতুকাবহ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর "হিমালয় দেখিয়া" একটি বিস্তৃত কবিতা। প্রমথ বাবুর যোগ্য হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "তেজা সিংহ" নামক ক্ষুদ্র গল্পে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সোম "জামষেদজী নসেরবাঁজী তাতা" প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সাহিত্যের পাঠকগণ তাহা ইতিপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কর্ম্মবীর টাটা" প্রবন্ধে অবগত হইয়াছেন। যেটুকু নূতন, উপসংহার হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা খুঁজিবার জন্য এমন দেশ অল্পই ছিল যাহা তিনি দেখেন নাই। শুধু কি দেখা? তাঁহার দেখিবার যোগ্য চোখ ছিল, ধারণা করিবার যোগ্য মন ছিল। কত দেশের কত বড়লোকের সঙ্গেই না তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি বিনীতভাবে যখন এই সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিতেন, তখন শুনিতে বড়ই কৌতূহল বোধ হইত। ইংলণ্ডকে তিনি যেরূপ জানিতেন বোধ হয় অনেক ইংরাজও তদ্রূপ জানে না; তাঁহার পারিসের জ্ঞান দেখিয়া মনে হইত তিনি এক জন পারিস-নাগরিক; নিউইয়র্কে থাকিয়া তিনি মনে করিতেন যেন বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার নিজের ক্লব-ঘরে বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার বাসভবনের জাঁক জমক দেখিয়া মনে হইতে পারে, তিনি এক জন বিলাসী ছিলেন; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার চাল চলননে বড়ই সাধাসিধা ছিল। সহজ পরিচ্ছদ পরিয়া 'পঁচিশী' খেলিতে খেলিতে তিনি যখন হাসিতেন, যখন (তখন?) সেই বিলম্বিতশ্মশ্রু বলিষ্ঠকায় চিত্তাকর্ষক

পুরুষকে দেখিয়া কোনও অপরিচিত লোক মনে করিতে পারিত না যে, তিনি এক জন এত বড় লোক। লোকে তাঁহাকে বড়মানুষ বলিয়া জানুক বা বড়মানুষ বলুক, এরূপ লঘুচিত্ততা তাঁহার ছিল না। তিনি কাহারও তোষামোদ করিতে জানিতেন না।"

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর ভাষ্য-রচনায় নিযুক্ত আছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক্ষণে স্বগ্রামে—ফরিদপুরের অন্তর্গত প্রাণপুরে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের স্মৃতিসভা দুই শত টাকা মূল্যে প্রবন্ধটি ক্রয় করিয়াছেন। রচনাটি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শুনিতেছি, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদ হইতে "উপাসনা" নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় উপাসনার সম্পাদক হইবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কতকগুলি গীতিকবিতা "লেখা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরিষদ হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের যে সংস্করণ প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই সংস্করণে পঞ্চাশখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার দুইখানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়াছেন। এ সংবাদ অনেকের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবে। সরকার মহাশয় উপন্যাস দুইখানি মুদ্রিত করিতেছেন না কেন?

চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থের সম্পাদক সুপণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রায় এক বৎসর রোগভোগ করিতেছেন। আশা করি, তিনি সত্বর নিরাময় হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রভুপাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করি।

রঙ্গালয়-সম্পাদক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি উপন্যাস লিখিতেছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাবুর নূতন উপন্যাসের নাম "সাধের বৌ"। দক্ষিণসাবাজপুরের সমুদ্রপ্লাবন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার আখ্যানবস্তুর কল্পনা করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ নাটক-কার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক সম্প্রতি সমাপ্ত করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে এই নূতন নাটকের 'মহলা' চলিতেছে; শীঘ্র অভিনীত হইবে।

মে মাসের "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিনে" মিসেস্ নাইট শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের রচিত "উজীর নুরুদ্দীন" নামক গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। গল্পটি প্রথমে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা গল্পটির প্রশংসা করিতে পারি নাই। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'।

আনন্দের বিষয়, "উড়িষ্যার চিত্র" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিতেছেন।

রামচন্দ্র কবিভারতী।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়দেশের (বঙ্গদেশের) বেরবতী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র কবিভারতীর জন্ম হয়। বেরবতী গ্রামের বিষয় কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে, উহা বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে কাত্যায়ন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই কাত্যায়ন-গোত্র-সম্ভূত ছিলেন না; অতএব রামচন্দ্র উক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের বংশধর নহেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বেও বঙ্গে ব্রাহ্মণ জাতির বাস ছিল। সম্ভবতঃ, রামচন্দ্র কবিভারতী সেই আদিম বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গে সেই সকল আদিম ব্রাহ্মণের সবিশেষ প্রভাব ছিল না। যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য কবি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তিনি তথায় বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। যখন দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু সিংহলে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সিংহলের জয়বর্দ্ধনপুরে উপস্থিত হন। পরাক্রমবাহু ১২৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলে রাজত্ব করেন। অতএব, রামচন্দ্র কবিভারতী ঐ সময়ের মধ্যে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। তৎকৃত বৃত্তরত্নাকরপঞ্চিকা-পাঠে জানা যায়, ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লঙ্কায় উপস্থিত ছিলেন।

জয়বর্দ্ধনপুরে সিংহলের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাহুল সংঘরাজের সহ রামচন্দ্র কবিভারতীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীরাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট সমগ্র বৌদ্ধ ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ত্রিরত্নের আশ্রয়গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ভক্তিশতক নামে একখানি সংস্কৃত কাব্যের রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকৌশল দেখিয়া রাজা পরাক্রমবাহু অত্যন্ত প্রীত হন, এবং গ্রন্থকারকে "বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী" এই উপাধি প্রদান করেন। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে একখানি সুবর্ণপদক প্রদান করেন, এবং তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মোপদেশকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি বৃত্তমালা নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। নানা ছন্দের উদাহরণস্বরূপ তিনি যে সকল শ্লোকের রচনা করিয়াছেন, তাহার

প্রায় সমস্তই মহানেত্রপ্রসাদ নামক ভিক্ষুর জীবনচরিত অবলম্বনে লিখিত। শ্রীকেদারভট্ট-প্রণীত বৃত্তরত্নাকর নামে যে ছন্দোগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, রামচন্দ্র কবিভারতী তাহারও এক সুন্দর টীকা বিরচিত করেন। এই টীকার নাম বৃত্তরত্নাকরপঞ্চিকা।

ভক্তিশতক গ্রন্থের উপসংহারে কবি আপনার এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"দেদীপ্যমান সূর্য্যবংশে আদিত্যস্বরূপ রাজাধিরাজেশ্বর লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহু যখন সুনীতিপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র কবিভারতী শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদায়ক ভক্তিশতক গ্রন্থের রচনা করেন।" (১)

বৃত্তরত্নাকরপঞ্চিকা গ্রন্থে কবি স্বীয়পরিচয়প্রদানচ্ছলে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ত্রিপিটকাচার্য্য পূজ্যপাদ গুরু শ্রীরাহুলের নিকট যিনি নির্ম্মল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রত্নত্রয়ের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি লঙ্কেশ্বরের নিকট হইতে বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ শ্রীমান্ রামচন্দ্র কবিভারতী বৃত্তরত্নাকরের এই ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।" (২)

শ্রীরাহুলের প্রতি রামচন্দ্র কবিভারতীর অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি বৃত্ত-রত্নাকর-টীকায় লিখিয়াছেন,—

"বিদ্বান, ষড়ভিজ্ঞ, ত্রিপিটকধারী, মৌর্য্যকুলচন্দ্র রাহুল নামক মুনি জন্মে জন্মে আমার মিত্র (গুরু) হউন।" (৩)

---

(১) ভাস্বত্তাম্বুকুলাম্বুজন্মমিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে
শ্রীলঙ্কাধিপতৌ পরাক্রমভুজে নীত্যা মহীং শাসতি।
সদ্গৌড়ঃ কবিভারতী ক্ষিতিসুরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রোতৄণামকরোৎ স ভক্তিশতকং ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদম্॥

(২) শ্রীমদ্রাহুলপাদত্রিপিটকাচার্য্যাদ্ গুরোর্নির্ম্মলং
বৌদ্ধং শাস্ত্রমধীত্য যস্ত শরণং রত্নত্রয়ং শিশ্রিয়ে।
যো বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তিপদবীং লঙ্কেশ্বরাল্লব্ধবান্
স শ্রীমানিহ সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণো ব্যাখ্যামিমং ব্যাতনোৎ॥

(৩) রাহুলনামা মুনিরিতি বিদ্বান্ ষড়্গুণভারী ত্রিপিটকধারী।
মৌর্য্যকুলাব্ধিপ্রভবসুধাংশু র্জন্মনি জন্মন্যপি মম মিত্রম্॥—বৃত্তরত্নাকরপঞ্চিকা।

রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের চিরন্তন সংস্কারসমূহ তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। তিনি ভক্তিশতক গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"যাঁহার জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী, যাঁহার বাক্য নির্দ্দোষ, যাঁহাতে রাগ দ্বেষ ও মোহ বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, যাঁহার অসাধারণ কৃপা অসংখ্য জীবের প্রতি কারণ-নিরপেক্ষ হইয়া প্রসৃত হইয়াছে, তিনি বুদ্ধই হউন, অথবা শিবই হউন, তিনিই ভগবান; তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।" (১)

বৃত্তমালা গ্রন্থের পথ্যার্য্যা ছন্দের উদাহরণে কবি লিখিয়াছেন,—

"বুদ্ধরূপ নির্ম্মল পদ্মের জয় হউক। এই পদ্ম সদ্ধর্ম্মরূপ মধু দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ভ্রমর দ্বারা সতত সমাবৃত।" (২)

ভক্তিশতক গ্রন্থে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ, বা শিবপদ লাভ করিয়া লোক সকল একান্তদুঃখপরিপূর্ণ এই সংসারে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন করিয়া থাকে। দুঃখ-পরিপূর্ণ ও আদ্যন্তবিশিষ্ট এই সকল পদ লাভ করিয়া জীবগণের কি ফল হয়? অতএব, আদি-মধ্য-অন্ত-পরিশূন্য নিত্য বৌদ্ধপদ (নির্ব্বাণ) প্রার্থনা কর।" (৩)

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

"পরস্ত্রীকে যিনি মাতা বলিয়া বিবেচনা করেন, পরধনে যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি মিথ্যাকথা বলেন না, মদ্যপান ও প্রাণিহত্যা করেন না, যিনি মর্য্যাদালঙ্ঘন বিষয়ে সর্ব্বদা ভীরু, যাঁহার হৃদয় করুণাপূর্ণ, এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ

---

(১) জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যাহেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে ॥—ভক্তিশতক।

(২) শ্রীঘনকমলজমমলং জয়তাং সদ্ধর্ম্মপুরমধুপূর্ণম্।
হরিহরহিরণ্যগর্ভপ্রভৃতিভ্রমরাবৃতং সততম্ ॥—বৃত্তমালা।

(৩) ব্রাহ্মং বৈষ্ণবমৈশ্বরঞ্চ বহুধা লব্ধ্বা পদং হেতুতঃ
সংসারে বত সংসরন্তি পুনরপ্যেকান্তদুঃখাস্পদে।
কিন্তৈর্দেহভৃতামপায়বহুলৈরাদ্যন্তবদ্ভিঃ পদৈঃ
তস্মান্নিত্যমনাদিমধ্যনিধনং বৌদ্ধং পদং প্রার্থ্যতাম্ ॥—ভক্তিশতক।

করিয়াছেন, হে ভগবন্ সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিই আপনার পাদপূজা করিতে সমর্থ হয়।" (১)

বুদ্ধের প্রতি রামচন্দ্র কবিভারতীর অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার ভক্তিশতক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—

"জগতের উপকারবিধানই বুদ্ধের পূজা, এবং উহার অপকারসাধনই বুদ্ধের পীড়া। আমি জগতের অপকারী। হে জিন! তথাপি আপনার পাদপদ্ম-ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে আমি লজ্জিত হইতেছি না কেন? (২) নানাবিধ সংসারদুঃখ অবলোকনে ভীত হইয়া আমি অনেকবার আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমি গুরুতর তৃষ্ণা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। অতএব, হে জিন! কৃপাহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমাকে ধরুন।" (৩)

রামচন্দ্র কবিভারতী যে প্রকার ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসদ্যোতক। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জ্ঞান ও তদনুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের সার। ভক্তির প্রাধান্য প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। যে সময়ে বুদ্ধদেব জগদীশ্বর বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি জ্ঞান ও কর্ম্মনিরপেক্ষ ভক্তি প্রদর্শনেই জীবের মুক্তি হয়, এইরূপ মত প্রচারিত হইল, তখন মূল বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

(১) মাতেবাসীৎ পরস্ত্রী ভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন যঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্য্যাদাভঙ্গভীরুঃ সকরুণহৃদয়স্ত্যক্তসর্ব্বাভিমানো
ধর্ম্মাত্মা তে স এব প্রভবতি ভগবন্ পাদপূজাং বিধাতুন্॥—ভক্তিশতক।

(২) জগদুপকৃতিরেব বুদ্ধপূজা
তদপকৃতিস্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে
গদিতুমহং তব পাদপদ্মভক্তঃ॥

(৩) প্রণতিরিয়মনেকশস্তবাহং বহুভবদুঃখমবেক্ষ্য ভীতিভীতঃ।
ধর গুরুতরতৃষ্ণয়া পতন্তং জিন মম দেহি কৃপাকরাবলম্বম্॥—ভক্তিশতক, ৩৮।

ভারতচন্দ্রের যুগ।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা।

প্রাচীন ভারতের কথায় ওল্‌ডেন্‌বর্গ বলিয়াছেন,—The liturgical conscience was stronger than the historical—if, indeed, that complete indifference with which men in India have at all times regarded literary and historical authenticity will allow us in this case to speak of an historical conscience.

প্রাচীন ভারতবর্ষ বলিতে আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের ভারতবর্ষ বুঝি না; সে 'কাল' বিস্তৃত ও অনির্দ্দিষ্ট। প্রাচীন ভারতে যাহা ছিল, বা যাহা ছিল না, তাহা কোন্ কালে ছিল, বা কোন্‌কালে ছিল না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুসন্ধান নিস্ফল হইবেই, এমন বিশ্বাসের কারণও নাই। ভারতবাসী চিরদিনই ইতিহাসবিমুখ, এই অপবাদ আমরা স্বদেশী ও বিদেশী সকলের নিকট শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু শুনিলেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কোন প্রাচীন জাতি নব্যরীতির অনুমোদিত ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে? ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নাই, তাহার জন্য প্রাচীন ভারতবাসীদিগকে অপরাধী না করিয়া আমাদিগকে অপরাধী করাই সঙ্গত। কারণ, শিল্পে ও সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান আছে। কোনও জাতির, কোনও সভ্যতার, কোনও যুগের সকল চিহ্ন বায়ুহিল্লোলের মত অন্তর্হিত হয় না। ভারতের ইতিহাসের যে পরিমাণ উপাদান বর্ত্তমান, তদপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণ উপাদান লইয়া অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ মিশরের, গ্রীসের, রোমের ইতিহাসরচনা করিয়াছেন। অত্যল্প উপাদানের সাহায্যে বিলুপ্ত হেটিট সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার তত্ত্ব স্বভাবতঃ ভারতবাসীরই সহজবোধ্য। কিন্তু কয় জন ভারতবাসী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আলোচনায় মন দিয়াছেন?

প্রাচীন ভারতে কর্ম্মবাদই প্রচলিত ছিল। যে সকল ধ্যানযোগী ভক্তি-ভাগীরথীর প্রবাহে কর্ম্মবাদ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আবির্ভাবকালের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন পর্ব্বত ও সমুদ্র দ্বারা অন্যদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের সুজলা সুফলা ভূমি ভারতবাসী আর্য্যদিগকে দার্শনিক আলোচনায় ইহকাল হইতে পরকালে লইয়া গিয়াছে; মানব-প্রতিভা অনন্তের তত্ত্বসন্ধিৎসু হইয়া অকূলে কূল

পাইতেছে না। ক্রমে জন্মান্তরবাদ ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ধরাপৃষ্ঠে মানবের জীবনকাল সিন্ধুসৈকতে বালুকাবিন্দুর মত সামান্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জীবনে মানবের কৃত কর্ম্ম জলে জলবিম্বের মত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিন্তাশীলদিগের চিন্তা ইহলোককে অতিক্রম করিয়া পরলোকের তত্ত্বে উৎসৃষ্ট হইল। তখন হইতে ভারতবাসীর ইতিহাসবিমুখতা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সময়ের ইতিহাসের উপাদান যে নাই, এমন নহে। কিন্তু তখন হইতে ভারতবাসী ইতিহাসবিমুখ।

আমাদের দেশে জীবনচরিতের অভাব এই ইতিহাসবিমুখতারই পরিচায়ক। বাল্যকাল হইতে য়ুরোপীয় শিক্ষকদিগের রচনায় আমরা চরিতের উপযোগিতার কথা পাঠ করিতেছি, এবং আপনাদের অভাবে আপনারাই লজ্জিত হইতেছি। এই লজ্জার আতিশয্যহেতু চরিতের অভাবের কারণ সন্ধান করিতেও বিস্মৃত হইতেছি। মানবমাত্রেরই জীবনচরিত রচিত হয় না কেন? যাঁহাদিগের জীবনে সাধারণ মানবজীবন হইতে কিছু স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, তাঁহাদিগেরই চরিত রচিত হয়। আদর্শ জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—লোকশিক্ষা। ভারতবর্ষে যেমন চিন্তার স্রোত ইহকাল হইতে পরকালে প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমনই আদর্শচরিত্র-মহিমাকীর্ত্তনেরও স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সাহিত্যে পদে পদে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শিত। অতিবিখ্যাত লেখক হইতে নগণ্য লেখক পর্য্যন্ত সকলেরই রচনার সেই উদ্দেশ্য। যে দুই মহাকাব্য বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবাসীর দুঃখশোকতাপতপ্ত বক্ষে স্নিগ্ধশান্তির সঞ্চার করিয়াছে, হতাশহৃদয়ে আশার অরুণকিরণ বিকশিত করিয়াছে, চঞ্চলকে স্থির ও শোকাতুরকে শান্ত করিয়াছে, সংসারের ঘনান্ধকারে ধর্ম্মের পথে আলোক দেখাইয়াছে, প্রতিকার্য্যে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়াছে, সে দুই মহাকাব্যেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শিত—আদর্শ চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তিত। পিতৃসত্যপালন হেতু রাজ্যভোগসুখত্যাগী বনবাসী রামচন্দ্রের পার্শ্বে পতিগতপ্রাণা ধরণীর দুঃখিনী দুহিতার আদর্শচরিত্র যেমন সমুজ্জ্বল, ভ্রাতৃপ্রেমবশে তরুণ যৌবনে সর্ব্বসুখত্যাগী, স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসব্রতাচারী ঊর্ম্মিলাবিলাসীর আদর্শ চরিত্রও তেমনই সমুজ্জ্বল। স্বার্থান্ধ কৌরবদলের তুলনায় ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবদিগের আদর্শ চরিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মগতপ্রাণ পঞ্চ ভ্রাতার দুঃখদুর্দ্দশার অমানিশাশেষে যখন সুখসম্পদের তরুণতপনকিরণ ফুটিয়া উঠিল, তখনই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় ঘোষিত হইল। 'মহাভারত'-রত্নাকরে সন্ধান করিলে সামান্য শ্রমেই চিরকুমার ভীষ্ম হইতে

উর্ব্বশীপ্রত্যাখ্যানক্ষম তৃতীয় পাণ্ডব পর্য্যন্ত বহু আদর্শচরিত্র লক্ষিত হইবে। এই সকল আদর্শপুরুষ ও রমণী 'রামায়ণে'র ও 'মহাভারতে'র অমৃতকথার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে একান্ত পরিচিত। ভারতবর্ষে আদর্শ চরিত্রের অভাব অনুভূত হয় নাই বলিয়াই চরিত-রচনার প্রচলন হয় নাই। গঙ্গার প্রবাহকূলে বাস করিয়া ভারতবাসী কূপের আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। আজ পরিবর্ত্তিত সমাজে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ, জঠরজ্বালা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের পথে যাত্রীর সংখ্যা একান্ত অল্প ; ইহকালের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া ভারতবাসীর ইহলোকে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে ; তাই আজ মহতের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে সাফল্যলাভসৌভাগ্যশালীরও চরিত রচিত হইতেছে।

ভারতচন্দ্র প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের অতিপ্রধান কয়টি ঘটনার কথামাত্র আমরা জানিতে পারি। আর সবই কাল বিস্মৃতির অন্ধকার অতলে লইয়া গিয়াছে—সে স্থানে মানবের গতি নাই। কেবল কাল তাঁহার মধুর রচনা লুপ্ত করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার যশঃসৌরভে বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জ সুরভিত।

কবির কাব্য বুঝিতে হইলে কবির সময়ের আলোচনার আবশ্যক হয়। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আদর্শ ভিন্ন হয়। কবি যে সময়ের লোক, তিনি সে সময়ের উপযোগী না হইলে, তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটে ; তিনি যে সমাজভুক্ত, সে সমাজের প্রভাব তাঁহার জীবনে ও রচনায় লক্ষিত না হইয়া যায় না ; তিনি যে শিক্ষায় শিক্ষিত, সে শিক্ষা তাঁহার কল্পনা ও আদর্শ উভয়কেই বিশেষত্ব দান করে। ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। সুতরাং ভারতচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুই যুগের সন্ধিস্থলে আবির্ভূত। তখন বিলাসব্যসনবিপন্ন মোগলসম্রাটের শিথিল কর হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছে। ছলে, বলে, কৌশলে আকবর যে রাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতি তাহার ধ্বংসানলশিখা জ্বালাইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের সমবেত শক্তির উপর কৌশলী আকবর মোগল-সিংহাসন সুদৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আকবরের সেই নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করেন ; মোগলের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দিনান্ততপনের মত তেজোহীন হইয়া পড়ে।

ভারতচন্দ্রের জন্মের পঞ্চবর্ষমাত্র পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অগ্নিবর্ষণে বিপন্ন ও বিদ্রূপবাণবিদ্ধ মোগলবাহিনী দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। বিংশবর্ষা-ধিককালব্যাপী যুদ্ধের পর—শাহজাহানের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য করিয়া, রণক্ষেত্র

সহস্র সৈনিকের রুধিরে সিক্ত করিয়া, শেষে অসাফল্যলাঞ্ছনানতশির মোগলসম্রাট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। (১) তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে মোগলসাম্রাজ্য বিপন্ন। এ দিকে তাঁহার ব্যবহারদোষে রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুগণ বিরক্ত। তাঁহার ভ্রান্তিবশে মুসলমান রাজ্যের দুইটি শক্তিস্তম্ভ—বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা বিধ্বস্ত। শরীর কঠোর আচারে দুর্ব্বল। (২) শত্রুজয়ের আশা নির্ম্মূল। পুত্রদিগের প্রতি বিশ্বাস নাই।—১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব আমেদনগরে মৃত্যুর কৃপায় সকল-যন্ত্রণামুক্ত হইলেন; মৃত্যুশয্যায় ভগ্নহৃদয়ের করুণ বিলাপ উঠিল—"অনেক পাপ করিয়াছি। জানি না, কি শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে পুত্রগণ সিংহাসনলাভাশায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের শান্তিপ্রস্তাবে উদ্ধত আজেম উত্তর করিলেন, "এক সিংহাসনে দুই জন নৃপতির স্থান হয় না।" (৩) আগ্রার নিকটে যুদ্ধক্ষেত্রে আজেম নিহত হইলেন। হায়দ্রাবাদের সন্নিকটে যুদ্ধে আহত হইয়া কামবক্সও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন মুয়াজেম বাহাদুরশাহ নাম লইয়া ভ্রাতৃরক্তসিক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

বাহাদুরশাহ রাজ্য সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ফল ফলিল না। তিনি রাজপুতদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন ঘরে বাহিরে শত্রু। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বাবর নদনদী সন্তরণে পার হইয়াছিলেন। যুবক আওরঙ্গজেবের সহচর আমীর ওমরাহগণ পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন। (৪) আবার দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল যুদ্ধে সেনাদল শ্রান্ত। কাজেই বাহাদুরশাহ সেনাবলে বলী হইতে

---

(১) কাফী খাঁর বিবরণ (Elliot—Vol. VII.)

Manouchi শাহজাহানের ধনলিপ্সার কথা পুনঃপুনঃই বলিয়াছেন। Elphinstone শাহজাহানের সমৃদ্ধিকালকেই ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির চরম উৎকর্ষের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকের মতে, শাহজাহানের ধনাগারে সঞ্চিত ধনরাশির মূল্য ২৭০০০০০০০০ টাকা। (Thomas' Revenue Resources of the Moghal Empire গ্রন্থে দেখা যায়, তৎকালে রাজস্বই মোট ৪০৫০০০০০০ টাকা ছিল।) আওরঙ্গজেব এই বিপুল ধনরাশি ব্যয় করিয়াছিলেন—ইহাই ঐতিহাসিক মত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের ধনবল ও জনবল উভয়েরই সর্ব্বনাশ হয়।

(২) Tavernier.

(৩) Seir Mutaqherin.

(৪) Hunter—*India of the Queen.*

পারিলেন না। (১) এ দিকে শিখগণ প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। গুরুগোবিন্দের স্বজনগণের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল, বন্দা তাহার শতগুণ অত্যাচার করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। মসজেদ লুণ্ঠিত ও নগরবাসীরা নিহত হইতে লাগিল। বাহাদুরশাহ স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য পরাজিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল।

তখন মোগলশক্তির চিতা কেবল ধূমোদ্গিরণ করিতেছে। এ দিকে চক্রবাল-রেখায় ইংরেজের সৌভাগ্যসূর্য্য কেবল সমুদিত হইতেছে—মেঘাচ্ছন্ন গগনে সেই তরুণ-অরুণ-কিরণ তখনও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন দুই যুগের সন্ধি।

বাহাদুর শাহের মৃতদেহ শীতল হইতে না হইতে আজেম উস্‌সান পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু সেনাপতি জুলফিকার খাঁ তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন না। তিনি মৃত বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়েজেদ্দিনকে সিংহাসন দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আজেম উস্‌সান নিহত হইলে অর্থবিভাগ লইয়া আর কয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ বাধিল। খেজিস্তা আখ্‌তার যুদ্ধে জয়ী হইয়াও জুলফিকারের কৌশলে নিহত হইলেন। তখন পলায়িত ময়েজদ্দিন বারাঙ্গনা লালকুয়রকে লইয়া শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। রণশ্রমশ্রান্ত সেনাদল বিশ্রামলাভের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করিল। ময়েজেদ্দিন সুরাপানে ও নর্ত্তকীর লাস্যলীলাদর্শনে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস অপর ভ্রাতা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন ময়েজেদ্দিন সুরাপানে চেতনাহীন, অসম্বৃতবেশ। সেই অবস্থায় তাঁহাকে করিপৃষ্ঠে তুলিয়া জুলফিকার যুদ্ধ করিলেন, এবং জয়ী হইয়া অপদার্থ ময়েজেদ্দিনকেই সিংহাসন দান করিলেন। ময়েজেদ্দিন ইতিহাসে জেহান্দার শাহ নামে পরিচিত।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহের পুত্র আজেমউস্‌সান বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি গুরুভার লঘু করিবার অভিপ্রায়ে আজিমাবাদের (বিহারের) শাসনভার হোসেন আলি খাঁকে ও ইলাহাবাদের শাসনভার হোসেন আলির ভ্রাতা আবদোলমা খাঁকে প্রদান করেন। জাফর খাঁ (মুরশিদকুলি) বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন—সৈন্যভারও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। পিতার সাহায্যার্থ আজেমউস্‌সান যখন বঙ্গদেশ হইতে গমন করেন, তখন তিনি রাজমহলে

(১) Lane—*Mediæval India.*

সুলতান সুজার প্রাসাদে পুত্র ফরোকশিয়ারকে ও অন্তঃপুরচারিকাদিগের জন কয়েককে রাখিয়া আইসেন। জেহান্দার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফরোকশিয়ারকে বন্দী করিতে উদ্যত হইয়া জাফর খাঁকে সেইরূপ আদেশ করিলেন। কিন্তু জাফর খাঁ মৃত প্রভুর পুত্রের প্রতি নির্দ্দয় হইতে পারিলেন না। পরিশেষে হোসেন আলি খাঁর ও আবদোল্লা খাঁর সহায়তায় ফরোকশিয়ার জেহান্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমে জেহান্দারের পুত্র এজেদ্দিনকে ও পরে স্বয়ং জেহান্দারকে পরাজিত করিয়া ফরোকশিয়ার সিংহাসন অধিকার করিলেন। নির্দ্দয় নরহত্যায় তাঁহার অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল।

ফরোকশিয়ার হিন্দু রাজা অজিৎসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সম্বন্ধবন্ধনে বদ্ধ করিয়া হিন্দুদিগকে তাঁহার পথভুক্ত করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন। যাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত তিনি সিংহাসনলাভ করিতে পারিতেন না, ফরোকশিয়ার অল্প দিনেই তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আবদোল্লা খাঁর দেওয়ান রতনচাঁদের ব্যবহারে দুই পক্ষে অসন্তোষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে এক দিন সেনাদল দুর্ভাগ্য ফরোকশিয়ারকে অন্তঃপুর হইতে বলে টানিয়া বাহির করিল। যে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন।

তাঁহারা প্রথমে জেহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র রাফিএদ্দর জাটকে সিংহাসনে বসাইলেন। ক্ষয়কাশ রোগে তিন মাসের পরই তাঁহার মৃত্যু হইলে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তদীয় ভ্রাতা রাফিয়েদ্দৌলাকে সিংহাসন দিলেন। কিন্তু তিনিও অল্প দিনেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই আগ্রায় নিকোশায়ারকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা হয়। যাহা হউক, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রফিয়েদ্দৌলার মৃত্যুর পরই খেজিস্তা আখ্‌তারের পুত্র রোসেন আখতারকে দিল্লীর সেলিমগড় দুর্গ হইতে আনাইয়া মহম্মদশাহ নামে সিংহাসনে বসান হইল।

তখন ক্ষমতাশালী রাজপ্রতিনিধিবর্গ সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইতেছেন। মহম্মদশাহ কখনও এক জনের, কখনও আর এক জনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কোন রূপে সিংহাসনে স্থির ছিলেন। হোসেনআলি হত ও আবদোল্লা বন্দীকৃত হয়েন। আসফজা স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনিই হাইদ্রাবাদের নিজামবংশের বংশপতি। হিন্দুদিগের প্রতি বিশেষ কর ধার্য্য হইয়া শেষে জেহি সিংহের অনুরোধে ত্যক্ত হয়। আসফজা ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলি খাঁ মহম্মদকে অভিনন্দন করেন, এবং মুর্শিদকুলি নজর ৬ঃ

রাজস্ব পাঠাইয়া দেন। মহম্মদশাহ বিচারপ্রার্থীদিগের স্থবিধার জন্য প্রাসাদের মধ্যে ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া তাহাতে বদ্ধ শৃঙ্খলের অগ্রভাগ বাহিরে রাখিতেন। প্রার্থীরা সেই শৃঙ্খলাগ্র আকর্ষণ করিলেই তিনি জানিতে পারিতেন। রাজধানীতে শৃঙ্খলা-সংস্থাপনের জন্য আসফজাকে মন্ত্রিপদে বৃত করা হয়। কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্য মহম্মদের পক্ষে যেমন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, মহম্মদের চাপল্যও বুদ্ধিমান বৃদ্ধের পক্ষে তেমনই বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, সম্রাটের সহচরগণ তাঁহার বেশ ও ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াও বিদ্রূপ করিত। বিরক্ত হইয়া তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। বস্তুতঃ যে সম্রাটের রাজকার্য্যে তাঁহার অনুগৃহীতা বারাঙ্গনাও হস্তক্ষেপ করিতে পারে, আসফজার মত লোকের পক্ষে তাঁহার কার্য্য করা সম্ভব নহে।

মহম্মদশাহের শাসনকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—নাদীরশাহের ভারত-আক্রমণ। দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতর রাজধানী দিল্লীর রাজপথ নরশোণিতসিক্ত হইল; দারুণ অত্যাচারে পীড়িত প্রজা বাধ্য হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারীকে অর্পণ করিয়া মান ও প্রাণ বাঁচাইল। দেশে হাহাকার উঠিল—গৃহে গৃহে ক্রন্দনধ্বনি ধ্বনিত হইল। প্রায় দুই মাস কাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া লুণ্ঠন সম্পূর্ণ করতঃ নাদীর দিল্লী ত্যাগ করিলেন। তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় ৪৮০০০০০০০ কোটী টাকা হইবে। এই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে শাহজাহানের লোকপ্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসনেরই মূল্য টেভার্নিয়ারের মতে ৯ কোটী টাকা হইবে। নাদীরের এই অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে পূর্ব্বাবস্থ হওয়া সহজ হইল না। কারণ, মোগল সাম্রাজ্য তখন একান্ত দুর্ব্বল—দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। হাইদ্রাবাদে আসফজা ও অযোধ্যায় সদত খাঁ প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছেন। বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া হিন্দু প্রাধান্যের পুনরুদ্ধারের কল্পনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"দুর্ব্বল কাণ্ডে আঘাত করিলে শাখা আপনিই যাইবে।" আসফজাও বাধ্য হইয়া মহারষ্ট্রীয়দিগকে 'চৌথ' দিতে স্বীকৃত হইলেন। গাইকোবার, হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোসলা—সকলেই প্রাধান্যসংস্থাপনে উদ্যত। এই অবস্থায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সুসংবাদ পাইলেন, পুত্র আমেদ-শাহকে পরাজিত করিয়াছেন। 'মুতাক্ষরীণ'-লেখক সত্যই বলিয়াছেন, মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর হইতে সম্রাট ও সাম্রাজ্য শূন্যগর্ভ শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ইহার পর বৃত্তিভোগী মোগলপুত্তলগণ সম্রাট নাম লইয়া কেবল অন্তঃপুর-বাহুল্যেই বিবৃত ছিলেন। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমেদশাহ সম্রাট

হইলেন। আসফজার পুত্র গাজিউদ্দিন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে জেহান্দারের পুত্রকে দ্বিতীয় আলমগীর নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি লাহোর জয় করিলে প্রতিশোধগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প আমেদশাহ দুরাণী পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিয়া দিল্লীবাসীর দুর্দ্দশার একশেষ করিলেন। নাদীরের অত্যাচারের পুনরভিনয় হইল।

তিনি ফিরিতে না ফিরিতে গাজিউদ্দিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তায় পুনরায় পঞ্জাব হস্তগত করিলেন। ক্রোধান্ধ আমোদ পুনরায় সেনাবাহিনী ভারতাভিমুখে প্রবাহিত করিলেন। পাণীপথে বাবর ও আকবর দুইবার ভারতসাম্রাজ্যের জন্য ভাগ্যপরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই পাণীপথেই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আমেদের সেনা ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা পরস্পরের সম্মুখীন হইল। প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই জয়ের সম্ভাবনা লক্ষিত হইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে মুসলমানের আক্রমণে মহারাষ্ট্রীয়-গণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দশ ক্রোশ পথ জেতৃদল বিজিতদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার কথা হইয়াছিল, তিনি নিহত হইলেন। সিন্ধিয়া আহত হইলেন। হোলকার ও নানা ফড়ণবীশ পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিলেন। প্রচলিত মত এই যে, এই যুদ্ধে দুই লক্ষ মহারাষ্ট্রীয়ের জীবননাশ হয়। হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপনের আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গেল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ হইতে ইংরাজাধিপত্য আরব্ধ হইল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তৈমুরের বংশের অভিনয় শেষ হইল; মোগলের সৌভাগ্যসূর্য্য দুর্দ্দশার ঘনান্ধকারে অস্ত গেল।

কর্ণাটে, মহীশূরে ও বঙ্গে, মুসলমান ইংরাজের গতিরোধের প্রয়াস পাইয়াছিল; ভারতের অন্য সকল স্থানেই হিন্দুকে পরাজিত করিয়া ইংরাজ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন।

এই সময়ের বঙ্গদেশের অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আজেমউস্‌সান পিতার সাহায্যার্থ দিল্লী গমন করিলে বাঙ্গলার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ও নাজেমী উভয় ভারই কিরূপে মুর্শিদকুলি খাঁর হস্তে আইসে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুজা খাঁ মুর্শিদকুলির জামাতা। শ্বশুরে ও জামাতায় মনান্তর উপস্থিত হয়। মনান্তরের প্রধান কারণ, মুর্শিদকুলির কন্যা জিনেতউন্নিসা স্বামীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। শ্বশুর

জামাতাকে দূরে প্রেরণ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যার প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জিনেতউন্নিসা পুত্র সরফরাজ খাঁকে লইয়া মুর্শিদাবাদে পিতার নিকটেই রহিলেন। সুজা উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন।

মুর্শিদ দৌহিত্র সরফরাজকে বঙ্গের দেওয়ানী কার্য্য দিলেন, এবং তাঁহার দেহান্ত হইলে দৌহিত্র যাহাতে নেজামতী পদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুজা খাঁও স্বয়ং বাঙ্গলার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজেম হইবার চেষ্টা করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে মীর্জ্জা মহম্মদআলি (আলিবর্দ্দী খাঁ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য্যদক্ষতায় তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর পরামর্শ মত দিল্লীতে সম্রাটের নিকট, উজীরের নিকট ও ক্ষমতাশালী খাঁ দুরাণের নিকট লোক প্রেরিত হইল।

মুর্শিদকুলির অন্তিমকাল উপস্থিত, এই সংবাদ পাইয়া, সুজা খাঁ মুর্শিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং পথে দিল্লী হইতে দত্ত অভীপ্সিত সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া তিনি চেহেলসুতুন গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাকে বাঙ্গলার দেওয়ান ও নাজেম বলিয়া প্রচার করিলেন। আপনাকে বাঙ্গলার দেওয়ান ও নাজেম জানিয়া উৎফুল্ল সরফরাজ তখন রাজধানীর উপকণ্ঠে বৃক্ষবাটিকায় আনন্দোৎসবমত্ত। চেহেলসুতুন হইতে উত্থিত বাদ্যধ্বনিতে বিস্মিত হইয়া তিনি কারণের অনুসন্ধান করিলেন। তখন আর উপায় কি? তিনি অগত্যা যথারীতি পিতৃপদ চুম্বন করিয়া পিতার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। এই সময় বিহারের শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইলে খাঁ দুরাণ সুজাকেই সেই পদ প্রদান করিলেন। সুজা খাঁ পুত্র সরফরাজকে তথায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পত্নীর আপত্তিতে শেষে আলিবর্দ্দীকেই সেই পদ প্রদান করিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রজারঞ্জক ন্যায়পরায়ণ সুজা খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন; পিতার মৃত্যুতে তিনিই পিতার সকল অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

চপলমতি সরফরাজ অল্পদিনেই দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। আলিবর্দ্দী অপমানিত হইয়া দিল্লীতে পত্র লিখিলেন যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, তিন প্রদেশের দেওয়ানী ও নেজামতী পাইলে, এবং যুদ্ধ করিয়া সরফরাজের হস্ত হইতে ক্ষমতা লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, তিনি দিল্লীতে বার্ষিক এক কোটী টাকা রাজস্ব দিবেন,—এবং তদতিরিক্ত—সরফরাজের সমস্ত সম্পত্তি ও এক কোটী টাকা নজর দিবেন। সুজা খাঁর মৃত্যুর ত্রয়োদশ মাস পরে

তিনি দিল্লী হইতে প্রার্থিত আদেশ পাইলেন। জগৎশেঠ আলিবর্দ্দীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা, তিন প্রদেশের দেওয়ান ও নাজেম হইলেন।

মসনদে বসিবার পূর্ব্বেই আলিবর্দ্দী প্রভু সুজার পত্নী,—সরফরাজ-জননীর দ্বারস্থ হইলেন, এবং "অদৃষ্টে যাহা ছিল হইল; আপনার এই অপদার্থ ভৃত্যের কৃতঘ্নতার কথা কখনও ইতিহাস হইতে অপনীত হইবে না"—এইরূপ বিনীত-বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি এক দিনের জন্যও সুজার পত্নীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই। আলিবর্দ্দীর যথেষ্ট সদ্‌গুণ ও শাসনক্ষমতা ছিল। উড়িষ্যাবিজয় প্রভৃতি কার্য্যে আলিবর্দ্দীর অনেক সময় গিয়াছিল সত্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধই তাঁহার রাজত্ব-কালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। তিনিও কয়বার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করেন; মহারাষ্ট্রীয়গণও বহুবার তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। মেদিনীপুরের নিকটে ভাস্কর পণ্ডিতের সেনাদলে বেষ্টিত হইয়া তিনি যেরূপে কাটোয়ায় উপনীত হয়েন, তাহাতে তাঁহার সাহসের ও রণকৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পঞ্চ সহস্র বঙ্গ-সেনার সেই প্রত্যাবর্ত্তনকাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নাই। অনবরত দশ বৎসর যুদ্ধে আলিবর্দ্দী শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আলিবর্দ্দীর বয়স তখন ৭৫ বৎসর। বৎসর বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের লুণ্ঠনে প্রজার অবস্থা অতি শোচনীয়। বর্ষে বর্ষে গ্রাম ও নগর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। জননীরা বর্গীর ভয় দেখাইয়া শিশু পুত্রকন্যাদিগকে ঘুম পাড়ান। আলিবর্দ্দী দেশের মঙ্গলকামনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কারণ, দেশের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে দিল্লীতে প্রেরণোপযোগী রাজস্বও সংগৃহীত হয় না। এ দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণও বহুবার পরাজিত হইয়া সন্ধি করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

অবশেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইল। মহারাষ্ট্রপক্ষীয় মীর হবিব উড়িষ্যার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা হইলেন। কথা রহিল, ঐ প্রদেশের রাজস্ব হইতে তিনি রঘুজী ভোঁসলার সেনাদলের পূর্ব্বপ্রাপ্য পরিশোধ করিবেন। প্রকারান্তরে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলগত হইল। স্থির হইল, এ রাজস্ব ব্যতীত, আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা দিবেন। সুবর্ণরেখা নদী বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণ কদাচ ঐ সীমা উলঙ্ঘন করিয়া আসিবেন না, অঙ্গীকার করিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে, তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। চপলচিত্ত সিরাজের দুর্ব্ব্যবহারে দেশের প্রধানগণ পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন সে বিরক্তির কারণ আরও বর্দ্ধিত হইল। সাধারণ জনগণও তাঁহার অত্যাচারে কাতর হইয়া উঠিল। শেষে দেশের প্রধানগণ ইংরাজের সহিত চক্রান্ত করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী ক্ষেত্রে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত ও ইংরাজ জয়ী হইলেন। নূতন যুগের আরম্ভ হইল।

আকবর যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন, তাহার ধ্বংসের কারণ তাঁহার সংস্থাপনপ্রণালীতেই নিহিত ছিল। আওরঙ্গজেবের শাসননীতি মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসানলশিখা প্রজ্বলিত করে। তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের বিলাসবাসনায় তাহাতে ইন্ধনযোগ হয়। আকবরের সযত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ আওরঙ্গজেবের সময়েই জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর যে পারিল, জীর্ণ প্রাসাদের প্রস্তররাশি গৃহচ্যুত করিয়া লইয়া গেল।

মুসলমান সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে স্বাধীনতা দিতে হইত। তখন পথ প্রায় ছিল না; যাহা ছিল, তাহাও ভাল নহে—বর্ষাকালে কর্দ্দমে দুর্গম হইয়া উঠিত; পথিপার্শ্বে শ্বাপদসঙ্কুল কানন; পথে দস্যু তস্করের উপদ্রব। দেশে শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ স্থলেই রক্ষক ও ভক্ষক—উভয়ই।

দেশাচারের প্রতি ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্থানীয় বিশেষত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া বিশাল ভূখণ্ড এক সাম্রাজ্য বলিয়া সর্ব্বত্র একই শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন তখনও প্রচলিত হয় নাই। তখন জাতীয় জীবনে যেমন বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব ছিল, শাসনকর্ত্তাদিগেরও তেমনই বিচার বিবেচনার অধিকারে স্বাধীনতা ছিল। শাসনপ্রণালী তখনও রাজধানীর মন্ত্রণা-সভার অনুমোদিত যন্ত্রমাত্রে পরিণত হয় নাই। এক কথায় ভারতবর্ষে তখনও প্রাচ্য শাসনপ্রণালী প্রচলিত। হিন্দু-স্থানে তখনও হিন্দু বিচার, শাসন ও সৈনিক বিভাগে প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। সর্ব্বত্রই মুসলমানের অধীন হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু শাসনকর্ত্তা, হিন্দু সেনাপতি প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গে সিরাজদ্দৌলার সময়েও "রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা রাজা রায়দুর্লভ কোষাধ্যক্ষ, রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা, এবং রাজা রামরামসিংহ মেদিনীপুরের

শাসনকর্ত্তা।" (১) বঙ্গের জমীদারদিগেরও স্ব স্ব জমীদারীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতাপ ছিল। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর আজেম উস্‌সান যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের "তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।" (২)

প্রজাবর্গের সহিত জমীদারদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; প্রজারা জমীদারকেই রাজা বলিয়া মনে করিত। জমীদার প্রভৃতি প্রধানগণের কিরূপ ক্ষমতা ছিল, তাহাব প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। দিল্লীতে যেমন মোগলের অধঃপতনদশায় এক এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা এক একটি ক্ষমতাশালী পরিবার এক সম্রাটকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া আর এক জনকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন—সম্রাট-পুত্তল লইয়া খেলা করিয়াছেন, বাঙ্গালাতেও তেমনই জমীদার প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দেওয়ান ও নাজেম করিয়াছেন। জগৎশেঠ প্রভৃতির সহায়তায় আলিবর্দ্দী অনায়াসে সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কেবল দিল্লীর সনন্দবলে কিছুই হইত না। তাঁহারাই আবার অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার সহগামী ছিলেন। আবার সিরাজ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজকে রাজ্য দিবার জন্য যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়, ভবানন্দের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্রই সেই বিপ্লবের "প্রবর্ত্তক, মন্ত্রী ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।" জগৎশেঠের যে গৃহের ভগ্নাবশেষ এখন ভাগীরথীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই গৃহে বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আলোচিত হইত। দেশের লোকের তখন এমনই ক্ষমতা ছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে তখন দেশীয়দিগের হস্তে যে ক্ষমতা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে আমরা সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। মুসলমান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তা বুঝিতেন, দেশের হিন্দু ও মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগের সন্তোষের উপর সংস্থাপিত না হইলে সিংহাসন দৃঢ় হইবে না। তাঁহাদিগের ক্ষমতার বিষয় সম্রাটের ও শাসনকর্ত্তাদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের সন্তোষবিধানে সচেষ্ট হইতেন।

মুসলমান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তারা ভারতবাসী ছিলেন। যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিতেন, তাঁহারাও ভারতবর্ষেই স্থায়ী হইতেন। রাজায় প্রজায়, শাসকে শাসিতে স্বার্থসংঘটন উপস্থিত হইত না। হিন্দু ও মুসলমান বিজেতা ও বিজিতের

(১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস"।

(২) "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত"।

ভাব বিস্মৃত হইয়া, একই উদ্দেশ্যে, একই স্বার্থে, একই সমবেদনায় কার্য্য করিতেন। যে স্থানে সম্রাট বা শাসক সেই নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই স্থানেই বিপদ ঘটিয়াছে।

বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিলক্ষণ সম্প্রীতি ছিল; সখ্য সময় সময় ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে পরিণত হইত। পরস্পর পরস্পরের অনেক আচারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজেও ইহার প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

সিংহলে।

২। শৈল-মন্দির।

যে অরণ্যের মধ্যে ভগ্নাবশেষগুলি নিহিত, সেখান হইতে বাহির হইয়া, জঙ্গলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইখানকার শৈল-মন্দিরে পূর্ব্বতন দেব-দেবীর মূর্ত্তি-গুলি অক্ষত রহিয়াছে। এই পরিত্যক্ত বন-ভূমির দূর দিগন্তে, এই শৈল-মন্দিরের ন্যায়, আরও অনেক শৈলপিণ্ড ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়। না জানি, পুরাকালের কোন্ প্রলয়-প্লাবনের প্রভাবে এইগুলি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঠিক্ মনে হয়, যেন ধরণীর মুখ কালো হইয়া স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই গোলাকার মসৃণ শৈলপিণ্ডগুলি কি করিয়া এখানে আসিল, চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে তাহার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মনে হয়, যেন এক-একটা প্রকাণ্ড পশু যূথ-ভ্রষ্ট হইয়া তৃণভূমির উপর একাকী বসিয়া আছে।

বৃহদাকার কোন জন্তু-বিশেষ ও বৌদ্ধমন্দিরের "দাগোবা"—এই দুয়ের সম্মিলনে যেন এই মন্দিরটি নির্ম্মিত;—শ্যামল স্তূপের উপর সৌধ-ধবল ক্ষুদ্র, একটি "দাগোবা" যেন স্থাপিত হইয়াছে। যেন হাতী তাহার কালো পিঠের উপর চূড়াকার একটা হাওদা বহন করিতেছে।

আমরা পৌঁছিয়া দেখিলাম, জঙ্গলটি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণতলে প্রসারিত; চারি দিক নিস্তব্ধ; মন্দিরের সমীপে জন-প্রাণী নাই; ভূমির উপর চামেলী প্রভৃতি এক রাশি ফুল ছড়ানো রহিয়াছে; ফুলগুলি শুখাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও

* সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

তার গন্ধ যায় নাই। এইগুলি পূর্ব্বদিনের পুষ্প। দেবতারা এখানেও যে বিস্মৃত নহেন, এই পুষ্পাঞ্জলিই তাহার সাক্ষী।

কোন বৃহদাকার জন্তুর ন্যায় এই শৈলমণ্ডলের গঠন-ভঙ্গী; উহার পাদ-দেশ সরোবরের জলে বিধৌত; সরোবরটি কুম্ভীরের আবাস ও পঙ্কজ-শোভিত।

নিকটে আসিলে লক্ষ্য করা যায়, উহাদের মসৃণ গাত্রে কতকগুলি অস্পষ্ট উৎকীর্ণ-চিত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। এত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট যে, ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমাগত সরিয়া সরিয়া যায়। কিন্তু চিত্রগুলি এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত যে, প্রকৃত বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তীর শুণ্ড, কর্ণ, পদ, অঙ্গাদির গঠন—ইহাই চিত্রের বিষয়। শৈলের প্রস্তরগুলি স্বভাবতই এমন আশ্চর্য্যভাবে বিন্যস্ত ও তাহাদের গায়ের এরূপ স্বাভাবিক রং যে, উহাতে হস্তীর গঠন ও বর্ণ যেন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। কেবল, শিল্পী অতি অপূর্ব্ব কৌশলে উহাদিগকে আপন কাজে লাগাইয়াছে, এই মাত্র। স্থানে স্থানে, এই গোলাকার শৈলের ফাটলে ফাটলে ছোট-ছোট গাছের চারা বাহির হইয়াছে। পুরাতন চামড়ার রংএর মত এই শৈল-প্রস্তরের রং—এই রংএর গায়ে এই চারাগুলি এত পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে যে, সত্যকার উদ্ভিজ্জ বলিয়া মনে হয় না। 'পেরিউয়িঙ্কল্'এর গাছ' খুব লাল, 'হিবিস্কাস'ও খুব লাল, সুপারীর চারাগুলি অত্যন্ত সবুজ। মনে হয়, যেন খাগড়ার ডাঁটার উপর পালকের থোপনা ঝুলিতেছে।

শৈলমণ্ডলের পশ্চাদ্দেশে একটি প্রাচীন ধরণের ছোট বাড়ী প্রচ্ছন্ন। উহার মধ্যে মন্দির-রক্ষক বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা বাস করে। উহাদিগের মধ্যে এক জন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন;—যুবা পুরুষ, বৌদ্ধ পুরোহিতের অনুরূপ পীত রংএর বহির্ব্বাসে গাত্র আচ্ছাদিত, কেবল একটি স্কন্ধ ও একটি বাহু অনাবৃত। দেবালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য এক ফুটের অধিক লম্বা, কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত একটি চাবি তাঁহার সঙ্গে। ইঁহার মুখ সুন্দর ও গম্ভীর, ইঁহার চোখ দুটিতে যোগিজন-সুলভ রহস্যময় ধ্যানের ভাব যেন পরিব্যক্ত। হস্তে চাবিটি লইয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন সূর্য্যের কনক-কিরণ তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় মনে হইল, যেন আমাদের 'পিটার'-মুনির তাম্রপ্রতিমাটি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত না হইয়া, পীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। লাল 'পেরিউইঙ্কলে'র ঝোপের মধ্য দিয়া শৈল-খোদিত একটা সিঁড়ি বাহিয়া, আমরা উপরে উঠিলাম। চতুর্দ্দিকের জঙ্গল-পরিধিটি যেন আরও বর্দ্ধিত হইল।

মুখ্য শৈলখণ্ডের মধ্য-পথে, কঠোর শৈল-গর্ভ ভেদ করিয়া, পাথর কাটিয়া দেবালয়টি নির্ম্মিত। প্রথমে একটি গহ্বর; সেখানে প্রস্তর-বেদিকার উপর, যূথী জাতি মল্লিকা প্রভৃতি টাট্‌কা ফুল বিকীর্ণ রহিয়াছে। গহ্বরের শেষ সীমায় দেবালয়ের প্রবেশ-দ্বার। দুইটি তাম্রকবাটে দ্বারটি রুদ্ধ। উহাতে, কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড তালা লাগানো আছে।

ঝনৎকার-সহকারে ধাতব কবাটদ্বয় উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র, রং-করা কতকগুলি বড়-বড় পুতুল বাহির হইয়া পড়িল। বহুমূল্য সুগন্ধি-নির্য্যাসের চৌবাচ্চা যেন সহসা অনাবৃত হইল। প্রতিদিন, গোলাপ-নির্য্যাসে ও চন্দন-রসে ভূমি পরিসিক্ত ও যূথী-জাতি-মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধি শুভ্র পুষ্প-স্তবকে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, তত্রস্থ বায়ু সুরভিত ও কুট্টিম-তল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যে দেবতারা এই সুড়ঙ্গ-গর্ভের অন্ধকারে বাস করেন, তাঁহারা এই সুরম্য সুমধুর সৌরভের মধ্যে নিত্য নিমগ্ন।

এই দেবালয়ে অনেকগুলি পুত্তলিকা; কক্ষটি আলমারীর ন্যায় সংকীর্ণ, কষ্টে-স্বষ্টে ৪।৫ জনের দাঁড়াইবার স্থান হয়। দেবীগুলি ১২ ফুট উচ্চ, শৈলপ্রস্তরের মধ্য হইতেই খুদিয়া বাহির করা, এবং বিবিধ সাজসজ্জায় বিভূষিত। বৌদ্ধ-পুরোহিতের পরিচ্ছদের ন্যায় ইঁহাদের মুখ পীতবর্ণ, এবং ইঁহাদের মুকুটগুলি খিলানে গিয়া ঠেকিয়াছে। মধ্যস্থলে অতিমানুষ-বিরাট-আকারের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি সেই পরিচিত চিরধ্যানের ভঙ্গীতে আসনস্থ। পুত্তলিকার আকারে ছোট ছোট দেবতারা ইঁহার সমীপে ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছেন। আর যে বিরাট দেবীমূর্ত্তিগুলি মণ্ডলাকারে চারি দিকে অবস্থিত, উহারা যেন এই পুতুলগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উহাদের অলঙ্কারগুলি খুব উজ্জ্বল, রং এখনও বেশ টাটকা রহিয়াছে, প্রস্তরময় পরিচ্ছদগুলি লাল নীল রংএ রঞ্জিত। এ সব সত্ত্বেও, ঐ আয়ত-নেত্র মহোদয়গণকে পুরাকালের লোক বলিয়াই মনে হয়।

আমি এখানে হঠাৎ আসায়, এই দেবতাদিগের গুহায় আজ একটু আলোক প্রবেশ করিয়াছে; দেবতারা, সম্মুখস্থ বিমুক্ত দালানের মধ্য দিয়া—যেখানে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব শতাব্দীর ভক্তগণ বাস করিতেন—সেই জঙ্গলের দূরদিগন্তদেশ পর্য্যন্ত এক্ষণে অবলোকন করিবার অবসর পাইলেন।

আমি তাঁহাদের মুখ-পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, পরক্ষণেই মন্দির-রক্ষক পুরোহিতেরা দেবালয়ের সেই পুণ্য-কক্ষটি আবার বন্ধ করিয়া দিল; শৈলগহ্বরবাসী দেবতারা স্বকীয় সুরভিত অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার নিমগ্ন হইলেন।

আমি বিদেশী—আমার নিকটে, বৌদ্ধদিগের এই সকল সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি—বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তি, এখনও প্রহেলিকাবৎ দুর্জ্জেয়।

আমি চলিলাম। পীতবসনধারী রক্ষকেরাও স্বকীয় আশ্রম-নিবাসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

এই অপূর্ব্ব মন্দিরপুরোহিতদিগের আর কোনও পার্থিব চিন্তা নাই। দেবালয়ে ফুল সাজানই উহাদের একমাত্র কাজ। এই বিজন আশ্রমে থাকিয়া, সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, যাহাতে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করিতে পারে, এবং এই নশ্বর জীবনের পরেও, যাহাতে জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্যক্তিত্বহীন ঘোরতমসাচ্ছন্ন অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে পারে,—ইহাই তাহাদের একমাত্র আশা।

এই শৈল-মন্দিরের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া, যখন আবার সেই অরণ্য-সুপ্ত অনুরাধপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। রাত্রিকালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিচরণ করিয়া, কল্য প্রভাতেই আবার এখান হইতে প্রস্থান করিব।

"'চন্দ্র'-পথ ও 'রাজ'-পথ—এই দুটি রাস্তা সব-চেয়ে বড়। বালুকাচ্ছন্ন রাস্তাটি আয়তনে উহাদের চতুর্থাংশ। 'চন্দ্র'-পথের দুই ধারে এগারো হাজার বাড়ী দৃষ্ট হয়। সদর-দরজা হইতে দক্ষিণের দ্বার পর্য্যন্ত দূরত্বে ৮ ক্রোশ; এবং উত্তর-দ্বার হইতে দক্ষিণ-দ্বার পর্য্যন্ত ঠিক আর ৮ ক্রোশ।"

অরণ্যের বৃক্ষতলে কত রাশি-রাশি প্রস্তর, প্রাচীন ধরণের কত পাষাণ-প্রতিমা—তার আর শেষ নাই। কিরীট-ভূষিত দেব দেবী; কুম্ভীরের দেহ, হস্তীর শুণ্ড ও পক্ষীর পুচ্ছবিশিষ্ট বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি। আর, থামের পর থাম চলিয়াছে;—কতকগুলি স্তম্ভ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, কতকগুলি ভগ্ন ও স্বস্থান-ভ্রষ্ট। তা ছাড়া, ভগ্ন-গৃহের কত যে দেহলী, তার আর সংখ্যা নাই। দ্বারদেশের সোপান-ধাপের প্রত্যেক ধারে এক-একটি ক্ষুদ্র স্মিতাননা দেবী-মূর্ত্তি, লতা পাতা শিকড়-জালের মধ্যে আসিবার জন্য যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে। এই সকল গৃহের গৃহস্বামীরা সেই তমসাচ্ছন্ন পুরাকালে অতীব আতিথেয় ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে ইঁহাদের ভস্ম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

কনক-রাগ-রঞ্জিত সায়াহ্নে, আমার আবাস-গৃহ হইতে বহু দূরে, রাজাদের প্রাসাদ-অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বৃহৎ ভিত্তি-বেষ্টন ও প্রস্তর-খোদিত সোপান-ধাপ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারি দিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। একটি কীটের শব্দ নাই, একটি পক্ষীর ডাক নাই। এইখানে

একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ পদ্ম-পুষ্করিণীর ধারে আমি বিশ্রাম করিতেছি। পুষ্করিণীর ধার পাথর দিয়া বাঁধানো; ইহা গজরাজদিগের স্নানাগার। অরণ্যের মধ্যে এইটুকুই তরুশূন্য মুক্ত পরিসর।

এই পুষ্করিণীর জলে ক্রমাগত বুদ্‌বুদ উঠিয়া এক একটা চক্র রচনা করিতেছে; এই কবোষ্ণ জলের মধ্যে সর্প কূর্ম্মের সহিত যে সকল কুম্ভীর বাস করে, তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে এই জলবুদ্‌বুদগুলি উৎপন্ন হইতেছে।

এই অঞ্চলের মধ্যে ঝোপ-ঝাড় কিছুমাত্র নাই। অরণ্যস্থিত ধ্বংস-রাজ্যের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারি দিকে আমার দৃষ্টি অবাধে সঞ্চরণ করিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে হঠাৎ যেন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গাছের ফাঁকে রশ্মি প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষু যেন ঝলসিয়া দিল;—উহা অস্তমান সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর যে অক্ষাংশবৃত্তে আমরা অবস্থিত, তাহাতে শীঘ্রই রাত্রি আসিয়া পড়িবে।

আরও বেশী দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি আরও দূরে চলিয়া গেলাম। আজ সন্ধ্যায় যতক্ষণ পারি ভ্রমণ করিব; কেন না, আজ এখানে আমার শেষ দিন।

দিবাবসানে, আমি যে নূতন ভূভাগে প্রবেশ করিলাম, তাহা আমার নিকট অতীব রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। ভূমির মৃত্তিকা সুকুমার, একটু শুষ্ক, একটু বালুকাময়, ছোট ছোট তৃণে আচ্ছন্ন; শৈশবে যে অরণ্য-ভূমির সহিত আমি পরিচিত ছিলাম, ইহা কতকটা সেইরূপ। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস দেখিয়া জন্মভূমি বলিয়া আমার যেন আরও বিভ্রম উপস্থিত হইল। সেই সেখানকারই মত কৃষক ও গোমেষাদির পদক্ষুণ্ণ মেঠো পথ; আমাদের দেশের ওক্‌গাছের ন্যায়, ঘন-শ্যামল-ক্ষুদ্র-পল্লব-যুক্ত ও ধূসরবর্ণের শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট সেই তরুগণ, সেই মেঠো নিস্তব্ধতা, সেই সন্ধ্যার বিষণ্ণতা * * কিন্তু এই ভগ্নাবশেষগুলি, এই বৃহৎ প্রস্তরগুলি, নিত্য নিয়ত আমার নেত্র-সমক্ষে থাকায়, বিশেষতঃ এই পাষাণ-প্রতিমাগুলির রহস্যময় মুখশ্রী আমার মনে সতত জাগরূক থাকায়, এই স্বদেশসম্বন্ধীয় বিভ্রমটি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। যে সকল নিঃসঙ্গ বুদ্ধ-মূর্ত্তি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্মিতমুখে শূন্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের ছায়াও যেন এই অন্ধকারে ভয়-বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এখান হইতে ফিরিয়া, কুক্কুর ও নেকড়েবাঘদিগের মধ্য দিয়া এক্ষণে যে প্রদেশে প্রবেশ করিতেছি, উহা যেন আরও বিষাদ-মধুর—একেবারেই যেন আমাদের দেশের মত। এই চতুর্দ্দিকস্থ ভারতীয় অরণ্যের ভাবটি যদিও আমার অন্তরের অন্তস্তলে

গূঢ়ভাবে জাগিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে, আমি Saintonge কিংবা Aunisএর ওক্‌বৃক্ষের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; তাই আমি এই অরণ্যের মধ্য দিয়া বিশ্রব্ধভাবে চলিতেছি।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমি এখানে সম্পূর্ণ-রূপে একাকী, তাই হঠাৎ আমার পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার হস্তদ্বয় কটিদেশে লগ্ন ও মস্তক আনত:—বুদ্ধের এই পাষাণ-প্রতিমাটি দুই সহস্র বৎসর হইতে এইখানেই বসিয়া আছে!

তাহার মুখের কাছে আসিয়া, অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম, সেই তার চির-নত দৃষ্টি, সেই তার চিরন্তন স্মিত-হাস্য!

এই সময়ে বিশেষতঃ এই চন্দ্রালোকে, যখন মন্দিরের চূড়াগুলি জঙ্গলের সুদূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত, স্বকীয় ছায়া প্রসারিত করে, তখন কি এক পবিত্র ধর্ম্মভাব-রঞ্জিত শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। আজ এই সন্ধ্যাকালে চন্দ্রমা সুনীলকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। আজ একটি রাত্রি আমি এই অরণ্যে যাপন করিলাম, আর সৌভাগ্যক্রমে আজিকার রাত্রিতেই দিগ্বিদিক স্বর্গীয় আলোকে প্লাবিত হইল। আমাদের জুলাই মাসের তরল-স্বচ্ছ উষ্ণরাত্রির কথা মনে পড়িতেছে। কেবল প্রভেদ এইমাত্র:—মনে হয়, এখানে গ্রীষ্মকালের যেন অন্ত নাই। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে, পদক্ষুণ্ণ-পথবিশিষ্ট সুন্দর শাদ্বল-ভূমির উপরে—আকাশের যে অংশ তরুশাখায় ঢাকা পড়ে নাই, সেই নভোদেশে—এমন কি সর্ব্বত্রই এখন আলোকে আলোকময়!

এই সময় কীটদিগের সুতীব্র নৈশ সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক অনুরণিত হইলেও, যতই আমি অরণ্য-গভীরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্রমশঃ মগ্ন হইয়া যাইতেছি।

আমি এখানে একাকীই বিচরণ করিতেছি। জ্যোস্নালোকে যে ছায়া দেখিয়া এখানকার লোকেরা ভয় পায়, আমি সেই মন্দির-চূড়ার প্রকাণ্ড ছায়ার অভিমুখে একাকীই অগ্রসর হইতেছি। পুরোহিত ও রাজাদিগের অপচ্ছায়ায় ভয়ে, আমার পথ-নেতা সঙ্গে আসে নাই। কিন্তু যখন আমি এখানকার একটি মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন উহার প্রকাণ্ড দাগোবার নিকট যাইবার জন্য, যে পার্শ্বে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে,—আমি সেই অংশটিই আপনা হইতেই বাছিয়া লইলাম।

এই পরিসর-স্থানটুকু প্রেতাত্মার বিচরণভূমি বলিয়াই যেন বোধ হয়! চারিদিকেই সারি সারি স্তম্ভ। এইখানে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি পাথারের

টালির উপর পা পড়ায়, সেই শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ভগ্নাবয়ব দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে, বেদিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি ;—সমস্তই নীল আলোকে প্লাবিত।

নিস্তব্ধ অনুরাধপুরের মধ্যে, এখানকার নিস্তব্ধতায় কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে ; এখানকার লোকদিগের ন্যায় ভয়গ্রস্ত হইয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম ; দাগোবার চারি দিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে—সেই ভীতিজনক ছায়াময় প্রদেশে প্রবেশ করিতে আমার আর সাহস হইল না।

যাহা হউক, যে সকল রাজা—যে সকল পুরোহিত এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায় ?—কোন্ নির্ব্বাণের মধ্যে, কোন্ ধূলিরাশির মধ্যে তাঁহারা এখন অবস্থিত ? তবে সেই দূর দেশ হইতে তাঁহাদের অপছায়া এখানে আসিবে কি করিয়া ?

তা ছাড়া আমার মনে হইতেছে, যে ধর্ম্মে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখন মৃত,—এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে—পুত্তলিকাদিগের পুরাতন ভস্মের মধ্যে উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিষ্ঠা।

১

শয়নমন্দিরের দ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত করিয়া আরক্তনেত্রে সুরেন্দ্র বাবু বাহিরে আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, "আমার ছেলেকে মারিয়াছ কেন ? তুমি মারিবার কে ?"

দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, হরেন্দ্র তখন সবে বাসায় ফিরিয়াছে, সুতরাং দাদার অকারণ তীব্র ভৎর্সনা নীরবে হজম করিবাব শক্তি সে সময় তাহার ছিল না। সে বলিয়া ফেলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন, তখন সত্যই আমি কেহ নহি, আমার কোনও অধিকার নাই ; কিন্তু আপনার অতটুকু ছেলে, আমাদের আশ্রিত পিতৃমাতৃহীন অত বড় ভাগিনেয়কে অকারণ চোর বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল, কই সে জন্য ত আপনার পুত্রকে শাসন করিলেন না ?"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। একটা দুরন্ত রাক্ষস-প্রকৃতি তাঁহার বুকের ভিতরটা নাড়া দিয়া চোখ মুখ দিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমার খেয়ে আবার আমার মুখের উপর জবাব! বেশ করিয়াছে, আমার ছেলে কাহারও অন্ন-দাস নহে।"

হরেন্দ্রের ব্রহ্মতালুতে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল, রক্তস্রোত তাহার শিরায় শিরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি ছেলের পক্ষ লইয়া ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহেন? আমিও কাহারও প্রসাদের কাঙ্গাল নই। আপনার অন্যায় সহ্য করিব কেন?"

দ্বারদেশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাও, এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও।"

দীপকে ঝঙ্কার দিয়া বধূঠাকুরাণী বলিলেন, "ও বাবা! এত তেজ? তবু যদি বাপের ভাত খেয়ে হ'ত। আমার বাবা ভাগ্যিস্ দয়া ক'রে টাকা দিয়েছিলেন, তাই এখন ব্যবসা করে পেটের ভাত জুটছে। পরের খেয়ে যে মানুষ, তার এত তেজ, এত দম্ভ কেন গা বাপু? সহ্য না হয়, সোজা পথ আছে, চলে যাও।"

"ক্ষমা করুন, দোহাই আপনার বৌঠাকৃরুণ। আপনার বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য। আমি এখনই যাইতেছি।"

হরেন্দ্র দ্রুতপদে স্বীয় শয়নকক্ষের অভিমুখে গমন করিল।

"ও ঘরে যেও না, ও সব জিনিসে হাত দিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। সব আমার বাপের বাড়ীর।"

ঘৃণায় অপমানে হরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "কেন, আমার কি কিছুই নাই?"

হরেন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "তোমার বাবা ত কিছু রেখে যান নি যে থাকবে? সব আমার নিজের। এমন পোড়া বাপও দেখিনি বাপু, পেটের জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করে গেছে।"

উত্তেজিতস্বরে হরেন্দ্র বলিল, "আমায় যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, কিন্তু সাবধান, বাবার পবিত্র নাম অমন করিয়া উচ্চারণ করিবেন না, আপনি স্ত্রীলোক—"

মুষ্টি উদ্যত করিয়া দাদা এক লম্ফে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "বেশ করিবে, লক্ষবার বলিবে। তোর কি, পাজী, বদমাস! আমার স্ত্রীকে অপমান! বেরো—দূর হয়ে যা।"

হায়! এই কি তাহার চিরজীবনের আদর্শ—সহোদর! অলক্ষ্যে হরেন্দ্রের হস্তও মুষ্টিবদ্ধ হইল।

ভ্রাতৃজায়া সভয়ে ডাকিলেন,—"দরোয়ান!"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "শূয়ারকো আবি নিকালো।"

মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া হরেন্দ্র বিদ্রূপহাস্যে বলিল, "থাক, আর বীর রসের প্রয়োজন নাই, আমি আপনই যাইতেছি।"

তিন বৎসরের খোকা ডাকিল, "কাকা বাবু, কাকা বাবু!"

দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া শিশু তাহার কাকা বাবুর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়া আসিল। অর্দ্ধপথে শিশুর জননী পুত্রকে কোলে টানিয়া লইলেন। শিশু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র দ্রুতপদে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও তাহার কর্ণে ভ্রাতৃজায়ার শাসনবাণী ও শিশুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার কঠিন পাণির নিদারুণ তাড়নার শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল।

দ্বাদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, চলে গেছে, গেট বন্ধ করে দে।"

২

বন্যার ন্যায় নয়নপথে অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত হইতে চাহিল। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া উদাস হরেন্দ্র শূন্যহৃদয়ে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। সংসারের পথে সকলেই চলিয়াছে। তাহাকেও এই বক্র, বন্ধুর, সীমাহীন পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। বিশ্বের এই চিরন্তন শাসননীতি এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু সে কোথায় যাইবে? এই বিপুল সংসারের মাঝে মাথা রাখিবার স্থান ত তাহার নাই!

দীপ্ত মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র হরেন্দ্রের আবরণহীন মস্তকের উপর জ্বলিতেছিল। তদপেক্ষা রুদ্র তেজে তাহার উদর দগ্ধ হইতেছিল। হায়! সংসারে কে এই অভুক্ত, নিরাশ্রয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে? যাহার কিছু আছে, তাহার সেবার জন্য সংসার সকল প্রকার আয়োজন করিয়া রাখে। অনাথের জন্য কেহ নাই, কিছু নাই! সে পথের ধূলির মত চরণতলে চিরদিন পিষ্ট হইতে থাকে।

দুঃখের সময় পরলোকগতা জননীর স্নেহফুল্ল প্রসন্ন মূর্ত্তি, মমতাস্নিগ্ধ সহস্র বাণী তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যে দিন আহারে এতটুকু বিলম্ব হইত, করুণারূপিণী মাতা অন্নের থালা সাজাইয়া পাখা হস্তে আসনের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন।

আজ ক্ষুৎপিপাসাতুর গৃহহীন অভাগার পানে চাহিবার কেহ নাই। তাহার মাতা বলিয়াছিলেন, "বাবা! অন্য স্থানে কাজ কর্ম্মের যোগাড় কর। তোমার দাদা আর সে দাদা নাই।" কিন্তু সে তখন জননীর অনুরোধ আদেশ উপেক্ষা করিয়া দাদার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাহার যৌবন, শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ব্যবসার উন্নতি হইলে তীর্থবাসিনী জননীকে পুনরায় সংসারে ফিরাইয়া আনিবে, অতীতের সহস্র অশান্তির অপ্রীতিকর স্মৃতি মনের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। হায় মানব! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় শাসননীতির উপর তোমার দুর্ব্বল শক্তিপ্রয়োগের অভিলাষ বাতুলতা নহে কি? সংসারের শ্রী ত ফিরিয়াছিল, অর্থের স্বচ্ছলতা হইয়াছিল, কিন্তু মাকে তাঁহার ত্যক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

"কোথায় যাইতেছ হরেন?"

চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে হরেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। তাহার প্রিয় বন্ধু সতীশচন্দ্র শামলা-মাথায় কোর্টে যাইতেছিলেন।

"তোমার কি এখনও স্নানাহার হয় নাই?"

মেঘস্তম্ভিত আকাশ বায়ুর স্পন্দনমাত্রেই প্রবল ধারায় ধরণী ভাসাইয়া দেয়। বন্ধুর সস্নেহ প্রশ্নে বহু চেষ্টাতেও হরেন্দ্রের চক্ষে অশ্রুধারা বাধা মানিল না। সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বন্ধুর হাত ধরিয়া সতীশচন্দ্র তাঁহার গৃহে ফিরিলেন।

বিশ্রামান্তে সকল ঘটনা শুনিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "রেঙ্গুনে যাবে?" আমার বিশেষ পরিচিত একটি সাহেব রেঙ্গুনে চাউলের কারবার করিতেছেন। তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত বাঙ্গালী সহকারী প্রয়োজন। যাবে?"

রেঙ্গুন! অর্থের জন্য এখন ল্যাপল্যাণ্ডে, এমন কি পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় যাইতে সে প্রস্তুত। সে টাকাকে আয়ত্ত করিতে চায়। যে অর্থের গৌরবে মানুষ মানুষকে অবহেলায় চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যায়, সে সেই চক্রাকার রজতখণ্ডসমূহের সম্রাট হইতে চায়!

হরেন্দ্র বলিল, "তুমি ত জান, কাজের মধ্যে দাদার ব্যবসার কার্য্যটাই জানি, আর এত কাল কেবল কাব্যের আলোচনাই করিয়াছি। কিন্তু কাব্যবৃক্ষের ফল যতই সুধাসিক্ত হউক না কেন, তাহাতে উদরের জ্বালা জুড়াইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। আমি রেঙ্গুনে যাইতে এখনই প্রস্তুত। এ দেশে আর আসিব না, আমি চাকরী করিব।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তবে বিলম্বে কাজ নাই। তুমি রেঙ্গুনে যাইবার উদ্যোগ কর। আমি সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া দিতেছি।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু হরেন্দ্রের হস্তে দুই শত টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "কিছু মনে করিও না ভাই! তোমার এখন অনেক টাকার দরকার। যখন সুবিধা হইবে, শোধ করিও।"

সতীশচন্দ্রের উদারতায় হরেন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বাক্য বহির্গত হইল না। হায়, বন্ধু ত তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নহে!

৩

হরেন্দ্র কর্ম্মসমুদ্রের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করিয়াছিল। দিবানিশি তাহার হৃদয়ে অগ্নি জলিতেছিল; স্মৃতির অঙ্কুশতাড়না,—তীব্র যন্ত্রণার জ্বালা বিস্মৃত হইবার জন্য সে কর্ম্মের কোলাহলে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, সে কেবল কাজের সন্ধানে ফিরিত। আর কোনও চিন্তা নাই, আর কোনও বাসনা নাই। অল্পদিনের মধ্যে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হরেন্দ্র নিজেই চমকিয়া উঠিত। কিন্তু অর্থ চাই, টাকার রাজা হওয়া চাই।

এস হে চক্রাকার টাকা! তুমি মুষ্টিমধ্যে আবির্ভূত হও। তোমার বিশ্ববিমোহন রূপে একবার ভাল করিয়া দেখা দাও। গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তোল। তোমার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মায়ালোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তোমার বিচিত্র নিক্কণে গৃহ ধ্বনিত হউক। হে অখণ্ডমণ্ডলাকার! লৌহসিন্ধুকের গর্ভে ব্যাপ্ত হও, শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া ফেল।

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, হরেন্দ্র এইরূপে অর্থের ধ্যানে কাটাইয়া দিল।

শাস্ত্রে বলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। একাগ্রমনে ধ্যান করিলে ভগবান্ ভক্তের মানসমন্দিরে আবির্ভূত হন। হরেন্দ্রের একাগ্র কামনা, সকল সাধনার ধন ক্রমশঃ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাহার লৌহসিন্ধুকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হরেন্দ্র সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছিল।

প্রসন্নসলিলা ইরাবতীর পূর্ব্বপারে, নদীর উপরেই তাহার বাঙ্গলো। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সে নির্জ্জন কক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিত। কাহারও সহিত মিশিত না। টাকাকড়ির হিসাব ও কাজ কর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গের আলোচনা কাহারও সহিত করিত না। আপনাকে সে মনুষ্যসমাজ হইতে সর্ব্বদা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। মনুষ্যজাতির প্রতি তাহার

একটা তীব্র বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীরা এ জন্য তাহাকে অর্থপিশাচ, অহঙ্কারী, ভণ্ড ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিত। তাহাদের এইরূপ সমালোচনায় হরেন্দ্র গৃহকোণের অন্ধকারকে আরও গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত।

কিন্তু চিরপ্রসারিত আকাশের বক্ষে সন্ধ্যার বিচিত্র চিত্র, শ্যামা মেদিনীর হৃদয়োত্থিত অপূর্ব্ব রাগিণী, তটপ্লাবিনী ইরাবতীর উদ্দাম উচ্ছ্বাস তাহার কঠোর শুষ্ক হৃদয়কে এক একবার পূর্ব্বপরিচিত সুরে, নবীনছন্দে জাগাইয়া তুলিত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুটীর-অঙ্গনে উপবিষ্টা মগবালিকার কোমলকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত, নদীবক্ষোবিহারী মগধীবরের তানলয়হীন হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যাকুলভাবে তাহার পাষাণ-হৃদয়দ্বারে আসিয়া আঘাত করিত। দুঃস্বপ্নের মোহজাল ছিন্ন করিয়া তাহার প্রাণটাও যেন এক একবার বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিত। কিন্তু প্রভাতের আলোকস্পর্শে জাগরিত পাখীর প্রথম গানে নিদ্রোত্থিত জগৎ বদ্ধপরিকর হইয়া আবার যখন কর্ম্মের সন্ধানে ফিরিত, তাহার হৃদয়ও তখন অর্থোপার্জ্জন ও কর্ম্মস্রোতে আবার ভাসিয়া যাইত। স্বপ্নালসা রজনীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে হৃদয়ের তারে যে রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিত, প্রখর দীপালোকে, কর্ম্মচক্রের ঘর্ঘর রবে তাহার ক্ষীণ-ধ্বনি মিলাইয়া যাইত। প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি এইরূপ জাগরণে ও স্বপ্নে কাটিয়া যাইত। বসন্ত দশবার তাহার বিচিত্র হেমসাজি পুষ্পভারে পূর্ণ করিয়া হরেন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া মৃদুগুঞ্জনে কাণে কাণে বলিয়া গেল, "হে প্রিয়, আমায় লহ, আমায় গ্রহণ কর। আমি চলিয়া গেলে এমন ভাবে আর আমায় পাইবে না।" কিন্তু তাহার ব্যর্থ চেষ্টার দীর্ঘশ্বাস হরেন্দ্রের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রতিহত হইয়া প্রতিবারই ফিরিয়া গেল।

৪

হরেন্দ্র অর্থকে বাঁধিয়াছিল সত্য; কিন্তু হায়! তৃপ্তি কোথায়? প্রথম জীবনে যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল, যৌবনের প্রথম উন্মেষে, কল্পনার স্বপ্নালোকে, হৃদয়ের মণিমন্দিরে যে আদর্শমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আজ সে কোথায়? দেউল ভগ্ন, মূর্ত্তি অন্তর্হিত! অবশিষ্ট জীবনটুকু কি অর্থের চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়াই সমাপ্ত করিতে হইবে?

বিনিদ্রনয়নে শয্যার উপর বসিয়া হরেন্দ্র যুক্তকরে ডাকিল, "জননী! তোমার পুত্রকে আবার কোলে টানিয়া লও। যে পথে চলিতে চলিতে পথভ্রান্ত হইয়াছি, তোমার শুভ অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই পুণ্যময় শোভন পথে তোমার সন্তানকে আবার ফিরিয়া যাইতে আদেশ কর। তোমার স্বর্ণবীণার উদ্দীপনাময় বিচিত্র ঝঙ্কারে

বিশুষ্কপ্রায় হৃদয়কুঞ্জ আবার চিরপরিচিত সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক। জননী! তোমার করুণ স্নিগ্ধদৃষ্টির উজ্জ্বল আলোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথে আবার চলিতে আরম্ভ করি।"

তখন উষার অমল দীপ্তি প্রাচীর ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

হরেন্দ্র সংকল্প দৃঢ় করিয়া সাহেবকে জানাইল, "আমায় বিদায় দিন, দেশে যাইব।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কবে আসিবে?"

"আর আসিব না সাহেব, একেবারে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সাহেব বিষণ্ন হইলেন, বলিলেন, "কেন যাইতেছ বাবু? আমি তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব, তুমি যাইও না।"

আবার অর্থের প্রলোভন!

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "টাকার জন্য আমি যাইতেছি না। আমার জীবনের যথেষ্ট কার্য্য এখনও বাকি আছে। এত কাল আপনার ও অর্থের সেবা করিয়াছি, এখন একবার জননীর সেবা করিবার চেষ্টা করিব।"

সাহেব হয় ত তাহার কথাটা ঠিক বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, "বাবু, তোমার বড় সেণ্টিমেণ্ট্যাল। পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর কি কাজ আছে?"

হরেন্দ্র সে কথার কোনও উত্তর দিল না।

৫

দশ বৎসর পরে কল্যাণদায়িনী জন্মভূমির চিরশান্তিময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে হরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! যাহারা প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া আইসে, পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহারা একটা তৃপ্তি, একটা শান্তি, আত্মীয় পরিজনের অযাচিত প্রীতি, প্রেম ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া প্রবাসের ক্লেশ বিস্মৃত হয়। কিন্তু হরেন্দ্রের গৃহ নাই; সুখ দুঃখের সমভাগী হয়, এমন একটি প্রাণীও ইহসংসারে নাই। তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় কাহারও প্রীতি-উৎফুল্ল নয়ন পথের পানে চাহিয়া উদ্বেগাকুল হয় না, সঞ্চিত স্নেহরাশি লইয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কেহ প্রবেশদ্বারের পথে সহস্রবার যাতায়াত করে না!

তাহার পুরাতন বন্ধুগণের অনেকেই ইহলোক হইতে অকালে হিসাব মিটাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও হরেন্দ্রের বিপুল শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল ও স্থূল কলেবর দেখিয়া প্রথমে চিনিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতার মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমে একটি অট্টালিকা ক্রয় করিল। তাহার পর মনের মত করিয়া গৃহগুলি সাজাইয়া সে মাতৃভাষার সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দশ বৎসরে সে অর্থের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, সুতরাং টাকাগুলি বসাইয়া না রাখিয়া একটা ব্যবসায়ে খাটাইবার সংকল্প করিল।

বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিল।

তখন বন্ধুবর্গ তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, এখন একটি গৃহলক্ষ্মী আনিয়া স্থায়ী গৃহী হইতে হইবে।

হরেন্দ্র বন্ধুগণকে বুঝাইল, "দিল্লীর বিচিত্র লাড্ডুটির তোমরাই সম্পূর্ণরূপে ভোগ দখল করিতে থাক। 'ও রসে বঞ্চিত' আমাকে আর দলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিও না। আমি বেশ আছি।"

কিন্তু বন্ধুবর্গ এত সহজে রণে ভঙ্গ দিলেন না। দুই এক জন তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তখন হরেন্দ্র স্পষ্ট বলিল, "ভাই, তোমাদের বৃথা চেষ্টা, আমি বিবাহ করিব না। যে দশ বৎসর পরের শোণিতসম অর্থরাশি শোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার হৃদয় এত কোমল নহে যে, কথার প্রলোভনে সহসা মুগ্ধ হইবে। বিবাহ না করিলে যদি মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।"

হরেন্দ্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বন্ধুগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। কেহ কেহ তাহার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হইলেন।

হরেন্দ্র ভাবিল, অদৃষ্ট!

৬

কাব্য-সাহিত্য-আলোচনায় বিক্ষিপ্ত মনটাকে নিবিষ্ট করিবার জন্য হরেন্দ্র চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! ভাবস্রোত আর পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের কূলে উছলিয়া উঠে না কেন? যেন একটা বিরাট পাষাণতলে অবরুদ্ধ হইয়া কল্পনার খরপ্রবাহ ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, পাষাণে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থমনোরথে আবার ফিরিয়া যাইতেছে।

সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ, ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস তাহার হৃদয়ের মধ্যে দশ বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহারই অভিশাপস্বরূপ কি এই নির্ম্মম শাস্তি? তাহার প্রাণটা যেন সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে আর রুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না। অভ্যাসের মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া উদার বিশ্বের পানে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিচিত্রবেদনাভরে হরেন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কাগজ কলম টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। সে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছাপাখানার দিকে অগ্রসর হইল।

তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারি দিকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ছাপাখানার পার্শ্বের বাড়ী হইতে বাদলা-হাওয়ার সঙ্গে হারমোনিয়ম ও সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

হরেন্দ্র ছাপাখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রিণ্টার কম্পোজিটার সকলেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। হরেন্দ্র ফিরিতেছিল, কিন্তু কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া সে ছাপাখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক সেই উজ্জ্বল আলোকে বসিয়া তখনও নিবিষ্টমনে কাজ করিতেছিল।

হরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। বালকের সুন্দর মুখমণ্ডলে আলোকরশ্মি পড়িয়াছিল। তাহার কর্ম্মপ্রিয়তা ও একাগ্রতা দর্শনে হরেন্দ্র মুগ্ধ, আকৃষ্ট হইল। সে নিঃশব্দচরণে বালকের পশ্চাতে গমন করিল।

বহুক্ষণপরে বালক তাহার ক্লিষ্ট নয়নদ্বয় তুলিয়া পশ্চাতে চাহিল। হরেন্দ্রকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালকের পৃষ্ঠে হাত দিয়া স্নেহবিগলিতকণ্ঠে হরেন্দ্র বলিল, "তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতেছ কেন?"

অবনতমস্তকে বালক মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "ম্যানেজার বাবু বলেছেন, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিলে এক্‌ষ্ট্রা পাওয়া যাইবে।"

হরেন্দ্র বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, রাত্রি জাগিয়া প্রত্যহ পরিশ্রম করিলে মারা পড়িবে। তুমি আর কখনও রাত্রি জাগিয়া কাজ করিও না।"

বালকের বিনয়নম্র ব্যবহার দর্শনে হরেন্দ্রের হৃদয় আরও আকৃষ্ট হইল।

বালকের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আবার হরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিল। যেন একটা তীব্র বেদনা তাহার উজ্জ্বলদৃষ্টি ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেছিল।

হরেন্দ্র তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছেন?"

ছলছলনেত্রে বালক বলিল, "মা, বাবা, দাদা—সবাই আছেন, কিন্তু—"

বালকের কণ্ঠরোধ হইল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার মুখমণ্ডলে যে নীরব দুঃখের কাহিনী, দারিদ্র্যের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে, হরেন্দ্র যেন তাহা স্পষ্ট পাঠ করিল।

পাশের বাড়ী হইতে হারমোনিয়মের সুরের সহিত সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—
চির দিন কেন পাই না।"

হরেন্দ্র বালককে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও। আর এখন কাজ করিতে হইবে না।"

বালক চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র ধীরে ধীরে একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। উন্মুক্ত বাতায়নপথে সঙ্গীতের ধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল—

"কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে—"

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার হৃদয়মধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছে!

ম্যানেজারের বহিতে হরেন্দ্র লিখিল, বালকের মাহিনা যেন দ্বিগুণিত করা হয়। তাহার প্রেসে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ যেন পরিশ্রম না করে।

৭

ভবানীপুরে বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল; হরেন্দ্র ভোজনান্তে গৃহে ফিরিতেছিল।

আকাশে ছিদ্রশূন্য মেঘ। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধতাভারে আচ্ছন্ন। হরেন্দ্র দ্রুতগতিতে ট্রামের রাস্তায় আসিল। বাতাসটা যেন ক্রমে আর্দ্র, শীতল হইয়া আসিল। বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা দেখিয়া পথিপার্শ্বস্থ একটা খোলার ঘরের ছাঁচের নীচে সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ট্রাম তখনও আসিল না।

কিন্তু বৃষ্টি দেখা দিল।

হরেন্দ্র যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই গৃহের অভ্যন্তরে কাহারা যেন গোলমাল করিতেছিল। ঝড়বৃষ্টির শব্দে স্পষ্ট কিছু শোনা যাইতেছিল না।

কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চে উঠিল। এক জন বলিল, "তোর জন্য আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, পথের ভিখারী হইয়াছি, তবু তুই এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করিবি না?"

আর এক জন বলিল, "বেশ করিব, তোমরা—"

বৃষ্টি আরও প্রবলবেগে নামিয়া আসিল। বাতাসের শব্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ঝড় বৃষ্টির শব্দ অতিক্রম করিয়া ভিতর হইতে উচ্চক্রন্দনের শব্দ উত্থিত হইল—"তুই আমায় মারলি?"

সেই আর্ত্ত চীৎকারে, বেদনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে হরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

গর্জ্জন করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ফের যদি অমন ক'রে চীৎকার কর, তা হ'লে এখনি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ গুরু পদার্থের পতনশব্দ হরেন্দ্রর কাণে গেল।

হরেন্দ্রের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় যেন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে বাড়ীর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অস্ফুট বিদ্যুদালোকে হরেন্দ্র দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি ভিজিতে ভিজিতে অঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে আসিতেছে।

তাহার পশ্চাৎ হইতে রমণীকণ্ঠে কেহ বলিল, "রাগ ক'রে কোথায় চল্‌লে? উপযুক্ত ছেলে না হয় দু' কথা বলেছে, একটা চড়ই না হয় মেরেছে, তা ঘর ছেড়ে কোন্ চুলোয় যাচ্চ?"

ক্রুদ্ধস্বরে গৃহমধ্য হইতে প্রহারকারী বলিল, "যাক্ না, বুড়ো যাবে কোথায়? তুমি শুয়ে থাক, ঠাণ্ডা লাগিও না মা। পেটের জ্বালায় এখনি ফিরে আস্‌বে।"

পথিপার্শ্বস্থ গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক লাঞ্ছিত বৃদ্ধের মুখের উপর পড়িল। তাহার মলিন, ছিন্নপ্রায় পরিধেয় বৃষ্টিসিক্ত, কর্দ্দমাক্ত! শীর্ণ মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

হরেন্দ্রের হৃৎপিণ্ডটা যেন অজ্ঞাত বেদনাভরে সহসা আকুল হইয়া উঠিল।

"বাবা, বাবা, রাগ করে যেও না, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, ফিরে এসো!" বলিতে বলিতে একটি বালক ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধের মস্তকে একটা ছাতি খুলিয়া ধরিল; একখানা ছিন্ন কম্বল সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া দিল। তার পর পিতার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বালক কহিল, "এই সে দিন জ্বর থেকে উঠেছ, বাবা! এখনি আবার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আস্‌বে। ফিরে এস বাবা!"

হরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহার প্রেসের সেই কম্পোজিটার বালকের কণ্ঠস্বর!

অন্ধকারের দিকে হরেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত দেহ এরূপ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে কেন?

রোরুদ্যমান বৃদ্ধ পুত্রের হাত ধরিয়া বলিল, "না বাবা, আর আমি ফিরে যাব না। তুমি বৃষ্টিতে ভিজো না, যাও, ঘরে যাও। তোমার দাদা জানিতে পারিলে এখনই তোমায় মারিবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। একদিন তাহাকে নিরপরাধে তাড়াইয়া—"

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। বিকট বজ্রনাদে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

"দেবা, তুই বৃষ্টিতে বাহিরে গিয়াছিস্? এখনো এলি না? মার খাবি বল্‌ছি!"

বালক একবার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি সব শুনিয়াছি। আসুন, আজ আপনি আমার অতিথি।"

বৃদ্ধ বিহ্বলনেত্রে হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

হরেন্দ্র বলিল, "কোনও সঙ্কোচ বা ভয় করিবেন না; আসুন।"

বৃদ্ধকে একরূপ টানিয়া লইয়া হরেন্দ্র ট্রামে উঠিল।

৮

ঝড় ও বৃষ্টি মাতামাতি করিতেছিল।

পার্শ্বের কক্ষে অতিথি নিদ্রিত। শয্যার উপর বিনিদ্রনয়নে হরেন্দ্র আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল, তথাপি তাহার নিদ্রা আসিল না। অতীতের সহস্র স্মৃতি বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাহার শরীর ও মনের মধ্যেও যেন একটা বিপ্লব বাধিয়াছিল। হরেন্দ্র তাহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিল।

বাতাস আর্ত্তচীৎকার করিয়া রুদ্ধ জানালা দরজায় আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি—পৃথিবীতে কি প্রলয়কাল উপস্থিত!

ক্রমে হরেন্দ্রের বোধ হইল, তাহার সমস্ত দেহে যেন বেদনা সঞ্চারিত হইতেছে। শয্যার উপর পড়িয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এ কি? তাহার কি হইল?

দরজা খুলিয়া হরেন্দ্র বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর্দ্র বাতাস শ্বসিয়া গেল, অন্ধকারপূর্ণ আকাশ মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎপ্রভায় উদ্ভাসিত হইল।

শীতল বাতাসে তাহার দেহ সুস্থ হইল না, বরং হাত পা যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত বিশ্বটা যেন শূন্য বলিয়া মনে হইল। কি যেন ঘটিবে, কি যেন শেষ হইয়া আসিতেছে, যেন একখানা অন্ধকার যবনিকা তাহার চক্ষুর উপর পড়িয়া সমগ্র পৃথিবীটাকে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।—এমনই একটা অমূর্ত্ত আশঙ্কায় হরেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ একটা দুর্দ্দমনীয় বমনেচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

* * * *

অতিকষ্টে হরেন্দ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্ত পদ অবশ, শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ভৃত্যগণকে ডাকিবে, এমন শক্তিও যেন নাই।

সহসা তাহার মনে হইল, এই পীড়া কি তাহার জীবনগ্রন্থি শিথিল করিতে আসিয়াছে? একটা অব্যক্ত আতঙ্কে হরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

সত্যই কি ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ! হায়! সংসারের সব কাজ কি এখনই শেষ হইয়া যাইবে? এই সুন্দর পৃথিবী হইতে এত শীঘ্র দোকানপাট তুলিতে হইবে? হৃদয়ের মধ্যে যে মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে, ইহা কি সেই মহাকালের আহ্বানসূচক?

কিন্তু হায়! এখনও যে তাহার পাথেয় সঞ্চিত হয় নাই! তাহার বহু কার্য্য এখনও যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে!

একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা, সীমাহীন স্তব্ধতা তাহার বুকের উপর, হৃৎপিণ্ডের উপর যেন পাষাণের মত চাপিয়া ধরিল।

* * * *

যখন হরেন্দ্র চক্ষু চাহিল, তখন দিবার আলোক কক্ষমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু গম্ভীরমুখে হাত টিপিয়া নাড়ী দেখিতেছেন।

অদূরে তাহার বন্ধু ও গত রজনীর অতিথি দণ্ডায়মান।

তবে কি সে মরে নাই?

ক্ষীণস্বরে হরেন্দ্র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বুঝিতেছেন?"

উৎফুল্লভাব দেখাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "ভয় কি, সারিয়া উঠিবেন।"

কিন্তু চিকিৎসকের বাহ্য প্রফুল্লতার মধ্য হইতে প্রচ্ছন্ন সংশয় আপনি ফুটিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র ম্লানহাস্যে বন্ধুকে বলিল, "এটর্ণি—বাবুকে আনিতে পাঠাও।"

বন্ধু অশ্রুসিক্তনয়নে চলিয়া গেলেন।

৯

অতি কষ্টে কাগজখানিতে সহি করিয়া হরেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে এটর্ণি বাবুকে বলিল, "পাশের ঘরে যে বৃদ্ধ অতিথি আছেন, কাগজখানি তাঁহাকে দিবেন, বুঝাইয়া বলিবেন।"

এটর্ণি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার সকলকে গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। রোগীর নিদ্রার প্রয়োজন।

হৃদয়ের মধ্যে যে গুরুভার পাষাণের মত চাপিয়া ছিল, তাহা যেন অনেকটা নামিয়া গেল। হরেন্দ্র যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। হে মৃত্যু! হে অমৃত!

এখন এস, এক আঘাতে হরেন্দ্রের জীবনগ্রন্থি শিথিল করিয়া দাও, তাহার আর বিশেষ আক্ষেপ নাই।

সহসা দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। হরেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। কে তুমি বালক? করুণ-ব্যাকুল-নয়নে কেন তাহার পানে চাহিতেছ? ঐ সুন্দর মুখে কালিমা মাখা, নয়নে উদ্বেগ ও শ্রান্তির চিহ্ন! বালক, পিতার সন্ধানে আসিয়াছ? যাও, ঐ ঘরে তোমার পিতা আছেন।

বিবর্ণমুখে বালক নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল। হরেন্দ্রের চক্ষের নীরব ভাষা কি সে বুঝিতে পারে নাই?

আবার তীব্র বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণায় হরেন্দ্রে অস্থির হইয়া পড়িল।

দরজা আবার মুক্ত হইল। গত রাত্রির বৃদ্ধ অতিথি রোগীর শয্যাপ্রান্তে উন্মত্তের মত আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হরেন্দ্রের শোণিতশূন্য শীতল হস্ত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "আমার প্রাণের ভাই, হারানিধি তুই! আজ তোর এই দশা! পিশাচ আমি, পাষণ্ড আমি, তোকে নিরপরাধে তাড়াইয়া দিয়া কি যন্ত্রণা—কি শাস্তিই পাইয়াছি, কিন্তু তবু আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই। আমি তোর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলাম, আজ তুই তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়াছিস। তোর সর্ব্বস্ব দিয়া এখন আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবি! ডাক্তার! ডাক্তার! শীঘ্র এস।"

"কাকা বাবু! কাকা বাবু!"

আকুল আহ্বান হরেন্দ্রের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই স্নেহব্যাকুল আহ্বান কি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আজ তাহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে? সে কৃপণের মত এতদিন সেই স্নেহসম্বোধনটি বুকের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল যে!

কিন্তু পৃথিবীর আলোক আর যে চক্ষে পড়িতেছে না। কোনও স্নেহসম্বোধন কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। কোথায় সেই স্নেহব্যাকুল নয়নদ্বয়?

হরেন্দ্র দাদার হস্ত সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। মৃত্যু! আসিতেছ কি?

বৃদ্ধের হাত সরাইয়া লইতে বলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনারা দেখ্‌ছি রোগীকে বাঁচিতে দিবেন না। এরূপ উত্তেজনায় সহসা মৃত্যু হইতে পারে। অত ব্যস্ত হইবেন না। দেখিতেছেন না, ইহার মূর্চ্ছা হইয়াছে?"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রেডিয়ম্।

আধুনিক প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ প্রায় পঞ্চাধিক সপ্ততি মূলবস্তুর অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বশেষে আবিষ্কৃত পদার্থের নাম দিয়াছেন—রেডিয়ম্ (Radium)। এক জন ফরাসী পণ্ডিত এই অভিনব পদার্থের আবিষ্কারক। তাঁহার নাম কুরী (M. Curie)। এই আবিষ্কার বিষয়ে অধ্যাপক কুরীর পত্নী তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পত্নীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে অধ্যাপক কুরী হয় ত রেডিয়ম্ আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই নূতন পদার্থের নানাপ্রকার গুণের পরীক্ষা, ইহার দুরূহ পরিশোধনপ্রক্রিয়া বিষয়ে ও নানাপ্রকার যন্ত্রাদির ব্যবহারে, মিসেস্ কুরী অকাতরে পতির সাহায্য করিয়া, তাঁহাকে বিবিধ যুক্তি ও পরামর্শ দিয়া, প্রকৃতপক্ষে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর হইল, রেডিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বেকারেল (Becquerel) য়ুরেনিয়ম্ (Uranium) নামক একটি মূল পদার্থের আবিষ্কার করিবার পর রেডিয়ম্ আবিষ্কারের পথ সুগম হইয়াছিল। হয় ত য়ুরেনিয়ম্ আবিষ্কৃত না হইলে রেডিয়মের অস্তিত্ব মানবসমাজে আরও বহুকাল অজ্ঞাত থাকিত।

রেডিয়ম্ একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা প্রস্তরাদির সহিত মিশ্রিত থাকে। স্বর্ণাদি ধাতুকে যেমন খনি হইতে তুলিবার পর পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ইহাকেও পরিষ্কৃত করিতে হয়। ইহা অনেক সময়ে বেরিয়ম্ (Barium) নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। য়ুরেনিয়মের খনি হইতে য়ুরেনিয়ম্ বাহির করিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইবার পর যে রাশি রাশি লালবর্ণ পদার্থ পড়িয়া থাকে, তাহাতেই এই দুর্লভ রেডিয়ম্ লুক্কায়িত থাকে। এক সময়ে এই লালবর্ণ পদার্থ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে, পাংশুবৎ পরিত্যক্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে রেডিয়মের একটি আকর বলিয়া উহার বিশেষ আদর হইয়াছে। বাজারে মূল্যও হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরের বহির্ভাগে আচার্য্য কুরীর রেডিয়ম্ বাহির ও পরিশোধন করিবার এক কারখানা আছে। এই কারখানায় পূর্ব্বোক্ত রাশি রাশি লালবর্ণ রাবিশ হইতে বহুচেষ্টায় বহুকষ্টে ও বহুব্যয়ে অতিসামান্যপরিমাণ রেডিয়ম্ সঞ্চিত হয়। বিস্তর জ্বালান পোড়ান, গালাই ঢালাই, ছাঁকাছাঁকি, দানাবাঁধাই ইত্যাদি করিয়া একপ্রকার সাদা

গুঁড়া অতি অল্প পাওয়া যায়। ইহাই বিশুদ্ধ রেডিয়ম্। তবে ইহা প্রকৃত মূল পদার্থ নহে। ইহা রেডিয়ম্ ধাতু ও ক্লোরিন্ নামক গ্যাসের একটি যৌগিক পদার্থ। এই ধাতু ক্লোরাইড্ বা ব্রোমাইড্ রূপেই থাকে। ইচ্ছা করিলে এই যৌগিক পদার্থ হইতে মূলধাতুটি পৃথক করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল নাই। কারণ, ইহার মৌলিক অবস্থা অত্যন্ত অস্থায়ী। অবিলম্বে বায়ুর অম্লজান গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তরিত ও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ক্লোরাইড্ বা ব্রোমাইড্ অবস্থায় ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। অস্মদ্দেশীয় কবিরাজগণের যেমন ধাতুর মারণ শোধনাদি প্রক্রিয়া আছে, এবং এক এক ধাতুকে যেমন শত সহস্রবার মারণ করিবার বিধি আছে, সেইরূপ অতি বিশুদ্ধ রেডিয়ম্ পাইবার জন্য প্রকৃতই লক্ষাধিকবার শোধন করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় প্রক্রিয়ার ন্যায় ইহাতেও অত্যন্ত সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হয়। নতুবা এই দুর্লভ ধাতুর বহু আয়াসলব্ধ সামান্য পরিমাণের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। শুনা যায়, আচার্য্য কুরী ও তাঁহার পত্নী আপনারাই এই শোধন কার্য্যের শেষাংশ সম্পন্ন করেন। সামান্য কর্ম্মচারী বা অন্যের হস্তে দিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। রেডিয়মের প্রাপ্তি বহুব্যয়সাধ্য। অধ্যাপক কুরীর গণনা-অনুসারে এক হাজার গ্র্যাম—প্রায় এক সের রেডিয়ম্ বর্ত্তমান প্রথানুসারে বিশুদ্ধ অবস্থায় বাহির করিতে গেলে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ আজকালের হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় এক রতি রেডিয়মের মূল্য তিন হাজার রতি সুবর্ণের মূল্যের সমান। সুতরাং ইহা শুধু দুর্লভ নহে, দুর্ম্মূল্যও বটে। অথবা জগতে দুর্ম্মূল্যতা দুর্লভতার প্রতিশব্দমাত্র। যাহা হউক, যদি কোন নরকুবের এক মণ কি দুই মণ রেডিয়ম্-সংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তবে তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। কেন না, এই রত্নগর্ভা ধরণীতে রেডিয়মের পরিমাণ অতি অল্প বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। অন্ততঃ তাহার সন্ধান বর্ত্তমান সময়ে খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক কুরী বলেন, সমস্ত পৃথিবীতে এখন বড় বেশী ধরিলে ৬০ গ্রেন্ রেডিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ফ্রান্সে ১৫ গ্রেন্, জর্ম্মনি দেশে ১৫ গ্রেন্, আমেরিকা মহাদেশে কিছু কম ১৫ গ্রেন্, আর পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশে গ্রেন্ আট রেডিয়ম্ বিদ্যমান আছে। যদি টন্ টন্ কি মণ মণ রেডিয়ম্ পৃথিবীতে থাকে, তাহা আজও মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ২৫।৩০ রতি রেডিয়মের অস্তিত্ব উপস্থিত জানা গিয়াছে। তাহাও প্রস্তরগর্ভে অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া এরূপ সূক্ষ্মভাবে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া

রহিয়াছে যে, ইহারই উদ্ধার করিতে সমগ্র মানবজাতির সমস্ত ব্যাঙ্ককে লালবাতি জ্বালিতে হয়। কলিকাতার দুই তিনটি বড় কলেজে ও ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভায় রেডিয়মের কিঞ্চিৎ নমুনা সম্প্রতি আনীত হইয়াছে।

যে পদার্থ এত দুর্লভ দুর্মূল্য, তাহার কি বিশেষ বা অসাধারণ গুণ আছে, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এই অদ্ভুত পদার্থ হইতে অবিরাম তাপ ও আলোক বহির্গত হয়। অথচ তজ্জন্য ইহার কিছুমাত্র শক্তির হ্রাস বা আয়তনের ক্ষয় লক্ষিত হয় না। জগতের দিবাকর মহাদ্যুতি সূর্য্য তাপ ও রৌদ্র বিকীরণ করিয়া ক্রমশঃ হীন হইতেছেন, কিন্তু এই রেডিয়ম্-কণার তেজ অক্ষয়। যদি ইহার কিছু হ্রাস হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম। উৎকৃষ্টতম যন্ত্রের সাহায্যেও জানিতে পারা যায় না। তাপ ও আলোক ব্যতীত এই ধাতু হইতে তিন প্রকার অদৃশ্য কিরণ সতত বহির্গত হয়। ইহাদের গতি আলোকের গতির সমতুল্য। এই কিরণমালার ক্রিয়া অতি বিস্ময়কর। ইহাতে উপকার ও অপকার উভয়ই সাধিত হয়। ইহা জীবনীশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। জীবের আকার পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। অনেক প্রকার জীবাণু (Bacteria) নষ্ট করিতে পারে। বিবিধপ্রকার রোগ ও ক্ষতাদি আরোগ্য করিতে পারে। বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ম্ শ্বেতবর্ণ গুটিকা (Crystal) রূপে থাকে। এই গুটিকাগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে পারা যায়। তখন ইহা দেখিতে ঠিক লবণের মত। ছোট একটি নল বা কাচের শিশির ভিতর একটুখানি এই সাদা গুঁড়া রাখিয়া পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। এই কাচের শিশির কতকটা সীসার আবরণে আবৃত থাকে। কারণ, রেডিয়ম্ হইতে যে কিরণমালা বহির্গত হয়, তাহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী। সীসা ভেদ করিয়া এই রৌদ্র বাহির হইতে পারে না। ইহার অদ্ভুত রৌদ্র যদি কয়েক মিনিট শরীরের কোন স্থানে লাগে, তবে সেখানে কিছুদিন পরে এক ভয়ানক ক্ষত দেখা দেয়। সে ক্ষত সহজে সারে না। রেডিয়মের কিরণ দেহের কোনও স্থলে লাগিলে প্রথমতঃ কিছুই হয় না। কিন্তু কিছু দিন পরে, প্রায় এক পক্ষ পরে, সেই স্থান লাল হইয়া চর্ম্মক্ষয় হইতে হইতে পরে এক গভীর ক্ষতে পরিণত হয়। এ জন্য রেডিয়ম্ লইয়া পরীক্ষাদি অনেক সময়ে নিরাপদ নহে। অধ্যাপক কুরী ও বেকারেল এই রুদ্র পদার্থের রৌদ্র আক্রমণে অনেক ভুগিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র শিশিতে যে পরিমাণ রেডিয়ম্ থাকে, তাহার উষ্ণতা চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু অপেক্ষা প্রায় তিন ডিগ্রি (ফারেনহাইট) অধিক। এই নির্গত তাপের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। এক ছটাক রেডিয়ম্ প্রতিঘণ্টায় সমপরিমাণ অর্থাৎ এক

ছটাক বরফ গলাইতে পারে। এবং বহুকাল ধরিয়াই এইরূপ করিতে পারিবে। এক সের পাথুরে কয়লা সম্পূর্ণরূপে পুড়িলে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ তাপ দিতে পারে, এক সের রেডিয়ম্ ৮০ ঘণ্টায় সেই তাপ দিতে সমর্থ। কিন্তু কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাপ বজায় রাখিতে গেলে পুনঃপুনঃ নূতন কয়লা দিতে হইবে। কিন্তু রেডিয়মের নিজেরও ক্ষয় বুঝিতে পারা যায় না, আর তাহার তাপেরও হ্রাস দেখা যায় না। আপাততঃ মনে হইতে পারে, উহা যেন চিরকাল সমভাবে তাপ দিতে থাকিবে। প্রকৃতই কি রেডিয়মের কিছুমাত্র ক্ষয় নাই? এক জন ফরাসী অধ্যাপক গণনা করিয়াছেন যে, কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ রেডিয়ম্ চূর্ণ বা গুটিকা এক শত কোটী বৎসর সমভাবে তাপ বিকীরণ করিবার পর দশ লক্ষ ভাগের একভাগমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। অন্ধকার ঘরে ইহার রৌদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। আন্দাজ এক গ্রেন্ কি আধ রতি রেডিয়ম্ হইতে যে আলোক বাহির হয়, তাহা কোনও ছাপান কাগজের কাছে ধরিলে, লেখা বেশ পড়িতে পারা যায়। অধ্যাপক কুরী গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৫০ গ্রেন্ রেডিয়ম্ ১৫ বর্গইঞ্চি স্থানে পাঠোপযোগী আলোক দান করিতে পারে। এক সের রেডিয়ম্ ২০ হাত দীর্ঘ ২০ হাত প্রস্থ একটি ঘর মৃদুভাবে আলোকিত করিতে পারে। যদি এই রেডিয়মের নিকট জিঙ্ক সল্ফাইডের (Zinc Sulphide) পর্দ্দা রাখা যায়, তাহা হইলে এই পর্দ্দাগুলি ইহার রৌদ্রে প্রস্ফুরিত (Phosphorescent) হইয়া ঘরটিকে বেশ আলোকিত করিতে পারে। আচার্য্যের এই কথায় আশা হয়, দূর ভবিষ্যতে রেডিয়ম্ সৌদামনীকে বিদূরিত করিয়া মানবগৃহ নাট্যশালাদি আলোকিত করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কারণ, কুরীই বলেন যে, রেডিয়মের দুষ্প্রাপ্যতা ও অগ্নিমূল্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার আলোকে মানুষের অন্ধতা, পক্ষাঘাত ও অনেক প্রকার স্নায়বীয় রোগ জন্মিতে পারে। এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভবিষ্যতে যদি কোনপ্রকার কৌশলময় আবরণ উদ্ভাবিত হয়, তবে আশা কতকটা সফল হইতে পারে।

চক্ষু বুজিয়া, চক্ষুর পাতার উপর রেডিয়মের শিশি চাপিয়া ধরিলে চক্ষুর ভিতর একপ্রকার আলো দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুগোলকের তরলাংশকে এইরূপে প্রস্ফুরিত করিবার রেডিয়ম্ কিরণের শক্তি আছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ললাটের প্রান্তভাগের অস্থির উপরে রেডিয়ম্-শিশি ধরিলেও চক্ষুর মধ্যে ক্ষীণালোক আবির্ভূত হয়। অস্থির ভিতর দিয়া রেডিয়মের কিরণ কার্য্য করিতে পারে। এই

প্রকারের নানা পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক কুরী অনুমান করেন যে, চক্ষুর কতক-গুলি রোগে রেডিয়মের কিরণ উপকারে লাগিতে পারে। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি চক্ষে ছানি পড়াতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে যদি উক্ত প্রকারে রেডিয়মের আলোক দেখিতে পায়, তবে ছানি সরাইয়া দিলে সে দৃষ্টি পাইতে পারে। কিন্তু যদি আলোক দেখিতে না পায়, তবে তাহার চক্ষু সারিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

রেডিয়ম্ হইতে তাপ আলোক ও বিবিধ কিরণ ব্যতীত এক প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ নিরন্তর বহির্গত হয়। জল কিংবা কর্পূর হইতে উত্থিত বাষ্পের ন্যায় ইহা রেডিয়মের সূক্ষ্মতর বাষ্পমাত্র। এই বাষ্প ইহার নিকটবর্ত্তী পদার্থের উপর সঞ্চিত হইয়া, কিছু সময়ের জন্য সেই পদার্থকে রেডিয়মের গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলে। এই তথ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধ্যাপক কুরী অতি কৌশলপূর্ণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, রেডিয়মের কিরণ কাচ ভেদ করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা হইতে নির্গত বাষ্প কাচভেদ করিয়া যাইতে পারে না। এই পরীক্ষা তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভাতে (Royal Institution এ) তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে অতি সুখ্যাতির সহিত করিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—থ্যাল্লিয়ম্ নামক মূল পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা ও সুপ্রথিত প্রেত-তত্ত্ববিৎ উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes) রেডিয়মের উক্ত বাষ্পনির্গমন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রে রেডিয়ম্-কণার বাষ্পবিকীরণ সহস্র সহস্র উল্কাপাতের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। রেডিয়ম্ হইতে নির্গত এই বাষ্পসঙ্ঘাতে যে কোনও দ্রব্য ইহার গুণ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য অতি অল্পপরিমাণ ধাতু সঞ্চিত থাকিলেও তাহার বাষ্প দ্বারা একখণ্ড লৌহ কি কাচ রেডিয়মের ধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া নানারূপ পরীক্ষাদি করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিককাল এই কৃত্রিম রেডিয়মের শক্তি থাকে না। কৃত্রিম ধাতুর এই শক্তির স্থিতিকাল (তাম্র, সীসক, রবার, মোম্, এলুমিনিয়ম্, প্যারাফিন্ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া,) আচার্য্য কুরী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যথার্থরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে তাঁহারা নিম্নলিখিত দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, (১) সকল প্রকার পদার্থকেই রেডিয়মের বাষ্পসংযোগে রেডিয়মের ধর্ম্মবিশিষ্ট করিতে পারা যায়। (২) রেডিয়মের বাষ্প কাচভেদ করিয়া যাইতে পারে না বলিয়া কোন সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুকে কাচের অথবা তদ্রূপ কোনও পদার্থের নল বা শিশির ভিতর রাখিয়া দিলে তাহার শক্তি অধিক দিন পর্য্যন্ত থাকে। এইরূপে সুরক্ষিত

হইলে তাহার শক্তি চারি দিন অন্তর অর্দ্ধেক করিয়া কমিয়া যায়। আর যদি ওরূপ করিয়া না রাখা যায়, তবে সেই অরক্ষিত কৃত্রিম বস্তুর শক্তি আধ ঘণ্টা অন্তর (কুরি দম্পতির কড়াকড়ি হিসাবে ২৮ মিনিট অন্তর) অর্দ্ধেক কমিতে থাকে।

রেডিয়ম্ সম্বন্ধে প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহা পীতাভ ফস্ফরাস্কে লালবর্ণে পরিণত করে। ইহার কিরণে অনেক সময়ে বায়ুতে ওজন (Ozone) নামক পদার্থের বৃদ্ধি হয়। জলে অল্পপরিমাণ রেডিয়ম্ ফেলিয়া দিলে, জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হয়। কোন কাচপাত্রে দ্রবীভূত রেডিয়ম্ রাখিলে সেই কাচের বর্ণ বেগুনিয়া বা বাদামে হইয়া যায়। কাচকে অত্যন্ত উত্তপ্ত না করিলে এই রঙ্গ কিছুতেই যায় না। কাচ ও রত্নাদির বর্ণপরিবর্ত্তনে রেডিয়মের এই গুণ ব্যবহারে আসিতে পারে। রেডিয়ম্ দ্বারা আসল ও নকল হীরক চিনিয়া লওয়া যায়। কোনও অন্ধকার ঘরে আসল হীরকের নিকট রেডিয়ম্ ধরিলে প্রস্তরখানি অতিশয় প্রস্ফুরিত হইয়া আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে। কিন্তু নকল বা ঝুটো পাথরের উপর তাহার এরূপ কোনও ক্রিয়া দেখা যায় না।

জান্তব জীবনে রেডিয়মের প্রভাব অতি বিস্ময়কর। ফ্রান্সের Pasteur Institute নামক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাগারে জীবজন্তুর উপর রেডিয়মের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইতেছে। তথাকার এক জন অধ্যাপক বলেন, দুই পাউণ্ড অর্থাৎ এক সের রেডিয়মের প্রভাবে প্যারিস নগরীর সমুদয় লোককে বিনষ্ট করা যাইতে পারে। রেডিয়মের রৌদ্র যখন এই লক্ষ লক্ষ নরনারীর গাত্রে লাগিবে, তখন তাহারা কোনও প্রকার ক্লেশই অনুভব করিবে না। অথচ এক মাসের মধ্যে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বাহির হইয়া ত্বক্ খসিয়া পড়িতে থাকিবে। অবশেষে অন্ধ হইয়া পক্ষাঘাতে সকলেই প্রাণত্যাগ করিবে। অধ্যাপকের মুখে রেডিয়মের এই ভয়ঙ্কর রুদ্র প্রভাবের কথা শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠে। এই রেডিয়ম্ হয় ত ভবিষ্যৎ যুদ্ধপুরাণের অগ্নিবাণ হইয়া উঠিবে। ইহার এরূপ ভয়ঙ্কর শক্তি থাকিলেও জীবের উপর ইহার শুভ ফলও আছে। ইহার বিস্ময়কর শক্তি দেখিয়া নানা পণ্ডিতে নানা কথা বলিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত কোন্ কথা টিকিবে না টিকিবে, এখন বলা যায় না। Pasteur Instituteএর উক্ত অধ্যাপক ও অন্য কোন কোন পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, রেডিয়মের প্রভাবে জীবদেহের বৃদ্ধি বা বার্দ্ধক্য স্থগিত হইতে পারে; জীবন দীর্ঘ হইতে পারে; ভেকাদির অস্ফুট বা অপরিণত অণ্ড হইতে জীবের সৃষ্টি করা যাইতে পারে; নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, ক্ষত, কাশ ও স্নায়বীয় পীড়া আরোগ্য

হইতে পারে। তাঁহাদের বিশ্বাস, রেডিয়মের প্রভাবে কালে তাঁহারা অভিনব প্রকারের কীট পতঙ্গ প্রজাপতি মৎস্য প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং অধিকপরিমাণে এই ধাতু প্রাপ্ত হইলে ইন্দুর শশকাদি বৃহত্তর জন্তুরও নূতন প্রকার সৃষ্টি করিতে পারিবেন। রেডিয়মের প্রভাবে তাঁহারা জীবের বিকৃতিসাধন করিতে পারেন। প্রকৃতির একজাতীয় জীবকে অন্য প্রকারের করিয়া দিতে পারেন। গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা হয় ত কালে সম্ভব হইবে। এই সকল অনুমান তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের উপর—অনেক রকম পোকামাকড় ও ব্যাঙাচি ইত্যাদির উপর নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া লব্ধ ফলসমূহের ভবিষ্যৎ স্ফূর্ত্তিরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এ সম্বন্ধে অতিবিস্ময়কর পরীক্ষাগুলির কথা এখানে উল্লিখিত হইল না। তাঁহাদের অনুমান সত্য হইলে রেডিয়মের সাহায্যে ভবিষ্যতে মানুষ চিরযৌবন লাভ করিবে। প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, এই চিরযৌবন সম্বন্ধে সম্প্রতি আর এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আর এক দিক হইতে আভাষ দিতেছেন। তিনি বলেন, জরা বার্দ্ধক্য মনুষ্যদেহের একপ্রকার রোগমাত্র। এই রোগের প্রতিষেধক ঔষধ বা উপায়ের আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। সে যাহা হউক, এই অভিনব পদার্থ রেডিয়মের যে সকল গুণ ইতিমধ্যে জানিতে পারা গিয়াছে, সেগুলি এতই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে, বোধ হইতেছে, রেডিয়ম্ বিদ্যুৎবিজ্ঞানাদির সাহচর্য্যে মানবজগতে অচিরে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায়।

ঐ ডুবে গেল বেলা অকূল নীরে,
রাখিয়া ঈষৎ আভা বালুর তীরে।
লইয়া ধূসর সন্ধ্যা তিমির-ডালি,
সাগরে অম্বরে দিল লেপিয়া কালি।
ধীবর গুটায়ে জাল ফেলিয়া কাঁধে,
ফিরিছে আবাসমুখে ত্বরিতপাদে।
ওরে! তুই কত র'বি বসিয়া তীরে?
গুটায়ে তুলিয়া জাল চল্ না ফিরে।

সারাটা দিবস ধ'রে অকূল-কূলে,
কি ছাই বাঁধিলি জালে দেখ্ না খুলে!
সকালে বুনিলি জাল শতেক-ফাঁসি,
দুপুরে ফেলিলি জলে ঘুরায়ে হাসি'।
কূলে কূলে ঘুরে ঘুরে কাটালি বেলা,
সাঁঝেতে গুটায়ে লও, ভাঙ্গিল খেলা।
উদিয়াছে কাল মেঘ আকাশ ঘিরে,
আর কেন—আর কেন বসিয়া তীরে?

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

দেশীয় চুলী।

গ্রামের কোন কোন প্রবীণা গৃহিণী রান্নাঘরের নিত্যব্যবহার্য্য উনন গড়িতে এমন গুণপনা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নিকোন, পুছন, শুক্‌ন, খট্‌খটে ত বটেই; গড়নে ভাল, কাজে আরও ভাল। বাস্তবিক, আমরা শৈশবাবধি এইরূপ উনন দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া ইহার গঠন-সৌন্দর্য্য কিংবা উপযোগিতা তত বুঝিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ উননের সহিত তীর্থ-যাত্রী মাড়োয়ারীর পথি-পার্শ্বের তিনখানা পাথর, ইট বা মাটির ঢেলার তুলনা করিলেই প্রভেদ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কোন গ্রামে উদ্‌খ্মাননির্ম্মাণদক্ষা গৃহিণীও কি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়? সৌন্দর্য্য ও উপযোগের সম্মিলন চিরকালই দুর্লভ।

যাঁহারা কলিকাতার ন্যায় সহরে বাস করেন, এবং গ্রাম্য জ্বালানি খড়, বাঁশ, তালপাতা, ঘুঁটে প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আধ্‌পোড়া পাথুরে কয়লা (কোক) ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত উক্ত বিবরণে গ্রাম্য উদ্‌খ্মানের অযথা প্রশংসা কল্পনা করিতেছেন। বস্তুতঃ অযথা প্রশংসা একটুও নাই, বরং উদ্‌খ্মানের অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করিবার ভাষা পাইতেছি না। কিন্তু কেবল অঙ্গসৌষ্ঠব কেন? অনেকে সৌন্দর্য্য চান না, উপযোগ চান। এখানে যে উদ্‌খ্মানের উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহাতে দুই গুণই বর্ত্তমান।

দেশের সৌভাগ্য যে, কেবল উদ্‌খ্মাননির্ম্মাণে নহে, শিল্পজাত প্রায় অধিকাংশ দ্রব্যে খুঁত ধরিবার কিছুই পাওয়া যায় না। বরং শিল্পীর গুণপনার চূড়ান্ত নিদর্শনই পাওয়া যায়। যে সে লোক দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের দোষগুণ বুঝিতে পারে না। যে মূল্যে যে দ্রব্যটি বিক্রীত, কিংবা যে সামান্য উপকরণে তাহা নির্ম্মিত হয়, তাহা অল্পদর্শী সমালোচকেরা ভুলিয়া যান। যৎসামান্য উপকরণে সুন্দর দ্রব্য যিনি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান নিশ্চিত বর্ত্তমান।

কলিকাতার মত সহরে গ্যাস পোড়াইয়া কিংবা তড়িৎ লাগাইয়া আগুন করা যাইতে পারে। তাহা এখানে আলোচ্য নহে। গ্রামে কাঠ, কাঠের কয়লা এবং কোন কোন ব্যাপারে পাথুরে কয়লা জ্বালানিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুষ, খড়, ঘুঁটে, লতাপাতা ও কাঠ ঘরকন্নার রাঁধাবাড়া করিতে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য কামার, সেকরা, পিতলকার, কাংস্যকার কাঠের কয়লা পোড়ায়। গ্রাম্য কুমর গ্রামের জঙ্গলী

লতা, কাঁটাগাছ কাটিয়া লইয়া এক দিকে গ্রামের বন পরিষ্কার করে, অন্য দিকে তদ্দ্বারা মাটীর বাসন পোড়াইয়া থাকে। বৎসরের এক এক সময় আখের ও খেজুরের রস শুকাইয়া গুড় তৈয়ারি করিতে কাশ, শর, আক ও খেজুরপাতা আবশ্যক হইয়া থাকে। গ্রাম্য ধনী পাকাবাড়ী করিবার সময় ইট ও চূণ পোড়াইতে কখন কখন পাথুরে কয়লার যোগাড় করেন। তবে মোটের উপর, জ্বালানিকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে। (১) কাঠ (২) কাঠের কয়লা, (৩) পাথুরে কয়লা।

কাঠ, গাছের প্রায় অকর্ম্মণ্য জীবনহীন অংশ। গাছের শৈশবাবস্থায় কাঠ থাকে না, কিন্তু ভাবী কাঠের আধারকলা (Tissue) বর্ত্তমান থাকে। সেই কোমল আধারকলায় পদার্থবিশেষ ব্যাপ্ত হয়, পরে তাহা দারুকলায় পরিণত হয়। দারুর প্রধান উপাদান, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এতদ্ভিন্ন কাঠমাত্রেই জল থাকে। বায়ুতে শুষ্ক কাঠেও মণকরা ৬।৭ সের জল থাকে। মোটামুটি, এরূপ শুক্‌ন কাঠে মণকরা ৬।৭ সের জল, ১৭ সের কার্ব্বন, ২ সের হাইড্রোজেন, ১৫ সের অক্সিজেন (নাইট্রোজেন) থাকে। মৃত্তিকার (বা খনিজ পদার্থের) পরিমাণ দেড় পোয়া কি দুই পোয়া ধরা যাইতে পারে। কাঠ পুড়িলে ঐ মৃত্তিকা ভস্মের আকারে পড়িয়া থাকে। ভস্ম অদাহ্য। অন্য উপাদানের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন দাহ্য, অর্থাৎ উহারা অক্সিজেনের সহিত উত্তপ্ত হইলে পুড়িয়া যথাক্রমে কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড নামক গ্যাসে এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। স্থলবিশেষে অক্সিজেন অল্প হইলে কার্বন পুড়িয়া কার্বন-মনক্‌সাইড নামক গ্যাসে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন পুড়িলে জল হয়; জল অদাহ্য। সাধারণতঃ কার্বন পুড়িয়া কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড হয়; ইহাও অদাহ্য। কিন্তু কার্বন-মনক্‌সাইডকে পোড়াইতে পারা যায়। পুড়িয়া উহা কার্বন-ডাইঅক্‌সাইডে পরিণত হয়। কাঠ পোড়াইলে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে প্রধান তিনটি এই—জলীয় বাষ্প, কার্বন-মনক্‌সাইড, কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড। কাঠে যে হাইড্রোজেন থাকে, তাহা সাধারণ চুলীতে প্রায় পোড়ে না। সুতরাং যখন আমরা কাঠ পোড়াইয়া আগুন করি, তখন কাঠের কার্বনের ভরসাই করিয়া থাকি। এই হিসাবে, এক মণ কাঠ পোড়াইলে যত তাপ পাই, কাঠের ১৭ সের কার্বন পোড়াইলেও তত তাপ পাই। বস্তুতঃ এত তাপ পাওয়া যায় না। কারণ, কাঠের সমস্ত কার্বন সাধারণ চুলীতে পোড়ে না, এবং কাঠে বর্ত্তমান জলকে বাষ্প করিয়া উড়াইয়া দিতে উৎপন্ন তাপের কিয়দংশ লুপ্ত হয়। ফলে এক মণ কাঠ পোড়াইলে যত তাপ পাই, প্রায় ১৩।১৪ সের কাঠের কয়লা পোড়াইলেও তত তাপ পাই। এক মণ শুক্‌ন কাঠ হইতে প্রায় দশ সের

কয়লা পাওয়া যায়। কারণ কাঠ হইতে কয়লা করিবার সময় কিয়দংশ কয়লা পুড়িয়া যায়।

অন্যপ্রকারে কাঠের ও কয়লার তাপ-উৎপাদক গুণের তুলনা করা যাইতে পারে। কাঠের এক সের কয়লা পোড়াইয়া ৮০০০ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক উষ্ণতামানের এক অংশ বাড়াইতে পারা যায়। কিন্তু বাতাসে শুকন এক সের কাঠ পোড়াইয়া ২৮০০ সেরের অধিক জলের উষ্ণতা এক অংশ বাড়াইতে পারা যায় না। অর্থাৎ, কাঠ ও কাঠের কয়লার তাপ-উৎপাদিকা শক্তির তুলনা করিলে দেখা যায়, ২০ সের কাঠ ৭ সের কয়লার সমান।

পাথুরে কয়লাও প্রথমে কাঠ ছিল। মাটীর নীচে বহুকাল জল খাইয়া এবং উপরের মাটীর চাপ ও ভিতরের মাটীর তাপ পাইয়া পুরাতন কাঠ পাথরের মত শক্ত কয়লায় পরিণত হইয়াছে। পাঁশ বাদে পাথুরে কয়লায় মণকরা ৩৪ সের কার্বণ, ২ সের হাইড্রোজেন, এবং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও গন্ধক মিলিয়া প্রায় ৪ সের থাকে। ইহা মোটামুটী হিসাব। পাঁশের হিসাব দেওয়া দুষ্কর। কারণ ইহা কোনও কয়লায় খুব বেশী, কোনও কয়লায় খুব কম থাকে। মোটের উপর ২ সের ধরা যাইতে পারে। পাথুরে কয়লাতেও জল থাকে; কিন্তু মণকরা ৪ সেরের অধিক প্রায় থাকে না। কোন কোন পাথুরে কয়লা স্নিগ্ধ—যেন তেল মাখান; কোন কোন পাথুরে কয়লা রুক্ষ—যেন তেল নাই। শেষোক্ত প্রকার কয়লা পোড়াইলে আগুনের শিখা হয় না। এই কয়লা বহু পূর্ব্বকালের; বঙ্গদেশের কয়লা তত পুরাতন নহে। যেমন কাঠ আধ্‌পোড়া করিলে কয়লা হয়, তেমনই স্নিগ্ধ পাথুরে কয়লা আধপোড়া করিলে পোড়া পাথুরে কয়লা বা কোক হয়। উৎকৃষ্ট পাথুরে কয়লা হইতে মণকরা ২৫।২৬ সের কোক পাওয়া যায়। বাকী অংশ কোল-গ্যাস, আলকাতরা, আমোনিক-কার্ব্বনেট প্রভৃতি দ্রব্যে পরিণত হয়। তাপোৎপাদক গুণ দেখিতে গেলে, এক সের পাথুরে কয়লা পোড়াইয়া ৬০০০ হইতে ৮০০০ সের জলের উষ্ণতা এক অংশ বাড়াইতে পারা যায়। এবং এক সের আধপোড়া পাথুরে কয়লা পোড়াইয়া প্রায় ৭০০০ সের জলের উষ্ণতা এক অংশ বাড়াইতে পারা যায়।

আগুন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানা আবশ্যক হয়,—সেটি আগুনের আঁচ। খড় পোড়াইয়া সোনা গলাইবার চেষ্টা বৃথা। কাঠের কয়লা কিংবা গ্যাস-কোক ব্যতীত লোহা গলাইবার চেষ্টা নিষ্ফল। লোহা সোনা গলাইতে আগুনের সমধিক আঁচ আবশ্যক হয়। প্রাচীনদিগের ভাষায় আঁচের নাম অগ্নিমাত্রা, আধুনিক

বিজ্ঞানের ভাষায় দহনের উষ্ণতা। তবে, ইন্ধনসমূহের কেবল তাপোৎপাদক গুণ দেখিলে চলে না, কার্য্যবিশেষে দহনের উষ্ণতা দেখিতে হয়। এই দুই হিসাবে সকল কাঠ সমান নহে। ভারী কাঠ ও হাল্কা কাঠে অনেক প্রভেদ। তেঁতুল ও বাব্লার আগুন সকলেই জানে। আমড়া ও আমকাঠের আগুন অন্য প্রকার। খড়ের ও তূষের আগুনের আঁচ আরও কম। ঘুঁটের আগুন ভারী কাঠের আগুনের মত নহে। কিন্তু উহার একটা গুণ আছে। কোন দ্রব্য ঘুঁটের মধ্যে রাখিয়া পোড়াইলে তাপ তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া থাকে। এই জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা ঘুঁটের আগুনে নানাবিধ পুটপাক করিয়া থাকেন। চুলীবিশেষ নির্ম্মাণ দ্বারা প্রায় সকল প্রকার ইন্ধন হইতে প্রখর তাপ পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চুলী বা অত্যন্ত প্রখর তাপ আমাদের নিত্যকর্ম্মে আবশ্যক হয় না। এ জন্য এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। গ্যাস-কোক দিয়া ভাত রাঁধিতে গেলে মাটীর হাঁড়ি ফাটিয়া যায়, হাঁড়ির তলার ভাত পুড়িয়া যায়। গ্যাস-কোক ত দূরের কথা, বাজারের আধ্পোড়া কয়লার আগুনে রাঁধা ভাত খাইতে অনেকে ভয় করেন।

শ্রেষ্ঠ ইন্ধনের কতকগুলি লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। (১) যে ইন্ধন শুষ্ক, আর্দ্র নহে, তাহা শ্রেষ্ঠ। কারণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, ইন্ধনের জলকে বাষ্পীভূত করিতে তাপ ব্যয় হয়। ফলে, কষ্টকর ধূম লাভ, এবং ভিজা কাঠ ফুঁকিতে ফুঁকিতে রাঁধুনীর চোখ মুখ লাল হয়, মেজাজ গরম হয়, এবং ভক্ষ্য দ্রব্যও সুস্বাদ ও সুসিদ্ধ হয় না। (২) যে ইন্ধন পোড়াইলে পাঁশ বেশী হয় না, তাহা শ্রেষ্ঠ। মাটী বালি মিশাইয়া গোবরের ঘুঁটে দিলে, গোবরের পাঁশের সহিত সেই মাটী বালি থাকে। ফলে দশ সের ঘুঁটের জায়গায় হয় ত পনর সের ঘুঁটে লাগে। মাটী বালি উত্তপ্ত করিতে তাপ লাগে, চুলী পাঁশে পূর্ণ হইয়া যায়। পূর্ণ হইলে পাঁশ বাহির করিতে হয়, নতুবা চুলী ভাল জ্বলে না। পাঁশ বাহির করিতে চুলীর আগুন নিবাইতে বা কমাইতে হয়। ইহার অর্থ চুলীকে শীতল হইতে দেওয়া, কাজেই অতিরিক্ত তাপ-ব্যয় ঘটে। (৩) ইন্ধন এমন হইবে যে, চুলীতে পোড়াইবার সময় তাহার দাহ্য অংশ অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ থাকিবে না। চুলী-নির্ম্মাণ দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে।

চুলীতে তাপ-উৎপাদনের নিমিত্ত চুলীর কয়েকটি অঙ্গ আবশ্যক হয়। যথা, (১) মুখ বা যে পথে ইন্ধন প্রবেশিত করা যায়; (২) চুলীতে বায়ুপ্রবেশপথ, কারণ বায়ু (বস্তুতঃ অক্সিজেন) না পাইলে ইন্ধন জ্বলে না; (৩) কাষ্ঠাদি ইন্ধনের

বিশ্লেষণস্থান; এখানে ইন্ধন দাহ্য গ্যাসে পরিণত হয়; (৪) দাহ্য গ্যাসের দহনস্থান, দাহ্য গ্যাস পুড়িলে অর্থাৎ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইলে তাপ জন্মে; (৫) ভস্মপতনস্থান; (৬) দগ্ধ গ্যাস ও ধূমের নির্গমনপথ। তবে উদ্ধ্মানকে ষড়ঙ্গ বলা যাইতে পারে। চুলীর নির্ম্মাণভেদে ছয়টি অঙ্গই পৃথক্ পৃথক্ থাকে না।

এখন আমাদের রান্নাঘরের উনন লইয়া এই কয়েক অঙ্গের নির্দ্দেশ করা যাউক। সকলেই এই চুলী দেখিয়াছেন, সুতরাং উহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। উহার মুখ প্রায়ই গোলাকার হইয়া থাকে। তাহাই ইন্ধন ও বায়ুপ্রবেশের পথ। রান্নাঘরের মেজে খুঁড়িয়া কটাহাকার গর্ত্ত করা হইয়া থাকে, এবং গর্ত্তের উপরে এবং মেজে হইতে অল্প উচ্চে প্রাচীর থাকে। এই প্রাচীরমধ্যস্থ গর্ত্তে কাষ্ঠ বিশ্লিষ্ট ও উৎপন্ন দাহ্য গ্যাস দগ্ধ হয়। গর্ত্তের তলে অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার ও ভস্ম সঞ্চিত হয়। চুলীর প্রাচীরের উপরিভাগে তিন স্থানে তিনটি মৃৎপিণ্ড থাকে। দেশভেদে তাহাদিগকে ঝিঁক বলে। এই তিন ঝিঁকের উপরে হাঁড়ী বসে। তাহাতে হাঁড়ীর দুই পাশে ও সম্মুখে ও চুলীর প্রাচীরের উপরে তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার পথ হয়। তাহারাই ধূমনির্গমনপথ। চুলীর মুখ দিয়া কাঠের ভিতর ও পাশ দিয়া বাহির হইতে চুলীর ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে। ভিতরে বায়ুর কিয়দংশ অক্সিজেন, অঙ্গারাদির সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাতে যে তাপ জন্মে, সেই তাপে দগ্ধ গ্যাস ও অবশিষ্ট বায়ু উষ্ণ হয়। উষ্ণ বায়ু, শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘু। এ জন্য তাহা উর্দ্ধগামী হয়। তাহার সহিত অদগ্ধ অঙ্গারকণা ও দগ্ধ ভস্মকণা ধূমের আকারে বহির্গত হয়। চুলীর ভিতরে উষ্ণ বায়ু ও দগ্ধগ্যাস সমায়তন শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘু। উহা যে পরিমাণে লঘু, সেই পরিমাণে ধূমনির্গমনের বেগ ঘটে। এই বেগবৃদ্ধির নিমিত্ত বাষ্পীয় যন্ত্রাদির ধূমনালী (বা চিমনী) থাকে। কেরোসিন বিলাতীদীপের চিমনীর উদ্দেশ্য তাই। চিমনীর উচ্চতা অনুসারে বেগবৃদ্ধি হয়, এবং তদনুসারে দহনস্থানে বায়ু প্রবেশ করে।

এখন আদর্শ চুলীর লক্ষণ দেখা যাউক। (১) চুলীতে দাহ্যবস্তু অর্দ্ধদগ্ধ বা অদগ্ধ থাকিবে না; অর্থাৎ, তাহাতে অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার পড়িয়া থাকিবে না। কারণ, যে পরিমাণে অঙ্গার পড়িয়া থাকিবে, সেই পরিমাণে তাপ পাওয়া যাইবে না; কাজেই ইন্ধনব্যয় অধিক হইবে। (২) চুলী হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম বহির্গত হইবে না। কারণ, কৃষ্ণবর্ণ ধূম অপর কিছু নহে, অদগ্ধ অঙ্গারকণা। সেই অঙ্গারকণা সকল পোড়াইলে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যাইত, তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই ইন্ধনব্যয় অধিক হয়। (৩) যে পরিমাণ বায়ু পাইলে দহন সম্পূর্ণ হয়, সেই

পরিমাণ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবে, তাহার অধিক বায়ু প্রবেশ করিবে না। কারণ, বাহিরের বায়ু শীতল। সেই শীতল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিয়দংশ তাপ লইয়া বাহিরে চলিয়া যায়। কাজেই ইন্ধনব্যয় অধিক হয়। (৪) যে পরিমাণ উষ্ণবায়ু ধূমনির্গমনপথে বহির্গত না হইলে ভিতরে বায়ুপ্রবেশ এবং দাহ্য পদার্থের সম্যক্ দহন হয় না, তাহার অধিক বায়ু বহির্গত হইবে না। কারণ, বায়ু উষ্ণ হইয়া বৃথা বহির্গত হইয়া গেলে তাপ চলিয়া যায়, ইন্ধনব্যয় অধিক হয়। (৫) চুলীর প্রাচীর অধিক হইবে না। কারণ, অধিক হইলে তাহাকে উত্তপ্ত করিতে অধিকপরিমাণে তাপ লাগিবে, ইন্ধনব্যয়ও অধিক হইবে। (৬) চুলীর আকার এমন হইবে যে, পাত্রের যেখানে তাপপ্রয়োগ আবশ্যক, কেবল সেই-খানেই তাপ লাগিবে। কারণ, অন্য স্থানে লাগিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্ন হইতে পারে, এবং ইন্ধনব্যয়ও অধিক হইতে পারে। (৭) যে উষ্ণতার তাপ আবশ্যক, তাহার ন্যূনাধিক হইবে না। কারণ, অল্প হইলেও কার্য্যহানি, অধিক হইলেও কার্য্যহানি। সোনা গলাইতে যে উষ্ণতা লাগে, ভাত রাঁধিতে সে উষ্ণতা লাগে না। (৮) চুলী এমন পদার্থে নির্ম্মিত হইবে যে, তাহার প্রাচীর দিয়া ভিতরের তাপ বাহিরে চলিয়া না যায়। কারণ, প্রাচীরকে তাপ-চালনীস্বরূপ করিলে ভিতরে তাপ থাকিবে না।

এতগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চুলী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কার্য্যকালে সকল দোষের যথোচিত প্রতিবিধান করিতে পারা যায় না। তখন মধ্যপথ গ্রহণ করিতে হয়। কোনও দোষ ছাড়িয়া, কোনও দোষ কমাইয়া, কোনও গুণ বাড়াইয়া, দেশকাল পাত্র দেখিয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। চুলীর প্রাচীর থাকিবেই। কিন্তু অল্প প্রাচীর দ্বারা অধিক স্থান বেষ্টন করিতে হইলে, চুলীর আকার গোল করা আবশ্যক। তৎপরিবর্ত্তে চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ করিলে প্রাচীর-প্রমাণ অধিক হয়। এই জন্য আমাদের নিপুণ গৃহিণীরা রান্নাঘরের চুলীর ভিতরের আকার হাঁড়ীর ন্যায় করিয়া থাকেন। এই আকারে বিশেষ সুবিধা হয়। ভিতরে বায়ু খেলিতে পায়, কোনও কোণ না থাকাতে সেখানে উষ্ণ বায়ু ও অগ্নিশিখা যায় না। চুলী ভাঙ্গিয়া যাইবার তত আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যহ চুলী নিকোনও স্বচ্ছন্দে হয়। চুলীর প্রাচীর থাকিবেই, অথচ তাহা তাপ অধিক শোষণ বা চালন করিবে না। বিকিরণ-নিবারণের নিমিত্ত আমাদের চুলীর অধিকাংশ মেজের নীচে থাকে। এখানে বিকিরণ নিবারিত হয় বটে, কিন্তু শোষণ নিবারিত হয় না। ভাল মাটী দিয়া চুলীর প্রাচীর গড়িলে, এবং তাহাকে ফাটিতে না দিলে,

শোষণ কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হয়। কাটিয়া যাইবার আশঙ্কায় চুলী প্রত্যহ মাটী ও গোবর দিয়া লেপা হইয়া থাকে। গোবর পুড়িয়া গেলে তাহার ভস্ম থাকে। চুলীর প্রাচীরে সেই ভস্মের এক পাতলা স্তর রহিয়া যায়। মাটী অপেক্ষা ভস্ম তাপের অপরিচালক। কিন্তু কেবল গোবর পুরু করিয়া লেপিলে চলে না। কারণ, শুধু গোবরের পাশের আটা নাই, সহজে খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। চুলীর প্রাচীর কেবল পাঁশের করিলেও চলে না; কারণ, তাহা দৃঢ় হয় না। ভাল চুলীর অন্যান্য গুণ নিপুণ গৃহিণীরা তাঁহাদের চুলীতে কি প্রকারে দিয়া থাকেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহারা চুলীর উপরের প্রাচীর উচ্চ করেন না; এমন কি, কোন কোন চুলীর প্রায় সমুদয় অংশ মেজের নীচে থাকে, উপরে কেবল তিনটি ঝিঁক দেখা যায়, এবং চুলীটি দেখিতে পানিফলের মত হয়। তাঁহারা চুলীর মুখ বড় কিংবা ঝিঁক উচ্চ করেন না। যাঁহাদের অল্প রান্না আবশ্যক, তাঁহারা চুলী ছোট করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ছোট চুলীতে বেশী রান্না চলে না। অনেক কাঠ পোড়াইলে চুলীর ভস্মস্থান অৰ্দ্ধদগ্ধ অঙ্গারে পূর্ণ হয়। চুলীর মধ্যভাগ ভস্ম ও অঙ্গারে পূর্ণ হইয়া গেলে, কাঠ ভাল জ্বলে না। কারণ, কাঠের বিশ্লেষণস্থান কম পড়িয়া যায়, এবং আবশ্যকপরিমাণ বায়ুর অভাবে কাঠ অৰ্দ্ধদগ্ধ অঙ্গারে পরিণত হয়। যদি সেই অঙ্গার পুড়িতে পারিত, তাহা হইলে উহাতে ক্ষতি থাকিত না। এই অসুবিধা-নিবারণের নিমিত্ত, বেশী রান্না আবশ্যক হইলে, দু,-আখা * উনন জ্বালা হইয়া থাকে। ইহার দোষ গুণ পরে বিবেচনা করা যাইবে।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রথম জ্বালিবার সময় চুলী হইতে যত ধূম নির্গত হয়, চুলী গরম হইয়া গেলে তত ধূম নির্গত হয় না। ইহার কারণ এই যে, কাঠ হউক, কয়লা হউক, তাহাকে পোড়াইবার অর্থাৎ তাহার কার্ব্বন হাইড্রোজেন প্রভৃতি দাহ্য অংশ পুড়িবার এক এক নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা আবশ্যক। আঁচ কম হইলে দাহ্য পদার্থের অল্পাধিক অদগ্ধ থাকিয়া যায়। ইহা অবশ্য ক্ষতি। অতএব সুগৃহিণী প্রথমেই অনেক কাঠ উননে প্রবেশিত, করেন না; প্রথমেই উননের ভিতরে প্রবেশিত না করিয়া তাহার মুখের কাছে জ্বালিয়া থাকেন। উননের মধ্যভাগ অল্পে অল্পে গরম হয়, ধূম বাহিরে না গিয়া প্রথমে প্রাচীরগাত্রে লাগিতে থাকে। পরে আঁচ বাড়িলে সে ধূমও পুড়িয়া তাপ বৰ্দ্ধিত

---

* 'পাখা' না 'আখা'? কোন কোন স্থানে 'চোখ' বলে। আখা, অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ? পক্ষ হইতে পাখা? না, পাক হইতে, 'পাকা'?

করে। এইরূপ, জ্বালিতে জ্বালিতে একবারে একগোছা কাঠ ভিতরে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদুপযুক্তপরিমাণ বায়ুর অভাবে ধূম বহির্গত হয়, কাঠের গোছা উত্তপ্ত করিতে আঁচ কমিয়া যায়। চুলীর মুখে ও ভিতরে কাঠ সাজানতেও গুণপনা আবশ্যক। সুগৃহিণী রাঁধিতে রাঁধিতে উনন নিবিতে দেন না, উননের আঁচ কম হইতে দেন না, কাঠের উপর কাঠ চাপাইয়া রাখেন না। জ্বলন্ত কাঠের বা অঙ্গারের উপর দিয়া বায়ু বহিয়া গেলে, কেবল উপরের দাহ্য পদার্থ পুড়িতে পারে, নীচের ও পাশের পদার্থ পুড়িতে পারে না। ফলে, অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গারস্তূপ, অর্থাৎ ক্ষতি। কিন্তু যদি এমন ভাবে কাঠ সাজান যায় যে, জ্বলন্ত কাঠের বা কয়লার নীচে হইতে তাহাদের পাশ দিয়া উপরে বায়ু উঠিতে পারে, তাহা হইলে অঙ্গার অদগ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, এইরূপে বায়ু পাওয়াতে নীচের ও পাশের কাঠ জ্বলিতে পায়। কাঠের পাঁশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, উননের ভিতরে অঙ্গারস্তূপ হয় না, উনন নিবাইয়া সে অঙ্গার বাহির করিতে হয় না, উননের আঁচ কমিতে দেওয়া হয় না। এ সকল কম লাভ নহে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে যখন বহুলোকের ভোজনের নিমিত্ত ভাত রাঁধিবার বা লুচী ছাঁকিবার চুলী গড়িতে হয়, গ্রাম্য পাঠকমাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন, তখন চুলী অত্যন্ত গভীর করা হইয়া থাকে। তথাপি তিন চারি মণ ময়দার লুচী ছাঁকা হইতে না হইতে চুলীর ভস্মস্থান অঙ্গাররাশিতে পূর্ণ হয়। সেই প্রখর জ্বলন্ত চুলীর ভিতর হইতে অঙ্গার বাহির করা কষ্টকর। গৃহস্থ সেই কয়লা কোন কাজেও লাগাইতে পারেন না। যিনি সমারোহে অর্থব্যয় করিতেছেন, তিনি অতিরিক্ত কাষ্ঠব্যয় অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে পারেন। কিন্তু গ্রামের ময়রা লাভের আশা করে। তাহার পক্ষে অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার অর্থে ক্ষতি। সে গ্রামের কামারকে অঙ্গার বিক্রয় করিলেও, কম মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যে গৃহস্থকে বহুপরিজনের নিমিত্ত বিস্তর কাঠ পোড়াইতে হয়, তাঁহারও কাঠের বাবদে মাসিক খরচ বর্দ্ধিত হয়। কাঠের বা কয়লার নীচে দিয়া বায়ু উঠিবার ব্যবস্থা থাকিলে, এই ক্ষতি হয় না।

আর এক লাভ আছে। কাঠ বা কয়লা হইতে কেবল তাপ পাইলেই সকল কাজ হয় না। সেকরা সোনা গলাইবার সময়, কামার লোহা নরম করিবার সময় আঁচ চায়। উভয়েই কয়লা পোড়ায়। গ্রাম্য সেকরা চোঙ্গা ফুঁকিয়া আগুনের উপরে বাতাস দেয়, কামার ভস্ত্রা দ্বারা আগুনের নীচে বাতাস চালায়। সোনার খাদ মারিতে উপরে ফুঁকা আবশ্যক। সোনা কেবল গলাইতে হইলে

নীচে দিয়া বাতাস চালনাই কর্ত্তব্য। সহরের সেকরা অনেক সোনা রূপা গলাইয়া থাকে, ভস্ত্রাও চালায়। অর্থাৎ, সেকরা ও কামার জ্বলন্ত অঙ্গারের নীচে দ্রুতবেগে ও অধিকপরিমাণে বায়ু চালনা করে। বায়ুর পরিমাণ অত্যধিক হইলে ক্ষতি, বায়ুর বেগ অত্যধিক হইলেও ক্ষতি। প্রথম স্থলে অনাবশ্যক বায়ুকে অনর্থক উত্তপ্ত করা হয়; দ্বিতীয় স্থলে উত্তপ্ত বায়ু তাপমোচন করিতে না করিতে বাহিরে চলিয়া যায়। তথাপি উভয়ই আবশ্যক, এবং উষ্ণতা বাড়াইতে হইলে বায়ুর পরিমাণ অপেক্ষা বেগ অধিক আবশ্যক। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা এখানে অনাবশ্যক। তবে, দেখা যায়, জ্বালানি যাহাই হউক, যেমনই হউক, তাহাকে প্রথমে দাহ্য গ্যাসে পরিণত করিয়া পরে পোড়াইলে অধিক উষ্ণতা পাওয়া যায়। যে উত্তপ্ত বায়ু ধূমের আকারে বাহিরে চলিয়া যায়, তাহার তাপে বায়ু উষ্ণ করিয়া চুলীর ভিতর চালিত করিলে, এক দিকে তাপের অপব্যয় কমে, অন্য দিকে উষ্ণতা বাড়ে। এই রূপে গ্যাস পোড়াইবার চুলীতে কাচরা কাচ গলাইয়া থাকে।

এ বিষয় এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রচলিত গ্রাম্য চুলীর দোষ গুণ এখন আলোচ্য। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, গ্রাম্য গৃহস্থের একআখা চুলীর নির্ম্মাণপ্রণালী প্রায় নির্দ্দোষ। এই প্রকার চুলী অল্প রান্নার পক্ষে উত্তম বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে বেশী রান্নার সুবিধা হয় না, চুলীর ভিতরে অঙ্গার জমে। তখন কাঠ ভাল জলে না, কাজেই অঙ্গার দ্রুতবেগে জমিতে থাকে। কাঠের পৃষ্ঠভাগ পুড়িতে থাকে, এমন কি, চুলীর মুখ দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতে থাকে। এই দোষের নিবারণ করিতে হইলে চুলীর মধ্যভাগে জাল (grating) পাতা আবশ্যক। এই জালের উপরে কাঠ পুড়িতে থাকিবে, নীচে হইতে বায়ু জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারের পাশ দিয়া উপরে উঠিবে। এইরূপ নির্ম্মাণে অদগ্ধ অঙ্গার থাকে না; সুতরাং বিশেষ লাভ বলিতে হইবে।

কলিকাতার সহরে যেখানে কোক-কয়লা পোড়ান হইয়া থাকে, সেখানে চুলীতে লোহার শিক পাতা হইয়া থাকে। ইহাই জাল। জালের উপরে ইন্ধন-বিশ্লেষণ ও দহনস্থান, নীচে বায়ুপ্রবেশপথ ও ভস্মস্থান। ভস্মের সহিত জ্বলন্ত কয়লার যে সকল টুক্‌রা নীচে পড়ে, তদ্দারা বাহিরের বায়ু উষ্ণ হইয়া জালের উপরিস্থ কয়লাকে পোড়াইয়া দেয়। সুতরাং কয়লা হইতে যত তাপ পাইবার কথা, সমুদয়ই পাওয়া যায়। এই চুলী গোলাকার হইয়া থাকে, সুতরাং ধূম-নির্গমনের বেগ মন্দ হয় না, প্রাচীরপ্রমাণও অধিক হয় না। একটি দোষ এই যে, এরূপ চুলী প্রায়ই মেজের উপরে থাকে, কাজেই প্রাচীর দিয়া তাপ-বিকিরণ

চলিতে থাকে। মেজের নীচে চুলী নির্ম্মিত হইলে এই দোষ কতকটা নিবারিত হইতে পারে। কয়লার উননের মত কাঠের উনন করা যাইতে পারে। প্রভেদ এই, কয়লার উননে মুখ রাখিতে হয় না, কাঠের উননে মুখ রাখিতে হয়। এক-আখা উননের উপর কেবল একটি পাত্র বসিতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে রান্না শেষ করিবার নিমিত্ত দু'-আখা চারি-আখা উনন করা হইয়া থাকে। সহজেই বুঝা যাইবে, এক-আখা উনন জ্বালিয়া সব রান্না শেষ করিতে যে পরিমাণ কাঠ লাগে, দু'-আখা উননে সেই রান্না করিতে অধিক কাঠ লাগে। কারণ, মুখ একটি হইলেও বড় হয়, বায়ু অধিক প্রবেশ করে, উত্তপ্ত বায়ু অধিক বহির্গত হয়। প্রাচীরপ্রমাণ অধিক হয়, তাহাতে তাপের শোষণ ও বিকিরণ অধিক হয়। প্রচলিত দু'-আখা উননের উন্নতি করিতে হইলে উননের মাঝখানে ও সম্মুখে মুখ না করিয়া এক পাশে করা কর্ত্তব্য। একটি এক-আখা উননের পশ্চাতে আর একটা জুড়িয়া দিলে যেমন হয়, দু'-আখা উনন তেমন করিলে লাভ আছে। যে উননে মুখ থাকিবে, তাহার উপরে ঝিঁক থাকিবে না, অন্য উননের পশ্চাদ্‌ভাগে ঝিঁক থাকিবে। এইরূপে, প্রথম উননের ভিতরের উত্তপ্ত বায়ু দ্বিতীয় উননে গিয়া তাহার উপরিস্থ পাত্রকে গরম করিতে থাকিবে। এই পাত্র গরম হইতে প্রথমে অবশ্য কালবিলম্ব হইবে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সে প্রভেদ তত লক্ষ্য হইবে না। যাহা হউক, সকল দিক্ রক্ষা করা চলে না। যদি কালব্যয়ে কাতর হও, ইন্ধনব্যয় কর; যদি ইন্ধনব্যয়ে কাতর হও, কালব্যয় কর। লোক-বিশেষে ইন্ধনের মূল্য অপেক্ষা কালের মূল্য অল্প। অবশ্য এরূপ উননেও জাল পাতা এবং উননের অধিকাংশ মেজের নীচে করা ভাল।

চার-আখা উনন গড়িতেও সেই কথা। পরে পরে উনন গড়াই ভাল। এইরূপ উননে আখের রস হইতে গুড় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পনর ষোলটা উনন পশ্চাতে পশ্চাতে গড়িয়া শেষে ধূমপথ রাখা হয়। সকল দিক্ দেখিতে গেলে এরূপ উননের উন্নতিকল্পনা করা কঠিন। কোন উননের ঝিঁক থাকে না, সকলের পশ্চাতে ধূমপথ থাকে। ফলে তাপের অপব্যয় হয় না। সম্মুখের উননে যে উননের পাশে মুখ থাকে, সে উননের তাপ অপেক্ষা তাহার পরের উননে তাপ বেশী হয়। এবং দূরের উননে তাপ কম হইলেও আখের রস অল্পে অল্পে শুকাইতে থাকে। নাদের বা বাইনের (যে গামলায় রস পাক করা হয়) গঠনও চমৎকার। জল শুকাইতে হইলে জলের অল্প স্থানে তাপপ্রয়োগ না করিয়া অধিক স্থানে করাই ভাল। নাদ দীর্ঘ, মোচার আকার। উহার কানাটুকু

চুলীর উপরে থাকে, অপর সমুদয় অংশ ভিতরে থাকে। মোচার আকার বলিয়া নাদ দৃঢ় হয়। সুতরাং নাদের আর কি ভাল আকার হইতে পারে? ইন্ধনও উৎকৃষ্ট। আখের পাতা, শর, খেজুরপাতা ইত্যাদি। অর্থাৎ, ভারী কাঠ নহে। ভারী কাঠের আগুনের শিখা দীর্ঘ হয় না, লতা পাতা ঘাসের শিখা দীর্ঘ হয়। এ জন্য দীর্ঘ চুলীর এক প্রান্তে পাতা পোড়াইলে তাহার শিখা অন্য প্রান্তে চলিয়া যায়। দেশ-কাল-পাত্র দেখিলে এইরূপ চুলী সকল দিকেই ভাল। তবে, একটা উন্নতি মনে হইতে পারে। চুলী প্রত্যহ জ্বালা হয়, প্রত্যহ নিবান হয়। ফলে তাপের প্রচুর অপব্যয়। কিন্তু আখের রসও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে না, রস পাক করিবার লোকও অধিক পাওয়া যায় না।

সবিরাম চুলী অপেক্ষা অবিরাম চুলীতে যে কম জ্বালানি লাগে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গ্রামের কুমর সকল একজোট হইয়া অবিরাম চুলী জ্বালিতে পারিত। কিন্তু এ দেশের কোন্ ব্যবসায়ে একতা আছে, কোন্ ব্যবসায়ে ঈর্ষ্যা নাই? যাহা হউক, অবিরাম চুলী একটা নহে, দুইটা বা অধিক চুলী পরস্পর যুক্ত থাকে। পৃথক্ পৃথক্ ইটের পাঁজার অপেক্ষা অবিরাম পাঁজায় (যেমন Bull's patent Brick Kiln) পোড়াইলে কাঠ কম লাগে, এবং ইটও পোড়ে ভাল। গ্রাম্য কুমারের দুই রকম চুলী বা পোয়ান দেখা যায়। কোন কোন পোয়ান দুতলা; জাল থাকাতে পোয়ান দুতলা হয়। জালের উপরে বাসন রাখিয়া খড় কাদা দিয়া উপরিভাগ লেপা হইয়া থাকে। কোন কোন পোয়ান একতলা, অর্থাৎ পোয়ানের মেজের উপরে বাসন থাকে, এবং বাসনের উপরে খড় কাদা লেপিয়া উপরিভাগ গোল করা হইয়া থাকে, তাপ ও শিখা উপরে উঠিয়া পশ্চাতের ধূমপথে নির্গত হয়। বাসন সাজাইতে পারিলে উভয়বিধ পোয়ানেই ফল এক হয়।

গ্রাম্য ইটের পাঁজা ভাল নহে। ইহাতে বহু ইট পোড়ে না, আবার অনেক ইট গলিয়া ঝামা হয়। বিশেষতঃ, পাঁজায় আগুন লাগাইবার পর কোনও দিকে বাতাস বহিতে থাকিলে, সে দিকের ইট পোড়ান দুষ্কর হয়। পূর্ব্বকালে ইন্ধন সুলভ ছিল কি না, সে তর্কে প্রয়োজন নাই। এখন যে সুলভ নহে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন।

গ্রাম্য কর্ম্মকার কাংস্যকার প্রভৃতির চুলী উৎকৃষ্ট। কামারের চুলীর প্রাচীর নাই, অন্ততঃ তিন পাশে থাকে না; থাকিলে কাজ করা চলে না। গ্রাম্য কর্ম্মকারকে নানা আকারের লোহা পোড়াইতে হয়, সুতরাং অনেক স্থলে অগ্নিকুণ্ডের

উপরে ছাদ করা চলে না। কিন্তু স্বর্ণকার তাহার অগ্নিকুণ্ডের উপরে ছাদ করিতে পারে; ছাদ থাকিলে কয়লা খরচ কম হয়। গ্রাম্য পিত্তলকার ও কাংস্যকারের চুলী বেশ; কাঠের কয়লায় যথেষ্ট তাপ ও উষ্ণতা হয়, চুলী কূপাকার বলিয়া ভস্ত্রা-সাহায্যে বায়ুপ্রেরণ আবশ্যক হয় না।

শেষে পুরীর মন্দিরের চুলীর উল্লেখ করা যাইতেছে। বঙ্গদেশের অনেকের ধারণা আছে, সে চুলীতে হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী বসাইয়া অন্নাদি পাক করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা হয় না। সেবকদিগের উনন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পরিমিত স্থানে যে যতগুলি উনন করিতে পারে, সে তত লাভ মনে করে। এই উননের সহিত বঙ্গদেশের চারি-আখা উননের তুলনা করা যাইতে পারে। কিংবা ঐ উননকে নবদ্বীপ বা যশোরের খেজুর-রস পাক করিবার উনন মনে করা যাইতে পারে। চারি পাঁচ হাত ব্যাসের বৃত্তকার স্থানে একটি কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার বৃহৎ মৌচাক করিলে তাহা দেখিতে যেমন হয়, পুরীর মন্দিরের চুলী সকলের আকার সেইরূপ। একমুখে জ্বাল দেওয়া হয়, পশ্চাতের এক ধূমপথে ধূম নির্গত হয়। কোন উননের ঝিঁক থাকে না। সুতরাং তপ্তবায়ু ও অগ্নিশিখা উপরে উঠিয়া উননের উপরিস্থ পাত্রে প্রতিহত, এবং শেষে ধূমপথে বহির্গত হয়। পরিধি হইতে মধ্যভাগের উনন ক্রমশঃ উচ্চ। ফলে, ভিতরের আগুন বেশ খেলিতে পায়, এবং পশ্চাতে ধূমপথ থাকাতে সকল উননই প্রায় সমান তাপ পায়। উনন সকল ক্রমশঃ উচ্চ না করিলে ভিতরে আগুন খেলিত না। তথাপি মুখের দুই পাশের উননে তাপ কম হইবার কথা। পাচক অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া নূতন হাঁড়ীতে তৎসমুদয় ঢালিয়া রাখে। এ জন্য বিদেশী যাত্রী সে হাঁড়ীর তলায় কালী দেখিতে পায় না।

পুরীর মন্দিরের উননের বিষয় বলিতে গিয়া সেকালের যজ্ঞকুণ্ডের বিবরণ মনে হইতেছে। সেকালের ঋষিগণ অগ্নিকুণ্ডরচনায় বহুবিধ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে বিষয় আরম্ভ করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। হয় ত কেহ কেহ মনে করিতেছেন, সামান্য উনন লইয়া এত পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবার আবশ্যক ছিল না। আমরা গ্রীষ্মদেশে বাস করি বলিয়া, আমাদিগকে গৃহে গৃহে অঙ্গারধানিকায় অগ্নিরক্ষা করিতে হয় না। শীতের দেশে বাস হইলে আমাদিগকে সাগ্নিক হইতে হইত। এদেশেও শীতকালে কেহ কেহ হসন্তীর উত্তাপ উপভোগ করিয়া থাকেন। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই অগ্নির তাপে স্বাস্থ্য অনুভব করে। কিন্তু এদেশের সূতিকাগৃহের প্রায় শ্বাসরোধক ধূমের কষ্ট কে না অনুভব করিয়াছেন!

আমরা নানাবিধ আকারে প্রত্যহ অগ্নিপূজা করিয়া থাকি। দেবপূজক সর্জ্জ-রস-নিক্ষেপ ও ধূমপায়ী তাম্রকূটবীর্য্যনিষ্কাশনের নিমিত্ত অগ্নিরক্ষার আয়োজন করিয়া থাকেন। এমন নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণে শিখিবার জানিবার অনেক আছে। যিনি উদ্‌ধ্মানের ধূমনির্গমনিবারণের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তিনি জনাকীর্ণ নগরের স্বাস্থ্যের বহু কল্যাণ সাধন করিবেন। গ্রাম্য গৃহস্থ লতা পাতা কাঠ প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ভস্ম পায়, তাহার ক্ষারে কখনও বা মলিন বস্ত্র ধৌত করে, কখনও বা তাহা শস্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া শস্যের অত্যাবশ্যক পটাসি-রূপ উপাদান তথায় সঞ্চিত করে। অতএব, চুলীর পাঁশ ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে। কোন্ জিনিসই বা ফেলিয়া দিবার আছে? আর, কত জিনিস আমরা ফেলিয়া দি, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

খনিজ বা ধাতুর জীবনীশক্তি।

বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত অভিনব আবিষ্ক্রিয়া সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রাণের পরিধিবিস্তার তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। বিজ্ঞানের শৈশবে প্রাণিগণই একমাত্র প্রাণের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখনও উদ্ভিজ্জরাজ্য একেবারে চেতনার গণ্ডীর বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু পদার্থের ক্রমবিভাগস্থলে—উদ্ভিদ্ অচেতন না হইলেও, চেতনারাজ্যে স্থান পাইত না। কেবল জীববিজ্ঞানে জীবনীশক্তির সূক্ষ্মতম বিকাশের দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ভিদ্‌গণ উদাহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রাণের পরিধি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া ধাতুদ্রব্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে। যাহা কিছু দিন পূর্ব্বে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতার সাধারণ স্বত্ব বলিয়া নির্ণীত ছিল, আজি বিজ্ঞান অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছে যে, ধাতু পদার্থও সেই প্রাণশক্তির সাধারণ স্বত্বাধিকারী। আর্য্য মনীষীগণ? বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রাণের লীলা দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা অচেতনকেও সচেতন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জড়ের জীবন সপ্রমাণ করিয়া তাহার পুরুষক্রমাগত জড়াপবাদমোচনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নবোদ্ভাবিত পরীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া ধাতুর জীবনীশক্তি সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ন্যাণ্টিস নগরের ডাক্তার Sephane Ledus এবং নেপলস নগরের সিয়ন ভন্ সিয়ন (Signore Von Schion) উক্ত বিষয়ের শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহাদের গবেষণা-প্রণালী বিবৃত হইতেছে

যদি এক খণ্ড দ্রবণীয় ধাতুজ দানাদার (Crystal) লবণ,—যেমন Sulphate of Soda,—অল্পপরিমাণ পরিস্রুত জলে নিক্ষেপ করা যায়, উহা তদ্দণ্ডেই জলে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা সকলেই জানেন। যদিও সহজদৃষ্টিতে জলে সোডার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত ধাতুজ লবণের সত্ত্বা প্রমাণিত হইতে পারে। এইরূপ লবণমিশ্রিত জলে পুনঃপুনঃ লবণ নিক্ষেপ করিলে এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন উক্ত জলে আর লবণ মিশিবে না। সেই সময়ে লবণনিক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে। তখন যদি ঐ লবণমিশ্রিত জলের উত্তাপ কমান যায়, তাহা হইলে সহজদৃষ্টিতে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইবে। পাত্রের মধ্যে সূচীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট রেখা সকল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। যদি পাত্রটি কোনও মতে কম্পিত না হয়, তবে অবিলম্বেই দুই চারিটি ক্রিষ্ট্যাল (দানাদার লবণ) দৃষ্টিগোচর হইবে, এবং সেইগুলি জ্যামিতিক নির্দ্দিষ্ট সরল রৈখিক ক্ষেত্রের ন্যায় নানা আকারে বিভক্ত হইতে থাকিবে। দানাগুলি অষ্টকোণ, দশকোণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে। সাধারণ লবণ ও ফটকিরি দ্বারা উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা হইতে পারে। যে সমস্ত ধাতু দ্রবীভূত হয় না, তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

হীরক দানাদার অঙ্গার (Crystal of Carbon) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা ঘনক্ষেত্রের (Cube) আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দানাদার প্রস্তর সকল (Rock Crystal) ষট্‌কোণী প্রিজ্‌মের (Prism) বা পরকলার ন্যায় আকারযুক্ত। প্রত্যেক ধাতুর ও ধাতুজ দানাদার লবণের এক একটি নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। হীরক কখনও প্রিজ্‌মের আকারে দৃষ্ট হয় না, বা দানাদার প্রস্তর (Rock Crystal) কখনও Cubeএর আকার ধারণ করে না। প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট আকার আছে।

ক্রিষ্ট্যাল সকল সজীব।

ক্রিষ্ট্যাল-ঘটিত উক্ত তত্ত্ব সকল রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তিকাল হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত সকলে বিদিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অণুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি বহু সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বলিতে পারিতাম যে, তরল বস্তু হইতে কঠিন বস্তু ধীরে ধীরে উৎপন্ন হইতেছে;—কিন্তু কি প্রকারে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইত, আমাদের তদ্বিষয়ের ধারণাও ছিল না। কিন্তু অধুনা ভন্ সিয়নের (Dr Von Schion) উদ্ভাবনীশক্তিবলে অণুবীক্ষণের শক্তি ৮০০০০০ গুণ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় তরল পদার্থের কঠিনীকরণবিষয়ক সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তিনি বলেন যে, প্রথমে একটি জলবিন্দু জলাধার হইতে সঞ্চালিত হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। উক্ত জলবিন্দু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিবৎ Cellএ পূর্ণ। এইগুলি আদিম উদ্ভিজ্জ অথবা জান্তব শরীরের (Organism) অনুরূপ। ডাক্তার এই গ্রন্থিযুক্ত পদার্থের পেট্রোব্ল্যাষ্ট (ক্রিষ্ট্যালের অঙ্কুর ?) নাম দিয়াছেন। উক্ত পেট্রোব্ল্যাষ্টের চতুর্দ্দিকে সূত্রাকার পদার্থ সকল সমষ্টিবদ্ধ হইয়া ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে উক্ত জলবিন্দুর বৃত্তাকার অন্তর্হিত হইতে থাকে, এবং পেট্রোব্ল্যাষ্ট সকল উপরিভাগে কোণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। উক্ত কোণকে ডাক্তার আদিম dominant angle নাম দিয়াছেন। তৎপরে এই কোণের বিপরীত দিকে আর একটি কোণ উৎপন্ন হয়। ইহাকে তিনি কর্ণকোণ বলেন (diagonal angle)। এই প্রক্রিয়া

সম্পন্ন হইলে পরে কৃষ্ট্যালের ধ্রুবরেখা বা অক্ষরেখা (axis) সংগঠিত হয়। ভন সিয়ন বলেন, এই স্থলে প্রাণপ্রবাহের প্রথম ক্রিয়া নয়নগোচর হয়। ইহার সহিত উন্নত জীবশরীরের প্রাথমিক জীবনসঞ্চারের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কখনও বা কৃষ্ট্যাল-গঠন-সময়ে একটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি কৃষ্ট্যালের উৎপাদন করে; দুইটিই পরস্পর ভিন্ন দিকে ছুটিতে থাকে। কোন কোন সময়ে পেট্রোল্যাষ্টগুলি জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। পেট্রোল্যাষ্টকেই কৃষ্ট্যাল-জননী বলা যাইতে পারে। ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে থাকে, এবং কৃষ্ট্যালখণ্ডগুলি যেন লাফাইয়া লাফাইয়া জননীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি কৃষ্ট্যাল সন্নিহিত হইলে, ক্ষুদ্রটি বৃহৎটির শরীরে সংলগ্ন হইয়া এক হইয়া যায়। সজীব পদার্থের প্রধান তিনটি ধর্ম্মই এই কৃষ্ট্যাল-জননে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎপত্তি, গতি ও বৃদ্ধি, এই তিনটি সজীবের ধর্ম্ম; কৃষ্ট্যালের ক্রম-বিকাশে ইহাই পুনঃপুনঃ লক্ষিত হইতে থাকে। সুতরাং কৃষ্ট্যালের জীবনীশক্তিতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। তবে সূর্য্যকিরণে যে স্বল্পায়ু কীটাণুপুঞ্জ নৃত্য করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, কৃষ্ট্যালের প্রাণশক্তি তাহাদের জীবনীশক্তি অপেক্ষাও ক্ষীণ। সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইবামাত্র কৃষ্ট্যালের গতির লোপ হয়। দ্রবণীয় ধাতু পদার্থের মধ্যে সজাতীয় কৃষ্ট্যাল বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং ঐ সমস্ত কৃষ্ট্যাল দ্রবীভূত হইলে পুনরায় সজাতীয় কৃষ্ট্যালের সৃষ্টি করে। কিন্তু অদ্রবণীয় ধাতুর (Minerals) জীবনীশক্তি প্রমাণিত করিবার সুযোগ আজিও উপস্থিত হয় নাই। এক কালে সম্পূর্ণ কৃষ্ট্যাল থাকিয়াও ইহা তখন নির্জ্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; পরে ইহাকে দগ্ধ করিলে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে, ইহার কৃষ্ট্যাল-জীবনের অবসান হইয়া থাকে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু।

কৃষ্ট্যালের সহিত প্রাণীর সাদৃশ্যের আরও প্রমাণ বিদ্যমান। কলিকাতার জগদীশচন্দ্র ৪ বৎসর পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ধাতুদ্রব্য সকলের প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তি আছে। প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা তাহাদের সজীব ও নির্জ্জীব ভাব পরীক্ষিত হইতে পারে। বিষপ্রয়োগে যেমন সজীব পদার্থের রূপান্তর হয়, ধাতুদ্রব্যেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।• এক মাস পূর্ব্বে M. Jean Becquerel বসুর পরীক্ষার সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন যে, ধাতু ও অন্যান্য খনিজদ্রব্য ক্লোরোফরম্, ইথর, লাফিং গ্যাস্ (হাস্যোৎপাদক বাষ্প), কিংবা আল্কোহল বাষ্প দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে—তৎকালে সেই খনিজ পদার্থের ভিতর দিয়া Blondlof কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। সম্প্রতি ন্যান্সী নগরের M. Bichat সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, খনিজপদার্থের শরীর প্রাণিশরীরের ন্যায় উক্ত কিরণসমূহের উৎপত্তিস্থানমাত্র। অধ্যাপক বসু সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈদ্যুতিকপ্রবাহপ্রয়োগে, জান্তব শরীরের ন্যায় ধাতুশরীরেও সজীব-নির্জীবভেদে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া (response) উৎপন্ন হয়। ধাতুদ্রব্যও প্রাণিগণের ন্যায় সময়বিশেষে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। আবার বিশ্রামসুখ-উপভোগান্তে তাহারা সুস্থ হইয়া উঠে।

জীবনের উৎপত্তি।

উল্লিখিত পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা কি প্রাণরহস্যের কোনও নূতন তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?—যে তত্ত্ব-আবিষ্কারে আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ বদ্ধপরিকর? আমি বলিতে চাই যে, প্রাণের পরিধি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। জীবনীশক্তি যখন প্রাচীন গণ্ডীরেখা অতিক্রম করিয়াছে,

তখন কোথায় যে ইহা আবার সীমাবদ্ধ হইবে, তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এক্ষণে স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তরাদির প্রাণের স্বত্ব 'সাব্যস্ত' করিবার চেষ্টা হইতেছে, অনেকে তাহাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন; বিচারফল অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ আজিও প্রাণপ্রবাহের উৎপত্তিকেন্দ্রের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যদ্যপি সকল জড়পদার্থই জীবনীশক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, কবিচূড়ামণি টেনিসনের উক্তি সত্যবোধে বলিতে হয়—"সকল পদার্থেরই জন্ম মৃত্যু আছে। কিছুকাল শান্তিভোগান্তে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" যাহা হউক, এ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব আজিও নিরূপিত হয় নাই। ডাক্তার লেডকের (Dr. Leduc) গবেষণাফলে উল্লিখিত রহস্যাবগুণ্ঠনের এক প্রান্ত ঈষদুন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, এই কৃষ্ট্যালীকরণ প্রক্রিয়া Colloid or blue like শিরীষের ন্যায় এক প্রকার পদার্থসংযোগে দ্রুত সম্পন্ন হয়। তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, Gelatineএর দ্রব পদার্থে Ferrocyanide of Potash সংযোগে জান্তব tissueতে যে প্রকার cells দৃষ্ট হয়, কৃষ্ট্যাল-শরীরেও ঠিক সেই রূপ cell উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ট্যাল যেমন জ্যামিতিক সরলরৈখিক ক্ষেত্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্টপরিমাণবিশিষ্ট, কৃষ্ট্যাল-শরীরের গতিও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট পথে (জ্যামিতিক রেখা বা ক্ষেত্র অনুসারে) নিয়মিত হইয়া থাকে। স্বর্ণ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু বৈদ্যুতিক শক্তিতে কৃষ্ট্যালাবস্থ হইয়া 'আটা'র ন্যায় তরল অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই বিষয়ের পরীক্ষা দ্বারা আরও অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে। ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ যে ধাতুসমূহ সমুদ্রমধ্যে colloid অবস্থায় অবস্থান করে। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বসুন্ধরার বক্ষে জীবলীলার প্রথম অভিনয় যেরূপেই আরব্ধ হউক না কেন, সাগরের গর্ভেই জীবলীলার দুর্ব্বল প্রারম্ভের প্রথম প্রাদুর্ভাব।

জাপানী বালিকা ও রমণীর প্রকৃতি।

সেণ্টজেমস্ পত্রিকায় এক জন লেখক লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্যদেশসমূহের বালকবালিকাগণ পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত। প্রতীচ্য পরিদর্শকগণের নয়নে এ দৃশ্য যে বিশেষ বিস্ময়কর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক বলেন যে, জাপানই উক্ত বিষয়ের আদর্শস্থানীয়। যে দেশে নচিকেতা, দেবব্রত ও রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, এবং উপমন্যু ও আরুণির গুরুভক্তি দৃষ্টান্তস্থানীয়, লেখক বোধ হয় সেই ভারতের বিষয় বিশেষ অবগত নহেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষে পিতৃভক্তি প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মনিচয় ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে।

জাপানী বালিকাগণ সর্ব্বপ্রথমেই বয়োজ্যেষ্ঠগণের আদেশপালন করিতে অভ্যস্ত হয়। আদেশের যুক্তাযুক্ততা বা হেতুজিজ্ঞাসা করিবার তাহাদের অধিকার নাই। অগ্রজা ভগিনীই কনিষ্ঠাগণের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। অনুজাগণও বিশেষ সম্ভ্রম ও সম্মানের সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে।

সকল প্রকার গৃহকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়াই বালিকাগণের শিক্ষার দ্বিতীয় সোপান। প্রত্যেক বালিকাকেই পরিচারিকার সর্ব্ববিধ কার্য্যই শিক্ষা করিতে হয়। গৃহমার্জ্জন, তৈজসপাত্রাদির পরিষ্করণ, গৃহাগত বিক্রেতৃগণের নিকট দ্রব্যাদিক্রয় ও রন্ধনাদি সমস্তই বালিকাগণের কর্ত্তব্যতালিকার প্রধান অঙ্গ। অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনাহরণ ও পরিচর্য্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই বালিকাগণ

অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে সম্পাদন করে, এবং তজ্জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা ঐ সমস্ত কার্য্য পরম আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করে। ইহাতে অভিমান বা লজ্জা তাহাদের মনে কখনও স্থান পায় না।

বালিকারা রজকের কার্য্যও করিতে বাধ্য। এই কার্য্যে তাহারা সাবানের পরিবর্ত্তে শীতল জল ব্যবহার করে, এবং 'ইস্ত্রি' করিবার পরিবর্ত্তে মসৃণ কাষ্ঠফলকে রেশমীবস্ত্রাদি সংস্থাপিত করিয়া যষ্টির আঘাতে সমান ও মসৃণ করিয়া লয়। ফলতঃ, গৃহসজ্জার যাবতীয় কার্য্যই বালিকাগণের কর্ত্তব্যতালিকার অঙ্গীভূত। প্রদোষে পরিবারবর্গের শয্যারচন তাহাদের অন্যতর প্রধান কার্য্য। এ বিষয়ে ধনী ও দরিদ্রে কোনও তারতম্য নাই। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হয়।

পাশ্চাত্যযুবতীগণ যেরূপ বিলাসবিভ্রমে যুবজনের চিত্তহরণ করেন, জাপানী যুবতী সেরূপ বিভ্রমলীলার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে। কারণ, তাহাদিগকে প্রলোভনজাল বিস্তার করিয়া প্রণয়ী সংগ্রহ করিতে হয় না। জাপানী বালিকা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, তাহার পিতা উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। বালিকা পিতার মনোনীত পতিতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। এই পরিণয়ে জাপানী যুবতী কিছুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করে না। কিন্তু সে স্বামীকে ভালবাসিতে জানে—সে ভালবাসা উদ্দাম নহে।

পরিণয়ের পরে বালিকাগণ পতিগৃহে গমন করিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতে আরম্ভ করে। জাপানে অত্যন্ত শিক্ষাভিমানী নব্যযুবকও স্বাধীনভাবে নিভৃতনিবাসের প্রমোদপ্রকোষ্ঠে 'মধুচান্দ্রমাস' যাপন করিত পারে না। বধূ শ্বশ্রূর সম্পূর্ণ শাসনাধীন। বালিকা বধূর উপর পতির সর্ব্বতোমুখ আধিপত্য নাই। নবোঢ়া বধূ তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ক্রীতা কিঙ্করী ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

জাপানে পত্নী কোনও অংশে পতির সমকক্ষ নহেন। শ্বশুর শাশুড়ী পরলোকগত হইলেও পত্নী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইতে পারেন না। তিনি গৃহকর্ম্মনিপুণা পরিচারিকা মাত্র। পতিসেবাই তাঁহার জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রত। স্ত্রী স্বামীর সহিত প্রকাশ্য স্থলে বাহির হন না—যদিও কোনও স্থলে পত্নী পতির সহিত প্রকাশ্যভাবে বহির্গত হন, সে কেবল পতির পরিচারিকা ভাবেই—সমকক্ষা প্রণয়িণীর বেশে তিনি বাহির হইতে পারেন না। এমন কি, সম্রাটের মহিষীও সম্রাটের পরিচারিকার কার্য্যসম্পাদন হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান না।

প্রত্যূষে স্ত্রী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দীপনির্ব্বাণ করেন—পরে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া দিবসোচিত বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া পরিচারকদিগকে জাগরিত করেন, প্রাতরাশ প্রস্তুত করেন, এবং সমস্ত প্রস্তুত হইলে পতিকে জাগরিত করেন। ভোজনান্তে পতি যখন কর্ম্মস্থানে গমন করেন, স্ত্রী তখনও পাদুকা, পুস্তক ও ছত্রাদি লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকেন।

জাপানী রমণী অল্পবয়সেই যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৩৫ বৎসর বয়সে তাহার গোলাপী গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং দেহযষ্টির যৌবনলাবণ্য অপগত হয়। কিন্তু তাহাতে জাপানী রমণী বিষণ্ণ হন না। কৃত্রিম উপায়ে আর তিনি নষ্টপ্রায় যৌবনসৌন্দর্য্যরক্ষায় যত্ন করেন না। তখন তিনি প্রৌঢ়োচিত বেশভূষায় সজ্জিত থাকেন। কারণ, তিনি বেশ জানেন যে, বয়োগতে বিলাস বিভ্রমের কোনও প্রয়োজন হয় না। তিনি এক্ষণে শাশুড়ীর পদে সমাসীন

হইয়া পুত্রবধূকে পরিবারসেবায় নিযুক্ত করিয়া নিজে কিছুদিন শান্তিভোগ করেন। এই সময়ে তিনি গৃহকর্ম্ম হইতে অল্পে অল্পে অবসর গ্রহণ করেন। গৃহকর্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থায় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র "গান"। আমরা ভাবগ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলকধাঁদার ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না।—

"আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।"

বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে 'গ্রীক্'।

"দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,"

অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। "আনন্দের গভীর গন্ধ" বোধ করি আকাশকুসুমের সৌরভের মত,—প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও 'নাসাগম্য' নহে। রবীন্দ্র বাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, অনেক গাহিয়াছেন,—এখনও যে তিনি যা' তা' ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক-কবি-সুলভ কবিত্ব-কণ্ডূতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন—সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী, রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "বাপ্পাদিত্য" নামক আখ্যানটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। লেখক যে নিপুণ চিত্রকর ও ভাবুক কবি, "মোহ", "বাপ্পাদিত্য" প্রভৃতি রচনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোচ্য গল্পেও একাধারে চিত্রসৌন্দর্য্য ও কাব্যসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া অবনীন্দ্র বাবু প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ছোট ছোট 'চলিত কথা'র উপকরণে তিনি যে শব্দ-চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধ্য বলিয়া মনে হয়। রাজস্থানের পুরাতন কাহিনী স্বপ্নলোকের মায়ালোকে রঞ্জিত করিয়া ও নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন কথা শিখিলাম, কেবল বঙ্গভাষার "ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি"র পরিচয় পাইলাম না। আরম্ভেই "বর্দ্ধিষ্ণু-বস্তুর একটা জঠরাবস্থা থাকে" দেখিয়া ভীত হইবেন না, যত অগ্রসর হইবেন, ততই "ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি" দেখিয়া পুলকিত হইবেন। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার 'বানান' বদলাইবার চেষ্টা হইতেছে! 'ঙ' বেচারা বহুকাল 'মাথায় পাগড়ী' বাঁধিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ক-বর্গের একপ্রান্তে সুপ্তিসুখে মগ্ন ছিল। রবিবাবু এই নিরীহ ব্যঞ্জনবর্ণটিকে কলমের তীক্ষ্ণ খোঁচায় জাগাইয়া তুলিয়া তাহার আলস্য অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়াছেন।—এখন 'ঙ' বেচারা বঙ্গদর্শনের দরবারে 'ঙ্গ' 'ং' প্রভৃতি

অনেকের 'বেগার' একাকী খাটিয়া দিয়া নিজের ধার সুদ সমেত পরিশোধ করিতেছে। এ সংবাদ নূতন নহে। দীনেশ বাবুও সম্প্রতি "অণু পরমাণু"র 'ণ'-টিকে ছুটী দিয়াছেন। দীনেশ বাবুর কল্যাণে "ধ্বংসের" 'স' 'শ'-কারের স্কন্ধে কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়া বহুকাল পেন্সন ভোগ করিতেছে। দণ্ডীরা যেমন 'পৈতা পুড়াইয়া' দণ্ড গ্রহণ করেন, উনবিংশ শতাব্দীর অনেক ব্রাহ্মণ যেমন পৈতা ফেলিয়া চশমা লইয়া থাকেন, বোধ করি "অনুসন্ধিৎসু"র "অসু"ও সেই পথের পথিক হইয়া চিরাশ্রিত উকারকে ভারতীর কুঞ্জে বিসর্জ্জন দিয়া ই-কারকে কাঁধে করিয়া বঙ্গভাষার "ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি"র পরিচয় দিতেছে! দীনেশ বাবু "অনিবার্য্যের" উপর অত্যন্ত প্রসন্ন—তাহাকে আর একটি রেফ বখ্‌শিস্ দিয়া "অনির্ব্বার্য্য" করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হয় নাই, আর এক পৃষ্ঠায় তাহার যফলাটির পেট কাটিয়া "অনিবার্ধ্য" করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। "কাহিণী" "বানিজ্য", "বাথ্যার প্রতিক্ষা", "সংস্কৃত" "পদার্পন" প্রভৃতি ত অসংখ্য। "ঘৃণার ফাব" কি "ঘৃণার ভাব"? না, দীনেশ বাবুর প্রতিভার কোনও নূতন সৃষ্টি? সব না হয় সহ্য করিলাম, দীনেশ বাবুর "পাণ্ডিত্যের" আবদার যে অসহ্য! আবার যেমন দীনেশ বাবুর "মৌলিভিরা দরবারে আসিয়া দীর্ঘ 'শশ্রু' দোলাইয়া বসিলেন", অমনই সেই দোলার ফলে "শ্মশ্রু"র মকার খসিয়া পড়িল! দেখিতেছি, দীনেশ বাবু সম্প্রতি দার্শনিক হইয়াছেন,—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই,—কিন্তু এক লাইনে "সোহং" ও অন্য লাইনে "স্বোহং" লিখিয়া জরাজীর্ণ "সোঽহং"এর গঙ্গাযাত্রা করিবার তিনি কে? বাঙ্গালাই না হয় বেওয়ারিশ, সেই ক্ষেত্রেই তিনি লীলা করিতে থাকুন, সংস্কৃত শাস্ত্রের তপোবন চষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন কেন? পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভুলের রাশি কি মুদ্রাকরপ্রমাদ? অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ, অপরূপ দার্শনিক তত্ব, বিবিধ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত প্রভৃতির পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সে পণ্ডশ্রমে আজ আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভাষার ইঙ্গিত" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "নারায়ণী" উপন্যাসের প্রথমার্দ্ধ এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে,—অবশিষ্ট আর ভারতীতে প্রকাশিত হইবে না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী। শ্রাবণ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পরীক্ষা-বিভ্রাট" নামক সুচিন্তিত নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও পরামর্শ এ দেশে দুর্ল্লভ। সচরাচর বাঙ্গালা সাহিত্যে কর্ম্মকারই কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। স্থানাভাবে ললিত বাবুর প্রবন্ধের সারসঙ্কলন করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "সাতারা" প্রবন্ধটি নিতান্ত নীরস। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঋণশোধ" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু মন্দ নহে, কিন্তু লেখক তাহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই;—ইন্দুর মৃত্যুতেই 'ছোট গল্পে'র সমাপ্তি হইয়াছে,—লেখক তাহার পর যে জের টানিয়াছেন, তাহা উপন্যাসের সীমায় উপনীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "আমাদের নক্ষত্রচক্র ও রাশি" আমাদের অনধিগম্য,—বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য। "ওরায়ণের" প্রণেতার নাম "টিলক" নয়, তিলক। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের "স্বদেশী সমাজ—ব্যাধি ও চিকিৎসা" রবীন্দ্র বাবুর "স্বদেশী সমাজে"র সহিত আলোচিত হইবে।

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্প্রতি আর একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এখনও উহা মুদ্রিত হয় নাই। আপাততঃ তিনি প্রাচীন ভারতের শিল্প সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন। তাহার ফল ইংরাজী প্রবন্ধে "কলিকাতা রিভিউ" ও "ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বৈজ্ঞানিক লেখক শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের বেদ-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি "সাহিত্যে" বেদ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সকল একত্র সঙ্কলিত ও "বেদ-প্রকাশিকা" নামে প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে "বেদ" নামক তাঁহার একটি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "দেশের কথা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজীর Poverty and Un-British Rule in India, মিষ্টার ডিগ্‌বীর Prosperous British India, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History ও ভগান দাসের ভারতীয় দুর্ভিক্ষসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে ভারতের আর্থিক অবনতির প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। সখারাম বাবু নিপুণতার সহিত সেই সকল পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বৃদ্ধ বয়সে বরোদার 'কাউন্‌সিলার' হইয়া গিয়াছেন। বেতন মাসিক তিন সহস্র টাকা। বরোদার লাভ, দেশের ক্ষতি। দত্ত মহাশয় এই বয়সে মাতৃভূমির সেবাব্রত পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে গেলেন, ইহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে গিরিডিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু, তাঁহার সুহৃৎ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

সুকবি শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর "প্রবাহ" নামক একখানি কবিতা-পুস্তক শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "নারায়ণী" উপন্যাসের প্রথম ভাগ খণ্ডাকারে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইতেছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের কতকগুলি গল্প পূজার পূর্ব্বেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বইখানির নাম হইয়াছে,--"ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প।"

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—'চিকিৎসক' ও 'হিন্দুরঞ্জিকা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, জেলা রাজসাহীর অধীন তালন্দ নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় নক্ষত্র অবলম্বনে সৃষ্টি ও তৎপরবর্ত্তী মনু প্রভৃতির সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল সত্বর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।"

ওয়াল্‌টেয়ার হইতে সাহিত্যের এক জন পাঠক আমাদের একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি আলোচনার যোগ্য। আমরা আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কিছু দিন পূর্ব্বে আমি বঙ্গসাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কোনও সমালোচক কর্ত্তৃক সমালোচিত এক জন প্রসিদ্ধ লেখকের রচিত একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করি। দুঃখের বিষয়, পুস্তকখানি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ইহাই যে আমার এ বিষয়ে প্রথম অভিজ্ঞতা, তাহা নহে; ইতি-পূর্ব্বে আরও দুই তিন বার এরূপভাবে প্রতারিত হইয়াছি। এবং সাহিত্যসেবী বন্ধুদের মধ্যেও সময়ে সময়ে এরূপ অভিযোগের কথা শুনিয়াছি; তাঁহারাও আমার মত সমালোচক মহাশয়দের মধুর বংশীরবে প্রতারিত হইয়াছেন। তাই মনে হয়, এখন সমালোচনার উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকাদি পাঠ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় আর নাই, সে নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সমা-লোচনার কোনও মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

"গ্রন্থকার যদি সামান্য লেখক হন, তবে তিনি সমালোচক মহাশয়ের বাড়ী দু'বেলা উমে-দারী ও খোসামোদ করিয়া যে কোনও উপায়ে একটা অনুকূল সমালোচনা যোগাড় করিয়া লন। আর গ্রন্থকারের যদি উহারই মধ্যে একটু সুলেখক বলিয়া সুনাম থাকে, বা তাঁহার প্রতি কমলার কৃপাকটাক্ষ থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই!

"সমালোচক মহাশয়েরা চক্ষু বুজিয়াই নির্ব্বি-চারে লেখনী চালাইয়া থাকেন, তা গ্রন্থের মধ্যে যাই থাকুক। কিন্তু সমালোচকগণের পুস্তকাদি সমালোচনা করিবার সময় একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের সমালোচনার উপর কত পাঠকের অর্থ ও সময়ের সৎব্যবহার নির্ভর করে।

"আমাদের দেশে অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক পাঠ করা প্রায় সাড়ে পনর আনা লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; পেটে খাইতেই কুলায় না, তা বই কেনা ত দূরের কথা। তাহার উপর সময় কোথায়? সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জীবিকার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয় (এখন রবিবারেও অনেক আপিস খোলা থাকে।) জমিদারী, ওকালতী, কেরাণীগিরি, মাষ্টারী প্রভৃতি করিয়া, সভা সমিতি সামাজিকতা রক্ষা করিয়া যদি অবসর পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যের আলোচনা। এমন স্থলে যদি অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যে অর্থ, সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা ছাড়া আমাদের এখন দেশ বিদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতির রীতিমত খবর রাখিতে হয়।

"তাই বলিতেছিলাম, সমালোচক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া নিরীহ পাঠকবর্গের প্রতি যদি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়েই অনর্থক অর্থনাশ ও সময়ের অপব্যবহার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন।

"আজকাল কোনও কোনও মাসিকপত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সেরূপ বিশদ বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয়, "সাহিত্যপরিষদ" পত্রে কেবল-মাত্র পুরাতন পুঁথির বিবরণাদি প্রকাশিত না করিয়া প্রতিমাসে স্বদেশীয় সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা হইলে ভাল হয়।"

চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

সুবর্ণগ্রাম হইতে ৯ ক্রোশ দূরে পদ্মাতীরে শ্রীপুর নামে নগর অবস্থিত ছিল। এই শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। নিম রায় নামে এক জন পরাক্রমশালী ব্যক্তি কর্ণাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করেন। তিনি শ্রীপুরের প্রথম ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সেনরাজগণের সময়ে তাঁহার আগমন হইয়াছিল। কারণ, সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যবাসী হওয়ায়, তাঁহাদের অনুগ্রহলাভার্থ নিম রায় দাক্ষিণাত্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিতে পারেন। নিম রায়ের পর শ্রীপুরে আর কোনও ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামে দুই ভ্রাতা (১) প্রবলপরাক্রমশালী ভুঁইয়া ছিলেন। তাঁহারা দে-উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহারা পাঠানরাজত্বকালে ভুঁইয়াশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। মোগলেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, চাঁদ রায় কদাচ আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মোগলেরা তাঁহাদের বহুনদীবিশিষ্ট ও দ্বীপসঙ্কুল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন; মোগল অশ্বারোহীরা সেই জন্য সহজে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিত না। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ঐ সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। (২) ইশা খাঁর সহিত তাঁহাদের মিত্রতা ছিল, এবং তাঁহারা ইশা খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। কিন্তু ইশা খাঁ বলপূর্ব্বক চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের

(১) শ্রীযুক্ত আনন্দলাল রায় বলেন যে, কেদার রায় চাঁদ রায়ের পুত্র। কিন্তু তাঁহারা দুই ভ্রাতা বলিয়া চিরদিনই কথিত হইয়া থাকেন। ওয়াইজও তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) "From Bacala I went to Serrepore which standeth upon the river Ganges. The king is called Chandry. They be all hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar, for here are so many rivers and ilands that they flee from one to another, where by his horsemen cannot prevaile against them. Great store of cotten cloth is made here".

সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়; ইশা খাঁর মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত সেই বিবাদ গুরুতররূপেই চলিয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, ইশা খাঁ কর্ত্তৃক স্বর্ণময়ী অপহৃত হইলে, চাঁদ রায় লজ্জায় ও অপমানে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত খাঁ নামে তাঁহাদের কোনও ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ইশা খাঁর হস্তে অর্পণ করে। চাঁদ রায়ের মৃত্যু হইলে, কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল ইশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কেদার রায় একেবারে মোগলের অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। জেস্যুইট পরিব্রাজকদিগের বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি নৌযুদ্ধে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য-মধ্যে বহুসংখ্যক রণতরী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সনদ্বীপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গজয়ের সহিত সনদ্বীপ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়, এবং তাহা সরকার ফতেয়া-বাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃত-সংকল্প হন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মোগলের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার জন্য সনদ্বীপের ইতিবৃত্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে লিখিত থাকিবে। এই সনদ্বীপ অধিকারের জন্য কেদার রায় কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। কেদার রায় নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন; তিনি নৌযুদ্ধ পরিচালনের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গী বা পর্টুগীজকে নিযুক্ত করেন। তাহাদের মধ্যে কার্ভালিয়স বা কার্ভালো প্রধান। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কার্ভালোর সাহায্যে সনদ্বীপ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। মাটিস নামে আর এক জন ফিরিঙ্গীও কার্ভালোর সহিত যোগদান করিয়াছিল। কেদার রায় তাহাদের হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার প্রদান করেন। সেই সময়ে আরাকান-রাজ মেং রাজাগি

—Harton Ryley's Ralph Fitch pp 118—119. অনেকে Chandryকে Choudry পড়িয়াছেন; কিন্তু হটন রাইলির গ্রন্থে স্পষ্টতঃ Chandry লিখিত আছে। হটন রাইলি আবার শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। রাল্‌ফ ফিচের সময় যে চাঁদ রায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বা সেলিম সা ৩) পর্টুগীজদিগের প্রাধান্তবিস্তার দেখিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হন। ফিলিপ ডি ব্রিট্টো বা নিকোটি নামে এক জন পর্টুগীজ আরাকাণ-রাজের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিত। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রবল হইয়া উঠিলে, আরাকাণ-রাজ তাহাকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ব্রিট্টো ক্রমে আরাকাণ-রাজের অধীনতা-ত্যাগের প্রয়াসী হয়। আরাকাণ-রাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রিট্টোর দমনে প্রস্তুত হন। সেই সময়ে কার্ভালো কর্ত্তৃক সনদ্বীপ অধিকৃত হইলে, বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজ প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে মনে করিয়া, তিনি প্রথমে সনদ্বীপ-অধিকারের সঙ্কল্প করেন। আরাকাণ-রাজ সনদ্বীপকে নিজের অধিকারভুক্ত প্রচার করিয়া, তাঁহার বিনানুমতিতে কার্ভালো তাহা অধিকার করিয়াছে বলিয়া, সনদ্বীপ-অধিকারের উদ্যোগ করেন। তিনি ১৫০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামানসজ্জিত বৃহৎ রণতরী প্রেরণ করেন। কেদার রায় তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপুর হইতে এক শতখানি কোষ নৌকা কার্ভালোর সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে পর্টুগীজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করে। (৪) এই সময়ে ব্রিট্টোও সাইরাম অধিকার করিয়া গোয়ার পর্টুগীজ প্রতিনিধিকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া পাঠায়। আরাকাণাধিপতি পর্টুগীজগণের জয়লাভে ক্রোধান্ধ হইয়া সনদ্বীপ অধিকারের

(৩) সেলিম সাকে পর্টুগীজগণ Xilimxa বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরাকান রাজ মেং রাজাগি 'সেলিম সা' এই মুসলমান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

(৪) The Mogals with the conquest of Bengala had possessed Sundiva. Cada-raji still continuing his Title. Under colour whereof Carvalius and Matees, two Portugals conquered it an 1602, Heereat the king of Arachan was angry, that without his leave they had made themselves Lords of that which is challenged to belong to his protection. Fearing that by his meanes, and the fortification of Siriam he should finde the Portugals un-neighbourly Neighbours. He sent therefore a fleet of a hundred and fiftie Frigates or little Galleys, with fifteene Oares on a side and other greater furnished with ordanance: and Cadry (which they say was true Lord of it) sent a hundred cosse from Siripur to helpe him. The Portugals prevailed and became Masters of hundred and nine and fortie of enemies Vessels.—Purcha's Pilgrimes, Fourth part, Book V. P 515, 1625.

জন্য পুনর্ব্বার সহস্রখানি রণতরী প্রেরণ করেন। সেবারেও কার্ভালো জয়লাভ করে। বিপক্ষগণের প্রায় দুই সহস্র সৈন্য হত হয়, এবং তাহাদের ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। পর্টুগীজদিগের ছয় জন মাত্র নিহত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে আরাকাণ-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সেনাপতিগণের কাপুরুষতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পর্টুগীজগণ জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রণতরীগুলি ভগ্ন হওয়ায় তাহারা শ্রীপুর, বাকলা ও চণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপে আশ্রয় লয়। কার্ভালো ৩০খানি রণতরীর সহিত শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট গমন করে। অগত্যা সনদ্বীপ আরাকাণ-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য এক শতখানি কোষ নৌকার সহিত মন্দা রায়কে প্রেরণ করেন। কেদার রায়ের সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মন্দা রায় হত হয়, এবং কার্ভালো জয়লাভ করে। তাহার পর কার্ভালো তথা হইতে গলিন বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথাকার মোগলদুর্গ অধিকার করে। কার্ভালোর নামে লোকে এরূপ শঙ্কিত হইত যে, কথিত আছে, এক জন আরাকাণী সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া আপনার অনুচরদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে নদীর জলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আরাকাণ রাজ তৎশ্রবণে তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। (৫) ইহার পর কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য

(৫) "The king of Arracan foreseeing such a storme, provided a Navie of a thousand sails, the most Frigates some greater catures and cosses, and assailed the Portugal Fleet at Sundiva under Carvalius, who had but sixteene of divers forts or shipping which staid by him, and yet got the victorie, neere two thousand of the Enemies being slaine, a hundred and thirtie of their vessels burnt with the loss but six Portugals which vexed the king of Arracan, that he put many of the captaines in woman's habit, upbraiding their effiminate courges, which had not brought one Portugall with them alive or dead, yet were the Portugall ships so torne, that they were forced for feare of another tempest to forsake the land, and to transport that which there they had to Siripur, Bacola, and Chandican in the continent, and thus Sundiva became subject to Arracan, Car-

হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাহাকে কৌশলপূর্ব্বক হত্যা করেন। প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে। দেখা যায়, তাহার পর কেদার রায় আরাকাণ-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আরাকাণ-রাজ যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সোনারগাঁ প্রদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কেদার রায় তাঁহার পক্ষভুক্ত ছিলেন। (৬) মান সিং ১৬০৩ খৃঃষ্টাব্দে প্রথমে আরাকাণ-রাজকে দমন করিয়া, তৎপরবৎসর কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কেদার রায়ের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। মোগল সেনাপতি কিল্‌মক্ কেদার রায় কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে মানসিং তাঁহার সাহায্যের জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নি-ক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগলহস্তে বন্দী হন,এবং মান সিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। (৭)

valius staid at Siripur (where he had thirtie fusts or frigates) with Cadury lord of the place,where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Manasinga,Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth this Navie against Cadury. Mandary a man famous in those parts being Admiral: where after a bloudie fight Mandary was slain, De carvalius carried away the honor. From thence recovering of a wound in the late fight, he went to Galin or Gullum, a Portugall colony up the streame from Porto Pequino, where he own a castle of the Mogors kept by foure hundred men one of that company only escaping. These exploits made Carvalius his name terrible to the Bengalans in so much that one of the Arracans Commander of fiftie Arracan ships dreaming in the night that he was assaulted by Carvalius, terrified his fellows, and made them flie into the river which when the king heard cost him his head !! (Parchas Pilgrims Pt IV. BK. V P 513)

(৬) "He (the Mogh Raja) succeeded by his wiles in bringing over Kaid Rai, the zemindar of Bikrampur, who had been forcibly reduced by Man singh." (Elleots History of India Vol VI.)

(৭) "Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja". (Elliots History of, India Vol vi Inayatullas Takmilla-i-Akbarnama)

এইরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কেদার রায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, কেদার রায় প্রভৃতির বিবরণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাম রাম বসু বলেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় দে-উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা কুলীন না হইলেও, বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ের ন্যায় সামাজিক বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। বিক্রমপুরে তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারপুর নামক গ্রামে কোনও কোনও চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। (৮) তাঁহাদের রাজধানী শ্রীপুর অনেক দিন কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিনাশক সলিলে বিধৌত হইয়া গিয়াছে (৯) চাঁদ রায় ও কেদার রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনার স্থান নাই। যাঁহারা বাঙ্গালী নামের দুর্নাম মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। (১০)

---

(৮) "At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to a Rajah of the name of chande Roy, of the vace of the Booneahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country west and south of the Boori Ganga, during the decline of the kingdom of Bangoz" (Taylors Topography of Dacca. P, 101.)
টেলার চাঁদ রায়কে প্রাচীন ভুঁইয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত চাঁদ রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর চাঁদ রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদারপুর নগরের নাম হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেদার রায়ের নামানুসারে উহা অভিহিত হইয়াছিল।

(৯) "The city on the opposite side of the Megna was not Sunergong, but Seripore which stood in Bickrompore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca p. 108)

(১০) তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই যে, মানসিংহ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কেদার রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয় গজ নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি॥

কেদার রায় তদুত্তরে মানসিংহকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

তাল নারিকেলের দেশে।

১। তাঞ্জোরের অদ্ভুত শৈল।

তাঞ্জোর প্রদেশের অনন্তপ্রসারিত সমভূমির ঊর্দ্ধে, নারিকেলাদিতরু-সমাচ্ছন্ন বনভূমির ঊর্দ্ধে, একটি শৈলস্তূপ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—নিঃশব্দ, বিরাটাকৃতি; উহা যুগযুগান্তর হইতে এই প্রদেশটিকে নিরীক্ষণ করিতেছে; কালক্রমে কত বন গজাইয়া উঠিল, কত নগর সমুত্থিত হইল, কত দেবালয় নির্ম্মিত হইল—সমস্তই দেখিয়াছে। ভূতত্ত্বের হিসাবে ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার;—আদিযুগের প্রলয়-প্লাবন-সম্ভূত যেন একটি আজগুবি খেয়ালকল্পনা; দেখিতে মুকুটের চূড়ার মত; অথবা যেন দৈত্যাদিগের জাহাজের অগ্রভাগ, উদ্ভিজ্জের হরিৎ-সাগরে অর্দ্ধ-মজ্জিত। প্রায় পাঁচ শত হাত উচ্চ। চারিদিককার বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে উহা কিরূপে সমুদ্ভূত হইল, *আশপাশের কোন লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। উহার গাত্র এরূপ মসৃণ যে, এই উদ্ভিজ্জ-প্রবল দেশেও, উহাতে কোনও গাছের চারা লগ্ন হইতে পারে নাই। এই হেতু, স্বভাবতই পুরাকালের ভারতবাসী সেই মহাযোগী ঋষিগণ এই শৈলটিকে স্বকীয় আরাধনার স্থান করিয়া লইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া, ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা এই শৈল-প্রস্তর কাটিয়া, অলিন্দ-সোপানাদি-সমন্বিত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার শীর্ষদেশে কনক-মণ্ডিত চূড়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। যুগযুগান্তর কাল হইতে, প্রতিরাত্রে ঐ চূড়ার উপর পূত অগ্নি জ্বালানো হইয়া থাকে। সাগরস্থ দীপ-স্তম্ভের ন্যায়, তাঞ্জোরের দূর দিগন্ত হইতেও উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

আজ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ে শৈলের পদপ্রান্তস্থ নগরটি, অন্য দিন অপেক্ষা আজ যেন একটু বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আগামী কল্য ব্রাহ্মণদিগের একটা মহাপূজা-পার্ব্বণের দিন। গত কল্য হইতে উহারা বিষ্ণুপূজার জন্য অসংখ্য হল্‌দে ফুলের মালা প্রস্তুত করিতেছে। রমণীরা, বালিকারা, উৎসবের সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া, যাহার যাহা-কিছু উত্তম অলঙ্কার ছিল—বলয়, নথ্, কান্-বালা—সমস্ত পরিধান করিয়া, তাম্র-কলসে জল ভরিবার জন্য, উৎসের

---

* ত্রিচিনাপলির শৈল।

চারিধারে আসিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়াছে। শকটের বলদদিগের সিং রং-করা—সোনার-গিল্‌টি-করা। তাহাদের কণ্ঠহার, ছোট ছোট ঘণ্টা ও কাচের গুটিকায় বিভূষিত। মালার দোকানদারেরা, দোকানে রাশি রাশি মালা সাজাইয়া রাখিয়াছে—একপ্রকার ছোট ছোট লাল ফুল, বঙ্গীয় গোলাপ, গাঁদা—এই সকল পুষ্প মুক্তার মত গাঁথিয়া, কতিপয়-হার-বিশিষ্ট মালা রচিত হইয়াছে। এই মালাগুলি অজাগর অপেক্ষাও স্থূল। ইহার ঝুলন্‌গুলিও ফুলের, জড়ি দিয়া জড়ানো। কল্য, যাহারা পূজা-উপলক্ষে আসিবে, এবং মন্দিরস্থ দেবতারা—সকলেই এই হল্‌দে ও গোলাপী রঙের মালাগুলি কণ্ঠে ধারণ করিবে। এই উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তারা, আজ প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়া, স্বকীয় আবাস-গৃহের সম্মুখে ও সযত্নসন্মার্জ্জিত কুট্টিম-ভূমির উপরে, ফুলের ও নানাপ্রকার রেখার নক্‌সা চিত্র করিবার জন্য ব্যস্ত; একটা ছোট সাদা গুঁড়ার পাত্র হস্তে লইয়া, চিত্র বিচিত্র নক্‌সার আকারে সেই গুঁড়া ছড়াইয়া দিতেছে। এই সাদা নক্‌সাগুলি এমন সুন্দর, এবং নক্‌সার প্রত্যেক সন্ধিস্থলে, হল্‌দে ফুল এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত যে, রাস্তায় চলিতে আর সাহস হয় না। কিন্তু এই-বার বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে; তাহার সঙ্গে লাল ধূলাও উড়িয়াছে। ভারতের এই দক্ষিণপ্রদেশে এই ধূলায় সব জিনিস লাল হইয়া যায়। লোকেরা যে এত ধৈর্য্য ধরিয়া চিত্র বিচিত্র রঙে ভূমি রঞ্জিত করিল, এখন ইহার আর কিছুই থাকিবে না।

নগরের বাড়ীগুলিতে লাল ইঁটের রং। ত্রিশূল-চিহ্ন গৃহ-দ্বারের উপর অঙ্কিত—সমস্তই খুব নীচু। মোটা-মোটা খাটো দেওয়াল, পোস্তা-গাঁথুনি, খিলান-গাঁথুনি,—এই সমস্ত, 'ফ্যারোয়া'দিগের মিসর-দেশকে মনে করাইয়া দেয়। এখানে মনুষ্যালয় অপেক্ষা দেবালয়ই অধিক। প্রত্যেক দেবালয়ের সম্মুখস্থ ত্রিকোণাকার গাঁথুনির উপর ছোট ছোট লাল্‌চে রঙ্গের বিকটাকার মূর্ত্তি সন্নিবেশিত, এবং তাহাদিগের সঙ্গে এক ঝাঁক দাঁড়কাক বসিয়া আছে। তাহারা পান্থদিগের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে;—কিরূপ শীকার জোটে, পচা-ধসা কিরূপ জিনিস মেলে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই চির-অবারিত-দ্বার প্রত্যেক দেবালয়ের অভ্যন্তরে এক একটি ভীষণ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত;—গজমুণ্ডধারী গণেশের মূর্ত্তিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌কা হল্‌দে ফুলের রাশি-রাশি মালা তাঁহার কণ্ঠে ঝুলিতেছে;—এই সকল মালায় তাঁহার চারিটি বাহু ও লম্বমান শুণ্ডটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পর মন্দির; ব্রাহ্মণদিগের স্নানার্থ পুণ্য পুষ্করিণী; প্রাসাদ; বাজার। মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ও এই তাল-নারিকেলের দেশে অল্প-স্বল্প প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। এক সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-দেশে মুসলমান-ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—ইহাই বোধ হয় তাহার কারণ। মস্‌জিদ্‌গুলি সাদাসিধা; গায়ে, আরবীয় শিল্পরীতির অনুযায়ী নক্‌সা-কাটা, সরু-সরু খিলানের মাঝখান হইতে উহা আকাশ ফুঁড়িয়া সোজা উঠিয়াছে। যে ধুলা এখানকার সব জিনিস লাল করিয়া দেয়, সেই লাল ধুলা-সত্ত্বেও, এই মস্‌জিদ্‌গুলি, 'হেজাজে'র মস্‌জিদের মত, কোন উপায়ে স্বকীয় তুষার-শুভ্রতা রক্ষা করিয়াছে।

পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় লোকের গতিবিধি—লোকের প্রবাহ চলিয়াছে। কাল উৎসবের দিন। আমি শৈল-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগটি নগর ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তিন চারিটি প্রকাণ্ড শৈলস্তূপে মন্দিরটি গঠিত; উহাতে একটুও চীড়্ নাই, ফাটল নাই, জীর্ণতার রেখামাত্রও নাই। এই স্তূপগুলি পরস্পর-উপর্য্যুপরি-নিক্ষিপ্ত জন্তুর পার্শ্ব-দেশের ন্যায় ইষৎ-বর্ত্তুল, বৃষ্টির জলধারায় মসৃণীকৃত; উহাদের গাত্র এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, দেখিলে ভয় হয়। দাঁড়কাকের মেঘে চারি দিক্ আচ্ছন্ন;—উহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘোর-পাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। গোল্‌মেলে-নক্‌সা-কাটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভের মধ্যে, ছোট-ছোট মন্দির-চূড়ার মধ্যে, (সমস্তই ক্ষয়গ্রস্ত ও বহুপুরাতন) একটা প্রকাণ্ড-উচ্চ সিঁড়ি শৈলের নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কতকগুলি সুলক্ষণাক্রান্ত আরাধ্য হস্তি-শাবক (আরাধ্য হস্তিবংশ-প্রসূত) প্রবেশ-পথটি প্রায় রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট-ছোট ঘণ্টা-গাঁথা মালায় উহাদের দেহ আচ্ছাদিত। সেই প্রবেশ-পথে উহারা শিশু-সুলভ ক্রীড়াচ্ছলে, আমার গায়ে শুঁড় বুলাইয়া দিল। এইবার আমার আরোহণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেই সঙ্গে চারি দিক হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল;—শৈল-গহ্বরের মধ্যে সেই ধ্বনির গভীরতা যেন আরও বৃদ্ধি হইল;—মনে হইতে লাগিল, যেন উহা পাতাল-গর্ভ হইতে নির্গত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। কত গুপ্ত কক্ষ, কত অলিন্দ, কত প্রবেশ-দালান, কত সিঁড়ি;—ইহার মধ্যে

কতকগুলি কেবলমাত্র পুরোহিতদিগের ব্যবহার্য্য ;—এই সিঁড়িগুলি রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রত্যেক গুপ্তস্থানে, প্রত্যেক কোণে, এক একটি প্রতিমা অধিষ্ঠিত ; কোনটা বা বামনের ন্যায় ক্ষুদ্র, কোনটা বা দৈত্যের ন্যায় বিরাটাকার, কিন্তু সবগুলিই কাল-বশে লুপ্তাঙ্গ ; কাহারও বা বাহুর অংশমাত্র—কাহারও বা আধখানা মুখ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আমি অদীক্ষিত দর্শক—আমি-মাঝের বৃহৎ পথটি দিয়া উপরে উঠিতেছি—সে পথটি সকলেরই নিকট অবারিত। চারিধারে, এক একটি অখণ্ড প্রস্তরে গঠিত চমৎকার স্তম্ভশ্রেণী—নক্‌সা ও আকৃতিচিত্রে সমাচ্ছন্ন ; উহাদের তলদেশ এক-মানুষ-সমান উচ্চ—পদঘর্ষণে তেলা ও চিক্‌চিকে হইয়া উঠিয়াছে। কত কত শতাব্দী হইতে, এই সকল সংকীর্ণ পথের ছায়ান্ধকারে, কত অগণ্য ঘর্ম্মাক্ত নগ্নগাত্র মনুষ্য অবিরাম চলিয়াছে ; তাহাদেরই স্বেদজল এই সকল শৈল-কুট্টিম গভীররূপে শোষণ করিয়াছে। শৈল-মন্দিরের গায়ে—এমন কি, উহার সোপান-ধাপ ও টালিতে পর্য্যন্ত—কতকাল পূর্ব্বে, লেখাক্ষর ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ক্ষোদিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত এখন দুর্ব্বোধ ও দুর্নিরূপ্য হইয়া পড়িয়াছে ;—বিচরণকারী লোকদিগের পাণিতল ও নগ্ন পদের ঘর্ষণে অতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রথমেই কতকগুলি ভজন-মণ্ডপ ; এত জনতা যে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এইখানে ভক্তজন অন্ধকারের মধ্যে বন্দনা গান করিতেছে। আর একটু উচ্চে একটি দেবালয়, 'ক্যাথিড্রাল' গির্জার ন্যায় বিশাল ; অরণ্যবৎ স্তম্ভশ্রেণী উপরকার ভীষণ পাষাণ-ভার ধারণ করিয়া আছে। এই মন্দিরে বিধর্ম্মীদিগের প্রবেশাধিকার আছে, কেবল এই নিয়ম যে, আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই দেবালয়টি কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, দেখা যায় না। দূর-প্রান্তের বর্ণবিন্যাস ও ক্ষোদিত গুহাগুলি শৈলের নৈশ-অন্ধকারে বিলীনপ্রায়। শুভ্র লোমশ বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি বৃদ্ধের নিকট, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-শিশু বেদ পুরাণাদি পাঠ করিতেছে। শৈল-মণ্ডপের সুঁড়িপথ-গুলিতে, ব্রাহ্মণদিগের আনুষঙ্গিক পূজা-সামগ্রী সকল সংরক্ষিত :—মহাপুরুষ, রথ, ঘোড়া, হাতী, (প্রকৃত অপেক্ষা বড়) অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত কত খুঁটিনাটি জিনিস, জমাট্-কাগজের উপর—রঙ্গিন কাগজের উপর আঁকা—দেয়ালের গায়ে, ভঙ্গুর বংশদণ্ডের উপর লট্‌কানো রহিয়াছে। এখানকার জীবকুল উন্মত্তভাবে বংশবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ছোট-ছোট পাখী—চাতক কিম্বা

চড়াই—মন্দিরের সুঁড়ি-পথগুলিতে নীড়নির্ম্মাণ করিয়া, চিত্রবিচিত্র রঙ্গের অণ্ডে তাহা পূর্ণ করিতেছে। এই সুঁড়িপথগুলিতে লোকজন যাতায়াত করিতেছে, পক্ষিশাবকগুলি চিঁচিঁ শব্দ করিতেছে, এবং এই লঘু প্রাণীদিগের পরিত্যক্ত পুরীষ, কুট্টিম-প্রস্তরের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে;—এই সমস্ত জীবন-উদ্যমের বিকাশে, বিচিত্র বিকটাকার জীবের প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলিও যেন একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এখনও আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে, এই সকল অখণ্ড-প্রস্তরময় মসৃণ প্রাচীরের মধ্যে, মনে হয়, যেন কোন ভূগর্ভস্থ-সমাধি-মন্দিরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে, হঠাৎ একটি বাতায়নের মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণচ্ছটা প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল, তখন নিম্নদেশের দূরস্থ বৃক্ষ ও মন্দিরাদি দেখিতে পাইলাম। আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। কতকগুলি শৈলস্তূপ—শৈলযুগের প্রস্তরবৎ প্রকাণ্ড, পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, বিশ্লিষ্ট ও এক-ঝোঁকা, শুধু স্বকীয় পরমাণু-রাশির ভারেই, প্রায় অনাদি কাল হইতে এক স্থানে দণ্ডায়মান।

আবার একটি দেবালয়; কিন্তু উহাতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি উহা দ্বারদেশ হইতেই দেখিলাম। এইমাত্র আমি যে স্থানটি ছাড়িয়া আসিলাম, সেখানকার শৈলস্তূপগুলির ন্যায় এই শৈলস্তূপগুলিও পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, কিন্তু তদপেক্ষা আরও প্রকাণ্ড ও চমৎকারজনক। তা ছাড়া এইগুলি অধিকতর আলোকিত; কেন না, ইহার খিলানের গায়ে, স্থানে স্থানে চতুষ্কোণাকার ফাঁক আছে,—যেখান হইতে নীল-আকাশ পরিলক্ষিত হয়, এবং সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া, বিচিত্র রঙ্গের অলঙ্কারে বিভূষিত, সোনালি-গিল্টির কাজ-করা, মন্দিরের অংশ-বিশেষের উপর নিপতিত হয়। এই দেবালয়টি—যাহা গগনবিলম্বী বলিলেও হয়—ইহার উপরে কতকগুলি ছাদ আছে; এই ছাদের উপর হইতে দেখা যায়,—তাঞ্জোরের সমভূমি দূরদিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত, এবং তত্রস্থ অসংখ্য মন্দির, হরিদ্বর্ণ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

এখন কেবল সেই সর্ব্বোপরিস্থ শৈলস্তূপটি আমার দেখিতে বাকি।—একটি অখণ্ড প্রস্তরের সেই স্তূপটি, যাহা আদিকালের প্রলয়বিপ্লবে, অত ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। নিম্নদেশ হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন উহা কোন জাহাজ-"গোলুই"এর অগ্রভাগ, অথবা 'হেল্‌মেট'-শিরস্কের চূড়া-

প্রান্ত। এই শৈলের গা বাহিয়া একটা অপরিস্ফুট সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহার ১৪০টা ধাপ—সঙ্কীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্ত ও এরূপ ঝোঁকা যে দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

উল্লিখিত কনক-কলস-ভূষিত ছাদের উপরেই, প্রতিরাত্রে পুণ্য-অগ্নি জ্বালানো হয়, এবং সেইখানেই মন্দিরের মুখ্য পুত্তলিকাটি, একটা প্রকাণ্ড তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপের মধ্যে স্থাপিত। যেন কোনও বন্য পশুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এইভাবে মণ্ডপের চারিধার মজবুৎ লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। বিগ্রহটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ গণেশ—স্বকীয় পিঞ্জরের দূরপ্রান্তে, অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছেন।—একেবারে গরাদের ধারে না আসিলে স্পষ্ট দেখা যায় না। ইঁহার গজকর্ণ ও গজশুণ্ড স্বকীয় লম্বোদরের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইঁহার প্রস্তরময় দেহটি, ঈষৎ ছাই-রঙ্গের ছিন্ন মলিন চীরবস্ত্রে আচ্ছাদিত। এই উত্তুঙ্গ ব্যোমমার্গস্থ কারাগৃহে বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ থাকিয়াও, ইনি একাকী সেই সর্ব্বোপরিস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন,—যেথান হইতে, দ্বিসহস্র বৎসর যাবৎ, বাদ্যধ্বনি ও বন্দনা-গান অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

আমি এখন মনুষ্য ও পাখীর রাজ্য ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে আসিয়াছি। নীচে কাকেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে, চীলেরা উধাও হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে—মনে হইতেছে, যেন নিঃস্পন্দ হইয়া স্থিরভাবে আকাশে ঝুলিতেছে। এই মন্দিরস্থ গণপতি যে প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেছেন, ঐ প্রদেশটি পূজা-অর্চ্চনায় যেরূপ উন্মত্ত, সমস্ত ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দেবালয়-সমূহ যেন বৃক্ষের ন্যায় চারি দিক হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে; চারি দিকেই দেব-মন্দিররূপ লোহিত কুসুম-রাশি যেন হঠাৎ বনভূমি হইতে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাল নারিকেলের বন হইতে এত মন্দির উঠিয়াছে যে, এই উচ্চস্থান হইতে মনে হয়, যেন তৃণক্ষেত্রের মধ্যে, শৃগালের কতকগুলি আবাসগর্ত্ত রহিয়াছে।

ঐ অদূরে, ২০টা ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড মন্দির-চূড়া—যেন কোন ছাঁউনিতে কতকগুলি তাঁবু একত্র সাজানো রহিয়াছে। উহা 'শ্রীরাগমে'র মন্দির। যতগুলি বিষ্ণুমন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাল ওখানে মন্দিরের উৎসব-উপলক্ষে, লোকেরা ঠাকুর লইয়া মহাসমারোহে রাস্তায় বাহির হইবে—আমি দেখিতে যাইব।

শৈলের ঠিক তলদেশে একটি নগর অধিষ্ঠিত—এখান হইতে ঝুঁকিয়া যেন একেবারে উহার উপরে গিয়া পড়া যায়; মনে হয়, যেন কোন-একটা রং-চং-করা

মানচিত্রে রাস্তাসমূহের জটিল নক্‌সা-জাল অঙ্কিত; বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মন্দিরের ছড়াছড়ি; কতকগুলি মন্দির খুব সাদা ধব্‌ধবে—তাহাতে একটু নীলের আভা স্ফুরিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণদীপ্ত দর্পণের ন্যায় পুণ্যতীর্থ-পুষ্করিণীগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, আর সেই পুষ্করিণী-জলে ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে—মনে হয়, যেন কালো-কালো অসংখ্য মাছি ভাসিতেছে।

ম্যালাবার প্রদেশের ন্যায় এখানেও নারিকেলের রাজত্ব। তথাপি, অনিল-আন্দোলিত এই শাখা-পক্ষময় অরণ্যের মধ্যে—যাহা চতুর্দ্দিকে দিগন্তে গিয়া শেষ হইয়াছে—এক একটা বড়-বড় ফাঁক্,. হল্‌দে দাগের মত দেখা যাইতেছে। এইগুলি শুষ্ক তৃণক্ষেত্র, বর্ষণের অভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং আরও দূর প্রদেশে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। তাঞ্জোরেও এই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

সুতীব্র জীবন-উদ্যম-পূর্ণ বিচিত্র কোলাহল, এইখানে পৌঁছিবামাত্র সব একত্র মিশিয়া যাইতেছে। উৎসবময় নগরের প্রমোদ-কল্লোল, গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ, রাস্তার ঢাক্ ঢোল ও শানাইয়ের বাদ্যনির্ঘোষ, চিরন্তন বায়সদিগের কা-কা-রব, চীলদিগের তীব্র চীৎকার, উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত মন্দির-সমূহের স্তবগান, তুরী ও শঙ্খধ্বনি,—এই সমস্ত শৈলদেহে প্রতিহত হইয়া অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যু-ভয়।

"স্নিগ্ধ-শোভন, হৃদিরঞ্জন জ্যোৎস্নাযামিনী তুমি;
শিশির-অন্তে নব বসন্তে উজ্জ্বল বনভূমি;
অরুণ-কিরণে সরসী-জীবনে বিকশিত শতদল;
মলয়-বীজনে বিকশিত বনে পিকের প্রণয়-কল;
বরষার শেষে শরৎ-আকাশে ঊষার কনক কর;
গন্ধ-মোদিত, কোকিল-কূজিত নিশীথে বাঁশরী-স্বর;
নব-বিকশিত কুসুম শোভিত শিশির অরুণ করে;
সুখদ-পরশ মলয় সরস নীরস শীতের ঘরে;

শিশিরের শেষে অভিনব বেশে প্রকৃতির নব শোভা;
বাত্যা-বিগত গগনে উদিত চন্দ্র লোচন-লোভা।
পূর্ণ হৃদয় শুধু তোমাময় তোমা ছাড়া নাই আর;
তোমার বিহনে শূন্য জীবনে উঠে শুধু হাহাকার;
তোমার নয়নে প্রেমের কিরণে নিবিড় আঁধার টুটে;
শুষ্ক এ বুকে সীমাহীন সুখে আকুল পুলক ফুটে।"—

"নীরস শীতের ঘরে"—"নীরস শীতের পরে" কোন্‌টি ভাল, কবিতা লিখিয়া সতীন্দ্রনাথ তাহাই ভাবিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। শয়নকক্ষে প্রশস্ত পালঙ্কে অতি কোমল শুভ্র শয্যা রচিত রহিয়াছে। তাহারই নিকটে—জরীর কাজ করা আস্তরণে আবৃত টেবিলে রিডিংল্যাম্প হইতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক উদ্গিরিত হইয়া কক্ষ আলোকিত করিতেছে। সেই টেবিলের সম্মুখে মরক্কো-চর্ম্মমণ্ডিত চেয়ারে বসিয়া সতীন্দ্রনাথ ভাবিতেছে। তখনও কলম হাতেই রহিয়াছে।

এমন সময় তাহার "তুমি" কক্ষে প্রবেশ করিল। পত্নীর পদশব্দে সতীন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল। পত্নী শৈলবালা গ্রীবা একটু বাড়াইয়া, নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দেখিল,—স্বামী কবিতা লিখিয়াছেন। সে কিছু না বলিয়া শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল।

সতীন্দ্র জানিত, শৈল কবিতা বড় ভালবাসে; সে ভাবিয়াছিল, শৈল নিশ্চয়ই কবিতা শুনিতে চাহিবে, এবং তাহারই উদ্দেশে লিখিত কবিতা শুনিয়া প্রীতা হইবে। তাই সে প্রথমেই বলে নাই, "শৈল, আজ একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। সতীন্দ্রের বোধ হইল, অনেকক্ষণ হইয়াছে। সে সতর্ক হইয়া একবার শয্যায় পত্নীর দিকে চাহিল। বোধ হইল, যেন শৈল ঘুমাইয়াছে। তখন আর "ঘরে" ও "পরে"র শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারে তাহার মন রহিল না। সে দুইবার মৃদুস্বরে ডাকিল,—"শৈল!" শৈল উত্তর দিল না। সতীন্দ্র অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে ডাকিল। তবুও উত্তর নাই। তখন আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া সতীন্দ্রনাথ যাইয়া পত্নীর কপোলে করতল স্পর্শ করিল। শৈল উঠিল না। যে সত্য সত্যই ঘুমায়, সে সহজে জাগে; কিন্তু যে কপটনিদ্রায় অভিভূত, তাহার নিদ্রাভঙ্গ সহজে হয় না। শৈল উঠিল না। সতীন্দ্রের মন ভারাক্রান্ত হইল।

পত্নীর কপালের কয় গুচ্ছ কেশ তাহার সযত্ন-রচিত কবরীতে বদ্ধ হইত না। শৈলবালার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা সত্বর আবশ্যক দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয় নাই। সতীন্দ্র সেগুলিকে সরাইয়া পত্নীর কর্ণের পশ্চাতে দিল; তাহার পর কপোল চুম্বন করিল।

আলোক নিবাইয়া আসিয়া সতীন্দ্র শয়ন করিল। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামীর গভীর ও নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দে শৈল বুঝিল, সতীন্দ্র ঘুমাইয়াছে। সে ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল; দেখিল, সত্যই সতীন্দ্র ঘুমাইয়াছে! সে ভাবিল, এত শীঘ্র এত নিদ্রা! কৈ, সে ত এখনও ঘুমায় নাই!

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়াই সতীন্দ্র পত্নীকে জাগাইল; বলিল, "শৈল, কাল একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

শৈল কিছু বলিল না। সে উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে ভাবিল, গত রাত্রিতে সে আসিবামাত্র সতীন্দ্রের সে কথা বলা উচিত ছিল।

সমস্ত দিন সতীন্দ্রের মনে যেন ভার চাপিয়া রহিল।

সতীন্দ্রনাথের মনে কেবল যে একটা ভারই চাপিয়া রহিল, এমন নহে। বর্ষার আকাশে যেমন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাময়ী বিদ্যুল্লতাও থাকে, তেমনই তাহার হৃদয়ে আশঙ্কাও রহিল। মনের সে ভার প্রণয়পাত্রীর মনোবেদনা হেতু। সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তখনও তাহাদের সন্তান হয় নাই। সতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পত্নী ব্যতীত আর কাহারও স্থান ছিল না। সতীন্দ্রনাথের সকল আশা ও সকল কল্পনার কেন্দ্র সেই পত্নী। কিন্তু আশঙ্কার কারণ অন্যবিধ।

সতীন্দ্রনাথ জানিত, তাহাকে লইয়া শৈল সুখী নহে। কেন? তাহা সে জানিত না; জানিলে হয় ত কারণ দূর করিতেও পারিত। শৈল যে তাহাকে ভালবাসে নাই এমন নহে। বিবাহের পর প্রথম প্রণয়বিকাশকালে সতীন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল, সে পত্নীর নিকট যে প্রেম পাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সেই প্রেমস্মৃতিই বহুদিন তাহার সর্ব্বসুখের আকর ছিল। কিন্তু তাহার পর সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে শৈল তাহা স্বীকার করে না। কিন্তু যে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহার হৃদয়ে প্রেমাস্পদের হৃদয় প্রতিবিম্বিত হয়; তাই শৈল তাহা স্বীকার না করিলেও, সতীন্দ্রনাথ তাহা অনুভব করিত।

সতীন্দ্র প্রথমে মনে করিত, সংসারে পত্নীর মন বসিলে তাহার এ ভাব যাইবে। শৈল সংসারের সব কাজ নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু সে সংসারের কাজ লইয়া থাকিত না। সে সব কাজ যেন সখ করিয়া করা। সন্তান হইলে হয় ত শৈলবালার এ ভাব দূর হইত। কিন্তু শিশুর হাসিমুখে স্বামিস্ত্রীর দাম্পত্যজীবন সুখসমুজ্জ্বল হয় নাই।

সাধারণতঃ স্ত্রী স্বামীর সকল খুঁটিনাটি যেমন করিয়া লক্ষ্য করে, স্বামী স্ত্রীর সকল খুঁটিনাটি তেমন করিয়া লক্ষ্য করে না। তাহার কারণ, স্বামীর অনেক কাজই গৃহের বাহিরে। স্ত্রী তাহাকে যে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কার্য্য তাহাকে সর্ব্বদাই সেই সীমার বাহিরে লইয়া যায়। স্ত্রীর সর্ব্বদাই মনে হয়, স্বামীকে পর্য্যাপ্তপরিমাণে পাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে হারাইবার ভয় থাকে—তাই স্ত্রীর এত চেষ্টা। স্বামীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অনাবশ্যক। কারণ, তাহার পক্ষে হারাইবার কোন আশঙ্কাই নাই। বিশেষ, চিরাগত অটল বিশ্বাসে স্বামী নিশ্চিন্ত থাকে, সেই তাহার পত্নীর সর্ব্বস্ব। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। শৈল স্বামীর প্রেমে অটল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সতীন্দ্র যে নিশ্চিন্ত ছিল না, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাহার প্রধান কারণ, দুর্লভ মানবজীবনে মানবমাত্রেরই স্বভাবতঃ যে আকর্ষণ থাকে, সতীন্দ্র ভাবিত, তাহার পত্নীর তাহা নাই। কেন নাই—কেন সে পত্নীর প্রতি তাহার সকল কর্ত্তব্য পালন করা সত্বেও, সে পত্নীকে হৃদয়ের প্রেম দিয়া তাহাকে হৃদয়সর্ব্বস্ব করিলেও, শৈল সুখী হয় নাই, সতীন্দ্র সর্ব্বদাই তাহা ভাবিত। সে ভাবিত, আর শঙ্কিত হইত,—না জানি তাহার অদৃষ্টে দুঃখ-দুর্দ্দশার কি দুরন্ত দাবানল জ্বলিবে!

পত্নীর কথায় ও কার্য্যে সতীন্দ্র কেবল এইটুকুই বুঝিয়াছিল, শৈলবালার বিশ্বাস,—সে স্বামীর সমস্ত প্রেম পায় নাই! ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সতীন্দ্র ভাবিত, সে পত্নীকেই জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছে, তবুও তাহার মনে এ সন্দেহ কেন? কেমন করিয়া—আর কি করিয়া সে পত্নীর সন্দেহ ঘুচাইবে? তাহার স্বভাবে বা কার্য্যে, ব্যবহারে বা আচরণে, কিসে পত্নীর হৃদয়ে এ সন্দেহ জন্মিয়াছে? কিন্তু ইহার জন্যও সে পত্নীকে দোষী করিত না; বরং ভাবিত, তাহার অবশ্যই কোনও দোষ আছে। প্রেম এমনই বটে!

আজও সতীন্দ্র আপনাকেই দোষী স্থির করিল। চপলতা, কৌতুকপ্রিয়তা

যৌবনের সহচর। কিন্তু একের পক্ষে যাহা পথ্য, অপরের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর যে না হয়, এমন নহে। যাহার যাহা সহে না, তাহার তাহা না করাই কর্ত্তব্য। সে পত্নীকে জানিয়াও কেন পূর্ব্বেই তাহাকে কবিতারচনার কথা বলে নাই? সে আপনাকেই দোষী মনে করিল।

ইহার পর সতীন্দ্র আরও একবার শৈলকে কবিতার কথা বলিল; শৈল সে কথায় কানই দিল না।

এই অতিতুচ্ছ ঘটনা হইতেও অঘটন ঘটিয়া গেল। স্বামীর মনে দুঃখ ও আশঙ্কা জন্মিল; স্ত্রীর আহত চিত্তও অভিমানে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। অদৃষ্টের এমনই উপহাস।

৩

যেরূপ তুচ্ছ ঘটনায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, এরূপ তুচ্ছ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সচরাচর তাহাতে দম্পতিকলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়; স্নেহের আদরে, সোহাগের বিদ্রূপে, প্রেমের চুম্বনে অভিমান ভাসিয়া যায়—কুজ্ঝটিকার পর সমুদিত সূর্য্যের মত প্রেম যেন সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। বরং মান অভিমান প্রেমের পক্ষে স্বাভাবিক—তাহাতে প্রেমের মাধুরী বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু নদীর স্রোতে একবার পলি জমিয়া যদি চর পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে প্রতিহতবেগ প্রবাহে বাহিত সামান্য পলিও তাহাকে ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন করিতে আরম্ভ করে। একবার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইলে বিপদের আর অন্ত থাকে না। এ স্থলেও তাহাই হইয়াছিল। কথায় কথায় শৈলবালার মন ভারি হইত; মুখ চিন্তায় অন্ধকার হইত; জীবনে বিতৃষ্ণার কথা প্রকাশ পাইত; সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় ও আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। প্রথমে সে বিপদের অন্ধকারে আশার যে কিরণরেখা দেখিতে পাইত, ক্রমে তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। শেষে বুঝি জীবন অন্ধকার করিয়া তাহার জ্যোতি নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। কিন্তু তখনও শৈলবালার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে সতীন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় পূর্ণ। সেই ত যন্ত্রণার কারণ। সতীন্দ্র সর্ব্বদাই ভাবিত,—কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না;—কেবল ভাবিত। তাহার হৃদয়ে কেবল আশঙ্কার দারুণ চাঞ্চল্য। জীবনে সুখ কোথায়?

যে সুখের আশায় মানুষ আর সব সুখ ত্যাগ করিতে পারে, সে সুখের আশায় হতাশ হইলে মানুষের বড় বেদনা, বড় যাতনা। মানুষ পত্নীর নিকট

বড় আশা করে, তত আর কাহারও নিকট করে না। পত্নীর প্রেমে যাহার হৃদয় সুখ-সুরভিত হয় নাই, তাহার জীবন বড় দুঃখের। পত্নীর প্রেমে যাহার হৃদয় পূর্ণ হয় নাই, তাহার শূন্য হৃদয়ে কেবল যাতনা। যে পত্নীর প্রেমে সব কষ্ট ভুলিতে না পারে, সে বাঁচিয়া থাকে কেন? পত্নীর প্রেমে যদি দুঃখ থাকে, তবুও সুখের তুলনায় সে দুঃখ নিতান্তই নগণ্য। দাম্পত্য জীবনে যদি বেদনা—যাতনা থাকে, তবুও সুখের কুসুমে সে মরুভূমি চিরপ্রফুল্ল হইয়া থাকে। পত্নীর প্রেম জীবনে অনন্ত সুখের আকর। যে তাহা পায় না, তাহার বড় দুঃখ। যে তাহা পাইয়াও পায় না, তাহার আরও দুঃখ। সতীন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল। সে যে প্রেম হৃদয়ের সুখ ও জীবনের নির্ভররূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সে প্রেমে এত দুঃখ কেন? যে পত্নীকে সে হৃদয়-সর্ব্বস্ব করিয়াছিল, তাহার মনে এ দারুণ সন্দেহ কি জন্য?

কবিতার চর্চ্চায় ও কবিতার রচনায় সতীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ হৃদয় আরও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইত।

পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে প্রথমে তাহার হৃদয়ে বেদনাই প্রবল হইত—তাহাতে আশঙ্কা তত প্রবল ও প্রদীপ্ত হইত না। কিন্তু ক্রমে বেদনা ও আশঙ্কা সমান হইতে লাগিল। শেষে বুঝি আশঙ্কা বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া গেল—আশঙ্কা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই কি তাহার জীবনে অতি দারুণ, কল্পনারও অতীত দুর্ঘটনা ঘটিবে? সত্যই কি পত্নীর এ ভাব—এ বিশ্বাস দূর হইবে না; সত্যই কি শৈলবালার জীবনে বিতৃষ্ণা অপনীত হইয়া জীবনে আকর্ষণ জন্মিবে না?

সতীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সুস্থ শরীরে কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না বটে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল না সত্য, কিন্তু সর্ব্বদা শঙ্কিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া তাহার স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে সামান্য কারণে অতিরিক্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িতে লাগিল; সামান্য বেদনা একান্ত অসহনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ইহার বিষময় ফলের কথা শৈল বুঝিতে পারিত না। স্বামীর অকারণ ব্যস্ততায় সে যদি বা কৌতুক বোধ না করিত, বিচলিত হইত না। ভাবনায় ভাবনা বর্দ্ধিত হয়। এক বিষয় একভাবে ভাবিতে থাকিলে, শেষে তাহার ভাবান্তরের কথা আর কল্পনাতেও আসিতে চাহে না। আশঙ্কায় কল্পিত

দুঃখকে সত্য ভাবিতে ভাবিতে শেষে শৈলবালার নিকট তাহা একান্ত দুঃসহ বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। সে সত্য সত্যই ভাবিতে লাগিল, সে তাহার প্রাপ্য পায় নাই; সুতরাং তাহার জীবন কেবল দুর্ব্বহ যাতনামাত্র। এ জীবনের, এ যাতনার ভার বহিয়া লাভ কি? কেন সে জীবন রাখিবে?

৪

ক্রমাগত আপনার কল্পিত দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া শৈলবালার সে দুঃখ যে পরিমাণ দুঃসহ বোধ হইতেছিল, তাহার জীবনের প্রতি আকর্ষণও সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সহস্র দুঃখ দুর্দ্দশাতেও জীবনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে! সাময়িক উন্মত্ততার উত্তেজনাই আত্মনাশের কারণ। ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় শৈল আর সে আকর্ষণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

শৈল যদি একবার ভাল করিয়া স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিত, তবে তাহার কল্পিত দুঃখকে অসার বুঝিতে না পারিলেও, সহনীয় মনে করিত। জগতে কল্পিত সুখলাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে? যাহা পাই না, তাহার জন্য সব ত্যাগ না করিয়া, জীবনের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া, যাহা পাইয়াছি, তাহারই সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া, আপনাকে ও আপনার জনকে সুখী করিবার চেষ্টাতেই মনুষ্যত্ব। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে শৈল এ কথা বুঝিতে পারিত; আরও বুঝিত, জগতে অনেক রমণীর অপেক্ষা সে সুখী। নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র স্বামীর প্রেম সে পাইয়াছিল,—ভ্রান্তিবশতঃ শৈল তাহা লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলে সে আপনাকে দুঃখী না ভাবিয়া সুখী ভাবিত। সে কেন তাহা লক্ষ্য করে না, সতীন্দ্র তাহাই ভাবিত।

সময় সময় পত্নীর জীবনে বিতৃষ্ণা এমনই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিত যে, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অবলম্বিত উপায়ে সতীন্দ্র আপনি সঙ্কুচিত হইত; তাহার আত্মসম্মান আহত হইত; সম্ভবতঃ তাহাতে শৈলবালার বিরক্তি ও ঘৃণা বর্দ্ধিত হইত।

এক এক দিন সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। বিষয়গুণে গাম্ভীর্য্য আপনি আসিত—বিশেষ তাহার হৃদয়াবেগ প্রত্যেক কথায় ফুটিয়া উঠিত। সতীন্দ্রনাথ এরূপ উপদেশ দিলে শৈল কখন কখন স্থির হইয়া তাহার সকল কথা শুনিত; কিন্তু এক এক দিন উপেক্ষার হাসিও হাসিত। সে হাসিতে সতীন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তাহার

হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ জ্বালাই কি যথেষ্ট ছিল না? আবার কেন সে ইচ্ছা করিয়া এ উপহাসের ভাগী হইতেছে? সে আপনাকে ধিক্কার দিত—জগৎকে ধিক্কার দিত। সে কি করিবে, স্থির করিতে পারিত না। কিন্তু হৃদয়ের সে অবস্থায় যে কোন কার্য্য করা সম্ভব। এক এক দিন যেন পত্নীর জীবনে বিতৃষ্ণা—জীবনদীপনির্ব্বাপনের বাসনা স্বামীতেও সংক্রান্ত হইত।

এক এক দিন উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে কত কথা বলিবে, স্থির করিয়া রাখিত। কিন্তু সাক্ষাতে পত্নীর উপহাসদীপ্ত দৃষ্টি ও আবেগহীন কথার ফলে তাহার কথা আর ফুটিত না। মনের কথা মনেই রহিয়া যাইত—কেবল তাহাকেই যন্ত্রণা দিত। সে আপনার জ্বালায় আপনি জ্বলিত।

এমনই ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ইহার মধ্যে এক এক দিন আসন্ন বিপদের নিবিড় ছায়ায় সতীন্দ্রনাথের হৃদয় অন্ধকার হইয়াছে। যদি বা কখনও সে অন্ধকারে বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, অন্ধকারাবসানে উষালোকবিকাশের শেষ সম্ভাবনাও আর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই।

সতীন্দ্রনাথ কোনরূপে পত্নীর জীবন রাখিয়াছে—তাহাকে আত্মঘাতিনী হইতে দেয় নাই। কিন্তু সে তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফিরাইতে পারে নাই—কাজেই কোনও স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। কেন এমন হইয়াছিল, সতীন্দ্রনাথ তাহা ভাবিয়া পাইত না। প্রথমে সে আশা করিত, একদিন পত্নী স্বীয় প্রেম বুঝিতে পারিবে। কিন্তু হায়!—সে একদিন আর আসিল কৈ? সে একদিনের আগমনসম্ভাবনা ক্রমে সুদূরপরাহত হইয়া শেষে অসম্ভবেই পরিণত হইয়াছিল। তাহার জীবন আশার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। তাহার মত দুঃখ কাহার?

আশা যখন নিবিয়া যায়, তখন জীবনে কেবল দুঃখ—কেবল যাতনা। সতীন্দ্রনাথের জীবনে তাহাই হইয়াছিল। সে নির্দ্দোষ হইয়াও দোষী, সে প্রেম দিয়াই অপরাধী, সে ভালবাসিয়াই লাঞ্ছিত। তবুও ভালবাসা যায় না—প্রেম অমর। তাই সতীন্দ্রনাথের যাতনা।

৫

পুরুষের নানা জ্বালা। সংসারের ভাবনাই তাহার একমাত্র ভাবনা নহে—যাহারা তাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের চিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা নহে। কর্ত্তব্যের কঠোর শাসন অনেক সময় অপ্রীতিকর, দুঃসহ। কিন্তু

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা,—তাহাকে বড় দুঃখেও হাসিতে হয়, হৃদয়ভাব গোপন করিয়া সমাজে মিশিতে হয়, লোকের সঙ্গে সহজ সামাজিক ব্যবহার করিতে হয়, লক্ষ্য রাখিতে হয় ;—সে দুঃখ, সে কষ্ট কেবল তাহারই আপনার, অপরে তাহা জানিতেও না পারে। এই প্রকৃত মনোভাবগোপনের দারুণ কষ্ট পুরুষকে পদে পদে সহ্য করিতে হয়। হায়!—কত দুঃখের—কত কষ্টের অংশ পুরুষ পত্নীকে—পুত্রকেও দিতে পারে না; হয় ত তাহাতেও তাহার আত্মাভিমান আহত হয়,—হয় ত সে তাহাদের হৃদয়ে বেদনাসঞ্চারের আশঙ্কাতেই সমস্ত দুঃখ, সকল কষ্ট আপনি সহ্য করে,—কাহাকেও সে সকলের অংশ দেয় না। যখন শত দুঃখ কষ্টের দারুণ শরশয্যায় জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আইসে—যন্ত্রণার অন্ত থাকে না, তখনও পুরুষকে স্বজনগণের সহায়তা হইতে স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই পুরুষের জীবন।

সতীন্দ্রকে এই জীবন যাপন করিতে হইত। হৃদয়ে দুঃসহ দুঃখজ্বালা, কিন্তু সংসারের ও সমাজের সব কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিতে হইত। হাসির মিথ্যা আবরণে অশ্রু আবৃত্ত করিতে হইত। আবার সেই জন্যই শৈল বিশ্বাস করিত না যে, তাহার স্বামী সত্য সত্যই দুঃখিত—সত্য সত্যই চিন্তিত ;—সত্যই তাহার জন্য স্বামীর চিন্তার অবধি নাই। বরং সে মনে করিত, সতীন্দ্রনাথ তাহার নিকট প্রকৃত কথা কহে না ; যে প্রেম জানায়, তাহা সত্য নহে ;—যে দুঃখের কথা বলে, তাহার মূল নাই। সে পুরুষের শতজ্বালার কথা বুঝিত না ; তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারিত না ; প্রকৃত ও অপ্রকৃত চিনিতে পারিত না।

অবিরত দারুণ দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের স্নায়বিক বিকার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সামান্য চিন্তায় চিত্ত একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে ; সমস্ত দিবস মন চঞ্চল থাকে—কিছুতেই শান্ত হয় না। সামান্য কারণে আশঙ্কার আর অবধি থাকে না। অকারণেও আশঙ্কা জন্মে। বিশেষ শৈলবালার সামান্য চাঞ্চল্যে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে—তাহার সকল ব্যবহারেই যেন আশঙ্কার কারণ উপলব্ধি করে। দিবসে দুশ্চিন্তা—নিশায় দুঃস্বপ্ন। সে রাত্রিকালে উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া দেখে,—শৈল জাগিয়া, কি ঘুমাইয়া,—সে কি করিতেছে।

তাহার এইরূপ ব্যবহারে শৈল হাসিত। সতীন্দ্রনাথ মনে করিত, এই হাসির আবরণে শৈল তাহার মনোভাব—চাঞ্চল্য গোপন করিতেছে, তাহাকে

প্রতারিত করিতেছে। তখনই মনে পড়িত, পত্নীর সরস ওষ্ঠাধরে হাস্যে তাহার কি আনন্দ ছিল; সে ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটাইবার তাহার কত আগ্রহ ছিল! হৃদয় ব্যথিত হইত—নয়নে অশ্রু আসিত। হায়!—সব যায়, তবু প্রেম যায় না। আজও তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে সে আগ্রহ যায় নাই; কিন্তু তাহা ফুটিতে না ফুটিতে আশঙ্কার দারুণ তাপে ম্লান হইয়া যায়।

সহসা পত্নীর পদশব্দ শুনিলে সতীন্দ্র চমকিয়া উঠিত—অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার কাতর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

এমনই ভাবে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। দারুণ দুর্দ্দশা প্রশমিত হইল না, বরং বাড়িতে লাগিল। আর মনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক নিস্তেজতাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

৬

রজনীর প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়াছে। সতীন্দ্রনাথ শয়নকক্ষে বসিয়া আছে। এক জন আত্মীয় পূজার ছুটীতে পশ্চিম গিয়াছেন। তাঁহার দ্রব্যাদি গুছাইতে—ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে সমস্ত দিন গিয়াছে। শ্রান্তদেহে সে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়াছে। কিন্তু আসিয়া দেখিয়াছে, পত্নীর মুখ অন্ধকার। সে কারণানুসন্ধান করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। তাই আজ শ্রান্তিহেতু নয়ন নিদ্রাজড়িত হইয়া আসিলেও সে শয়ন করে নাই; জাগিয়া বসিয়া আছে—কি জানি কি ঘটে!

শৈল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। সতীন্দ্র বলিল, "দীনেশ দাদাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি। এত জিনিস লইয়া লোক বেড়াইতে যায়!"

শৈল কোনও কথা কহিল না।

সতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি তোমার শরীর ভাল নাই?"

শৈল বলিল, "কেন?"

"মনে করিতেছি, কল্য তোমাকে শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে লইয়া যাইব। যাইবে ত?"

"তোমার যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে—যাইও। আমি ত কোন দিন তোমাকে কোন কার্য্য হইতে নিবারিত করি নাই। আমাকে লইয়া যাওয়া কেন?" স্বরে কেমন একটু তীব্রতা ছিল।

সতীন্দ্র যেন আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "শৈল, অনেকবার

তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—আজও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি,তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর কেন ?"

"আমি কি মন্দ ব্যবহার করিয়াছি ?"

"সকল স্ত্রীই কি স্বামীর সঙ্গে এমনই ব্যবহার করে ?"

"আমি ত অনেক দিনই বুঝাইতে চাহিয়াছি—তুমিই বুঝাইতে দাও নাই। আজই জানিতে পারিবে।"—বলিয়া শৈল শয্যা ত্যাগ করিল, দ্বার মুক্ত করিয়া কক্ষের দক্ষিণের খোলা ছাতে গেল।

ছাতে যাইয়া শৈল আকাশের দিকে চাহিল—গ্রহতারাপূর্ণ নীলাম্বরে অসম্পূর্ণগোলক চন্দ্র জ্যোৎস্না ছড়াইতেছে। শৈল কি ভাবিল। সে কি অন্য দিনেরই মত আশা করিতেছিল,সতীন্দ্র এখনই আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে ? সে কি রমণীসুলভ কৌতূহলবশে আজ সতীন্দ্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল ?

বিদ্যুতের স্পর্শে শরীরের শিরা উপশিরায় যেমন সহসা বিষম আঘাত লাগে, তেমনই দারুণ আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের দুর্ব্বল স্নায়ুতে বিষম আঘাত লাগিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। উন্মাদের মত সেও কক্ষের বাহিরে আসিল।

শৈল স্বামীর দিকে চাহিল—জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, স্বামীর নয়নে অন্য দিনের মত আশঙ্কা ও অনুনয়ে বিগলিত দৃষ্টি নাই—নয়নদ্বয় যেন জ্বলিতেছে। সে দৃষ্টি দেখিয়া আজ তাহারই হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হইল।

সতীন্দ্রনাথ দ্রুত অপ্রশস্ত ছাত পার হইল ; মুহূর্ত্তে ছাতের আলিসাও অতিক্রম করিল।

ভয়ে শৈলবালার চরণদ্বয় কম্পিত হইতেছিল। সে দ্রুত যাইয়া স্বামীকে নিবারিত করিবার চেষ্টা করিল। পারিল না।

সে আলিসায় বুক দিয়া নিম্নে রাজপথে চাহিয়া দেখিল—সতীন্দ্রনাথের কপাল মস্তকচ্যুত—মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ—স্বামীর গতপ্রাণ দেহের কি বিকৃতি! কেবল নয়ন তেমনই জ্বলিতেছে।

শৈলের শরীরে রক্ত যেন শীতল হইয়া গেল—সমস্ত শরীর অবসন্ন—চারি দিক তাহার স্বামিরহিত জীবনেরই মত শূন্য—অন্ধকার। সে সেই শূন্য ছাতে বসিয়া পড়িল—মরিতে পারিল না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

———

ভুবনেশ্বর।

পাষাণ করেছে মোরে পাষাণের মত—
গতিহীন, স্তব্ধ মূক, স্পন্দনবিহীন!
কোথা লাগে হায়, মণি মুক্তা মরকত—
পাষাণের এত রূপ সৌন্দর্য্য বিভব!
বিন্দুসরসীর তীরে, একাম্রকাননে,
স্তরে স্তরে বিস্তারিয়া শিল্প মায়াজাল—
দাঁড়ায়ে দেউল ওই বিরাট বিশাল!
এ কি এ দেউল,—না, পাষাণের ফুল—
পার্ব্বতীর তনু ঘেরা লাবণ্য দুকূল!
ত্রিভুবনেশ্বর রাজে অন্তরের মাঝে!
ধ্বনিয়া প্রান্তর আরতির ঘণ্টা বাজে—
বায়ু সনে ভেসে যায় বন হ'তে বনে।
ধন্য তুমি দেবভূমি উড়িষ্যা প্রাচীন!
ধন্য হে কেশরি-কুল নৃপতি বল্লভ!

কাঠজুড়ি।

অয়ি নদী, শুনি, ক্ষীণ কটিকাঞ্চীসমা
ছিলে তুমি হাস্যময়ী মুগ্ধ মনোরমা!
তটতরুছায়াযুক্ত অযুত মাধুরী
তব ওই বক্ষপরি দু'টি কাঠ জুড়ি'
পার হ'য়ে যেত চলে' ওড্র নরনারী।
এবে তুমি স্ফীততনু যৌবন উঘারি'
ঝলকি' ছলকি' চলে' যাও গরবিনী—
ভূতলে উজলে যেন স্থিরা সৌদামিনী!
এত রূপ মরি, মরি!—রূপের বন্যায়
ভেসে যায় দুই কূল,—কেঁদে হায়, হায়!
স্বর্ণশস্য ঝরে' পড়ে চরণতলায়!
তুমি চলিয়াছ শুধু আপনার মনে—
ভাবে ভোর, আত্মহারা, ছাড়ি' সর্ব্বজনে
ফিরিতেছ অভিসারে রাজার নন্দিনী!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

১৩ই ভাদ্র। অনেক দিন এই ডায়েরিতে পঙ্কুরামের কথা লিখি নাই। কাজটা অন্যায় হইয়াছে। তবে, এতদিন আমি তাহার শিশু-হৃদয়ের নিয়ত-বিকাশোন্মুখ শোভার পর্য্যবেক্ষণ করি নাই, এমন নহে। * * * আজ কাল সে আমার সহিত কেমন পরিচিত হইয়াছে। আমাকে দেখিলে, আর কাহারও কোলে থাকিবে না। আমি তাহার হাসি দেখিয়া, তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত দুই একটি কথা শুনিয়া কত আনন্দপ্রকাশ করি, ইহা সে যেন বুঝিতে পারিয়াছে। তাই, পাখীর মত, সে যে দুই চারিটি অর্থপূর্ণ কথা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল তাহাই বলিয়া উঠে। আমাকে আনন্দিত করিবার জন্যই যেন তাহার সেই সকল শৈশবলীলার অভিনয় করে। হায়! যে অসহায় শিশুটি আমার আশ্রয়কে নিরাপদ ভাবিয়া, তাহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে, আমি ত সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেছি না। তাহাকে ভুলাইয়া, ফাঁকি দিয়া, কত কৌশলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছি। সে বোধ হয় মনে মনে তাহার আলোচনা করিয়া কত ক্লেশানুভব করে। পৃথিবীর ভাষা এখনও তাহাকে আপনার অধীন করিতে পারে নাই; কেবল সেই কারণেই তাহার অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ করে না।

১৪ই ভাদ্র। স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিতেছেন। সম্প্রতি খরচটা এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এই সামান্য সীমাবদ্ধ বেতনের উপরে নির্ভর করিয়া কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছি না। * * * শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় বোধ হয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই কয়েকটি টাকা ধার চাহিয়াছেন। তাঁহাকে কোনও প্রকারে দিতে না পারিলে বড় অন্যায় হইবে। আমার ন্যায় সামান্য জনের সাহায্যের উপর যাঁহারা এরূপে নির্ভর করেন, যদি সেই দুই এক জনের সামান্য অসুবিধাও ঘুচাইতে না পারিলাম, তবে বৃথায় এ জীবন। হায় ভগবান! মূর্খতা ও অধর্ম্মের অবতার কত অপদার্থ লোক অর্থের স্তূপ সাজাইয়া, তাহারই উপর বসিয়া রহিয়াছে, আর আমার বন্ধুর ন্যায় সজ্জন সামান্য উদরান্নের জন্যও বিব্রত।

১৫ই ভাদ্র। কেহ কেহ মনে করেন, এবং প্রকাশ্যে বলিতেও ছাড়েন না যে, কোমলতা ও লালিত্যবিহীন কবিতা কবিতাই নহে। তাঁহাদের বিশ্বাস এই, যাহা কিছু তেজোময়, ওজস্বী, উদ্দীপনা-পরিপূর্ণ, তাহা গদ্যের অন্তর্ভূত; আর যাহা কবিতা, তাহা

"শুধু ভালবাসা, সুধু সুমধুর ছন্দে,
শতরূপ ভঙ্গিমায়, পলকে পলকে
লুটায়ে, জড়ায়ে, বেঁকে, বেঁধে, হেসে, কেঁদে,
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা!"

কবিতার এই সংকীর্ণ সংজ্ঞানির্দ্দেশ বড় রহস্যময়, সন্দেহ নাই। আমি প্রেম ভালবাসার বিরোধী নহি; লাবণ্য-লালিত্যের সহিত আমার কোনও শত্রুতা নাই। কিন্তু যে প্রেমের ব্যাখ্যা উপরি-উদ্ধৃত চারি ছত্রের ভিতর নিবদ্ধ রহিয়াছে, আমি তাহাকে প্রকৃত প্রেম বলিয়া স্বীকার করি না। আমার মতে, প্রকৃত প্রেম

"—সরল উন্নত
বীর্য্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্ব্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মত
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত।"

তাই যাঁহারা কোমলতার সহিত "কমল বিলাসিতা"কে এক করিয়া ফেলেন, আমি তাঁহাদের বুদ্ধি ও সমালোচনশক্তির আদৌ প্রশংসা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, যাহা প্রকৃত, অকৃত্রিম কোমলতা, তাহাও সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্য এই আত্যন্তিক কোমলতার জ্বালায় মাটী হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গলার প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ এত দিনে এই কথা বুঝিয়া প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৬ই ভাদ্র। "সমুদ্রের প্রতি" সম্বোধনে কবি বলিতেছেন,—

"যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ-মাঝে"—

আত্মা অবিনশ্বর; চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং চিরদিন থাকিবে, এ বিশ্বাস অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক নহে। পৃথিবী যে এক কালে জলময়ী ছিল, ইহাও বিজ্ঞানের একটা মত বটে। কিন্তু, অবিনশ্বর আত্মা যে বিলীনভাবে জলময়ী

পৃথিবীরই ভিতর নিবদ্ধ ছিল, এ কথা নিতান্ত জড়বাদী ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। দেহবন্ধনবিমুক্ত আত্মার গতি স্বাধীন, সর্ব্বত্র তাহার অস্তিত্ব কল্পিত হইতে পারে, তাহার সীমাবদ্ধ অবস্থান আমরা অনুভবই করিতে পারি না। রবীন্দ্র বাবু যে জড়বাদী নহেন, তাহা তাঁহার যে কোনও কবিতা পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারা যায়। তবে, এ স্থলে তিনি এরূপ বিষম ভ্রমে কেন পড়িলেন, সহজে বুঝা যায় না। যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, কোনও সময়ে এই বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্র সলিল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহা হইলে সেই সলিলের অভ্যন্তরে আত্মার অবস্থান অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু, কবি অতঃপর আবার সন্ধ্যা, ঊষা, নক্ষত্র প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি যখন সকলই জলময় আকাশে বিলীন ছিল, তখন সন্ধ্যা বা ঊষা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? একমাত্র জড়বাদ ভিন্ন উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের অন্য অর্থ অসম্ভব। কবি ভ্রমবশতঃই উহার প্রশ্রয় দিয়াছেন।

১৭ই ভাদ্র। বিধাতা এই জীবনের উপর কি অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। পরিণাম ভাবিতে গেলে প্রাণে ত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শিশুটির জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া রহিয়াছি, তথাপি অদৃষ্টের সেই অশুভ দৃষ্টি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। মানব কীটের দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সে যেন মাথার উপর দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে বিকট হাসি হাসিতেছে; আর সেই ভীষণ পরিণামের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। দেখিতেছি, দিন দিন যেন সেই পরিণামের ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে; বুঝি ক্রমশঃ তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছি। কিন্তু, তথাপি আমি জীবনে নিরাশ্বাস হই নাই; হৃদয়ের সাহস প্রাণপণে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। ভাবিতেছি, জ্বালা-যন্ত্রণা যা কিছু, কেবল মৃত্যু পর্য্যন্ত। মরিলেই সব ফুরাইল। বিশ্বাস আছে, সেই শেষ মুহূর্ত্তে জগজ্জননী আমাকে কদাপি ভুলিতে পারিবেন না। আমি মহাপাপী বটে; জীবনের এই স্বল্পমাত্র সময়ে বহু ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়াছি। কিন্তু যিনি অনন্ত করুণাময়, তাঁহার করুণার অতীত অপরাধে দুর্ব্বল মানুষ কখনই ত অপরাধী হইতে পারে না। তিনি জন্ম দিয়াছেন, তাই সাহসের সহিত জীবন রক্ষা করিতেছি; তিনি দুঃখ দিতেছেন, তাই নীরবে সহ্য করিতেছি;—রোদন যে না করি, এমন নহে। আর যদিই তিনি এই অধম সন্তানকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও দুঃখ নাই। নিশ্চয়

তাহাতেই আমার মঙ্গল। আমি তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল ভাবিতে একেবারে অসমর্থ।

১৮ই ভাদ্র। ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্যে এক জন লেখক প্রাচীন ও অধুনিক কাব্যসমূহের তুলনা করিয়া শোষোক্তের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বা কাশীদাসের মহাভারত, ইহারাই বাঙ্গালার স্থায়ী মহাকাব্য; কিন্তু বৃত্রসংহার বা মেঘনাদ-বধ সহস্র সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের তুলনায় মাইকেল বা হেমচন্দ্র যে এখনও এক প্রকার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু, চিরদিনই কি এই অবস্থা থাকিবে? বাঙ্গালী সাধারণ কি দিন দিন উচ্চশিক্ষায় উন্নত হইতেছেন না? তাঁহারা কি কোনও কালে এই সব আধুনিক কাব্যের উচ্চভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিবেন না? ইতিমধ্যেই ত মাইকেলের যথেষ্ট প্রতিপত্তি লক্ষিত হইয়াছে; ইহা কি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে না? মাইকেল যে কখনও কৃত্তিবাস বা কাশীদাসকে অতিক্রম করিতে পারিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কারণ, ইহাঁদের যে সুবিধা, মাইকেলের তাহা নাই। ভাষা ও ভাবের যে সারল্য থাকিলে, বিষয়ের যেরূপ সর্ব্বজনমনোহারিত্ব থাকিলে, কাব্য সাধারণের নিকট পঁহুছিতে পারে, তাহা আধুনিক কাব্যে নাই। কিন্তু সমাজের আদর্শ ও চূড়াস্বরূপ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যদি কখনও একান্ত অভাব না হয়, তবে মাইকেল যে মরিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

* * * * *

২০শে ভাদ্র। এতদিনের পর "বর্ষার বোধন" শেষ করিতে পারিয়াছি। কবিতাটি আমার নিজের তত সুন্দর বলিয়া মনে লাগিতেছে না। তবে, প্রকাশের অনুপযোগী, বোধ হয়, হয় নাই। * * *

২১শে ভাদ্র। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার Peele Castle সম্পর্কীয় কবিতার শেষে বলিয়াছেন:—

> "But welcome furtitude, and patient cheer,
> And frequent sights of what is to be borne!
> Such sights, or worse, as are before me here,
> Not without hope we suffer and mourn"

আজ এই অপরাহ্ণে নিতান্ত বিষণ্ণ অন্তরে সেই আশা, সাহস ও সহিষ্ণুতার কথাই

ভাবিতেছি। হায়! কবিবর! আমি চিরদিন তোমার এই অবিচল সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়া আসিতেছি; এই জগৎ-সংসার সম্বন্ধে তোমার যে আদর্শ ছিল, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছি; কিন্তু কি করিলে, কোন সাধনায় জীবন ঢালিয়া দিলে, তোমার ন্যায় গভীর ধীরতা লাভ করিতে পারা যায়? আজ এই সান্ধ্য অন্ধকারের সহিত আমার হৃদয়ে যে গাঢ় তমসরাশি ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা ত কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। আমি আপনাকে সংসার-সংগ্রামে এক জন অগাধবলশালী বীরপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই; কিন্তু মনে হয়, যদি একবার স্বভাবকোমলা স্ত্রীজাতির মত উচ্চকণ্ঠে করুণরবে রোদন করিতে পারিতাম, তবে বুঝি এই সন্তপ্ত হৃদয় কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারিত। তোমার মত মহাজনের নিকট আমি আজ সহিষ্ণুতা-শিক্ষার্থ আসিয়াছি; তোমার সাহস-পরিপূর্ণ কবিতাগুলির আলোচনা করিতেছি; আজ যদি তুমি একবার তোমার সেই সদা-প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখের হাসি লইয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইতে, তবেই বুঝি সেই বীরধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিতাম।

২২শে ভাদ্র। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, গাম্ভীর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলে নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" মহাকাব্য মাইকেলের "মেঘনাদকে" অতিক্রম করিয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। হীরেন্দ্রনাথের সমালোচন-ক্ষমতার উপর যথেষ্ট আস্থা সত্ত্বেও আমি তাঁহার এই মতে সায় দিতে পারিলাম না। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থে দুই একটি সুন্দর চরিত্র ও কয়েকটি উদ্দীপনাপরিপূর্ণ, ওজস্বিনী বক্তৃতা ভিন্ন তাঁহার কাব্যের বিষয়গত মহত্ত্ব ও একতা পাঠকের মনে তাদৃশ প্রতিভাত হয় না। তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন। কিন্তু, সেই ধর্ম্মরাজ্যটা কি প্রকার, তাহা আমরা আদৌ অনুধাবন করিতে পারি না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে একটা ধর্ম্মযুদ্ধ বলিতেও আমি প্রস্তুত নহি। শুধু এক পাণ্ডবদিগের প্রতি কতকটা অবিচার ভিন্ন দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসনে আমি তাদৃশ কোনও দোষ দেখিতে পাই না। রাজ্য কাহারও স্থায়ী সম্পত্তি নহে; যিনি সুশাসন করেন, রাজ্য তাঁহারই। সুতরাং, পাণ্ডবেরা নিজের ন্যায্য-স্বত্ব-রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ কথা বলা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে কেবল কতকগুলা নরহত্যা করা হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনার্থ যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা অধর্ম্মের অন্তর্গত। আর ভারতবর্ষ

বাস্তবিক কখনও একছত্রাধীনে হইয়াছিল কি না, তাহাও ভাবিবার কথা। যদিই বা হইয়া থাকে, তাহা যে বহুদিনস্থায়ী হয় নাই, ইহা নিশ্চয়। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরাবতার, একটা অস্থায়ি-কার্য্য-সম্পাদনার্থ তিনি যে তাদৃশ নিষ্ঠুরতায় পরিচয় দিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

২৩শে ভাদ্র। আজ আমি মৃত্যুর সর্ব্বজনভয়াবহ ভীষণ মূর্ত্তির কথা ভাবিতেছি। এই স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতকিরণরাশি, সন্ধ্যাকাশের এই প্রশান্ত রক্তিমাভা, পত্রপুষ্পগ্রহতারাসমন্বিত বিশ্বের এই বিচিত্র আনন্দলীলা, মৃত্যুর করাল গহ্বরে—সেই অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করিলে, এই সকলই ত অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দয়া মায়া মমতা কিছুই নাই; সে সৌন্দর্য্যের মহত্ত্ব বুঝে না, সৌকুমার্য্যের সেবা করিতে জানে না; অসহায়, নিরাশ্রয় শিশুর স্বভাব-সরল মুখমণ্ডল দেখিয়া, তাহার প্রাণ পবিত্র স্নেহরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না। তাহার কাছে দুর্ব্বল সরল, পবিত্র অপবিত্র, সুন্দর অসুন্দর, প্রীতি অপ্রীতি, সকলেরই সমান গতি। হে মৃত্যু! তাই আজ নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয়ে তোমায় সুধাইতেছি, সংসারের চিরসুকুমার, অনন্তসৌন্দর্য্যাধার পদার্থগুলি লইয়া গিয়া তুমি কোথায় রাখিয়া দাও? আমার এই হৃদয়-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া তুমি কত রত্নই অপহরণ করিয়া লইয়াছ। আমার সেই আজন্মস্নেহময়ী জননী, দ্বিতীয়জীবনসদৃশ সহোদর, নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত সেই সব প্রিয়জন, তাঁহাদিগকে তুমি কোথায় রাখিয়া দিয়াছ? আমার প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা সেই প্রণয়িনী, আমার প্রেম, প্রাণ, জগৎ—সকলের অধিক সেই অতি সুকোমল প্রশান্ত শিশুটিকে, তুমি কোন শিরীষপুষ্পপেলব শুভ্র শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছ? পাছে সে কোনও প্রকার ক্লেশানুভব করে, এই ভয়ে আমি তাহাকে এই বুকের উপর রাখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না। তুমি তাহাকেও কাড়িয়া লইলে; আমি পাষাণহৃদয়ে তাহাও সহ্য করিয়াছি। হে অসীমপ্রভাবশালী, সর্ব্বদমন মরণ-দেব! আমি তোমার চরণে আমার এই প্রাণ পর্য্যন্ত "মানসিক" করিতেছি, সে যেন আমার এই অপার স্নেহের অভাব কখনও অনুভব করিতে না পায়। অন্ততঃ তাহার চক্ষে যেন তোমার প্রশান্ত স্নেহময় সৌম্যমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়। নহিলে সে ভয় পাইয়া হয় ত আবার আমারই জন্য কাঁদিয়া উঠিবে।

২৪শে ভাদ্র। পঞ্চুরামকে দেখিলাম। সপ্তাহব্যাপী জ্বরের আজও বিরাম হয় নাই। তাহার প্রফুল্লতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। শুনিলাম

গতকল্য দিনরাত্রি কেবল কাঁদিয়াছে। মুহূর্ত্তেরও জন্য শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহার শরীরের অভ্যন্তরে কি যন্ত্রণা হইতেছে, স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর ত কেহই জানিতে পারিবে না। আমরা কেবল অন্ধকারে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে পারি। * * * *

২৫শে ভাদ্র। শিশুটি আমাকে ছাড়িতে চাহে না। তাহার ঝোঁক হইল, রাস্তার ধারে বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া আমার হাতে "নে, নে" বলিয়া তুলিয়া দিবে। তাহাকে সন্তুষ্ট ও শান্ত করিবার জন্য কিছুক্ষণ তাহাই করিতে দিলাম। * * * *

২৬শে ভাদ্র। চিকিৎসক এত চেষ্টা করিয়াও রোগনিবারণ করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তিনি এখন নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই—বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবে আমি ততটা আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। এবার নূতন ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। সু—কে চিঠি লিখিয়া দিলাম। তিনি যেন শীঘ্র ঔষধগুলি আনাইয়া দেন,এই কথা লিখিলাম। পত্র লিখিতে লিখিতে রোদন সংবরণ করিতে পারি নাই। হায়! আমি কি মহাপাপী; আমার ভাগ্যে কি ক্ষুদ্র বালকটিও সহ্য হইবে না? নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া আজ হৃদয় মনকে আক্রমণ করিতেছে। কি করিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। পিতৃদেব মহাশয় পঞ্চুর অসুখের কথা শুনিয়াছেন। তিনি অদ্যকার পত্রে আমাকে চিন্তা করিতে বারণ করিয়াছেন। তিনি অনেক সহ্য করিয়াছেন; তাঁহার বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু, আমি যে আপনাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। সংসারে এত লোক নিজ নিজ শিশু লইয়া সুখী হইতেছে; আমার এই একমাত্র অবলম্বন আমাকে কেন ছাড়িয়া যাইবে?

২৭শে ভাদ্র। শিশুটি কেমন আছে, কি করিতেছে, সেই কথাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবিতেছি। আমাকে পাইলে সে আর কাহাকেও চাহে না। আজ আমি তাহার কাছে নাই, আজ কে তাহার শৈশব-হৃদয়কে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে বুকে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছে? আমার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া সে হয় ত আমার উপর মনে মনে কত বিরক্ত হইতেছে। হায়! আমার এই দাসত্বে ধিক্! আমার এই বিষম অর্থোপার্জ্জন-লালসাকে ধিক্! আমি কেন তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম? কি নিদারুণ কর্ত্তব্যের বেড়া আমার চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি

কাহাদের জন্য তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতেছি? সে বোধ হয় আর বেশী দিন আমাদের এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর স্নেহের প্রত্যাশা করিবে না। বিশ্বজননী বুঝি স্বয়ং তাহার ভার লইবার মানস করিয়াছেন। তাই মনে করিতেছি, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কয় দিবস কেবল তাহারই পরিচর্য্যায় এ জীবন নিয়োজিত করিব। কিন্তু আমি কি নিষ্ঠুর, পাষাণপ্রকৃতি! আমি কেন তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি। আমি কেন সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের চরণে তাহার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন,—"More things are brought by prayer than this world dreams of" আমি কেন এই চিরসত্য অমর বাক্যের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছি না? হায়! আমার সেই অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায়? আমি যে নিতান্ত নরাধম।

২৮শে ভাদ্র। কলিকাতায় গিয়া পঙ্কুকে দেখিলাম। শুনিলাম, গত রাত্রে বড় বেশী জ্বর হইয়াছিল। আজ দিনের বেলা একটু ভাল আছে। * * আজ কাল আমার সমুদয় অনুভবশক্তি যেন বহিরিন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তাহাকে সামান্য একটুকু প্রফুল্ল দেখিলে অমনিই যেন সব বিস্মৃত হইয়া যাই; তাহার বিপদের কথা যেন মনেই থাকে না। আবার কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ দেখিলে হৃদয়টা কেবল শোকে ও বিষাদেই অভিভূত হইয়া পড়ে। ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির সাক্ষাৎই পাওয়া যায় না। শুনিলাম, আজ দুপুর বেলা শিশুটি কেবল আমাকে ডাকিয়া কাঁদিয়াছে। কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারে নাই। আমি তাহাকে লইয়া, কিছুকাল রাস্তায় এ দিক ও দিক করিয়া বেড়াইলাম। তাহার মনটা যেন বেশ প্রফুল্ল হইয়া আসিল। মুখে হাসি দেখা দিল। কিন্তু, আগেকার লীলা খেলা এখন অধিকাংশই ভুলিয়া গিয়াছে। সেইরূপ কোলের উপর শুইয়া,প্রাণবিমোহন মধুর রবে সেই "তাই, তাই" আর শুনিতে পাই না।

• •

ভারতচন্দ্রের যুগ।

দেশের ও সমাজের অবস্থা।

নদীর আরম্ভ সন্ধান করিলে লক্ষিত হয়, পর্ব্বতাঙ্গে নানা স্থানে উদ্ভূত বহু শীর্ণ জলধারা, কোথাও বা শিলাখণ্ডমধ্যে অদৃশ্য হইয়া, কোথাও বা শিলাখণ্ডপার্শ্ববাহিনী হইয়া, দুর্ব্বল শক্তিতে কোনরূপে উপল-বিষম পথ অতিক্রম করিয়া, এক স্থানে মিলিত হয়। একত্রিত জলরাশি ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করে, এবং অবশেষে কোথাও বা পথরোধকারী শিলাখণ্ড ভাসাইয়া, কোথাও বা শিলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, মৃত্তিকা খনন করিয়া স্বীয় পথ প্রস্তুত করে, এবং সেই পথে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়। তখন তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। কেহ প্রবাহমুখে কোনও বাধা সংস্থাপিত করিলে প্রবাহ অল্পকাল স্থির হইয়া দাঁড়ায় সত্য, কিন্তু অচিরে সঞ্চিতশক্তিতে প্রবাহিত হয়; তখন সে বেগ বড় ভয়ানক, তাহার সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই ভাসিয়া যায়,—সে প্রবাহতাণ্ডবতাড়নে প্রলয়প্লাবনেরই মত বহিয়া যায়।

সেইরূপ রাজপ্রাসাদে ও রাজসভায়, রাজকীর্ত্তিতে ও রাজকল্পনায়, বিলাস-বাহুল্য ও সম্পদসৌন্দর্য্যসন্দর্শনপ্রয়াস নানা স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া একত্রিত হয়; তখন তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব। সর্ব্বপ্রকারে শক্তির পরিচয়ে জনগণের চিত্তে ভীতি ও ভক্তির উৎপাদনই বিলাসবাহুল্যের ও সম্পদসৌন্দর্য্যসন্দর্শনপ্রয়াসের প্রধান কারণ। বহুব্যয়সাধ্য শিল্পদ্রব্য ইহার এক প্রমাণ। তাহাতে ধনবল ও জনবল প্রকাশ পায়। মিশরের ক্ষোদিত সমাধি-সমূহে, আসীরিয়ার শিল্পাবশেষে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচ্যে নানা দেশে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার মণিমুক্তাখচিত বেশ, সমুচ্চ সৌধ, সুসজ্জিত অশ্বগজাদি বাহন, বহুমূল্যবেশধারী ভৃত্যবর্গ—এ সকলই বলের বিকাশ। য়ুরোপে পূর্ব্বরাজগণের যুদ্ধসজ্জাতে পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। স্বর্ণাদিখচিত বর্ম্ম, কারুকার্য্যবহুল তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র, এ সকলই ধনবলের পরিচায়ক। ক্রমে ব্যয়বাহুল্যই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের

পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল।* ভারতবর্ষে ফতেপুর সিক্রী, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর বহুদিনে বহুব্যয়ে সৌধমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, † যে দেশের শাসন-প্রণালীতে একের অবাধ প্রাধান্য যথেচ্ছাচারিতার সীমাতেও অনায়াসে উপনীত হইতে পারে, সেই দেশেই "বর্ব্বর-শিল্প" রাজায় ও প্রজায় পার্থক্য প্রকাশ করে। কিন্তু যে দেশে রাজার ক্ষমতা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সে দেশেও রাজপ্রাসাদে ও রাজকীর্ত্তিতে এই বাহুল্য ও সম্পদপ্রদর্শনপ্রয়াস লক্ষিত হয়। এমন কি, সাধারণতন্ত্রশাসিত দেশেও সৌধে ও সজ্জায় প্রজার প্রতিনিধিতে ও প্রজায় পার্থক্য প্রকাশ পায়। ইহার কারণ মানবের শিক্ষা ও সভ্যতাদত্ত কৃত্রিম আবরণতলে তাহার শিশুপ্রকৃতি লুক্কায়িত থাকে, এবং সুবিধা পাইলে আত্ম-প্রকাশ করে। প্লেটো সাধারণ জনগণকে বহুশির পশু বলিয়াছেন। সাধারণ মানবকে চালিত করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়—ভাব ও আবেগ। সেই জন্যই জনগণের ভয় ও ভীতির উৎপাদনকল্পে বাহুল্য ও সম্পদপ্রদর্শনপ্রয়াস। রাজগণ-সেবিত ধর্ম্মেও বিলাস ও বাহুল্য প্রবেশ করে, এবং প্রবল হইয়া উঠে। ক্যাথলিক য়ুরোপের রাজগণসেবিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের সৌধ, সম্পদ ও শিল্পাগার বহু নৃপতির ঈর্ষ্যার বিষয়। উড়িষ্যার কেশরী রাজবংশের ৬৩ জন নৃপতি দেশে কেবল বহুব্যয়সাধ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তাঁহারা মন্দিরে দেবসেবার জন্য যথেষ্ট ভূমিদান করেন; দেশে বহু পুরোহিতের বাসের ব্যবস্থা করেন। ‡ মোগল সম্রাটদিগের মস্‌জেদে যে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, সে কি কেবল ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণার জন্য? তাহার মধ্যে ধর্ম্ম-মহিমাঘোষণার প্রয়াস কতটুকু, আপনার ধনবল ও জনবল ব্যক্ত করিবার চেষ্টা কত অধিক? ধর্ম্মবিশ্বাসের কিরণপাতে সে সকল ধর্ম্মমন্দিরের কয়খানি প্রস্তর সমুজ্জ্বল? ধনবল ও জনবলের ব্যঞ্জক বিচিত্র শিল্পকৌশলে সে সকল ধর্ম্ম-মন্দিরের কত চূড়া ও স্তম্ভ রমণীয়? হিন্দুরাজপ্রধান দক্ষিণ ভারতবর্ষে হিন্দু-মন্দিরে বিলাস ব্যভিচার ব্যাবৃত্তির দমনের জন্য আজও বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার নিকট করুণ আবেদন উপস্থিত হয়।

---

* মানরীক বলেন, তাজমহলের স্থপতি, সৌধনির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয়ের উল্লেখ করিলে, সামান্য ব্যয় হইবে বলিয়া, সম্রাট শাহজাহান তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—লেখক।

† Facts and Comments.

‡ Hunter—Orissa.

আবার প্রজার আনন্দসম্ভোগবাসনার তুলনায় রাজপ্রাসাদের বিলাস ও বাহুল্য সাগরের নিকট সরিৎমাত্র। যে রাজা বা শাসনকর্ত্তা সে সাগরের উর্ম্মিলীলারোধের চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই ভ্রান্তবুদ্ধিবশে বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছেন; বারিরাশি দ্বিগুণবেগে তটভূমিতে প্রবাহিত হইয়াছে। সে বারিবেগে ধর্ম্ম ও নীতি, শীলতা ও লজ্জা ভাসিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে পূতাচারযুগে একবার এই চেষ্টা হইয়াছিল। ঘাতুকের খড়্গমুখে রাজা প্রথম চার্লসের মস্তক দেহচ্যুত হইলে ক্রমওয়েল কৃপাণকরে কলিযুগ উচ্ছিন্ন করিয়া সত্যযুগের সংস্থাপনকল্পনায় "ধর্ম্মরাজ্য" প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবেক-ভীতি রাজবিধিতে পরিণত হইল; ব্যক্তিগত কঠোরাচার অত্যাচারের সীমায় আসিল; আনন্দ সুখসম্ভোগ শত্রুর মত ত্যজ্য বলিয়া প্রচারিত হইল। জুয়ার আড্ডা ও রঙ্গালয় বন্ধ হইল; অধিনেতাদিগকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করা হইল। শপথের জন্য অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। সাধারণ জনগণ ভল্লুকের ক্রীড়া দেখিত,—সে সকল ভল্লুক হত হইল। প্রলেপ দিয়া নগ্ন ভাস্করকীর্ত্তি 'শোভন' করা হইল। আনন্দোৎসব বন্ধ হইল; বালকদিগের পক্ষেও নৃত্যগীতাদি দণ্ডার্হ স্থির হইল। ধর্ম্মমন্দিরে চিত্রাদি নষ্ট করা হইল। কেবল ধর্ম্মগীতসংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মকথাশ্রবণই উৎসাহিত হইতে লাগিল। যেন ঘনান্ধকার মেঘে মানবজীবনের আলোক নির্ব্বাপিত, সুখ অপসৃত, সৌন্দর্য্য অদৃশ্য হইয়া গেল। * ক্রমওয়েল জনগণের আনন্দ-উপভোগের সকল পথ রুদ্ধ করিলেন; উদ্দেশ্য,—পাপ পলায়ন করিবে, পৃথিবী পুণ্যভূমিতে পরিণত হইবে! ভ্রান্ত মানবের ব্যর্থ চেষ্টা! ক্রমওয়েলের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত না হইতেই জনগণ জয়োল্লাসে নিহত প্রথম চার্লসের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইল। আনন্দসুখসম্ভোগের রুদ্ধ স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। সে বেগে সাধারণ লজ্জার আবরণও ভাসিয়া গেল। রাজসভায় বিলাসিনীদিগের বিভ্রম, রাজকার্য্যে রাজানুগৃহীতা ব্যভিচারিণীদিগের প্রভাব। বেশে লজ্জা নাই, বাক্যে সংযম নাই, ব্যবহারে সুরুচি নাই—রাজসভার এই অবস্থা।† সমাজের অতি নিম্নস্তরের লজ্জাহীনা বিলাসিনীরাও সৌন্দর্য্যবলে রাজানুগ্রহ লাভ করিতে লাগিল। রাজারও লজ্জা নাই—ব্যভিচারিণীদিগের গর্ভসম্ভূত তাঁহার পুত্রগণ অনায়াসে আভিজাত্যে উন্নীত হইতে লাগিল; রাণীর বন্ধ্যাত্বে

---

* Taine—History of English Literature.

† Court Beauties of Charles II. দ্রষ্টব্য।

বিদ্রূপেও তাঁহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। * মহিলারা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া ছদ্মবেশে রাজপথে ফলবিক্রয়ার্থও বাহির হইতে লাগিলেন; রাজা তাঁহার কোনও অনুগৃহীতা ব্যভিচারিণীর গর্ভস্থ সন্তানকে স্বীয় সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে, সে দৃঢ়তাসহকারে তাঁহাকে সম্মত করাইল। † রঙ্গালয় বন্ধ হইয়াছিল, এখন নবোৎসাহে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরব্ধ হইল। রঙ্গালয়ে ও রঙ্গমঞ্চে বিবিধ উন্নতি সাধিত হইল। দৃশ্যপটপরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে বালকগণ মহিলা সাজিয়া অভিনয় করিত; এক্ষণে রমণীরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিল;—তাহারা অনেকে রাজার বা অভিজাতবংশীয়দিগের অনুগৃহীতা। নূতন আলোকে, নূতন সজ্জায়, রঙ্গালয় লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল। আনন্দসুখতৃষ্ণা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, আর বাধা সহিল না। সকল বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রবৃত্তিপরিচালনে সুখ, নিবৃত্তিতে কেবল দুঃখ। কে স্বেচ্ছায় সুখ ত্যাগ করিয়া, দুঃখভোগ করিবে? মানবের পশুপ্রকৃতি ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের মত প্রবল হইয়া উঠিল। শিল্পে ও সাহিত্যে ইহার প্রভাব যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ইংলণ্ডের এই অবস্থার সহিত আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে।

আওরঙ্গজেবের পূতাচার কপটতার আবরণমাত্র কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার স্থান এ নহে। কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তিনি মুসলমান ধর্ম্মে অতিরিক্ত গোঁড়ামী প্রযুক্ত আকবরের নীতিচ্যুত হইয়াই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া যান। তিনি জিজিয়া কর পুনঃসংস্থাপিত করিলে কৃপাপ্রার্থী হিন্দুরা যখন মস্‌জেদের পথে তাঁহার নিকট মর্ম্মবেদনা জানাইতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে করিপদে নিষ্পিষ্ট করিয়া পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। ‡ মোগল সম্রাটগণ প্রত্যহ প্রাসাদবাতায়নে প্রজাবর্গকে দর্শন দিতেন। কোন কোন রাজভক্ত হিন্দু বাতায়নপথে রাজদর্শন না করিয়া আহার করিতেন না। ¶ আওরঙ্গজেব সে প্রথার

* Green.

† Pepys' Diary Feb. 20, 1664—1665 and July 30, 1667.

‡ মুতাক্ষরীণ।

¶ কাফী খাঁ; Elliot. Vol VII.

বিলোপ করেন। কাশীতে ও মথুরায় হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জেদ নির্ম্মিত হয়, এবং বিগ্রহ মুসলমানের চরণস্পৃষ্ট হইবার জন্য আগ্রায় মস্‌জেদের সোপান-তলে প্রোথিত হয়। আওরঙ্গজেবের পূতাচার তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মে অতিরিক্ত গোঁড়ামীর অঙ্গমাত্র ছিল। তিনি আমিষ আহার করিতেন না, মদ্য স্পর্শ করিতেন না। উপবাসশ্রমে তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চারি সপ্তাহ কাল আকাশে ধূমকেতু দৃষ্ট হয়। তৎকালে আওরঙ্গজেব অতি অল্প আহার করিতেন, এবং ভূমিতলে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিতেন। ইহাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হয়, তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়েন। সেই সময় হইতে তিনি আর পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইতে পারেন নাই।*

হিন্দুদিগের অধিকাংশ উৎসবই ধর্ম্মসংসৃষ্ট; সে সকল বন্ধ হইয়া গেল। প্রাসাদে নৃত্যগীতাদিও বন্ধ হইল। সম্রাট স্বয়ং বহুমূল্য বস্ত্র ও মণিমুক্তাদির ব্যবহার ত্যাগ করিলেন। সভাসদগণও রাজসভায় আগমনকালে সে সকল পরিহার করিতে আদিষ্ট হইলেন। সম্রাট স্বয়ং শ্বেতবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণের বসন ব্যবহার করিতেন না। কাজেই রাজসভাসংসৃষ্ট সকলকেই তাঁহার অনুকরণে শ্বেতবসন ব্যবহার করিতে হইল। ইহাতে অনেক লোকের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় নষ্ট হয়। গায়ক ও অভিনেতৃগণ এই উপলক্ষে শবাধারে একটি সুসজ্জিত মৃৎপুত্তল বহন করিয়া রাজধানীর পথে ভ্রমণ করে। সম্রাটের বাসকক্ষের বাতায়নতলে তাহাদিগকে দেখিয়া সম্রাট কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, "গীত ও আনন্দ মৃত—তাহাদের শবদেহ এখন সমাহিত করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।" শুনিয়া আওরঙ্গজেব বলেন,—"সাবধান, শব যেন সমাধিমধ্যে নড়িতে, কথা কহিতে, বা গান গাহিতে না পারে। তাহা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ।" †

পরিবর্ত্তনশীল সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চালিত হইতে পারে না; সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-নিয়মেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আওরঙ্গজেব ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের বিধানে সমাজের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে বিধানে নরহত্যার অপেক্ষা সুরাপান গুরুতর অপরাধ—প্রথম অপরাধ নরদেহসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় অপরাধ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে!

---

* Tavernier.

† মুতাক্ষরীণ।

আওরঙ্গজেব সাধারণ জনগণের আনন্দসুখসম্ভোগেচ্ছার গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্র সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন, এমন বলিতে পারি না। তিনি সুরাপান রহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। * কিন্তু প্রচলিত মত, তাঁহার প্রাসাদেই সুরা ব্যবহৃত হইত। বিশেষ প্রতিহত স্রোত ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিতেছিল, এবং প্রতিহত অবস্থাতেই সম্রাটের সতর্কদৃষ্টির অন্তরালে সমাজশরীরে, নিম্নে, নানা স্তরে, নানা পথে প্রবাহিত হইয়া, গুরুতর অনিষ্টই করিতেছিল; স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের কারণ না হইয়া গুরুতর ব্যাধি ও অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিতেছিল। অল্পদিনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন প্রতিহত স্রোত সঞ্চিতবেগে প্রবাহিত হয়।

আওরঙ্গজেব ইতিহাসরচনা রহিত করিয়া দেন। †

আকবর হইতে শাহজাহান পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটগণ সকলেই স্থাপত্য-শিল্পের অনুরাগী ও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফতেপুর সিক্রীর স্বপ্নপুরী অশেষ যত্নে ও অজস্র অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পরিত্যক্ত হয়। শাহজাহান মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের উদারতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার দিল্লীস্থিত প্রাসাদ প্রাচ্য ভূখণ্ডে বা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল প্রাসাদ ছিল। ‡ শাহজাহানই 'ইণ্ডো-স্যারাসিনিক' স্থাপত্যের উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক। ভারতের হিন্দুশিল্প বৌদ্ধ যুগ হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ মুসলমানের করতলগত হয়। আকবর যথাসম্ভব ভারতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া হিন্দু শিল্প ও মুসলমান শিল্পের সংমিশ্রণ সম্পন্ন করেন। শাহজাহান তাঁহার পিতামহের ও পিতার অনুগৃহীত স্থাপত্যশিল্পপ্রণালী মিশাইয়া গাম্ভীর্য্য, শোভা ও লালিত্যে পূর্ণ 'ইণ্ডো-স্যারাসিনিক' স্থাপত্যের উদ্ভাবন করেন। তিনি সেই প্রণালী স্থায়ী হইবার উপযোগী সম্পূর্ণতায় সমুজ্জ্বল করিবার পূর্ব্বেই পুত্র কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। আওরঙ্গজেব সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাই অচিরে অযোধ্যার প্রাসাদমালায় ও জুনাগড়ের সমাধিসমূহে শাহজাহানের উদ্ভাবিত স্থাপত্যপ্রণালীর বিকৃতি পরিলক্ষিত

* কাফী খাঁ।

† মহম্মদ হাসিম আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাসরচনা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সম্রাটের আদেশভয়ে স্বীয় রচনা লুকাইয়া রাখেন। এই লুক্কায়িত (কাফী) ইতিহাস পরে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই হাসিম সাধারণতঃ কাফী খাঁ নামে পরিচিত।—লেখক।

‡ Fergusson—Indian and Eastern Architecture.

হয়। * আওরঙ্গজেব শিল্প সম্বন্ধে কেবল যে উদাসীন ছিলেন, এমন নহে। অনেক স্থলে তিনি বহুশ্রমবহুল দিবসের ও নিদ্রাহীন রজনীর কীর্ত্তি শিল্পজাত নষ্ট বা বিকৃত করেন। মুসলমানের পক্ষে জীবের যথাযথ অনুকরণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আকবর চিত্রকরদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বলিতেন, অনেকে চিত্র ঘৃণা করে; আমি তাহাদিগকে ভালবাসি না। চিত্রকরের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান। চিত্রকর চিত্রে লিখিত জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ করে; কিন্তু সে জীবনদান করিতে পারে না। তখন সে ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা না করিয়া পারে না। †

আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। মুসলমান-ধর্ম্মের নির্দ্দেশপালন সম্বন্ধে স্থানকালপাত্রবিচার তিনি পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, বা বিশ্বাস করিবার ভাব দেখাইতেন। তিনি পটে বা প্রস্তরে জীবপ্রকৃতির অনুকরণ ধর্ম্মবিরোধী বলিতেন। আজও রাজপুতানায় বহু প্রাসাদে শুনিতে পাওয়া যায়, দিল্লীর মূর্ত্তিদ্বেষী সম্রাটের ভয়ে প্রস্তরে ক্ষোদিত শিল্পকীর্ত্তি প্রলেপ দিয়া অদৃশ্য করা হয়। ‡ প্রপিতামহের শিল্পকীর্ত্তি ফতেপুর সিক্রীতেও তাঁহার মূর্ত্তিদ্বেষের প্রমাণ বিদ্যমান।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল রাজসভায় পূর্ব্বতন বাহুল্যের প্রাদুর্ভাব হইল। বাহাদুরের রাজসভা জনগণকে শাহজাহানের রাজসভার কথা স্মরণ করাইতে লাগিল। ইরাদত খাঁ বলেন, সেই সমৃদ্ধি-সমুজ্জ্বল দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অসম্ভব। ইহাতে জনসাধারণের মনে যে ভাব উদিত হয়, তাহাতে মনে হয়, শাহজাহানের পরই বাহাদুর দিল্লীর সিংহাসন পাইলে সম্ভবতঃ মোগল রাজত্ব আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইত। ¶

অল্পদিনেই বাহাদুরের রাজ্যকাল শেষ হইয়া গেল।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জেহান্দার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অপদার্থতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহাসন লইয়া যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ, তখন তিনি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। সেনাপতির কৌশলে তাঁহার জয় হইলে, তিনি

---

* Watt—Indian Art at Delhi, 1903.

† আইন আকবরী।

‡ Lockwood Kipling—Beast and Man in India.

¶ Tod.

বারাঙ্গনা লাল কুয়রকে লইয়া শিবিরাভ্যন্তরে সুরাপানে ও নর্ত্তকীর লাস্যলীলা-দর্শনে রজনী অতিবাহিত করেন। পরদিবস আর এক ভ্রাতা যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলে, সেনাপতি, সুরাপানে হতচেতন, অসংবৃতবেশ জেহান্দারকে করিপৃষ্ঠে তুলিয়া যুদ্ধ করেন, জয়ী হয়েন, এবং তাঁহাকেই সিংহাসন দান করেন।

মোগল বাদশাহদিগের সাম্রাজ্ঞীদিগের মধ্যে কেবল নূরজাহান প্রকাশ্য-ভাবে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ছিল; তিনি রণক্ষেত্রে, মন্ত্রণায়, শাসনে, স্বামীর সহচরী ও সহকারিণী। তিনি ভিন্ন সপত্নী-বহুল মোগল অন্তঃপুরে মোগল সম্রাটের আর কোন সীমন্তিনী রাজকার্য্যে আপনাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন নাই। আকবরের পত্নীদিগের ব্যক্তিত্ববিচারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। শাহজাহানের পত্নী-প্রেম ব্রজাঙ্গনার নয়ননীরপুষ্টা কালিন্দীর কূলে শিল্প ও সৌন্দর্য্যের সার সমাধিমন্দির বেষ্টন করিয়া আজও কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মমতাজমহলের গর্ভে শাহজাহানের চতুর্দ্দশ সন্তান জন্মে। * কিন্তু মোগল শুদ্ধান্তের কথা এমনই গুপ্ত থাকিত যে, মেনুসী যখন দিল্লীতে আগমন করেন, তখন ইঁহাদিগের মধ্যে ছয় জন জীবিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া মনে করেন। আওরঙ্গ-জেবের জীবনে তাঁহার পত্নীবর্গের প্রভাব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদয়পুরীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ কেবল প্রেমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। †

আর জেহান্দারের অনুগৃহীতা বারাঙ্গনার সখীও রাজধানীর রাজপথে সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করিতে সাহসিনী হইল। ‡ সম্রাট লাল কুয়রের ভ্রাতাকে উচ্চ পদে সমাসীন করিতে উদ্যত হইলে, উজীর তাহার নিকট নজর-স্বরূপ বহু বাদ্যযন্ত্র চাহিলেন। সে অপমানিত হইয়া ভগিনীকে জানাইল। ফলে সম্রাট উজীরকে এরূপ অদ্ভুত নজর চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে মোগল বাদশাহগণের অধীনে কর্ম্মচারীরা বংশপরম্পরাক্রমে রাজসেবা করিতেন। যাহারা নৃত্যগীতে বাদশাহদিগের চিত্তবিনোদ করিত, তাহারা অর্থ পুরস্কার পাইত। এখন যদি বাদশাহ

---

* বাদশানামা।

† ইনি কামবক্সের জননী; জির্জ্জিয়া হইতে আনীতা, খৃষ্টানী। দারা ইঁহাকে ক্রয় করেন। দারার মৃত্যুর পর ইনি আওরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে আনীতা হয়েন।—লেখক।

‡ মুতাক্ষরীণ।

শেষোক্তদিগকে উচ্চ পদ দিতে আরম্ভ করেন, তবে পূর্ব্বোক্তগণের পক্ষে শেষোক্তদিগের ত্যক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা ব্যতীত আর উপায় কি? আমি বাদ্যযন্ত্রসমূহ তাঁহাদিগকে দিব; তাহা হইলে, তাঁহারা নৃত্যগীতব্যবসায়ী-দিগের ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।" * সম্রাট কুপ্রবৃত্তি-চরিতার্থকরণেই সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন। † ইরাদত বলেন, এই অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে রাজত্বের ধ্বংসকামনা করিতে লাগিল।

ফরোকশিয়ার স্বয়ং অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন। এদিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভুত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, ক্ষমতাচ্যুত, দুর্ব্বল বাদশাহও ততই অধিক-মাত্রায় কুপ্রবৃত্তিচরিতার্থতায়—সুখসন্ধানের ব্যর্থ চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন।

ফরোকশিয়ার নামে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভু ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারাই সম্রাটের প্রভু ছিলেন। ফরোকশিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় যখন সম্রাটের ধনরত্ন ও অশ্বগজাদি আত্মসাৎ করেন, সেই সময়ের কথায় মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু জনরব, অঙ্গনাভিলাষী আবদোল্লা খাঁ রাজশুদ্ধান্ত হইতে কয়েক জন সুন্দরীকেও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ‡

মহম্মদ শাহও কুসঙ্গে মিশিয়া রাজকার্য্যে যথোচিত মনোযোগ দিতেন না। জান মহম্মদ নামক এক জন ফকীরের কন্যা তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, কিছুদিন সম্রাটের লেখ্যাধার ও মোহর তাহারই নিকট থাকিত। সে ইচ্ছায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিত। কিন্তু ভারতচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন,—

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ॥"

যখন সম্রাটের প্রিয় জাফর খাঁ ও শা আবদুল গফুর কর্ম্মচ্যুত ও নিগৃহীত হইল, তখন তাহাদের একযোগী বলিয়া কোকীও রাজরোষভাজন হইল। তাহার পক্ষে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ¶

অন্তিমদশায় দিল্লীর রাজসভায় বিলাস, বাহুল্য ও আতিশয্যের ব্যাপার এইরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

---

* মুতাক্ষরীণ।
† কাফী খাঁ।
‡ মুতাক্ষরীণ।
¶ মুতাক্ষরীণ।

ভারতবর্ষের ভূমি অনেক স্থলেই উর্ব্বর। অনেক স্থানে জনসংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হওয়ায় ভূমি যথারীতি কর্ষিত হইত। শিল্পিগণ যে সকল গালিচা, কিংখাব, জরীর কাজ, কোষের ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিত, সে সকল বিদেশে রপ্তানী হইত। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে স্বর্ণ রৌপ্য ভারতে আসিত, এবং ভারতবর্ষেই রহিয়া যাইত। আমেরিকার বহুমূল্য ধাতু, বহুভাগে য়ুরোপের নানা দেশে যাইয়া, অবশেষে ক্রীত দ্রব্যের মূল্যরূপে তুরস্কে ও পারস্যে আসিত। বাণিজ্যের স্রোতে তাহারও অধিকাংশ আবার ভারতবর্ষে আসিত। যখন বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হইত, তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল জাহাজ পণ্যদ্রব্য লইয়া মোকায়, বসোরায় ও বন্দর আব্বাসে যাইত,সেই সকল জাহাজে বাহিত পণ্যদ্রব্যের মূল্যরূপে ভারতে অর্থাগম হইত। ভারতীয়, ডচ্ ও ইংরাজ বণিকদিগের বহু বাণিজ্যপোত ভারতের পণ্যদ্রব্য লইয়া পেগু, তেনাসেরিম, শ্যাম, চীন, সুমাত্রা, মালদ্বীপ ও মোজাম্বিকে যাইত; তাহাতেও ভারতে যথেষ্ট ধনাগম হইত। ডচ্গণ জাপান হইতেও বহুমূল্য ধাতু আনয়ন করিত। ফ্রান্স ও পর্টুগাল হইতেও ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য-রূপে বহু অর্থ আসিত। জাপান, এমন কি, য়ুরোপ হইতেও ভারতে বিবিধ দ্রব্য আসিত। ইংলণ্ড হইতে সীস, ফ্রান্স হইতে বনাত, আরব ও পারস্য হইতে জলপথে ও স্থলপথে অশ্ব, এবং সমরকন্দ,বল্ক, রোখারা ও পারস্য হইতে ফল আসিত। মালদ্বীপ হইতে কড়ী আসিত, এবং বঙ্গদেশে ও অন্যত্র মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। ইথিওপিয়া হইতে গণ্ডারশৃঙ্গ, গজদন্ত ও ক্রীতদাস আসিত। ইহা ভিন্ন চীন হইতে পোর্সিলেন আসিত। তুতি-কোরিণ হইতে মুক্তার আমদানি হইত।* এই সকল দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে অর্থ বাহিরে যাইত না; পরন্তু ভারতের পণ্যদ্রব্যের বিনিময়েই এই সকল দ্রব্য আসিত।†

শাসনরীতিতে অনেক সময় প্রজার কষ্টের একশেষ হইত। দেশে শান্তি-রক্ষার জন্য ও বিপদের আশঙ্কায় যে বিপুল সেনাদল রক্ষিত হইত, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ করাই প্রজার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিত।‡ দেশের উর্ব্বর ভূমিও

---

* তুতিকোরিণ ভারত সীমায়।

† Bernier.

‡ এই সেনাদলের কথায় হণ্টার বলেন—An enormous ragged army who ate up the industry of the province.—*Annals of Rural Bengal.*

স্থানে স্থানে লোকাভাবে কর্ষিত হইত না। শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারই লোকাভাবের মুখ্য কারণ ছিল। প্রজা যে কেবল সর্ব্বস্বান্ত হইত, এমন নহে। তাহাতেও তাহার নিস্তার ছিল না। সময় সময় প্রজাবর্গের সন্তানদিগকে ক্রীতদাস করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। এইরূপ অত্যাচারে প্রজারা কেহ বা গ্রামত্যাগ করিয়া নগরে আসিত—ভারবাহী বা জলবাহী বা সেইরূপ অন্য কিছু হইত, কেহ বা অপেক্ষাকৃত সুব্যবহারের আশায় কোন জমীদারের জমীদারীতে পলাইয়া যাইত। শাসনকর্ত্তারা নজরে ও উপঢৌকনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তবে প্রার্থিত পদ পাইতেন। তাঁহারা প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার না করিলে সে অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারিতেন না। সাধারণ প্রজার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার হইত। প্রজা বা শাসনকর্ত্তা কাহারও অধিকার স্থির ছিল না। শাসনকর্ত্তা ভাবিতেন, যখন মুহূর্ত্তমধ্যে আমি পদচ্যুত হইতে পারি, তখন যে কয় দিন পারি—যে উপায়েই হউক—অর্থসংগ্রহ করিয়া লই। দেশের বা প্রজার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। প্রজা ভাবিত, আমি দেহের শোণিত দিয়া যাহা কিছু করিব, হয় ত অচিরেই তাহা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার হস্তগত হইবে। এ অবস্থায় আমি শ্রম করিয়া মরি কেন? আমার কি স্বার্থ? এরূপ অবস্থায় দেশের বা প্রজার উন্নতি হয় না, হইতে পারে না। *

দরিদ্রে দরিদ্রে বিবাদ উপস্থিত হইলে অনেক সময় সুবিচার হইত; কিন্তু এক পক্ষ প্রতাপশালী বা বিচারককে অর্থদানক্ষম হইলে সুবিচারের আশা সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইত। লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনোপার্জ্জনও নিরাপদ ছিল না। কাহারও অর্থ আছে, এ কথা প্রচারিত হইলে, অত্যাচারী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাহার সঞ্চিত ধন লুণ্ঠন করিবেন, এই আশঙ্কায় লোক ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর দারিদ্র্যের ভান করিত; ধনবানের সৌধে বা সজ্জায়, ব্যয়ে বা ব্যবহারে, তাহাকে ধনবান বলিয়া বুঝিবার উপায় থাকিত না। ওমরাহগণ কারণে অকারণে লোককে পশুরমত কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেও তাহার শাস্তি ছিল না। দেশের পথ ঘাট ভাল ছিল না; স্থানে স্থানে পথিকদিগের জন্য পান্থশালা ছিল সত্য, কিন্তু সে সকল পান্থশালায় সুবন্দোবস্ত ছিল না। দেশের লোকের এই অবস্থা; কিন্তু রাজসভায় সমৃদ্ধি সৌন্দর্য্যের অন্ত ছিল না। মোগলপ্রাসাদের সমৃদ্ধি সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে

---

* Bernier.

করিবার আবশ্যক। ওমরাহগণেরও জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। সম্রাট প্রভাতে বিচার করিতে বসিতেন; তখন একবার ও অপরাহ্ণে আর একবার ওমরাহদিগকে রাজসভায় আসিতে হইত। সপ্তাহে একদিন প্রত্যেক ওমরাহকে দুর্গে প্রহরীর কার্য্য করিতে হইত। কোথাও গমনকালে সম্রাট আবৃত যানে গমন করিতেন, কিন্তু ওমরাহগণকে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইত। এই ওমরাহগণই রাজসভার শোভা ছিলেন। ইঁহারা সুবেশ-সজ্জিত না হইয়া বাহির হইতেন না; অশ্বারোহী রক্ষিদলে বেষ্টিত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে, গজোপরি, বা নরবাহ্য যানে রাজপথে বাহির হইতেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যবর্গ, কেহ বা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনে মক্ষিকা ও ধূলি দূর করিয়া, কেহ বা পানীয় জল লইয়া, কেহ বা পীকদান ধরিয়া চলিত। ওমরাহ প্রভৃতির অলঙ্কারবাহুল্যের কথা বলাই বাহুল্য। দরিদ্র সৈনিকও পত্নীকে ও সন্তানদিগকে অলঙ্কার সজ্জিত করিবার জন্য স্বয়ং কষ্ট স্বীকার করিত। *

বার্ণিয়ার যে সময়ের কথা বলিয়াছেন, তখন মোগলপ্রতাপ নানা কারণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সম্রাট হিন্দু প্রজার প্রতি সদয় নহেন, স্বয়ং যুদ্ধে বিব্রত। নহিলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সময় দেশের লোকের এমন দুর্দ্দশা ছিল না। মুতাক্ষরীণ-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন, শাহজাহান পর্য্যন্ত বাদশাহগণ হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে স্নেহ দান করিতেন। তাহারা সুখে ছিল। আওরঙ্গজেবের সময় নানা দোষের সূচনা হইল। পূর্ব্বে পথ-ঘাটের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, শাসনপ্রণালীর ও শাসকদিগের দোষে, সাধারণ লোকেরা অত্যাচার সহ্য করিত সত্য; কিন্তু সম্রাটের সতর্কদৃষ্টি বহু অমঙ্গল নিবারণ করিত। এখন তাহার অভাবে দেশে ক্ষমতাশালিমাত্রই অত্যাচারী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন।

ভলটেয়ার দেখাইয়াছেন, রাজসভার বিবরণই ইতিহাস নহে। দেশের অবস্থাবর্ণনেও ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। দেশের লোকের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান ও বর্ণন ব্যতীত ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের এই প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন নাই। রাজা ও রাজসভা, বিগ্রহ ও সন্ধি, এই সকলেই ভারতের ইতিহাস পূর্ণ। দেশের মেরুদণ্ড কৃষকের অবস্থা ও অভ্যাসের বর্ণনে, দেশের সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার লিপিবদ্ধ করণে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ মনোযোগ

* Bernier.

দান করেন নাই। তবে নানা গ্রন্থে অবান্তরভাবে সে সকলের উল্লেখ আছে; বিদেশীয় ভ্রমণকারী ও কর্ম্মচারীদিগের বিবরণে অনেক কথা পাওয়া যায়। অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে যোগ্য ঐতিহাসিকের চেষ্টায় সে সকল সংগৃহীত ও সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত হইবে। আলোচ্য কালে দেশের লোকের অবস্থার বিষয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে এক জন উত্তম সংগ্রাহক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ দুঃখের ও হাস্যের উদ্রেক হয়।—গ্রামে গ্রাম্যসমিতি থাকায় প্রজার সুবিধা ছিল; কিন্তু ইহাতে আবার দোষও নিবারিত হইত না—অন্য গ্রামে দস্যুতা বরং ইহাতে পোষিত হইত। কৃষক, শিল্পী প্রভৃতির জীবনে উন্নতির প্রসার ছিল না। রমণীরা ভার বহিত; রৌদ্র পোহাইত; গোময়ের দাহ্য প্রস্তুত করিত। পুরুষগণ কলহ ও গৃহপালিত পশু-অপহরণের অবসরকালে ভূমিকর্ষণ করিত। দেশে দস্যু তস্করের বিষম উপদ্রব ছিল। *

প্রজাগণ কখনও রিক্তহস্তে সম্রাটের বা শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিত না। হিন্দু প্রজাবর্গের আচার ব্যবহার দীর্ঘ কাল হইতে একই পথে প্রবাহিত হইতেছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সম্রাটের শাসনাধীন হইবার পর হইতে হিন্দু রাজার অভাবে হিন্দুসমাজে কোনরূপ সংস্কার সহজসাধ্য হয় নাই। সুতরাং তৎকালে বিদেশীয়গণ যে সকল আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন, সে সকল প্রায় আমাদের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, বা আছে। বাল্য-বিবাহ, গ্রহণাদিকালে স্নানদানাদি, জগন্নাথের রথযাত্রা, মন্দিরে নর্ত্তকীর লাস্যলীলা, সতীদাহ, মরণাহতকে তীরস্থকরণ, গোজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, সাধু ও অসাধু সন্ন্যাসীর বাহুল্য,—তাঁহারা এই সকলই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। তখনও পুরুষের পরিধান একখানি বস্ত্র, সম্ভ্রান্তের উত্তরীয়, মহিলাদিগের অঙ্গ একখণ্ড বস্ত্রে আবৃত। যাত্রিগণ প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করিত; মধ্যাহ্নে দারুণ রৌদ্রে পথ চলা কষ্টসাধ্য হইত; তখন যাত্রীর দল কোন ঘনচ্ছায় বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত। গোজাতির প্রতি হিন্দুর যথেষ্ট ভক্তি ছিল; কারণ, গো ব্যতীত কৃষিকার্য্য চলিত না, আবার দুগ্ধ ও ঘৃত ভারতবাসীর প্রধান আহার্য্য। কিন্তু গোচারণের মাঠের অভাব ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ সতীদাহনিবারণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। †

---

* Keene—The Turks in India.

† বার্ণিয়ার গোচারণের মাঠের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তৎকালে যথেষ্ট ভূমি

মুসলমান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তারা হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থের ও হিন্দুদিগের বিদ্যার আলোচনানুরাগী ছিলেন। দারা পার্শীতে উপনিষদের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শাহজাহান বারাণসীর প্রধান পণ্ডিতকে বার্ষিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি দিতেন। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নিবেদন।

[একখানি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে লিখিত।]

১

বল, দেব, একি এ করিলে?
যশ-চন্দনের বাটি, বাণীর মন্দির হ'তে
আনি, কেন এ দীনের ললাট মণ্ডিলে?
রক্ত জবা ধুতুরায়, গাঁথিয়ে সামান্য মালা
দিতে চাও, দাও কণ্ঠে (কুসুম সুন্দর
সুকবির কণ্ঠে সাজে, নৃপতির ভালে রাজে!)
কাঙ্গালে সাজালে কেন, আনি নাগেশ্বর?
বাসরের সাজ সজ্জা তরুণ যুবারে সাজে,
বুড়ারে সাজালে কেন নবীন নাগর?

২

বল, দেব, একি এ করিলে?
আনি সিন্দূরের কৌটা, আনি তাম্বূলের বাটা
বিধবার পাণ্ডু হস্তে কেন অরপিলে?
আধ বাগাম্বর ছাল, আধ কণ্ঠে অহি-মাল,
শ্মশান-বাসিনী যেই হরের ঘরণী,

পতিত থাকিত; ভূমিবাহুল্য হেতু কৃষকও ক্ষেত্রকে বিশ্রাম দিত; দেশে কাননবাহুল্য ছিল—Forest Low'ও ছিল না। সেই জন্যই স্বতন্ত্র গোচারণভূমির আবশ্যকতা ছিল না।—লেখক।

একি দেব! পরিহাস, ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌমবাস,
তার তরে?—উমা নহে ব্রজের গোপিনী!
কুলু কুলু গঙ্গা ধায়, অদূরে জ্বলিছে চিতা,
শ্মশানে ধরিলে কেন সোহিনী রাগিণী?

৩

ভ্রম! ভ্রম! অলীক স্বপন!
কাচ আমি, নহি হীরা, আমি গো সামান্য তাম্র,
নহি আমি, নহি আমি, রজত, কাঞ্চন!
ভক্ত আমি? সর্ব্বনাশ! এ দারুণ পরিহাস
কেন? কেন? আমি, দেব! দীন অভাজন।
সুন্দর হৃদয় তব, সুন্দর নয়ন তব,
ভুবনে হেরিছ তাই সকলি মোহন!
শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী
চন্দ্রোদয়ে, দূর্ব্বাঘাস তাহাও কাঞ্চন।

৪

খোলা ভোলা বালকের হিয়া—
সাপের তর্জ্জন শুনি, করে আনন্দের ধ্বনি;
অহীরে আলিঙ্গি' ধরে, ফণা সাপটিয়া!
কুপতির পদ বন্দি', সতীর সদ্গতি হয়,—
মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা;
গঙ্গা-ভ্রমে পড়ি' জলে, ভক্ত লভে মুক্তিফলে,
কর্ম্মনাশা থাকে কিন্তু সেই কর্ম্মনাশা!

৫

ভক্ত আমি? আহা তাই হোক!
ভক্তির চরণস্পর্শে, হে দেব! ফুটুক হর্ষে
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে বাসন্তী অশোক!
ফুল ও চন্দন, দেব, পড়ুক শ্রীমুখে তব,
উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্—আহা তাই হোক!
এ হৃদয়-মরুভূমে বহুক প্রেমের ধারা,
হাসুক আঁধার ঘরে চাঁদের আলোক!

৬

হে শ্রীহরি, আসি দাও দেখা।
হৃদয়-দর্পণখানি মাজিয়া উজ্জ্বল কর,
মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল কলঙ্কের রেখা।
লোকে মোরে "ভক্ত" বলে, লাজে হয় মাথা হেঁট,
দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতে না পারি।
লজ্জা-নিবারণ হরি, হৃদয়প্রতিমা-মাঝে
ভকতি-প্রতিষ্ঠা কর; দোহাই তোমারি!

৭

হে সুন্দর, বুঝিবারে নারি,
কৌমার, যৌবন গেল, আয়ু প্রায় শেষ হ'ল,
কত কাল থাকিব গো অনূঢ়া কুমারী?
এস বঁধু, এস বর, সাজাইয়া এ বাসর
সারা-রাত্রি আছি বসে', রাত্রি হ'ল শেষ;
দেহ-মালঞ্চের মোর অর্ঘ্য-পুষ্প ঝরে যায়.
প্রাণের দেবতা! এস, এস পরমেশ!

৮

শ্যামাঙ্গিনী চণ্ডিকা কালিকা,—
সেই বেশে চাও যদি, এস হে আস্ফালি' অসি,
আমারে করিয়া নিও ভৈরবী সাধিকা।
বলি দিয়া প্রেম-খড়্গে, স্বার্থ—অসুরের রক্ত
নিভৃতে, সাধনমঞ্চে পিয়াব, অম্বিকা!
অয়ি নর-মুণ্ড-মালে, সন্তানে তুলিয়া কোলে,
নাচিস্ তাণ্ডব নাচ—অপূর্ব্ব রাধিকা!

৯

রাধা কৃষ্ণ যুগল মুরতি,—
সেই বেশে চাও যদি, এস বঁধু হৃদি-কুঞ্জে,
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি।
হৃদি-বৃন্দাবন-ধামে, এস হে বিনোদ ঠামে,
প্রাণ-মন-উন্মাদন বাজাও বাঁশরী;

কাম, লোভ-গোপ-কন্যা, পড়ুক শ্রীপদে আসি',
কুল, মান, ভয়, লজ্জা, স্বর্ব্বস্ব পাশরি' !

১০

সেই দিন নব বৃন্দাবন
বিরাজিবে হৃদি-কুঞ্জে, হে ব্রজের বংশী-ধারী,
তোমার ও মুখচন্দ্র করি' দরশন !
হইবে গো দোল রাস, বার মাস সুখোচ্ছ্বাস,
ছুটিবে রসের উৎস, প্রেমের ফোয়ারা,
প্রেমে গদ গদ বোল, যারে তারে দিব কোল,
মুখে হরি হরি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা !

১১

তখন পরায়ে দিও মালা,—
আনি চারু কৃষ্ণচূড়া, কুন্তল সাজায়ে দিও,
পীতাম্বরে করে দিও এ দেহ উজালা !
দেহ-বুদ্ধি না থাকিবে, লাজ ভয় না রহিবে,
আমি শ্রীহরির ধ্যানে হইব তন্ময়।
তুমি দেবে মোর গলে, আমি কিন্তু সেই ছলে,
গোবিন্দের কণ্ঠে দিব, বলি "জয় জয় !"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ইস্‌লামে বৌদ্ধ-প্রভাব। *

পৃথিবীতে বৌদ্ধ প্রভাব।

পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সমস্ত মহাপুরুষ বা অবতার জন্মপরিগ্রহ করিয়া পবিত্র পদাঙ্কে বসুন্ধরা ধন্য করিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধদেবের ন্যায় কেহই সার্ব্বভৌম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ

* রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর বিশিষ্ট সভ্য ও বুদাপেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা সমূহের অধ্যাপক গোল্ডজিহের্ (Gold Giher) ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ হাঙ্গেরীর

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাববিস্তারে কেহই বুদ্ধের সমকক্ষতা লাভ করেন নাই। হিন্দুর কৃষ্ণ, খৃষ্টানের খৃষ্ট, ইস্‌লামের মহম্মদ, প্রাণশূন্য হইয়া অনলে কিংবা ভূগর্ভে মিশিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিতাভস্ম, অস্থি, দন্ত বা কেশগুচ্ছ লইয়া উপাসকমণ্ডলী অম্বরচুম্বী চৈত্যস্তূপাদি নির্ম্মিত করিয়া উপাস্য দেবের কীর্ত্তিকৌমুদী বিস্তার করে নাই। যেদিন কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নশ্বর শরীর চন্দনকাষ্ঠের চিতানলে ভস্মীভূত হইল, খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধ পঞ্চ শত বৎসর পূর্ব্বে, সেই স্মরণীয় দিনে, মহাকশ্যপ প্রমুখ পাঁচ শত ভিক্ষু সেই পূত ভস্মরাশি পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া স্বর্ণপাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড, নখ, কেশ ও দন্তাদি লইয়া রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উত্থদ্বীপ ও কুশীনগর প্রভৃতি স্থানে প্রোথিত করিয়া, তদুপরি অভ্রভেদী মন্দির, স্তূপ ও চৈত্য নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। অদ্ভুতশিল্পমণ্ডিত, কীর্ত্তিস্তম্ভভূষিত ঐ সকল স্থান অদ্যাপি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে।

অনুরাধাপুরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজত্বকালে ধর্ম্মকীর্ত্তি যে দাতবংশের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের একটি দন্ত বা একগাছি কেশের অধিকারী হইবার জন্য তাঁহার ভক্তগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কোন ব্রাহ্মণরাজ্ঞীর প্রতিষ্ঠিত কলিঙ্গে দন্তপুরের কাহিনী অনেকেই জানেন। পাটলীপুত্রের হিন্দু-নরপতি পাণ্ডু বুদ্ধদন্তের অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক মহিমায় আত্মবিস্মৃত হইয়া মাণিক্যপাত্রস্থ বুদ্ধদন্তের উপরে প্রকাণ্ড চৈত্য নির্ম্মিত করিয়া কলিঙ্গরাজ গুহসিংহের মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ভারতীয় স্থপতিশিল্পের ইতিহাস লেখক ফার্গুসন বিস্মিতহৃদয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে বুদ্ধের ন্যায় বিরাটপুরুষ আজিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। মোঙ্গোলিয়া হইতে ল্যাপলাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, জাপান, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি সমস্ত দেশও বুদ্ধদেবের লীলানিকেতন ভারতবর্ষে, সর্ব্বত্রই বুদ্ধের পুণ্য চরণচিহ্ন দেদীপ্যমান। তথাকার

বিজ্ঞান-সভার সাধারণ অধিবেশনে, পরলোকগত তিব্বতীয়-প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতপ্রবর আলেকজাণ্ডার কসমা ডি কোরসের (Alexander Csoma de Koros) স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের অনেক তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্ট্রিহের যাহা লিখিয়াছেন,—তাহা ব্যতীত অনেক সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছি।—লেখক।

শিল্প ও সাহিত্য, ভূগর্ভ ও গিরিগহ্বর বুদ্ধের পদাঙ্ক ধারণ করিয়া এখনও তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের গভীর গবেষণায় ইস্‌লামের ক্রীড়াক্ষেত্র বোখারা হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বৌদ্ধবিহারের স্মৃতিস্তূপ আবিষ্কৃত হইতেছে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বৌদ্ধপ্রভাব 'বিস্তীর্ণ হইতেছে। আমেরিকা, ইউরোপ ও এসিয়ার প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী বুদ্ধদেবের অতীত মহিমার অনুধ্যানে রত হইয়াছেন। বৌদ্ধভাবানুস্যূত শিল্প ও সাহিত্যসংক্রান্ত পুস্তকাদির উদ্ধার ও মুদ্রণ হইতেছে। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে, ভূগর্ভস্থ প্রস্তরফলকে ও কীটদষ্ট জীর্ণপত্র পুঁথিতে বৌদ্ধ কীর্ত্তির করলেখা পাঠ করিতেছেন। বৌদ্ধ দর্শনেরও বিপুল আলোচনা চলিতেছে। কুম্ভকর্ণ চীনের নিদ্রাভঙ্গের উপক্রম হইয়াছে; প্রাচী-দ্বারে জাপান উষার:সুকুমার অরুণপ্রভার ন্যায় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শৌর্য্যশিক্ষা ও স্বদেশবাৎসল্যের অপূর্ব্ব প্রভাবে পৃথ্বী-বাসী মনুষ্যমাত্রকেই চমকিত করিতেছে;—এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার মনে জগন্নাথের প্রতি উদয়নাচার্য্যের "পুনর্বৌদ্ধে,সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ" এই ভবিষ্যদ্বাণী জাগরূক হইয়া উঠে।

গোল্ডজিহের প্রবন্ধপ্রারম্ভে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতীচ্য ধর্ম্মমত ও আধ্যাত্মিক জীবন জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে প্রাচ্য ভাবের দ্বারা অভিভূত ও পরিচালিত হইয়াছে। বিজ্ঞ সমালোচকগণ প্রতীচ্য ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যভাবের পরিচয় পাইবেন।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, জীবজগতে দেশ ও কালের প্রভাব সংক্রমিত হইয়া থাকে। বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু ও জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই দেশ ও কালের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং মনুষ্যের উদ্ভাবিত ধর্ম্মমতেও যে: তদানীন্তন প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির ছায়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বয়স নিরূপণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কে অর্ব্বাচীন বৌদ্ধমত লালিত পালিত, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু তথাপি বৌদ্ধ শিশু যখন ব্রাহ্মণ্যের কুণ্ণমার্গে পদক্রম শিক্ষা করিয়া যৌবনের উদ্দাম বলে বলীয়ান্ হইয়া পিতৃকল্প প্রৌঢ় হিন্দুকে দূরে পরিহার করিয়াছিলেন, যখন এসিয়াখণ্ডের

সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ প্রাধান্যের বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত, তখন প্রাচীন হিন্দুও যে উদীয়মান বৌদ্ধমতের ছন্দানুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ কথাও প্রৌঢ় পুরাণকার বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব তৎ।"

যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার স্থল নহে। বৌদ্ধমতের সর্ব্বতোমুখ প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষমাগুণের অবতার; গুণপক্ষপাতিতা তাঁহার স্বাধর্ম্ম্য। অর্ব্বাচীন বৌদ্ধমত প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের মূল বেদে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষমাবতার গুণগ্রাহী হিন্দু ঋষি বুদ্ধের প্রতিভার পূজা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না;—অন্য পথগামী শিশুকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন;—তাঁহাকে ভগবানের অবতারের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁহার বেদবিরুদ্ধ মত হিন্দুসমাজে গৃহীত হইল না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধভাব প্রবেশ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের যৌবনকালে খৃষ্টধর্ম্মের জন্ম হইল। খৃষ্টধর্ম্মে কাহার প্রভাব কতদূর তাহার আলোচনা করিবার স্থল ইহা নহে। আবার খৃষ্টধর্ম্ম যখন পদক্রম শিক্ষা করিতেছেন, তখন ধর্ম্মজগতের সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু ইস্‌লামের জন্ম হইল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব।

প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী সূক্ষ্মভাবে ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, য়ুরোপীয় জাতিসমূহের প্রবাদপরম্পরায়, সাধুগণের জীবনবৃত্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গুহ্যতম অংশসমূহে প্রাচ্য ভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীচ্য সাহিত্যের মধ্যে বার্লাম ও যসোফত * (Barlaam and yasophat) কাহিনীতে বুদ্ধের জীবনচরিত কি প্রকার প্রসিদ্ধ, তাহা অনেকেই জানেন। সেণ্ট টমাসের জীবনের অনেক তত্ত্বও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক ব্যতীত নির্ণীত হইতে পারে না।

গোল্ড জিহের বলেন, মুসলমানধর্ম্মের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইস্‌লাম দর্শনে গ্রীক দর্শনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সামাজিক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপাদিতে পারসীক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ব্যবহারশাস্ত্রে রোমক সভ্যতার ছায়া সুস্পষ্টরূপে

* কথিত আছে, বারলাম নামক জনৈক খৃষ্টীয় সাধু যশোফৎ (বোধ হয় যশোবন্তের অপভ্রংশ) নামক কোনও ভারতীয় যুবরাজকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

পরিলক্ষিত হয়। জায়মান বৃক্ষ যেমন ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ও আলোক উত্তাপের প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ অভ্যুদয়শীল ইস্লাম চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রচলিত ধর্ম্ম ও রীতিনীতির আলোকে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

পরে যখন ইস্লাম রাজশক্তিতে পরিণত হইয়া আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে চতুর্দ্দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল, তখন চতুঃপার্শ্বস্থ উৎকৃষ্টতর সভ্যতার রীতিনীতি ইহাতে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিতে লাগিল। সকলেই জানেন যে, খৃষ্টীয় ও য়ুনানী (Jewish) ধর্ম্মের ভিত্তি অবলম্বনে ইস্লামের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইস্লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সময়ে ইস্লামে ভারতীয় সভ্যতার আলোক পতিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। ইস্লাম অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তৃত বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। * স্বর্ণ-প্রসূ.ভারতভূমির বিবিধপণ্যপরিপূর্ণবাণিজ্য-তরণীসমূহে আরব সাগর পরিব্যাপ্ত থাকিত। কিন্তু যতদিন ইস্লামের সহিত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষাৎ সংঘর্ষ হয় নাই, ততদিন প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতীয় আলোক ইস্লামে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ইস্লাম বিজয়বাহিনীর দুই শাখা দুইদিকে প্রধাবিত হইল। প্রথম বাহিনী সর্ব্বাগ্রে মধ্য এসিয়ায় প্রবেশ করিল। তৎকালে সমগ্র মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধের অপ্রতিহত ও অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিরাজিত ছিল। এই সময়ে ধর্ম্মান্ধতায় উত্তেজিত নির্ভীক ইস্লাম বাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয়বৈজয়ন্তী লইয়া দিগ্‌দিগন্তে রণদুন্দুভি নিনাদ করিয়া পূর্ব্বে আটলাণ্টিক হইতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্রভাববিস্তার করিতে লাগিল।

আরব দেশে ৩য় শতাব্দীতে বুদ্ধের শামানিজ্‌ম বা শ্রমণধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আরবী ভাষায় ইহা অল্-সামানিয়ে (Al-Samanyeh) বলিয়া কথিত হইত। তদানীন্তন আরবী ভাষার অভিধানে বুদ্দ, (Budd) শব্দ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী কালে ইহা কেবল প্রতিমূর্ত্তি-বোধক অর্থেই ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে তদানীন্তন বৌদ্ধ প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আলেক্জাণ্ডার পলিহিষ্টর (খৃঃ পূঃ ৮৯—৬০)

---

* John Yeats L. L. D. প্রণীত "The Growth and Vicissitudes of Commerce" from 1500 B. C. to 1789 A. D. দ্রষ্টব্য। আমার সঙ্কলিত "মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস" নামক প্রস্তাবে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বাক্‌ট্রিয়ার পুরোহিতগণকেও সামানিয়া (শ্রমণ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইস্‌লাম বাহিনীর যে শাখা মধ্য এসিয়ায় প্রবেশ করিল, তাহা সেই স্থানের প্রচলিত রীতিনীতি পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিতে লাগিল। যুক্তিবাদী ইস্‌লাম দার্শনিকগণ জন্মান্তরতত্ত্ব ও কর্ম্মবাদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন আরব সাহিত্যের একাংশ হইতে ইহা প্রমাণীকৃত হইবে। মুসলমান দার্শনিকের উক্তি প্রত্যুক্তি—

প্রশ্ন। পৃথিবীতে অনেক স্থলে ধার্ম্মিক লোকে কেন এত দুঃখভোগ করেন?

উত্তর। কারণ, উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মা জন্মান্তরে পাপীর দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদ।

আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে আরবগণ ভারতের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অনেক রত্নরাজি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় গল্প-ভাণ্ডারের উপাখ্যান আরবে প্রচলিত ও আরব্যোপন্যাস বা একাধিক-সহস্ররজনী নামে অভিহিত হইয়াছিল। গুণাঢ্যের ভূতভাষাময়ী বৃহৎ-কথা এখন বিস্মৃতির দুর্ভেদ্য তিমিরে আবৃত। কথাসরিৎসাগরে তাহার জীর্ণ কঙ্কালের পরিচয় পাওয়া যায়। কয় জন সংস্কৃতজ্ঞ শুকসপ্ততির সমাচার রাখেন? কিন্তু অনেক মৌলবী তুতিনামার কথা বলিতে সমর্থ,—অনেক য়ুরোপীয় ভাষায় তোতাকাহিনীর অনুবাদ আছে। মদনবিনোদ ও শৃঙ্গারসুন্দরী যে মৈমুন ও খোজিস্তায় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ বিস্ময়ের কারণ নাই।

আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলিতে অদৃষ্টবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই "বিধিলিপি" বা "ভাগ্যলেখা" হিন্দুর সম্পূর্ণ নিজস্ব। খৃষ্টধর্ম্মের অগ্রজ জ্ঞানবৃদ্ধ বৌদ্ধও ইহা নিজস্ব বলিতে সঙ্কুচিত। ইহা হিন্দু ঋষির প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত। ইস্‌লামের "কিস্‌মেৎ"বাদ এই অদৃষ্টবাদের স্পষ্ট নিদর্শন। মুসলমান বৌদ্ধের নিকট ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই শামানিজম্ বা শ্রমণধর্ম্মের মূলসূত্র। একনিষ্ঠ ভক্ত মুসলমানগণ শ্রমণধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিপূজা গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু যুক্তিবাদী ইস্‌লাম দার্শনিকগণ ধীরে ধীরে শ্রমণধর্ম্মের নীতি সকল গ্রহণ করিয়াছেন। সারসত্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই, তাহা চিরকালই সর্ব্বত্র বিদ্বৎসমাজে সমভাবে সমাদৃত।

পরবর্ত্তী কালের কোনও কোনও মুসলমান লেখক নানা প্রকারে ইস্‌লা-

অস্বীকার করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ, প্রতীচ্যপ্রত্নতত্ত্ব-বিৎ রত্নপরীক্ষকগণ প্রভূত গবেষণা সহকারে তাঁহাদের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন। মুসলমানগণ ভারতের অতুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কত অগণিত মণি মাণিক্যে গজনীর রাজপ্রাসাদ অলকার ধনভাণ্ডারের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু কালের কঠোর নিয়মে লুণ্ঠিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কোনও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ তাহার নিদর্শনপ্রদর্শনে সমর্থ নহেন। হয় ত মথুরা কান্যকুব্জ, সোমনাথ অথবা ভীমনগরের রত্নরাজি কোনও খোরাসানবিলাসিনীর বিশাল উরঃস্থলে লম্বিত থাকিতে পারে; অথবা কোনও সারাসেনমহিলার কটিদেশে মেখলারূপে বিরাজিত থাকিতে পারে; হয় ত ময়ূরসিংহাসনের রত্নমালা কোনও তাতার-রমণীর চরণচুম্বনে নিরত আছে! কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মুসলমান সোমনাথের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি মস্‌জেদের পাদপীঠে পরিণত করিয়াছিল; এখন কে সেই শিলাখণ্ডের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবে? কিন্তু ইস্‌লাম বিদ্বদ্‌বর্গ ভারতীয় অক্ষয় ভাণ্ডারের যে কিছু ভাবরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিজাতীয় বেশে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। বহু শতাব্দীর বিভিন্ন বেশেও আজিও সেই সনাতন সূত্রগুলি প্রত্যগ্র পুষ্পের সৌন্দর্য্যে প্রত্যেক পাঠককে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। গোলাপ পুষ্পস্তবক কি তীব্রগন্ধ চম্পকের সুরভি প্রচ্ছন্ন করিতে পারে?

ইস্‌লাম অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বতন কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত আরবাদি দেশের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে আরববাসীরা ভারতের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অনেক রত্নরাজি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সময়ে আরবী সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। যখন আব্বাসাইডগণ সর্ব্বপ্রথমে দামস্কস হইতে বোগদাদে রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন, তখন তাঁহারা ধর্ম্মান্ধতার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতেই ইস্‌লাম সামাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে এসিয়া,ইউরোপ ও আফ্রিকা, সর্ব্বত্রই ইস্‌লাম প্রভাব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের অন্ধতা।

[লাইলির অনুকরণ।]

নন্দনে মন্দারমূলে শ্বেত শিলাসনে
সমাচ্ছন্ন শৈবালের শ্যাম আস্তরণে,
পুঞ্জীভূত পুষ্পরাশি—বিচিত্র-বরণ ;
তদুপরি রতি কাম খেলায় মগন—
—পণ রাখি' পাশা খেলা। ঘিরি চারিধারে
উৎসুক অমরবৃন্দ কাতারে কাতারে।
কে হারে কে জিনে রণে—উৎকণ্ঠা বিষম !
পবন বহে না বেগে, মূক বিহঙ্গম।
অদৃষ্ট কামেরে বাম, তাই ছাড়ি' তারে
প্রসন্ন প্রথম হ'তে অনঙ্গ-প্রিয়ারে।
বিশ্বজয়ী পুষ্পধনু হারিল মদন
দুরন্ত পাশার পণে। সংক্ষুব্ধ পবন
গর্জ্জিল শঙ্খের নাদে বিজয় ঘোষিয়া।
একে একে পঞ্চ বাণ পণে ধরি' দিয়া
হৃতসর্ব্ব মনসিজ, লাজে অভিমানে
অনন্ত যৌবন নিজ বাঁধা দিল দানে।
দশন-মুকুতা দিল, প্রবাল-অধর,
দুটি গণ্ড হ'তে দুটি গোলাপ সুন্দর ;
যুগল নয়ন দিল—খঞ্জন চঞ্চল—
সর্ব্বশেষ পণে। হর্ষে ত্রিদিবের দল
করিল দুন্দুভিধ্বনি ; সাঙ্গ হ'ল রণ।
নেত্রহীন সে অবধি দুর্দ্দান্ত মদন।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল—বিশ্ব চরাচরে
তাই প্রেম সেই হ'তে অন্ধ নাম ধরে।

সহযোগী সাহিত্য।

লাসার পুরোহিত-দেবতা।

দলই লামার অভিব্যক্তি।

"টাইম্‌স্" পত্রিকায় লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ওয়াডেল্ লিখিয়াছেন;—লাসার মহালামা কিপ্রকারে দেবপ্রকৃতিভূষিত পুরোহিতরাজে অভিব্যক্ত হইলেন—সে বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রতীচ্য কল্পনা-শক্তি বহুদিন যাবৎ ব্যাপৃত। সেই রহস্যতত্ত্ব তিব্বতের আদিম ইতিহাস ও তিব্বতবাসিগণের কুলক্রমাগত প্রবাদপরম্পরার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিছু আভাষ প্রদত্ত হইল।

তিব্বতীয়গণ এক কালে রণকুশল জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল। তৎকালে যিনি শস্ত্রশিক্ষা ও সংগ্রামকৌশলে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিতেন, তিনিই সিংহাসনের অধিকারী নির্ব্বাচিত হইতেন। তখন তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম কিংবা চীনশাসন অজ্ঞাত ছিল। সেই প্রাচীনকালে দুর্দ্দান্ত রণদুর্ম্মদ তিব্বতীয়গণ অদ্রিশৃঙ্গে বা অটবীর অভ্যন্তরে অসভ্যদিগের ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর চীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ভীষণপ্রকৃতি বর্ব্বর তিব্বতীয় মেষপালকগণ প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। তাহারা প্রতিবৎসর মেষ, কুকুর ও বানর বলিদান দিয়া জাতীয় প্রতিনিধির নিকট 'ক্ষুদ্র শপথ' গ্রহণ করিত, এবং তিন বৎসরান্তে 'মহাশপথ'-গ্রহণকালে তাহারা মনুষ্য, অশ্ব, বৃষ ও গর্দ্দভাদি বলিপ্রদান করিত। তখন তাহাদের মধ্যে কোনও লিখিত ভাষার উৎপত্তি হয় নাই। তাহারা প্রস্তরখণ্ডে রেখাপাত করিয়া পরস্পর তাহার অর্দ্ধখণ্ডের বিনিময় করিয়া শপথরক্ষা করিত। আজিও তিব্বতে এই প্রথার লুপ্তাবশেষ দৃষ্ট হয়।

তিব্বতীয়গণ গর্ব্বসহকারে বানরজাতিকে তাহাদের আদি পিতা বলিয়া স্বীকার করে। এই গুপ্ত তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া লর্ড মনবড্ডো উল্লাসের সহিত ডারুইনের মানববংশ-কল্পনার পূর্ব্বেও নরজাতিকে অভিব্যক্ত বানর জাতি বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণ বলে যে, এক মহাবানর (কিষ্কিন্ধ্যা হইতে) হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক তিব্বতবাসিনী এক কিন্নরীকে (বা যক্ষকন্যাকে) বিবাহ করিয়াছিল। এই আদি দম্পতী হইতে কতকগুলি বানরশিশু যুগপৎ জন্মগ্রহণ করে। পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেব করুণাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শস্য ভক্ষণ করিতে দেন। তাহা ভক্ষণ করিবামাত্র বানরশিশুগণের দীর্ঘ লাঙ্গুল ও লোমাবলী ক্রমে ক্রমে হ্রস্ব হইতে লাগিল, এবং অবশেষে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। তাহার পর বানরশিশুরা কথা কহিতে শিখিল, এবং একেবারেই মনুষ্যে পরিণত হইল। তখন তাহারা বৃক্ষপত্র পরিধান-পূর্ব্বক লজ্জানিবারণ করিল। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেবই মহালামায় পরিণত হন। তিব্বতীগণ বলে যে, তাহারা পিতৃপক্ষ হইতে তাহাদের প্রকৃতিসুলভ ভক্তি ও মাতৃপক্ষ হইতে নির্দ্দয়তা ও প্রতারণা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাথমিক ইতিহাস।

৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিব্বতবাসিগণ বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন পূর্ব্বক ইতিহাসের রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইল। প্রথমাঙ্কেই তাহারা ভীমবিক্রমে উত্তর ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিম চীন আক্রমণ পূর্ব্বক চীনসম্রাটকে পরাজিত করিয়া অপমানসূচক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি হয়। চীনসম্রাট পরাক্রমশালী ত্রয়োবিংশবর্ষদেশীয় তিব্বতরাজ 'স্রংশান্ গ্যাম্পোর সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিলেন। তৎপরে তিব্বতরাজ নেপাল জয় করিয়া তথাকার রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিব্বতরাজের এই দুই মহিষীই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। অসভ্য তিব্বতরাজ বিদুষী মহিষীদ্বয়ের বিদ্যা ও ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইলেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করিল। তিব্বতরাজ পত্নীবাৎসল্যের অনুপ্রাণনায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিব্বতে শিক্ষা ও সভ্যতার নবযুগ জাগিয়া উঠিল। তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও পুস্তকাদির জন্য ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকাদি অনুবাদিত করিতে লাগিলেন। চীন দেশ হইতেও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইল। ধর্ম্মশীলা পত্নীদ্বয়ের প্ররোচনায় তিব্বতরাজ তিব্বতে যে ধর্ম্মবল প্রদান করিলেন, তাহাতে একটি নূতন মহাজাতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক অশুভেরও আবির্ভাব হইল। দেশের সঞ্জীবনীশক্তির পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এক অভিনব ব্যাধিতে পরিণত হইল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে বিকৃত অবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—তাহা তিব্বতের আদিম ধর্ম্মের সহযোগে বীভৎস পিশাচপূজার আকার ধারণ করিল। তিব্বতীয় শার্লামেনের উৎসাহের অবসরে লামাগণের প্রতাপ প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী রাজগণের অধিকারকালে লামাগণ বিশিষ্ট-ভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিলেন। রাজগণ তাঁহাদের হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে লামাগণ প্রবল হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। প্রকৃত রাজশক্তি অন্তর্হিত হইল।

পুরোহিত-রাজত্ব।

কিন্তু তিব্বতে পুরোহিত-তন্ত্র রাজত্বে বিশেষ সুফল ফলিল না। পুরোহিতগণ স্বীয় স্বার্থলাভের সঙ্কীর্ণ নীতির ক্রীতদাস হইয়া জাতীয় উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করিলেন। পৌরোহিত্য-প্রপীড়িত তিব্বতের অধিবাসিগণ কেবল দাসত্বের দৃঢ় নিগড়ে নিবদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জাতীয় গৌরব অন্তর্ধান করিতে লাগিল।

পশ্চিম তিব্বতের শাক্য নামক স্থানের লোহিতোষ্ণীষধারী লামাই প্রথম পুরোহিতরাজ, বা মহালামা। তিনি মোঙ্গলবংশীয় চীন সম্রাট কুব্লাই খাঁর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করায়, উক্ত চীন সম্রাট্, ১২৫২ খৃষ্টাব্দে প্রত্যুপকারচ্ছলে তাঁহাকে তিব্বতের সিংহাসন প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ কুব্লাই খাঁর বন্ধু ও কর্ম্মচারী মার্কোপোলোর বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কুব্লাই জঙ্গিস্ খাঁর পুত্র ছিলেন। কুব্লাই জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতিভার পূজা করিতেন। যোগ্যতা দেখিলেই তিনি তাহার পুরস্কার প্রদান করিতেন। তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য, চীনের রাজসভায় লামাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ-বিচারের জন্য তিনি খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বহু আলোচনার

পরে অবশেষে লামাগণের বৌদ্ধধর্ম তাঁহার মনঃপূত হয়। তৎকালে চীন ও মোঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

"তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষার বিষয় অতীব বিস্ময়জনক। পোপগণের নিকট হইতে যে সকল খৃষ্টান প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, কুব্লাই তাঁহাদিগকে কোনও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণের ন্যায় খৃষ্টানগণও কোনও অমানুষিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। তখন লামাগণ নানা ইন্দ্রজালের অবতারণা করিলেন। লামাগণের অদ্ভুত যাদুমন্ত্রে ভূতলস্থ মদ্যপূর্ণ চষক শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া কুব্লাইর ওষ্ঠলগ্ন হইল। তদ্দর্শনে বিস্মিত কুব্লাই খাঁ লামাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। খৃষ্টানগণ উহাকে ভৌতিককাণ্ড বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কুব্লাই কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না।

যখন মোঙ্গলবংশীয় সম্রাটগণ চীনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন, তখন কালমুখ সম্রাটগণ সাইবীরিয়া প্রান্তরে মোঙ্গোলিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উর্গা নগরে রাজধানী স্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুরোহিত মহালামাও সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অদ্যাপি কোকোনর হ্রদের সান্নিধ্যে উর্গার লামার রাজধানী বিদ্যমান আছে। সেই রাজধানীতে রাজনীতিসূত্রে এক জন রুসীয় 'রেসিডেন্ট' বা রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত আছেন।

তিব্বতের শাক্যলামাগণ মোঙ্গল সম্রাটের আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হইয়াও চারি শত বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে ধর্ম্মমণ্ডিত রাজদণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তাতার-বংশীয় বর্ব্বরসম্প্রদায় তিব্বত জয় করিয়া প্রাচীন লামা-শাসন বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিল।

পীতোষ্ণীষ লামা-শাসন।

পীতোষ্ণীষ লামাগণ এতদিন লোহিতোষ্ণীষ লামাগণের অধীন ছিলেন। তাঁহারা তাতার আক্রমণের সুযোগ বুঝিয়া তাতার-রাজের সাহায্যে প্রাধান্যলাভে অগ্রসর হইলেন। তদনুসারে তাতার-রাজ গুম্রী খাঁ এক দল সৈন্য পাঠাইয়া লোহিতশীর্ষ লামাদিগের প্রাচীন সিংহাসন অধিকার করিয়া পীতোষ্ণীষ লামাগণকে প্রদান করিলেন। লামারাও প্রত্যুপকারস্বরূপ গুম্রী খাঁর পুত্রকে তিব্বতের রাজা ও সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। মোঙ্গলরাজও 'সমুদ্রসদৃশ বিস্তীর্ণ' উপাধিবিশিষ্ট তিব্বতের প্রকৃত রাজাকে 'দলই' লামা বলিয়া অভিহিত করিলেন। মোঙ্গল ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ 'সাগরসদৃশ বিস্তীর্ণ'। অদ্যাবধি লামাগণ ইউরোপবাসিগণের নিকট উক্ত নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

সেই প্রথম দলই লামার নাম বাগ্মিপ্রবর 'লাজাং'। প্রথম দলই লামার ন্যায় রাজনীতিকুশল বিচক্ষণ লামা আর তিব্বতের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইনি আপনাকে দেববংশজাত বলিয়া প্রচার করেন, এবং তদবধি তদ্বংশীয়গণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র তিব্বতবাসিগণের নিকট দেবোচিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। নিম্নলিখিত কৌশলে তিনি স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

তিনি পীতোষ্ণীষ মহালামাগণের অধস্তন ৫ম উত্তরাধিকারী। ইঁহারা বুদ্ধের 'মৃত্যুঞ্জয়' উপাধি ধারণ করেন। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম গ্যালওয়া। তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস যে, প্রথম মহালামার আত্মা যথাক্রমে পাঁচবার অবতীর্ণ হইয়াছে। মহালামার এক আত্মাই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। তিব্বতীয়গণের সংস্কার, পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেব, যিনি 'স্রংশান গাম্পো'

রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পুরোহিতরাজ হইয়াছিলেন, এবং প্রাথমিক তিব্বতীয় বানরশিশুগণকে ঐন্দ্রজালিক খাদ্যপ্রভাবে মনুষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন—তিনিই মহালামারূপে পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হইতেছেন।

এই দেবতাই পরবর্ত্তী কালে তিব্বতে অবলোকিত চীনরাজা নামে পূজিত হন। ইনিই পূর্ব্বে নির্ব্বাণলাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দলই লামার প্রামাণিকতা।

তিব্বতীয়গণের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস ও তিব্বতীয় পৌরাণিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দলই লামা এক অলৌকিক বংশবল্লী প্রস্তুত করেন। তাহার প্রমাণের নিমিত্ত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং স্রংশান গ্যাম্পোর লিখিত এক দৈব পুঁথিরও আবিষ্কার করেন।

এবম্প্রকারে অকাট্য প্রমাণের বলে কূটনীতিজ্ঞ দলই লামা তিব্বতীয়গণের নিকট আপনাকে দেববংশসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সময়ে ভূতপূর্ব্ব লোহিতোষ্ণীষ প্রকৃত লামারাজগণ উক্ত দলই লামার অনৈসর্গিক দেববংশে আস্থা স্থাপন করিলেন না। কিন্তু প্রবলপ্রতাপশালী পীতোষ্ণীষ দলই লামা এক জন সেনাপতিকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা লোহিতোষ্ণীষ লামাগণকে সংহার করিলেন। তাঁহাদের বিহার সকলে দলই লামার পীতপতাকা উড্ডীন হইল। এই সময়ে ১৬৫৬ খৃঃ জেস্যুইট গ্রুবার লাসা নগরে আগমন করেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে বিধাতৃস্বরূপ লামাকে পূজা না করে, সে তন্মুহূর্ত্তেই তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। সেই সময় হইতে তিব্বতে পুরোহিত-রাজ লামার প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে।

উক্ত দলই লামা আর এক ব্যক্তিকে দেবত্বের কিছু অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম তিব্বতের প্রধান মঠ 'তাসিলুম্পো'র অধিষ্ঠাতা। লাসার পরেই এই নগর উল্লেখযোগ্য ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের বিহার ও মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। তদবধি সর্ব্বত্রই এই স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। এই মঠের লামা কিছুকাল পূর্ব্বে মহালামার উচ্চাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গস্থ অমিতাভ বুদ্ধের পার্থিব অবতার বলিয়া পরিগণিত। তিব্বতের এই দ্বিতীয় লামা 'তাসি লামা' বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত। ইনি মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন রাজনীতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকেন না; বিদ্যা ও ধর্ম্মের জন্যই ইনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই কারণে ইঁহার উপাধি 'বিদ্যা মহারত্ন'। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে এই তাসি লামার এক পূর্ব্বাধিকারী ইংরাজদিগের বাণিজ্যদূত বগ্‌ল্ সাহেবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। তিনি তাসি লামার চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

মহালামা।

উক্ত প্রথম দলই লামা তাঁহার বহু দোষ সত্ত্বেও শিল্প ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় তিব্বত শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি রাজধানীর বহির্ভাগে পটল পর্ব্বতের শিখরে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে এই অলৌকিক প্রাসাদ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই পুরোহিতরাজ ৩৫ বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজদণ্ড ও ধর্ম্মদণ্ড পরিচালন করিয়া চরমবয়সে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ঔরসজাত পুত্র সাঙ্গ্য গ্যাম্‌ৎসোকে রাজ্যভার দিয়া মহাপ্রস্থান করেন। পুত্র সাঙ্গ্য অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও

কূটনীতিপরায়ণ ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর কাল পিতার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিয়াছিলেন। পরে তিনি এক জন যুবককে মহালামার পদে অভিষিক্ত করেন। এই তরুণ লামার দুশ্চরিত্রতায় লাসাবাসিগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া রাজপ্রতিনিধি সাঙ্গ্যের প্রাণসংহার করে। সাঙ্গ্যের আশ্রিত তরুণ মহালামাও চীনসম্রাটের আদেশে পদচ্যুত ও নিহত হন। ইতঃপূর্ব্বে তিব্বতে আর কখনও লামা-হত্যা হয় নাই।

উক্ত দলই লামার গুপ্তহত্যায় পুরোহিতের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। তখন লামার আত্মার অবতারতত্ত্বে সন্দিহান হইয়া, সকলে লাসার চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের এক জন বর্ষীয়ান্ পুরোহিতকে দলই লামার আসনে বসাইল। সকলেই পূর্ব্বসংস্কারানুসারে বিশ্বাস করিল যে, ভূতপূর্ব্ব দলই লামার নিশ্বাস কিয়দংশে এই নবনির্ব্বাচিত লামার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চীনসম্রাটের আদেশেই এই দলই লামার নির্ব্বাচন হয়।

কিন্তু তিব্বত বাসী ধর্ম্মযাজকগণ এই নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা অবিলম্বে একটি সদ্যোজাত শিশুকে দলই লামার আত্মজ বা অবতার বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহাকেই দলই-লামা-পদের প্রকৃত অধিকারী স্থির করিলেন। সাধারণেও ধর্ম্মযাজকদিগের কথা বিশ্বাস করিল। উভয় পক্ষের গোলযোগে জাতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সাধারণ ধর্ম্মযাজকগণ এক দল তাতার সৈন্যের সহায়তায় ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে লাসা অধিকার করিলেন।

চীনসম্রাট কাংশিও প্রকাণ্ড এক দল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন। চীনসৈন্য তাতার সেনাপতিকে সংহার করিয়া লাসা অধিকার করিল। তখন চীনসম্রাট মহালামার অবতার-তত্ত্বের অনুরূপ সাধারণ মতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সাধারণের নির্ব্বাচিত শিশুকেই দলই লামার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু তিনি লামার কার্য্য ধর্ম্মের গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং রাজকার্য্যাদি পরিচালনের নিমিত্ত এক জন চীনপ্রতিনিধিকে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইনি নামতঃ লামার অধীন থাকিলেও সর্ব্বতোভাবে তিব্বতের হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার অধীনে আর দুই জন চীনরাজ-প্রতিনিধি লাসা ও আম্বান নগরে অবস্থিত হইলেন।

বিপ্লবকাল।

এই দলই লামা ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে চীনরাজপ্রতিনিধিকে হত্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া চীনসম্রাট লাসায় আর এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। দলই লামা বন্দীকৃত ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ নিহত হইলেন। চীনসম্রাট কিম্‌রি নামক এক জন বৃদ্ধ সম্মানভাজন পুরোহিতকে মহালামার আসনে বসাইলেন, এবং তাঁহাকে সমস্ত বৈষয়িক অধিকারচ্যুত করিয়া কেবল ধর্ম্মবিষয়ের গুরুরূপে স্বীকার করিলেন। মিবাং নামক অন্য এক ব্যক্তি শাসনকার্য্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। এই বিপ্লবসঙ্কুল কালে লাসা নগরে যে সমস্ত জেস্যুইট প্রচারক ছিলেন, তাঁহারা স্বচক্ষে উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব দলই লামা তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নবনির্ব্বাচিত তিব্বতরাজ মিবাং অল্প দিনে আম্বানবাসী চীন 'রেসিডেণ্ট' সকলের বিরাগভাজন হইলেন, এবং ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগের দ্বারা নিহত হইলেন। এই ঘটনায় তিব্বতীয়গণ উত্তেজিত হইয়া চীন রেসিডেণ্টগণের বিনাশসাধন করিল। ইহাতে চীনসম্রাট চেনলাং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিব্বতে আবার চীনশাসন প্রবর্ত্তিত হইল। আম্বানবাসীরা প্রাধান্য লাভ

করিল। তাহারাই 'রাজ'-নির্ব্বাচনে অধিকতর ক্ষমতা লাভ করিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে আম্বানগণের হস্তেই রাজ্যের শাসনভার থাকিল। রাজা তাহাদিগের ক্রীড়াপুত্তলবৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেন। আম্বানগণ দলই-লামা-নির্ব্বাচনেও অধিকারলাভ করিলেন।

এই সময় হইতেই দেবপ্রিয় প্রসিদ্ধ দলই লামা অকালেই স্বর্গযাত্রা করিতে লাগিলেন। তদবধি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াই দলই লামাগণ মরধাম ত্যাগ করিতেন। এক জন লামার দেহত্যাগ ঘটিলে, পুনর্ব্বার একটি শিশু লামাপদে আসীন হন। এই প্রকারে লামাগণ কিছুতেই প্রাপ্তবয়স্ক হইতে পারেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্য রাজার হস্তে বর্ত্তমান।

ইহাদিগের পরবর্ত্তী দলই লামাগণ যথাক্রমে ১১, ১৮, ১৮ ও ১৮ বয়সে লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান দলই লামাই কেবল উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ। চীনগণের নিদারুণ অত্যাচারবহ্নিতে তিনিই কেবল পতঙ্গের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। সৌভাগ্যক্রমে তিব্বতে যে স্বজাতিবাৎসল্যের উত্তেজনায় জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে—সেই হেতু সনাতন নিয়মানুসারে অষ্টাদশ বর্ষে স্বর্গযাত্রারূপ দারুণ দুর্ঘটনা বর্ত্তমান দলই লামার ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই। কোনও এক অপূর্ব্ব নাটকীয় কৌশলে চীনদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান দলই লামা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইনি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেন, তৎকালে তিব্বতের জাতীয় সম্প্রদায় রাজপ্রতিনিধিকে কারারুদ্ধ করিয়া 'শীলমোহর' হস্তগত করিলেন, এবং অবিলম্বে চীনের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া দলই লামাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। আম্বানবাসিগণ চীনসম্রাটকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পিকিন হইতে এক অনুশাসনপত্র বাহির করিল, এবং তাহার বলে পূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধিকে সিংহাসন প্রদান এবং স্বাক্ষরমুদ্রা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য জাতীয় সম্প্রদায়কে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হইল, এবং আম্বান দলপতি উৎকোচের বশীভূত হইয়া চীন অনুশাসন প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া চীনসম্রাটকে জ্ঞাপন করিলেন।

বর্ত্তমান কাল।

শুভক্ষণে চীন জাপানে সমর সংঘটিত হইল। এই সুযোগে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতিজ্ঞ দলই লামা চীনশাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় শাসন বদ্ধমূল করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ সিচুয়ান্ নামক পশ্চিমপ্রদেশীয় এক চীনরাজপ্রতিনিধি পিকিনে চীনসম্রাটকে পত্র লিখিলেন যে, তিব্বতে চীনশাসন শিথিলীকৃত হইয়াছে; অতএব এক দল সৈন্য পাঠাইয়া চীনশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা বিধেয়।

বর্ত্তমান যুবক দলই লামা বাগ্মিপ্রবর উদারহৃদয় তুবদান নামে পরিচিত। তিনি সিংহাসনের অধিকারী এবং ধর্ম্মবিষয়ে পিকিন, মোঙ্গোলিয়া, বৈকাল, লাদাক, সমগ্র তিব্বত ও হিমালয়প্রদেশস্থ বৌদ্ধরাজ্যে তাঁহার প্রভাব অব্যাহত। তিনি একটু ক্রোধপ্রবণ।

তাঁহার ধর্ম্মপরিষৎ নানাপ্রকার লামা বা পুরোহিতগণের সমবায়ে গঠিত। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমতানুসারে বিভিন্ন শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। তাহা লইয়া অনেক সময়ে কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সিংহাসন সাধারণের প্রীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। সুতরাং তিনি বিশেষ বহুদর্শী নহেন। আবার তদুপরি নানাপ্রকার

কুচক্রী লোক স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কল্পে তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকে। এই কারণেই দলই লামা তিব্বতে বিধাতার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদস্বরূপ (!) ইংরেজ সৈন্যের আগমনে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়াছিলেন। চীনের শাসননিগড় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া রুসিয়ার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, লামা দর্জ্জিএফ্ নামে দলই লামার এক শিক্ষক আছেন, তিনি রুস গবর্মেণ্টের প্রজা। সেই জন্যই তিনি দলইলামার কর্ণে রুষের শরণগ্রহণরূপ কুমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি রুসিয়ায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ২০ বৎসর পূর্ব্বে ৩৫ বৎসর বয়সে লাসার এক মঠে অবস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দলই লামার পরিষদে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি রুসিয়ার ভৌগোলিক সমিতির সভ্য, এবং নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। ইনি ভারতবর্ষ ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ভাদ্র। "মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত কবিতাবলী" এবার প্রবাসীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই অসম্পূর্ণ কবিতাগুলিতে মাইকেলের প্রতিভার পরিচয় নাই;—তথাপি, স্বর্গীয় মহাকবির খণ্ডিত রচনাও অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য লিখিয়া মাইকেল অনেকের বিদ্রূপভাজন হইয়াছিলেন; তাহার সাক্ষ্য—'ছুছুন্দরী-বধ' স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে। অমিত্রাক্ষর নূতন বলিয়াই এই বিদ্রূপের ঢেউ উঠিয়াছিল। মাইকেল নিজেও "সংস্কৃত ছন্দে লিখিত কোনও বাঙ্গলা কাব্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে" "দেবদানবীয়ম্" নামক কাব্য লিখিতেছিলেন! দুইটি কবিতার পর সে রচনা আর অগ্রসর হয় নাই। বাঙ্গলা ভাষার দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য বলিব? প্রথম শ্লোকটি এই,—

"কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে;"

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রহস্যে বিপদ" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধটি "প্রবাসী"র অনেকটা স্থান গ্রাস করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, "আমরা যে নারীগণকে অন্ধ ও খঞ্জ করিয়া বন্দিদশাতে রাখিতেছি, ইহার শাস্তি আমরাই ভোগ করিতেছি।" যাঁহারা নারীগণের চক্ষুর উপর চশমা দিয়া দিব্য দৃষ্টি ও চরণকমলে জুতা পরাইয়া অবাধ গতি দান করিয়াছেন, তাঁহারাই কি কম শাস্তি ভোগ করিতেছেন? আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি;—কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার অপচারকে 'শিক্ষা' বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে শিক্ষায় গৃহস্থের কন্যার খানার টেবিলে মদিরা দেখা দেয়, যে শিক্ষায় হিন্দুর মেয়ে নারীধর্ম্ম

ভুলিয়া জোয়ান অফ্ আর্ক' সাজিয়া বখামি ও ভণ্ডামি করে, যে শিক্ষায় যথেচ্ছাচার স্বাধীনতার মুখোস্ পরিয়া প্রচণ্ডতাণ্ডবে সমাজ ও সংসার দলিত করিতে থাকে, যে শিক্ষা ত্যাগকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভোগের পূজা করে, আমরা তাহাকে 'শিক্ষা' বলিতে পারি না। তাহা পুরুষের পক্ষেও বিষ, রমণীর পক্ষেও বিষ, হিন্দুরমণীর পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু। শিবনাথ বাবু 'লেসে' ঢাকিয়া, 'রুজ্' লেপিয়া, 'এসেন্স্' মাখাইয়া স্ত্রীশিক্ষার যে পুতুলটি খাড়া করিয়াছেন, তাহা সকলের চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে না। অনেকে জানে, তাহার 'উপরেই চাকণচিকণ,' কিন্তু 'ভিতরে খ্যাড়।' শিবনাথ বাবু ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—"বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।" তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই,—কিন্তু নারী যদি 'নারী' থাকেন, তবেই, নতুবা নহে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিদ্যাপতির টীকায়" ভূতপূর্ব্ব টীকাকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন। শুনিলাম, কালীপ্রসন্ন বাবু নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ "প্রবাসী"র সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কি বলেন, দেখা যাক। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জাপান" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "চীন দেশে চণ্ডুসেবন" চলনসই। "হোলকর রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ।

সাহিত্য-সমাজে সুপ্রথিত, ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু, দরিদ্রবৎসল উইলিয়ম ডিগ্‌বী লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমাদের দুঃখের অবধি নাই। বন্ধুহীন ভারতবর্ষ! তোমার দুর্ভাগ্য শোচনীয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত পেড্‌লার, কালীপ্রসন্ন বাবুর ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যকল্পে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ নাটক-কার ও সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ সাহিত্য-শ্রম দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। তিনি এক রাশি নাটক লিখিয়াছেন, এক রাশি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, ফরাসী সাহিত্য হইতে মাতৃভাষায় রত্ন আহরণ করিতেছেন। সংপ্রতি তাঁহার "ফরাসীপ্রসূন" নামক একখানি নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। "ফরাসী-প্রসূন" ফ্রেঞ্চ গল্প, কবিতা ও ক্ষুদ্র নাটিকার মনোজ্ঞ তোড়া।

কোপেনহেগেনের ডাক্তার সোরেনসেন মহাভারতের নামের Index প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বম্বে নগরে মুদ্রিত মহাভারত ও প্রতাপ রায়ের সংস্করণ অবলম্বনে Index রচিত হইয়াছে। নামের সঙ্গে বিবরণও আছে। কিছুদিন হইল, ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এ দেশে সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ। সংপ্রতি তিনি ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইহাতে খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। আগামী মাসে অক্সফোর্ডের ক্লারেণ্ডন প্রেস হইতে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। বিদেশী ভারতের ইতিহাস রচনা করেন—আমরা "যে তিমিরে সে, তিমিরে।"

মৌলবী আবদুল সালাম ইংরাজীতে "রিয়াজুস্-সালাতিনে"র অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। রিয়াজুস্ বাঙ্গলার ইতিহাসের বিশেষ আবশ্যক উপকরণ।

"বঙ্গবাসী'র কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইতিহাসপাঠকের ধন্যবাদভাজন হইতেছেন। তাঁহার Bernier's Travel, Stewart's Bengal, Memoirs of Jahangir, Memoirs of Humayun, Cunningham's Shiks প্রকাশ করিয়াছেন।

স্নেহের ব্যথা।

১

নবগঙ্গার শ্যাম কূলে মাধবপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। নদীতীরে এক শ্রেণী তিন্তিড়ীক ও কতকগুলি বেণুকুঞ্জ। নদীপথে গমনশীল জলযানের আরোহীর চক্ষে সেই শ্যামস্তূপ-মধ্যবর্ত্তী গ্রামখানি চিত্রলিখিতবৎ প্রতীয়মান হয়। শ্যামশষ্পাস্তৃত নিম্নগ তটভূমিতে জলকূলে ঘনশ্যাম বেতসকুঞ্জ ও মধ্যে মধ্যে কেতকী। গ্রামখানিও বৃক্ষবহুল, ছায়াতিশয্যে শীতল। গ্রামে আম, কাঁটাল, খর্জ্জূর ও নারিকেল তরুই অধিক—আর মধ্যে মধ্যে বেণুকুঞ্জ। গ্রামে স্থানে স্থানে পতিত জমীতে কালকাসন্দা ও আস্সটির ঝোপ; শীতাগমে শিয়ালকাঁটার হরিদ্রাবর্ণ ফুল ফুটিয়া থাকে। গৃহগুলি পরিচ্ছন্ন—প্রাঙ্গন এরণ্ডের বা চিতার বৃতিতে বেষ্টিত; বৃতিতে তেলাকুচার লতায় কোথাও বা শ্বেত কুসুম—কোথাও বা পরিপক্ক রক্ত ফল। অধিকাংশ প্রাঙ্গনেই বাণে লতা।

গ্রামে লোকের সংখ্যা অধিক নহে। অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী; কয় জন কৈবর্ত্ত—ভুষামালের কায করে; আর কয় ঘর কায়স্থ—কাহারও সামান্য জমাজমী আছে, কাহারও বা চাকরী সম্বল। গ্রামে ধনী নাই বলিলেই হয়। কায়স্থ হারাধন তরফদার হরিণকুণ্ডের ব্রাহ্মণ জমীদারের অধীনে ভদ্রাসনের ও নিকটস্থ আর কয়খানি গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। তরফদার মাসিক তিন টাকা বেতনে সন্তুষ্ট থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। অভাব অল্প;—খামারজমীতে কিছু ধান্য হইত,—প্রজারাও বিচালি, তরকারী প্রভৃতি দিয়া আসিত।

হারাধনের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ আশুতোষ নিকটস্থ গ্রামের পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। হারাধনের মৃত্যুর পর জমীদার তাঁহাকে তাঁহার পিতার কার্য্য দিয়া প্রতিপালন করেন। আশুতোষের পর হারাধনের পর পর দুই পুত্র ও এক কন্যার মৃত্যু হয়;—কনিষ্ঠ শ্যামাচরণ তাহার পরের সন্তান, সুতরাং জননীর বড় আদরের। তাহার বিদ্যা "শিশুবোধক" অতিক্রম করে নাই। শ্যামাচরণ বাড়ীর কায দেখিত;—খাসখামারের কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত;—গ্রামের লোকের আপদবিপদে সাহায্য করিত—অন্নপ্রাশনের, বিবাহের, শববহনের ও

শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিত; বর্ষাকালে নবগঙ্গার স্ফটিকবারি যখন কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিত, তখন ছিপ লইয়া মৎস্য ধরিত।

হারাধনের মৃত্যুকালে আশুতোষের বয়স প্রায় ত্রিশ, শ্যামাচরণের বিশের কিছু উপর। হারাধনের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আশুতোষের প্রথম সন্তান—পুত্র যশোদাকুমার জন্মগ্রহণ করে। পুত্র প্রসব করিয়াই বহুকালাবধি রুগ্না প্রসূতি পীড়িতা হইয়া পড়েন। পীড়া ক্রমে সূতিকায় পরিণত হয়। প্রথম সামান্য টোট্‌কা টাট্‌কার ব্যবস্থা হয়—তাহাতে ফলোদয় হইল না। পরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কবিরাজ মহাশয় পীড়ার অবস্থা শুনিয়া বটিকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ফল প্রসব করিয়া ওষধি যেমন শুকাইয়া যায়, পুত্র প্রসব করিয়া প্রসূতি তেমনই জীবনত্যাগ করিলেন।

যশোদাকুমার পিতামহীর আদরে ও খুল্লতাতপত্নীর অঙ্কে বাড়িতে লাগিল। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার হাতে খড়ি হইল। সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষের মনে পুত্রকে অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি পুত্রকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

যশোদাকুমার বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিল। বুদ্ধিমান বালক শিক্ষায় উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিল, শিক্ষকগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,— আশুতোষের পিতৃহৃদয় আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইল।

যশোদাকুমারের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় শীতকালে গ্রামে বিষম বিসূচিকা দেখা দিল। গৃহে গৃহে ক্রন্দনধ্বনি—নদীজলে শব—শৃগাল কুক্কুর গৃধ্র শব আহার করিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না;—সকলেই ভীত। এক দিন প্রত্যূষে আশুতোষ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সন্ধ্যার মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। ভ্রাতার শবদাহ করিয়া শ্যামাচরণ যখন গৃহে ফিরিল, তখন পুত্রের পীড়া জননীতে সংক্রান্ত হইয়াছে। তিন দিন সস্ত্রীক শ্যামাচরণ প্রাণপণে জননীর শুশ্রূষা করিল। রোগিণীর অবস্থা কখন কিছু ভাল, কখন অত্যন্ত মন্দ—এই ভাবে তিন দিন আশায় নিরাশায় শ্যামাচরণের হৃদয়ে আলোক ও ছায়া আসিতে যাইতে লাগিল। চতুর্থ দিন জননীর জীবন শেষ হইয়া গেল।

শ্যামাচরণ অন্ধকার দেখিল।

২

যথাকালে ভ্রাতার ও জননীর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইয়া গেল। ভাবনার অন্ত নাই, শ্যামাচরণ ভাবনার কূল পাইল না।

সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায় কি! যশোদাকুমারের শিক্ষার উপায় কি হইবে? এখন বিপদে পড়িয়া শ্যামাচরণ বিশেষ বুঝিল,—যেমন করিয়াই হউক, যশোদাকে পড়াইতে হইবে। সে আপনি যদি কিছু লেখাপড়া জানিত, তবে আজ এত বিপদ ঘটিত না। এখন শ্যামাচরণের মনে পড়িল, পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিরস্কার করিলে জননী যখন বিপন্ন পুত্রের উদ্ধার হেতু ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, তখন বিরক্ত হইয়া পিতা বলিতেন,—"শেষে যে খানসামাগিরি করিয়া খাইতে হইবে! আমি তাহা দেখিতে আসিব না; কষ্ট উহারই হইবে।"

স্বামী স্ত্রীতে অনেক পরামর্শ হইল। বন্ধ্যা কামিনী হৃদয়ের সমস্ত আকর্ষণে যশোদাকেই ভালবাসিয়াছিল—তাহাকেই নিষ্ফল বক্ষে চাপিয়া শান্তি পাইয়াছিল। কামিনীও বলিল, যেমন করিয়া হউক যশোদাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কি! কেহই ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক জন দরিদ্র কায়স্থসন্তান কলিকাতায় কাজ করিত। এই সময় সে গৃহে আসিল। সে শ্যামাচরণকে আশা দিল যে, মামসম্ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিলে কলিকাতায় কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে। তখন মানসম্ভ্রমের কথা শ্যামাচরণের মনেই ছিল না; সে তখন যশোদাকুমারকে মানুষ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্যামাচরণ স্ত্রীকে সে কথা বলিল। কামিনী কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "যাইতেই হইবে?" দুইটি ক্ষুদ্র কথায় কি বেদনা! সত্য—যাইতেই হইবে; না যাইয়া উপায় নাই; কিন্তু যাইতে শ্যামাচরণেরও যেমন কষ্ট, কামিনীরও তেমনই বেদনা। শ্যামাচরণ কখনও বিদেশে যায় নাই; এই বয়সে অজ্ঞাত বিদেশে যাইয়া, অজ্ঞাত ব্যবসায়ে কেমন করিয়া কি করিবে? কামিনী ভাবিল,—এত দিনে গৃহ ও হৃদয় শূন্য হইবে। কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তখন শ্যামাচরণ আপনার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পত্নীকে বুঝাইল,—"ভয় কি? আমি প্রায়ই বাড়ী আসিব। যশোদা বাড়ী থাকিবে। অল্প দিনেই যশোদা মানুষ হইবে; তখন আমাদের সুখ দুঃখ দূর হইবে। এ কয় দিন কোনরূপে সব সহ্য করিয়া থাকিতেই হইবে।"

কামিনী স্বামীর কথা শুনিল—বুঝিল। কিন্তু তবুও পোড়া চক্ষুতে জল ঝরিতে লাগিল। সে কেমন করিয়া শূন্য হৃদয়ে শূন্য গৃহে থাকিবে? পত্নীর সেই অশ্রু দেখিয়া শ্যামাচরণও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তখন অশ্রুতে অশ্রু মিশিলে হৃদয় শান্ত হইত সত্য; কিন্তু তাহা হইলে কামিনী কি আর ধৈর্য্য

ধরিতে পারিত? তাই শ্যামাচরণ সেই শেষ সান্ত্বনা হইতেও স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিল।

যাহার সহিত শ্যামাচরণ কলিকাতায় যাইবে, তাহার যাইবার দিন আসন্ন হইয়া আসিল। আশুতোষের পত্নীর যে কয়খানি অলঙ্কার ছিল, তাহা ভ্রাতার ও মাতার শ্রাদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন টাকার উপায় কি হইবে! সংসারখরচ রাখিয়া যাইতে হইবে; কিছু মূলধন সঙ্গেও লইয়া যাইতে হইবে। টাকার আবশ্যক শুনিয়া কামিনী আপনার সব অলঙ্কারগুলি আনিয়া শ্যামাচরণকে দিল। সে অলঙ্কার লইতে শ্যামাচরণ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কামিনী বলিল,—"যদি ভগবান দিন দেন, অনেক অলঙ্কার হইবে। তুমি উপার্জ্জন করিতে যাইতেছ। অদৃষ্টে থাকে, আবার অলঙ্কার হইবে। যশোদা মানুষ হইলে সব কষ্ট ঘুচিবে।"

পত্নীর মহত্ত্বে শ্যামাচরণ মুগ্ধ হইল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে বলিল, "তোমার এই সামান্য সম্বল—"

কামিনী বাধা দিয়া বলিল, "কখন্ আবশ্যক হয়—সেই জন্যই ত অলঙ্কার। উহার জন্য তুমি ভাবিও না।"

অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহার কতক অংশ দিয়া শ্যামাচরণ সংসারখরচের দুই তিন মাসের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিল—সব গুছাইয়া দিল; আর যশোদার বিদ্যালয়ের বেতন ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়ের জন্য কামিনীর নিকট কিছু অর্থ রাখিল। অবশিষ্ট অর্থ সে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

তখন শ্যামাচরণ পাড়ার প্রবীণ-প্রবীণাদিগকে আপনার সংকল্পের কথা জানাইয়া, তাঁহাদিগকে তাহার অনুপস্থিতিকালে গৃহের তত্ত্বাবধান করিতে বলিল। প্রবীণগণ তাহার সংকল্পের প্রশংসা করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিলেন—আশার কথা বলিলেন। সকলেই সাগ্রহে তাহার গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। সহসা অবস্থাবিপর্য্যয়ে শ্যামাচরণের এই কষ্টে প্রকৃতস্নেহশীলা প্রবীণাদিগের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সকলেই শ্যামাচরণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গ্রামের প্রবীণপ্রবীণাদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া শুভলগ্নে শ্যামাচরণ কল্পতরু কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

৩

শ্যামাচরণ যখন চলিয়া গেল, তখনও প্রভাত হয় নাই। শীতের আকাশে ক্ষীণতনু চন্দ্র ও স্থির তারকাপুঞ্জ। প্রকৃতির মুখে স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকার আবরণ। অদূরে নদীতীরে বেণুকুঞ্জে পবনের দীর্ঘশ্বাস ও ঝিল্লীরব। বিহগ নীরব। গ্রাম সুপ্ত।

কামিনী আসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে শ্যামাচরণ, তাহার সঙ্গী ও ভারবাহী অদৃশ্য হইয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনী সেই দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। শ্যামাচরণ যাইবার সময় কামিনী বহুকষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়াছিল—আর পারিল না। দাওয়ায় বসিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল—সেই অশ্রুধারায় তাহার মনের সঞ্চিত ভার প্রশমিত হইল।

পূর্ব্বগগনে আলোকবিকাশ সূচিত হইল। কামিনী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ঘরে গেল। যশোদা তখনও ঘুমাইতেছিল। কামিনী তাহাকে তুলিল। যশোদা উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কি গিয়াছেন?" উত্তর দিতে কামিনীর গলা ধরিয়া আসিল। যশোদা অভিমানের সুরে বলিল, "আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছিলাম, আমাকে জাগাইয়া দিও! কেন দিলে না?" কামিনী যশোদাকে জাগাইতেছিল; সে জাগিলে কাঁদিবে বলিয়া শ্যামাচরণ তাহাকে জাগাইতে দেয় নাই। সে কথা বলিতে যাইয়া কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া যশোদাও কাঁদিতে লাগিল।

এই সময় প্রাঙ্গন হইতে পাড়ার এক জন প্রবীণা ডাকিলেন, "ছোট বৌ!" অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কামিনী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল। প্রবীণা শ্যামাচরণের গমন-সংবাদ লইয়া প্রাতঃস্নানার্থ নদীতে গমন করিলেন। কামিনী ছড়াঝাঁট দিতে প্রবৃত্তা হইল।

গ্রামের প্রবীণগণ প্রায়ই যশোদাকে ডাকিয়া তাহাদের বাড়ীর সংবাদ লইতেন, প্রবীণারা সংবাদ লইতে আসিতেন, এবং কখনও বা চালের কুমড়া, কখন বা ক্ষেত্রের ফল মূল উপহার আনিতেন। দুর্দ্দশায় পড়িয়া কামিনী যেন গ্রামের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রামের সকলের এই সহানুভূতি কামিনীর রমণী-হৃদয় স্পর্শ করিত, কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু হৃদয়ের শূন্যভাব কিছুতেই দূর হইত না।

মধ্যাহ্নে যখন যশোদা বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত,—গ্রাম শান্ত হইত, তখন বিজন গৃহে একাকিনী কামিনী দূরগত শ্যামাচরণের কথা ভাবিত, তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইত। কবে এ দুঃখের শেষ হইবে?

৪

শ্যামাচরণ কলিকাতায় আসিয়া যেন সমুদ্রে পড়িল। পল্বলবাসী মীন সাগরে পড়িলে তাহার কেমন বোধ হয়? সৌধের অরণ্য—পাষাণপথে অবিরাম জনস্রোতঃ! এথানে সে—পল্লীপুত্র—কেমন করিয়া কি করিবে? দেখিতে দেখিতে কয় দিন

কাটিয়া গেল—মূলধন কমিতে লাগিল। শেষে সঙ্গীর পরামর্শে শ্যামাচরণ তাহারই অবলম্বিত ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, স্থির করিল। ফিরি করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে। শ্যামাচরণ মানসম্ভ্রম ত্যাগ করিবে স্থির করিয়াই আসিয়াছিল; তবুও তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে কেমন করিয়া সে কার্য্য করিবে? কিন্তু তখনই যশোদার কথা মনে পড়িল;—মনে পড়িল, কামিনী রমণী হইয়াও তাহার শেষ সম্বল স্বেচ্ছায় দিয়াছে। শ্যামাচরণ স্থির করিল, যেমন করিয়াই হউক, এ কার্য্য করিতে হইবে। তবুও দিবাভাগে শ্যামাচরণ সে কার্য্য করিতে পারিল না;—শেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে কলিকাতার পথে পথে বরফ ফিরি করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম উচ্চস্বরে ডাকিতে লজ্জা বোধ করিত,—কেহ বরফ কিনিবার জন্য ডাকিলে গৃহে প্রবেশকালে শ্যামাচরণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; সে দর করিয়া পণ্য বিক্রয় করিতে পারিত না।

ক্রমে এ সকল কাটিয়া গেল; ব্যবসায়েও অল্প অল্প লাভ হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ আপনি যত অল্প ব্যয়ে পারিত, চালাইত;—স্বয়ং সকল কষ্ট স্বীকার করিত। যশোদাকে মানুষ করিতে হইবে।

চার মাসে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত হইল। তখন শ্যামাচরণ প্রথমবার বাড়ী গেল। সমস্ত পথ কি আনন্দ, কি আশা! দীর্ঘ চার মাস পরে শ্যামাচরণ গৃহে গেল। কামিনীর আঁধার মুখে হাসি ফুটিল। শ্যামাচরণ শুনিয়া সুখী হইল, যশোদা দিন দিন পাঠে উন্নতিলাভ করিতেছে।

এমনই ভাবে চার বৎসর কাটিয়া গেল। অকালবার্দ্ধক্যে শ্যামাচরণের কেশজাল শ্বেত হইতে লাগিল—দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার শ্রমে কাতরতা নাই। সেইবার যশোদাকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল।

যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল—যশোদা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্যামাচরণ ও কামিনী যেন হাতে স্বর্গ পাইল। শ্যামাচরণ গৃহে আসিল। স্বামী স্ত্রীতে আবার কত পরামর্শ হইল। শ্যামাচরণ বলিল, "এইবার যশোদার একটা চাকুরী জুটিলে হয়।" কামিনী বলিল, "না! বাছা এখনই চাকরী করিবে কি? উহাকে আরও পড়াইতে হইবে।" শ্যামাচরণের একবার মনে হইল, উচ্চাশার একটা সীমা থাকা ভাল; কিন্তু কামিনীর কথায় তাহার উচ্চাশার সীমা বাড়িয়া গেল। সেও মনে করিল, সেই ভাল। সেই ত পরিশ্রম করিতেছি-ই; আর অল্পদিন পরিশ্রম করিলে যদি যশোদা আর দুই একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে—তবে তাহাই হউক।

এইবার যশোদাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। সে প্রস্তাবে কামিনী আবার কাঁদিল। এবার যে গৃহ একেবারেই শূন্য হইবে! শ্যামাচরণ যখন বিদেশে যায়, তখন অভাগিনী বন্ধ্যা নারী যে অবলম্বন লইয়া ছিল, আর যে তাহাও রহিল না! কিন্তু কাঁদিয়া ফল কি?

কামিনী পুত্রাধিক যশোদার বাক্স গুছাইয়া দিল। প্রত্যেক দ্রব্যে বন্ধ্যা নারীর অশ্রু যেন আশীর্ব্বাদের মত পতিত হইল। তাহার মনে কত আশঙ্কা!

আবার বিদায়ের দিন আসিল। শ্যামাচরণ যশোদাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। কামিনী শূন্যগৃহে—শূন্যহৃদয়ে একাকিনী রহিল। সঙ্গে রহিল কেবল আশা।

৫

শ্যামাচরণ যশোদাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। তাহাকে ছাত্রাবাসে রাখিল। ব্যয় বাড়িয়া গেল—শ্যামাচরণ অধিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইল। তাহাতে তাহার বিরক্তিমাত্র নাই। কিন্তু সেই জন্য সে প্রত্যহ যশোদাকে দেখিতে যাইতে পারিত না। যশোদা কলেজে পড়িতে লাগিল।

যথাকালে যশোদা দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—বৃত্তি পাইল। শ্যামাচরণের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সে লক্ষ্য করিল, যশোদার যেন কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে। নূতন স্থানে—নূতন পরিচিতদিগের মধ্যে পল্লীপালিত বালক আর যেন পূর্ব্ববৎ নাই। শ্যামাচরণ মনকে প্রবোধ দিল, এমন হইতেই পারে। সে কথা সে কামিনীকেও বলিল না। কিন্তু যশোদা বৃত্তি পাইলেও তাহার ব্যয় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শ্যামাচরণের পরিশ্রম কমিল না। সে একদিনও যশোদার ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে বাক্যব্যয় করিত না; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে তাহার প্রার্থিত অর্থ দিত।

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল;—যশোদা বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কামিনী পূর্ব্ব হইতেই যশোদার-বিবাহ দিবার জন্য জিদ করিতেছিল; এবার বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। শ্যামাচরণেরও মত হইল।

শ্যামাচরণ কলিকাতায় আসিবার কয় দিন পরে এক দিন ছাত্রাবাসে গেল। যশোদার এক "বন্ধু" তাহাকে বলিল, "ছাত্রাবাসের সম্মুখে উকীল রামদাস বসু মহাশয়ের বাটী। তিনি তাঁহার কন্যার সহিত যশোদার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক।" শ্যামাচরণ ক্রমে ক্রমে শুনিল, রামদাসের এক পুত্র যশোদার সতীর্থ। পাঁচ ছয় মাস হইতে এই সম্বন্ধের কথা হইয়াছে; যশোদা এ বিবাহে সম্মতি জানাইয়াছে।

তাহার অজ্ঞাতে ব্যাপার এত দূর অগ্রসর হইয়াছে জানিয়া শ্যামাচরণ কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু যশোদার সম্মতির কথা শুনিয়া সে আর কিছু না বলিয়া আপনার সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

বিবাহের সব স্থির হইল। শ্যামাচরণ উপলক্ষমাত্র। স্নেহশীল শ্যামাচরণের হৃদয়ে সেই প্রথম স্নেহের ব্যথা বাজিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই শ্যামাচরণকে পুনরায় গৃহে যাইতে হইল। যশোদার বিবাহ হইবে—কামিনী জিদ করিল, সে কলিকাতায় যাইবে। শ্যামাচরণ কোন্ প্রাণে তাহাকে নিবারণ করিবে? রমণী স্নেহে অন্ধ হইলে অবস্থা-ব্যবস্থা সব ভুলিয়া যায়। কামিনী কলিকাতায় যাইবে—'বধূ-পরিচয়ে' বধূকে বলয় দিবে। অবস্থার কথা বলিয়া নিবারণ করিতে শ্যামাচরণের মন সরিল না।—কামিনী স্বেচ্ছায় তাহার স্ত্রীধন বাহির করিয়া দিয়াছিল।

শ্যামাচরণ পৈত্রিক খামারজমী বন্ধক দিল—অর্থসংগ্রহ করিল।

৬

যশোদার বিবাহ হইল। কামিনী দেশে যাইয়া 'বৌভাত' করিবার প্রস্তাব করিল। যশোদার মত হইল না। যে দারিদ্র্য মানবের ঔদ্ধত্য ও অবিনয়, গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিয়া দেয়, যাহার অপেক্ষা সুশিক্ষক জগতে আর নাই, যশোদা সেই দারিদ্র্য লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তাহা গোপন করিতে সচেষ্ট হইল। প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামই মানবজীবন—মহত্বের ও মনুষ্যত্বের পথ প্রতিকূলতার কঠোর কণ্টকে আকীর্ণ, তাহা সে বুঝিল না। হায় ভ্রান্তি! হায় কুশিক্ষা!

যশোদার মত বুঝিয়া শ্যামাচরণ কামিনীকে বুঝাইল,—"বৌমা বড়মানুষের মেয়ে, ছেলেমানুষ। আমাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এখনই লইয়া যাইলে ছেলেমানুষের বড় কষ্ট হইবে।" কামিনী অভিমানের সুরে বলিল, "বল কি? তবে কি বৌ ঘর করিতে যাইবে না?" শ্যামাচরণ বুঝাইল,—"কেন যাইবে না? একটু গুছাইয়া লইয়াই বৌমাকে লইয়া যাইব।" কামিনীর স্বাতন্ত্র্য ছিল না—সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। কামিনীকে বুঝাইবার জন্য শ্যামাচরণ বধূর "ধূলি পায় লগ্ন" করাইয়া কামিনীকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গেল। যশোদা পাঠের ছুতা করিয়া কলিকাতায় রহিল,—সঙ্গে গেল না।

ইহার পর শ্যামাচরণ তাহার নিকট যাইলে যশোদা যেন বিব্রত হইয়া পড়িত। শ্যামাচরণ তাহা বুঝিল। বোধ হয়, যশোদা শ্যামাচরণের কলিকাতায়

অবস্থানের কথা বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বদিগের নিকট গোপন করিতেছিল। শ্যামাচরণ পুত্রাধিকস্নেহভাজন যশোদাকে সর্ব্বদা দেখিবার জন্য হৃদয়ের তৃষ্ণা হৃদয়েই রাখিল, তাহার নিকট গমন কমাইয়া আনিল। তাহাতে কেবল কষ্ট।

এই সময় প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোদা ডেপুটীর পদ পাইয়া বিদেশে চলিয়া গেল।

কর্ম্মস্থান হইতে যশোদা প্রথম প্রথম শ্যামাচরণকে পত্র লিখিত;—ক্রমেই তাহা বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। কয় দিন পত্র না পাইলে শ্যামাচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিত—পত্র লিখিত। ক্রমে শ্যামাচরণ পত্র না লিখিলে আর যশোদার পত্র আসিত না। যশোদা শ্যামাচরণকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিল না,—শ্যামাচরণের দুঃখ ঘুচিল না।

গৃহে যাইয়াও শ্যামাচরণের শান্তি নাই। কামিনী বধূকে আনিবার জন্য জিদ করে—অভিমান করে। শ্যামাচরণ তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইবে? সেই দারুণ দুঃখের কথা বলিয়া কামিনীকে ব্যথিত করিতে সে কুণ্ঠিত হইত। বিলম্বের নানা-প্রকার কারণনির্দ্দেশ করিয়া শ্যামাচরণ তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গেল। শ্যামাচরণ পৈতৃক খামারজমী বন্ধক রাখিয়াছিল। মহাজন পূজার সময় তাহাকে টাকার জন্য তাগাদা করিতে লাগিল। অনেক বলিয়া কয় মাসের সময় লইয়া শ্যামাচরণ কার্ত্তিকের প্রথমে বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিল।

৭

পৌষের প্রথমে কামিনীর জ্বরের সংবাদ পাইয়া শ্যামাচরণ বাড়ী গেল; যাইয়া দেখিল, কামিনী অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কার্ত্তিক মাস হইতে তাহার জ্বর; সে গ্রাহ্য করে নাই, তাহাকে সংবাদও দেয় নাই। এখন শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া শ্যামাচরণ উদ্বিগ্ন হইল, নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ডাক্তার আনাইল। ডাক্তার সাত আট দিন ঔষধ দিলেন; কোন ফল ফলিল না। কামিনী দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন শ্যামাচরণ অধিক শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে পৈতৃক জমাজমীর নিজের অংশ বিক্রয় করিল, ঋণশোধ করিয়াও কিছু অর্থ হাতে রহিল। শ্যামাচরণ কামিনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল।

কলিকাতার একটি বহুজনাকীর্ণ বাড়ীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শ্যামাচরণ বাস করিত। মেজে আর্দ্র, প্রাচীরগাত্র বহু দূর পর্য্যন্ত সিক্ত—বালুকা খসিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র কক্ষে কামিনী যেন হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার পল্লীগৃহ পরিচ্ছন্ন, শুষ্ক, আলোকোজ্জ্বল, বায়ুহিল্লোলস্নিগ্ধ। সে গৃহের সহিত এ গৃহের কি প্রভেদ!

শ্যামাচরণ ডাক্তার আনিল। তিনি দেখিয়া বলিলেন, রোগিণী ম্যালেরিয়া জ্বরে জীর্ণা। প্রথম কয় দিন শ্যামাচরণ সর্ব্বদাই পত্নীর নিকটে থাকিত। কিন্তু সামান্য অর্থ ছিদ্রকুম্ভের বারির মত শেষ হইতে লাগিল। তখন শ্যামাচরণকে আবার অর্থের জন্য বাহির হইতে হইল। দরিদ্রের অনেক জ্বালা। সে যতক্ষণ নিকটে না থাকিত, ততক্ষণ কামিনীর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইত। শ্যামাচরণের কেবল মনে হইত, অর্থাভাবে কামিনীর যথেষ্ট চিকিৎসা করাইতে পারিতেছে না।

মাসাধিককাল চিকিৎসা চলিল—কোন সুফল ফলিল না। শেষে শ্যামাচরণ ও কামিনী উভয়েই বুঝিল, দিন ফুরাইয়াছে। শ্যামাচরণের দুর্দ্দশাদাবানলদগ্ধ জীবনে সকল আশার আলোক যেন নিবিয়া যাইতে লাগিল।

শেষে কামিনী এক দিন বলিল, "তুমি যশোদাকে আসিতে লেখ। তাহাকে আনিয়া দাও। আমি মরিবার আগে তাহাকে একবার দেখিব।"

শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া শ্যামাচরণ বালকের মত কাঁদিল, তাহার পর মন স্থির করিয়া যশোদাকে পত্র লিখিয়া কামিনীর শেষ ইচ্ছা জানাইল।

ইহার দুই দিন পরে পূর্ণিমা। কামিনীর জ্বর বাড়িল। সে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "যশোদা কবে আসিবে?" শ্যামাচরণ বলিল, "শীঘ্রই আসিবে।"

কামিনী জ্বরঘোরে সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িল। অজ্ঞান অবস্থায় সে কেবল যশোদার কথা বলিতে লাগিল—যখন শ্যামাচরণ যশোদাকে তাহার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ের কথা।

সেই দিন নিশাশেষে কামিনীর জীবনদীপ মৃত্যুর ফুৎকারে নিবিয়া গেল। শ্যামাচরণের সব শেষ হইল।

* * * * *

কামিনীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া যশোদা যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা কামিনীর মৃত্যুর পর শ্যামাচরণের হস্তগত হইল। শ্যামাচরণ তাহার উত্তর দিল না।

তাহার পনর দিন পরে ছুটী লইয়া যশোদা কলিকাতায় আসিল—শ্বশুরালয়ে উঠিল।

শ্যামাচরণের সহিত যশোদার যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন যশোদার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। প্রকৃতি সময় সময় কৃত্রিমতার সকল আবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। যশোদা শৈশব হইতে কামিনীর ক্রোড়ে পালিত—তাহার

মৃত্যুতে যশোদা হৃদয়ে সত্য সত্যই বেদনা অনুভব করিতেছিল। কিন্তু শ্যামাচরণের আহত অভিমান গুরুভার প্রস্তরের মত তাহার অশ্রুর উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ের অশ্রুপ্রবাহ মিশিল না—উভয়ের মধ্যে বর্দ্ধনশীল ব্যবধান দূর হইল না। যে সুযোগ আপনি আসিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল।

ইহার পর যশোদা প্রায় প্রত্যহ শ্যামাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিত। কিন্তু কেহই যেন কথা খুঁজিয়া পাইত না।

শ্রাদ্ধের দিন যশোদা শ্যামাচরণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেল। শ্রাদ্ধ শেষ হইল। গৃহে ফিরিবার সময় শ্যামাচরণের গৃহদ্বারে যশোদা তাহাকে কয়খানি নোট দিল।

শ্যামাচরণ কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; সেই কয়খানি নোট বহুবার নাড়া চাড়া করিয়া কেবল কাঁদিল। যশোদার মাতৃবিয়োগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িল! যশোদার শৈশব হইতে বাল্য, বাল্য হইতে যৌবন, সে যেন সবই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিল। আর কামিনীর স্নেহ ও স্বার্থত্যাগের কথা বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া শ্যামাচরণের হৃদয়ের ভার যেন কিছু লঘু হইল। তখন সে উঠিল—দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হইল।

শ্যামাচরণ যশোদার শ্বশুরের গৃহে উপনীত হইল। ভৃত্যকে দিয়া যশোদাকে ডাকাইল। যশোদা আসিলে শ্যামাচরণ সেই অশ্রুসিক্ত নোট কয়খানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়াছে; টাকার আমার আর আবশ্যক নাই।"

যশোদা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ গলি ছাড়াইয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল।

কুসুম।

নলিন ও পরেশের কলিকাতার নিম্নবাহিনী ভাগীরথী ভিন্ন অন্য কোনও নদীর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। প্রাবৃটপ্রসন্না পদ্মার অকূল জলবিস্তার দেখিয়া তাহারা সহজেই চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে আবার ঝড়!

শঙ্কিতচিত্তে বন্ধুদ্বয় 'ছই'য়ের বাহিরে আসিয়া দেখিল, পদ্মা ফেনপুঞ্জে মণ্ডিতা।—যেন নন্দনচারিণীগণের চেলাঞ্চলচ্যুত শুভ্র পুষ্পরাশি পদ্মাবক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম চক্রবালনিম্নে সূর্য্যকিরণে জলরাশি রঞ্জিত। রক্তাংশুকের ন্যায় একটি রক্ত আভা তাহাদের নৌকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। পদ্মা তখন উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে নৃত্যশালা।

অদূরে, ইলিশ-মাছ বোঝাই একখান 'ছাঁদি' নৌকায় দিনান্তে জালুকেরা গৃহে ফিরিতেছিল। বিপদ আসন্ন বুঝিয়া তাহারা পুনরায় 'বেড়জাল'খানা ফেলিয়া দিল। 'বেড়জাল' ফেলিতে পারিলে ছাঁদি নৌকার আর কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

নলিন ও পরেশ উভয়েই তখন কিনারায় নৌকা লাগাইবার জন্য মাঝিকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মাঝি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল, পদ্মার 'ভাঙ্গন' কূলে নৌকা লাগান বিপজ্জনক। উপায়ান্তরহীন বন্ধুদ্বয় তখন অগত্যা কোনও নিরাপদ স্থানের প্রতীক্ষায় রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মাঝি একটা 'জুলি'র মধ্যে নৌকা লইয়া গেল। কিন্তু সেখানেও বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল না। এক একবার এক একটা দম্‌কা বাতাস আসে, আর সুর-চড়ান বেহালার তাঁতের মত নৌকার কাছি টন্ টন্ করিয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া বন্ধুদ্বয়ের নৌকায় থাকিতে সাহস হইল না। মাঝিকে একটা আশ্রয়ানুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দিল।

মাঝি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, নিকটবর্ত্তী হাটের এক মুদীর দোকানে তাহাদের থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

২

ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। মাঠের মধ্য দিয়া পথ। মাঝে মাঝে এক একটা 'বন্যা' ও 'হিজল' গাছ। পথে, কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও কাদায় পা ডুবিয়া যায়। অতি কষ্টে নলিন ও পরেশ মুদীর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরখানি বেশ পরিচ্ছন্ন। উপরে 'ছনে'র ছাউনি ; চারি দিকে 'চাঁচে'র বেড়া। এক কোণে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। গৃহের সামান্য তৈজস-পত্রগুলির শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের মধ্যে নিপুণ গৃহিণীপনার পরিচয় সুস্পষ্ট।

গৃহের এক প্রান্তে মাচার উপর একটি শয্যা। সেই শয্যায় এক জন শয়ান। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি যুবতী তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছিল। যুবতী আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া, ঘোমটা টানিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

দাঁড়ের উপর একটি কাকাতুয়া ঘুমাইতেছিল। অপরিচিতের সাড়া পাইয়া কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বন্ধুদ্বয় শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, শয্যায় এক জন পীড়িত,—বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুইটি নিমীলিত। তাহারা দুই একবার রুগ্নকে ডাকিল, কোনও উত্তর পাইল না।

এমন সময় স্ত্রীলোকটি এক ঘটি জল ও একখানি গামছা ঘরের মেঝেয় রাখিয়া গেল। বন্ধুদ্বয় হাত পা ধুইয়া আসিল। এক পাশে গোটা দুই তিন কেরোসিনের বাক্স পাতা ছিল, তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

স্ত্রীলোকটি তখন ঝিনুকে করিয়া রুগ্নকে দুধ খাওয়াইতেছিল। দুধ খাওয়ান শেষ হইলে সযত্নে রোগীর মুখ মুছিয়া দিয়া গায়ের কাঁথাখানি ভাল করিয়া মুড়িয়া দিল। তার পর রোগীকে ব্যজন করিতে লাগিল।

যাহাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে, তাহারা কেহ কোনও কথা কহে না দেখিয়া, পরেশ মনে মনে একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। নলিনের কানে কানে বলিল, "কৈ, এরা কেউ ত কিছু বলে কয় না।"

নলিন বলিল, "সে জন্য এত আক্ষেপ কেন? রাত্রে থাকিবার মত একটু স্থান পাইয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। তা ছাড়া দেখছ এক জন রুগ্ন। অপরটি স্ত্রীলোক,—বিশেষ,—"

প। তুমি যে ইতিমধ্যেই বিশেষের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হ'লে দেখছি। তা—এমন যখন অবস্থা, তখন অমন কলাবউটি সেজে থাকার চেয়ে আমাদের আশ্রয় না দিলেই হ'ত।"

বিপন্নাবস্থায় আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য যে তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য, নলিন তাহার বন্ধুকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিবে, মনে করিতেছিল। কিন্তু পরেশ এক কথায়, মুখবন্ধের প্রারম্ভেই, নলিনের মুখবন্ধ করিয়া দিল।

কথায় পরেশকে আঁটিয়া উঠা দায়।

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর পরেশ উঠিয়া একেবারে পীড়িতের শয্যার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিয়া শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

সরলপ্রকৃতি পরেশ সর্ব্বত্র সপ্রতিভ। তাহার কথাবার্ত্তায় আলাপ আচরণে এমন একটি সরল সচ্ছন্দ ভাব ছিল যে, নিতান্ত অপরিচিত লোকের মধ্যেও সে অতি সহজে নিজের ব্যক্তিত্বটাকে বিশেষিত করিয়া তুলিতে পারিত।

পরেশ রুগ্নকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ? কতদিন ভুগিতেছ?"

সে কোনও উত্তর দিল না। কাতরদৃষ্টিতে অতিথির মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

পরেশ ভাবিতেছিল, লোকটা কালা না কি?

স্ত্রীলোকটি তখন সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল যে, এক বৎসর হইল, রোগে ইহার বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পরেশ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এর কে হও?"

সে কোনও উত্তর দিল না। অবনতমুখী হইয়া রহিল।

"তোমার স্বামী?"

স্ত্রীলোকটি সসঙ্কোচে মস্তক অবনত করিয়া দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় হাটের 'পিঠালিপোড়া' গাছ হইতে 'কুরুলিয়া' পাখী 'কঃ-কঃ' শব্দে প্রহর ডাকিয়া উঠিল।

পরেশ ধীরে ধীরে নলিনের পাশে আসিয়া বসিল; কহিল, "কি হে! তুমি ধ্যানমগ্ন না কি!"

নলিন অন্যমনস্ক ছিল। পরেশের কণ্ঠে চমকিয়া উঠিয়া একটু অপ্রতিভ-ভাবে কহিল, "কাকাতুয়াটি বেশ।"

পরেশ নলিনের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি বুঝি এতক্ষণ কাকাতুয়ার ধ্যানে মগ্ন ছিলে! কাকাতুয়ার স্বামিনীকে দেখ্‌লে না!"

নলিন সত্যই এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে কাকাতুয়াটি দেখিতেছিল। বিরহী যেমন কোনও ব্যক্তিতে প্রিয়জনের কোন সাদৃশ্য দেখিলে একাগ্রচিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া থাকে, নলিন তেমনই ভাবে কাকাতুয়াটির পানে চাহিয়াছিল। তাহাদের আশ্রয়দাত্রীর সঙ্গে পরেশের যে কথা হইয়াছিল, তাহার কিছুই সে শুনিতে পায় নাই। এখন সমস্ত শুনিয়া সে বিস্মিত হইল। আজ এক বৎসর এই দুঃখিনী একাকিনী এই রুগ্ন রুদ্ধবাক্ দরিদ্র স্বামীর সেবায় নিবিষ্ট!—ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ কড় কড় শব্দে অনতিদূরে একটা বজ্রপাত হইল। বিদ্যুৎবিভায় গৃহাভ্যন্তর মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইল। বন্ধুদ্বয় শিহরিয়া উঠিল। কাকাতুয়াটা 'ক্যাঁ, ক্যাঁ' করিতে করিতে দাঁড়ের নীচে ঝুলিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটি ছুটিয়া আসিয়া, জননী যে আগ্রহে শিশুসন্তানকে বুকের ভিতর টানিয়া লয়, তেমনই আগ্রহে তাহার পীড়িত অশক্ত স্বামীর শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেল। বুঝি তাহার

ইচ্ছা, বিশ্বের সমস্ত বিপত্তি হইতে এমনই করিয়া সে চিরদিন তাহার রুগ্ন স্বামীকে রক্ষা করিবে!

নলিনের বোধ হইতেছিল—মাতৃত্বের একটি স্নিগ্ধ ফল্গুধারা অনুক্ষণ এই সেবাপরায়ণা সাধ্বীর অন্তরতল অভিষিক্ত করিতেছে।

শৈশবে মাতৃহীন নলিনের হৃদয় আজ স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

৩

পাশের ঘরে নলিন ও পরেশের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার এক ধারে একখানি ছোট মুদীখানা। অপর দিকে একখানি তক্তপোষের উপর একটি সামান্য শয্যা। বন্ধুদ্বয় শুইয়া 'সিগারেট' টানিতেছিল।

পরেশ কহিল, "এ যাত্রা কিন্তু খুব রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। আর একটু হইলেই গৃহিণীদের সিঁথির সিন্দুর হাতের নোয়া ঘুচিয়া যাইত।"

বেড়ার আড়ালে যেন চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হইল।

নলিন পরেশের কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "শুনচ, পরেশ! মাঝির বিরহ!"

নৌকায় মাঝি তখন 'ভাটিয়াল' ধরিয়াছিল :—

"আলগা চুল কপালের উপার উবা কইরা থুইয়া
কানছিতে খাড়াইয়াছিল কাজলা চ'খে চাহিয়া
ও সে কি সুন্দর চ'খ—"

পরেশ শুনিয়া একটু হাসিল। বলিল, "না হ'বে কেন? কেমন চড়ণদার তার নৌকায়—"

কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া উঠিল। বন্ধুদ্বয় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

৪

প্রভাতে নলিনের ঘুম ভাঙ্গিল। কিন্তু নিদ্রার জড়তা তখনও দূর হয় নাই। পরেশের তখনও নাসিকাধ্বনি হইতেছিল।

এমন সময় পাশের ঘর হইতে কাকাতুয়াটা বলিয়া উঠিল, "মা'জি! বাবু আয়া।"

সুপ্তি-সিক্ত নয়নদ্বয় উভয় হস্তে মার্জ্জন করিয়া স্পন্দিতহৃদয়ে নলিন শয্যায় উঠিয়া বসিল।

ঘরে অন্য কেহ ছিল না। একটা বিড়াল বস্তার উপর বসিয়াছিল। সে আস্তে আস্তে নামিয়া দোকানের মাচার নীচে প্রবেশ করিল।

কাকাতুয়াটা আবার বলিয়া উঠিল—"ওগো! বেলা হয়েছে—ওঠ না।"

বিস্মিত স্তম্ভিত নলিনের তখন আর একটা কাকাতুয়ার কথা মনে হইতেছিল। সে কাকাতুয়াটাও এই সকল বুলি বলিত!

এই সময়ে পরেশের ঘুম ভাঙ্গিল। সে নলিনের মুখের দিকে চাহিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "নলিন, তোমার কি কোনও অসুখ বোধ হচ্চে?"

নলিন কি উত্তর দিবে? অতীতের স্মৃতিতে তাহার চিত্ত তখন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখে কথা সরিল না।

নলিনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পরেশ যখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নলিন পরেশের নিকট কাকাতুয়ার রহস্যটি ব্যক্ত করিল। বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

পরেশ একটু হাসিল। বলিল, "ছি! তুমি এখনও তাহাকে ভুলিতে পার নাই?"

নলিন কাহাকে ভুলিবে? সেই উদ্ভিন্ন যৌবনের উল্লসিত রূপ, বসন্তের জলজলতিকার মত স্নিগ্ধ অঙ্গলাবণ্য, সেই মুগ্ধবিহ্বল দৃষ্টি।—হায়, সে সব কি ভুলিবার!—

শিশু সূর্য্যের সোনালি কিরণ তখন, পিচকারীর ধারার মত, বেড়ার ছিদ্র দিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষকেরা হলস্কন্ধে গরু তাড়াইতে তাড়াইতে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়াছে। মেঘমুক্ত প্রকৃতির মুখ প্রফুল্ল—প্রসন্নহাস্যে সমুজ্জ্বল।

এমন সময় নৌকার মাঝি আসিয়া জানাইল, বেলা হইলে বাতাস উঠিতে পারে।

আর বিলম্ব করা অসঙ্গত মনে করিয়া বন্ধুদ্বয় উঠিয়া পড়িল। আশ্রয়দাত্রীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিল যে, রমণী গৃহে নাই। তাহারা এ দিক ও দিক একটু অনুসন্ধান করিল; অবশেষে কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, রুগ্নের শিয়রে কয়েকটি টাকা রাখিয়া, তাহারা চলিয়া গেল।

৫

পাঁচপীরের নাম স্মরণ করিয়া মাঝি নৌকা খুলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একটি কৃষকবালক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া নলিনের রূপার সিগারেট-কেসটি ও যে টাকা কয়টি তাহারা রুগ্নের শিয়রে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই টাকা কয়টি তাহার হাতে দিয়া, এবং সকলের বিস্ময়ের মাত্রা সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তখনই আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সিগারেট-কেসটি যেন নলিন ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পীড়িতের সাহায্যার্থ তাহারা যে টাকা কয়েকটি দিয়া আসিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিবার তাৎপর্য্য বন্ধুদের কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

নৌকা 'জুলি'র মধ্য হইতে পদ্মায় আসিয়া পড়িল। বীচিমালিনী পদ্মা তখন শান্ত, স্থির। তীরে রাখালবালকেরা কলের জাহাজ দেখিবার আশায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নলিন 'ছই'য়ের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইবার অভিপ্রায়ে সিগারেট-কেসটি খুলিয়াই দেখিতে পাইল, তাহার মধ্যে একখানি কাগজ। দেশলায়ের বাক্সটি কোলের উপর রাখিয়া নলিন ধীরে ধীরে কাগজ-খানির ভাঁজ খুলিল। খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

কাগজখানিতে লিখিত ছিল,—

"তোমার কাছে পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পোড়া কাকাতুয়াটার জন্য দেখিতেছি সবই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

"আসিবার সময় লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, 'আমি একবস্ত্রে চলিলাম'— কিন্তু কাকাতুয়াটাকে যে আমি লইয়া আসিয়াছিলাম, তাড়াতাড়িতে সে কথা লিখিতে মনে হয় নাই। যদি কাকাতুয়াটাকে না আনিতাম! অথবা আগে থাকিতে যদি এটাকে কোথাও সরাইয়া রাখিতাম!—

"আমাকে তুমি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলে না। নিঃশব্দে চলিয়া গেলে। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। এই পীড়িত ব্যক্তি যে আমার স্বামী, তাহা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করিতে পার নাই। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, আজ সে সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিব; তোমাকে না বলিয়া না কহিয়া হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছিলাম, সে জন্য তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। কিন্তু সাহস হইল না।

"যাক্, একটা কথা আজ তোমাকে জানাইতেছি। আমার বিবাহ হইয়াছিল। তুমি তাহা জানিতে না। আমি জানিলেও, স্বামী কেমন, জীবিত কি মৃত, তাহা কিছুই জানিতাম না। পরে তাহা জানিয়াছিলাম। অর্থের লোভে মা চাতুরী করিয়া তাহা আমাকে জানিতে দিতেন না। হায়, যদি কোনও গৃহস্থের ঘরে জন্মিতাম!

"আশীর্ব্বাদ কর, যেন শীঘ্র মরি। কিন্তু স্বামীর আগে নয়। আমি আগে মরিলে এ অবস্থায় তাঁহাকে কে দেখিবে?

"হতভাগিনীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।

কুসুম।"

* * * * *

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নলিন তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার বোধ হইল, দূরে—সেই মুদীর দোকানের পার্শ্বে এক নারীমূর্ত্তি তাহাদের নৌকার দিকে চাহিয়া আছে।

গরুর গাড়ী।

গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের গ্রামের পাশ দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, ছোট ছোট মালগাড়ী রেলের মালমশলা সাজসরঞ্জাম আনিয়া ফেলিতেছে। দেশের ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মনে উৎসাহ ও উল্লাস, বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা হইবে, 'ছয় দণ্ডে চলে যাবে ছ' দিনের পথ।' অনেকে উৎসাহভরে আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, 'এ বছর যা কষ্ট পেলে, আস্‌ছে বছর আর গরুর গাড়ীর কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইবে না, একেবারে রেলগাড়ীতে আমাদের গ্রামের মাঠে আসিয়া নামিবে।' কথাটায় আমার কিন্তু আশ্বাস না হইয়া কেমন একটা আপ্‌শোষ হইল; প্রাণটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল, হায়! ইংরাজী সভ্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লয় পাইতেছে; বহুবিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধপ্রথা জাতিভেদপ্রথা একান্নবর্ত্তিপরিবারপ্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চকমকির স্থান 'বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী' দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অম্বুরী খাম্বিরা ছাড়িয়া আজ ভারতবাসী মার্কিনের বার্ডসাই ফুঁকিতেছে; আবার বুঝি বিধিবিড়ম্বনায় আমাদের সনাতন ঋষিগণের উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যান গরুর গাড়ীও বিলয়প্রাপ্ত হয়। হায়! কি কুক্ষণেই পলাশীর ময়দানে বিচিত্র সমর অভিনয় হইয়াছিল।

বাস্তবিকপক্ষে, গরুর গাড়ী যেন আমাদের ভারতের নিতান্তই অন্তরঙ্গ, 'আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়'। আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'যাদৃশী দেবতা তস্যাস্তাদৃশ্

ভূষণবাহনম্'। কথাটা বড় পাকা। প্রকাণ্ডকায় মন্থরগতি গম্ভীরবেদী হস্তী, মাংসপিণ্ড স্থূলোদর জড়ভরত জমীদার জাতির উপযুক্ত বাহন। নরস্কন্ধবাহিত আবৃতদ্বার শিবিকা, সুভগপুরুষহৃদিবাসিনী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠনবতী কুলনারীর উপযুক্ত বাহন। কঙ্কালসার-অশ্বিনীকুমারযুগল-সংযোজিত কেরাঞ্চী গাড়ী, কলিকাতার কর্ম্মক্লিষ্ট কৃশকায় কেরাণীকুলের উপযুক্ত বাহন। অবিরতঘূর্ণিতনেমি দ্বিচক্রযান আত্মনির্ভরক্ষম 'হস্তপাদাদিসংযুক্ত' উষ্ণশোণিত নব্যসম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাহন। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বাষ্পের জোরে, তাড়িতের বলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বায়ুবেগে ছুটে ; এ সকল যান, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী অবিশ্রান্তকর্ম্মা ধরাবিদ্রাবকারী রাজসিক য়ুরোপীয় জাতির উপযুক্ত বাহন। তেজীয়ান্ ত্বরিতগতি তুরঙ্গম, বীরবিক্রান্ত যুদ্ধব্যবসায়ী তামসিক রাজপুত জাতির উপযুক্ত বাহন ; 'হঠ ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ হঠ সদা গতি, সদাগতি পরাভূত তায়'। আর শমদমাদিগুণালঙ্কৃত সাত্বিক ভারতীয় ব্রাহ্মণ প্রকৃতির উপযুক্ত বাহনই গোযান। যেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা 'গোব্রাহ্মণহিতায় চ' এই অপূর্ব্বযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর আরাধ্য দেবদেব মহাদেব পরমযোগী কর্ম্মমুক্ত, বৃষভাসনে সমারূঢ়। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী' ; ভক্ত দেবতার উপরও এক কাঠী চড়িয়াছেন। বৃষভপৃষ্ঠে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া লগুড়দণ্ডে বারংবার বৃষভরাজকে তাড়না করিলে সমাধিভঙ্গের ভয় আছে, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইবার পথে বিঘ্ন আছে। তাই বলীবর্দ্দযুগলের পশ্চাতে যষ্টিহস্ত সারথি ও অপূর্ব্ব বংশময় যান স্থাপিত করিয়া সাত্বিক আরোহী দারুব্রহ্মের ন্যায় নিশ্চল, যেন জগৎসংস্থিতিকারণ নারায়ণ ক্ষীরোদশয্যায় অনন্ত শয়নে কোটিকল্প ধরিয়া যোগনিদ্রায় বিভোর।

যতই চিন্তা করি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত বড় পরিষ্কাররূপে খাপ খায়। রেলগাড়ীর সব দিকেই আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি। রেলগাড়ী চলিবে, তাহার জন্য রেল পাতিতে হইবে, রাস্তা তৈয়ার করিতে হইবে। সেই রেল হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইলেই প্রাণসংশয়, রেলের উপর কোনও কিছু থাকিলে তখনই বোঝাই ট্রেন পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে, রাস্তা বেমেরামত থাকিলে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের গমনাগমন বন্ধ। তাহার পরে, রেলের গাড়ীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে, তাহাকে হুঁসিয়ার করিতে, তাহার জল কয়লা সরবরাহ করিতে, অসংখ্য লোক ও অবিরত বন্দোবস্তের দরকার।

রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য থামিবে, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে। কঠোর ব্যবস্থা, 'পদে পদে নিয়ম অধীন'। ঠিক বিলাতী সমাজের সভ্যতার অনুরূপ, সেই পোষাক পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, সেই কলার নেক্‌টাই বেল্‌ট গার্টারের কসাকসি, সেই ডিনারটেব্‌লের ড্রয়িংরুমের এটিকেটের আঁটাআঁটি, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতির বাঁধাবাঁধি। এক পাও স্বাধীনভাবে ইচ্ছাসুখে এগোবার যো নাই।

গরুর গাড়ী হিন্দুসমাজের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক; জলে, জঙ্গলে, বনে বাদাড়ে, পথে অপথে, ইহার অপ্রতিহত গতি; 'হাট-বাট-ঘাট-মাঠ ফিরি ফিরিছে বহুদেশ'। ইহা নিয়মের, কড়া আইনের, নাগপাশে বাঁধা নহে। ধীরে ধীরে নীরবে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিচারে ইহা সর্ব্বস্থানে গতায়াত করিতেছে। বিশাল বিরাট হিন্দুসমাজ যেমন 'গুঁড়ি কাষ্ঠ নুড়ি শিলা', ঘেঁটুমনসা, শীতলা, ওলাবিবি, ষষ্ঠীবুড়ী, কলাবৌ হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল দেবতা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিশেষে অঙ্কে স্থান দিয়া ধীর স্থির গতিতে ধ্রুব লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেইরূপ গরুর গাড়ীও শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বালুকাময় নদীপুলিনে, তুঙ্গ শৈলশিখরে, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, গভীর খাতে, পঙ্কিল জলাভূমিতে, সমান প্রীতির সহিত ধীর সংযত গতিতে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সমাজ ও যান উভয়ই শান্তি ও প্রীতির লীলাস্থল। পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয় সমাজ বাষ্পীয় এন্‌জিনের ন্যায় রক্তনেত্রে উদ্দাম উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে; আর অণুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে উপনীত হইতেছে। কলুষিত প্রবৃত্তি, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, বিজাতীয় উৎসাহ, মর্ম্মবেদনাকর অতৃপ্তি, য়ুরোপীয় প্রকৃতির ভালে কলঙ্কের কালী লেপিয়া দিতেছে, এন্‌জিনের কৃষ্ণাঙ্গার অবিশ্রান্ত ধূমোদ্গার করিয়া আকাশমণ্ডল কালিমাবৃত করিয়া দিতেছে। যান ও সমাজ উভয়েই অশান্তি ও অপ্রীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাই বলিতেছিলাম, গরুর গাড়ী, শুদ্ধশীল সাত্ত্বিক ভারতীয় প্রকৃতির সুসদৃশ।

• •

যাক্, ও সব অধ্যাত্মতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া একবার রেলগাড়ী ও গরুর গাড়ীর সুবিধা অসুবিধার কথাটা বিচার করি। রেলগাড়ীতে বারমাস ত্রিশদিন সমান লোকের ভিড়। একটু পা ছড়াইয়া বসি, বা গা মেলিয়া শুই, তাহার যো নাই। গরুড় পক্ষীর মত হাঁটু উঁচু করিয়া বসিয়া আছি, হাঁটু নামাইলেই সহযাত্রীদের পেটরার খোঁচায় কাপড় ছিঁড়িয়া বা গা ছড়িয়া যাইবে। আশে পাশে গাদা করা

বস্তা, সম্মুখে কয়েক জন 'দেশওয়ালী' দাঁড়াইয়া আছে, শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে। বেঞ্চিতে পিছনে ছাতা লাঠী ছিঁচ্‌কে প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র, একটু পিছাইলেই 'শূলে' যাইবার আশঙ্কা। ডাহিনে 'চাচাসাহেব' থাকিয়া থাকিয়া জৃম্ভন করিতেছেন, পিঁয়াজ রশুনের গন্ধে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে। বামে মাড়োয়ারী মহাজনের কাঁইমাই চীৎকারে কাণ ঝালাপালা হইতেছে। বায়ুবেগে কয়লার গুঁড়া উড়িয়া আসিয়া চোখে পড়িতেছে। কাঠের বেঞ্চের কোমল পরশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, অথবা শতরঞ্জি-মোড়া গদীর কেল্লা হইতে ছারপোকাকুল অঙ্গে শেল হানিতেছে। যদি বা একটু তন্দ্রা আসিল, অমনই কাঠের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া চৈতন্যলাভ হইতেছে, অথবা 'চাচাসাহেবে'র কোমলামন্ত্রণে ম্লেচ্ছসংস্পর্শের ফল হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। কোনও কোনও গাড়ীতে নিদ্রার সুবিধার জন্য ঝুলান বেঞ্চি আছে, কিন্তু উঠিতে নামিতে মাথাফাটার ভয় বিলক্ষণ আছে, অসহিষ্ণু সহযাত্রিবর্গের উত্তমাঙ্গে পাদুকাসঞ্চারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, জীমন্যাষ্টিক না জানিলে উঠা নামা অসাধ্য। ইহার উপর আবার ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে যাত্রীদের উঠানামার ভিড়, পেটরা টানাটানির হিড়িক; নবাগত যাত্রী তাড়াতাড়িতে গায়ের উপর দিয়া জুতা চালাইলেন, মাথার উপর পেটরা নামাইলেন; এ সব তো ফাউ, বোঝার উপর শাক আঁটিটা। যতক্ষণ থাকিব, নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া থাকিতে হইবে, ষ্টেশনে নামিবার অবসর নাই, পাছে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, আমাকে ফেলিয়া যায়, 'সদা মনে হারাই হারাই'। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াও স্বস্তি নাই, নামিবার সময় অসাবধানতার জন্য সহযাত্রীদের ভ্রূকুটি, তাঁহাদের নিকট সবিনয় এপলজি, মুটে ডাকাডাকি, পেটরা বাক্স নামাইবার তাড়াহুড়া, সেই উপলক্ষে সহযাত্রী মহাশয়দিগের নিকট আর একপ্রস্থ এপলজি। গাড়ী হইতে নামিয়াই অস্থাবর সম্পত্তি নামাইবার জন্য মেয়েকামরায় ছুটাছুটি, অবগুণ্ঠিতাদের ভিতর হইতে নিজের মাল সনাক্ত করা, এবং পরিশেষে রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইতে করাইতে ক্যাসবাক্সধারিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খালাস করা। চকিতের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। নতুবা দাম্পত্যবন্ধনে চিরবিচ্ছেদ!

আর গরুর গাড়ী? 'হেথা সুবিমল শান্তি অনন্ত বিশ্রাম'। লোকের ভিড় নাই, কোনও হাঙ্গামা নাই, কাহারও সহিত সঙ্ঘর্ষণ হইবার আশঙ্কা নাই। I am monarch of all I survey, My right there is none to dispute. পরমুখাপেক্ষী হইয়া যাত্রিসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন

দিতে হইবে না। পুরু বিচালীর উপর তেলোক পাতিয়া তোফা লম্বা হইয়া গা পা ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া আছি। উঠিলে মাথা ঘুরিবে, বসিলে বমনোদ্রেক হইবে, দাঁড়াইলে পতন অবশ্যম্ভাবী, এ স্থলে 'শয়নে পদ্মনাভ' ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সূত্রকার ভবিষ্যৎ অভিধানে লিখিবেন, 'যে যানে চড়িলে শয়ন করিয়া থাকা অনিবার্য্য, তাহারই নাম গোযান'। পেটরা বাক্স সব গাড়ীর পিছনে, যানের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতেছে। তাহার উপর পা তুলিয়া দিয়া শরীরের ভার লঘু করিতেছি। গাড়ীর মন্থরগতিতে ঈষদান্দোলিত চ্যাঙ্গারী মৃদু বায়ুহিল্লোল তুলিয়া টানাপাখার কাজ করিতেছে। বামপাশে তেলের চোঙ্গা অবিরাম এধার ওধার দুলিয়া পেন্‌ডুলমের ন্যায় সময় নিরূপণ করিতেছে। ডাহিনে ছইয়ে গোঁজা কাস্তে Feudal castleএর ভিত্তিলম্বিত যুদ্ধাস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উপরে বিচিত্র বাকারীনির্ম্মিত ছই চন্দ্রালোকে অট্টালিকার কড়িবরগার ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। নীচে ঝুলান ছালাবন্দী থালা ঘটী বাটী দুন্দুভিনিনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। গাড়ীর মৃদুমন্থরগতি ও তজ্জনিত মৃদুমন্দ শব্দ, 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' নূপুরচরণা বরাঙ্গনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মুহুর্মুহু আন্দোলিত কর্দ্দমগোময়লিপ্ত গোপুচ্ছ কপোলদেশে হরিচন্দনের ছিটা দিতেছে। গাড়োয়ানরূপী সচ্চিদানন্দ হুঙ্কাররবে প্রণব উচ্চারণ করিতেছেন, আর আমি 'বাঁশের দোলাতে উঠে' 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্করে'র কথা ভাবিয়া পরমার্থতত্ত্বে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। কি ভূমা আনন্দ, কি বিমল শান্তি, কি প্রগাঢ় যোগাভ্যাস! স্থানে অস্থানে আপন এক্তিয়ার মত যেখানে সেখানে যতক্ষণের জন্য ইচ্ছা থামাইতে পারি, যেথানে সেখানে যতক্ষণের জন্য ইচ্ছা চালাইতে পারি। সাধ পূরিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি; রেলগাড়ীর ন্যায় নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া দর্শন ও উপভোগের বিঘ্ন জন্মাইতেছে না। 'যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্।' এ যেন ঠিক মনোরথগতি পুষ্পক রথ।

আর যদি এই শকটে যুগলমূর্ত্তিতে বিরাজ কর, তবে তো সে মণিকাঞ্চন যোগ। স্থানের পরিসর, শরীরের অবস্থান ও যানের গতি, এই তিনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এ স্থলে অনন্ত অবিচ্ছিন্ন মিলন অবশ্যম্ভাবী, মান অভিমান বিরাগ বিরহের অবসরমাত্র নাই। ভীরুস্বভাবা সীতাদেবী দণ্ডকারণ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া রামচন্দ্রকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই 'নিবিড়বন্ধ পরিরম্ভ' প্রেমিক রামচন্দ্র অনেক দিন ভুলিতে পারেন নাই। আমরা বাঙ্গালী কাপুরুষ, মেঘগর্জ্জন শুনিলে

আমরাই আগে আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, তা প্রিয়াসুখস্পর্শ অনুভব করিব কি? কিন্তু গরুর গাড়ী যখন বন্ধুর ভূমিতে উচ্চ হইতে নীচে হঠাৎ অবতরণ করে, তখন পতনভীতা ব্রীড়াশীলা কুলবধূ, কতক জড়জগতের গতিবিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে, আর কতক নারীহৃদয়ের সলজ্জ সশঙ্ক অনুরাগভরে পার্শ্বস্থিত পতিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মনে রামচন্দ্রের 'দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সহচরী'র কথা উদয় করাইয়া দেন; অবসরজ্ঞ পতিও পতননিবারণের জন্য অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করেন। ধন্য রে গরুর গাড়ী, পবিত্র প্রণয়ের এমন মধুর রস তোমার প্রসাদেই বাঙ্গালী উপভোগ করিতে পারে!

এই প্রসঙ্গে আমার এক জন অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু তাঁহার অতীত জীবনের যে একটি সুখস্মৃতির পট উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বন্ধুবর লিখিয়াছেন—

"নূতন চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া 'সস্ত্রীক শকটারোহণে' প্রবাসযাত্রা করিয়াছি। জ্যোৎস্না-রাত্রে আহারাদির পর আমরা দু'জনে দুর্গা বলিয়া চড়িয়া পড়িলাম। গ্রাম্য পথ ধরিয়া কিছু দূর গিয়া গাড়ী বাঁধা রাস্তায় উঠিল। দুই ধারে অনন্তবিস্তৃত প্রান্তর। আকাশে চাঁদ সুষুপ্ত জগতে কৌমুদীধারা ঢালিতেছে। নিশার নিস্তব্ধ প্রকৃতি মনে স্বপ্নদৃশ্যের সঞ্চার করিতেছে; আধ ঘুম আধ জাগরণে দীর্ঘ পথ বাহিয়া প্রশান্তমনে চলিয়াছি। অন্তরে বিমল শান্তি ও পরিপূর্ণ সুখের উৎস খেলিতেছে। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল, তরুশাখায় পাখীরা প্রভাতী গাহিল, দেখিতে দেখিতে প্রাচীদিগ্‌বধূর 'ভালে বালার্ক সিন্দুরফোঁটা' শোভা পাইল, আর দিবালোকে আলজ্জবদনা প্রিয়ার ঘোমটায় তাঁহার কপালের সিন্দুরফোঁটা ঢাকা পড়িল। স্নিগ্ধ প্রভাতবাতসংস্পর্শে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, একটি নদী পার হইতেছি। নদীতীর হইতে গ্রাম্যসুন্দরীরা বামকক্ষে কলসী লইয়া দক্ষিণ করপল্লব আন্দোলিত করিতে করিতে গ্রামের দিকে যাইতেছে, আর ঘরকন্নার সুখের দুঃখের কথা বলিতেছে; সরল শান্তপ্রকৃতি গ্রাম্যনারী, কোনও বিলাসচাঞ্চল্য নাই, কোনও হাব ভাব নাই। মাঠে কৃষকেরা লাঙ্গল দিতেছে ও বলদের লাঙ্গুল মোচড়াইতেছে, রাখালবালকেরা গরু চরাইতেছে ও মনের আনন্দে মেঠোসুরে গান ধরিয়াছে 'ওরে রামশশী, হ'বি বনবাসী, কে আমারে ডাক্‌বে মা বলে'। বড় মিঠে লাগিল। ক্রমে বেলা হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণার বেশ উদ্রেক হইয়াছে, এমন সময় এক আড্ডায় পৌঁছিলাম। পথের ধারে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় গাড়ী রাখিয়া একখানি দোকানঘরে ঢুকিলাম। দোকানী বাড়ীর ভিতরের

একখানি ঘর নিকাইয়া চুকাইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুঁটুলি বাঁধা ডাল চাল মুন লঙ্কা হলুদ খুলিতে লাগিলাম ও যে সব জিনিসের অভাব আছে, তাহা দোকানীকে সরবরাহ করিতে বলিলাম। এ দিকে গৃহিণী দোকানীর ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া স্নানে গেলেন ও আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ণকুম্ভকক্ষে মঙ্গলময়ীবেশে আবির্ভূতা হইলেন। যথাসময়ে রন্ধন সম্পন্ন হইলে স্নানান্তে আহারে বসিলাম। কি সুন্দর রন্ধন, কি সুন্দর পরিবেশন! গৃহে কতদিন গৃহিণী রন্ধন করিয়াছেন, কিন্তু সে অন্ন ব্যঞ্জন পাঁচমিশালি, কোন্‌টুকু তাঁহার স্পর্শে অমৃতায়মান, তাহা কেহ জানিতে দেয় নাই। আজ আর দ্বিধা সংশয় করিবার যো নাই। বুঝিলাম, নূতন সংসার পাতিয়া প্রবাসে ভালই কাটিবে। আর পরিবেশনকালে, নূতন গৃহিণীপনার আনন্দে ও গুরুজনের অসাক্ষাতেও সসঙ্কোচ লজ্জায় জড়াইয়া কি এক অপূর্ব্ব মুখশ্রী! 'ভয় নাই তবু আঁখি সতত চঞ্চল'। রৌদ্রের তেজ কমিলে আবার গাড়ী যুড়িল, দুই চারি ক্রোশ যাইতেই গোধূলি আসিল; পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন, একবার আকাশের রক্তিমরাগ আর একবার প্রিয়ার মুখের লজ্জারুণ মুখশ্রী দেখিলাম, বুঝিলাম না কোন্ শোভা অধিক মনোলোভা। রাত্রি এক প্রহর হইলে আবার এক আড্ডায় পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিলাম, এবং শেষরাত্রে নূতন উদ্যমে যাত্রা করিলাম। সে রাত্রে আর রাঁধা বাড়া হইল না, এক চাষাবাড়ী হইতে খাঁটি দুধ লইয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলাম। পরদিন প্রদোষকালে প্রবাসস্থিত নূতন গৃহে পৌঁছিয়া সাদরে সংসারসঙ্গিনীকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিলাম। সে সুখের স্মৃতি আজও গরুর গাড়ীর সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। কিন্তু রেলগাড়ীর এই বিরামবিশ্রামহীন সময়সংক্ষেপকারী বেগে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য, সেই পথের বিচিত্র সুখ দুঃখ আনন্দ আবেগ সবই ভাসিয়া যাইবে। দেশভ্রমণের কবিত্বরস উঠিয়া যাইবে।" "The poetry of travelling is gone."

সুহৃদ্বরের ব্যক্তিগত সুখস্মৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও বুঝা যায়, গরুর গাড়ীর সঙ্গে যে কবিত্বরস বিজড়িত আছে, তাহা রেলগাড়ীতে নাই। রেলগাড়ীর কথা পাড়িলেই টিকিটঘরে লোকের ভিড় ও পকেটকাটার কথা, মালপত্র লইয়া কুলীর হাঙ্গামা ও ওজনদারের কারচুপীর কথা, ট্রেন ফেলের কথা, গলাধাক্কার কথা, গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকীর কথা, চলন্তট্রেণে চুরী ডাকাতী ও পাশবিক অত্যাচারের কথাই মনে পড়ে। ইহাতে

কবিত্ব নাই, রস নাই, প্রেমপ্রীতির অবসর নাই; ইহার সার কবিত্ব Iron horse, আয়স অশ্ব।

আর গরুর গাড়ী? গরুর গাড়ী প্রাচীন ভারতের সুদূর অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কি মধুর বন্ধন, কি অখণ্ড সংযোগ স্থাপন করে। ম্লেচ্ছ যবন, শক হূণ, মোগল পাঠান, ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি কর্ত্তৃক সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের বাস্তব সত্য লুপ্ত করিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। গরুর গাড়ীর নাম শুনিলেই স্মৃতিপটে ভারতের অতীতের কত বিচিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠে।

ঐ দেখিতেছি, বর্দ্ধমানক নামক বণিক্‌পুত্র দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য নামক নগর হইতে গোশকটে দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া, গৃহপালিত সঞ্জীবক ও নন্দক নামক দুই বলদ যুড়িয়া বাণিজ্যার্থ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। শকট মন্থরগতিতে স্নিগ্ধবায়ুসঞ্চালিত যমুনাকচ্ছ বাহিয়া চলিতেছে, আর বণিক্‌পুত্র শুইয়া শুইয়া পণ্যবিক্রয়লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

আবার কি দেখিতেছি? এ যে উজ্জয়িনীর রাজপথ। মানসপটে একে একে তিনটি দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এক দিকে দেখিতেছি, শর্ব্বিলক নামক ব্রাহ্মণতনয় প্রেমের মহিমায় বারাঙ্গনার ক্রীতদাসী মদনিকার বিনামূলে নিষ্ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হর্ষগদ্গদচিত্তে প্রেমপ্রতিমাকে লইয়া গোযানে চড়িয়া সুখের জীবন আরম্ভ করিতেছেন।

অন্য দিকে দেখিতেছি, অকলঙ্কচরিত্রা বসন্তসেনা চারুদত্তে সমর্পিতপ্রাণা হইয়া গোযানে চড়িয়া চারুদত্তের উদ্দেশে অভিসারে যাইতেছেন, কিন্তু 'প্রবহণবিপর্য্যয়ে' দুষ্ট শকারের হস্তে পড়িয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন।

ও দিকে গোপালদারক আর্য্যক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীতে সিংহাসনলাভ করিবেন এই আশঙ্কায়, রাজা পালক তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া 'বধূযানে' আরোহণ করিয়া আত্মসংগোপন করিতেছেন, এবং রাজপুরুষ চন্দনক ও দ্বিজ চারুদত্তের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন।

এই দৃশ্যগুলি বিলীন হইতে না হইতেই মানসপটে এক পবিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। কৌণ্ডিল্য নামক মুনিসত্তম সদ্যঃপরিণীতা শীলানাম্নী সুশীলা ভার্য্যাকে লইয়া গোযানে চড়িয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন, মধ্যাহ্নসময়ে নদীপুলিনে ব্রতধারিণী কুলনারীগণ অনন্তের ডোর ধারণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন; তাহা দেখিয়া

বিমাতার নির্য্যাতন হইতে সদ্যোনির্ম্মুক্তা বালিকা বধূ স্বামীর সৌভাগ্যকামনায় ঐ ব্রত গ্রহণ করিতেছেন, এবং ব্রতসিদ্ধি ও ভবিষ্য সুখের ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ও দিক্ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া দেখিতেছি, সম্মুখে বিরাট্ দৃশ্য। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক ঋষিগণ অশেষভূতিলাভার্থ সোমযাগ করিতেছেন; রাজা 'সোম'কে গোযানে স্থাপন করিয়া ছদিঃ (ছই) দ্বারা আবৃত করিয়া 'হবির্ধান-প্রবর্ত্তন' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, এবং উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ক্রমে স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষে ঋক্ উচ্চারণ করিতেছেন।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, ঐক্যশৃঙ্খল এই গরুর গাড়ী। হিন্দুর বাণিজ্য, হিন্দুর রাজনীতি, রাষ্ট্রবিপ্লব, হিন্দুর প্রমোদ প্রমদাপ্রীতি, হিন্দুর ব্রতাচার ধর্ম্মাচার, সকল প্রথার মধ্যেই এই গরুর গাড়ী পরিস্ফুটভাবে বিরাজ করিতেছে। আজ দৈববিড়ম্বনায় বিলাতী সভ্যতার কুহকে অন্ধ হইয়া আমরা সেই জাতীয় জীবনের চিরসহচর গরুর গাড়ীকে হারাইতে বসিয়াছি। হায় আর্য্যসন্তান!

আর না! ঐ মাঠের ধারে রেলের রাস্তায় ট্রেনের বাঁশী বাজিল। শ্যামরায়ের বাঁশীতে একদিন ব্রজবালা কুলত্যাগ করিয়াছিল। ইংরেজরাজের এই বাঁশীতে গ্রাম্যসুন্দরীদের কি দশা হইবে, কে জানে?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যদি।

১

সর্ব্বদেশের ভাষায় 'যদি' বলিয়া একটা কথা আছে। 'যদি' অতি পুরাতন কথা। 'যদি' অতি ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছে।

'যদি' অতি সামান্য কথা হইলেও ইহার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। মানবের পক্ষে 'যদি' অন্ধের নড়ি।

'যদি'র আলোচনা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতে 'যদি'র সম্বন্ধে একটা নোট করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

এক জন কবি গাহিয়াছিলেন :—

"'যদি':রে রমণীকুল হ'ত কাননের ফুল!"

হায়! হায়!

অন্য একটি কবি গাহিয়াছিলেন :—

"আগে জানতেম 'যদি' নিরবধি কাঁদাবে আমায়,
তবে কি মন প্রাণ স'পিতাম তোমায়?"

কি সুন্দর ভাব!

প্রথম কবির ইচ্ছাটি 'যদি' অবলম্বন করিয়া হাম্বারবে বনস্থলী কম্পিত করিতেছে। দ্বিতীয় কবি 'যদি'র কণ্ঠ জড়াইয়া হৃদয়ের অসহ্য বেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা তাই ভাবি, 'যদি'টা কি? যদির উৎপত্তি কোথায়? 'যদি'র কি মরণ নাই? লবণের ন্যায় 'যদি' প্রত্যেক ভাবের অগ্রে পশ্চাতে ও মধ্যে মিশিয়া যায়। 'যদি' না হইলে ভাষায় রস হয় না, চিন্তায় মাধুরী হয় না, কথাবার্ত্তায় জমাট বাঁধে না।

ধান ফুটিয়া যেমন খই হয়, বাক্যভাণ্ডার 'মন' হইতে কথা ফুটিলে সেইরূপ 'যদি' বাহির হয়।

২

চাদরখানি মাথায় বাঁধিয়া জীবনচন্দ্র বন্ধু হরিদাসের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন।

সম্মুখে 'ম্যাণ্টলপীসে'র উপর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ অরণ্যে রোদন করিতেছিল। যদি সেটা না থাকিত, তবে জীবন 'যদি'র দিক দিয়াও যাইত না। কিন্তু যাহা ভবিতব্য, তাহা নিশ্চয় ভবিতব্য। এই সত্য কথা ও সার কথা চিন্তাশীল পুরুষগণ বহু অধ্যবসায়ের সহিত চারি যুগ ধরিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ফটোগ্রাফখানি দেখিয়া জীবন ভাবিল,—"যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে ঐরূপ।"

এটা মতপ্রকাশ।

আবার ভাবিল,—"যদি আমার হইত, তবে কত সুখের হইত!"

এটা কামনা।

জীবনের চরিত্র-গৌরবের পাছে হ্রাস হয়, অতএব বলিয়া রাখা ভাল যে, জীবনের তখনও বিবাহ হয় নাই। যে বিবাহ করে নাই, তাহার প্রথম সাধ পবিত্র, ইহা সকলের অনুমোদিত।

অবশেষে জীবনের মনে একটা ভয় হইল, "যদি পরের হয়?"

এরূপ ভয়ও মার্জ্জনীয়।

মস্তক হইতে চাদর খুলিয়া জীবন ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। অধিক চিন্তা হইলে মানব হয় বসিয়া থাকে, নয় ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা সস্ত্রীক, তাহারা বসিয়া পড়ে। যাহারা অবিবাহিত, তাহারা ঘুরিতে থাকে।

এটা সাধারণ প্রথা। প্রতিষেধ পাওয়া গেলেও বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনও গূঢ় কারণ আছে।

৩

ফটোগ্রাফখানি মাধুরীর। মাধুরী সুন্দরী। সর্ব্বাপেক্ষা মাধুরীর চক্ষু দুটি সুন্দর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পূর্ব্বকথিত 'যদি'র মীমাংসা হইয়া গেল। মাধুরী হরিদাসের ভাগিনেয়ী, এবং সর্ব্বপ্রকারেই জীবনের উপযুক্তা।

মাধুরী জীবনেরই হইল। অভাব পরিপূর্ণ হইল।

যদি মাধুরীর কোনও কষ্ট হয়, যদি মাধুরীর কোনও অভাব হয়, এই ভয়ে জীবন মাধুরীকে কচি লিচুর কলমের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল।

মাধুরী বলিল, "তুমি আমার জন্য অত কষ্ট কর কেন?"

জীবন হাসিয়া বলিল, "তুমি ভালবাসিবে বলিয়া।"

মাধুরী। 'যদি' না বাসি, তবে যত্ন করিবে না?

আবার সেই সর্ব্বনেশে 'যদি'।

জীবন বলিল, "যদি না বাস, দেখা যাইবে।"

'যদি' কল্পনার বাহন। মানব কল্পনার দাস। কল্পনা অভাবের সহচরী। ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করিয়া ভাবিয়াছিলেন, "যদি পরে অগ্নিটার সৃষ্টি করা যাইত, তাহা হইলে দেবাসুরের সংগ্রাম বাধিত না।" কিন্তু ব্রহ্মা পরে বুঝিয়াছিলেন যে, যদি একটা হয়, তবে অন্যটা হয় না। এক সঙ্গে সকলই সম্পূর্ণ হইলে 'যদি' থাকিত না। কিন্তু তাহা কি কখনও হয়? সুতরাং 'যদি'র প্রতাপ অজেয়।

জীবন ভাবিল, মাধুরীর কথাগুলা একটু কড়া। যদি আর একটু মিষ্ট হইত! যাহা হউক, যেটা হইবার কথা, সেটা হইয়া গিয়াছে। অনুশোচনা বৃথা।

৪

জীবন লেখাপড়া যথেষ্ট শিখিয়াছিল। শরীরখানি দৃঢ় ও ক্লেশসহিষ্ণু। তবে জীবন কিছু কৃষ্ণবর্ণ, এবং তাহার নিজের পছন্দমত নহে। জীবনের একটা বিশেষ স্বভাব ছিল। সে সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত।

সন্দিগ্ধচিত্ত পুরুষের নিকট 'যদি' কিছু অধিকমাত্রায় প্রকাশ পায়।

কুম্ভকর্ণ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল; কেন না, সে ছয় মাস ঘুমাইয়া থাকিত। ঘুম হইতে উঠিয়া কুম্ভকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, রাম কে?"

এ সন্দেহ রাবণের পূর্ব্বে হয় নাই। কিন্তু 'যদি' কুম্ভকর্ণের স্কন্ধ হইতে রাবণের স্কন্ধে আরোহণ করিল।

ঘটনাক্রমে জীবনের পক্ষে আবার 'যদি' কঠিনরূপে আবির্ভূত হইল। কথাটা অতি সামান্য।

মাধুরীর একখানি রুমালের কোণে এক ছত্র কবিতা রেশমের সূতায় গ্রথিত ছিল,—

"স্মৃতিটুকু রেখ মোর তরে"
—তোমারিই জীবনে মরণে—

জীবন হঠাৎ মাধুরীর বাক্স খুলিয়া তাহা পাইয়াছিল। জীবন ভাবিল, রুমালখানি কোনও বাল্যসহচরীর উপহার। যদি তাই হয়, লুকাইয়া রাখে কেন? জীবন ভাবিল, মাধুরী থিয়েটার হইতে আসিলে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে। মন খুলিয়াই কথাটা বলা ভাল। কিন্তু আবার ভাবিল, "না, যদি মাধুরী মিথ্যা কথা কয়?"

৫

মিথ্যা কহাও সম্ভব, সত্য কহাও সম্ভব। তবে যদি মিথ্যা কথা কয়! এই ভয় জীবনের বাড়িতে লাগিল।

মনোময় জগতে প্রমাণের ভার 'যদি'র উপর। ন্যায়বাগীশ বলেন, "যদি ব্রহ্ম সত্য, তবে জগৎ মিথ্যা; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, অতএব ব্রহ্ম সত্য।" "কোনটা সত্য নহে" এমন হইতে পারে না।

কিন্তু "যদি দুইটাই সত্য হয়?" হইবে না কেন? জগৎ মায়াময়। মায়াটা সত্য। তবে মায়ার রূপটা সত্য নয়। মায়ার খেলাটা সত্য। যাঁহার খেলা, তিনি সত্য। তবে মায়ার খেলাটা সত্য হইলেও মায়া মিথ্যা। কিন্তু এটা যে মিথ্যা, তাহা সত্য। অর্থাৎ, এ কথাটা সত্য। তবুও মিথ্যা সত্য হইতে পারে না।

আর জীবন? স্বয়ং রামচন্দ্র জানকীর সম্পর্কে বিচার ও তর্কের অধীন হইয়াছিলেন, জীবনচন্দ্র ত সামান্য লোক! জীবনচন্দ্র নূতন ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। সওয়াল জওয়াব তাঁহার অভ্যস্ত।

কাজেই সারানিশিটা জীবনের অনিদ্রায় গেল। ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় 'যদি'

ক্রমাগত অতি তীক্ষ্ণ শরশয্যা স্থাপন করিতে লাগিল। জীবনের আপাদমস্তক 'যদি' শরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। ষ্টার থিয়েটারে "সরলা" দেখিয়া রাত্রি তিনটার সময় যখন মাধুরী বাড়ী ফিরিল, তখন জীবন ওতপ্রোতভাবে 'যদি'র উপর গড়াইতে-ছিলেন। মাধুরী নিকটে আসিয়া দেখিল, জীবনের অবস্থা একটু নূতন ধরণের; জীবনের মুখেও একটু নূতন রকমের গন্ধ ছিল।

মাধুরী ভাবিল, জীবন ঔষধ খাইয়াছে। মাধুরী কখনও জীবনকে মদ্যপান করিতে দেখে নাই। কাজেই মাধুরী 'যদি'র মধ্যে গেল না।

মাধুরী বলিল, "তোমার অসুখ করেছে?"

জীবন রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা অন্য দিকে একটিবারমাত্র চাহিয়া উত্তর করিল, "যদিস্যাৎ।"

৬

নবীনা বধূর ন্যায় বসন্ত-নিশীথিনী সূর্য্যকরস্পর্শে অবগুণ্ঠন খুলিয়া প্রভাতে পরিণত হইল। দিন ও রাত্রি বিভিন্ন নহে। সময় একটাই। সূর্য্য সময়টাকে দিন করে, অতএব তিনি দিনকর। চন্দ্র সেই জন্যে নিশাকর।

কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যেরও একটা অন্ধকার আছে। সেটা 'যদি' না থাকিত!

মানব কিছুতেই 'যদি'র কবল এড়াইতে পারে না। অভাব হইলেও 'যদি', অভাবপূরণ হইলেও 'যদি'।

হরিদাস বলিয়াছিলেন, "'যদি' একটি পুত্রসন্তান হয়, তবে এই বিষয়টা রক্ষা পায়।" ক্রমে যখন পুত্র কন্যা প্রচুরপরিমাণে জন্মিল, তখন হরিদাস বলিলেন, "যদি গোটা দুই কন্যা বাদ যাইত, তবে বিষয়টা এত খাটো হইয়া যাইত না।" যাহা হউক, যাহা হইবার, তাহা হইবেই; ইহাই 'যদি'র ব্রহ্মাস্ত্র।

হরিদাসের পুত্রকন্যার সংখ্যা মনে করিয়া জীবন ভাবিল, "কি সর্ব্বনাশ! 'যদি' আমার ঐরূপ পুত্রকন্যা হয়!"

ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? জীবনের ফুলের বাগানে কে গাহিল:—

"যদি রে কামিনী, হ'ত, কাননের ফুল!"

জীবন ভাবিল, "যদি লাঠিগাছটা এই সময় কাছে থাকিত, তবে একবার দেখাইয়া দিতাম।"

গায়কপ্রবর হরিদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দুভূষণ। অতএব সম্পর্কে জীবনের শ্যালক। ইন্দু হরিদাসের উত্তরাধিকারী। বিষয়টা বৃহৎ। জীবন কিঞ্চিৎ বিরক্ত-ভাবে বলিল, "তোমাদের বখামি কি সব সময় ভাল লাগে?"

৭

ইন্দু একটু অপ্রতিভ হইল।

জীবন বলিল, "ইন্দু, প্রেমটা বেশ জিনিস, যদি তাহার মধ্যে কণ্টক না থাকিত।"

ইন্দু। কণ্টকটাও বেশ জিনিস, যদি তাহার সঙ্গে প্রেম না থাকে। কণ্টক-টাকে চাহিলেই কণ্টক আসে। কণ্টকটা কল্পনা।

জীবন। তোমার কল্পিত কাননের ফুলও ত কল্পনা।

ইন্দু। আমি কণ্টক কল্পনা করি নাই, ফুলই কল্পনা করিয়াছি।

জীবন। জগতে কণ্টক আছে। কেবল মূর্খেরাই ফুলের কল্পনা করিয়া থাকে।

ইন্দু। যদি কল্পনা করিতে হয়, তবে ফুলের কল্পনাই ভাল। ফুলও কল্পনা, কণ্টকও কল্পনা। সুখও কল্পনা, দুঃখও কল্পনা। যদি কল্পনা করাই মনুষ্যত্ব, তবে ভালটা কল্পনা করাই ভাল। আমি কল্পনা করিয়াছি যে, বিলাতে গিয়া একটা মেম বিবাহ করিব।

জীবন। সে তোমাকে কখনও ভালবাসিবে না।

ইন্দু। জীবন দা'! তজ্জন্য আমি অল্প চিন্তা করি। কে ভালবাসিবে, তাহা কে জানে? অন্ধ দর্পণে মুখ দেখিতে পায় না।

স্ত্রীলোকগুলাই দর্পণ। যাহারা চালাক, তাহারা তাহাতে আপনার মুখ দেখিয়া লয়। আমি শুনিয়াছি, প্রকৃতি নাকি প্রচ্ছন্ন বিরাট পুরুষের দর্পণ।

জীবন। তোমার মতে স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে না?

ইন্দু। সেটা প্রতিবিম্ব। তুমি ভালবাসিলেই সে বাসিবে।

জীবন। যদি না বাসে?

ইন্দু। নিশ্চয় বাসিবে। এটা একটা ধ্রুব সত্য।

জীবন। অনেকে ভালবাসিয়া প্রতিদান পায় নাই।

ইন্দু। তবে সে স্ত্রী এখনও ভালবাসিতে শিখে নাই।

জীবন। শিখিয়াছে, কিন্তু সে অন্যকে ভালবাসে।

ইন্দু। ওটা কবির কল্পনা। স্ত্রীলোক ভালবাসা চায়। রামই হউক, আর শ্যামই হউক, তাহার ভালবাসার একটা আধার চাহি। রামকে যদি সে আগে ভালবাসিয়া থাকে, তবে শ্যামের case খারাপ। কিন্তু শ্যাম যদি প্রথমে ভাল-বাসিয়া থাকে, তবে রামের বাবার সাধ্য নাই যে, তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিবিম্ব

মুছিয়া ফেলে। মনটা একটা জড় প্রস্তরের মত। একবার গলিলেই কর্দ্দম হইয়া যায়। দুইবার গলিতে পারে না।

ইন্দু গানটা আবার উচ্চস্বরে ভাঁজিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল।

না জানি কেন মাধুরী শীর্ণা হইয়া গিয়াছে। মাধুরীর চ'খে কালিমা পড়িয়াছে।

ইন্দু বলিল, "মাধুরী, তুই অমন হয়েছিস্ কেন?"

মাধুরী বলিল "কিছু না।"

ইন্দু বুঝিল, ইহার মূলে কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ। বাহিরে গিয়া ইন্দু বলিল, "জীবন দা'! পূর্ব্বে জানিতাম, তুমি একটা ঘোড়া, এখন দেখিতেছি সম্পূর্ণ গাধা।"

৮

তিন চারি দিন ক্রমাগত ভাবিয়া জীবনের মাথা খারাপ হইয়াছিল। আদালতে যাইবার পূর্ব্বে জীবনের পিসী খাইতে ডাকিলেন।

জীবনের সাড়াশব্দ নাই! পিসী জীবনের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, জীবন অর্দ্ধ-অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে।

পিসী ডাকিলেন, "ওরে! তোরা এ দিকে আয়, ডাক্তারকে নিয়ে আয়।"

হঠাৎ একটা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল, এবং যাদব ডাক্তার ক্যাম্ফারের শিশি ও নস্যের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

জীবনের মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইত। ছোট খাট রকম হইলে নস্য দিলেই যাইত। একটু গভীরাকারে হইলে ক্যাম্ফার লাগিত। কিন্তু এবার মূর্চ্ছা নহে। জীবন বলিল, "তাহার বাম হস্ত এবং বোধ হয় অঙ্গটা অবশ হইয়া গিয়াছে।"

যাদব ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা সব সর।"

পিসী তখন ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন, এবং পুরাতন শরীরে যত দূর সম্ভব, সেকালের অভ্যাস স্মরণ করিয়া পরহিতের জন্য চীৎকার করিতে করিতে লোচনের বারি ছাড়িয়া দিলেন।

মাধুরী ভয়ে ব্যাকুল হইয়া গেল। পিসী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, দাদার যে ব্যারাম হয়েছিল, জীবনধনেরও যদি তাই হয়—মাগো!——"

জীবনের পিতার পক্ষাঘাতে কাল হয়। মাধুরী তাহা শুনিয়াছিল। মাধুরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

৯

অর্দ্ধরাত্রিতে যাদব ডাক্তার বলিলেন, "এখন একটু ভাল আছ ত?"

জীবন বলিল, "হাঁ।"

জীবনের চক্ষু কি অন্বেষণ করিতেছিল। পিসীমা বুঝিয়া মাধুরীকে খুঁজিতে গেলেন।

মাধুরীর মূর্চ্ছা আপনিই ভাঙ্গিয়াছিল, তাহার পর সে একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল।

ধীরে ধীরে হৃদয়ের অসহ্য কল্পনা দৃঢ়ভাবে সংবরণ করিয়া মাধুরী জীবনের পদতলের দিকে বসিল।

জীবন বলিল, "মাধুরী, তুমি ভয় পাইয়াছ?"

মাধুরী। আমার আশা, ভয়, অবলম্বন,—সবই তুমি।

জীবন। যদি কোনও দোষ করিয়া থাকি,—কিছু মনে করিও না।

মাধুরী। স্বামীর কোনও দোষ হইতে পারে না। অমন কথা বলিও না। বল, ভাল হইবে।

জীবন। যদি না হই?

মাধুরী। তবে আমারও শেষ।

জীবন মাধুরীকে কোলে টানিয়া লইল। জীবনের কোনখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ ছিল না।

১০

জীবন বলিল, "তোমার বাক্সের মধ্যে সুন্দর একখানি রুমাল দেখিয়াছি।"

মাধুরী লজ্জায় গলিয়া গেল। মাধুরী বলিল, "ওটা তোমার জন্যই বুনিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, যদি মরি, তবে ঐখানি তোমার হাতে দিয়া যাইব। কিন্তু তোমার রোগের সংবাদ পাইয়া রুমালখানি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছি।"

জীবন সেই ছিন্ন রুমাল দেখিল।

জীবন অনেকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিল। অলক্ষ্যে 'যদি'র শরগুলি জীবনের বুক হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে লাগিল। সন্দেহের 'যদি' গেল; কামনার 'যদি' গেল; অহঙ্কার ও মোহের 'যদি'ও গেল। তথাপি জীবন একটা 'যদি'কে ধরিয়া রাখিল।

জীবন বলিল, "মাধুরী, যদি তুমি আজ আমার নিকট এ সময় না আসিতে, তবে আমি বাঁচিতাম না।"

মাধুরী। আমি ত তোমার দাসী। আমি যাব কোথায়?

তখন ইন্দু বাহিরে গাহিতেছিল, "যদি আসে তবে কেন যেতে চায়!"

জীবন হাসিয়া বলিল, "আমার রুমাল দেখিয়া ভয় হইয়াছিল, ও'। অন্য কাহারও উপহার।"

মাধুরী। কার ?

জীবন। হয় ত তুমি কাহাকেও পূর্ব্বে ভালবাসিতে।

মাধুরী। তবে তোমার নিকট আসিয়া বাঁচিয়া থাকিতাম কি করিয়া ?

জীবন। ওঃ! তাই বটে। দেখ, আমার কেবল সামান্য মূর্চ্ছা হইয়াছিল মাত্র। সেটা বোধ হয় 'যদি'র মূর্চ্ছা।

মাধুরী আশ্বাস পাইয়া স্বামীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

মাধুরী। 'যদি'র মূর্চ্ছা কি প্রিয়তম ?

জীবন। আমার সন্দেহ হইয়াছিল—যদি তুমি আমাকে না ভালবাস।

মাধুরী বলিল, "তোমরা আশ্চর্য্য জাতি। আমাদের কাছে 'যদি' নাই। আমরা যাহা হয়, তাহাই বিশ্বাস করি। আমরা স্বামীকেই দেখি, স্বামীকেই জানি।

জীবন। যদি স্বামী অসৎ হয় ?

মাধুরী। তবুও তিনি সৎ। কল্পনা হইলেও এটা সুখের। কল্পনা-স্বপ্ন যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবু দ্বিতীয় কল্পনা নাই। এই জন্য আমরা স্বামীকে রাখিয়া মরিতে পারিলে সুখী হই। সুখ একবারই চাওয়া যায়, একবারই আসে। আবার তুমি যদি 'যদি'র নাম কর, তবে জোর করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিব।

নায়িকা একই উপায়ে নায়কের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে ; মাধুরী সেই উপায়ে জীবনের মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

জীবনের মন অভ্যাসবশতঃ পরে কখনও 'যদি' স্মরণ করিলেও, মাধুরীর স্মৃতি তাহাকে তাড়াইয়া দিত। এটা দশ বৎসর পরের কথা। তখন সোনার মাধুরী একটি পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছে।

মধুস্রবা।

১

গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত কুসুম্ভপুরের রাজা বন্ধুহিত পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। কন্যা মধুস্রবার যত্ন, সেনাপতি বলাহকের শত্রুশাসন ও সভাকবি ক্ষেমশ্রীর মধুর কাব্যরস রাজাকে চিন্তামুক্ত ও সদানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল।

মধুস্রবার তনুলতায় লাবণ্যললিত পুষ্পশ্রী; ঈষচ্চঞ্চল আয়ত নয়নে শুভ্র দুগ্ধ-নদীর ন্যায় মুগ্ধ দৃষ্টি;—তরঙ্গায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি ও লীলামধুর গতি-ভঙ্গীতে তাহাকে ঘনবর্ষার বিদ্যুৎপুঞ্জের মত মনে হইত।

সাগরোপকণ্ঠে রাজসভা,—মর্ম্মরমণ্ডিত, মণিবেষ্টিত, উদ্যানশোভিত, সাগর-চুম্বিত। দক্ষিণে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল ফেনমাল্যমণ্ডিত ভীমকান্ত সমুদ্র; পূর্ব্বে সাগর-সম্মিলিতা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী বিশাখা; উত্তরে নগরপ্রান্তে মেঘমালার মত ধূম্রধূসর মুঞ্জকেশ পর্ব্বত; পশ্চিমে এলালিঙ্গিত চন্দনতরুর উদ্যান। সমুদ্রের গর্জ্জন, বিশাখার গুঞ্জন, মুঞ্জকেশের তরুরাজিনীলা শ্রী, উদ্যানলুণ্ঠিত মিশ্রগন্ধ রাজসভাটিকে অত্যন্ত মধুর করিয়া রাখিত; রাজার পার্শ্বোপবিষ্টা মধুস্রবার রূপজ্যোতি রাজ-সভাকে পূর্ণশ্রী দান করিত।

মধুস্রবার রূপ ও কুসুমপুরীর সংস্থানসৌন্দর্য্যে বহু বীরহৃদয় প্রলুব্ধ হইত; কিন্তু বলাহকের তরবারি সকলকে বিমুখ করিত। রাজা সানন্দচিত্তে ক্ষেমশ্রীর কাব্যরস উপভোগ করিতেন। বলাহকের তরবারি মধুস্রবাকে স্মরণ করিয়া যেমন ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল, ক্ষেমশ্রীর কাব্যও তেমনই মধুস্রবাকে আশ্রয় করিয়া সকলের হর্ষ উৎপাদন করিত।

শত্রু-মথন-কালে বলাহক যে করুণ প্রেমব্যাকুল দৃষ্টিতে মধুস্রবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিত, বলাহকের সেই চকিত দৃষ্টিতে কত প্রেম কত নীরব প্রার্থনা মধু-স্রবার চরণে নিবেদিত হইত, তাহা কাহারও অগোচর থাকিত না। শত্রুবিজয়-অন্তে ক্ষেমশ্রীর কবিতায় মুদ্রিত-কমল-বেষ্টনকারী ভ্রমরের মত যে হর্ষ-শোকার্দ্র গুঞ্জন-ধ্বনি ধ্বনিত হইত, তাহাতে মধুস্রবা বুঝিত, কত প্রেম, কত অব্যক্ত ব্যাকুলতা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। যখন বলা-হক গর্ব্বোন্নতমস্তকে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিত, "মহারাজ, আপনাদের স্নেহের কবচে আত্মরক্ষা করিয়া আমি আজ জয়ী!" তখন ক্ষেমশ্রী কম্পিতকণ্ঠে হ্রীদীপ্তনয়নে নতমস্তকে গাহিত, "ওগো! তোমার প্রেমে আমি আজ বন্দী।" বন্দী-কৃত শত্রুকে রাজসম্মুখে আনিয়া বলাহক যখন বলিত, "মহারাজ, এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি, এখন ইহাকে কি শাস্তি দিব, বলুন।" তখন ক্ষেমশ্রী অশ্রুসজলনয়নে করুণামধুরকণ্ঠে গাহিত, "বন্দীর লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দাও, উহাকে প্রেমের শৃঙ্খলে চিরবন্দী কর।" বলাহক যখন শুভারম্ভে দেবদর্শনের ন্যায় চকিতে মধুস্রবার লাবণ্যললিত কৌমারশ্রী একাগ্রনয়নে পান করিয়া লক্ষ্যবেধে প্রবৃত্ত হইত, ক্ষেমশ্রী তখন পুষ্পস্তবকাভিরাম দৃষ্টি দ্বারা মধুস্রবার আরতি করিয়া আসিত। বলা-

হক চাহিয়া চাহিয়া হাসিত; দেখিতে দেখিতে ক্ষেমশ্রীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

২

মধুস্রবার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। বলাহক মধুস্রবার পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ, হৃদয়ের শোণিত ব্যয় করিয়া চিরকাল আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, আজ তাহার পুরস্কার দিন।" ক্ষেমশ্রী কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকণ্ঠে ভয়চকিতচিত্তে বলিল, "মহারাজ, ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়া আজীবন আপনাদের সেবা করিয়াছি,—তাহা স্মরণ করিয়া আজ প্রসাদ ভিক্ষা দিন।"

উভয়েই রাজার প্রিয়। ক্ষেমশ্রী শুধু প্রীতি দিয়াছে; বলাহক ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তিনি সংশয়ভঞ্জনের ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের আশায় মধুস্রবার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মধুস্রবা উভয়কেই প্রীতিমধুরদৃষ্টিতে অভিনন্দন করিতেছে। তখন রাজা বলিলেন, "ধরণী ও রমণী বীরভোগ্যা; তোমাদের বলের পরীক্ষা হউক।"

বলাহকের মুখচ্ছবি আশায় দীপ্ত হইল; বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলাহকের দিকে চাহিয়া মধুস্রবা একটু হাসিলেন; কিন্তু ক্ষেমশ্রীর মলিন মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসি ম্লান হইয়া গেল।

ক্ষেমশ্রী বলিল, "মহারাজ, কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক, রমণী প্রেম-পক্ষপাতিনী; আমাদের প্রেমের গভীরতার পরীক্ষা হউক।" মধুস্রবার মধুর দৃষ্টিপাতে ক্ষেমশ্রীর সুন্দর কমনীয় মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলাহক ব্যাকুল হইয়া রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা বলিলেন, "বলহীন কখনও আত্মরক্ষায় সক্ষম নহে; আমার রাজ্য ও কন্যার রক্ষায় কে সমর্থ?" বলাহক তরবারি কোষমুক্ত করিল, মধুস্রবার স্মিতমধুর মুখের দিকে চাহিল। ক্ষেমশ্রী গাহিয়া উঠিল, "প্রেম দিয়া শত্রুজয় করিব, প্রেমের বলে বলী হইব; স্বার্থই কি পরমার্থ? বিরোধ-বিক্ষুব্ধ রাজ্য অপেক্ষা নির্ব্বিরোধ তরুতলবাস শ্রেয়ঃকল্প।" এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া যে যখন মধুস্রবার সদয় দৃষ্টি লাভ করিতেছিল, সে তখন প্রফুল্ল ও অপর জন বিষণ্ণ হইতেছিল। রাজা বলিলেন, "বলীই আমার কন্যা লাভ করিবে।" বলাহক স্বীয় সৌভাগ্যগর্ব্বে ক্ষেমশ্রীকে বিদ্রূপ-দগ্ধ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিল। ক্ষেমশ্রী বিনয়নম্রবচনে বলিল, "তবে বলেরই পরীক্ষা হউক।" তখন দম্ভভরে বলাহক অসি গ্রহণ করিয়া ক্ষেমশ্রীকে আহ্বান করিল। ক্ষেমশ্রীর ব্যাকুল দৃষ্টি মধুস্রবার নয়নে সন্নদ্ধ হইল।

এতক্ষণ পরে মধুস্রবা কহিল, "এরূপ বলপরীক্ষা ন্যায়সঙ্গত নহে। এক জন

আজন্মশিক্ষিত অস্ত্রব্যবসায়ী, অপর জন অস্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ, কবি। এরূপ অসম যুদ্ধে বল অপেক্ষা কৌশলেরই জয় হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। আর, অস্ত্রযুদ্ধে এক জন হত বা আহত হইতে পারে। তাহাও আমার অনভিপ্রেত।" বলাহক তাহার প্রতি ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টিপাত করিল; ক্ষেমশ্রীর দৃষ্টিতে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। "তবে বাহুযুদ্ধ হউক।" মধুস্রবা তাহাও নিরাপদ মনে করিল না। তখন স্থির হইল, "ভারোত্তোলনের শক্তি দেখিয়া বলের পরিমাপ হউক।"

৩

শরতের কনককান্ত উজ্জ্বল রবি-কিরণ সভা-প্রাঙ্গনে ব্যাপ্ত হইতে না হইতে সভাগৃহ জনপূর্ণ হইল। বৈতালিক রাজার আগমন ঘোষণা করিল। ক্ষেমশ্রী চিরপ্রথামত রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া গান ধরিল; কিন্তু আজিকার গান অতি সংক্ষিপ্ত, অতি করুণ। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজাদেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

বলাহক গুরু ভার সকল তুলিতে লাগিল। ক্রমশঃ অধিকতর গুরু ভার তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে, আর সে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। বলাহক একটি ভার বক্ষ পর্য্যন্ত তুলিয়া আর তুলিতে পারিল না।

এখন ক্ষেমশ্রীর পালা। ক্ষেমশ্রীর সদাপ্রফুল্ল মুখ আজ শারদ প্রভাতের মত গম্ভীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ! সে অগ্রসর হইল। শত সহস্র চক্ষু সেই অক্ষমের উপর করুণা ও মঙ্গলেচ্ছার বৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্ষেমশ্রী একবার সাগরের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল, একবার বিশাখাকে দেখিল, একবার মুঞ্জকেশ পর্ব্বতের দিকে চাহিল, একবার এলালিঙ্গিত চন্দনতরুশ্রেণী দেখিয়া লইল,—সর্ব্বশেষে মধুস্রবাকে দেখিয়া দেখিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহার পর পদপ্রান্তপতিত সেই গুরু ভার দুই হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতহস্তে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল।

ক্ষেমশ্রীর জয়ে সভায় হর্ষকোলাহল উত্থিত হইল; সভাজনের দৃষ্টির আঘাতে বলাহকের পরাজয় সহস্রগুণ তীব্র হইয়া উঠিল। লজ্জায় বলাহক ঘর্ম্মাক্তবদন, পাংশু-বর্ণ, মৃত্তিকাবদ্ধদৃষ্টি। রাজা বলিলেন, "সাধু ক্ষেমশ্রী! সাধু! তোমার প্রেমের জয় হইয়াছে। গুরুভার আর ধারণ করিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই, ফেলিয়া দাও।"

জয়োল্লসিত কবির কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না। কবি মধুস্রবার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, গুরুভার প্রস্তর মাথার উপর ধরিয়া নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। চারি দিক হইতে ধ্বনি উঠিল, "ফেল, ফেল, প্রস্তর ফেলিয়া দাও।" কবির মুখ হাস্যদীপ্ত, চক্ষু মধুস্রবার প্রতি নিবদ্ধ, হস্তে গুরু ভার। কবি অবিচল, অকম্পিত। মধুস্রবা বলিলেন, "কবির হস্ত হইতে প্রস্তর নামাইয়া দাও।" অমনই কয়েক জন লোক অগ্রসর হইয়া

কবির হস্তধৃত প্রস্তর আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণে ক্ষেমশ্রীর প্রাণহীন দেহ প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ ভূমিতলে পতিত হইল।

বিজয়দৃপ্ত কবির এই অপূর্ব্ব তিরোধান রাজসভার আনন্দকোলাহলের উপর মরণের করুণগম্ভীর একখানি যবনিকা টানিয়া দিল। মধুস্রবা তাহার পণজেতা স্বামীর এই মহিম-মণ্ডিত মৃত্যুতে হর্ষ-শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছায় শান্তিলাভ করিল।

পরিণাম।

সকলেই জানেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় কাণপুরে অনেক ইংরাজকে বিদ্রোহীর হস্তে প্রাণ দিতে হয়।

এই সময়ে একদিন মনিয়ার নামে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী স্ত্রী ও এক বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে সঙ্গে লইয়া ডাকগাড়ী করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে-ছিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সাহেব দেখিলেন, এক দল সশস্ত্র সিপাহী বিকট চীৎকার করিতে করিতে তীরবেগে গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সাহেব স্ত্রীকে গাড়ীর পশ্চাৎদিকের দরজা দিয়া তাড়াতাড়ি নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি শীঘ্র মেয়েকে লইয়া দৌড়াইয়া নিকটস্থ কাহারও বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লও, আমি ততক্ষণ উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া সাহেব সশস্ত্র রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত বিদ্রোহিদল আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব একা আর বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিলেন না, অবিলম্বে ভূতল-শায়ী হইলেন।

মিসেস্ মনিয়ার দৌড়াইয়া এক মুসলমান বণিকের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লই-লেন। বণিক প্রথমে কোনমতেই আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না; অবশেষে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহাকে বিবাহ করিবে, এই শপথ করাইয়া লইয়া মেমকে বাড়ীতে স্থান দিলেন। মুসলমান অনেকদিন যাবৎ মেমকে অন্দরে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু স্বামিশোকেই হউক, কিংবা মুসলমানের অনুগৃহীতা হইয়া থাকিতে হইবে এই দারুণ মনস্তাপেই হউক, মিসেস্ মনিয়ার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শীঘ্রই ইহলোক

পরিত্যাগ করিলেন। অন্ধকার রাত্রে গোপনে খাঁসাহেব বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের বাগানে মেমের কবর দিলেন।

ছোট মেয়েটিকে লইয়া কিন্তু খাঁসাহেব ভারি বিপদে পড়িলেন। খাঁসাহেব নিজে দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ;—মেয়েটির নীল চোখ, কটা চুল, ধবধবে শাদা রঙ্গ দেখিয়া সকলেই নিশ্চয় সন্দেহ করিবে যে, এ সাহেবের মেয়ে,—হয় ত মনিয়ারের হত্যাপরাধে শেষে তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হইবে। মেয়েটির জন্য পূর্ব্বেই একটি বৃদ্ধা আয়া নিযুক্ত হইয়াছিল। খাঁসাহেব ভয়ে ভয়ে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আয়াকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরের কাছে ছোটখাট একটি একতালা বাড়ী ভাড়া লইয়া আয়ার সঙ্গে মেয়েটিকে রাখিলেন। সমস্ত ঠিক্ঠাক্ করিয়া খাঁসাহেব পুনরায় কার্ণপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মেয়ের জন্য আয়ার নামে মাসে মাসে, বিশ ত্রিশ,যখন যেমন সুবিধা হইত, টাকা পাঠাইতে লাগিলেন।

মেয়েটি একটু বড় হইয়া কথা কহিতে শিখিয়া বুড়ীকে "আয়ি" বলিয়া ডাকিত। বুড়ী মেয়েকে আদর করিয়া "মণিবাবা" বলিত।

মেয়েটি বড় হইতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে অলক্ষ্যে তরুশাখার ন্যায় বুড়ীর শুষ্ক বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র স্নেহনীড় রচনা করিল, যাহার জন্য, এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া যে পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত মৃত্যুকামনা করিত, সে এক্ষণে মনে মনে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল, "আরও কিছুদিন আমাকে রাখো—মেয়েটিকে মানুষ করিয়া বড় করিয়া ইহার একটা সদ্গতি দেখিয়া তবে যেন মরিতে পারি।"

বুড়ী একলাই সব কাজ করিত। খুব ভোর থাকিতে উঠিয়া লাঠি-হাতে ঠুক্ঠুক্ করিয়া নিজে গয়লাবাড়ী গিয়া দুধ লইয়া আসিত, পাছে গয়লা দুধে জল মেশায়;—নিজে বাজার করিত, রাঁধিত, স্নান করাইত, খাওয়াইত, স্কুলে রাখিয়া আসিত, মধ্যাহ্নে পুনরায় স্কুলে গিয়া খাওয়াইয়া আসিত, অপরাহ্নে আবার স্কুল হইতে মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত। মেয়েটি যখন স্কুলে থাকিত, তখন অন্য কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলে বুড়ী দৃষ্টিহীন চক্ষে সুতাবাঁধা একটি চস্মা আঁটিয়া মেয়ের জন্য কাপড় শেলাই করিতে বসিত। রাত্রে মেয়েটিকে বুকের কাছে রাখিয়া বুড়ী সেকালের কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিত,—বলিতে বলিতে সেই রক্ষকবিহীন নির্জ্জন গৃহে নিরাশ্রয় দুই জনে ঘুমাইয়া পড়িত। এইরূপে দিনরাত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। কাঁচা কাঠ শীঘ্র ধরে না,

শুষ্ক কাষ্ঠেই ইন্ধন প্রস্তুত হয়। বুড়া-হাড়ে একবার স্নেহের আঁচ লাগিলে ধূধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, খাঁসাহেব মধ্যে একবার আসিয়া মেয়েটিকে এক অর্ফান স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান। সেখানে নাম ভাঁড়াইয়া "মিস্ টার্নার" বলিয়া মেয়েটির পরিচয় দেন, এবং নিজেও ঐ নামে তাহাকে ডাকিতে থাকেন।

স্কুলে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রী হইতে শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত সকলেই মেয়েটির গুণে মুগ্ধ হইল। তাহার দীনতা বিনয় সৌজন্য দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিল, সকলেই তাহার বন্ধু হইল।

প্রতিবাসীরা ও যে সকল সাহেব-মেম বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা প্রায়ই মেয়েটি সম্বন্ধে বুড়ীকে অনেক প্রশ্ন করিত,—কাহার মেয়ে, বাপ মা কোথায়, এখানে থাকে কেন, ইত্যাদি। মেয়েটি অনাথা নিরাশ্রয় জানিলে পাছে তাহার বিপদ্‌সম্ভাবনা হয়, এই ভয়ে বুড়ী মিথ্যা করিয়া বলিত, —"টার্ণার সাহেবের মেয়ে, সাহেব পশ্চিমে কাজ করেন, কখন কোথায় থাকেন ঠিক নাই,—মেয়ের মা নাই, তাই আমার কাছে এইখানে রাখিয়া গেছেন।"

বুড়ী ভয়ে স্কুল ছাড়া মেয়েকে বাড়ীর বড় একটা বাহির করিত না—মেয়েটিও বাহিরে যাইতে চাহিত না। মেয়েটির আমোদের জন্য বুড়ী নিজের পয়সা খরচ করিয়া এক রাশ হাঁস, পায়রা ও গোটাকতক শাদা ইঁদুর কিনিয়া দিয়াছিল—সে বাড়ীতে তাহাদের লইয়াই খেলা করিত।

সন্ধ্যার সময় দুই জনে সিঁড়ির ধাপে আসিয়া বসিত; ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়া আসিয়া বালিকাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিত—বালিকা তাহাদের জন্য মটর ছড়াইয়া দিত,—শাদা ইঁদুরগুলাকে কোলের উপর রাখিয়া রুটীর টুকরা খাওয়াইত। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। বালিকাও ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল।

এক দিন দুই জনে সিঁড়িতে বসিয়া আছে, এ কথা সে কথার পর বালিকা বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আমার মা বাপের কথা তুমি কি কিছু জান?"

আয়ি কহিল, "সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, মাণবাবা,—তাঁহারা ত কেহই নাই।"—এই বলিয়া চোখের জল মুছিল।

বালিকা কহিল, "আচ্ছা, খাঁ-সাহেব আমার কে হন? উনি এখানে আসেন কেন, আমার জন্য টাকাই বা কেন পাঠান?"

বুড়ী কহিল, "উনি তোমার মা বাপের খুব বন্ধু ছিলেন, তাই তোমাকে এত স্নেহ করেন।"

বালিকা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আয়ি, আর কতদিন এইরূপ থাকিব!"

বুড়ী কহিল, "কেন মণিবাবা, এমন কথা বলিতেছ, তোমার দুঃখ কি?"

এই সময়ে বিচিত্রবাসপরিহিত এক দল সাহেব মেম হাস্যকলরব তুলিয়া, সুগন্ধ ছড়াইয়া বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেল, কিন্তু ঢেউ আসিয়া বালিকার হৃদয়ে আঘাত করিল; তাহার দৈন্য আরও ফুটিয়া উঠিল—চোখ ছলছল্ করিতে লাগিল।

বুড়ী তাহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু মণিবাবাকে অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, সে তাহার মনের দুঃখ বুঝিল, কহিল, "চল বাবা, আজ হাঁসদের খাওয়ান হয় নাই, তাহাদের খাওয়াইয়া আসি।"

২

খাঁসাহেব প্রায় দুই বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অনেক মাল নৌকা-ডুবি হইয়া কারবার ফেল হওয়ায় তিনি এক্ষণে ঋণগ্রস্ত। হঠাৎ এই বিপৎপাতে খাঁসাহেবের মেজাজ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। যে কসাই রোজ বাড়ীতে মাংস দিয়া যায়, মাংস খারাপ হওয়াতে একদিন তাহাকে এমন গালি দিলেন যে, আর একটু হইলেই খুনাখুনি ব্যাপার হইত;—গয়লার হিসাব লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; সে দুধ দেওয়া বন্ধ করিল। কারণে অকারণে প্রতিবাসী সকলের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। বুড়ীও বড় একটা বাদ যাইত না; কিন্তু সে মেয়ের মুখ চাহিয়া সকলই সহ্য করিত।

একদিন খাঁসাহেবের কিছু টাকার আবশ্যক হইল, বুড়ীর কাছে চাহিলেন। বুড়ী কহিল, "সাহেব, আপনি যে টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে বাড়ী ভাড়া দিয়া খুব কষ্টেই সংসার চলিয়াছে। আমার যা কিছু টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহাও মেয়েটির জন্য খরচ করিয়াছি—আমার হাতে কিছুই নাই।

বুড়ীর কথায় খাঁসাহেব একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "যাহা পাঠাইতাম, তাহা হইতে অন্ততঃ দু' শ' টাকা এতদিনে খুব রাখা যাইত। এত টাকা পাঠাইতাম, সবই খরচ হইয়াছে!—নিশ্চয়ই তুই চুরি করিয়াছিস্—তোকে পুলিসের হাতে দিব।"

বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "শেষে এই কথা! আপনার যা ইচ্ছা হয়—করুন, খোদাকি কসম্, আমি আপনার টাকা লই নাই!"

খাঁসাহেব কহিলেন, "তুই আমার বাড়ী থেকে এখনি বেরো।"

বালিকা বুড়ীর হইয়া অনেক বলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে হাতে পায়ে ধরিল, কিছুতেই কিছু হইল না। বুড়ী বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইল। যাইবার সময় বালিকার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "যদি বাঁচিয়া থাকি, আর আল্লা দিন দেন ত আবার দেখা হইবে। বালিকাও খুব কাঁদিল।

বুড়ী কয়েক দিন লুকাইয়া "মণিবাবা"র সহিত দেখা করিল, কিন্তু একদিন ধরা পড়িয়া খাঁসাহেবের নিকট এমন ভর্ৎসিত হইল যে, সেই অবধি আর তাহাকে দেখা গেল না।

খাঁসাহেবের এক পরমবন্ধু সীলোনে চালের ব্যবসা করিতেন। খাঁসাহেব পত্র দ্বারা তাঁহাকে আপনার অবস্থা জানাইলেন। উত্তরে বন্ধুবর তাঁহাকে সীলোনে আসিতে লিখিলেন, এবং পথখরচাও পাঠাইলেন। খাঁসাহেব মেয়েটিকে অর্ফানেজে বোর্ডার রাখিয়া সীলোন যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, অর্ফানেজ্ অনাথ বালক-বালিকার জন্য—সেখানে কোনও খরচ দিতে হয় না।

৩

বালিকা এখন পূর্ণবয়স্কা যুবতী, সুতরাং, এখন হইতে আমরা তাহাকে মিস্ টার্নার বলিয়াই ডাকিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্ফানেজের সকলেই মিস্ টার্নারকে খুব ভালবাসিত। সেখানে এক মিশনরী মেম প্রতি শনিবারে আসিয়া মেয়েদের বাইবেল শিক্ষা দিতেন। মিস্ টার্নারের প্রতি তাঁহার ভালবাসার আর সীমা ছিল না। মিস্ টার্নার ক্রমে এণ্ট্রেন্স, এফ্. এ. পাস করিল। তখন ঐ মিশনরী মেম একদিন তাহাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমাদের মিশনে কাজ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া দিতে পারি।" মিস্ টার্নার খুব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অল্পদিন পরেই মিস্ টার্নার মিশনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মাসে এক শত টাকা বেতন ধার্য্য হইল। তিনি বৌবাজারের কাছে একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়া মিশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। বুড়ীকে কিন্তু মিস্ টার্নার ভুলিতে পারিলেন না, তাহার জন্য মনটা মাঝে মাঝে কেমন করিত। গ্রহণের সময় যেমন পৃথিবীর

উপর ম্লান আভা পড়িয়া সমস্তই মলিন দেখায়, স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও মিস্ টার্নারের মনে তেমনই বুড়ীর জন্য দুঃখের একটা ম্লান ছায়া চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল।

একদিন মিস্ টার্নার ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন, এমন সময় তিন চারি জন পুলিসের লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা বাক্স হইতে কতকগুলি অলঙ্কার ও একটা পুঁট্লিতে বাঁধা দুই শত টাকার নোট্ দেখাইয়া কহিল, "এই অলঙ্কার, এই নোট্ আপনার কি?"

মিস্ টার্নার অলঙ্কারগুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিলেন, "এ অলঙ্কারও আমার নয়, এ নোটও আমার নয়।" পুলিস আর কোনও কথা না বলিয়া অলঙ্কারগুলি বাক্সয় ভরিয়া ও নোটগুলি বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মিস্ টার্নার রাস্তা হইতে একটি মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন। ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া দেখেন, পুলিসের প্রহারে এক বুড়ী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—পার্শ্বে সেই পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া। মেম "আয়ি"কে চিনিতে পারিলেন—তীব্র চীৎকার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর পুলিসদের নীচের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুড়ীকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

অনেক কষ্টে বুড়ীর চৈতন্য হইল। একটু সুস্থ হইলে মেম ডাকিলেন, "আয়ি!"

বুড়ী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মণিবাবা!"

মেম কহিলেন, "এ কি ব্যাপার আয়ি?"

বুড়ী থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল, "আমার আর সময় নাই। আমি যাহা বলি, শোন। তোমার মা খাঁসাহেবের ভয়ে লুকাইয়া আমার কাছে কতকগুলি গহনা রাখিয়াছিলেন, বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি বড় হইলে সেগুলি তোমাকে দিতে। দেশে বাড়ীতে আমার নাতির কাছে গহনাগুলি রাখিয়া দিয়াছিলাম। দেশ হইতে এই গহনার বাক্স আনিয়া পথে পথে কতদিন যে তোমার সন্ধানে ফিরিয়াছি, তাহার ঠিক নাই!—উঃ!—তাহার পর আজ দুই দিন হইল পুলিসের হাতে পড়ি। তোমার নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—'মণিবাবা' বলাতে উহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর তুমি এক সময়ে খিদিরপুরের যে স্কুলে পড়িতে, তাহার নাম করাতে পুলিস আমাকে সেখানে লইয়া গেল। সেখানে সকলেই আমাকে চিনিল,—তোমার নাম ও সন্ধান পুলিসকে বলিয়া দিল।—উঃ!—আর মণিবাবা, খাঁসাহেব দু' শ' টাকার দাবী দিয়া আমায় যে চোর অপবাদ দিয়াছিলেন—

আমি দেশের জায়গা জমী বিক্রি করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—দুই-ই পুলিসের কাছে আছে। খাঁসাহেবকে টাকা দিও, আর গহনাগুলি তুমি পরিও।—উঃ!—"বুড়ীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল,—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিল, "তুমি সুখে আছ ত?"

মেম বুড়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "তোমাকে দেখিতে পাইলাম আয়ি, এই আমার সুখ, তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি!"

বুড়ী অস্পষ্ট উচ্চারণে কহিল, "আমার ত দিন ফুরাইয়াছে, খোদা তোমাকে সুখে রাখুন। মণিবাবা, গয়নার বাক্স আন—আমি নিজের হাতে তোমাকে পরাইয়া দিই।"

মেম পুলিসের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছিল, এই গহনার বাক্স ও নোট্ আমারই।" মেম বলিতেছেন, পুলিস অগত্যা রসিদ লইয়া ছাড়িয়া দিল।

বুড়ী কম্পিতহস্তে একজোড়া সোনার বালা লইয়া মেমের হাতে পরাইয়া দিতে লাগিল।—এক হাতে পরাইয়া আর পারিল না, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বুড়ী আর একবার ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মণি!—" তাহার পর সব শেষ হইল।

মেমের কান্না রাস্তা হইতে শোনা গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া মেম সমারোহের সহিত বুড়ীকে কবর দিলেন। প্রত্যেক রবিবারে সন্ধ্যার সময় দেখা যাইত, "আয়ি"র কবরের উপর ফুল রাখিয়া মিস্ টার্নার বসিয়া আছেন।

অপেক্ষা।

—*:*—

১

সে দিন প্রভাতে সখীগণ সাথে
আমার প্রাসাদশিখরে উঠি'
দেখিতেছিলাম, পূর্ব্ব গগনে
তরুণ অরুণ উঠিতে ফুটি'।
তখনো নিশার ধূসর আঁচল
পশ্চিম মেঘে লুটায়ে চলে,

পূর্ব্ব মেঘের রেখায় রেখায়
শোণিমা—রক্ত-কমল-দলে।
কলরবহীন বিশাল নগর
নিদ্রিত,—মায়ানগরী যেন;
জনহীন পথ রয়েছে পড়িয়া
হিম-জড় দেহ উরগ যেন।

ছায়াহীন মোর বিরাট প্রাসাদ—
চিত্রে লিখিত প্রাসাদ সম;
মুক্ত-কৃপাণ প্রহরী কেবল
ফিরিছে সপ্ত তোরণে মম।
পুর-সরসীর স্বচ্ছ সলিলে
তখনো মুদিত কমলরাজি;
মর্ম্মরে বাঁধা সোপানে কাহারো
মুখর নূপুর উঠেনি বাজি'।
তখনো দিনের আলোকে ঝলেনি
পুর-পরিখার আঁধার জল,
সদ্য-বিগত- নিদ্র বিহগ
কূজিছে কেবল হরষ-কল।

২

উঠিল বিকশি' কনক-কিরণ,
মুদিত কোরক মেলিল আঁখি;
সুখদ-পরশ প্রভাত-পবন
বিকচ-কুসুম সুরভি মাখি'।
জাগিয়া উঠিল নিদ্রিত পুরী,
খুলিল প্রহরী রুদ্ধ দ্বার।
জাগিছে নগরী জন-কলরবে,
পবনে ভাসিছে আভাষ তার।
সূর্য্য-বিকাশ দেখিয়া ফিরিতে
পশ্চিম দিকে দেখিনু চাহি'—
আসিছে একাকী পথিক যুবক
বিরল-পথিক সরণী বাহি';
শুভ্র ললাট শোভিছে উজ্জ্বল
তরুণ রবির অরুণ করে;
ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ;
প্রতিভাদীপ্তি নয়ন 'পরে।
বুঝিতে নারিনু নিদ্রিতা আমি—
অথবা নিশার স্বপন-ঘোরে।
মানস-দেবতা আসিল কি মোর
মূর্ত্তি ধরিয়া ছলিতে মোরে?
পিপাসিত আঁখি, পড়ে না পলক;
মুগ্ধা—হেরিতে লাগিনু তাঁরে।
চঞ্চল হৃদি উদাস-ভরে—
আসিল পথিক আমারি দ্বারে!

৩

পুত্রের সম পালিলা আমারে
মৃত পিতা মোর—রাজ্য-স্বামী।
রাজার মুকুট লুটেছে চরণে,
ফিরিয়া চাহিনি,—কুমারী আমি।
নারী-হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম-সুধা—
ভাবিলে আপনি শিহরি লাজে;
চরণে যাহার বিশাল রাজ্য
আপনা-বিকান তাঁ'রে কি সাজে?
দুর্ব্বল নারী স্নেহপ্রেম যাচে,
আপনারে দেয় পরের করে;
আপনারে লয়ে আছিনু অটল
আপন গর্ব্ব-শিখর 'পরে।
আজ যেন মোর রুদ্ধ প্রকৃতি
আত্ম-প্রকাশ করিল বলে;
অটল গর্ব্ব টুটি' গেল মোর
দরবিগলিত অশ্রুজলে।
পূর্ণ প্রাসাদ জনহীন যেন,
সুখ-লেশহীন সকল সুখ।
নিষ্ফল মোর জীবনে কেবল
অসহ যাতন—তীব্র দুখ।
দু'খানি অধর- পরশের আশে
চাহিনু সকলি করিতে দান;
নিষ্ফল বুকে শিশুরে ধরিতে
ব্যাকুলি' উঠিল নারীর প্রাণ।

৪

অটল-গর্ব্ব- শিখর ত্যজিয়া
দুর্ব্বল নারী আসিনু নামি,'
হৃদয়-আসন রচনা করিয়া
অজানা পথিকে বরিনু স্বামী।
কেহ নাহি তার, কহিল পথিক—
মধুর বচনে অমিয় ক্ষরে—

আমারে পাইয়া লভিল সে যেন
স্বর্গ-কুসুম মানব-করে।
পরাধীনতায় ছিল এত সুখ!
কেঁদেছি তৃষিতা বারিধি-তীরে!
কর প্রসারিলে অমৃত মিলিত
গর্ব্ব-অন্ধা চাহিনি ফিরে!
সুখ-সুধা-পান- বিহ্বলা আমি
হেরিনু জগৎ হরষময়;
নিঃশেষ-পীত সুধার পাত্র
পলক ফেলিতে পূর্ণ হয়!
আমাদেরি তরে পাখী গাহে গান,
পবন মোদিত কুসুম-বাসে;
আমাদেরি তরে ফুটি' উঠে তারা;
আমাদেরি তরে জ্যোছনা হাসে।
হরষে নিমেষে দিন বহে যায়—
ত্বরিতপক্ষ—উজ্জ্বল-হাসি।
বরষের পর বরষ আসিল,—
সুখের প্রবাহে চলিনু ভাসি'।

৫

বাতায়নে বসি' দেখিতেছিলাম,
উঠিছে ফুটিয়া রবির কর।
দৃঢ়বাহুপাশে বাঁধি' পতি মোর
টানি' লয়েছিলা বক্ষ'পর।
সে সুখ-শয়নে নিবেশিতা আমি,—
প্রেমের অমরা সে বাহু-পাশ,—
অলকে, কপোলে পরশিতেছিল
দেবতার মোর তপ্ত শ্বাস।
দেখিনু চাহিয়া পূর্ব্ব তোরণে,
দাঁড়ায়ে রমণী—মলিনবেশ,
আঁধার আননে বিষাদের ছায়া,
জীর্ণ বসন, রুক্ষ কেশ।
সহসা আমার কটিতট হ'তে
খসিল শিথিল বাহুর পাশ!
চকিতে চাহিয়া দেখিনু, স্বামীর
পাণ্ডু আনন,—নয়নে ত্রাস!

বাহু বাড়াইয়া গলদেশ বেড়ি'
আদরে চুমিনু অধরখানি;—
উঠিল না জাগি' চুম্বন সেথা,—
শীতল অধর, ফুরে না বাণী;
বদ্ধ নয়ন পূর্ব্ব তোরণে!
অজানা শঙ্কা জাগিল প্রাণে।
দেখিনু চাহিয়া, রোদন-নিরতা
ভিখারিণী চাহি' তাঁহারি পানে।

৬

দুখিনী রমণী আমারি তোরণে
এসেছে—খুঁজিয়া পতিরে তা'র!
কপট পুরুষে যে দেয় হৃদয়
নিয়তি তাহার—নয়নধার।
কেহ নাহি তা'র বলেছিলে মোরে;
সত্য বলিয়া ভেবেছি আমি।
কি ছলে ভুলিয়া রাজার কুমারী
অজানা পথিকে বরেছি স্বামী!'
ক্রোধ-কম্পিত দেহলতা মোর,
রোষের বহ্নি হৃদয় দহে;
বিপদশঙ্কা গণিয়া হৃদয়ে
ভীতি-নত-আঁখি সখীরা রহে।
দলিত দর্প লভে নব বল,—
কোথা সে ভ্রষ্ট দেবতা মম?
ক্ষমা নাহি দিব, প্রতারিতা আমি,
রচিব শাস্তি কঠোরতম।
দেখিনু খুঁজিয়া কক্ষে কক্ষে,
বিরাম-কুঞ্জে—সরসীতীরে,
কুসুম-আকুল উদ্যানমাঝে,
উচ্চ-শিখর-প্রাসাদ-শিরে।

৭

নিষ্ফল শ্রম; ফিরিল সকলে;
অজানা পথিক গিয়াছে চলি';
অজানা যেমন এসেছিল একা,
অজানা তেমনি গিয়াছে ছলি'।

নিষ্ফল ক্রোধে ফিরিনু যথায়
পতিপ্রেমহীনা দুঃখিনী নারী
মলিন ছিন্ন বসনে মুছিছে
দরবিগলিত নয়নবারি।
কেন সে আসিল? পরশে তাহার
লুপ্ত প্রেমের অমরা মোর!
সুখের স্বপনে ছিলাম বিভোর,
কেন সে টুটিল ঘুমের ঘোর?
আঁধারে ঢাকিল সুখের কিরণ
কেন সে দুঃখিনী?—তাহারি দোষ।
দুখিনীর 'পরে উঠিল জ্বলিয়া—
রাজবালা আমি—আমার রোষ।
চাহিনু বারেক মুখপানে তা'র—
ম্লান মুখখানি বিষাদে ঢাকা;
চরণ-লগ্ন সজল নয়ন—
প্রভাতকমল শিশিরমাখা।
আজি যে যাতনা- বিহ্বলা আমি—
কত দিন সেই যাতনা ভার
বহেছে দুখিনী হৃদয়ে তাহার!
দুখের অন্ত নাহিক তা'র।
অপগত-ক্রোধ রাজবালা আমি
বসিনু নগ্ন হর্ম্ম্যতলে;
গল বেড়ি' তা'র, নয়ন-সলিল
মিশানু তাহার নয়ন-জলে।

৮

সে অবধি দু'টি অভাগিনী নারী
তাহারি আশায় জীবন বাহি;
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী;—
চরণশব্দে চমকি' চাহি।
বাতায়নতলে বকুল-কুঞ্জে
কাঁপিলে পত্র, গাহিলে পাখী,
দুরু দুরু কাঁপে দু'খানি হৃদয়,
চমকিয়া চাহে সজল আঁখি।
নিদাঘে রবির দীপ্ত কিরণ,
বরষায় ঘন জলদরাশি,
শরতে তপনে জলদে মিলন,
হেমন্তে শস্যে সোনার হাসি,
কুহেলি-আঁধারে ঢাকা ধরা হিমে,
মাধবে মাধুরীমধুর ধরা;
বরষের পর বরষ পোহায়—
মোদেরি হৃদয়ে বিষাদ-ভরা।
পূর্ণ প্রাসাদ জনহীন যেন,
সুখলেশহীন সকল সুখ;
গত-অভিমান, প্রেমক্ষুধাতুর
রমণী-জীবনে কেবলি দুখ।
আশা-পথ চাহি' দিন কাটি' যায়,
জীবন-গ্রন্থি জরায় খসে।
জুড়া'বে না বুঝি দু'খানি জীবন
প্রেমের অমৃত-পরশ-রসে।

কঙ্কা

প্রথম অধ্যায়।

রাজনীতি।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা গণনা করিয়াও শেষ করা যায় না। স্বার্থপর, হীনবল ও বিলাসপরায়ণ রাজারা যে যাহার আপনার রাজ্যে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন, এবং সুবিধা পাইয়া মুসলমানেরা ধীরে ধীরে পঞ্জাব সীমান্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চন্দেল্ল-বংশীয় রাহিল রাজার পুত্র হর্ষদেব বুন্দেলখণ্ডের রাজা। আর্য্যই হউন, অনার্য্যই হউন, হর্ষদেবের স্বদেশানুরাগ ছিল। কি করিলে ভারতবর্ষ বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, সর্ব্বদাই তাহার উপায়-উদ্ভাবনে ব্যগ্র ছিলেন। সীমান্তপ্রদেশগুলি সুরক্ষিত করিতে হইলে দেশের সমগ্র রাজবল একত্রে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এই জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদেশের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

ভারতবর্ষ তখন ক্ষীণপুণ্য; মানবচেষ্টায় তখন তাহার উদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যোদ্ধা ও পণ্ডিতদিগকে লইয়া হর্ষদেব অপরাহ্নসময়ে সভা করিয়া বসিলেন; অমনই ভাটেরা তাঁহার যশের গান আরম্ভ করিল। রাজা ভাটদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি এই ক্ষুদ্র বুন্দেল-খণ্ডের শাসনকর্ত্তা মাত্র, আমাকে অযথা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া অপমান করিও না।"

রাজার আদেশে বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রত্যাগত দূতেরা একে একে আসিয়া রাজবর্গের অভিমতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কানোজ-প্রত্যাগত দূত কহিল, "মহারাজ, কানোজ-পতি মহেন্দ্রপাল দেব তাঁহার গুরু ও সভাপণ্ডিত কবিরাজ-শেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং উহার শিরোভাগে স্বহস্তে আপনার প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া দিয়াছেন।" রাজা গ্রন্থখানি লইয়া দেখিলেন, যে, লিখিত আছে, "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালং গচ্ছতি ধীমতাম্।" রাজা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িলেন। দ্বিতীয় দূত রাজার চরণতলে একখানি লিপি-

স্থাপন করিলেন। রাজা স্বয়ং তাহা পড়িয়া দেখিলেন যে, চেদিকুলের কলচুরি-বংশীয় মুগ্ধতুঙ্গ-প্রসিদ্ধধবল তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, "তিনি নিজে পরাক্রান্ত ও বাহুবলসম্পন্ন। ম্লেচ্ছ যবনদিগকে অনায়াসে দূরীভূত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে; তিনি অন্য রাজার সহিত দলবদ্ধ হইয়া আত্মগৌরব হীন করিতে চাহেন না।" হর্ষদেব মন্ত্রীকে বলিলেন যে, "ইহাকেই বিপত্তি কালের বিপরীত বুদ্ধি বলে।" ক্ষুদ্র কোশল-রাজকে পরাস্ত করিয়া এবং পূর্ব্ব সমুদ্রকূলের দুর্ব্বল রাজাদিগকে জয় করিয়া, কলচুরি রাজা অতি গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সময়ে চোলরাজ্যে বীরনারায়ণ বা পরান্তকদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেরল-রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া, অংশতঃ কেরলপতির সাহায্যে পাণ্ড্য রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা পর্য্যন্ত জৈত্রযাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজা পঞ্চম কস্‌সপকে (কাশ্যপ) একবার পরাভূত করিয়াছিলেন। হর্ষদেবের বিশ্বাস ছিল যে, বীরনারায়ণ সমগ্র দক্ষিণপ্রদেশের একাধীশ্বর হইতে পারিবেন। এই জন্য তাঁহার বিজয়-বার্ত্তায় আনন্দপ্রকাশ করিয়া আপনার অভিমতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পরান্তকের পত্রে কেবল এই কয়েকটি কথা ছিল;—"উত্তর ভারত বহুদূরে।" হর্ষদেব সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি নিজেই একবার অন্যান্য নিকটবর্ত্তী রাজাদিগের মন বুঝিবেন; তাহার পর যাহা হউক, একটা কিছুর অনুষ্ঠান করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রগল্‌ভা।

লুনীর জল বড় নির্ম্মল, বড় শীতল। অজমীর প্রদেশে এখন যেখানে তারাগড়, উহার দক্ষিণ দিক দিয়া এক সময়ে লুনী নদীর ধারা বহিয়া যাইত। সেই সময়ের কথাই বলিতেছি। অতি প্রত্যূষে নদীর শীতল জলে অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া, কুমারী কঙ্কুকা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। একালের রুচিতে কঙ্কুকা নামটা ভাল লাগিবে না; কিন্তু কবিত্বপ্রিয় পাঠকদিগের খাতিরে ঐতিহাসিক নামের পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।

নামটা যেমনই হউক, কুমারী হয় ত খুব সুন্দরী। কেন না, তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই, এক জন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক সন্ন্যাসী তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দেব-পূজার মন্ত্র ভুলিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ
শ্রবণতটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ
উষসি বদনবিম্বৈরংসসংসক্তকেশৈঃ
শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য। (১)

এই সময়ে অজমীয়ে নূতন চাহমান বা চোহান বংশের রাজত্ব চলিতেছিল। রাজা গোবকের পুত্র চন্দন তখন সিংহাসনে। কুমারী কঙ্কা রাজা চন্দনের সহোদরা।

সুন্দরী দেবপদে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে মস্তক অবনত করিলেন। সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি আপনার প্রণামগ্রহণের অযোগ্য; বিশেষতঃ, এই মন্দিরের মধ্যে দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ নমস্য নহেন।" কথা কি কেবল কণ্ঠের গুণেই মিষ্ট হয়? সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে কাহারও বাধা নাই; কুমারী সস্মিতবদনে কহিলেন, "স্বয়ং চাহমান-পতি আপনার ভক্ত; তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী আপনাকে প্রণাম করিলে ক্ষতি হইবে কেন?" সন্ন্যাসী এই পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন হইলেন, মনে হইল।

কুমারী হয় ত একটু প্রগল্‌ভা; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি মুগ্ধার চক্ষু। সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া কথা কহিবার সময়, পাতা দু'খানি যখন ঈষৎ উর্দ্ধে উঠিয়াই সুকোমল দৃষ্টিটুকু ঢাকিয়া অবনত হইল, তখন সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণটি প্রাচীন বক্ষোগৃহ ছাড়িয়া, যুবতীর ঈষন্মুক্ত দৃষ্টিপথ দিয়া সৌন্দর্য্যের নবমন্দিরে প্রবেশ করিল। মনোমোহিনী যদি চক্ষুর পাতা দুখানি আবার উন্মুক্ত করিয়া চাহিতেন, তথাপি পলাতক প্রাণটা ফিরিয়া আসিত কি না সন্দেহ।

ইহার পর হইতেই কুমারীর দেবভক্তি বাড়িয়া উঠিল। তিনি দু' বেলা মন্দিরে আসিতেন; এবং কখনও কখনও পরিচারিকা লইয়া আসিতেও ভুলিয়া যাইতেন। একদিন সন্ন্যাসী মন্দিরসোপানে বসিয়া বামকরে চক্ষু আবৃত করিয়া মানসপূজায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কুমারী মৃদুপদে নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। সায়াহ্নের আরতির জন্য তখনও দেবমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ

(১) সদ্যঃস্নাতা কামিনীর হের শোভা সুরুচির;—
বিলম্বিত কেশপাশ, অংসতল শোভিল;
পাটল উপান্তসম, আঁখি দুটি মনোরম,
আকর্ণবিশ্রান্ত মরি, কিবা শোভা ধরিল।
কনককমল সম, এ যে মুখ নিরুপম;
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন গৃহমাঝে বসিল।

হইল; তিনি নম্রস্বরে কুমারীর কুশলপ্রশ্ন করিলেন। কুমারী কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব; এবং আপনার শিষ্যা হইব।" কুমারী বড় প্রগল্ভা। তাহার পর উভয়ে কি কথোপকথন হইল, বলা দায়। কিন্তু মন্দিরের দ্বার মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই হৃদয় দুইটি মুক্ত হইয়াছিল।

উহা' পরদিন সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি ঘটক হইয়া কুমারী কঙ্কুকার সহিত বুন্দেলখণ্ডপতি হর্ষদেবের বিবাহসম্বন্ধ করিবেন। রাজা স্বীকৃত হইলেন; এবং সন্ন্যাসী লুনীর জলে স্নান আহ্নিক সম্পন্ন করিয়া অজমীর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কথাটা মনে রহিল যে, লুনীর জল বড় নির্ম্মল, বড় শীতল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমরক্ষেত্রে।

সন্ধি স্থাপিত না হইলে যুদ্ধ করিতে হয়, ইহা চিরকালের নীতি। চান্দেল্লপতি হর্ষদেব, বুন্দেলখণ্ডকে ভারতের কেন্দ্র করিবেন বলিয়া, ক্ষুদ্র রাজাদিগের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিবিধ স্থানে জয়লাভ করিবার পর চেদিবংশীয় কলচুরি রাজাদিগের সহিত সমর আরম্ভ হইল। গর্ব্বদীপ্ত মুগ্ধতুঙ্গ-প্রসিদ্ধধবল তখন পরলোকে; এবং তাঁহার পুত্র বালহর্ষ তখন রাজা। মধ্যপ্রদেশে এখন যেটা সগর জেলা, উহা চেদিরাজ্যের প্রধান স্থান ছিল। সগর জেলার উত্তরে ও বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ সীমায় সাহগড়ে উভয় পক্ষের সংগ্রাম হইয়াছিল।

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্নে একদিন দেবীপূজা করিবার পর রাণী কঙ্কুকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছাপন্না হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাজা যেন একখানি আলোকরঞ্জিত মেঘস্তরে উপবেশন করিয়াছেন, এবং তিনি রাজার পাদস্পর্শের জন্য যতবার হস্তপ্রসারণ করিতেছেন, ততবারই সিংহাসনখানিতে বাধা লাগিতেছে। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাণী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সমরক্ষেত্রেও স্বামীর নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। রাজা অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাণী তাহা শুনিলেন না। তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! চাহমানের মেয়ে যুদ্ধ দেখিয়া ভয় পায় না।" রাণী রাজাকে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেন।

সাহগড়ে সৈন্যকোলাহল ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফাল্গুনের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন মধ্যাহ্নসময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল; সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, তবুও কোনও পক্ষ নিরস্ত হইল না। সহসা রাণীর মনে কেমন একটা উৎকণ্ঠা জন্মিল, কোনও ক্রমে তিনি শিবিরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যগ্র হইয়া যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে

উঠিলেন ; এবং শিবিরস্থিত ৫০ জন পদাতিক লইয়া, 'জয় চন্দেল্লপতির জয়!' বলিয়া পার্শ্বদেশ হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। রাত্রিকালে নূতন সৈন্যের আগমনে পরিশ্রান্ত কলচুরি সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল ; এবং 'মার মার!' শব্দে বুন্দেলখণ্ডের সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

রণজয়ের পর রাজা ও রাণী একত্র প্রত্যাগমন করিলেন। রাণীর আদেশে অবিলম্বে জ্যোৎস্নালোকে মুক্ত আকাশতলে শয্যা প্রস্তুত হইল ; সমরসজ্জা পরিত্যাগ না করিয়াই রাজা সেখানে শয়ন করিলেন। রাণী রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিবামাত্রই বৈদ্য আসিলেন ; কিন্তু রাজা স্থিরভাবে বলিলেন, "চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না।" তবুও রাণীর অনুরোধে বৈদ্য রাজার ক্ষত বক্ষঃস্থলে ঔষধলেপন করিলেন ; এবং রাণী স্বহস্তে ঔষধ পান করাইয়া পতির মুখচুম্বন করিলেন।

হর্ষদেব পত্নীর করধারণ করিয়া বলিলেন, "একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে ; তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিবে না।" দেবী অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দেবতা, রমণীজন্মের যথার্থ সুখটুকু হইতে আমাকে কি অপরাধে বঞ্চিত করিবে?" রাজা বাহুবেষ্টনে রাণীর কোমল কণ্ঠ ধরিয়া কহিলেন, "দেবী, দেবদত্ত জীবন আত্মহত্যায় নাশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। সুখের আশা পরিত্যাগ কর ; দুঃখ বহন কর। উহাই জীবনের যথার্থ গৌরব। যে মন্ত্রে লূনীতীরে আমরা দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রে বালক যশোবর্ম্মাকে দীক্ষিত কর। পুত্রের জননী হইয়া আমার কামনা পূর্ণ করিবার জন্য জীবনধারণ কর।" রাণীর আদেশে পুত্র যশোবর্ম্মাকে আনিবার জন্য অশ্বারোহী ছুটিল।

পরিশিষ্ট।

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় সংগৃহীত লিপি হইতে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে, রাজার কামনা ও রাণীর সাধনা বহুপরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যশোবর্ম্মা মাতার নিকট যুদ্ধদীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গৌড়, খস্, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদি, কুরু ও গুর্জ্জর জয় করিয়াছিলেন।

তিব্বত (ভোট) রাজার নিকট হইতে কানোজ-রাজ একটি দেবমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, উহা কৈলাস হইতে আনীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ৯৪৮ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা কানোজ হইতে ঐ দেবমূর্ত্তি আনিয়া বৈকুণ্ঠ নামক একটি মন্দির গড়িয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতামাতার বৈকুণ্ঠকামনায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সহযোগী সাহিত্য।

গুজরাটী উপন্যাস।

"ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে সিভিলিয়ান মিষ্টার কিংকেয়ার্ড একখানি গুজরাটী উপন্যাসের অনতিদীর্ঘ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায়কে বুঝিবার পক্ষে, সেই সম্প্রদায়ের সাহিত্যই সর্ব্ব-প্রধান সহায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়াভাবে ভারত-প্রবাসী ইংরাজগণ প্রকৃতপক্ষে দেশীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তক বাছিয়া লইতে ও পাঠ করিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নন্দশঙ্কর টুলজশঙ্কর কর্তৃক প্রণীত "করণ-ঘেলো" নামক গুজরাটী উপন্যাসের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই ঐতিহাসিক উপন্যাস স্কটের উপন্যাসের মোহালোকে সমুজ্জ্বল।

উপন্যাসের নায়ক করণ-ঘেলো গুজরাটের শেষ রাজপুত রাজা। উপন্যাসবর্ণিত কালের ঐতি-হাসিক অবস্থার আলোচনা করিয়া আমরা উপন্যাসের পরিচয় দিব। উপন্যাসবর্ণিত কালে আলা-উদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্। তিনি ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে জেলালউদ্দীনকে নিহত করিয়া তদীয় সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতে মুসলমানের আধিপত্য পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গের কোনও কোনও অংশ ব্যতীত অন্যত্র স্থায়ী হয় নাই। মুসলমানপ্রাধান্য পারস্যে, আসিয়া: মাইনরে, আফ্রিকায় ও স্পেনে বন্যার জলের মত বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতে তাহা অতি মন্দগতিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল মাত্র। মহম্মদের যশঃপ্রভাব বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দূত পত্র লইয়া পারস্যাধিপতির নিকট উপনীত হয়—'মহম্মদকে ভগবানের প্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার কর।' পারস্যাধিপতি সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে দূত বলিয়া আইসে, পারস্যরাজ্য ছিন্ন পত্রখণ্ডেরই মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে মহম্মদ আরবের রাজা হইলেন; ইহার বিশ বৎসর পরে দুর্ব্বল পারস্যের সর্ব্বনাশ হইল। এজদিলার্ড পলাইয়া শেষে চীনে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুহিতৃত্রয়ের মধ্যে এক জন বন্দি-অবস্থায় জীবনত্যাগ করেন; এক জন আলীর পুত্র হুসেনের সহিত বিবাহিতা হয়েন; আর এক জন সৌরাষ্ট্রে আসিয়া পরিণীতা হয়েন। উদয়পুরের বর্ত্তমান শাসকগণ তাঁহার বংশধর। আফ্রিকা-বিজয়, স্পেন-পরাজয়—সবই স্বল্পায়াস-সাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য-সংস্থাপনের ইতিহাস অন্যরূপ। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমানের প্রথম পদার্পণ। কিন্তু ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমান ভারতবিজয়ের কল্পনা করেন নাই। সেই বৎসর মহম্মদ কাশিম সিন্ধুদেশ বিজয় করেন। কিন্তু সে বিজয়ও স্থায়ী হয় নাই। বিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান-প্রাধান্য ক্ষীণ হইয়া ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। ইহার ফলে সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর ভারতে আর মুসলমানের আক্রমণ হয় নাই। ইহার পর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।—সোমনাথের মন্দির আক্রমণকালে তাঁহার যে সকল সৈনিক প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের সমাধি আজও বর্ত্তমান।—কিন্তু তবুও ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য স্থায়ী হয় নাই।

শেষে তৈমুরের বংশধরগণ ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য স্থায়ী করেন। কিন্তু হিন্দুর অন্তর্নিহিত শক্তি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাই মোগলশাসন শিথিল হইতে না হইতে—আওরঙ্গজেবের

মৃত্যুকালে রাজপুতানায়, পঞ্জাবে ও দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের প্রাধান্ত অন্তর্হিত হইল, এবং অল্পকাল-মধ্যেই মোগল মহারাষ্ট্রীয়ের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। মুসলমান-প্রাধান্তের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। বহুবার মোগলবলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও রাজপুতের স্বাধীনতা-প্রিয়তা লুপ্ত হয় নাই। রাজপুত-সম্প্রদায়ের কোনও শাখা বা এই কালসময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—কোনও শাখা বা সামান্ত বশ্যতাস্বীকার করিয়া রক্ষা পাইয়াছে। মেওয়ারের অদম্য গর্ব্বে সামান্ত কলঙ্কস্পর্শমাত্র ঘটিয়াছিল। বিকানীরপতি ও অম্বরাধিপ তুর্ককে বংশের কন্তাদান করিয়াছেন, তিনবার চিতোর জনশূন্য হইয়াছে, তবুও উদয়পুরের শিশোদীয় রাজা বনে ও মরুভূমিতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন; বশ্যতাস্বীকার করেন নাই।

আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত কালের পূর্ব্বে গুজরাট মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক মুসলমানাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তখন স্বাধীন হিন্দু রাজপুত রাজা—করণ গুজরাটের অধিপতি। প্রথম অধ্যায়ে রাজধানী অনিলবাদপত্তনে দশারা উৎসবের বর্ণনা। এই শুভদিনে রাজার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনোদ্দেশে সমবেত জনগণের মধ্যে প্রধানত্রয়ের বর্ণনা এইরূপ,—

বাণ জাতিতে কুনবী। সে জনতায় তাঁহার মত সুগঠিতকায় ও প্রতিভাদীপ্তশ্রী আর কেহই ছিল না। তিনি রাজার কৃপায় জায়গীর পাইয়াছিলেন—বহু ভূসম্পত্তিও করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর—কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অনাহত। তাঁহার দেহ সুরক্ষিত—বুদ্ধি প্রখর ও অভিজ্ঞতা অসাধারণ।

বাণের সম্মুখে জৈন বণিক জেতশ উপবিষ্ট। তাঁহার বিস্তৃত কারবার। গ্রামে গ্রামে তাঁহার দোকান। তাঁহার নামের গুণে মরুভূমিও মুদ্রাপ্রসূ হইত। বিদেশে বহু বন্দরে তাঁহার বাণিজ্য-তরী গতায়াত করিত। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়মাত্র পাওয়া যাইত না। তিনি অতিকায়—তিনি মরিলে কি প্রকারে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেই চিন্তায় তাঁহার আত্মীয়গণ অধীর হইতেছিল! উদরে মাংসরাশি স্তরবিন্যস্ত, কোনও দ্রব্য স্তরদ্বয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সহজে তাহার উদ্ধারের আশা থাকিত না!

সেই জনতায় আর এক জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাধব নাগর ব্রাহ্মণ—বুদ্ধিমান। তিনি রৌপ্যাসনে উপবিষ্ট; গাত্রে কাশ্মীরজাত শাল, বাহুতে ও মণিবন্ধে অলঙ্কার, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়। দেহ ঈষৎস্থূল, বর্ণ শুভ্র, নাসিকা ও কর্ণ সুগঠিত—নয়নে প্রতিভাদীপ্তি। তিনি রাজমন্ত্রী। বুদ্ধি-বলে তিনি ক্ষমতাশালী। তিনিই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসক; রাজা পুত্তলমাত্র।

রাজপ্রাসাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত। গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত প্রাসাদের পাষাণপ্রাচীরের ও স্তম্ভরাজির বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীরগাত্রবহির্ভাগে রামায়ণে ও মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার চিত্র ক্ষোদিত।

প্রাতে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত-পূর্ব্বে প্রাসাদে শঙ্খনাদে ও ঢক্কাবাদনে রাজার শয্যাত্যাগবার্ত্তা ঘোষিত হইল। রাজা উঠিয়া অশ্ব পরিদর্শন করিলেন; পরে স্নানাদিসমাপনান্তে শিবপূজা শেষ করিয়া সমবেত ভিখারীদিগকে তণ্ডুলদানের আদেশ প্রদান করিলেন; তাহার পর অলঙ্কৃত হইয়া দরবারে চলিলেন।

দরবার-কক্ষ প্রশস্ত ও সুন্দর; স্তম্ভাবলী স্ফটিকনির্ম্মিত। হর্ম্ম্যতলে পুরু গদি, তদুপরি শ্বেত

আস্তরণ। দুই পার্শ্বে আসন, সিংহাসনের দুই পার্শ্বে পদমর্য্যাদা-অনুসারে কর্ম্মচারী প্রভৃতির আসন। পুত্রহীন রাজার সিংহাসনের পার্শ্বে যুবরাজের শূন্য সিংহাসন,—তৎপার্শ্বে মন্ত্রীর আসন। মাধব সুসজ্জিত হইয়া তাহাতে উপবিষ্ট।

আর এক পার্শ্বে রাজদূতগণের আসন। তাহার পর সামন্ত ছত্রপতি প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট স্থান। এক কোণে চর্ম্ম, অসি ও ছুরিকাধারী সেনাগণ দণ্ডায়মান। পণ্ডিত, জ্যোতির্ব্বী, চিকিৎসক প্রভৃতির অভাব নাই। আর এক দিকে ভাট, চারণ, চিত্রকর প্রভৃতি। আর এক স্থানে বহুরত্নাভরণে সুসজ্জিত নর্ত্তকীদল লাস্যলীলায় লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে। সহসা চোপদারগণ অগ্রসর হইয়া রাজার আগমন ঘোষিত করিল। সকলে আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা তরুণ যুবক—বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র—ব্যায়াম হেতু দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। রাজা সুন্দর। ওষ্ঠাধর দেখিলে বোধ হয়,তিনি একগুঁয়ে;—যাহা ধরেন,ভাল হউক মন্দ হউক, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়েন না। নয়নদ্বয় দীপ্ত। তিনি রাজপুত, অত্যন্ত সাহসী। তিনি চিন্তা করিয়া কাজ করেন না। তিনি কামুক। রাজার কপাল প্রশস্ত। রাজবেশ বহুমূল্য—মাথায় জরীর কায করা পাগড়ী—মুক্তাময় ও হীরকখচিত অলঙ্কারে বদ্ধ। স্বর্ণ পিধানে অসি—রত্নাদিখচিত।

দরবারের পর রাজাকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ ও রাজকবির গান শুনিতে হইবে; অপরাহ্নে নগরের বাহিরে একটি বৃক্ষকে পূজা করিতে যাইতে হইবে।

সন্ধ্যাকালে রাজা বিশ্রাম না করিয়া ছদ্মবেশে নগরের পথে ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই সময় রাজা মাধবের পত্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মাধবের পত্নী রূপসুন্দরীর বর্ণনা এইরূপ;—

রূপসুন্দরী পদ্মিনীজাতীয়া স্ত্রী। তিনি চারুচন্দ্রাননী; সে আননের সরস-শোণিমায় গোলাপের রক্তিমা পরাজিত হয়। মুখ-গহ্বর ক্ষুদ্রায়তন—ওষ্ঠাধর প্রবালবৎ। তিনি মৃদু হাসিলে মুক্তাপাঁতির মত দশনচয় দেখা যায়। তাঁহার নাসাভরণের মুক্তা যখন সেই প্রবাল ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে, তখন বোধ হয়, যেন রক্তপদ্মপর্ণে শিশির শোভা পাইতেছে। হাফেজ একটি বালিকার মুখে তিল-চিহ্নের জন্য সিরাজ ও বোখারা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, রূপসুন্দরীর গণ্ডেও সেইরূপ চিহ্ন।—নয়নদ্বয় দীর্ঘ ও কৃষ্ণতার, কজ্জলসজ্জিত নয়নপল্লবে নয়নের শোভা বর্দ্ধিত হইত। নয়নে স্নিগ্ধ দৃষ্টি—তবুও সে দৃষ্টিতে নরের চিত্ত বিদ্ধ হয়। ভ্রূযুগ রামধনুর মত, মদনদেব সেই ধনুকে গুণ দিয়া সহস্র সহস্র হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারিতেন। কপালে চন্দনবিন্দু—তুষারক্ষেত্রে রক্তবিন্দুর মত দেখায়। কবরীমুক্ত হইলে কেশরাশি কটিদেশ স্পর্শ করিত। তিনি বিধাতার অনিন্দ্য রচনা। কে এমন রূপ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে? মানুষ মানুষমাত্র।

এ রূপরাশি দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন। তিনি যে উপায়েই হউক, রূপসুন্দরীকে লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পর দিবস রাজকার্য্যের ছলে মাধব দূরে প্রেরিত হইলেন। রূপসুন্দরী প্রভাতে উঠিয়া কক্ষকোণে সম্মার্জ্জনী দেখিয়াছিলেন, সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে একটি বিড়াল তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গেল, বাতায়নপথে চাহিতে তিনি সম্মুখে এক জন বিধবাকে দেখিলেন। এই সকল দুর্লক্ষণে চঞ্চলচিত্তা রূপসুন্দরী মনে নানা আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমন সময় রাজসেনাদল গৃহ আক্রমণ করিল। মাধবের ভ্রাতা কেশব ভৃত্যবর্গের সাহায্যে গৃহরক্ষার চেষ্টা করিয়া নিহত হইলেন। তাঁহার

পত্নী গুণসুন্দরী পতির শব সহ চিতারোহণ করিলেন। শ্মশানের পথে রাজা ছদ্মবেশে তাঁহার আশী-র্ব্বাদলাভের চেষ্টা করিলেন। গুণসুন্দরী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন,—অভিশাপ দিলেন,—যেন রাজা গৃহহীন হইয়া মরুপথে প্রাণত্যাগ করেন; তাঁহার পত্নী পরহস্তে পতিতা হয়েন; তাঁহার দুহিতা বহু নিগ্রহ ভোগ করিয়া বর্ব্বরের করতলগত হয়েন; যেন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পুরীতে আসিয়া বাস করে; প্রজাদল রাজদুর্ভাগ্যভাগী হয়; রাজধানী নষ্ট হয়।

সতীর কথা ব্যর্থ হইবার নহে। আবার রাজদোষে রাজ্যে আর এক পাপঘটনা ঘটিল। এক জন বেণিয়া দুই হাজার টাকা ঋণ করে;—এক জন ভাট তাহার জামীন ছিল। সুদে আসলে তাহা চারি হাজারে পরিণত হয়। মহাজন বেণিয়ার নিকট টাকা না পাইয়া ভাটকে ধরিল। ভাট মহা-জনের টাকা শোধ করিয়া বেণিয়ার দ্বারস্থ হইল। সে তিন দিন অনাহারে বেণিয়ার দ্বারে পড়িয়া রহিল; তবুও বেণিয়া টাকা দিল না। তখন সে তাহার মাতাকে ও পুত্রকে আনিয়া বেণিয়ার দ্বারে হত্যা করিয়া তাহাকে সেই রক্তে সিক্ত করিল। তবুও টাকা না পাইয়া সে অবশেষে রাজদ্বারে প্রতীকারপ্রার্থী হইল; আশায় নিরাশ হইয়া সে রাজসমক্ষে আত্মহত্যা করিল।

এই সময় দিল্লীর সেনাদল রাজার রাজধানী আক্রমণ করিল।

মুসলমান সেনার রাজধানী-আক্রমণের মূল কারণ—মাধব। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, রাজকার্য্যে মাধবকে দূরে পাঠাইয়া রাজা তাহার পত্নীকে হরণ করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাধব দেখিলেন, গৃহ শূন্য, পত্নী অপহৃতা, ভ্রাতা মৃত, ভ্রাতৃবধূ সহমৃতা, তিনি স্বয়ং কর্ম্মচ্যুত। সুসময়ের বন্ধুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। প্রবল প্রতিহিংসাবহ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া মাধব দেবমন্দিরে গমন করিলেন। সতীপূজিতা ভবানী মুসলমানরমণীরূপে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া দিল্লীর পথ দেখাইয়া দিলেন। মাধব বহু কষ্টে আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মদিনোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিল্লীতে উপনীত হইলেন।

কালীমন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীর জনতা দেখাইয়া, লেখক, পাঠককে আলাউদ্দীনের রাজসভায় উপ-নীত করিলেন। আক্রমণকারী মোগলদলের অবশিষ্ট কয় জন করিপদপিষ্ট হইবে, এই দণ্ড প্রদত্ত হইল। যুদ্ধে ও অন্য সময়ে তাঁহার সকল কার্য্য মুসলমানধর্ম্মবিধানের অনুমোদিত কি না— সম্রাট ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, কাজী বলিলেন, সম্রাটের কার্য্য মুসলমানবিধানবিরোধী। সকলেই ভাবিল—কাজীর সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু আলাউদ্দীন কাজীর সাহসে প্রীত হইয়া তাঁহাকে উপহার দিয়া বলিলেন যে, মুসলমানবিধানে এক দিনও হিন্দুস্থান শাসিত হইতে পারে না।

শাহজাদার জন্মদিনে সন্ধ্যাকালে মিছিল বাহির হইল। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত রত্নরাজিতে সুসজ্জিত অশ্বগজাদি পথে বাহির হইল। এই সময় একটি হাউই বাজি জ্বলিয়া বাজির গাড়ীতে আগুণ লাগিল। চারি দিকে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল।

বিপুল জনতায় সকলে পরস্পরকে ঠেলিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে জনতায় পথ পাওয়া দুঃসাধ্য। শেষে এ উহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। হস্তী ও অশ্ব সকল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কেহ বা করিপদে, কেহ বা অশ্বক্ষুরে, কেহ বা অস্ত্রাঘাতে মরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লোক মরিতে লাগিল। ধনী দরিদ্র, প্রভু ভৃত্য, রাজা প্রজা, একত্র ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

শাহজাদার হস্তীও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মাহুত আর করিপৃষ্ঠে থাকিতে পারিল না। হাওদায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। শাহজাদার তখন লম্ফ দিয়া পড়িলে নরপদপেষণে পিষ্ট হইবার সম্ভাবনা যেমন নিশ্চিত, করিপৃষ্ঠে থাকিলে অগ্নিদগ্ধ হইবার সম্ভাবনাও তেমনই ধ্রুব। এই অবস্থায় মাধব তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তিনি প্রীত হইয়া পুরস্কার দিতে চাহিলে মাধব সম্রাটের সাক্ষাৎভিক্ষা করেন, এবং সম্রাটসমীপে সকল কথা নিবেদন করেন। সম্রাট গুজরাট জয় করিয়া তাঁহাকেই মন্ত্রী করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

দিল্লীর সেনাদল উপনীত হইলে করণের সেনানায়কগণ প্রস্তাব করিলেন, যুদ্ধ না করিয়া নগর-রক্ষার ও মুসলমানদিগের রসদ বন্ধ করিবার চেষ্টাই সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে আরও সেনাসংগ্রহ চলিতে থাকুক। কিন্তু করণ ধৈর্য্য ধরিতে জানিতেন না; তিনি বলিলেন, এ কার্য্য রাজপুতের যোগ্য নহে। তিনি সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলেন। দিনব্যাপী যুদ্ধের পর রাত্রিকালে উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া রাত্রির মত যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। সরলহৃদয় হিন্দুরা নিদ্রিত হইল। নিশার শেষভাগে যবনগণ অতর্কিতভাবে হিন্দুশিবির আক্রমণ করিল। হিন্দুরা পরাজিত হইল। রাজা আহত হইয়া পলায়ন করিলেন। রাণীরা জহরে জীবন-বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই পুরী মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। পাটরাণী ঝালাবাদে পিত্রালয়ে যাইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ধৃত হইয়া আলাউদ্দীনের নিকট প্রেরিতা হইলেন। সতীর অভিশাপের একার্দ্ধ পূর্ণ হইল।

কয় বৎসর পরে করণের সহিত পাঠকের পুনরায় সাক্ষাৎ। তখন তিনি দেওঘরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা রামদেবের বেগনান দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। পাটরাণী পিত্রালয়যাত্রাকালে কন্যাদ্বয়কে—কনকদেবী ও দেবলদেবীকে ঝালাবাদে প্রেরণ জন্য ভৃত্যকে আদেশ করেন। ভৃত্য পথে অবগত হয় যে, করণ বেগনান দুর্গে। তাই সে ঝালাবাদে না যাইয়া কন্যাদ্বয়কে পিতৃসমীপে আনয়ন করে। পাঁচ বৎসর পরে জ্যেষ্ঠার মৃত্যু হয়—উপন্যাসবর্ণিত কালে কনিষ্ঠার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

এই সময় রামদেবের পুত্র সঙ্কলদেব ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে দেবলদেবীকে উদ্ধার করেন। উভয়ের মনে প্রেমসঞ্চার হয়। রামদেব দেবলদেবীকে পুত্রবধূ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু করণ রাজপুত, রামদেব মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। উদ্ধত করণ এই অপমানকর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল। করণের পাটরাণী আলাউদ্দীনের প্রিয় মহিষী হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে কন্যার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার পরামর্শে আলাউদ্দীন বেগনানে ও দেওঘরে সৈন্য পাঠাইলেন। করণ বেগনানে মুসলমানের গতিরোধের প্রয়াসী হইলেন। বেগনান অবরুদ্ধ হইল। শেষে দুর্ভিক্ষদুঃখে নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবসরে করণ কন্যাকে ও রামদেবের দ্বিতীয়পুত্র ভীমদেবকে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথে এক দল মুসলমান তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দেবলদেবীকে হরণ করিল, এবং দিল্লীতে পাঠাইল। সেখানে শাহজাদা তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

এ দিকে রামদেব মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, রাজ্যরক্ষা করিলেন। করণ বিরক্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রামদেবের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যুবক সঙ্কলদেব মুসলমানকে করদানে অস্বীকৃত হইলেন। করণের পরামর্শে তিনি শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে মুসলমান সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই যুদ্ধে করণ নিহত হইলেন।

পুস্তকে উদ্ধত বীর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কামুকের পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। প্রধান চরিত্র ব্যতীত পুস্তকের নানা খণ্ডচিত্রও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। অর্থগৃধ্নু ব্রাহ্মণগণের চিত্র, সন্ন্যাসীর মেলা—সকলই সুন্দররূপে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাগ্রে অঙ্কিত। পুস্তকে গুজরাটের চিত্র ও চরিত্র, আচার ও ব্যবহার, প্রথা ও সংস্কার—বর্ণিত। পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশও চিত্তাকর্ষক।

আলোচ্য পুস্তক হইতে বোধ হয়, গুজরাটে উপন্যাসের উন্নতি নিতান্ত পণ্য নহে।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

উৎসর্গ।

কবিবর মাইকেল মধুসূদনের প্রতি।

হে মধু, আছিলে যবে এই ধরাধামে,
ছিল তব ও বদন সুহৃদ-রঞ্জন,
নীলোৎপল ঢল ঢল সহাস লোচন,
মোহিনী কবিতা দেবী, (রতি যথা কামে)
গলে দিয়া বরমাল্য ও মূর্ত্তি সুঠামে
মোহিয়া, সৃজিয়া মরি নব বৃন্দাবন,
কেলিকদম্বের তলে, শ্রীমধুসূদন!
অর্চ্চিলা ও পাদপদ্ম, রাধা যথা শ্যামে।
হে গুরো, কখন তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব, দ্রোণশিষ্য একলব্য সম,
মানসে গড়িয়া তব মূর্ত্তি নিরুপম,
শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা তোমারি সদনে।
যা রে শর! স্বর্গে গিয়া শ্রীগুরুচরণ
ক'রে আয়, ক'রে—আয়, আনন্দে বন্দন!

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী।

হে রাজেন্দ্র! বামনেত্র করিছে স্পন্দন,
মুহুর্ম্মুহু। হেরিয়াছি গত নিশাকালে,
ইন্দুহাসি ইন্দুভাতি অমলা কমলা।
পদ্মালয়া পদ্মগন্ধে মোহিয়া আমারে,
সুখস্বপ্ন ফুলদল ঢালিয়া পরাণে,
কহিলেন বীণাস্বরে আনন্দরূপিণী!—
"স্নান করি', শুদ্ধচিত্তে, সরযূর নীরে,
বিনাইয়া চারু বেণী, পর নীলাম্বরী,
লো কৈকেয়ী! ভাগ্যবতী, রঞ্জিয়া চরণ
অলক্তে, সর্ব্বাঙ্গে কর চন্দনলেপন।
নিশান্তে পাইবি তুই ধনরত্নরাশি!
তরুতলে দাঁড়াইলে, শারদী শেফালী
ঢালি' দেয় যথা শুভ্র ফুল রাশি রাশি
নিশান্তে, নিশান্তে কালি দশরথ রাজা
ভরি' দিবে ও অঞ্চল রতনে রতনে!
বিশাল ললাটে তোর ওলো সুলোচনা,
জ্বল জ্বল, জ্বলে আজি সৌভাগ্যতারকা।"
পোহাইল বিভাবরী। এই রাজপুরী
আনন্দে করিছে নৃত্য; চঞ্চলা, বিহ্বলা,
অধীরা, খসিয়া পড়ে কবরীকুসুম,
করিয়াছে পান যেন সুতীব্র মদিরা।
বাজে বীণা, প্রাণ ঢালি' বাজিছে মুরলী,
ফুল-ছড়াছড়ি আর ফুল-কাড়াকাড়ি,

অকালবসন্ত যেন এসেছে, এসেছে!
পরি' ফুলদাম, পাতি' ফুলশয্যা মরি
সাজিয়াছে রসময়ী নবীনা নাগরী
যেন এ নগরী! কলহাস্যে নেচে উঠে
তরুণ তরণী! ধায় চৌদিকে, কৌতুকে,
সুসজ্জিত লোকসঙ্ঘ পঙ্গপাল সম!
কেন না ফলিবে আজি সুখস্বপ্ন মম?
আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও, আনিতে ত্বরিতে
মহারাজ! রাজহর্ম্ম্যে আছে যে উজ্জ্বল
রত্নরাজি, নেত্রসুখ, নয়নকৌমুদী,
সুন্দরীর শুভ্রহাসি, শুভদৃষ্টি সম!
অবশ্য ফলিবে আজি সুখস্বপ্ন মম।
কঞ্চুকীরে পাঠাইয়া, রত্নাগর খুলি'
আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও, আনিতে ত্বরিতে।
নিরখি রত্নের ঘটা, কাঞ্চনের ছটা,
কে না জানে নারীকুল, হায় এ জগতে,
ঝাঁপাইয়া পড়ে সেই উজ্জ্বল অনলে,
বাহুপক্ষ বিস্তারিয়া, পতঙ্গের মত?
সুশুভ সংবাদ দেব! সুশুভ সংবাদ!
এ হেন কল্যাণবাণী শোননি জীবনে।
দাতৃশ্রেষ্ঠ! তাই আজি, আশাদৃপ্তা হয়ে,
আসিয়াছি, আসিয়াছি, কল্পতরুমূলে!
রাজপ্রসাদের লোভে, ভয়লজ্জা ছাড়ি',
দুঃসাহসে বাঁধি' বুক, প্রগল্‌ভা কৈকেয়ী,
তাই আজি দিতে চায়, উৎফুল্ললোচনে,
তব শ্রীচরণে ভূপ, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি',
সাত রাজত্বের ধন এ সংবাদমণি।
এ জ্যোৎস্না-পরশে তব পরাণ-কুমুদী
ফুল্ল হ'বে, সারা তুমি হইবে আহ্লাদে।
মুক্তহস্তে দাও তবে, দাও তবে আজি,
শত মুক্তাবলী আর শত রত্নাবলী
এ দাসীরে! হে রাজেন্দ্র, দাও দাও আজি,
রত্ন-মালঞ্চের তব ফুল্ল ফুল-সাজি!
আরক্ত অশোক জিনি' লাল পদ্মরাগ
(অলক্তের রাগ যেন কৌশল্যা-চরণে!)
ইন্দ্রনীল কামিনীসোহাগ! ইন্দুলেখা-
উদ্গারিণী চন্দ্রকান্ত মণি! গজমুক্তা
(হে রসিক, সুমিত্রার দন্তপাঁতি সম
কি উজ্জ্বল! লাবণ্যেতে সদা ঢল ঢল)
দাও দাও স্বর্ণ-থালে আনি'! আন, আন,
নাগিনী-কুন্তল-শোভা অপূর্ব্ব মাণিক!
উষাহাসি জিনি' আহা অনুপম হীরা
(পাতিয়াছি দুই হস্ত) দাও শীঘ্র করি!
বসন্ত-উৎসব-দিনে হে চারু নাগর,
কৌশল্যার কম্বকণ্ঠে দিতে যাহা হাসি',
আন সেই স্বর্ণহার, জড়ায়ে যতনে
নাগদন্তে! রত্নচেলী, কাঞ্চন কঙ্কণ,
সিঁথি, কাঞ্চী সম্মোহন, অরবিন্দ-ছটা!
হে সম্রাট, তোমার ও বিরাট ঐশ্বর্য্য—
কি ভয়? কভু কি ক্ষয় হয় ও ভাণ্ডার?
পারিজাত, নাগেশ্বর, শ্রীহরিচন্দন,
(মদন-উৎসব-কথা পড়ে কি হে মনে?)
দেবপুষ্প সুমন্দার—অমৃত-ফোয়ারা,
খুলি' দাও! অবগাহি আকর্ণ ডুবিয়া!
কি কহিব? হে বল্লভ, পাদপদ্ম তব
সত্যই ভেটিব আজি অপূর্ব্ব সংবাদে!
আইবুড়া-কানে যথা বিবাহের কথা,
ঢালি' দিব কর্ণে তব সঞ্জীবনী সুধা!
পাইবে নব যৌবন, ঘুচে যাবে জরা!
শুনিবে? শুনিতে চাহ অমৃত-বারতা?
শোন তবে মন দিয়া শ্রবণললাম
এ সংগীত,—ইন্দ্রালয়ে উর্ব্বশীর গীতি!
ছাড়ি' এ ধর্ম্মের পুরী হে অযোধ্যাপতি,
রুক্ষ জটা, হস্তে শূল, গেরুয়া বসন,
ভালে ললাটিকা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা,
দিঘল নিশ্বাস ফেলি' তব রাজপথে,
হেলায় হইয়ে পার, সরযূ, নর্ম্মদা,
লীলায় করিয়া ভেদ ঘোর বিন্ধ্যাটবী,

দূর পঞ্চবটী বনে, নিবিড় কান্তারে,
কৈকেয়ী, ভৈরবীবেশে, যাবে চলি' আজি!
ধর্ম্মরাজ! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠে
আকাশে; অধর্ম্ম করে পাপাচার যদি,
করে তাহা অন্ধকারে, দূর গৃহকোণে।
লজ্জায়, মুখস পরি', দুটি চক্ষু বুজি';
তুমি আজি হে নরেন্দ্র, কেমনে অবাধে,
দিয়ে জলাঞ্জলি তব কুলশীলমানে,
দিবাভাগে, তপনের তীব্র স্ফূটালোকে,
পূর্ব্ব সত্য পাশরিলে, ধর্ম্মে বিসর্জ্জিলে?
হে সূর্য্যের বংশধর কোন্ মতিভ্রমে,
সূর্য্যের সুমুখে দিলা ছাই ভস্ম ধূলা?
কেমনে, ভরতে লজ্বি' রামচন্দ্রে আজি,
দিয়ে তুচ্ছ যৌবরাজ্য, হা ধিক্ নৃমণি!
মাথায় বহিতে চাও কলঙ্ক-পশরা?
কিন্তু আমি বৃথা কেন করি এ রোদন
অরণ্যে? অমিতবল সর্ব্বশক্তিমান্
তুমি, শত অশ্বমেধ যজ্ঞে, হে রাজেন্দ্র,
বলীয়ান্ তুমি!—ভীম গঙ্গার প্রবাহে
হা লজ্জা! রোধিবে কিসে ক্ষুদ্র ইন্দ্রকরী!
আমার কি সাধ্য দিব ধর্ম্ম-উপদেশ
তোমায়? ধার্ম্মিক তুমি! কে জ্বালে প্রদীপ
দিবসে? কে বর দেয় বরদা চণ্ডীরে?
শিখাইয়া দিব আজি আমার ভরতে—
(আহা বাছা চিরদুঃখী) চাঁচর চিকুর
মুড়াইয়া, মৃগচর্ম্ম পরি', ক্ষীণহস্তে
কমণ্ডলু ধরি', ভস্ম মাখি' সর্ব্ব অঙ্গে,
সাজিবে সে আহা মরি নবীন সন্ন্যাসী।
হে রাজন্ আমার এ পাষাণ-পরাণ,
পুত্রবরে ক্রোড়ে করি, মন্ত্র দিয়া কানে
কহিব, 'যাও রে বাছা যমুনার ধারে,
বালক ধ্রুবের মত, দুটি হস্ত জুড়ি',
ডাক রে কাতরে সেই রাজরাজেশ্বরে
অন্তর অন্তরে,—বাছা রে অযোধ্যারাজ্য
কি ছার! পাইবি তুই অনন্ত সাম্রাজ্য।'
হে রাজর্ষি! জন্ম মম নহে নীচকুলে;
রাজার ঝিয়ারী আমি রাজপুত্রবধূ!
ভুবনবিখ্যাত রঘুবংশ-অবতংস
অধিনীর স্বামী! গালি দাও, কর ঘৃণা,
বক্ষে কর পদাঘাত হে স্বামিন্, তবু,
কৌস্তুভ-রতন সম বুকে লব পাতি'।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, আশৈশব আমি
শিখিয়াছি এই মন্ত্র—'পতিই দেবতা!'
নলিনীর কমকান্তি পোড়ায় অনলে
তপন, সে রবি পানে তবুও নলিনী
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পতিগতপ্রাণা!
হে নরেন্দ্র, ঘোর বনে, তপস্যার হেতু
পশিয়া, পূজিব যবে চণ্ডিকা দেবীরে,
হে স্বামী, করিব আগে কল্যাণ-কামনা
তোমার, মাগিব বর,—'দাও প্রাণনাথে
চির আয়ু, রসময় সুচির যৌবন।'
ইষ্টদেবতারে, দেব, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি'
মাগিব কৌশল্যা লাগি' অনন্ত যৌবন,
আয়ত কমল-আঁখি, ফুল-শরে ভরা,
বিম্বাধরে হাসিরাশি, পীন পয়োধরে
কি লাবণ্য! সেই ললিত কঠিন স্পর্শে
হর্ষে টুটি' খসি' যাবে মুকুতার মালা।
বুকে দাগা দিলে তুমি, তবু নরমণি,
মুক্তকণ্ঠে তব যশ গাইব চৌদিকে।
গঙ্গাষ্টক, শিবস্তব, বিষ্ণুনামমালা
গায় যথা ভক্তগণ, তব গুণাবলী
বিরচি' হে গুণিশ্রেষ্ঠ, জলধিগর্জ্জনে
উচ্চারিব, গঙ্গোত্রীর প্রপাতের মত
নিনাদিয়া; শুনাইব বিশ্ব চরাচরে!
দুটি ঋষিবালিকারে কাছে ডাকি' আনি'
একেরে শিখায়ে দিব অপরে শুধাতে,
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন নরপতি?'
অপরা উত্তর দিবে আমার ইঙ্গিতে—

'অযোধ্যার পতি, আহা অযোধ্যার পতি!'
শিখাব বালকবৃন্দে এ ধর্ম্মকাহিনী।
পাঠশালে গুরু যবে শুধাবে বালকে,—
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন নরপতি?'
বালক উত্তর দিবে গম্ভীরবদনে,—
'অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি!'
নিরাশ, সজলনেত্রে, পাটল অধরে,
হস্ত রাখি' মহাকষ্টে মরমের স্থলে
কহিবে, 'কোথায় গেলে এ জ্বালা জুড়াবে?
জগতে দীনের বন্ধু কোন মহামতি?'
আমি আশ্বাসিব তারে মধুর বচনে,
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, কাশীতে, পুষ্করে,
নৈমিষ-অরণ্যে দূর বদরিকাশ্রমে,
ঋষিমণ্ডলীর মাঝে উঠিবে এ প্রশ্ন,—
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন মহামতি?'
আমি দিব সদুত্তর, ত্রিশূল ঘুরায়ে,
'অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি!'
বাসরে সধবাবৃন্দ, করি' হুড়াহুড়ি,
সুধাইবে কূট প্রশ্ন সুসজ্জিত বরে,—
'এই বিশ্বে অতুলন কোন নরপতি?'
বর হয়ে সন্দিহান তাকাবে চৌদিকে!
কঙ্কণ-আঘাতে বরে চেতায়ে কৌতুকে,
রঙ্গিনীরা হাসি কবে, 'শোন মূঢ়মতি,
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
কৈলাসশিখরে গিয়া হেরিব আহ্লাদে
হরগৌরী; রক্তজবা বিল্বদল দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' দোঁহে, বৃষভের গলে
কৌতুকে দোলায়ে দিব অতসীর মালা!
সুহাসিনী সুধাবেন, 'বল লো যোগিনী,
বিশ্বমাঝে অতুলন কোন্ নরপতি?'
আমি উত্তরিব, 'মাগো কি না জান তুমি?
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
শুনি' কথা, মহাহর্ষে ভূতপ্রেতদল,
এই কথা বারবার, নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিবে, কন্দুক সম কথা-লোফালুফি
করিবে,—কহিবে, 'বিশ্বে অতুল্য ভূপতি
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি!'
আছে ধর্ম্ম; হে রাজর্ষি, চিরকাল দিবা
রহে কি? প্রদোষে আসে ঘোরা তমস্বিনী!
কৌশলে চালায় রথ কাল মহারথী,
রথের ঘর্ঘর-শব্দ শুনিছ না কানে?
কি আশ্চর্য্য! হে কুহকী, নিম্ববৃক্ষ রোপি,
চাহ তুমি তাহা হতে চন্দনসৌরভ
ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ? দেখিব কৌতুকে,
কবে কোন্ কালে তরু ধরে নিজ ভালে,
রসাল পিয়াল, ঢালে অমৃতের ধারা?

* * *

হে রাজেন্দ্র, রাজপদে ছিল নিবেদিতে,
যা' যা' কথা, সব কথা নিবেদি সভয়ে,
খুলি' অঙ্গ-আভরণ, এই অবসরে
ডাকি' নর্ম্মসখীবৃন্দে কহিনু গোপনে;—
'আর কেন? লো মন্থরা, সাজা তবে আজি
যোগিনী!—নয়নে তোর কেন অশ্রুবারি?
হেন অমঙ্গল কেন করিস্ ভামিনী
এ উৎসবে? কৈকেয়ীর সুপ্রভাত আজি!
টুটি' যাবে চিরতরে মায়ার বন্ধন
কৈকেয়ীর! দেখ্ দেখ্ সখী সুলোচনা,
কেমন সেজেছে এই গেরুয়া বসন
অঙ্গে মোর! ছি ছি! বোন্, এই অলক্ষণ
কেন তোর?—পরাইতে রুদ্রাক্ষের মালা,
দুটি তপ্ত অশ্রুবিন্দু ফেলিলি লো আলি,
বাম হস্তে! সখী, ভেদিয়া পাষাণপ্রাণ,
আমারও বহিছে, হের, নয়নের বারি!
কি বলিলি; 'থাক্ দুটি শাখার কঙ্কণ
দুটি হস্তে!'—ভিখারীরে সাজাবি সুন্দরী?
এ দুঃখেও হাসি আসে শুনি' তোর কথা!
চলিনু—চলিনু তবে বিজন বিপিনে

একাকিনী। কোথা তুই অয়ি নিস্তারিণী?
রাজকন্যা ভিখারিণী, আজন্মদুঃখিনী।
আঁধার আঁধার বিশ্ব! দু নয়ন আঁধা;
প'ড়ে মরি, প'ড়ে মরি আমি! কি গর্জ্জন!
সংসার-জলধি, বিস্তারিয়া শত হস্ত,
গ্রাসিবারে চাহে এলোকেশী। রক্ষ মা গো!
এ বিপদে, তনয়ারে তার ত্রিনয়নী!
মিটেছে মিটেছে সাধ! এই রসাস্বাদে
সুধু পরমাদ মাগো, সুধু অবসাদ।
আমার বক্ষের মাঝে, প্রাণপক্ষী দুঃখী
ত্রাহি ত্রাহি করে নিস্তারিণী! এ শৃঙ্খল
খুলি' দাও, কাটি' দাও মায়ার বন্ধন।
যাক চলি' এ বিহগী বনস্থলী মাঝে,—
মাগো? তোর ও চরণ আনন্দ-কাননে,—
যথা সদা নিত্যানন্দ, কোকিলকূজন,
চিরবসন্তের রাজ্য, নির্ঝর উছলে,
শত ফুলে ইন্দ্রধনু রাজে ফুলে ফুলে।
গায় শ্যামা, ধায় অলি গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'! *

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "শারদ-প্রভাতে" সহজ সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা, ধারাধৌত যূথীর ন্যায় সুরভি ও নির্ম্মল। রচনাটি স্বদেশবিরহীর বেদনায় ও করুণায় অনুপ্রাণিত, কিন্তু সে বেদনায় বিষাদ নাই, সে করুণায় অশ্রু নাই। শারদসমাগমে প্রবাসী কবির উদাসী চিত্তে মাতৃভূমির যে সৌন্দর্য্যস্মৃতি জাগিয়াছে, তাঁহার কবিতা মুকুরে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সহৃদয় কবির আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্বর্গীয় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত রচনায় বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এখনও চলিতেছে। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকে এত বর্ণাশুদ্ধি অসহ্য। ২৯৬ পৃষ্ঠায়, "সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবা-পরম্" এই চরণে ছন্দঃপতন হইয়াছে। "শিবালয়ং শূলাবচিত্রচূড়ম্" প্রভৃতিরও অভাব নাই। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর "অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব" বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ও সুখপাঠ্য। কিন্তু ভাষার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এক স্থলে লেখক বলিতেছেন, "আলোক-চিকিৎসা প্রণালী এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু ফিন্‌সেনের হস্তে এই প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতির আশা করা যাইতেছে।" কিন্তু হায়, লেখকের এ আশা পূর্ণ হইবার নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ফিন্‌সেন লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি এখন যে লোকে, সেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং "ফিন্‌সেনের হস্তে উন্নতির আশা" লুপ্ত। "নিশার স্বপন সম তব এ বারতা হে দূত!" ইত্যাদি—[মাইকেল; ঈষৎ-পরিবর্ত্তিত।] কিন্তু দেনমার্ক বঙ্গ নয়, সেখানে অনুষ্ঠাতার সঙ্গে সঙ্গে

* সাহিত্যে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা" ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে কবির "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা" সম্বন্ধে আমরা যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা"র সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। যদিও এই অভিনব কাব্যখানি অমর মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের পদানুসরণে লিখিত, তথাপি ইহাতে অনুকরণের গন্ধ নাই। মূলকাব্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সহৃদয় পাঠক স্বীকার করিবেন যে, অভিনব কাব্যখানি সুন্দর, সরল ও মৌলিকতাপূর্ণ। অমিত্রাক্ষর রচনাতেও কবি সিদ্ধহস্ত।—সাহিত্য-সম্পাদক।

অনুষ্ঠানের মৃত্যুশঙ্কা নাই। বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় ফিন্‌সেনের আবিষ্কারের মূলসূত্র ধরিয়া ক্রমে সত্যের মন্দিরে উপনীত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মাতৃ-হীনা" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি করুণরসে অভিষিক্ত। মাতৃহীনা তারার দুঃখে হৃদয় অভিভূত হয়, অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আমরা বহুদিন এমন করুণ-কাহিনী পাঠ করি নাই। চতুর্থ অধ্যায়ে স্থলেখক দীনেন্দ্রবাবু আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। মাতৃস্নেহবঞ্চিতা দুর্ভাগ্য বালিকার চিত্র-রচনায় দীনেন্দ্র বাবু যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন; সে ছবি দেখিলে সঞ্জীববাবুকে মনে পড়ে। সঞ্জীববাবুর শিশু-চিত্র র‍্যাফেলের 'এঞ্জেলে'র মত চিরসুন্দর, অনুকরণের অতীত। হায়! বাঙ্গলা সাহিত্যে সে তূলির আর উত্তরাধিকারী নাই। "মাজুকা" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্বাক্ষরিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। ডিমিশা রুস সৈন্য। জাপানীরা তাহাকে বন্দী করিয়াছিল। ফিরোশী জাপানী যোদ্ধা; সে ডিমিশার রক্ষার ভার পাইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত গল্প। তাহার পর উপকথা। ফিরোশী ছুটী পাইয়া গৃহে চলিল;—ডিমিশাকেও সঙ্গে লইয়া গেল। তাহাদের গ্রামে মাজুকা নাম্নী এক বিধবা ছিল। ফিরোশী মাজুকাকে ভালবাসিত, কিন্তু মাজুকা ফিরিয়া চাহিত না। ডিমিশার সহিত বিধবার পরিচয় হইল। উপসংহারে সে জাপানী বামনকে উপেক্ষা করিয়া ষণ্ডা রুসকেই পতিত্বে বরণ করিল। মাজুকার কাণ্ড দেখিয়া মোপাসাঁর চিত্রিত একটি গণিকাকে মনে পড়ে। ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মন্ যুদ্ধের সময় এক দল ফরাসী নাগরিক—তন্মধ্যে দুই তিন জন সস্ত্রীক—প্রুসীয় সৈন্যের আক্রমণ-শঙ্কায় 'ওম্‌নিবস্' যানে অন্য নগরে পলায়ন করিতেছিল। একটি গণিকাও সেই ওম্‌নিবসের যাত্রী ছিল। বেশ্যার সাহচর্য্যে সঙ্কুচিত যাত্রীরা মনের সাধে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিল। তাহারা মধ্যপথে একটি গ্রামে উপনীত হইয়া দেখিল,—ইতিপূর্ব্বেই গ্রামটি প্রুসীয় সৈন্যের অধিকৃত হইয়াছে। ওম্‌নিবসের যাত্রীরা গ্রাম্য পান্থশালায় আশ্রয় লইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রুসীয় সেনাপতি গণিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। গণিকা সাক্ষাৎ করিতে গেল, এবং ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। সেনাপতির সহিত তাহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সে কাহাকেও তাহা বলিল না। প্রভাতে আবার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিবার কথা। কিন্তু ওম্‌নিবসের চালক জানাইল, 'সেনাপতির নিষেধ, যাইবার অনুমতি নাই।' সকলে বিস্মিত হইল। সন্ধ্যার সময় পান্থশালার অধিকারী জিজ্ঞাসা করিল, 'এলিজাবেথ রুসে কি মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন?' গণিকা দৃঢ়স্বরে বলিল, 'না।' সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতেও যাত্রীরা জানিল,—যাত্রা করিবার অনুমতি নাই। সে দিন সন্ধ্যার সময় পান্থশালার অধ্যক্ষ আবার জিজ্ঞাসিল,—'এলিজাবেথ রুসে কি মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন?' রুসে আবার বলিল, 'না।' পর দিন সন্ধ্যার সময় আবার এই প্রশ্ন;—উত্তরে এলিজাবেথ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, 'Never, Never, Never.' যাত্রীরা জানিতে চাহিল,—ব্যাপার কি? এলিজাবেথ কিছুতেই বলিতে চাহে না,—অবশেষে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বলিল, "পাজী আমাকে চায়—আমি কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।'—গণিকার দৃঢ়তায় যাত্রীদের আনন্দের সীমা রহিল না। সাধুবাদের বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু যখন বুঝা গেল, সেনাপতির ধনুর্ভঙ্গ পণ, গণিকা তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে আর মুক্তির উপায় নাই—তখন সকলের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নানা ছলে কলে কৌশলে তাহাকে সেনাপতির অঙ্কশায়িনী করিয়া যাত্রীর দল মুক্তিলাভ করিল। এলিজাবেথ যখন দেশের শত্রুর স্পর্শে কলুষিত ও জীবন্মৃত হইয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল, তখন তাহার কি রোষ, কি ক্ষোভ, কি লজ্জা।—নগেন বাবুর মাজুকা এই গণিকার পদধূলির যোগ্য নহে। তবে মোপাসাঁ স্বাধীনতার পুণ্যতীর্থ ফ্রান্সের বরপুত্র, নগেন্দ্রবাবু সপ্তশত-বর্ষব্যাপী 'পয়জারে' পীড়িত বাঙ্গালীর ঔপন্যাসিক। শাস্ত্রকার সত্যই বলিয়াছেন,—"প্রবৃত্তিরেষাং ভূতানাম্।"

উদ্বোধন।—আশ্বিন; ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ কাঞ্জিলালের "সৃষ্টিতত্ব" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতে তিন বৎসর" যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত বিরল। শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার

"ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার"প্রবন্ধে স্বর্গীয় কর্ম্মবীরের জীবনের ও হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। "বৈজ্ঞানিক প্রমাণপ্রয়োগে সত্যনির্ব্বাচন করিতে যাইয়া তাঁহার (ডাক্তার সরকারের) হৃদয় শুষ্ক না হইয়া বরং তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা, সরলতা, ও ঈশ্বরবিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল", আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙ্গলা ভাষায় পারমার্থিক গান রচনা করিতেন, ইহা সাধারণের পক্ষে নূতন সংবাদ। আমরা সরসীবাবুর প্রবন্ধ হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

"দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগনমণ্ডলে।
কি শোভা করেছে সেথা গ্রহতারাদলে॥
(যেন) প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পদলে।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণকমলে॥
দূরবিন সহকারে বিজ্ঞানের বলে।
(দেখ অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে' ॥
দেখিবে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য।
চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে॥
ছড়ায়ে ধূলি এক মুষ্টি, তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি,
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ধূলাখেলার ছলে॥
সঙ্কর ও মহাপ্রলয় করিতে নিবারণ,
বন্ধন করেছেন তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলে,
নিয়মপালনে তারা ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ,
অপার মহিমা তাঁর গাইতেছে সবে মিলে॥"

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পুঁটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত লিখিতেছেন। শ্রীশবাবু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রচনাও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। রাণী শরৎসুন্দরী সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানেন, তাঁহারা শ্রীশবাবুকে সাহায্য করিলে, জীবনচরিতখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্র বাবুর "চোখের বালি"নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই "চোখের বালি" অভিনীত হইবে। রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর বাহার দেখিবার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন; তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু "চোখের বালি"র নাটকত্ব কোথায়, বলিতে পারি না। তবে তিলতর্পণ-ধৃত নাটকের ব্যুৎপত্তি এই,—ন নাস্তি আটকো যস্মিন্,—যাহাতে কিছুই আটক নাই

লক্ষ্ণৌ নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দী অনুবাদ প্রচারিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। দত্তমহাশয়ের ইতিহাসে ভ্রমপ্রমাদ আছে, এই অজুহাতে, সভার কতিপয় সভ্য তাহাতে আপত্তি করেন। অবশেষে স্থির হইয়াছে, দত্ত-কৃত ইতিহাসের অনুবাদ নাগরী প্রচারিণী সভা আর প্রচার করিবেন না। কিন্তু সভার সম্পাদক স্বয়ং উক্ত ইতিহাসের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত করিতেছে। দত্ত মহাশয়ের অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ লেখকগণের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। সেগুলি সংশোধনের যোগ্য ও সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

শুনিতেছি, আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "উপাসনা" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখনও সাক্ষাৎ পাই নাই।
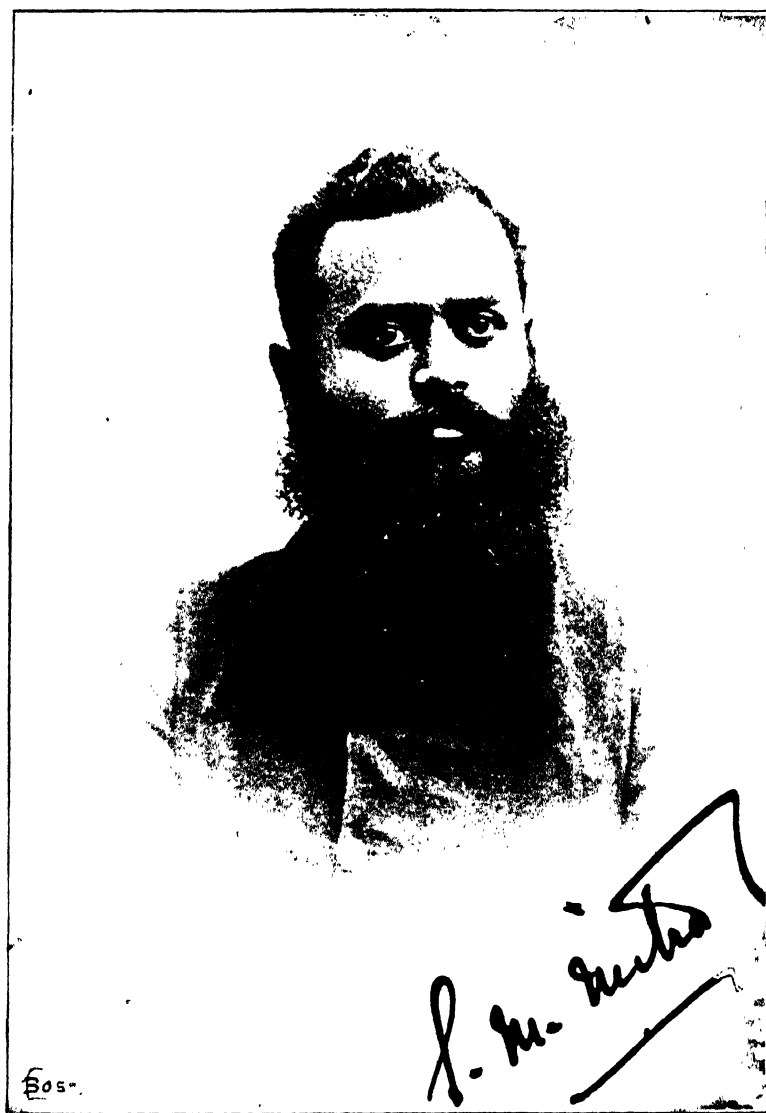
শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র।

ফির্‌দউসি ও হোমর্।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন মহাত্মা ফি.র্‌দউসির নাম শুনি, তখন স্বপ্নেও জানিতাম না যে, জীবনের ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষের মুসলমানসমাজের কেন্দ্রস্থল হায়দ্রাবাদ প্রবাসে আমার জীবন অতিবাহিত হইবে, এবং খাঁটি পারস্যদেশবাসী মৌলবীর সংসর্গে, পারস্যভাষার অনুশীলনে, প্রায় প্রত্যহ আমার অবকাশকাল কাটিবে। পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথমে পারস্যভাষায় স্বর্গীয় কবি ফি.র্‌দউসির শাহ্‌নামাহ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনও মনে উদয় হয় নাই যে, একদিন উহার দুই একটি উপমা, মাতৃভাষায় সাজাইয়া, মহাত্মা ফি.র্‌দউসিকে স্বদেশী বন্ধুবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব।

অতি দুঃখের বিষয় যে, ফি.র্‌দউসি বঙ্গদেশীয় পাঠকের সুপরিচিত নহেন। পরিচিত হইলে, আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, "মেঘনাদবধ" পাঠ করিয়া কবিবর মধুসূদন সম্বন্ধে যখন লিখিয়াছিলেন :—"Second only to the highest and greatest that ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare;" কেন ফি.র্‌দউসিকে ভুলিয়া গেলেন? প্রায় সকল যুগের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের নাম করিলেন; কিন্তু হায়! ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমরের সমকক্ষ, চিরস্মরণীয়, আমাদের প্রতিবাসী পারস্য কবি, যাঁহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যজগৎ পূজা করে, তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেন!

শাহনামা একখানি সুবিশাল গ্রন্থ, সুতরাং এই সামান্য প্রবন্ধে, তাহার দুই একটি পরমাণু ভিন্ন অধিক স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। Sir William Jones বলেন যে, ইতালীয় ভাষা সকল ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর বলিয়া তাঁহার প্রথমে ধারণা ছিল। কিন্তু পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন যে, উহা মধুরতায় ইতালীয় ভাষাকেও পরাজিত করে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন :—"Persian sonnets are capable of being set to music as any air in Mestachio", এবং শাহনামা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "From the majesty of its style, and the harmony of its numbers, may be justly styled, a Divine Poem." যদি বাস্তবিকই Divine Poem, তবে সকল দেশে ইহার চর্চ্চা নাই কেন? পারস্যভাষার অধিক চর্চ্চা না হইবার, Sir William Jones বলেন, একটি

কারণ এই যে, যাঁহাদের হস্তে শিক্ষার ব্যবস্থা, তাঁহারা নিজে বাস্তবিকই সুশিক্ষিত নহেন; "Men of learning have no taste, and men of taste have no learning." তাহা না হইলে আজি ইংলণ্ড কেন উমর্ খ.ইয়ামকে (Umar K.hayyam) লইয়া পাগল? পারস্য কবি হিসাবে উমর্ খ.ইয়ামের স্থান ফি.রদউসির অনেক নিম্নে, মায়াবাদেও হাফি.জ্ (Hafiz) ও মৌলানা রুম্ (Maulana Rum) অপেক্ষা নিম্নে, কিন্তু ইহাদের আদর নাই কেন? Fitzgeraldএর কৃপায় আজি ইংরাজ পারস্যের তৃতীয় শ্রেণীর কবিকে লইয়া মাতিয়াছেন। হায় ফি.রদউসি! হায় হাফি.জ্! হায় অদৃষ্টের পরিহাস!

পারস্যভাষা অনেক কাব্যরত্নে পরিপূর্ণ, এবং ইহার একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, পৃথিবীর চারিটি মহাকাব্যের (epic) মধ্যে একটি ইহাতে রচিত হইয়াছে। হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারত, গ্রীকের ইলিয়ড (Illiad) ও মুসলমানের শাহনামা ভিন্ন জগতে আর অমর epic নাই।

যদিও রুদকি (Rudaki) হইতে পারস্য ছন্দের আরম্ভ, কিন্তু ফি.রদউসিকে পারস্য কাব্যের জন্মদাতা বলিতেই হইবে। সুল্‌তান্ মহ্‌মুদ গ.জ.নির শাসনকালে খৃঃ ৯৫০ সনে মশহদের (Meshed) নিকটবর্ত্তী তুস্ গ্রামে ফি.রদউসির জন্ম হয়। ফি.রদউসির আসল নাম কি, তাহা লইয়া অনেক গোলমাল। অনেকের মতে, তাঁহার পিতৃদত্ত নাম অবুল কাসিম্ (Abūl Qāsim)। কিন্তু প্রসিদ্ধ লেখক দউলত্ শাহ্ বলেন যে, ফি.রদউসির আদি নাম হসন্। যাহাই হউক, মহ্‌মুদ্ গ.জ.নি-দত্ত ফি.রদউসি (স্বর্গীয় কবি) নামে সাহিত্যজগতে পরিচিত।

ফি.রদউসিকে জীবনে অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহিতে হইয়াছে; প্রাণভয়ে তাড়িত ও নিরন্ন হইয়া অনেক সময় কালযাপন করিতে হইয়াছে। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর কলহ সকল দেশেই আছে; সাহিত্যসেবকের দারিদ্র্যও চিরকালই প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা চিরকালই উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী! এখন, প্রকাশক মহাশয়ের অনুগ্রহ না হইলে সাহিত্য-জীবীর সর্ব্বনাশ; সেকালে, মুরুব্বী না থাকিলে একপ্রকার উপবাস। তখন, সকল দেশেই, বড়লোকে মুরুব্বী হইয়া কবিদের প্রতিপালন করিতেন। আমাদের দেশে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এক একটি ক্ষুদ্র রাজা বা জমীদারের আশ্রয়ে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। মহাকবি ফি.রদউসি, স্বয়ং সম্রাট মহ্‌মুদকে মুরুব্বী ধরিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টচক্রের নিদারুণ আবর্ত্তনে তাঁহার সকল যত্ন বিফল হইল, এবং ললাট-লিপি ফলিল; রাজদত্ত স্বর্ণমুদ্রা ফি.রদউসির মৃত্যুর পরে তাঁহার বাটীতে পহুঁছিল! সুতরাং বলা বাহুল্য

যে, তাঁহাকে চিরদিনই দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই মনীষীর পক্ষে বলা যায় না যে, দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিনাশী। বাস্তবিকই, বিলাসের সুকোমল অঙ্ক অপেক্ষা দারিদ্র্যের ভীষণ সংঘর্ষণে মানসিক বৃত্তির অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়।

কবির শেষদশা, Wordsworthএর মতে,—

"We poets in our youth begin in gladness,
But thereof come in the end depressing madness."

সকলের পক্ষে madness না হউক, অনেকের পক্ষে, দারিদ্র্য বটে। অবশ্য Byron ও shellyর মত যাঁহারা ধনিবংশোদ্ভব, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের কবিকুলচূড়ামণি মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে কমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমা সুন্দরী,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি—লোকে যাহা বলে—
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তবে মনে জ্বলে॥"

কবিবর হেমচন্দ্র মাইকেলের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"হায়, মা ভারতী, চিরদিন তোর,
কেন এ কুখ্যাতি ভবে।
যে জন সেবিবে, ও পদ-যুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে?"

হায়, যখন হেমচন্দ্র ইহা লেখেন, তখন তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, তাঁহার নিজের শেষদশা কি হইবে!

মহাকবি ফি,রদউসি মরিয়াও শনির হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই! তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার সময়ে মহা গোলযোগ, শেখ্ অব্দুল্ ক,াদির কুরকানি মহাশয় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ফি,রদউসি শাহনামায় অনেক স্থলে পার্শীদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন;—পার্শীরা অগ্নিকে পূজা করে, সুতরাং তিনি ফি.রদউসিকে প্রকৃত মুসলমান বলিতে প্রস্তুত নহেন! কিন্তু সেই রাত্রে শেখ্ সাহেব স্বপ্নে দেখিলেন যে, ফি,রদউসি স্বর্গে বসিয়া আছেন; অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, শাহনামায় একেশ্বরবাদী শ্লোক থাকায় তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। সুতরাং শেখ্ মহাশয় পরদিন প্রফুল্লচিত্তে ফি,রদউসির কবরে যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়া কবির শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণকে আপ্যায়িত করিলেন।

শাহনামা পারস্তদেশের প্রায় ৩৬০০ বৎসরের এক প্রকার ইতিহাস—ইহাতে ফি্‌রদউসি খৃঃ ৬৩৬ সনের ঘটনাবলি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে ষষ্টি সহস্র দ্বিপদী শ্লোক আছে। ইহা একখানি মহাকাব্য।

কাব্য কি? এ বিষয়ে পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই সত্য, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, কাব্যের উদ্দেশ্য মনুষ্য-সমাজের উন্নতি। Wordsworth কবির কথায় সত্যই বলিয়াছেন:—

"Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of Heaven and Home."

যাঁহারা জগতের সৌন্দর্য্য প্রকৃতরূপে বুঝিয়া লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ কবি। অতুল্য রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত সমুদয় আসিয়া খণ্ডে শাহনামার মত আর কাব্য নাই। আসিয়ার বাহিরে কেবল হোমর ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী। কি কল্পনায়, কি উপমায়, কি বর্ণনাকৌশলে, কি সঙ্গীতে, শাহনামা অতুল্য। সমগ্র মুসলমানজগতে শাহনামার আদর ভারতবর্ষে মহাভারত ও রামায়ণ অপেক্ষা কম নহে। মহাভারত ও রামায়ণের আদর অনেকটা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া। কিন্তু শাহনামার আদর কেবল কাব্য হিসাবে। কারণ, শাহনামায় ইস্‌লামধর্ম্মের অপেক্ষা মহম্মদের জন্মের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পৌত্তলিকদিগের কথাই অধিক। ফি্‌রদউসির কাব্য-সাগর মন্থন করিলে সকল প্রকার রত্নই পাওয়া যায়। এক দিকে মধুরতায় কালিদাস, গভীরতায় ভবভূতি, কোমলতায় ভারতচন্দ্র,—অন্য দিকে Byron ও Popeএর দেখা পাইবেন। আমাদের ভারতচন্দ্র সুখের কবি, কবিকঙ্কণ দুঃখের কবি; কিন্তু ফি্‌রদউসি উভয় তারেই ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন। সুখের সুরে Wordsworth অপেক্ষা কম নহেন, আবার দুঃখে Byronএর সমকক্ষ। Emerson বলেন, "All mankind love a lover."। ভালবাসা মানবের চির-সম্বল। শাহনামায় সকল প্রকার ভালবাসার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এক দিকে প্রিয়তমার রূপভোগলালসা, অন্য দিকে গুণে মোহিত হইয়া সংসর্গলিপ্সা, বা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। ফি্‌রদউসির সসীমের বর্ণনায় যেমন চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহার অসীমের আভাসেও সেইরূপ হৃদয় উদ্বেলিত হয়। তাঁহার প্রকৃতি-চিত্র কখন নগ্নমূর্ত্তি, আবার কখনও ধর্ম্মোন্নত—দেবভাব বা আসুরিক ভাব যেখানে যেটি আবশ্যক, যথাযথ চিত্রাঙ্কনে জগৎকে মোহিত করিয়াছেন। মিল্‌টনের (Paradise Lost) ঈভের চিত্র অপেক্ষা উত্তম প্রেমের মোহিনী প্রতিমা যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পারস্য ভাষায় শাহনামা পাঠ করুন। প্রেমচিত্রে স্বর্গ মর্ত্ত্য

প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। ফি.রদউসির নায়িকার—উল্লাসিনী বা উন্মাদিনী, সংসারিণী বা সর্ব্বত্যাগিনী, আদরিণী বা বিরহিণী,—সমতুল্য অন্য সাহিত্যে পাওয়া দুষ্কর। নারী যে ভগবানের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, এবং বিশ্বকাব্যের অপূর্ব্ব ভাষ্য, তাহা ফি.রদউসি বেশ দেখাইয়াছেন। ফি.রদউসি রুস্তমের স্ত্রী তহমিনাকে আদর্শ ভারতললনার সরলতা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ও পাতিব্রত্য প্রভৃতি নানা গুণে ভূষিত করিয়া দেবোপমা করিয়াছেন। ফি.রদউসির উদ্দীপনায় অলস উচ্ছ্বাস নাই। তাঁহার উদ্দীপনা গম্ভীর মৃদঙ্গের ধৈবত ধ্বনি। ভাষার কুসুম ও ভাবের সুষমা সৌরভের জন্য শাহনামার এত আদর। কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সামান্য কথা ও সামান্য ভাব, ফি.রদউসির শব্দবিন্যাসগুণে মধুরতা লাভ করিয়াছে।

তহ্‌মিনা তুরাণের রাজকুমারী; রুস্তমের বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু রুস্তমের সন্দেহ হয়। তাঁহার পবিত্র চিত্তে রুস্তমের তিরস্কার সহনাতীত হইলে, মধুরভাষিণী, বাষ্পাকুললোচনা তহ্‌মিনা, সবিদ্যুৎ-মঘতুল্য চক্ষু রুস্তমের উপর স্থির করিয়া, ভুবনমোহন মুখে তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ের তাপ সামান্য কথায় এইরূপে ব্যক্ত করিলেন ;—

"কস্ অজ. পর্‌দহ্ বিরূণ নদিদহ্ ময়া
নহ্ হর্‌গিজ.্ কস্ অদা শনিদহ্ ময়া"

ভাবার্থঃ—

কেহ ত দেখেনি মোরে, ওগো স্নেহময় !
শুনে নাই কথা কেহ, হোয়ো না নির্দ্দয়।"

তাঁহার নয়নবারি, সেই দুর্দ্দমনীয় রমণীহৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সহায়তা করিল। প্রণয়-বিহ্বলা তহ্‌মিনা কুটিল কেশবিন্যাস করেন নাই, এবং তাঁহার বিশাল চক্ষুতে কটাক্ষের নামমাত্র ছিল না। তাঁহার সরল দৃষ্টিতে রুস্তম অলৌকিক মহিমা দেখিলেন, যেন সম্মুখে প্রকৃতির রাজ্ঞী। কথা শুনিয়া রুস্তম একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত, তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা লোপ পাইল। ভালবাসা ঐন্দ্রজালিক। রুস্তম বুঝিলেন যে, তহ্‌মিনার প্রণয় যথার্থই পদ্মের ন্যায় বদ্ধমূল, তিনি কোন প্রকারে অবিশ্বাসিনী নহেন। রুস্তমের প্রাণ পবিত্র স্নেহরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সকল দেশেই তহমিনার মত নায়িকার আদর। Shakespeareএর Desde-mona অনেকটা ঐ প্রকার :—

Othello :—

"She loved me for the dangers I had passed ;
And I loved her that she did pity them."

যা' তা'কে সুন্দর করা দেখিলে Tennysonএর Mermaid মনে পড়ে :—

"Who would be
A mermaid fair,
Singing alone,
Combing her hair
Under the sea,
In a golden curl
With a comb of pearl,
On a throne ?"

আমাদের ভারতচন্দ্রও শব্দমন্ত্রের আচার্য্য। সহজ কথাকে তিনি সঙ্গীতের মত করিয়াছেন :—

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥"

বাস্তবিকই শাহনামা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে নাই কি ? বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির চিত্র, মায়াবাদ, (Mysticism) সকলেতেই ফি়রদউসির অতুল্য কবিত্ব দৃষ্ট হয়। যে কবিতায় কৃত্রিমতা আছে, তাহা কখনও স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। প্রতিবৎসর কত কবির (!) আবির্ভাব হয়, কিন্তু এক শতাব্দীর পরে কয় জন তাঁহাদিগকে মনে রাখে ? প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যখন ইংলণ্ডেরBaron ও Lord মহাশয়েরা নিজের নাম লিখিতেও জানিতেন না, এবং শান্তিপ্রিয় খৃষ্টের উপাসকগণ, বিদ্যাচর্চ্চা ভুলিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) সময় অতিবাহিত করিতেন, তখন অমর ফি়রদউসি শাহনামা লিখিয়াছেন; কিন্তু আজিও জগতে তাঁহার কত আদর! এখনও তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক দেবতার মত পূজা করিতেছে। শাহনামায় দুই একটি আতিশয্যের ত্রুটি যদি কোনখানে পাওয়া যায়, তাহা কবিতার সঙ্গীত-ধ্বনিতে এমন ভাবে ঢাকা যে, তজ্জন্য কবিতার কোনও অংশ লুপ্তশ্রী বলা যাইতে পারে না। শব্দমাধুরীর স্রোতে যেন সেই যৎসামান্য ত্রুটিগুলি একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। ফি়রদউসি কল্পনাবলে কত অলৌকিক দৃশ্য কবিহৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ফি়রদউসি ভাগ্যবান। শাহনামা

ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে অনেক অমানুষিক ঘটনা, অপ্সরা, কিন্নর, দেবাসুরে যুদ্ধ প্রভৃতি থাকাতে, তিনি কবিকল্পনায় যথেচ্ছাক্রমে সকল দিকে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে উপাদানের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই সত্য, কিন্তু বৈচিত্র সংগ্রহ ও সৃষ্টিতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কখন তাঁহার কবিতা মেঘধ্বনির ন্যায়, কখনও তীব্র তেজস্বিনী, আবার কখনও কুসুমময়ী লতিকা মৃত্তিকায় অবলুণ্ঠিতা! কিন্তু সকল সময়েই ফি.রদউসি হৃদয়ের কবি, তাঁহার সকল কবিতাই হৃদয়স্পর্শিনী বলিয়া প্রশংসা করিতে গিয়া ভক্তির উদ্রেক হয়। যেমন বাল্মীকি ও হোমরকে পরকীয় পদানুসরণ করিতে হয় নাই, সেই প্রকার ফি.রদ্‌উসিও, পারস্যভাষার আদি কবি বলিয়া, কোনরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গীত প্রতিধ্বনি নহে, উহা তাঁহার নিজের স্বাধীন ধ্বনি। শাহনামায় ফি.র্‌দউসি তাঁহার অসাধারণ তন্ময়তা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কি সৌন্দর্য্য-গঠন, কি সৌন্দর্য্য-চিত্রন, উভয়েই ফি.রদউসি সিদ্ধহস্ত। এমন সুন্দর চিত্র-পরম্পরার সমাবেশ ইংরাজিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এই জন্যই বোধ হয়, ইহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে সকলেই মোহিত। আমাদের ভারতচন্দ্র, কাশীদাস প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নিকট ঋণী। সকলেরই রূপ-বর্ণনা প্রায় একই প্রকার বলিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত কবিত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

প্রতিভা যাঁহার আছে, তাঁহার কিছুতে ভয় নাই। প্রাণভয়ে বল, অন্নচিন্তায় বল, সকল অবস্থাতেই ফি.রদউসির প্রতিভাকুসুম শত শোভায় প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের একখানি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছিল। তাই আজি ফি.র্‌দউসির উদ্ভাবনী প্রতিভায় সমস্ত মুস্‌লম জগৎ গৌরবান্বিত। বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমর ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই—এমন শতমুখীপ্রতিভাশালী লেখক আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরদত্ত কবিত্বের সহিত ছন্দোবৈচিত্র্য থাকাতে শাহনামার এত আদর। ফি.র্‌দউসি কবি-কল্পনার আচার্য্য। কল্পনা ফি.রদউসির নিজের সামগ্রী—সমস্ত গ্রন্থে অতি যত্নে খুঁজিলেও একটি কষ্ট-কল্পনা পাওয়া দুষ্কর। Wordsworthএর কথা যদি সত্য হয়, "Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings," তাহা হইলে, যথার্থই শাহনামা কাব্যের শীর্ষস্থানীয়। Sir william Jones শাহনামার ভাষাকে "Impassioned.language" বলিয়াছেন। বড় বড় ইংরাজ কবিও প্রতিভাকে ফি.রদ্‌উসির মত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। স্বয়ং মিল্‌টন (Milton)

বলিয়াছেন যে, ঋতুবিশেষে তাঁহার প্রতিভা দেখা দিত। Byron ও Popeএর ভাল কবিতাগুলি, তাঁহাদের ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লিখিত। ফি্রদ্‌উসিকে কখনই প্রতিভা ত্যাগ করে নাই, সেই জন্য কাব্যজগতে ফি্রদ্‌উসি আজি অমর কবি বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমরের সঙ্গে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া আছেন। Sir William Jones, গ্রীক, সংস্কৃত ও পারস্য, তিনটি ভাষা যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, পদলালিত্যে ব্যাস, বাল্মীকি, অথবা হোমর, এই পারস্য কবিকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তবে, নিখুঁত পৃথিবীতে কিছুই নাই; সমালোচকের হস্তে তিলোত্তমার রূপেও ত্রুটি বাহির হয়। স্বয়ং Shakespeareএর এই সম্প্রদায়ের হস্তে নিস্তার নাই! Hectorএর সময়ে Aristottleএর জন্ম হয় নাই; কিন্তু ইংলণ্ডের কবিশ্রেষ্ঠ Hectorএর মুখে Aristottleএর বচন বাহির করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি একবারে নাই বলেন, এমন লোকও জগতে বিরল নহে।

হিন্দু সাহিত্যে যেমন দুষ্মন্তের, রামচন্দ্রের ও সীতার মনস্তাপ প্রসিদ্ধ, এবং ইংরাজিতে Byronএর Prisoner of Chillon যেমন অশ্রুজলসিক্ত, সেইরূপ মুস্‌লিম্ সাহিত্যে, রুস্তমের হস্তে তাঁহার অপরিচিত পুত্র সোহ্‌রাবের মৃত্যুতে রুস্তমের খেদ করুণরসে অতুল্য। যদিও ইহা শোকসিন্ধুর তীব্র উচ্ছ্বাস, তথাপি এ অশ্রুকে এক প্রকার আনন্দধারা বলা যাইতে পারে; কারণ, বিষাদের গাথা হইলেও মর্ম্ম-স্পর্শিনী বলিয়া, হর্ষসঙ্গীতের মত আনন্দদায়িনী। কাঁদিয়া সুখ কি নাই? তাই বলি, এমন কান্নার কথায় সুখ আছে। দারুণ মর্ম্মবেদনায় মনে যে তীব্র ও গভীর ভাবের উদয় হয়, তাহার বর্ণনাতেও ফি্রদ্‌উসি সিদ্ধহস্ত।

Byronএর Vision of Judgment গালির চূড়ান্ত বলিয়া খ্যাত, কিন্তু ফি্রদ্‌উসির হস্তে মহাবলপরাক্রান্ত সম্রাট মহ্‌মুদ্ গ্‌জ্‌নির লাঞ্ছনা বোধ হয় কাব্যজগতে অতুল্য। Byronএ শিক্ষা নাই বলিলেই হয়। ফি্রদ্‌উসি শিক্ষাগুরু। তাঁহার রচনায় প্রায়ই "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ পারস্যকবি উন্‌সুরি, ফি্রদ্‌উসিকে উপদেষ্টা অপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়াছেন :—

"উ নহ্ উস্তাদ্ বুদ্, ওয়া মা শাগির্দ,
উ খুদাওন্দ্ বুদ্, ওয়া মা বন্দহ্।"

ভাবার্থ :—

হইতে ফির্দৌসি-শিষ্য, নাহি মম আশ।
তিনি হন প্রভু মোর, আমি তাঁর দাস॥

এক কথায়, আমাদের দেশে যেমন বাল্মীকির রসনায় বাগ্দেবীর আবির্ভাবে বিশ্বাস আছে, মুসলমান সমাজেও তেমনই ফি.রদউসি সম্বন্ধে ধারণা যে, তাঁহার বীণা দৈবশক্তিসম্পন্না বলিয়া তাঁহার গীতে লোক আত্মহারা হইয়া যায়।

বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শাহনামার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অমর গ্রীক্‌কবি হোমরের সহিত ফি.রদউসির তুলনা করিয়াছেন। ইয়ুরোপে হোমরের বড় আদর। Meyers তাঁহার Essays Classicalএ বলেন :—

"Besides Homer, Virgil seems elaborate, Dante crabbed, and Shakespeare barbarous."

বাস্তবিকই হোমরের সহিত ফি.রদউসির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইউরোপে হোমরের যেরূপ আদর, পারস্য, আরব ও অন্যান্য মুসলমানদেশে ফি.রদউসির সেইরূপ মান্য। হোমরের গ্রন্থ (Illiad) যেমন একমাত্র ইউরোপীয় epic, ফি.রদউসির শাহনামা মুসলমান সাহিত্যে সেইরূপ একমাত্র মহাকাব্য। গ্রীককবির রচনায় যেমন আদিমকালের বাহুবল ও সাহসের বিশেষ প্রশংসা, তেমনই পারস্য কবির গ্রন্থেও পুরাতন কালের শৌর্য্য বীর্য্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। হোমর গ্রীককাব্যে পিতৃস্থানীয়; ফি.রদউসি পারস্যকাব্যের জন্মদাতা। কেবল যে ইসলাম সাহিত্যের romance ফি.রদউসির নিকট ঋণী, তাহা নহে; ইউরোপীয় romance-লেখকগণও ফি.রদউসি হইতে অনেক সুন্দর সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফি.রদউসি শাহনামা রচনা করেন; দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত Orlando Furioso প্রভৃতিতে শাহনামার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

পারস্য যোদ্ধা রুস্তম ও গ্রীক মহাবীর হর্‌কিউলিজ. (Hercules) অনেকটা এক প্রকার। হর্‌কিউলিজ. ১২ বার অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, ফি.রদউসির প্রতিভাবলে, রুস্তম্ সাতবার অলৌকিক কার্য্য করিয়া সেইরূপ বিখ্যাত। সকল দেশেই কবিগণ নারীর সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত না হইয়া কল্পনাবলে নির্দ্দোষসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারাই হিন্দু কবির অপ্সরা, খৃষ্টান কবির ফেয়ারি (fairy) ও মুসলমান কবির পরী। পারস্যকবি ফি.রদউসি যেমন পরী লইয়া ব্যস্ত, গ্রীক কবি হোমরের রচনাতেও সেইরূপ অনেক সময়ে fairyর দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু fairy পারস্যকল্পনাপ্রসূত পরী নহে—উভয়ের মধ্যে কেহ যে সংস্কৃত কাব্যের অপ্সরা বা কিন্নরীর আত্মীয়া, তাহাও বোধ হয় না। পরীকে angel বলিলেও পারস্যকবির ভাব প্রকাশ পায় না; angelএর ভাব "ফরিশ্‌তহ্" (farishtah) শব্দে অধিক প্রকাশ পায়।

রোম্যানদিগের geniiও পারস্য কবির পরী নহে; পাশ্চাত্য কবির seraph অথবা cherubও পারস্য কল্পনার মত নহে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্রই জয়, সকল পারস্য কবিই ইহা লইয়া পাগল। শেখ্ সাদি বলেন :—

"মানন্দ্ তু আদ্মি দর্ আফাক্
মুম্কিন্ নবুদ্——পরী নদিদম্।"

ভাবার্থ ;—

তব সম মানবী ত না হয় সম্ভব।
পরী রূপে প্রিয়ে যদি হও পরাভব॥

প্রসিদ্ধ কবি খুসরু, সুন্দরীর কথায় বলেন ;—

"খুবান্ গুমান্ মবর্ কে অজ্ অউলাদ্-ই-আদ্মি অন্দ্
হুরন্দ্ যা ফরিশ্তহ্ য়া রুহায় অজি-ম্ অন্দ্।"

ভাবার্থ :—

এমন রূপসী, নহে মানবসুন্দরী।
হবে হুরী, ফ্রিস্তা, কিংবা স্বর্গের কিন্নরী॥

ইউরোপীয় Blue-eyes বা Hazel-eyesএর পারস্য কবির নিকট আদর নাই। হুর আর্ব্বী শব্দ, ইহার অর্থ কাল চক্ষু। আরব দেশে কাল চক্ষু না হইলে সুন্দরী বলে না। স্বর্গের হুরীরও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ।

কালতে কি রূপ নাই? "Is a Black woman of the fair sex?" মনে পড়ে, এক জন গ্রীক কবি বলেন :—

"By Didyma's beauty I am carried away ;
I melt, when I see, like wax before fire :
She is black, it is true : So are coals ; but even they
When they 're warmed, a bright glow like the rose-
cup acquire."

আরব্য কল্পনার "হুরী" ও পারস্য কল্পনার পরীতেও প্রভেদ আছে। স্বয়ং শেখ সাদি গোলযোগে পড়িয়া বলিয়াছেন:—

"হুরী নদানম্, য়া মলক্।
ফর্জন্দহ্ আদম্ য়া পরী।"

ভাবার্থ :—

না জানি সে প্রিয়তমা, অপ্সরা কি হুরী।
রূপসী মানবকন্যা, বা স্বর্গের পরী॥

পরীর সৌন্দর্য্যবর্ণনায় এক জন পারস্য কবি বলিয়াছেন যে, পরী অর্থে শরীরী পুষ্পসৌরভ ও চন্দ্রকর। পারস্যকবির পরীর পাখা আছে, ভবিষৎজ্ঞান বিলক্ষণ, অনাহারে জীবনধারণে অসমর্থ, এবং অমর নহেন। অবশ্য, প্রথম গুণ নির্দ্দোষসৌন্দর্য্যবিশিষ্টা। বঙ্কিম বাবুর মতে, এমন স্থলে, পাঠকের গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী বলিলেই সকলেই বুঝিতে পারেন, এবং সব লেঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হয়; কারণ, পারস্যকাব্যে গৃহিণীর রূপ উপমায় বড় আইসে না। এক জন প্রসিদ্ধ পারস্যকবি লিখিয়াছেন যে, যদি অন্য কোনও প্রকারে পরীর সুন্দর চিত্র কল্পনায় না আনিতে পার, নিজ প্রিয়তমার (উপপত্নীর) মুখখানি ধ্যান করিবে, তাহা হইলে পরীর কতকটা আন্দাজ পাইবে!

এখন দেখা যাক, শেক্সপীয়র ও মিল্টনের ফেয়ারি, কতটা পারস্য কবির "পরী"। Mid-summer Night's Dreamএ ফেয়ারিগণ

"Killing cankers in the musk-rose buds"

এবং আর এক স্থলে:—

"To serve the Fairy Queen,
To dew her orbs upon the green" &c
"They must go, seek some dew-drops here and there
And hang a pearl in every cow-slip ear."

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পারস্যকল্পনাপ্রসূত পরীগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী ভিন্ন কখনও অন্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ কোন পারস্যকাব্যে দেখি নাই।

মিল্টনের Comusএ পারস্য পরীর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়:—

"Their port was more than human as they stood—
——I took it for a fairy vision,
Of some gay creatures of the element,
That in the colours of the rainbow live
And play in the plighted clouds—I was awe struck,
And as I passed I worshipped."

সুরাও উভয় কবির আদরের সামগ্রী। ফি.রদউসির বীরগণ উদরের যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এবং মদিরাসক্ত ছিলেন। শাহনামায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, "হমা মস্ত্ বুদন্দ্", অর্থাৎ "সকলেই নেশায় চুর"। মহাকবি হোমরও তাঁহার যোদ্ধাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে

কালের সকল বীরগণই জঠরসমস্যা বেশ বুঝিতেন,—আমাদের কুম্ভকর্ণ মহাশয়ও এ বিষয়ে বড় নিন্দনীয় নহেন! ফি.রদউসি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "কসারন্দহ্ বাদহ্", অর্থাৎ "শোকতাপহারী মদ্য।"

হোমরের নেপ্‌থুনের (Nepthune) ও ঐ গুণ:—

"Charmed with the virtuous draught the' exalted mind
All sense of woe delivers to the wind"

Pope—Odyssey.

পারস্যের আদি কবি কি ক্ষণেই সুরার গুণগান করিয়াছিলেন—হাফি.জ্ (Hafiz) প্রভৃতি সেই গীতে মাতিয়া কাব্যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অপ্সরা ও পরী বিহনে স্ত্রীসৌন্দর্য্যে সকল দেশের কবিই মোহিত। সৌন্দর্য্য চিরকালই নারীর অস্ত্র। খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক কবি Anacreon বলিয়াছেন:—

"Beauty, this
Both their arms and armour is:
She that can this weapon use,
Fire and sword with ease subdues."

Thomas Stanley.

মিলটনে আছে:—

"With store of ladies whose bright eyes
Rain influence, and judge the prize
Of wit or arms, while both contend
To win her grace whom all commend."

L' Allegro.

রুস্তমের মাতা রুদাবা অতি সুন্দরী। ফি.রদউসি তিলোত্তমার সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। রূপবর্ণনায়, সকল দেশের সকল কবিরই প্রথমে শশধর লইয়া টানাটানি। রুদাবার রূপবর্ণনায় ফি.রদউসি লিখিয়াছেন:—

"অগর মাহ্ জুয়ী, হমা রুয়ে উস্‌ত্।
ওগর্ মুশ্‌ক্ বুয়ী, হমা বুয়ে উস্‌ত্॥"

ভাবার্থ:—

যদি চাহ ইন্দু, দেখ চন্দ্রানন তার।
সুগন্ধ মৃগনাভি, বদনে রুদাবার॥

বিদ্যার রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি' তার আছে কতগুলা॥"

ভারতচন্দ্রের উপমা ও ভাব অনেক স্থলে পারস্য কাব্য হইতে নীত, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য উপমার সহিত রায়গুণাকরের উক্ত উপমার কত মিল দেখুন।

"হিলালে কে বর্ আস্মান্ যায়ে উস্ত।
তরাশিদহ্ নাখন্ পায়ে উস্ত্॥"

ভাবার্থ :—

চন্দ্রের স্থান সবে জানে, হয় আকাশে।
পদনখে তারি আজি কেন গো বিকাশে॥"

চন্দ্রের উপমায় পাঠকের বোধ হয় Moore মনে পড়িবে :—

"Let her eye-brows sweetly rise,
In jetty arches over her eyes,
Gently in a crescent gliding,
Just commingling, just dividing."

কেবল মুখের উপমা উভয় কবির এক প্রকার নহে, সুন্দরী নারীর অন্য অঙ্গের উপমায়ও অনেক ঐক্য আছে। সকল দেশের কবিই গোলাপ ফুলের ঔজ্জ্বল্য ও কোমলতার উপমা দিয়া স্ত্রীসৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। হোমর্ কেবল "Rosy-fingured" বলিয়া ক্ষান্ত; Gray বলেন, "Rosy-bosomed;" Tennyson লিখিয়াছেন :—

"Rosy is the west,
Rosy is the south,
Roses are her cheeks,
And a rose her mouth."

কিন্তু ফি.রদউসির নায়িকা "গুল্ অন্দাম্"—সর্ব্বাঙ্গ গোলাপের মত। স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের সহিত গোলাপের তুলনায় Ronsard মনে পড়ে। Pierre-de-Ronsard এক জন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি। Andrew Lang তাঁহার "গোলাপ" হইতে ইংরাজীতে পদ্যে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"Hear me, Darling! speaking sooth :
Gather the fleet flowers of your youth!
Take ye your pleasure at the best!
Be merry ere your beauty flit!
For length of days will tarnish it,
Like roses that were loveliest."

ফি.রদউসির অনেক উপমা ইউরোপীয় কবির উপমা অপেক্ষা সুন্দর। প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি Ariosto তাঁহার নায়িকার পীন পয়োধরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"Full and large the breast;
Where fresh and firm, two *ivory apples* grow." &c

Spencer তাঁহার Faery Queenএ "like young fruit in May" বলিয়াছেন; কিন্তু ফি.রদউসির "অনার্ পিস্তান্" অর্থাৎ দাড়িম্বসদৃশ কুচযুগল, বাস্তবিকই অতুল্য। অবশ্য, ভারতচন্দ্র বিস্তার রূপবর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

"কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল, দাড়িম্ব বিদরে॥"

ভারতচন্দ্র পারস্যভাষা জানিতেন, এবং পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, তিনি উপমা-সংগ্রহে পারস্যভাষার নিকট ঋণী। তিনি নিশ্চয়ই শাহনামা হইতে দাড়িম্বের সুন্দর উপমাটি লইয়াছেন। পারস্যযুবতীর পয়োধরের তুলনা, পক্ক দাড়িম্বের সহিত অনেকটা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্রের নায়িকা বঙ্গললনা—যতই রূপের গর্ব্ব করুন, এ বিষয়ে ইরাণী সুন্দরীর কাছে হার মানিতেই হইবে।

ফি.রদউসির "পুর্‌জে. খা.ব"—যদিও ভাবার্থ "ঘুমন্ত", তথাপি তাহার সম্পূর্ণ ভাব দুই একটি কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। পোপের হোমরের অনুবাদে "The sleepy eye that speaks the melting soul" অনেকটা ফি.রদউসির ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই দুই মহাকবির মুখবন্ধ প্রায়ই একই প্রকার। ফি.রদউসির কথায় কথায় "তুগুফ.তি" অর্থাৎ "তুমি (হইলে) বলিতে" দেখিয়া, হোমরের

"*Thou wouldst have thought*, so furious was the fire!
No force could tame them, and no toil could tire."

Illiad—Pope.

মনে পড়ে।

হোমর ও ফি্‌রদউসির বীরগণ সকলেই অশ্বপ্রিয়। রুস্তমের তুরঙ্গের নাম র.খ.শ. (Rakhsh); ফি্‌রদউসির অশ্বের অপেক্ষা হোমরের অশ্ব বুদ্ধিমান। রুস্তমের ঘোটক কেবল কথা বুঝিতে পারিত, কিন্তু কহিতে পারিত না; Achillesএর ঘোড়া Xanthus ও Balius কথা কহিতেও পারিত! Hector ও Antilochus প্রায়ই তাঁহাদের অশ্বগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাহাদের তুষ্ট করিতেন।

গ্রীক ও পারস্য উভয় মহাকাব্যেই মাদুলীর কিছু বেশী আধিক্য। ফি্‌রদউসির "মোহর-ই-স্থলেমান" সামান্য ভূত তাড়াইবার মাদুলী অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া ত বোধ হয় না। ফি.রদউসি ও হোমর উভয়েই মাদুলীর গুণগানে অনেক স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদে মুসলমানসমাজে মাদুলীর খুব প্রচলন—প্রায় সকলেই মাদুলীধারণ করে; কাহারও ভূতের ভয়, কাহারও অর্শরোগ, কেহ বা গৃহিণীর প্রণয়ে বঞ্চিত, কেহ বা আবার প্রিয়তমার কটাক্ষে পীড়িত; সকলেরই বিশ্বাস যে, এই কণ্ঠভূষণ সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। সকল সময়ে, কণ্ঠভূষণ নহেন; যখন বাহুভূষণ হন, তখন ইঁহার নাম "বাজু.বন্দ্‌"—ইহার ধারণে সকল ফাঁড়া কাটে। অবস্থাভেদে মাদুলীর তারতম্য সকল সমাজেই আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঠানদিদি ঠাকুরাণীদের কৃপায় মাদুলী চিরকালই জীবিত থাকিবে। গর্ব্বিত বিজ্ঞান যাহাই বলুক, মাদুলী এ জগতে অমর।

ক্রমশঃ।

হায়দ্রাবাদ। শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্র।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা।

হে মাধব, হে কেশব, হে প্রাণবল্লভ,
চিনিতে কি পার মোরে? জনমদুঃখিনী
আমি গো সামান্যা নারী, রূপগুণশূন্যা,
অবরেণ্যা! তুমি নাথ! ভুবনবরেণ্য,
বিশ্বশোভা, মুনিমনোলোভা; যাঁর ধ্যানে
মগ্ন সদা স্থকৈলাসে দেব ত্রিপুরারি।
পথে যেতে যেতে যারে চক্ষুর নিমেষে
হেরেছিলে হায়! সেই দীনা হীনা নারী
এখনও হাসে কি গো স্মৃতির দুয়ারে?
হায় কি ধৃষ্টতা মম, হায় কি দুরাশা!
এ কি প্রেমোন্মাদ মম, আকাঙ্ক্ষা বিষম?
প্রবীণা বন্ধ্যার যেন তনয়ের সাধ!
যা হোক তা হোক দেব! ও পদসরোজে
ভৃঙ্গী সম মনানন্দে গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
গাইয়া জীবনগীতি শুনাব তোমারে,—
দাসীরে দৈবাৎ যদি পড়ে' যায় মনে!

ত্রিবক্রা দাসীর নাম ; মথুরাবাসিনী ;
যৌবনে ত্যাজিলা স্বামী কু-অঙ্গ হেরিয়া ;
ভাবিলাম যাহা হোক,—যৌবন ত আছে,
জীবন যাপিব এবে কুলটার বেশে !
হা লজ্জা ! সে সাজসজ্জা, অঙ্গনা-বিভ্রম,
সকলি বিফল হোল ; যেই আসে দ্বারে,
সেই জন কুঁজ হেরি' হেসে চলে যায় ;
কীটদষ্ট কু-পুষ্পের জুটিল না অলি !
দারিদ্র্যে ও অবসাদে দিশাহারা হ'য়ে
একদিন সন্ধ্যাকালে উন্মাদিনীবেশে
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম যমুনার গর্ভে
আত্মহত্যা তরে ; চঞ্চলা কালিন্দী, আহা,
শত বাহু প্রসারিয়া আপনার ক্রোড়ে
দিলা স্থান ; ডুবে গেনু অতল তিমিরে।
মরণের হিমকক্ষে নয়ন উন্মীলি'
তাকাইনু যবে, এ কি ! হেরিনু বিস্ময়ে
সেই নারীঘাট, সেই যমুনার তীর !
আর্দ্র কেশে আর্দ্র বেশে আছি গো শয়ানা
আমি এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে !
কহিলা মধুর মূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া,—
'ছি ছি বৎসে ! জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে
লোক পায় সুদুর্লভ মানব-জনম ,
সেই নর-জন্ম প্রতি এত অবহেলা ?
দৈববশে যেতেছিনু এই পথ দিয়া,
ঝাঁপাইয়া পড়ি' জলে রক্ষিনু তোমারে।
ভাগ্যবতী ! এখনও অদৃষ্টে তোমার
দেবতা-বাঞ্ছিত আছে সৌভাগ্য অসীম,
কিছু দিনে আসিবেন শ্রীহরি আপনি
হেথায়, গোলোকচন্দ্র লীলাচ্ছলে এবে
অবনীতে অবতীর্ণ যশোদার গৃহে।
অমৃত-পরশে তাঁর অয়ি ভাগ্যবতী !
হবে তুমি শাপমুক্তা ; ধর, বৎসে ! ধর,
এই সুমধুর মন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ হরে'।
ইহারই প্রভাবে তব নিশ্চয় ঘুচিবে
দুঃখ দৈন্য ; থাকিবে না ভাবনা-কালিমা
অই ভালে ; যাও বালে ! নগরে ফিরিয়া।
কায়মনঃপ্রাণে কর মন্ত্রের সাধনা,
হবে' সিদ্ধি। আমি বৎসে ! দেবর্ষি নারদ,
এত বলি' মহাপ্রাণ, বীণা লয়ে করে,
করিলেন হরিধ্বনি মধুর ঝঙ্কারে।—

রাগিণী বেহাগ ; তাল আড়াঠেকা।

'হরি ! তুমি মদনমোহন !
হেরি নাই হেন রূপ ঘুরি' ত্রিভুবন !
সাধে কি হে মনঃ-প্রাণ
তোমারে করেছি দান,
চরণ-নিকুঞ্জে থাকি মৃগের মতন।
তব রূপ-সরোবরে রাজহংস-রূপ ধ'রে
মানস-মরাল মম করে সন্তরণ।'

* * *

নগরে ফিরিয়া গিয়া কংস নৃপতির
হইলাম দাসী। সবে মোরে করে যত্ন ;
অনুলেপনের কার্য্যে হইনু নিপুণা।
বিরলে গোপনে সুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে !'
মন্ত্র জপি। উষাকালে শয্যাত্যাগকালে
যোড়হস্তে ডাকি,—'ওহে জগন্নাথ !
বড় সাধ হেরিবারে শ্যামল মুরতি !
নরনারী পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গমে
হেরিতে লাগিনু ধ্যানে সে শ্যাম-মুরতি !
বৈরী মোর ? হায় ! যেই ডাকে প্রেমময়ে
অহোরাত্রি, তার কভু বৈরী থাকে ভবে ?
এ বিশ্ব সংসার হ'ল প্রীতি-পারাবার।
একদিন সুপ্রভাতে, সাধনার সিদ্ধি
হ'ল মম ; পাইলাম ত্রিদিবদুর্লভ
ঋদ্ধি ; হেরিলাম নেত্রে মদনমোহনে।
কি মধুর ! কি মধুর ! যুগল-মুরতি !
হস্তে চন্দনের বাটী, যাইতেছিলাম
রাজবাটী ; তুমি হাসি' পথ আগুলিলে !
পীতাম্বর মনোহর শ্যাম জলধরে

নিরখি', ঝাপটি' পক্ষ এ প্রাণ চাতক
নিবিড় আনন্দে হ'ল উধাও অস্থির!
মধুস্বরে হে গোবিন্দ! কহিলে আমারে,
'হে বরোরু! দাও ঐ অঙ্গবিলেপন
দুই জনে।' মনে মনে কহিনু গোপনে,
'হে নাথ! ও পাদপদ্মে কি আছে অদেয়?'
অঙ্গবিলেপনরাগে হইয়ে রঞ্জিত,
কি সুন্দর শোভা, মরি, ধরিলে দু' জনে!
যুগল কার্ত্তিক যেন অবতীর্ণ ভবে!
শ্রাবণ-গগনে যেন যুগ্ম ইন্দ্রধনু!
তার পরে ভগবন! হইয়া প্রসন্ন,
তব শুভ-দরশন-ফল দেখাইতে,
প্রকাশিলা, মরি মরি! অপরূপ লীলা।
হে অচ্যুত! সুমোহন পাদদ্বয় দিয়া
এ দাসীর পাদদ্বয়-অগ্রভাগ চাপি',
শ্রীহস্তের দুটি চারু অঙ্গুলি উত্তোলি',
চিবুক ধরিলা মম; পরম আদরে,
উত্তোলি' ধরিলা দেহ। শ্রীকরপরশে
ত্রিবক্রার দেহ হ'ল সরল সমান!
যৌবন-লাবণ্যে হ'ল ঢল ঢল বপু!
হইলাম নিতম্বিনী, পীনপয়োধরা!
হরষে, বিস্ময়ে, গর্ব্বে, নবীন বৈভবে
হ'য়ে মাতোয়ারা আমি, বাহু পসারিয়া
হে সুন্দর! চাহিলাম তোমা আলিঙ্গিতে।
ঈষৎ হাসিয়া তুমি কহিলে সুস্বরে,—
'হে সুভ্রু! হইছ কেন অধীরা উতলা?
কার্য্য সমাপিয়া আমি দিন করি' ধার্য্য,
আসিব আসিব তব প্রেমের নিকুঞ্জে।
হে সুন্দরী! জান না কি বিনা নিমন্ত্রণে
কোকিল আপনি আসে বসন্ত আসিলে;—
ঝঙ্কারে নলিনীপত্রে অনাহুত অলি?'

*　　*　　*

কত দিন, কত দিন, কতদিন গেছে!
এ তীব্র বিরহ আর পারি না সহিতে;
পারি না পোহাতে আর এ দীর্ঘ যামিনী;
হে নির্দ্দয়! মিথ্যা ধর দয়াময়-নাম;
অরসিক! মিথ্যা ধর রসময়-নাম;
অপ্রেমিক! মিথ্যা ধর প্রেমময়-নাম!
যৌবন-মণ্ডপে যত তুলসীর পত্র
ঝরি' গেল; ধূপ ধুনা হৃদয়-মন্দিরে
জ্বালিয়াছি; তা'ও বুঝি পুড়ে হয় খাক!
হ'ল না, হ'ল না হায়! দেবের অর্চ্চনা।
আর কেন? এস নাথ! মুরলী-অধরে,
ত্রিভঙ্গিম শ্যামবেশে হাসিয়া সুহাসি,
এস, এস পীতাম্বর, ভুবন মোহিয়া!
আবার হাসিয়া, হরি, পথ আগুলিয়া,
দাঁড়াও দাসীর পথে; অথবা চুম্বিয়া
এ মুখ, ভরিয়া দাও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে!
চক্ষু পক্ষ্ম যাক ভিজি' রোদনের জলে;
উজলি' উঠুক আঁখি অন্তর-হাসিতে,
আঁখি-প্রান্তে লাল রেখা রাজুক সহসা,
অভিলাষ, ভয়, গর্ব্ব, রোষ ও অসূয়া
দেখা দিক এক কালে পাটল অধরে।
দুরু দুরু কম্পমান পীন পয়োধর
ভরি' যাক অকস্মাৎ কদম্ব-পুলকে।
সেই দিন ত্রিবক্রার অন্তর-বক্রতা
ঘুচে যাবে, চিত্ত হ'বে সরল, সমান!
কামগন্ধ নাহি রবে কুব্জার প্রেমে,
হরি, তব রাগ-রক্ত পাদ-পদ্ম চুমে'

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

২। তাল-নারিকেলের দেশে।

শ্রীরাগমের অভিমুখে।

যে পান্থনিবাসে আমি আশ্রয় লইয়াছি, উহা পূর্ব্ববর্ণিত নিঃসঙ্গ শৈলটি হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ, এবং শ্রীরাগমের বৃহৎ মন্দির হইতে তিন ক্রোশ দূরে। ইহা অরণ্যমধ্যস্থিত একটি তরুশূন্য রৌদ্রস্নাত মুক্ত পরিসরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে একজাতীয় "লজ্জাবতী" লতা-গাছ আসিয়া তালবৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার পাতা এত অল্প ও এত সূক্ষ্ম যে, উহাতে কিছুমাত্র ছায়া হয় না। চারি দিকেই অবসাদক্লিষ্ট ঝোপ্‌ঝাড়, শুষ্ক দগ্ধ তৃণরাশি। শুষ্কতা প্রযুক্ত এক্ষণে ভারতের সমস্ত উত্তর প্রদেশ, সমস্ত রাজস্থান মরণপথে অগ্রসর; সেই অসাধারণ শুষ্কতার একটু নমুনা যেন এই চিরআর্দ্র চিরশ্যামল দক্ষিণ দেশেও আনিয়া ফেলিয়াছে।

আমার আবাস হইতে শ্রীরাগমে যাত্রা করিবার সময়, যে নগরটির মাথার উপরে পূর্ব্ববর্ণিত শৈলটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে—সেই নগরটির মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইল। তাহার পর, দুই ঘণ্টা কাল গাড়ীতে তাল প্রভৃতি তরুপুঞ্জের নীচে দিয়া গিয়া কতকগুলি মন্দিরের নিকট উপনীত হইলাম। এই মন্দিরগুলি, বলিতে গেলে, আসল মন্দিরটির পূর্ব্বোদ্যোগমাত্র।

এই মন্দিরগুলি বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন আকারের।—ইহারা যেন বিবিধ সাদাসিধা ও ক্ষোদিত প্রস্তরের উদ্দাম বিলাসলীলা। ভক্তগণ সাগ্রহে ও উৎসাহভরে এখানে আসিয়া ফুল ও ফুলের মালা রাখিয়া যাইতেছে। এ মালাগুলি কল্যকার উৎসবের জন্য;—অতি অপূর্ব্ব। প্রত্যেক প্রবেশপথে, প্রত্যেক তোরণপ্রকোষ্ঠে, বিষ্ণুদেবের (মহাদেবের?) ভীষণ ত্রিশূলগুলি সাদা ও লাল রঙ্গে টাট্‌কা রং করা হইয়াছে। এই সকল মনুষ্যদিগেরও ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত। এখানকার কোনও কোনও তালবন বিষ্ণুদেবের উদ্দেশে বিশেষরূপে উৎসর্গীকৃত, এবং বিষ্ণুদেবেরই নিজস্ব রঙ্গে অনুলিপ্ত। স্তম্ভের ন্যায় মসৃণ প্রত্যেক বৃক্ষকাণ্ড সাদা ও লাল রঙ্গে রঞ্জিত;—কোথায় যে

মন্দিরের শেষ ও বনের আরম্ভ, তাহা বুঝা দুষ্কর। সমস্ত প্রদেশটিই যেন একটি বিশাল ভজনালয়।

অবশেষে আসল মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। মন্দিরটি প্রকাণ্ড, এবং উহার সাতটি ঘের। প্রথম ঘেরটির পরিধি তিন ক্রোশ। উহার মধ্যে ২১টি মন্দির;—মন্দিরের চূড়াগুলি ৬০ ফুট পরিমাণ আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

মন্দিরগুলির প্রকাণ্ডতা ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; উহাদের আত্যন্তিক বহির্বিকাশে অন্তরাত্মা যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। উহাদের আকার এত বৃহৎ, এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও এত প্রচুর যে, তৎসমস্ত মনোমধ্যে ধারণা করা দুষ্কর। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাঠ করা গিয়াছিল, যাহা কিছু জানি বলিয়া বিশ্বাস ছিল, পরীস্থানের নাট্যদৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, সমস্তই এই চমৎকারজনক দৃশ্যের নিকট হার মানে। ভারতবর্ষীয় পুষ্পের নিকট আমাদের ছোট ছোট সুন্দর ফুলগুলি যেরূপ,—এই সকল লাল পাথরের রাশি রাশি প্রকাণ্ড স্তূপের নিকট, এই সকল বিংশতিবাহু বিংশতি-মুখ দেবতাদিগের নিকট, আমাদের সাদাটে রঙ্গের ছোট ছোট প্রস্তরে গঠিত, "সেণ্ট" ও "এঞ্জেলে" ভূষিত ক্যাথিড্র্যাল্ গির্জাগুলিও তদ্রূপ।

প্রথম ঘেরটি যার-পর-নাই বিরাট, প্রকাণ্ড; উহা মন্দিরের অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইবারও বহুপূর্ব্বে বিরচিত—কোনও দুজ্ঞেয় পুরাকালের সামিল বলিয়া মনে হয়। কোন এক যুগের লোকেরা "ব্যাবেল" মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড মন্দির এখানে নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরটি সমাপ্ত না হইতে হইতেই, তাহাদের কল্পনা-বহ্নি বোধ হয় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যে তোরণের মধ্য দিয়া এই ঘেরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়, উহার খিলান ৪০ ফুটের ঊর্দ্ধে বিলম্বিত; এবং উহা ১৩।১৪ গজ পরিমাণ—দীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তর-সমূহে নির্ম্মিত। উহার শীর্ষদেশে একটি ত্রিকোণাকৃতি অসমাপ্ত চূড়ার তল-দেশের নিদর্শন এখনও দৃষ্ট হয়। ঐ চূড়া সমাপ্ত হইলে, একটা ভীষণ প্রকাণ্ড অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। সমস্তই তাম্রবৎ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। এবং উহার ভাস্করকার্য্যখচিত আলিসার উপর কতকগুলি পবিত্র টিয়া পাখী সপরিবারে বাস করে;—মনে হয়, যেন উহাতে উজ্জ্বল সবুজের কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে।

তোরণগুলির অপর দিকে, মন্দিরের উদার প্রশস্ত বীথিসমূহ প্রসারিত;

ক্রমপরম্পরাগত অন্যান্য ঘেরগুলির মধ্য দিয়া এই সমস্ত বীথিগুলি বরাবর চলিয়া গিয়াছে। উহাদের দুই ধারে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ ইমারৎ, মেছো-পুষ্করিণী, বাজার, কুলুঙ্গীর মধ্যে আসীন বিবিধ দেবমূর্ত্তি, উচ্ছ্রিত-স্তম্ভ প্রস্তরগঠিত দ্বারহীন সেকেলে ধরণের মণ্ডপগৃহ ;—এই মণ্ডপগৃহের থামগুলি ভারতীয় ধরণের—চতুর্ম্মুখী ; খিলান-পার্শ্বের 'ঠেস্'-স্বরূপ, থামের মাথাগুলি কতকগুলি বিকটাকার মূর্ত্তিতে গঠিত।

প্রত্যেক ঘেরের তোরণের মাথার উপর সেই একই রকম, বর্ণনাতীত, গুরুভার ত্রিকোণাকৃতি চূড়া—৬০ ফুট উচ্চ। ১৫ "থাক্" প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি সারি সারি উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া এই চূড়াটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদিববাসিগণ অযুত চক্ষু দিয়া উপর হইতে অবলোকন করিতেছেন—অযুত অঙ্গের বিবিধ ভঙ্গী করিতেছেন। কতকগুলি দেবতা স্বীয় দেহের উভয় পার্শ্ব হইতে বিংশতি বাহু হাত-পাখার মত প্রসারিত করিয়া আছেন। তাঁহাদের মাথায় মুকুট, হস্তে অসি, বিবিধ প্রকারের সাঙ্কেতিক পদার্থ, পদ্মফুল, অথবা নরমুণ্ড। তাঁহাদের ঘন পংক্তির মধ্যে নানা প্রকার কাল্পনিক পশুও পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি ভাবে রহিয়াছে ;—অসম্ভব-বৃহৎ-পুচ্ছধারী ময়ূর অথবা পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ। তা ছাড়া, পাথরগুলা এমন ভাবে উৎকীর্ণ—এরূপ গভীর ভাবে ক্ষোদিত যে, প্রত্যেক প্রধান ও আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি, সমগ্র মূর্ত্তিসমষ্টি হইতে যেন স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় ;—যেন উহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত মূর্ত্তি-সংঘাত আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া, সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রের ন্যায়, সারি সারি কতকগুলি বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত পদার্থ, সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত নগ্নমূর্ত্তি, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত ভূষণ, একই অপরিবর্ত্তনীয় রঙ্গে রঞ্জিত। কত কত শতাব্দীর সহিত যুঝাযুঝি করিয়া এই রঙ্গ স্বকীয় উজ্জ্বলতা এখনও পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। এখানে রক্ত-লোহিত বর্ণেরই প্রাধান্য। দূর হইতে দেখিলে, প্রত্যেক চূড়াই লাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাছে আসিলে, অন্য রঙ্গেরও মিশ্রণ দৃষ্ট হয় ;—উহাতে সবুজ, সাদা ও সোনালি রঙ্গের মিশ্রণ রহিয়াছে।

দেবকার্য্যে নিযুক্ত যে সকল ব্রাহ্মণ অতীব শুদ্ধাচারী, তাঁহারাই মন্দিরের শেষ ঘেরটির মধ্যে সপরিবারে বাস করিবার অধিকারী। এই শেষ তোরণের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি জীবন্ত হস্তী প্রস্তর-চাতালের উপর শিকল দিয়া বাঁধা। এই বৃদ্ধ হস্তীগুলি অতীব পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এখন ইহারা আনন্দে বৃংহিতধ্বনি করিতেছে। ভক্তগণপ্রদত্ত তরুণ বৃক্ষের ডালপালা চর্ব্বণ করিতেছে। যেমন

এক দিকে অসংখ্যমূর্ত্তি-সমন্বিত এই সমস্ত গুরুভার মন্দিরচূড়ার গম্ভীর মহিমা, তেমনই আবার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলা নিতান্ত গ্রাম্য জিনিস থাকায় বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; কতকগুলি চালা ঘর, কতকগুলা ছোট ছোট সেকেলে শকট, আদিমকালের শ্রমকার্য্যোপযোগী কতকগুলা সামগ্রী ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। এই পুরাতন প্রাকারের পাদদেশে সমস্তই ভগ্ন চূর্ণ, সমস্তই বিলুপ্তমুখশ্রী। না জানি কোন্ সুদূর অতীতের নৃশংস বর্ব্বরতা এই প্রাকারটির উপর ধ্বংসের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সূর্য্য অস্তগত। দ্বারদেশ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব—সে সময় আর নাই। গুরুভার প্রস্তর-খিলানের নিম্নে, মন্দিরের অফুরন্ত মণ্ডপগুলির মধ্যে সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। তবে যে আমি প্রবেশ করিতেছি, সে কেবল কল্যকার রথযাত্রার কথা মন্দিরপুরোহিতদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত। ক্ষুদ্র চলন্ত ছায়ামূর্ত্তিবৎ ঐ সকল পুরোহিত, স্তম্ভশ্রেণীর অসীমতার মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে।

উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি যে কথা জানিতে পারিলাম, তাহা অতীব অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। যথা,—"বিষ্ণুদেবের রথযাত্রা আজ রাত্রেই, কিংবা আরও বিলম্বে আরম্ভ হইবে। দিন ক্ষণের উপর, তিথিনক্ষত্রের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।" * * * আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, উহাদের ইচ্ছা নয়, আমি এই উৎসবে যোগ দিই।

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর দেয়ালের ধারে ধারে দুই সারি অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাঘ্র, স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহৎ রোষদীপ্ত অশ্ববৃন্দ অঙ্কিত —এইরূপ একটি গভীরনিনাদী সরু পার্শ্ব-দালানের মধ্যে, এক জন অতীব সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ পুরোহিতের নিকট আমি সমস্ত অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন, এই উৎসব, নিশ্চয়ই কাল সূর্য্যোদয়সময়ে হইবে, এবং যদি এই উৎসব দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য আমার বাসায় গেলাম, এবং রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

কিছু আহার করিয়া পান্থশালা হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন মধুর চন্দ্রমা রজতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এই কিরণচ্ছটা এত শুভ্র যে মনে হয় যেন, তৃণশূন্য নগ্ন ভূমির উপর—সুধালিপ্ত প্রাচীরের উপর—অজস্র তুষারপাত হইতেছে।

আমাদের শীতদেশীয় বৃক্ষের ন্যায়, চতুর্দ্দিকস্থ লজ্জাবতী লতাগাছের মধ্যে, চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কেন না, উহার শাখাপল্লব

অতীব বিরল ও সূক্ষ্ম—প্রায় দৃষ্টির অগোচর। নরম পালকের থোপ্‌নার মত, উহাদের ছোট ছোট ফুলগুলিও যেন পড়ন্ত তুষারকণার অনুকরণ করিতেছে—ভূতলস্থ সংহত হিমকণার অনুকরণ করিতেছে। মনে হয় যেন, শীতপ্রধান উত্তর দেশের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এই অত্যুষ্ণ দেশে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখন আর আমি কিছুতেই বিস্মিত হই না—কেন না, এ দেশে যাহাই দেখি, তাহাই অপূর্ব্ব,—সমস্তই যেন বিচিত্র ছায়াচিত্রপরম্পরা; সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল মৃগতৃষ্ণিকা।

কিন্তু এই শীতের বিভ্রমটি ক্ষণিক; কেন না, এই শুষ্ক তৃণহীন ভূমিখণ্ড হইতে বাহির হইবামাত্র, বৃহৎ তালজাতীয় বৃক্ষের, বটবৃক্ষের, Bindweed বৃক্ষের পরিস্ফুট ছায়াতলে আসিয়া উপনীত হইলাম।

এই সময়ে উৎসব-দীপাবলীর আলোকচ্ছটায় নগরটি উদ্ভাসিত। সমস্ত অবারিত মন্দিরগুলি, এমন কি, আলমারির ন্যায় সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্রতম মন্দিরগুলিও, ছোট ছোট প্রদীপে ও হল্‌দে ফুলের মালায় সুসজ্জিত। শ্রীরাগমের অভিমুখে আমার গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে; একটার পর একটা কত দৃশ্যই আসিতেছে, কিন্তু সমস্তই পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। * * *

আবার এই সময়েই "রামদানে"র মাস; সুতরাং মুসলমানদের মধ্যেও এখন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। যে মস্‌জিদ্‌টির সম্মুখে তুরীভেরী বাদ্যের সহিত, নানা রঙ্গের অসংখ্য উষ্ণীব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই মস্‌জিদ্‌টি অসংখ্য প্রজ্বলিত দীপকাঠিতে আচ্ছন্ন। পরী-দৃশ্যটি আরও সম্পূর্ণ করিবার জন্যই যেন সাদা প্রাচীরগুলি, স্তম্ভশ্রেণী, লতাপাতা-অঙ্কিত আরবী-ধরণের নক্‌সাদি, প্রজ্বলিত দীপাবলী,—সমস্তই একটি লাল রঙ্গের সূক্ষ্ম মলমল্ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত; তাহাতে, মস্‌জিদ্ একটু ঘোর-ঘোরভাব ধারণ করিয়াছে, উহাতে গোলাপী রঙ্গের ছায়া পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন মস্‌জিদ্‌টি আরও একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে; সমস্ত বস্তুর আকারে ও দূরত্বে যেন এক প্রকার অস্পষ্ট অনিশ্চিতভাব আসিয়া পড়িয়াছে; কেবল মস্‌জিদ্‌টির ঈষৎনীলাভ তুষারধবল "মিনার"-চূড়াগুলি ও গম্বুজটি এই রঙ্গিন বস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে;—উহাদের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধ্বজাগ্রগুলি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; এবং সমস্ত মিলিয়া এক সঙ্গে তারকা-খচিত আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সীমাদ্রি-শিখরে।

গুরু গুরু গুরু দেবদুন্দুভি
উঠিয়াছে নভে বাজি' রে!
থমকি' চমকি' চকিত তড়িৎ
দিকে দিকে ছোটে নাচি' রে!

লম্বিত ঐ শৈলশিখরে
নীরদ-সোপান-রাজি রে!
অমরা হইতে কে এল মরতে—
মন্দারদামে সাজি' রে!

ঝর ঝর ঝর ভৃঙ্গারবারি
ঢালে দিগঙ্গনা হরষে,
ফুটিছে শিহরি' কেতক নীপ
কাহার চরণ-পরশে?

দেখ দেখ দেখ, কার কেশদাম
ঢেকেছে সকল দিগন্ত;
কার এ বিমল তনু-পরিমলে
সুগন্ধ ধরণী অনন্ত!

কাহারে নিরখি' শিখিনী শিখী
বর্হ বিথারি' নাচিছে?
গম্ভীর-স্বরে প্রাবৃট-শঙ্খ
কলাপি-কণ্ঠে বাজিছে?

স্নিগ্ধ নীলিমা চারু শ্যামলিমা
মধুর বরণ-দৃশ্য রে!
কার তনু-ছায় ঘন নীলিমায়
ফুটিয়া উঠিছে বিশ্ব রে!

গুরু গুরু গুরু দুরু দুরু দুরু
হৃদয় আমার কাঁপিছে!
ঐ ঘন ঘন-মাঝে মেঘনির্ঘোষে
কে যেন আমারে ডাকিছে।

ঝর্ঝর ঝর-নির্ঝর-স্বর-
মুখরিত গিরি অরণ্য,
চল আনি' তুলি' গিরিমল্লিকা
চারু চম্পক বরেণ্য।

নীল লোহিত পাটল পীত
কুসুমপুঞ্জ সুরঙ্গ,
আলোক-ছায়া মিলিত কায়া,
যেন হরি-হর একাঙ্গ!

এই নির্ঝর-ধারে শৈলশিখরে
পূজিতে বর সুন্দরে!—
গাঁথ সজনী! প্রসূনদাম,
গাঁথহ চারু ছন্দ রে!

কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়।

চাঁদ রায়ের পর বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ আলোচনা করা যাইতেছে। সেনবংশীয় শেষ পরাক্রান্ত রাজা দনুজমর্দ্দন বা দনৌজা মাধব চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা। তাঁহার দৌহিত্র বসু-বংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের অধিকার

লাভ করেন। সুতরাং ইঁহারা অনেক দিন হইতে পরাক্রান্ত ভুঁইয়া-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মোগল-বিজয়ের সময়ে কন্দর্প রায় বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ অতি পরাক্রান্ত বীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে অনেক সৈন্য ছিল; তিনি যবনপতি গাজীকে যুদ্ধে নিহত ও মগদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় কর্তৃক হোসেনপুর হইতে যবনগণ বিতাড়িত হয়। (১) মোগলেরা প্রথমে বঙ্গ জয় করিলে দায়ুদ উড়িষ্যা লইয়া ক্ষান্ত হন। পরে মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গ-জয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। (২) কন্দর্প রায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর কখনও বিদ্রোহাচরণ করেন নাই। রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্দর্প রায়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কন্দর্প রায় বন্দুক-ক্রীড়া ভালবাসিতেন। (৩) কন্দর্প রায়ের পর তাঁহার শিশু পুত্র রামচন্দ্র বাকলার অধীশ্বর হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জেসুইট প্রচারক ফন্‌সেকা তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত

---

(১) কন্দর্প রায় সম্বন্ধে ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে।—

"কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ সব্যসাচিসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মহাবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ স নৃপোত্তমঃ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনখ্যপুরাৎ ততঃ।
রথীনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

(২) "In 982, he (Murad khan) was attached to Munim's Expedition of Bengal.He conerqued for Akbor the district of Fathabad, Sirkar Bogla and was made Governor of Jellasur in Orisa, after Daud had made peace with Munim." (Blochman's Ain-i-Akbari)

3 "From Chatigan in Bengala I came to Bacola; the king where of is a Jentile, a man very well disposed and delighted much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotten cloth and cloth of

হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অষ্টমবর্ষীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৫৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউয়েন নামে চারি জন জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ইঁহারা বঙ্গদেশ ব্যতীত আরাকান প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফনসেকা চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় উপস্থিত হন। পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে গমন করেন। তৎকালে সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে আপনার দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মানপ্রদর্শন করেন। ফনসেকা বলিয়াছেন যে, তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও, তাঁহার বিবেচনাশক্তি অধিকবয়স্কের ন্যায়ই ছিল। রামচন্দ্র ফনসেকাকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন যে, আমি চ্যাণ্ডিকানে আপনার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যাইতেছি। আপনার রাজ্যের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইতেছে বলিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আপনার রাজ্যের মধ্যে গির্জানির্ম্মাণ ও লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার আদেশ প্রদান করুন। রামচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদিগের সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া নিজেই তাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পরে তিনি ফনসেকাকে আজ্ঞাপত্র ও দুই জনের উপযোগী বৃত্তি প্রদান করেন। (৪) ফনসেকার বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সে সময়ে বাকলায় রামচন্দ্রের আশ্রয়ে অনেক পর্টুগীজও বাস করিত। কার্ভালোর সহিত যুদ্ধের পর আরাকান-রাজ সনদ্বীপ

---

silke. The houses be very faire and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The woman weare great store of silver hoops about their neckes and armes, and their legs are ringed with silver and copper and ringes made of elephant's teeth."—*Harton Rylay's Ralph Fitch. P. 118.*

(৪) "And it appeared to be by the disposition of our lord that when I was about to go to Arracan in the place of Firnandez, who was ill with fever. I too should fall ill, and should be transferred to Ciandeca ; so that in this journey the company gained a residency in the kingdom of Bacola, I

অধিকার করিলে, রামচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য স্বীয় রাজ্য হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আরাকান-রাজ সেই সুযোগে বাকলা অধিকার করিয়া লন, এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অধিকার করিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন। (৫) বাকলা মগগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণেও মগগণ কর্ত্তৃক

---

had scarecely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, but whose discretion sarpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waiting for me, all the nobles and captains rose up, and I a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him. After compliments he asked me where I was going, and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the Company trusting that his Highness would give permission to the erection of churches and the making of christians. The king said, 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualites,' and so he gave me a letter of authority, and also assigned a maintenance sufficient for two of us."—*Beveridge's Bakarganj. pp. 30-31.*

(৫) ডুজারিক আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক বাকলা-অধিকারের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"The king of Arracan, was proud of having taken the island of Sundwip from the Portuguese ; and desiring now to pursue his design of conquering all the kingdoms of Bengal, he sndd'enly threw himself upon that of Bacola, of which he possessed himself without difficulty as the king of it was absent and still young."—*Beveridge's Bakarganj. P. 34.*

" For whiles the king of Arracan having lately achieved so great matter in Pegu, and added Sundwiva and the kingdome of Baccala intended to annex Chandecan, to the rest of his conquest."—*Purcha's Pilgrim's. Pt. iv. Bk. V. P. 514.*

চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের উল্লেখ আছে। (৬) কিন্তু তাহার পর রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বাকলা অধিকার করিয়া লন। রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের একাধিপত্যলাভ ও চন্দ্রদ্বীপ-অধিকারের জন্য বিবাহরাত্রিতেই আপনার জামাতাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার সামন্ত রামনারায়ণ মল্ল চতুঃষষ্টি-ক্ষেপণী-যুক্ত, কামানে সজ্জিত ও সৈন্যে পরিরক্ষিত একখানি নৌকা আনিয়া দেন; রামচন্দ্র তাহাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন। তিনি কামানের ধ্বনি দ্বারা স্বীয় গমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (৭) রামরাম বসু বলেন যে, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শুনিয়া স্বীয় শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে মশালধারীর বেশে প্রতাপাদিত্যের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে বাকলায় প্রস্থান করেন, এবং তোপধ্বনি দ্বারা আপনার পলায়ন জ্ঞাপন করেন। বসন্ত রায় তাঁহার পলায়নের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার হয়। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, বিবাহরাত্রিতে রমাই ভাঁড় নামে এক জন লোক রামচন্দ্রের আদেশমতে স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের

---

(৬) "মগজাতিশস্ত্রপাতৈঃ মর্ত্তব্যা সকলাঃ প্রজাঃ।
মগাধিকারো ভাবী চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি।
মগান্তে যবনো ভাবী কল্কিদেবাবধির্দ্বিজাঃ।"

(৭) "যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপাযেমে নৃপোত্তমঃ॥
ততো বিবাহযামিন্যাং ক্রূরো যশোহরেশ্বরঃ।
সমাজস্যাধিপত্যার্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ॥
মন্ত্রণাং পাত্রভিঃ সার্দ্ধং কৃতাসৌ ভীমবিক্রমঃ।
কুচক্রং কল্পয়ামাস স্বজামাতুর্বধং প্রতি।
এতৎসর্ব্বং রামচন্দ্রঃ শ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽভবৎ॥
মল্লকুলোদ্ভবো মল্লো রামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা সকলসংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।

বধের আদেশ প্রদান করেন। ফলতঃ প্রতাপ যে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা সকল প্রবাদ অপেক্ষা প্রাচীন ঘটককারিকার প্রবাদই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্রের সহিত অনেক দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহের কথা হয়। সম্ভবতঃ, এই বিবাহসময়ে রামচন্দ্র কিছু কাল স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকান-রাজ বাকলা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই সময়ে কার্ভালোও প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হয়। রামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যকে জয় করিয়া বন্দি-অবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (৮) বাকলাতেই লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। রামচন্দ্র মোগল ও মগ

চতুঃষষ্টিদণ্ডযুক্তা নৌরানীতা মহামতিঃ॥
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতা।
তস্যামারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকাযুধং।
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালীকধ্বনিভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ।"

উজীরপুরের সিংহরায়গণ উক্ত রামমোহন মল্লের বংশোদ্ভব। তাঁহারাও কায়স্থ-বংশজ।

(৮) "রামচন্দ্রস্তস্য সুতঃ গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্দ্ধরঃ শূরো ভীমসেনসমো বলী॥
জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং।
স্বরাজ্যে হ্যানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলঃ।"
* * *
মহাযোধো মহাবথো বিক্রমে কেশরিসমঃ।
ভাস্বরস্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥—ঘটককারিকা।"

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁহার নৌকায় উপস্থিত হন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রামচন্দ্র তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ভুলুয়া হইতে এইরূপ প্রবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রামচন্দ্র যুদ্ধঘোষণা করিয়া ভুলুয়ায় উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার রণতরীতে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইলে, তিনিই অবশেষে ধৃত হন। সিংহ মহাশয় উক্ত প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ঘটককারিকায় দেখা যায় যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াই বন্দি-অবস্থায় আনয়ন

কর্ত্তৃক আক্রান্ত পর্টুগীজদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী আপনার প্রাধান্যবিস্তারের জন্য রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাঁহার অধিকারস্থ সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা অধিকার করিয়া লয়। গঞ্জালেস নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করা যাইবে। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণও অত্যন্ত বীর ছিলেন, তিনি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ ছিলেন, এবং মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গীগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ঢাকার নবাব তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। (৯) চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বাহুবলের জন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বংশানুক্রমে তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কচুয়া নামক স্থানে প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরে কন্দর্প রায় মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপিত করেন। (১০) বাকল নামে কোন নগর ছিল কি না, জানা যায় না; থাকিলে, ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের প্লাবনে তাহা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ মহাপ্লাবনের কথা আইন-আকবরীতেও লিখিত আছে।

করেন। প্রাচীন ঘটককারিকা অপেক্ষা বর্ত্তমান প্রবাদের অধিক মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

(৯) "কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গসৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীরপুরাধীশো নবাবো যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥"—ঘটককারিকা।

(১০) "স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটিসংজ্ঞকং।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈব চ॥"

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ।
গমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপে তদা মহৎ।
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি॥
মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্ম্মকৃতা যদা।
স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ॥"

প্রতাপাদিত্য।

প্রতাপাদিত্য হিন্দু ভুঁইয়াত্রয়ের অন্যতম ছিলেন। তিনি কিরূপ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাহা সকলেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। যদিও কোন মুসলমানী ইতিহাসে তাঁহার বিবরণ বর্ণিত হয় নাই, তথাপি জেসুইট প্রচারকগণের বিবরণ হইতে আমরা তাঁহার পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া থাকি। তাঁহারা বারভুঁইয়ার মধ্যে শ্রীপুর ও চণ্ডীকানের অধিপতিকে ক্ষমতাশালী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সেই চণ্ডীকানেরই অধিপতি ছিলেন। এই চণ্ডীকান বা চণ্ডীকা সাগর দ্বীপের নামান্তরমাত্র। প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন, এই জন্য ইউরোপীয়গণ কর্তৃক তিনি চণ্ডীকানের অধিপতি বলিয়া কথিত হইতেন। প্রতাপাদিত্য কিরূপে আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন,এবং তাঁহার সম্বন্ধে কি পরিমাণে প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়, আমরা প্রতাপাদিত্য নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিব।

এই সমস্ত ভুঁইয়া ও জমীদারগণের ইতিহাসের আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালী এককালে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। কেবল ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা নহে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব-সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বাঙ্গালী বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যাঁহারা সীতারাম রায় ও উদয়নারায়ণের বিবরণের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালীগণ রাজসরকারে কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াও অস্ত্রধারণে কুণ্ঠিত হইতেন না। জানকীরাম ও দুর্লভরাম প্রভৃতি তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। আমরা আমাদের ইতিহাসের আলোচনা করি না, তাই আমরা আমাদিগকে কাপুরুষের সন্তান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, আমাদের পিতৃপিতামহ-গণ কাপুরুষ ছিলেন না। কেবল আমরাই কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছি। ইতিহাস গুরুগম্ভীরস্বরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ভারতচন্দ্রের যুগ।

দেশের ও সমাজের অবস্থা।

ঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যেও বলাসবাহুল্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হেতু অনেকেরই দুর্নাম রটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মুর্শিদকুলীর সহিত তদীয় জামাতা সুজা খাঁর মনান্তর হয়; মনান্তরের প্রধান কারণ, মুর্শিদকুলীর কন্যা জিনেতউন্নিসা স্বামীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। এই এক দোষে সুজা খাঁর বহু সদ্‌গুণ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। (১)

দুর্ভাগ্য স্বল্পভোগী সরফরাজের দোষরাশির উপর বিস্মৃতির যবনিকাপাতই বাঞ্ছনীয়। শুনা যায়, তাঁহার শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সংখ্যা ১৫০০ ছিল। (২) এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে দেশের প্রধানগণ তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। "জগৎশেঠের পুত্র এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি একদিন ঐ কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন যে, কেহই তাঁহার জিদ ভঙ্গ করিতে পারিল না। জগৎশেঠকে অগত্যা পুত্রবধূকে রাজভবনে লইয়া গিয়া নবাবকে দেখাইয়া আসিতে হইয়াছিল।" (৩) অপদার্থ সরফরাজ প্রজার মান সম্ভ্রমের বিষয়ে এমনই উদাসীন ছিলেন।

স্নেহান্ধ, স্ত্রৈণ আলিবর্দ্দী স্বজনগণের দোষে একান্তই অন্ধ ছিলেন। যে যুবকের কুক্রিয়া-স্রোতে তাঁহার সযত্নসংস্থাপিত সিংহাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, সে তাঁহারই অতিরিক্ত স্নেহে নষ্ট হইয়াছিল। বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার কয়

---

(১) হাজি আহম্মদ তাঁহার জন্য সুন্দরী সংগ্রহ করিতে যাইয়া বহু মানবিয়োগভাজন হয়েন। মুতাক্ষরীণের টীকায় সুজা খাঁর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সহজে বিশ্বাস করাই দুঃসাধ্য।—লেখক।

(2) Stewart—History of Bengal.

(৩) স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালার ইতিহাস।" See Holwell—Interesting Historical Events.

দিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার জন্ম হয় ; সেই হইতে তাঁহার প্রতি আলিবর্দ্দীর স্নেহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কামুকতাই আলিবর্দ্দীর বংশের কাল হইয়াছিল। তিনি সরফরাজের জননীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহম্মেদ সরফরাজের অন্তঃপুর হইতে বলপূর্ব্বক কয় জন রমণীকে ভোগার্থ লইয়া যাইলে, আলিবর্দ্দী তাহার প্রতীকার করা দূরে থাকুক্, সে বিষয়ে দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তাঁহার ক্ষমতাসূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগনে করবিস্তার করিতেছিল, তখন তাঁহার পরিবারে যে সকল কুকাণ্ডের অভিনয় হইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ হয়। হোসেন কুলী সিরাজের পিতৃব্যপত্নী ঘাসিটী বেগমকে পরিত্যাগ করিয়া যখন সিরাজজননী আমিনা বেগমের মোহে মুগ্ধ হন, তখনই সিরাজ ঈর্ষ্যাজর্জ্জরিতা পিতৃব্যপত্নীর সম্মতিক্রমে তাহার প্রাণনাশ করেন। এই কুকার্য্যে যে আলিবর্দ্দীরও সম্মতি ছিল না, এমন বলা যায় না। (৪)

মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা সিরাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, তিনি কুক্রিয়াসক্ত অনুচরবর্গের সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদের রাজপথে পরিভ্রমণ-কালে,কি স্ত্রী,কি পুরুষ,সকলেরই প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। লোকেরা তাঁহার দর্শনমাত্রেই বলিয়া উঠিত, "ভগবান্, দুরাত্মার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

অল্প দিনেই হীরাঝিলে বিলাস-বাসনাও ক্রমাগত চরিতার্থতা হেতু নূতনের চাকচিক্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোগলরাজত্বের অস্তিমকালীন মুর্শিদাবাদের নবাবের সভা দিল্লীর রাজসভার প্রতিবিম্বমাত্র।

বঙ্গদেশে ধান্য ও অন্য বহুবিধ শস্য,—রেশম, কার্পাস ও নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। (৫) সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালায় যে ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার উদ্বৃত্ত অংশ নৌকাযোগে গঙ্গাতীরে পাটনা পর্য্যন্ত ও সাগরকূলে মছলীপট্টমে রপ্তানী হইত। এমন কি, সিংহলে ও মালদ্বীপেও বঙ্গ হইতে চাউল যাইত। বাঙ্গালা হইতে কর্ণাটে, মোকা ও বসোরার পথে আরবে, মেসোপোটেমিয়ায়,

---

(৪) মুতাক্ষরীণ।

(৫) ভারতচন্দ্রের "দিল্লীতে উৎপাত" বর্ণনে দেখিতে পাই,—

> "ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
> মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
> দেধান মাড়ূয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
> জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥"

এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যে চিনি যাইত। বঙ্গে আম্র, আনারস, লেবু, হরিতকী প্রচুর ফলিত। (৬) গোধূম যে না জন্মিত, এমন নহে। তবে দেশের লোক অন্নাহারী বলিয়া অধিক গোধূমের উৎপাদন করিত না। যে গোধূম জন্মিত, ইংরাজ, ডাচ ও পর্টুগীজ জাহাজের নাবিকগণ তাহাতে বিস্কিট প্রস্তুত করিত। কয় প্রকার উদ্ভিদ, অন্ন ও ঘৃতই দেশের সাধারণ লোকের প্রধান আহার ছিল। সে সকল দ্রব্যই সুলভ ছিল। ছাগমাংস, মেষমাংস, শূকরমাংস ও পক্ষিমাংসও সুলভ ছিল। তাই প্রবাদ ছিল, বঙ্গে প্রবেশের শত দ্বার মুক্ত, কিন্তু বঙ্গ হইতে বাহির হইবার একটি দ্বারও নাই। কারণ, খাদ্যাদি সুলভ ছিল। পক্ষান্তরে বঙ্গের জলবায়ু সহজে বিদেশীয়দিগের সহ্য হইত না। রেশম ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। এই সকল দ্রব্য কাবুলে, জাপানে, য়ুরোপেও প্রেরিত হইত। ডাচ ও ইংরাজগণ বঙ্গের সোরায় ব্যবসায় চালাইত। জলপথবহুল বঙ্গে জলপথের উভয় পার্শ্বে বহু জনপূর্ণ গ্রাম ছিল। গ্রামের ক্ষেত্রে বহুবিধ উদ্ভিদ ও শস্য জন্মিত। তদ্ভিন্ন, গ্রামে রেশমের গুটীপোকার আহার্য্য তুঁত-গাছও যথেষ্ট দৃষ্ট হইত। নদীগর্ভে বহু চর ছিল, চরের ভূমিও বিশেষ উর্ব্বর ছিল। দেশে কড়ীও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। (৭) বঙ্গের পাটী তখনও প্রসিদ্ধ। (৮)

জলপথবহুল বঙ্গে নানা প্রয়োজনানুরূপ নানাবিধ নৌকা নির্ম্মিত হইত। (৯)

---

(৬) সুপারী ও দাড়িম্বও জন্মিত। India of Aurangzeb গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

(৭) Bernier.

(৮) India of Aurangzeb.

(৯) India of Aurangzeb.

"রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন,—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মুকারম খাঁর কথায় Stewart বলেন, তিনি ঢাকায় আসিয়া রাজধানী করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ নদীবহুল, বিশেষ বর্ষাকালে অনেক স্থান জলমগ্ন থাকে; তজ্জন্য বঙ্গে শাসন-কর্ত্তাকে বহুবিধ নৌকা রাখিতে হইত। জলদেবতার প্রতি হিন্দু ও মুসলমান প্রজার ভক্তির আধিক্য হেতু শাসন-কর্ত্তাকেও বাধ্য হইয়া জলদেবতার পূজা দিতে হইত।—History of Bengal.

মুতাক্ষরীণের টীকায় দেখা যায়, ঢাকা হইতে বর্ষে বর্ষে দিল্লীতে নৌকা প্রেরিত হইত।

দিল্লীতে সম্রাটের অনুকরণে মুর্শিদাবাদে নাজিম স্বয়ং বা কর্ম্মচারীর সাহায্যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। আবার তাঁহার অনুকরণে জমীদারগণ আপন আপন অধিকারমধ্যে বিচার করিতেন। "জনশ্রুতি আছে যে, যবনরাজত্বকালে নবদ্বীপের রাজারা আপন অধিকারমধ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির স্বত্বাসত্বের ও সর্ব্বপ্রকার অপরাধের বিচার করিতেন। রাজা প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিচারাসনে বসিয়া সর্ব্বসাধারণের আবেদন শুনিতেন ও তাহার বিচার করিতেন। স্বত্বাস্বত্বের বিচার প্রথমে তাঁহার দেওয়ান করিতেন, কিন্তু তাহার চূড়ান্ত আদেশ রাজা দিতেন। অপরাধের বিচারের ভার তাঁহার ফৌজদারের প্রতি অর্পিত ছিল। এই উভয় কর্ম্মচারীর কৃত বিচারের আপীল রাজসন্নিধানে হইত। রাজা অবিচার করিলে তাহার আপীল নবাবের নিকট হইতে পারিত। কিন্তু রাজার বিচারের বিরুদ্ধে অপীল করা অতি দুঃসাহসের কর্ম্ম ছিল।" (১০)

বর্দ্ধমানের "গড়বর্ণনে" ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—দস্যু, তস্কর ও ভ্রষ্টাগণ "বেড়ীপায় মেগে খায় বাজার বাজার।" কোতয়ালি চতুরতায়,—

"যমালয় সমান লেগেছে ধুমধাম ॥
ঠড়ঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার ছটছটি ॥"

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তে দেখা যায়, বর্দ্ধমান রাজদরবারে উকীলও থাকিত।

নবদ্বীপের রাজাদের সদর কাছারীতে "ন্যূনাধিক দুই শত কর্ম্মচারী থাকিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের "তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।" বর্দ্ধমান-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র সেনাগণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু একবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সেই দস্যুতস্করের অত্যাচারবহুল কালে জমীদারদিগকে লোকবলে

"কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে "মধুকরাদি" যে সকল ডিঙ্গীর উল্লেখ ও বর্ণনা আছে, সে সকল পাঠ করিলে সহজেই মনে হয়, বঙ্গে বহু দিন হইতে নৌনির্ম্মাণ চলিত ছিল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলযানের ও জলদস্যুর কথা বঙ্গের ইতিহাসে অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইবে। বাহুল্যবোধে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

এখন বঙ্গদেশে নৌনির্ম্মাণব্যবসায় বিলুপ্ত হইতেই বসিয়াছে।—লেখক।

(১০) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত

আত্মরক্ষা ও প্রজারক্ষা করিতে হইত, এবং সেই জমীদারসম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই সীতারামের ও প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়। প্রথম হইতে সেনাসংগ্রহ বিষয়ে বাধা পাইলে তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে সেনাগর্ব্বে মুসলমান-শাসন অবহেলা করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা,—

"চালী খেলে উড়া পাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়-বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মাল সাটে ফুটি হেন মাটী ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস।"

তখন "ফিরীঙ্গী"রা দেশীয় জমীদারদিগের সেনাদলেও কার্য্য করিত; মোগল-পাঠানগণ সৈনিকের কার্য্য করিত; "অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল" ক্ষত্রিয় সকল ও "যুদ্ধে মজবুত" যত রাজপুত তাঁহাদিগের প্রধান বল ছিল।

সমাজে, এমন কি, পূজাদি-প্রচলনেও জমীদারদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জমীদারদিগের—বিশিষ্ট প্রাধান্য ও অধিকার ছিল। নবদ্বীপের "রাজারা কদাচারীকে জাতিচ্যুত ও পতিতকে উদ্ধার করিতেন। শূদ্রজাতির মধ্যে কেহ দুষ্কর্ম্মদোষে পতিত হইলে রাজসনন্দ ব্যতীত কখনই সমাজে চলিত হইত না। * * * * উজনীয়া গোপসম্প্রদায়ের জল পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না। এই রাজারা এ প্রদেশে তাহাদিগকে চলিত করেন।" (১১) "চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি" জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণার পূজা প্রবর্ত্তিত করেন।

জমীদারগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই প্রজারঞ্জক ছিলেন। সুগঠিত রাজবর্ত্ম, বিস্তৃত সেতু ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা অনেক স্থানে তাঁহাদিগের কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বকালে সুলভ শ্রমজীবীর শ্রমে তাঁহারা যে সকল সরোবর খনন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের বংশধরগণের পক্ষে সে সকল সংস্কৃত করাই দুঃসাধ্য। (১২) তখন পথিপার্শ্বে ছায়াবহুল বৃক্ষরোপণ, সরোবর-খনন প্রভৃতি লোকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিত। অনেক জমীদার বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপের রাজবংশীয়গণ বিশেষ উল্লেখ-

---

(১১) ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত।

(১২) তখন বেগারও চলিত ছিল। কিন্তু লোকের উপকারার্থ বলিয়া লোকে বেগার দেওয়া অন্যায় মনে করিত না। প্রাচ্যে এরূপ অনেক কার্য্যই বেগারশ্রমে সম্পন্ন Stein's Sand-Buried Ruins of Khotan দ্রষ্টব্য।—লেখক

যোগ্য। এই বংশীয়গণ নানা স্থান হইতে পণ্ডিতদিগকে আনিয়া অধিকারমধ্যে স্থাপিত করিতেন, এবং অধ্যাপকদিগকে পরিবারের ও শিষ্যবর্গের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমি বা বৃত্তি দান করিতেন। রাজসমীপে পরীক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে উপাধি গ্রহণ করিতে হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা "নানাজাতি সুগন্ধ সুন্দর কুসুম-শোভিত উদ্যানের ন্যায় বিবিধ গুণসম্পন্ন বুধগণে:শোভমান ছিল।"

দেশীয় শিল্প এই সকল জমীদারের উৎসাহেই উন্নতিলাভ করিত। রাজসভায় সঙ্গীতচর্চ্চা হইত। রাজপরিবারের জন্য বস্ত্রবয়নে তন্তুবায় শিল্পকৌশলে উন্নতি-লাভ করিত। জমীদারদিগের সহায়তাতেই স্থপতিশিল্প ও ভাস্করকার্য্য শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিত। রাজগণপ্রকাশিত নানা দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণেই কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ মৃন্মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে নিপুণ হইয়া উঠে। এ কার্য্যে তাহারা বিশেষ উৎসাহ পাইত। তাহাদিগের বংশধরগণ নানাবিধ মৃন্ময়ী মূর্ত্তির নির্ম্মাণ করিয়া অদ্যাপি দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করিতেছে। এই সকল মূর্ত্তিতে স্বভাবানুকরণনৈপুণ্য দেখিলে শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বঙ্গে স্থপতিশিল্পেরও যে উন্নতি না হইয়াছিল, এমন নহে। বঙ্গের স্থাপত্যে বিশেষত্ব বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ের মিশ্রিত স্থাপত্যে যে সকল কদাকার গৃহ লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিতেছে, সে সকল ছাড়িয়া দিলে বুঝা যায়, বঙ্গের কুটীরে ও বঙ্গের মন্দিরাদি গৃহে বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাহাই বঙ্গের স্থপতিশিল্পের বিশেষত্ব। (১৩) বঙ্গের স্থপতিশিল্পের অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান। দিনাজপুরে কান্তনগরের মনোহর মন্দির ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। ১৪ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র, ঢাকা হইতে আলাল দস্ত নামক এক জন প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর চক ও নওবৎ-খানা ইত্যাদি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান ; এবং তাহাকে এখানে (কৃষ্ণনগরে) রাখিয়া অত্রত্য গাঁড়ালজাতীয় অনেক ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। এই জাতির মধ্যে এরূপ সুনিপুণ স্থপতি সকল হয় যে, তাহারা কৃষ্ণনগরের রাজভবনে যে বৃহৎ শোভান্বিত পূজার দালান (১৫) ও শিবনিবাসের যে তিন দেবমন্দির নির্ম্মাণ

---

(১৩) Fergusson—Indian and Eastern Architecture.

(১৪) Buchanan Hamilton—Eastern India. Edited by Martin

(১৫) "রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি, কত ঘর, যেন হর্ম্ম্যবন ;

করে, তাহার কল কৌশল অদ্যাপি দেখিলে দর্শকগণ প্রীত ও চমৎকৃত হন। এমন সুন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রাসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গ দেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে নয়নগোচর হয় না। * * * * শিবনিবাসের কোন কোন অট্টালিকার প্রাচীরে চূণ ও সুরকি ইত্যাদি সামান্য উপকরণ দ্বারা এরূপ সুন্দর ও সুদৃঢ় জাফরি নির্ম্মিত হইয়াছে যে, যদিও তাহাতে দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টির আঘাত লাগিতেছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহা দেখিলে প্রস্তর ব্যতীত আর কিছু অনুমিত হয় না।" (১৬) দিঘাপাতিয়া রাজবংশের বংশপতি দয়ারাম সীতারামের কৃষ্ণজীকে যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে গৃহ এত দৃঢ় যে, গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের দারুণ ভূমিকম্পে তাঁহার পরবর্ত্তি-গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সৌধমালা ভূমিসাৎ হইলেও, সেই প্রাচীন জরাজীর্ণ গৃহ ভগ্ন হয় নাই। ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির ৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ও পুরীর মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। বুদ্ধ-গয়ার বর্ত্তমান মন্দির ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার নির্ম্মিত হয়। তখন বঙ্গে জমীদার-গৃহ গড়বেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত ও সুন্দর হইত।

পূর্ব্বে, যে যে সম্প্রদায়ের যে যে ব্যবসায়, তাহারা তাহাই করিত। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনশঙ্কায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না। তখন ব্রাহ্মণগণ "নাজির বা দারোগার পদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না।" "তদানীন্তন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপন, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থরচনা এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবনযাপন করিতেন। সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি প্রায় কিছুই মনোনিবেশ করিতেন না।" (১৭)

চমৎকার পরিপাটী পূজার দালান
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্র সম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কত কাল গেছে তবু চক্‌মক্ করে :
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বারচতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাঠলেশ।"—সুরধুনী কাব্য

(১৬) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(১৭) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

দস্যু তস্করের উপদ্রবে দেশবাসী যাঁহারা স্বচ্ছন্দাবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন, তাঁহারাও দীন অবস্থায় বাস করিতেন। "তাঁহাদের অর্থ চন্দ্র সূর্য্যেরও গোচর হইত না, নিয়ত গৃহের প্রাচীরমধ্যে অথবা ভূগর্ভে নিহিত থাকিত। ঋণের আদান প্রদান কার্য্য পর্য্যন্ত অতি সঙ্গোপনে সম্পাদিত হইত। অধিক লোকের বিদিত হইবার আশঙ্কায় ঋণপত্রে অন্য সাক্ষী না করিয়া কখন কখন কেবল ধর্ম্ম সাক্ষী লিখিত হইত। দস্যুতস্করভয়ে সাধারণ লোকেরা ঘরের মেঝের মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত রাখিতেন, এবং রাত্রিতে আভরণ ও তৈজসাদি তন্মধ্যে রাখিয়া তদুপরি এক কাষ্ঠফলক প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর শয্যা করিয়া নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার পর গ্রামান্তরে যাইতে হইলে বিষম বিপদ উপস্থিত হইত। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ আরও বিপদজনক ছিল।" (১৮)

ভারতবাসীদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ধনবান ও সম্ভ্রান্তগণ আপনাদিগের কামিনীগণকে রত্নাভরণ ও স্বর্ণভূষণ দিতেন। "মধ্যবিত্ত মহিলাগণ নাসিকায় নথ, কর্ণদ্বয়ে নলঝুমকা বা ধেঁড়িঝুমকা, গলদেশে পাঁচনর বা সাতনর বা কণ্ঠমালা, এই কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার পরিতেন। আর বাহুদ্বয়ে তাড়, হস্তদ্বয়ে বাউটি, গজরা, রুশুন, কুসীকঙ্কণ ও পুঁইচা, কটিদেশে গোট বা চন্দ্রহার, পাদযুগলে মল, পদাঙ্গুলিতে পাশুলি, এই কয়েকখানি রজত-নির্ম্মিত আভরণ পরিধান করিতেন। (১৯) অপেক্ষাকৃত হীনবিত্ত রমণীরা স্বর্ণাভরণের মধ্যে কেহ বা কেবল নথ ও কণ্ঠমালা, এবং তিন চারখানি রূপার অলঙ্কার পাইলেই চরিতার্থ হইতেন। অধমাবস্থার স্ত্রীলোকের স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত কোন অলঙ্কার থাকিত না। তাঁহারা কাংসা বা পিত্তলের আভরণ পাইলেই কৃতার্থন্ম

---

(১৮) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(১৯) "কবিকঙ্কণচণ্ডীতে" বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। তাড় বালা, কঙ্কণ, কেয়ূর, (অঙ্গদ] অঙ্গুরী, হার, [পাঁচনর ও সাতনর ও কণ্ঠমালা] নূপুর পাসলি, চুড়ী, ও কর্ণে হেম-মুকুলিকা এবং কর্ণপুর ও শঙ্খ উল্লেখযোগ্য।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘনরাম "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে অঙ্গুরী কর্ণপুর, কণ্ঠমালা ও শঙ্খ ব্যতীত আরও যে সকল অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, "নয়ানী শিবাইদত্ত বারুয়ের বৌ"র লাউসেনকে দেখিয়া "লাস বেশ"—বর্ণনায় সে সকলের নাম পাওয়া যায়। সে তালিকাও নিতান্ত সঙ্কিপ্ত নহে।—

"আরোপে অলকাকোলে মুকুতার পাঁতি।
সীমন্তে রচিয়া দিল সুবর্ণের সিঁথি ॥
অঙ্গে পরে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
প্রবাল পুরট পাঁতি গজমতিহার ॥

হইতেন। রাজপরিবারস্থ কামিনীগণ তৎকালেও বিবিধ রত্নখচিত স্বর্ণভূষণে ভূষিত থাকিতেন।" (১৯) শাঁখা, সোনা, রঙ্গিন শাড়ী সকলের ভাগ্যে জুটিত না।

বঙ্গদেশে নানাবিধ রেশমের ও কার্পাসের বস্ত্র হইত। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে "পুনঃপুনঃ পাটের শাড়ী"র ও "তসরের শাড়ী"র উল্লেখ আছে। ঢাকাই মজলিন ও মালদহের পট্টবস্ত্র দিল্লীর প্রাসাদে সাদরে ব্যবহৃত হইত। (২০) সেরূপ সুন্দর বস্ত্র

দোসুতি তেসুতি মতি হেম কণ্ঠমালা।
গোরা গায় গজমতি গর্ব্ব করে ভাল॥
নাসায় বেশর পরে করিয়া লাবণ্য।
* * * *
কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
সহজে সুন্দরী তায় বেশ করে বড়ি।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া।
* * * *
পরিল পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী।
কটীতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলি॥
অপর যে পদভূষা পাতা গোটা মল।"—জানতি পালা।

অন্যান্য প্রাচীন কাব্যগ্রন্থেও প্রায় এই সকল অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশে যথেষ্ট অলঙ্কার চলিত ছিল। তখন লোকে অলঙ্কার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিত। সাধারণ লোকের পক্ষে দেহই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত তোষাখানা ছিল।—লেখক।

(১৯) সুবর্ণবণিক স্বর্ণকারদিগের চাতুরীর পরিচয় "চণ্ডী"তে প্রাপ্তব্য।—লেখক

"সুবর্ণ বণিক বৈসে, রজত কাঞ্চন কসে,
পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়।
কিছু বেচে কিছু কেনে, মনুষ্যের ধন আনে,
পুরমধ্যে যাহার নিলয়॥
নিবসে পশ্যতোহর, পুরমধ্যে যা'র ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সভার ধণ,
হাথ বদলিতে ভাল জানে॥
(বণিক ও নবশায়কদিগের আগমন।)

(২০) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(২১) Stewart—History of Bengal.

এখন আর প্রস্তুত হয় না। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালদহের সেখ ভিক পারস্যউপসাগরের পথে তিন জাহাজ মালদহী বস্ত্র রুশিয়ায় প্রেরণ করেন। (২২) পাটনাতেও মজলিন প্রস্তুত হইত। (২৩) ঢাকাই মজলিনের সাধারণ নাম মলমলখাস অর্থাৎ রাজ-মজলিন)। এক প্রকার মজলিনের নাম ব্যপ্তহাওয়া (বয়নকৃত বায়ু), এক প্রকারের নাম আবরাওয়ান (প্রবাহিত সলিল), এক প্রকারের নাম শবনম (সান্ধ্য শিশির)। শেষোক্ত মজলিন সিক্ত অবস্থায় তৃণোপরি সংস্থাপিত হইলে শিশির ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হইত না। (২৪)

তক্রু ও চরকা উভয়বিধ যন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত করণ মহিলাদিগের আয়ের এক উপায় ছিল। সূত্র তন্তুবায়গণ কর্তৃক ক্রীত হইত। "যাঁহারা যেরূপ সূক্ষ্ম সূত্র কর্তনে সমর্থ হইতেন,তাঁহারা সেইরূপ অর্থলাভ করিতে পারিতেন, এবং স্ত্রীমণ্ডলে তদনুরূপ প্রশংসাভাজন হইতেন। এই ব্যবসায় দ্বারা নিঃস্ব লোকের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের অনেক আনুকূল্য হইত। যদিচ মধ্যবিত্ত লোকেরা এই ব্যবসায়কে অপমানকর জ্ঞান করিতেন, তথাপি তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা যজ্ঞসূত্র বা নিজের বস্ত্রনির্ম্মাণের ছলে অধিক সূত্র কর্ত্তন করিতেন, এবং অতি সঙ্গোপনে অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা বিক্রয় করাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন।" (২৫)

অশ্ব, গজ, পাল্‌কী ও গোযান ব্যবহৃত হইত। সুখাসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (২৬)

দেশে তাম্রকূট ব্যতীত অন্য মাদক দ্রব্যের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরে গাঁজা ও অন্যান্য স্তরে সিদ্ধির ব্যবহার ছিল।

"অন্ন, ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এই কয়েক দ্রব্য তদানীন্তন সাধারণ লোকের সচরাচর আহার ছিল। শাক্তসম্প্রদায়ী লোকে কখন কখন ছাগমাংস ভোজন করিতেন, কিন্তু এই ছাগ কোন শক্তিপূজার উদ্দেশে ছিন্ন না

---

(২২) Birdwood—Indusrtial Arts of India.

(২৩) Birdwood—Industrial Arts of India.

(২৪) মুতাক্ষরীণ ; টীকা ।

বর্ত্তমান সম্রাট যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহার জন্য ২০ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ যে মজলিন প্রস্তুত করান হইয়াছিল, তাহার ওজন সাড়ে তিন আউন্স মাত্র।—লেখক।

(২৫) ক্ষতীশ-বংশাবলি-চরিত।

(২৬) India of Aurangzeb.

নেয়ানা নামক এক প্রকার দ্বারহীন পাল্‌কীরও সন্ধান পাওয়া যায়—লেখক।

হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেন না। কদাচিৎ কেহ মেষ ও মৃগমাংসও ভোজন করিতেন। গোধূম বা যবচূর্ণ পিষ্টকাদি কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহৃত হইত না। ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রের বিধবারা নিরামিষ ভোজন ও একাহার করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী লোকমাত্রেই মাংসস্পর্শ করিতেন না, এবং অনেকে মৎস্য-আহারেও বিরত থাকিতেন।" (২৭) হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ পানভোজন তখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ" নবদ্বীপ হইতে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কূলপ্লাবিণী বন্যার মত বাহির হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের সময় তাহার চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জলরাশি তখনও অপসৃত হয় নাই। পূর্ব্বে দেশে মাংসাহার চলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে ব্যাধপত্নীর বাজারে ও গৃহে গৃহে মাংসবিক্রয়ের কথা আছে। ফুল্লরা ব্রাহ্মণগৃহেও মাংস বিক্রয় করিত। ধনপতি সদাগরের গৃহে আহারের আয়োজনকল্পে দুর্ব্বলা দাসী "জীয়ন্ত শশ", "জরঠ কমঠ" ও "খাসী" কিনিয়াছিল; সাধুও "মাংসের ব্যঞ্জন" ও "মাংসবড়ি" ভোজন করিয়াছিলেন।

"ইদানীন্তন স্ত্রীপুরুষেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, পূর্ব্বকালীন লোকের সেরূপ পরিচ্ছদ ছিল না। তৎকালে মধ্যবিত্ত ও হীনবিত্ত পুরুষেরা গ্রীষ্মকালে ধুতি ও দোবজা অথবা একপাট্টা এবং শীতকালে ধুতি ও হামাম বা গ্লাপ ব্যবহার করিতেন। শীতকালে কদাচিৎ কেহ গায়ে বেনিয়ান বা মের্জাই ও মস্তকে টুপী দিতেন, অথবা উষ্ণীষ বাঁধিতেন। মধ্যবিত্ত কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি প্রাতে বনাৎ ও রাত্রিতে কার্পাসপূর্ণ রেজাই ব্যবহার করিতেন। তরুণ-বয়স্কেরা শীতনিবারণার্থ দোলাই ব্যবহার করিত। কোন কোন ধনী সময়বিশেষে পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। শাল, রুমাল, জামেয়ার প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্র অতি অল্প লোকেরই থাকিত। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সকল সময়েই স্ত্রীগণের এক শাটীমাত্র পরিধেয় ছিল। তাহারা শীতানুভব করিলে আর একখানি শাটী গাত্রে দিত। রাজসংসারের উচ্চপদস্থ পুরুষেরা রাজভবনগমনকালে জামা ইজার ও পাকৃড়ি ব্যবহার করিতেন। করচরণাচ্ছাদনার্থ কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। (২৮) নবদ্বীপের রাজারা দেবার্চ্চন, ভোজন ও শয়নকালে ধুতি ও দোবজা পরিতেন। কিন্তু অন্য অন্য সময়ে পশ্চিমোত্তরীয় নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। রাজ্ঞী, রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয় শাটী পরিতেন;

(২৭) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(২৮) "কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে" আছে, "পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল।"

কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভকার্য্যোপলক্ষে পশ্চিমোত্তরদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগ্‌রা ও ওড়না পরিধান করিতেন। (২৯) ইঁহারা শীতকালে বিবিধ বহুমূল্য কৌষেয় ও রাঙ্কব বস্ত্র অঙ্গে দিতেন, এবং চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বকালে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, কোন শ্রেণীর লোকই পাতলা কাপড় পরিতেন না। কেহ তাদৃশ বস্ত্র পরিলে জনসমাজে অতিশয় নিন্দাস্পদ ও উপহাসভাজন হইতেন।" (৩০) দিল্লীযাত্রাকালে ভবানন্দের বেশের ভারতচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শীরে চিরা হীরা তায় বিলাতি খেলাত গায়
নানা বন্ধে কোমর বান্ধিল।"

এই বেশ রাজদরবারে যাইবার জন্য—বহুদিন মুসলমান সংস্রবের ফল।

কেশবিন্যাস রমণীদিগের প্রসাধনের বিশেষ অংশ ছিল। উড়িষ্যার মন্দিরে ভাস্করকার্য্যে নানাপ্রকার কেশবিন্যাস ক্ষোদিত রহিয়াছে। (৩১) "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে চিরুণী দিয়া কেশ আঁচড়াইয়া কবরী বাঁধিবার উল্লেখ আছে। লহনা "কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।" "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" নয়ানী "বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টান্নুনি।" "অন্নদামঙ্গলে" পদ্মমুখীর "চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল।"

তখন রমণীদিগের নয়নে অঞ্জনলেপনের প্রথা ছিল। ভারতচন্দ্রের সময় চুয়া, কেশর, কস্তুরী ও চন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আতর, গোলাবও ব্যবহৃত হইতেছে। তৎপূর্ব্বে "চণ্ডী"তে "সপত্নী-সোহাগে" দেখিতে পাই,—

"হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।"

তৎপরে "অঙ্গে আরোপিল রামা ভূষণ চন্দন।" "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" ও দেখিতে পাই, "গায়ে দিল চার্চ্চিত চন্দন চারু চূয়া।" রঞ্জাবতী

"হরিষে হরিদ্রা তৈল আমলকী লয়ে।
সখীসঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে॥"

---

(২৯) "চণ্ডীতে" "লহনার অভিসার"—বর্ণনায় ও ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" নয়ানীর "লাস বেশ" বর্ণনায় কাঁচুলির উল্লেখ আছে। ধনীদিগের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার ছিল বলিয়াই বোধ হয়।—লেখক।

(৩০) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(৩১) Rajendra Lala Mittra—Antiquities of Orissa.

হরিদ্রার ব্যবহার ভারতচন্দ্রের সময়েও ছিল। সুন্দর-দর্শনে বর্দ্ধমানকামিনী-দিগের এক জনের উক্তি,—

"হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।"

দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহের বয়সও অল্প ছিল। "কবিকঙ্কণ-চণ্ডী"তে জানাই পণ্ডিত লক্ষপতিকে বুঝাইতেছেন,—

"সপ্তম বৎসরের কন্যা, বিভা দিলে হয় ধন্যা,
তার পুত্র কুলের পাবন।"

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে": রঞ্জাবতীর যখন "বয়স বছর বার", তখনই তাঁহার সহোদর তাঁহাকে "বন্ধ্যা বলি হেলে।" তিনি "মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আশে খান", এবং "কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে।" আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎকালে বিদ্যার বয়স অধিক হয় নাই—তাঁহাকে তখনও উপদার্পিতমাত্রযৌবনাও বলা যায় কি না সন্দেহ। তথাপি কন্যার কলঙ্ক-কথা শুনিয়া রাণী রাজার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া "নূপুরের ঝন্ঝনে" তাঁহার বৈকালিক নিদ্রা ভাঙ্গিয়া তিরস্কার করিয়া বিদ্যার কথায় বলিলেন, তাহার "বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।"

কাজ কর্ম্ম প্রধানতঃ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে নিষ্পন্ন হইত। লোকে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না, তাহা বিবেচ্য।

দেশে বহুবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। লোকে শুভাশুভচিহ্নে বিশ্বাস করিত। মন্ত্রতন্ত্রে লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল—মহিলাদিগের ত কথাই নাই। "চণ্ডী"তে কন্যার বিবাহে রম্ভাবতী বিবিধ বশীকরণ ঔষধের সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লহনাও দুর্ব্বলা দাসীর পরামর্শে লীলাবতীর নিকট যে ঔষধ সংগ্রহ করিতে-ছিলেন, তাহাতে,—

"ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে,
যেন পিঞ্জরের শুয়া।"

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে"ও আছে, "মুখে মাখে তৈল পড়া, নয়নে কজ্জল।" ভারতচন্দ্র ভবানন্দের গৃহাগমনকালে চন্দ্রমুখীর কথায় বর্ণনা করিতেছেন,—

"খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।

পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা।"

কোন কোন স্থান সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার ছিল।

শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য অস্তিত্বহীন জীবের অস্তিত্বও কল্পিত হইত।

মোগল রাজত্বের অন্তিম দশায় দেশের সর্ব্বত্র যে বিলাস ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বঙ্গেও তাহার যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। স্বভাবতঃ একপত্নীরত হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিশেষরূপ প্রচলিত হইতেছিল। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে ধনপতি ভৎসনা করিয়া লহনাকে বলিতেছেন,—

"সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান যার পতি,
বিবাহ করয়ে দুই তিন।"

লহনা এ কথা যথার্থ বিবেচনা করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বহুবিবাহের বহুল প্রচলন শেষে কুলীনব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে "বিবাহ-ব্যবসায়ে" পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের "দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।" ভারত-চন্দ্র তরুণ বয়সে গুরুজনদিগের অমতে এবং বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও স্বীয় মনোনীতা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর হইয়াও ভাগ্যদোষে ঘটনাস্রোতে লঘু তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কূল পাইয়াছিলেন। তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে জীবনের শেষ কয় বৎসর যৌবনের সেই প্রণয়ভাগিনীকে লইয়া দাম্পত্য ও পারিবারিক সুখ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ছিলেন। তাই বহুবিবাহকারিগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"এ সুখে বঞ্চিত কবি রায়গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥"

পুরুষসমাজে অন্যবিধ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা "হরগৌরীর কথোপকথনে" জানিতে পারা যায়। ভারতচন্দ্রের দেবচরিত্র হইতে কেন আমরা মানবসমাজের আচার ব্যবহার অভ্যাসাদির আভাষ পাই, তাহার কারণ পরে আলোচিত হইবে। সমসাময়িক ইতিহাসেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোভাসিংহ বর্দ্ধমানের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। বর্দ্ধমানের রাজ-পুত্র স্ত্রীবেশে নারীগণের আরোহণযোগ্য যানে কৃষ্ণনগরে রামকৃষ্ণের গৃহে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। (৩২) সেনাবলে বলী রামকৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় ও শরণাগত-রক্ষায়

(৩২) ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্।

সমর্থ হয়েন। রাজদুহিতার রূপলাবণ্যমুগ্ধ শোভাসিংহ রাজকন্যার তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্ব্বে পাতলা কাপড় পরিলে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হইত সত্য; কিন্তু ক্রমে বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে। "ঢাকা নগরে বহুকালাবধি অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা এক প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহা এ দেশে শব্‌নম্ ও (৩৩) ইউরোপে ঢাকাই মজলিন নামে খ্যাত, এবং অতি আগ্রহসহকারে গৃহীত হয়।" (৩৪) তাহার অনুকরণে শান্তিপুরে পাতলা ধুতি ও শাটী প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপ অধিকারে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে শান্তিপুরের বস্ত্র এত পাতলা যে, দীনবন্ধু মিত্র বলিয়াছেন,—

"শান্তিপুরে ডুরেশাড়ী সরমের অরি,
'নীলাম্বরী', 'উলাঙ্গিনী', 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী'।" (৩৫)

নীলাম্বরী ভারতচন্দ্রের সময় প্রচলিত ছিল। তিনি বিরহতাপতপ্তা বিদ্যার বর্ণনায় "নীল কাপড়ে"র উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠ করিলে সহজেই জয়দেবের "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং" মনে পড়ে। জয়দেবের পর কবিকঙ্কণও মেঘডুম্বরু কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও অন্যত্র চিকণ শাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন। সাধী বড়রাণীকে সদুপদেশ দিতেছে,—"শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামথানি গো।"

কৃষ্ণনগরের রাজা রঘুরাম স্বীয় পুত্র তরুণবয়স্ক কৃষ্ণচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য নবাবের সম্মতি লইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের অধিকার-প্রার্থনার জন্য যখন নবাব-সন্নিধানে গমন করেন, তখন চতুর কৃষ্ণচন্দ্র ধূমপানাসক্ত পিতৃব্যের অভীষ্ট ব্যর্থ করিবার জন্য, মুর্শিদাবাদের চকের রাজপথের উভয় পার্শ্বে কয়েক ব্যক্তিকে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তামাক খাইতে বলেন। তাম্রকূটধূমগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পথে বিলম্ব করেন। এ দিকে কৃষ্ণচন্দ্র নবাবসমীপে পিতৃরাজ্য প্রার্থনা করিলে, নবাব, চকে রামগোপালের ধূমপানের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ বিলাসী বিবেচনা করেন, এবং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকেই রাজ্য দান করেন। (৩৬)

(৩৩) সকল প্রকার ঢাকাই মজলিন যে শবনম নহে, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।—লেখক।

(৩৪) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

(৩৫) সুরধুনী কাব্য।

(৩৬) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

বিদ্যাসুন্দরের মিলনবর্ণনায় ভারতচন্দ্র বিলাসের যে চারুচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার উপাদান তাঁহার সময় অজ্ঞাত ছিল না,—

"গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পুরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পুরি কনকের থালা॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানাদ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত। (৩৭)
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত॥
মিঠাপান মিঠাগুয়া চূণ পাথরিয়া
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।"

সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা করিলে সমাজে বিলাসিতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল মুসলমানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তখন হিন্দুসমাজে নানারূপে মুসলমানের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজসভায় মুসলমানের বেশ পরিহিত হইত। বেশভূষায়, গীতবাদ্যে, সাহিত্যে সে প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। তখন মুসলমানী গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও হিন্দুর গ্রন্থ পারসীতে অনূদিত হইত। মুসলমান কবিরাও হিন্দুর মহাভারতাদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন। "তৎকালে পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহিবার বা লিখিবার প্রথাই ছিল না। সকল কথোপকথন ও লিখনের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক পারস্য ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত।" (৩৮) দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক সন্ধানক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। "অন্নদামঙ্গলে" "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ" হইতে নিম্নলিখিত কয়টী ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

"কারমাণী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥

---

(৩৭) বর্দ্ধমানের রাজকন্যা কাঞ্চীপুরের কথায়ও বলিয়াছিলেন, "হায় বিধি সে কি দেশে গঙ্গা নাই যথা।" বর্দ্ধমান গঙ্গার উপর অবস্থিত নহে সত্য, কিন্তু গঙ্গাজলের পাবন গুণ জ্ঞাত থাকায় তাহা সমাদরে ব্যবহৃত হইত। আইন আকবরীতে দেখা যায়, আকবর রাজধানীতেই হউক, বা ভ্রমণকালেই হউক গঙ্গার জল পান করিতেন। গঙ্গাজল সঙ্গে যাইত।—লেখক।

(৩৮) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

কোঠায় কাঙ্গুরাঘড়ী নিশান-নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।
ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥"

এই কয় ছত্রে যবন শব্দ।

ভারতচন্দ্রের যে সকল রচনা বর্ত্তমান, সে সকলের মধ্যে "সত্যপীরের কথা" সর্ব্বপ্রথম রচিত,—

"গণেশাদি রূপধর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।
ফকীর-শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি।—ইত্যাদি।

মুসলমান রাজত্বকালে রাজদরবারে পারসী প্রচলিত ছিল। ক্রমে সমাজেও পারসীতে দক্ষতা আদৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাই পারসী শব্দ অবাধে বাঙ্গলায় চলিয়া গিয়াছে। তখন পারসীর এত আদর ছিল যে, ভারতচন্দ্র প্রথম বয়সে পারসী না শিখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করাতে স্বজনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পারসীভাষা অনাদৃত ও ক্রমে তাহার আলোচনা ত্যক্ত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বহু পারসী শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছিল। সে সকল বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়াই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক রচনাতেও সে সকল শব্দ সংস্কৃত শব্দের পার্শ্বেই আসন প্রাপ্ত হয়। অনেক আচার যেমন বিধানের বক্র কটাক্ষ সত্ত্বেও সিংহদ্বারপথে না হউক, পশ্চাতের দ্বারপথে সমাজে প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে সিংহদ্বারপথেও তাহাদের গতায়াত আর গোপনে নিষ্পন্ন হয় না, তেমনই সকল বিধান সত্ত্বেও, অনেক বিজাতীয় শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে রহিয়াই যায়। তখন জমীদারদিগের শাসনপ্রণালীও মুসলমানের অনুকরণে। এখনও নানা পদের বিজাতীয় নাম তাহাদিগের উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে।

মুসলমান শাসনকালে হিন্দুর আচারে ও ব্যবহারে, শিল্পেও সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কারে, মুসলমানের যে প্রভাব পতিত হইয়াছিল,তাহাদূর হয় নাই; পরন্তু তাহা হিন্দুর আচারে ও ব্যবহারে, শিল্পে ও সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কারে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, সহজে লক্ষিত হয় না।

চপলা।

প্রথম অধ্যায়।

সরস্বতীজলে।

সহসা বন্যা আসিয়া সরস্বতী নদীতে খরস্রোত বহিতেছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা; তখনও গ্রীষ্মকালে সরস্বতীতে জল থাকিত না, কিন্তু বর্ষাকালে এত প্রবলবেগে বন্যা আসিত যে, নাবিকেরাও নৌকা লইয়া যাতায়াত করিতে ভয় পাইত। থানেশ্বরের ছেলে বুড়া সকল কাজকর্ম্ম ফেলিয়া নদীতীরে বসিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। সাহসী যুবকেরা সাঁতার কাটিতে জলে নাবিতেছে, বৃদ্ধেরা ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিতেছেন। বালকবালিকারা কূলে কূলে জল ছিটাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সরস্বতীতে বার মাস জল থাকে না বলিয়া কোথাও একখানি বড় নৌকা নাই; ক্বচিৎ এক একখানি ছোট ডোঙ্গা দড়ী দিয়া কূলে বাঁধা ছিল। যেখানে নগরের লোকেরা আনন্দমগ্ন, তাহা হইতে কিছু দূরে দুইটি বালিকা গাছের আড়ালে জলক্রীড়া করিতেছিল। সহসা একটি বালিকা ডোঙ্গায় উঠিয়া অপরটিকে ডাকিয়া বলিল, "আয় ভাই! মজা করি।" ডোঙ্গাখানি জলে ভাসিয়া দুলিতেছিল; দড়ি টানিয়া একবার কূলে আসা, আর একবার একটুখানি দূরে চলিয়া যাওয়া, এইটুকু সেই বালিকার "মজা।" দ্বিতীয়া ভয় পাইল; সে বলিল, "না ভাই, কি হইতে, কি হইবে; আমি ডোঙ্গায় উঠিব না।" প্রথমা যখন ডোঙ্গায় উঠিয়া দড়িটা টানাটানির একটু বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন দ্বিতীয়া কহিল, "চপলা আয় না, ঢের হয়েছে।" চপলা শুনিল না, সে হাসিতে লাগিল, এবং ডোঙ্গায় বসিয়া মজার খেলা খেলিতে লাগিল।

দৈবাৎ দড়িগাছি খুলিয়া গেল, এবং প্রবল স্রোতে ডোঙ্গাখানি ছুটিয়া চলিল। যে মেয়েটি কূলে ছিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল, "চপলা ভেসে গেল গো।" চপলার বয়স চতুর্দ্দশের অধিক নহে; সে কিন্তু চিৎকার করিল না। সাবধানে ডোঙ্গাখানি ধরিয়া বসিয়া রহিল। চিৎকার শুনিয়া অনেক লোক ছুটিয়া আসিল,

কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জলে নাবিল না; অনেকেই কেবল মেয়েটির দুর্ব্বিহারের সমালোচনা করিতে লাগিল। এক জন অপরিচিত ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া ডোঙ্গা লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে ডোঙ্গা ও সন্তরণকারী, দর্শকগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল।

যে সাঁতরাইয়া গেল, সে কে? কেহই তাহা বলিতে পারিল না। তখন নানা প্রকার সমালোচনা ও দৈব দুর্ঘটনার প্রাচীন গল্পের পর, দর্শকেরা ছেলেদিগকে শাসন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। এই থানেশ্বরে চপলার জন্য কাঁদিবার কেহ ছিল না। চপলা শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। এক জন অতিদূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তি দয়া করিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন, এইমাত্র। চপলার প্রতিপালকের কন্যাটিকে বিধাতা সৌন্দর্য্য দান করেন নাই, কিন্তু সেই অপরাধে সুন্দরী চপলা তাঁহার বয়স্থার জননীর প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন নাই। নানা কারণে চপলার দুঃখে কাহারও আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আশ্রিতা।

প্রায় এক ক্রোশ পথ ভাসিয়া যাইবার পর ডোঙ্গাখানি একটা বাঁকে ঘুরিয়া প্রায় কূলের নিকটবর্ত্তী হইল। সন্তরণকারীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেই স্থানে ডোঙ্গা ধরিয়া ফেলিলেন। চপলা তখনও স্থির হইয়া ডোঙ্গা ধরিয়া বসিয়া ছিল; কোন দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।

বলিষ্ঠ সন্তরণকারী যখন ডোঙ্গাখানি কূলে টানিয়া লইয়া চপলাকে নাবিতে বলিলেন, তখন তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সে নাবিতে পারিল না। যুবক ধীরে ধীরে এক হাতে নৌকার ছেঁড়া দড়িটুকু ধরিয়া, অন্য হাতে বালিকাকে তুলিয়া কূলে নাবাইয়া দিলেন। উভয়েই আর্দ্রবস্ত্র। চপলা চলিতে পারে না। যুবক তাহাকে বহন করিয়া নিকটস্থ পল্লীতে গেলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগকে কাপড় দিল, আহার দিল, তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। যুবক চপলাকে বলিলেন, "চল, তোমাকে গ্রামে রাখিয়া আসি।" চপলা কাঁদিয়া কহিল, তাহার কেহ নাই; যাঁহার গৃহে সে আশ্রিতা, সে তাহাকে মারিবে, এবং তিরস্কার করিবে। যুবক তখন বালিকাকে লইয়া একটি প্রান্তর পার হইয়া রাত্রিকালে একটি সৈন্য-নিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং জানাইল

যে, তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য থানেশ্বরে যে সকল লোক গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে; এবং চারি দিকে তাঁহার সন্ধানে লোক গিয়াছে।

অবিলম্বে দশ জন দাসী নিযুক্ত করিবার জন্য যুবক আদেশ করিবামাত্র, "যে আজ্ঞা যুবরাজ!" বলিয়া লোক ছুটিল। এক প্রহর রাত্রির মধ্যেই দাসী নিযুক্ত হইল, স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং চপলা রাজকুমারীর মত সেবাশুশ্রূষা পাইতে লাগিল।

যুবক সৈন্যেরা যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তের এই অভিনব অনুষ্ঠান দেখিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল; বয়স্কেরা বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, কাজটা ভাল হইল না। সকলেরই সন্দেহ হইল যে, এই কুড়ানী মেয়েটা বুঝি রাজরাণী হইয়া উঠিবে। রাজকুমারের এক জন ভৃত্য দর্প করিয়া বলিল যে, শ্রীমতী ধ্রুবদেবীর কাছে সংবাদ গেলেই রাজরাণীগিরি ঘুচিয়া যাইবে। যুবকটি মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত; ধ্রুবদেবী যুবরাজের পত্নীর নাম। যুবরাজ পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধযাত্রার জন্য বাহির হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইতিহাস।

যে চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা, সে সময়ের রাষ্ট্রোন্নয়নের দু চারিটি কথা বলিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসের সহিত অধিকাংশ পাঠকের পরিচয় নাই বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র অখ্যায়িকা লিখিতে গেলেও, ইতিহাসের কথা বলিতে হয়।

মৌর্য্যকুলতিলক দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে গান্ধার হইতে পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত,নেপাল হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর কথা। তাহার পর যখন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশের অধোগতি হইল, তখন সুঙ্গবংশীয় রাজারা ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ক্ষুদ্র প্রদেশবিশেষের রাজা ছিলেন। এই দেশে তখন যবন, শক, তুরুষ্ক, চীনজাতীয়েরা আসিয়া রাজত্বস্থাপন করিতেছিলেন, এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়াছিল। অনার্য্যজাতীয় অন্ধ্র রাজারা কেবল দক্ষিণ প্রদেশেই প্রবল হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয়দিগেরই প্রভাব বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে কালরাত্রির আরম্ভ, খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার শেষ।

এই দীর্ঘব্যাপী অন্ধকারের অবসানে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের

সূচনা। সম্ভবতঃ শ্রীগুপ্ত এই গুপ্ত-বংশের প্রথম রাজা। শ্রীগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচের রাজত্বের পর ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য নেপাল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, কানোজ-সন্নিহিত নূতন পুষ্পপুর বা কুসুমপুরে রাজধানী স্থাপিত করেন; এবং ঐ বৎসর হইতে নূতন গুপ্তাব্দের প্রথম বৎসর গণিত হয়।

প্রাচীন পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে লিচ্ছবি-বংশীয় রাজারা হীনবল হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন; এবং প্রধানতঃ নেপালেই লিচ্ছবিদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই লিচ্ছবি রাজারা গুপ্তদিগের অধীশ্বরত্ব স্বীকার করিতেন, এবং উঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বের আরম্ভ। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য যখন যুবরাজ, এই আখ্যায়িকা সেই সময়ের কথা লইয়া। আলাহাবাদের স্তম্ভলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গ, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কোশল, সমুদ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল; এবং কেরল পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভূভাগেও তিনি রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে এমন গৌরবের দিনের ইতিহাস আর নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজমন্ত্রী।

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের প্রিয় সচিব প্রিয় বর্ম্মা, কুসুমপুরের রাজপ্রাসাদে বসিয়া কতকগুলি লিপি পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজ্যের কুশল ত?” প্রিয়বর্ম্মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং রাজা তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর প্রিয় বর্ম্মা বলিলেন, “মহারাজ, এখন শক, যবন প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া আদৃত হইয়াছেন; আপনাদের প্রতিও ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে; এখন বিজিত রাজ্য সুরক্ষিত করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগী হইবার প্রয়োজন।” মহারাজ কহিলেন, “পঞ্জাব ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে ক্ষত্রপ রাজগণ বিজিত হইবার পূর্ব্বে, রাজ্যটিকে অখণ্ড মনে করিতে পারিতেছি না।” প্রিয় বর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন যে, স্বয়ং যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। মহারাজ কহিলেন, “তোমার পুত্র বিশ্ব বর্ম্মা যখন তাঁহার সহচর ও সহকারী, তখন জয়ের আশা করিতে পারি বটে।” প্রিয় বর্ম্মা কহিলেন, “মহারাজ আপনার অনুগ্রহের পরিসীমা নাই; আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নর বর্ম্মাকে আপনি মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিয়া আমার বংশগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্ব

বর্ম্মা যদি যুবরাজের সহচর হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে বটে, কিন্তু রাজ্যের কল্যাণের জন্য একটা প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।”

রাজা মনোযোগী হইলেন, এবং প্রিয় বর্ম্মা কহিতে লাগিলেন;—“সংবাদ পাইলাম যে, হূন নামে একটা জাতি বড় বলশালী হইয়া উঠিয়াছে; এবং অচিরাৎ তাহাদের গান্ধার প্রদেশ অধিকার করিবার সম্ভাবনা। ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সুরক্ষিত না হইলে কদাচ ভারতবর্ষের কল্যাণ হইবে না। হূনদিগের সন্ধান লইবার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ না করিলে নয়। বিশ্ব বর্ম্মা রোমকাদি পশ্চিমদেশীয় অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা জানেন। আমার ইচ্ছা যে, তাহাকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করি।” মহারাজ সচিবের স্বার্থশূন্যতা ও হিতৈষণায় চিরদিনই মুগ্ধ ছিলেন; তবুও এই প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন, “প্রিয় বর্ম্মা, আমি একটু ভাবিয়া দেখি, তাহার পর তোমার কথার উত্তর দিব।”

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, পঞ্জাব হইতে যুবরাজের দূত আসিয়াছে। দূত যে সকল পত্র আনিয়াছিল, রাজা ও প্রিয় বর্ম্মা তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইলেন যে, যুবরাজের জৈত্রসেনা নির্ব্বিঘ্নে পশ্চিমপথবাহিনী হইয়াছে। ঐ পত্রগুলির সঙ্গে আর দুখানি পত্র ছিল; রাজা তাহা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। যুবরাজপ্রেরিত পত্র দুখানির একখানি মাতা দত্তদেবীর নামে, এবং অন্যখানি পত্নী ধ্রুবদেবীর নামে। ধ্রুবদেবীর পত্রে অন্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল;—“তুমি হয় ত ভাব, তুমি ভারি রূপসী। থানেশ্বরে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ক্ষত্রিয়া কুমারী কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহাকে দেখিলে তোমার আত্মশ্লাঘা একটু কমিতে পারে।”

পঞ্চম অধ্যায়।

চপলার কথা।

ক্ষত্রপ রাজা স্বামী রুদ্রসেন যুদ্ধ না করিয়াই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। কাজেই মহারাজের অনুমতির অপেক্ষায় যুবরাজের সৈন্যেরা ভরুকচ্ছে অবস্থান করিতেছিলেন। যে সময়ে যুবরাজ চপলার উদ্ধার করেন, তাহার পর হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে চপলার সঙ্গে যুবরাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

চপলা একটি যবনীর শিক্ষাধীন থাকিয়া চিত্র আঁাকতে শিখিতেছিল। পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে চপলার একটু শিক্ষা ছিল; এবং সে যাহা কিছু দেখিত, তাহারই ছবি আঁাকিত। সেই জন্য যুবরাজ তাহার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চপলা ছবি আঁকিতেছে, এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত গিয়া বলিলেন, "কি আঁকিতেছ চপলা?" চপলা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া ছবি ঢাকিয়া বলিল, "তা বলিব কেন?" যবনী হাসিয়া বলিল, "আজ একটা নাক আঁকিতেছে; বলিতেছিল যে, একটা ভাল নাক মক্‌স করিয়া লইয়া তার পর আপনার একটা ছবি আঁকিবে।" চপলা হাসিতে লাগিল। যুবরাজ স্মিতমুখে বলিলেন, "আমার নাকের উপর তোমার এত দৌরাত্ম্য কেন?" চপলা যবনীর গা টিপিয়া বলিল, "সে কথা বোলো না কিন্তু।" যুবরাজ বলিলেন, "কি কথা?" চপলার গোটা দশেক 'না না'র মধ্যে যবনী কহিল, "চপলা বলিতেছিল যে, আপনার নাকটা খারাপ হ'লে দেবী রাগ করিবেন।" চপলার লজ্জা হইল। যুবরাজ চলিয়া গেলে, চপলা যবনীকে বলিল, "মেলিনা, তুমি বড় দুষ্ট!"

আর একদিন বিশ্ব বর্ম্মা, নন্দী ভদ্র প্রভৃতি যুবরাজের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ লইয়া মেলিনা ও চপলার তর্ক চলিতেছে, এমন সময়ে যুবরাজ কুশলপ্রশ্ন করিতে আসিলেন। চপলা প্রথমেই বলিল, "আচ্ছা বলুন দেখি, নন্দী ভদ্র খুব ভালমানুষ নয়?" যুবরাজ বলিলেন, "ভালমানুষ বই কি; নইলে তোমাকে রোজ রোজ বাদাম এনে দেয়?" চপলা বলিল, "আচ্ছা, বাদাম যদি নাই দিতেন; তবুও ত ভালমানুষ?" মেলিনা বলিল, "তিনি ভাল নয়, তা ত আর আমি বলিনি। আমি বলিতেছিলাম যে, বিশ্ব বর্ম্মার মত লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" চপলা যুবরাজকে বলিল, "দেখুন, বিশ্ব বর্ম্মা ওঁদের গ্রীক্ কথা জানেন কি না, তাই এই পক্ষপাত।"

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। রাজধানীতে সন্ধির প্রস্তাব যাইবার পূর্ব্বে মহারাজের এক আদেশলিপি আসিয়াছিল যে, বিশ্ব বর্ম্মাকে গান্ধার অভিমুখে চর-স্বরূপ যাইতে হইবে। সেই আদেশ পাইবার পর যুবরাজ বড়ই চিন্তিত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে চপলা আসিয়া বলিল যে, তাহার একটা সোনার পদক চাই। সরলা বালিকার আবেদনে তৃপ্তিলাভ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "কি রকম পদক, চপলা?" চপলা চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিল। "আচ্ছা, শীঘ্রই পাইবে" বলিয়া যুবরাজ পুনরপি চিন্তামগ্ন হইলেন। চপলার তাহা সহ্য হইল না; সে রাগ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। যুবরাজ হাসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নূতন চিন্তা।

স্বনামখ্যাত বুদ্ধঘোষ তখনও ত্রিপিটকের টীকা লিখিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারিব না। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ

ঘোষ, যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকে সুগত-মাহাত্ম্যের অনুরাগী করিবার জন্য তাঁহার যুদ্ধ-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সমস্ত দিন তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথপোকথনের পর অপরাহ্নে চপলার সংবাদ লইতে গেলেন। "বুদ্ধঘোষ দেখবি আয়!" বলিয়া মেলিনা চপলাকে ডাকিয়াছিল, চপলাও তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, চপলার ক্ষুদ্র কক্ষটুকু শূন্য। সেখানে তাহার কয়েকখানি চিত্র পড়িয়াছিল; সেগুলি দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া রাজা কক্ষমধ্যে গেলেন। একটা পাখীর ছবির তলায় তাহার নূতন পদকখানিও ছিল। পদকখানি একটু নূতন রকমের; যদি খুব বড় না হইত, তাহা হইলে সে-খানিকে একালের লকেট্ বলা চলিত। যুবরাজ অন্যমনস্কে ছবি দেখিতে দেখিতে পদকের ডালাটি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং দেখিলেন, উহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র চিত্র! ক্ষুদ্র চিত্রখানি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, এবং ধীরে ধীরে পদকখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া, দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, মেলিনা ও চপলা এক সঙ্গে আসিতেছে। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" চপলা বলিল,—"আমি ভাবিয়াছিলাম যে, না জানি কি একটা নূতন জন্তু কিছু হইবে। মানুষ! আমরা বুদ্ধঘোষ দেখিয়া আসিলাম।" চন্দ্রগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, বুদ্ধঘোষ ভারি পণ্ডিত, সাধু পুরুষ।" চপলা তখন গম্ভীর হইয়া তাঁহার উদ্দেশে একটি প্রণাম করিল।

চপলার চঞ্চলতার অভ্যন্তরে যে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য ছিল, চন্দ্রগুপ্ত আজি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বালিকার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "চপলা, তুমি আর কত দিন এখানে থাকিতে পারিবে?" চপলা এবারে গম্ভীর হইয়া বলিল যে, আর ভাল লাগে না, তাহার কুসুমপুর দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সে ধ্রুবদেবীকে দেখিতে চায়। যুবরাজ বলিলেন, "তুমি ত কখন তাঁহাকে দেখ নাই; তিনি কি তোমাকে ভালবাসিবেন?" চপলা মুখ উঁচু করিয়া বড় বড় চোখ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়! তিনি আমাকে খুব ভালবাস্‌বেন্।" যুবরাজ তাহা জানিতেন বটে; কিন্তু বালিকার এই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন।

এই আনন্দের মধ্যে একটুখানি চিন্তারও উদয় হইল। সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইল কি না, এবং বিশ্বকর্ম্মাকে অবিলম্বে গান্ধারে না পাঠাইলে চলে কি না, এই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হূন-সংবাদ।

"আমি মহারাজের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। যখন সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে, তখন আপনি সন্ধিস্থাপন করিয়া রাজধানীতে চলিয়া যান। আমি এক জন ভৃত্য লইয়াই ছদ্মবেশে গান্ধার যাত্রা করিব।" বিশ্ব বর্ম্মার কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। কিন্তু যুবরাজ বলিলেন,—"এ বিষয়ে আমি একটি দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার জন্য আর একটু প্রতীক্ষা করিলে ক্ষতি কি?" বিশ্ববর্ম্মা কহিলেন, "যুবরাজ, মহারাজ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন না করিয়া অন্যবিধ প্রস্তাব করিলে কর্ম্মভীরুতা প্রকাশ পাইবে। বিশেষতঃ, যে জন্য এই আদেশ, তাহার গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতেছি। সে দিন শ্রমণ কুমার জাব যাহা বলিতেছিলেন, তাহাতেও হূনদিগের প্রভাববৃদ্ধির কথায় বিশ্বাস হইতেছে। এ সময়ে কালহরণ করা রাজদ্রোহিতা।" যাহা হউক, যুবরাজ বিষণ্ণচিত্তে অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল।

বিশ্ব বর্ম্মা যুবরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটি বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, এবং আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিশ্ববর্ম্মা টলেমির গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, অনেক নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। এই জন্য তিনি যখন আকাশের দিকে চাহিয়া বসিতেন, কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। অনেকক্ষণ পরে, যিনি নক্ষত্রগণের পতি, যিনি নরভাগ্যের নেতা, সজলনয়নে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। যদিও মেলিনা ভিন্ন অন্য কেহ এ কথা জানিত না, তবুও কথাটা খুলিয়া বলাই ভাল, যে বিশ্ব বর্ম্মা চপলার আনন্দময়ী প্রতিমার অনুরাগী হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গান্ধারে যাইতেছেন, কিন্তু চপলার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। চপলা তাঁহার আয়ত্তের অতীতে, বহু ঊর্দ্ধে, তাহাই মনে করিয়া পীড়িত হইতেছিলেন। চপলার প্রণয়প্রার্থী হইলে যুবরাজের সহিত এ বন্ধুত্ব আর থাকিবে না। সেই জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন যে, রাজ্যের সেবার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনার মনের ব্যথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দু' চারিটি সাংসারিক কথা।

যুবরাজ যখন রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন দক্ষিণ প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে, মালবর উপকূলে চের-রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ

নম্বুরি ও নায়ারেরা উপস্থিত করিয়াছিল। ইতিহাসে ইহার তারিখ ৩৮৯ খৃষ্টাব্দ। যুবরাজ অনেক দিন পরে রাজ্যে ফিরিয়াছেন বলিয়া, এবারে মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত স্বয়ং দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। এই বিদ্রোহের সুবিধায় চের-রাজ্য জয় করিয়া, সিংহল পর্য্যন্ত যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ বহু সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে চলিয়া গেলেন। দুটি বৎসর রাজ্যভার সম্পূর্ণরূপে যুবরাজের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। যুবরাজ দেখিলেন যে, প্রিয় বর্ম্মা যেখানে মন্ত্রী, সেখানে রাজ্যশাসন অতি সহজ।

বিশ্ব বর্ম্মা যখন হূনদিগের সংবাদ সবিশেষ ভাবে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, মহারাজ তখন সিংহল জয় করিয়া ফিরিয়াছেন, এবং তখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। যুবরাজই সমগ্র রাজকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজের সিংহল-জয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে মালবের শাসনকর্ত্তা নর বর্ম্মা পরলোকগমন করিলেন। প্রিয় বর্ম্মা একে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর এই শোকের আঘাত। তিনি এখন কদাচিৎ প্রয়োজন উপলক্ষে রাজগৃহে আসিতেন; নচেৎ গৃহেই থাকিতেন। মালবের শাসনকর্ত্তার নিয়োগ বিষয়ে যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সানন্দে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সে কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিতেছি।

নবম অধ্যায়।

নূতন-পুরাতন।

এক দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রিয়বর্ম্মা গৃহের বারান্দায় শয়ন করিয়া আছেন, এবং একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাইয়া আনন্দদান করিতেছে। শিশুটি বৃদ্ধের নাতি। তিন বৎসর বয়সের ছেলেটি বৃদ্ধের পৈতাগাছটি লইয়া এক, পাঁচ, তিন করিয়া তার গুণিতেছে; মুখে হাত দিয়া, দাঁত নাই কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতেছে; এবং সর্ব্বাঙ্গে নূপুর-পরা ছোট পায়ের ধূলা মাখাইয়া দিতেছে। তিনি শিশুর করস্পর্শে আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বালক "দাদা দাদা" বলিতেছিল; এবং তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধত্ব ভুলিয়া, অতীত যৌবনের অতীত তীরের শৈশবসুখ স্মরণ করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যেন তিনি আবার শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। দীর্ঘ দিবা-নিদ্রার পর যেমন কখনও কখনও অপরাহ্ণে প্রভাতের ভ্রান্তি হয়, বৃদ্ধের যেন তেমনই ভ্রান্তি হইয়াছিল।

বৃদ্ধ যখন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া স্বপ্নে মগ্ন, তখন শিশুর মাতা দেখিলেন যে, দুষ্ট ছেলেটা বড় উৎপাত করিতেছে। তিনি তাহাকে টানিয়া আনিতে গেলেন, সে

আসিল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, শিশু তাহা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী হয় ত জানিতেন না যে, এ সংসারে ঠাকুরদাদার মত মিষ্ট পদার্থ আর নাই! যুবতী শিশুকে একটু জোর করিয়া কোলে তুলিতে গেলেন, শিশু একটা টানে তাঁহার গলার হারগাছি ছিঁড়িয়া ফেলিল। রণজয়ী শিশু হারগাছি ফেলিয়া দিয়া যখন চুল ধরিল, তখন বৃদ্ধের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "থাক না মা লক্ষ্মী, টানাটানি ক'রে কি হবে? আমাকে কিছু বিরক্ত কচ্চে না।"

বৃদ্ধের মুখের কথা মুখে আছে, এমন সময় যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন, এবং যুবতী কোনও প্রকারে চুল ছাড়াইয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, তোমার ছেলে খুব দুষ্ট হয়েছে? তা হোক্, এস বন্ধু, আমার কোলে এস!" যুবরাজ ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন বন্ধু। পরেও ইনি বন্ধু বর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; সে কথা ইতিহাসজ্ঞেরা জানেন।

বন্ধু কিন্তু ছেঁড়া হারগাছির সঙ্গে একটা পদক পাইয়াছিল; সেইটিতে সে মনোযোগ দিয়াছে। পদকটি দৈবাৎ খুলিয়া গেল, এবং একখানি কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। যুবরাজ তাড়াতাড়ি হাতে লইয়া তাহা রক্ষা করিলেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে যুবরাজের জানা ছিল যে, চপলা বিশ্ব বর্ম্মার ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়া পদকে পূরিয়া রাখিয়াছিল। যুবরাজ হাসিয়া হাসিয়া সে প্রতিকৃতিটি পদকে পূরিয়া পদক বন্ধ করিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলেন; চপলার ভারি লজ্জা হইল। সে জানিত না যে, যুবরাজ তাহার পদকের কথা সব জানেন।

চপলা ভাল করিয়া কাপড় গুছাইয়া পরিয়া বাহিরে আসিয়া ছেলে কোলে নিল; এবং প্রিয় বর্ম্মা যুবরাজকে বসিতে বলিলেন। যুবরাজ তখন বিশ্ব বর্ম্মার মালব-শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইবার সংবাদ দান করিলেন। চপলা বলিল, "না; বাবা এ বয়সে অত দূর কি ক'রে যাবেন?" যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাহার সুব্যবস্থা করিব।" চপলা তখন আবার বলিল, "তা হ'লে আপনি দেবীকে নিয়ে মালবে মাঝে মাঝে যাবেন বলুন?" যুবরাজ স্বীকৃত হইলেন। চপলা এখনও তাঁহার আদরের আদরিণী ছোট বোন্‌টি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়।

অল্প দিন হইল, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "অত্যুক্তি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্ট-দাবানলদগ্ধ দিল্লীর উপকণ্ঠে ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দরবার সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই, ইংলণ্ডে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেক হইয়া গিয়াছিল। সেই অভিষেকে ভারতীয় মিত্ররাজগণের কয় জন উপস্থিত ছিলেন। সেই বিষয়ে বক্র কটাক্ষ করিয়া কবিবর বলিয়াছিলেন, "আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে, ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত; আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে। তাই ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নপ্রায়, * * * ঠিক সেই সময়টাতেই অধম ভারতবর্ষের রাজভক্তি ইংরেজ নানাপ্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে,—আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্য ঘট যথেষ্ট পরিমাণ শব্দ করিতেছে।" এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু তুলনায় সমালোচনা সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্বমত বিস্মৃত হইয়া বা পদদলিত করিয়া, তুলনায় সমালোচনা করিয়া, মুসলমান রাজার মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট তুলিয়া দিয়া,—সমবেত যুবকমণ্ডলীর করতালিধ্বনিতে তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মুসলমানে ও ইংরাজে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, অতীতে ও বর্ত্তমানে সকল প্রভেদ তিনি বিস্মৃত হইয়া ভাবাবেশে একই আদর্শে উভয়ের বিচার করিয়াছিলেন। ভাল করিয়াছিলেন কি না, সে বিচার করিব না। আমাদের যত দূর স্মরণ হয়—বড় অধিক দিনের কথা নহে—লর্ড ক্রসের বিলের আন্দোলনকালে রবীন্দ্রবাবুই বলিয়াছিলেন,—"স্বার্থই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা হইত যে, ক্রন্দন করিবার অবকাশও থাকিত না।" 'মরকত-রঙ্গমঞ্চে' এই উক্তি ও 'কর্জ্জন-রঙ্গমঞ্চে' পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি উভয়ে, প্রভেদ! এই অত্যল্পকালের মধ্যেই ইংরাজ যদি পূর্ব্বাদর্শভ্রষ্ট হইয়া এমনতর নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন, তবে বড় আশঙ্কার কথা—সন্দেহ নাই। তাহা না হইলেও, রবীন্দ্রবাবুর শেষের উক্তি যদি কবির অত্যুক্তি না হয়, তবে তাহাও বড় আশঙ্কার বিষয়। কারণ, নিদ্রিত ভারতের সহসা জাগরিত হইয়া জাপান হইবার সম্ভাবনা যখন আপাততঃ সুদূরপরাহত, তখন ইংরাজের সহিত আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া কেবল যে ইংরাজেরই দুর্ভাগ্য, এমন নহে। কারণ শাসকে ও শাসিতে হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বেটন-বন্দুক-বেয়নেট-বম্বশেলের যে সম্বন্ধ থাকে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায়ও আমাদের পক্ষে প্রলোভনীয় নহে। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে ভারতহিতৈষীর সন্ধান করিতে যাইয়া রবীন্দ্রবাবু হেয়ার ও হিউম প্রভৃতি দুই এক জন স্কচ ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান পান নাই। সে কথা রবীন্দ্রবাবু "সাধনা"য় প্রকাশিত "ইংরাজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে মেকলে ইংরাজী-শিক্ষার উপায় করিয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকারের আস্বাদ বুঝাইয়াছিলেন, যে ম্যাক্সমুলার ও ম্যাকডোনেল, কাওয়েল ও কোলব্রুক, জোন্স ও প্রিন্সেপ ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদনে জীবনব্যয় করিয়াছেন, যে ব্রাড্‌ল, ফসেট, ওয়েডারবার্ণ, কেন, ডিগবী ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন।

সরিছে কুয়াসা ধীরে, ঝরিছে শিশির,
হে পান্থ, উন্মুক্ত মম হৃদয়-মন্দির।
এস, বস অন্তরালে পূত ধৌত এবে,
নাহি দিবা-খরদৃষ্টি, নিশীথ-তিমির।

৭

শুষ্ক বৃক্ষে মুঞ্জরিছে কত না মুকুল,
শুষ্ক খাতে প্রবাহিছে কি স্রোত আকুল!
অমরীর শ্বেতাঞ্চল চঞ্চল আকাশে,
নরদেহে অবতীর্ণ ঋষি-ঋভু-কুল!

৮

দেখ হৃদি-সিংহাসনে প্রেম মূর্ত্তিমান—
কি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সহাস বয়ান!
সমস্ত জগত আজ পাদপীঠ ঘেরি
করযোড়ে ভক্তিভরে করে সামগান।

৯

ওগো, এস, মুছাইয়া দেই আঁখি দুটি—
নাহি জানি কত দূর হ'তে আস ছুটি!
নাহি জানি রবে তুমি কতক্ষণ আর,
জানি কিন্তু—যাবে যবে সর্ব্ববন্ধ টুটি।

১০

এমনি বসন্ত গেছে ল'য়ে ফুলদল!
নাহি সে মথুরাপুরী, নাহি সে কোশল!
নাহি সে বাল্মীকি ব্যাস, নাহি কালিদাস—
চঞ্চল জীবন অতি, মৃত্যু অচঞ্চল।

১১

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিনষ্ট প্রভাস—
রেখে গেছে কিন্তু তার বিস্মৃতি-প্রয়াস!
দেবতার সুধাপায়ি-অধর-চুম্বিত
অমরী-অধরদ্রাক্ষা এখনো প্রকাশ!

পান্থ।

[ওমারের অনুকরণ।]

১

আর ঘুমায়ো না, পান্থ, মেলহ নয়ন!
প্রাচী-প্রান্তে ফুটে—ফুটে প্রভাত-কিরণ।
এলোকেশী নিশীথিনী পলায় তরাসে
অঞ্চলে কুড়ায়ে অঁার ছড়ান রতন।

২

কর্ব্বুরিত নীলাকাশ—প্রশান্ত সুন্দর;
মৃদুমন্দ গন্ধবহ সুবাস-মন্থর।
দেখ—দেখ আঁখি মেলি, আলোক-পুলকে
ঝলসিছে ধবলার সুবর্ণশিখর!

৩

কি শুভ কাকলিরব ওঠে চারিধারে!
পরিপূর্ণ তপোবন প্রণবে ওঙ্কারে।
চকিত চরণধ্বনি কত দেবতার
ইতস্ততঃ তরুতলে—ঘন অন্ধকারে!

৪

সাহসে করিয়া ভর, উঠ, ভীরু তুমি!
ধরা নয় দৈত্যবাস—দেবপ্রিয়ভূমি।
হয় তো পাষাণ-দৃঢ় আবরণ তার,
সরস করেনি হৃদি এত নদী চুমি'?

৫

কি জবাকুসুম-দ্যুতি গগনে উছলে!
জগত উঠিল জাগি কলকোলাহলে।
মন্দিরে মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি—
কেন তুমি ম্লানমুখী গতস্বপ্নচ্ছলে?

র

ল

শ

স

রবীন্দ্রবাবু তাঁহাদের নাম করেন নাই। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, ইংরাজের সহিত আমাদের মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায়, এ কথাটাকেও আমরা সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে অত্যুক্তি করিয়া তুলিতেছি কি না? আজ ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিলে রুশিয়া হইতে—

"গরজি গম্ভীরে
বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ,
নিরস্ত্র ভারত আরক্তশরীরে
ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ।"

এ অবস্থায় মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষে আমরা যদি সামান্য চেষ্টাও করি, তাহা হইলেও আমরা দোষী। কিন্তু ভারতীয় ও ইংরাজ,—কতকগুলি লেখক, রচনায় এই সম্বন্ধবিচ্ছেদের পক্ষে সদা সচেষ্ট!

এই সময় মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ও বিচ্ছিন্নপ্রায় সম্বন্ধ পূর্ব্বাবস্থ করিবার চেষ্টা দেখিলে আনন্দ হয়। সম্প্রতি "ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে মিষ্টার অ্যাণ্ডারসন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান "সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

লেখক বলেন, ভারতবাসী ইংরাজদিগকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলা হয়। য়ুরোপ-প্রত্যাগত ভারতবাসীদিগকে যদি ইণ্ডো-আংলিয়ান বলিতে যাওয়া যায়, তবে তাঁহারা রাগ করিবেন; বলিবেন, তাঁহারা কেবল যে ভারতে জন্মিয়াছেন, এমনই নহে, প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষা সত্বেও তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে খাঁটি ভারতবাসী। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা যায় না।

এ বিষয়ে এক জন ফরাসী সংস্কৃতপণ্ডিতের সহিত লেখকের কথা হয়। পণ্ডিত বলেন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভাবে, ভাষায় ও চিন্তায় ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র। ভারত-বাসে তাঁহাদিগের সহানুভূতি যেমন প্রসার প্রাপ্ত হয়, মনেরও তেমনই পরিবর্ত্তন হয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি সার্ আলফ্রেড লায়ালের উল্লেখ করেন। স্যার আলফ্রেড সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুকবি। কিন্তু তাঁহার সকল রচনাতেই ভারতীয় ভাব। তাঁহার হৃদয় ভারতে। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াও ভারতের শিল্প-সাহিত্যাদির মায়া কাটাইতে পারেন নাই। এ কথা অতি সত্য। সর্ উইলিয়ম জোন্স হইতে সার্ এড্উইন্ আর্নল্ড পর্য্যন্ত কে একবার ভারতের মোহাবর্ত্তে পতিত হইয়া উদ্ধার পাইয়াছেন? সার্ আলফ্রেড লায়ালের কথাই ধরা যাউক। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া English Men of Letters গ্রন্থাবলীতে কবি টেনিসন সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার সম্মান পাইয়াছেন। এই পুস্তকেও তিনি প্রাচ্য প্রভাবের চিহ্ন লুপ্ত করিতে পারেন নাই; টেনিসনের "আকবরের স্বপ্ন" শীর্ষক কবিতার কথায় প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার কথা বলিয়াছেন। "সাহিত্যে"র পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি 'বামদেব শাস্ত্রী ছদ্মনামে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। প্রকাশকালে অনেকে সেগুলিকে সত্য সত্যই কোন ভারতবাসীর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধগুলি সার্ আলফ্রেডের Asiatic Studies গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সার্ আলফ্রেড ভারতে যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহার কতকগুলি Verses Written in India নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। Land of Regrets কবিতায় তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, য়ুরোপীয় যে কারণেই কেন ভারতে আসুক না, সে ভারতের ক্রীত; ভারতেরই।

যে পণ্ডিতের সহিত লেখকের কথা হয়, তিনি পুঁথির সন্ধানে ভারতে আসিয়াছিলেন ; বারাণসী, কাটামুণ্ড ও কলিকাতার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। সুদূর ফ্রান্সে বসিয়া,তিনি ভারতের দৃশ্য,ভারতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবা, ভারতের অধিবাসী ও ভারতের সাহিত্য,—এই সকলের বিষয় চিন্তা করেন। প্রতীচ্যের পরিবর্ত্তন ও সংশয়ের মধ্যে প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার চিন্তায় তিনি সুখ ও শান্তি পাইয়া থাকেন। গোল্ডষ্টুকার, ম্যাক্সমুলার, বুর্ণেল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের ভারতের সাহিত্য লইয়া জীবনব্যাপী শ্রমের কথা স্মরণ করিলে এ কথা বিশ্বাস করিতে আর দ্বিধা বোধ হয় না।

আবার অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুরুষানুক্রমে ভারতবাসী। সেই সকল নরনারী ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করেন। করিবারই কথা। এক পুরুষেই য়ুরোপের যে কোন দেশবাসী আমেরিকান, বা কেনেডিয়ান, বা অষ্ট্রেলিয়ান হইয়া যায়। তাহার ভাব ও ভাষা, চিন্তা ও আশা, তাহার নূতন দেশের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কলোনিয়ান বা আমেরিকান ভাব ও চিন্তা য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তা হইতে যত স্বতন্ত্র, ভারতীয় ভাব ও চিন্তা য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তা হইতে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক স্বতন্ত্র। সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানে ও ইংরাজে প্রভেদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভারতের প্রভাবে তাহার চিন্তাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। অনেকে বলেন, ইংরাজাধিকারে ভারতে অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সে পরিবর্ত্তন সমাজের অন্তরে প্রবেশ করে নাই ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রই রহিবে। পাঠক স্মরণ করিবেন, রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন, প্রাচ্য প্রাচ্যই—প্রতীচ্য প্রতীচ্যই—উভয়ের মিলন অসম্ভব। ইংরাজশাসনে ভারতে পরিবর্ত্তনের কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একবার মনেও করেন না যে, ভারতবাসে ইংরাজেরও অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অন্যান্য য়ুরোপীয়ের সহিত ইংরাজের যে প্রভেদ, তাহাও সম্ভবতঃ বহু পরিমাণে ইংরাজের ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আবার খাঁটি ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতেরই সন্তান। ভারতে বাস তাহার শরীরে সহে না, সে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বন্ধন, তাহার একটি স্বদেশ আছে---কেবল তাই সে পার্শীর মত একান্ত ভারতেরই হইয়া যায় নাই। নহিলে প্রকৃতপক্ষে সে ভারতেরই সন্তান ভিন্ন আর কিছু নহে।

য়ুরোপে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকেন,—"ভারতে ইংরাজ এত অপ্রিয় কেন?" ফরাসীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি মনোরম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন ফরাসী গ্রন্থকার বলেন, ভারতের লোকের নিকট ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইংরাজই সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রিয়। জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধারণতঃ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ সমপদস্থ ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক অপ্রিয় কি না? তাঁহারা ভারতে অধিক অপ্রিয়, না ইংল্যাণ্ডে অধিক অপ্রিয়? অধিকাংশ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতে বাসকালকেই জীবনে সুখের কাল বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভারতে সংস্থাপিত বন্ধুত্বের স্মৃতি সাগ্রহে সংরক্ষণ করেন, ভারতবাসী বন্ধুদিগের সহিত পত্রব্যবহার করেন, ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠ করেন, দেশের রাজনীতির অপেক্ষা ভারতের রাজনীতি ভাল বুঝেন। আমাদের মনে পড়িতেছে, সুদীর্ঘ কাল ভারতে কাটাইয়া অবসরগ্রহণকালে ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট বলিয়াছিলেন, ছত্রিশ বৎসর পরে বিদেশ হইতে দেশে যাইতেছি ; এ যেন স্বদেশ হইতে

বিদেশে যাইতেছি। যখন দেশ হইতে আসিয়াছিলাম, তথনকার আচার ব্যবহার, আদব কায়দা, বেশ ভূষা, সবই এখন পরিবর্ত্তিত। সব নূতন করিয়া শিখিতে হইবে। জীবনের সায়াহ্নে নূতন বন্ধুত্ব সংস্থাপিত করিতে হইবে। এখন পরিবর্ত্তিত স্বদেশে আমরা যাদুঘরে রক্ষিত সামগ্রীর মত প্রতীয়মান হইব। এই করুণ-উক্তি কি মর্ম্মস্পর্শিনী! হাইকোর্টের জজ বেভার্লি দেশে যাইয়া সার্ এড্উইন্ আর্নল্ড প্রণীত কোন পুস্তকের ভারতীয় দৃশ্যাদির বর্ণনার ত্রুটি ধরিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে সমুজ্জ্বল।

দেশে ফিরিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংগঠিত করেন; সময় সময় হিন্দী, বা গুজরাটী, বা বাঙ্গালা বলেন। তাঁহাদের সন্তানগণ প্রাচ্য দিবালোকের ও আয়ার ও বেয়ারার স্মৃতি ভুলিতে পারে না। তাহাদেরও আকাঙ্ক্ষা, ভারতে আসিবে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতের এমনই নিজস্ব।

জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ভারতে কাটাইয়া, ভারতে যৌবন, স্বাস্থ্য ও উৎসাহ শেষ করিয়া গিয়া কোন্ ব্যক্তি সহজে স্বীকার করিবে যে, সে যাহাদের মধ্যে এই সময় যাপন করিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছে, সন্দেহ করিয়াছে? সকলেরই শত্রু আছে। উচ্চ রাজপদে অপক্ষপাত হইয়া কার্য্য করিলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শত্রু করিতে হয়—লোকে আশাভগ্ন হইয়া ক্রুদ্ধ হয় এরূপ অবস্থায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যদি স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশীর নিকট অধিক অপ্রিয় হন, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সর্ব্বদেশেই রাজকর্ম্মচারীর জনসাধারণের অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, প্রাচ্যে বহুদিন পদগৌরবাদির সম্মান রাজদ্বারে ও বিচারাগারে অক্ষুণ্ণ ছিল। কাজেই নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিলে সাধারণের চিত্তরঞ্জনের সম্ভাবনা অনেক স্থলে নাও থাকিতে পারে।

বলা বাহুল্য, সর্ব্ব দেশেই এমন লোক আছে, যাহারা যে স্থানে যায়, সেই স্থানেই ব্যবহারদোষে শত্রু করে। কিন্তু সেরূপ জন কয়েকের দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই অন্যায় যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতেরই সন্তান হইয়া ভারতবর্ষে ভারতবাসীর নিতান্ত অপ্রিয়। বিদেশীর শাসন ভাল না বাসা এক কথা, আর যাহারা সেই শাসনের পরিচালক, তাহাদের বিরুদ্ধে জাতক্রোধ হওয়া আর এক কথা; তাহা সমীচীনও নহে। ভারতবাসীরা যে প্রকৃত শ্রদ্ধাস্পদ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দেখেন নাই, এমন কথা নহে।

য়ুরোপ এসিয়ায় বিবিধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এক দিকে রুশিয়া অতৃপ্ত জঠরানলে এসিয়ার খণ্ড খণ্ড আত্মসাৎ করিয়া অসম্ভব বিশাল রাজ্য সংগঠিত করিতেছে; আর এক দিকে ইংলণ্ড ফ্রান্সাদি প্রাচ্যে অধিকার শাসন করিতেছে। রুশিয়ার প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীতে প্রজা মূক। ইংলণ্ডের প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে প্রজার প্রবল প্রাধান্য—রাজা মন্দিরের বেদীতে অধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিমাত্র; তিনি প্রজার শ্রদ্ধাভক্তির কেন্দ্র, কিন্তু শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রাচ্যে রাজপ্রাধান্যই নিয়ম; কাজেই রুশিয়া স্বীয় শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করে নাই। ইংলণ্ডে রাজা 'জনে'র সময় হইতে বহু শতাব্দীর বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়া প্রজার প্রাধান্য প্রবল হইয়াছে। ভারতে এক দিনে সে প্রণালীর প্রবর্ত্তন প্রতিপদে বিপদশঙ্কাসঙ্কুল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংলণ্ডের সেই প্রণালীতে শিক্ষিত; তাই তাহার পক্ষে ভারতশাসন বিশেষ শ্রমসাধ্য। আবার ভারতে যত বৈচিত্র্য, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এক দিকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও

ইংরাজী ভাবে দীক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষার ফলে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বৈষম্যের বিরোধী; বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনের উদ্দাম প্রচারণগ্রন্থ 'সাম্য' তাঁহাদিগের মতের তূর্য্যনিনাদ। আবার আর এক দিকে কোল ভীলাদি অসভ্য জাতিরা অতি প্রাচীন যুগের আচার, ব্যবহার, অভ্যাস ও বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। আবার ভারতবাসী ইংরাজ সম্প্রদায়কেও নগণ্য বলা যায় না। এই বহু সম্প্রদায়ের সহ বিশেষত্ব বিবেচনা ও বিচার করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এ দেশে প্রথম আসিলে এই বৈচিত্র্য অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের চক্ষে অদ্ভুত বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে ভাবে অভাবে চিন্তায় ও বন্ধুত্বে সে ভারতেরই হইয়া যায়। তাহার ভ্রম অনিবার্য্য, কিন্তু ভারতবাসীরাই কি এরূপ অবস্থায় ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইতে পারেন? ভারতবাসীরা স্বভাবতঃ সততা ও ন্যায়পরায়ণ হইবার চেষ্টা বুঝিতে পারে। তাহারা যে সত্য সত্যই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে অধিক ঘৃণা করে, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যদি সত্য সত্যই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতবাসীর অপ্রিয় হয়েন, তবে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অসন্তোষ ও সন্দেহের আওতায় কেহ সুখী হইতে পারে না, ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের মুষ্টিমেয় ইংরাজ, সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস না করিলে, তাহাদের কুসংস্কার পর্য্যন্ত বিশেষভাবে না মানিলে, ইংরাজের পক্ষে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। এ দেশে ইংরাজ প্রধানতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণে নিযুক্ত। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতের সামাজিক উন্নতিসাধনে সাধ্যমত সাহায্য করিতে সর্ব্বদা তৎপর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ সর্ব্বতোভাবে বিদেশী হইলে তাঁহাদের পক্ষে এ কার্য্য করা অসম্ভব হইত। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতেরই বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা, ভারতে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র। এ সব সহর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের কীর্ত্তি। কাজেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নিকট ভারতবাসীর ঋণ অস্বীকার করা যেমন অসম্ভব, তেমনই অনাবশ্যক ও অন্যায়। ভারতবর্ষে নূতন সামাজিক জীবন সংগঠিত হইতেছে; ভারতবাসীরা নূতন আশায়, নূতন আনন্দে, নূতন উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। এই নূতন সামাজিক জীবনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের অংশ আছে। এ সময় তাহাকে অপ্রিয়, ঘৃণিত বলিয়া নূতন দলাদলির সৃষ্টি কর্ত্তব্য নহে। ভারত-শাসনে অনেক বিঘ্ন বিদ্যমান। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন আচার—এ সকলকে এখন আর বাড়াইয়া কায নাই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অনেক সময় প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়াই অপ্রিয়। সে অবস্থায় তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া, দলে লওয়া, ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। জাতীয় বিশেষত্ব ও পার্থক্য পদদলিত করিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের ও ভারতবাসীর একত্র হইয়া উভয়ের স্বদেশ ভারতের উন্নতি-বিধানে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। এক জনের দোষে এক সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা বা ত্যাগ করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।

যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ে প্রবন্ধলেখকের মত লোক বিদ্যমান, সে সম্প্রদায় ভারতের হিত বিষয়ে অন্ধ নহেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতের জন্য অনেক করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখন যাহাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানে ও ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হইয়া, ঘনিষ্ঠতর হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতবাসী উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন। কার্ত্তিক। সম্পাদকের "নৌকাডুবি" এখনও চলিতেছে; ভক্ত পাঠকগণ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভরা ডুবির প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রামায়ণের চামর ফেলিয়া বঙ্গদর্শনের আসরে "যাত্রা ও থিয়েটার" লইয়া জাহির হইয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, দীনেশ বাবুর এই রচনাটি সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে অনায়াসে প্রহসনের স্থান অধিকার করিবে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, অবেস্তা, এমন কি, কাবুলের পেস্তা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দীনেশচন্দ্রের বিজয়িনী লেখনীর অবাধগতি দেখিয়া মনে হয়, 'সর্ব্বগ্রাসিনী' প্রতিভার একটি লক্ষণ বিশ্বব্যাপিনী অনধিকারচর্চ্চা। উপসংহারে দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"প্রাচীন যাত্রার ভাঁড় হইতে আধুনিক প্রহসনের ভাঁড় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।" অত্র সন্দেহো নাস্তি। আমরা কেবল এই মন্তব্যের উপর আর একটি ছত্র জুড়িয়া দিতে চাই,—"আবার প্রহসনের ভাঁড় 'হইতে' আধুনিক সাহিত্যের ভাঁড় সর্ব্বগুণে গরিষ্ঠ।" হইতে=অপেক্ষা,ইত্যমরঃ। পুনশ্চ,"আমাদের কৃষ্ণগ্রীবার উপর শুভ্র নেক্‌টাই,'অশুদ্ধ ইংরেজী-উচ্চারণ' * * প্রভৃতি," দীনেশবাবুর মতে, "শত শত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রহসনগুলিকে পুষ্ট করিতেছে।" এখন প্রশ্ন এই, স্বদেশীর কণ্ঠে বিজাতীয় ভাষার অশুদ্ধ উচ্চারণে যদি প্রহসনের পুষ্টি হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালী লেখকচূড়ামণিগণের হস্তে মাতৃভাষার এই দৈনন্দিন আদ্যশ্রাদ্ধ কিসের বিষয় মহাশয়? শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র "রামায়ণের রচনাকাল" নির্ণয় করিতেছেন। এখন পাণিনির আথড়াই চলিতেছে। অক্ষয় বাবুর চেষ্টাও "তর্ককোলাহলে অভিভূত হইয়া ব্যর্থ" না হয়, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। "সংযম" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "বিশ্বামিত্রের তপস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ; লেজা না মুড়া, বুঝিতে পারিলাম না। লেখক বলেন,—"বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য-সভ্যতার আদর্শপুরুষ আমেরিকার সেই ধনকুবের মর্গান, আর্যসভ্যতার আদর্শপুরুষ সেই কাশীধামের ত্রৈলঙ্গ স্বামী।" মর্গ্যান যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শপুরুষ, আমরা তাহা জানিতাম না। 'আর্য্যামী'র আর একটি নাম পাওয়া গেল,—'আর্যসভ্যতা।' প্রাচীন ভারতের গুণকীর্ত্তনেও যে অন্ততঃ একবিন্দু সংযম আবশ্যক, অনেক লেখক অতি সহজেই তাহা ভুলিয়া যান। সিংহ মহাশয় সজীব ইয়ুরোপে আর্যসভ্যতার প্রচার করুন। আগে বাঁচি ও প্লীহা বাঁচাই, তাহার পর ত্রৈলঙ্গ স্বামী হইব। যে মৃত,শক্তিশূন্য,স্বয়ং অন্যের বল,গায় সংযত,সংযমেও তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে" উল্লেখযোগ্য। পিয়ের লোটীর ভারতীয় চিত্রগুলি আরব্যোপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক আলোকে সমুজ্জ্বল।

প্রবাসী। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী ভাষায় রচিত "মাসির-উল-উমরা" নামক মূল গ্রন্থ হইতে "আওরাঙ্গজিবের আদি লীলা" বিবৃত করিয়াছেন। সরকার মহাশয় বহুদিন যাবৎ পারস্য ভাষায় লিখিত পুরাতন ঐতিহাসিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার রচিত "আওরাঙ্গজিব" নামক মৌলিক ইংরাজী গ্রন্থ অগাধ পরিশ্রম ও অসাধারণ গবেষণার ফল। এত দিন পরে অধ্যাপক সরকার মাতৃভাষায় ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মাতৃভাষার দাবী

তাঁহার স্থায় সুধী জনের নিকট কখনও উপেক্ষিত হইতে পারে না। অধ্যাপক সরকার এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুন, জাতীয় ইতিহাসের নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। বাঙ্গলা ভাষায় আজকাল যাঁহারা ইতিহাসের আলোচনায় ব্যাপৃত, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। বিশেষতঃ, আমাদের তথাকথিত ইতিহাস ইংরাজীর অনুবাদ ও চর্ব্বিতচর্ব্বণে জর্জ্জরিত,—অন্তঃসারশূন্য অনুবাদসম্বল কূপমণ্ডূক ঐতিহাসিকের হুঙ্কারে সাহিত্যের তপোবন বিকম্পিত, বিক্ষুব্ধ। এই দুঃসময়ে মৌলিক গবেষণা ও শ্রমসিদ্ধ ও অধ্যয়নের সুদৃষ্টান্ত সাহিত্য-সমাজে আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "চিন্তাসঙ্করণ" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় পরিণত বয়সে নির্দ্দয়ভাবে ভাষার উপর অত্যাচার করিতেছেন কেন, বলিতে পারি না। প্রবন্ধটিও শৃঙ্খলাশূন্য। কতকগুলি 'নোটে'র সমষ্টিমাত্র। আমরা "চিন্তাসঙ্করণে"র সূত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের সমাবেশেই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন হয় না। তাহা হইতে সত্যের উদ্ধার করিবার ভার পাঠকের উপর অর্পণ করিলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য" উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন,—"এতদ্দারা প্রমাণ হয় যে, যে সময়ে মহাকবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে চীনদেশীয় ক্ষৌম বসন এ দেশে প্রজাসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।" কেবল একটি উপমার সাহায্যেই তাহা প্রতিপন্ন হয় না। প্রতিপোষক অন্য প্রমাণ আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—"লোকে 'কেতুনির্ম্মাণ করিতে হইলেই' চীনাংশুক ব্যবহার করিত।" "কেতুনির্ম্মাণ করিতে হইলেই চীনাংশুক ব্যবহার করিত" বলিলে বুঝায় যে, কেতুনির্ম্মাণে অন্য বসন একবারেই ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু উদ্ধৃত উপমা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় কি? আলোচ্য প্রবন্ধে এরূপ শিথিল ভাষা ও 'পলকা' প্রমাণের অভাব নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে আমরা এতদপেক্ষা সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের আশা করিয়া থাকি। "কাঙ্গলী পরব" ও "সাঁওতাল-রহস্যে" বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "কল্যাণী" নামক ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গল্পটি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। আখ্যানবস্তুর বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "য়ুরোপপ্রবাসী বাঙ্গালী" উল্লেখযোগ্য। একটু নীরস, কিন্তু জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত একটি" সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "মর্ম্মর প্রস্তরে লক্ষ্মীমূর্ত্তি" প্রবন্ধে সংবাদ দিয়াছেন,—"কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে একটি লক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন।" প্রবন্ধের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রতিমার ছবিও আছে। সর্ব্বশেষে লেখক এই মর্ম্মরপ্রতিমার চারিখানি প্রশংসাপত্র নিবিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পত্রখানিই উল্লেখযোগ্য, উপভোগ্যও বটে।—"শীতলের এই প্রথম উদ্যম শুনিলাম, সে কখনও আর্ট স্কুলে পড়ে নাই। সে এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনায় আনিল কিরূপে? আপনারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না? এ ব্যাপারের সমন্বয় করিবেন কি দিয়া?" প্রতিধ্বনি বলিতেছে, "কি দিয়া?" হয় ত মাইকেল এঞ্জিলো হইতে শীতলচন্দ্র পর্য্যন্ত একটা জন্মধারা বহিয়া আসিতেছে! শীতলচন্দ্র হইতে পূর্ব্বজন্ম,—বিরাট দৌড়!

ভারতসুহৃদ ডিগ্‌বী।

কিছু দিন রোগভোগের পর গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ভারতসুহৃদ ডিগ্‌বীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত পীড়িত; স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় সমুদ্রভ্রমণে নরওয়ে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মহাযাত্রার আর অধিক বিলম্ব নাই;. চিকিৎসকগণও রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডিগ্‌বীর জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল; ইংরাজের পক্ষে ইহা প্রৌঢ়দশার শেষ সীমা মাত্র।

স্বদেশে কিছু দিন সংবাদপত্রের সংস্রবে কার্য্য করিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডিগ্‌বী Ceylon Observer পত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া সিংহলে আসেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ Fortnightly Review পত্রে Home Rule Experiment নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সিংহলে মাদকবিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট-সময়-নির্দ্ধারণ-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। তিনি স্বয়ং মাদকবিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃত মহাত্মা কেন্ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

সিংহলে অবস্থানকালে তিনি আর একটি বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিংহলে ভূমির রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত প্রকাশ্য নিলামে ঠিকা দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য, ঠিকাদারগণ আপনাদের অধিকারকালমধ্যে যথাসম্ভব অধিক অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিত, এবং তাহাতে প্রজার উপর অত্যাচার হইত। ডিগ্‌বীর আন্দোলনফলে গভর্মেণ্ট অনুসন্ধানসমিতি গঠিত করেন, এবং অনুসন্ধানের ফলে ঠিকাদারী রহিত হয়। ডিগ্‌বী ধান্যের উপর শুল্কের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। কিন্তু সে আন্দোলন সফল হয় নাই। এই সময় তিনি বিলাতের অবাধবাণিজ্যের প্রধান সমর্থক কব্‌ডেন্ ক্লবের গোচর জন্য Food Taxes in Ceylon পুস্তিকা রচনা করেন। তাহার ফলে তিনি ঐ সভার বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। এই সময় Calcutta Review পত্রে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এবং তিনি ঐ পত্রের সম্পাদকের

পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। যাঁহারা এই পত্রের ইতিহাস ও য়ুরোপে ইহার আদরের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই এই পদের সম্মানের কথা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান নিবন্ধন তিনি ঐ পদগ্রহণে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রপাত। এই বৎসর তিনি Madras Times পত্রের সম্পাদক হইয়া মাদ্রাজে আগমন করেন। তখন "ভারতে কালের ভেরী" বাজিয়াছে,—দক্ষিণ-ভারত দুর্ভিক্ষের করাল-কবলগত। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ তখন মহাসমারোহে মোগল বাদশাহদিগের অনুকরণে তাঁহাদিগের রাজধানী দুর্দ্দশা-দাবানলদগ্ধ দিল্লীর শ্মশানবক্ষে—দরবারের উদ্যোগে ব্যস্ত। ক্ষুধিত মুমূর্ষু জনগণের আর্ত্ত-চীৎকারে তিনি কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই ভারত গভর্মেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত জানিয়া ডিগ্‌বী ইংলণ্ডে Times পত্রে দেশের অবস্থা বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি ইংলণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডিউক্ অফ্ বকিংহাম্ তখন মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা। তিনি ডিগ্‌বীর পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ডিগ্‌বীর পত্র ইংলণ্ডে সকল সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হইল। ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলন চলিল; সর্ব্বত্র ক্ষুধার্ত্তের সাহায্যের চেষ্টা হইতে লাগিল। ডিগ্‌বীর প্রমাণ অকাট্য, যুক্তি সুসম্বদ্ধ। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যথাকালে সাহায্য না পাইলে দেশবাসীদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। ইংলণ্ডে আন্দোলন উপস্থিত হইলে ভারত গভর্মেণ্টের চৈতন্যোদয় হইল। রাজপ্রতিনিধি দরবারের সজ্জা সম্বন্ধে কবিজনোচিত কল্পনা পরিহার করিয়া মাদ্রাজে যাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সাহায্যের জন্য পূর্ত্তকার্য্য আরব্ধ হইল। ইংলণ্ডে ১২০০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইল। এ দেশে ডিগ্‌বী সেই অর্থবিতরণার্থ সংগঠিত সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত। দীর্ঘ ছয় মাস কাল তিনি প্রতি সপ্তাহে এক শত কুড়িটি শাখা-সমিতির সহিত পত্রব্যবহার করিয়া পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বিবরণ প্রকাশ করিতেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইলেও তাঁহাকে হিসাবপত্র শেষ করিতে কিছু কাল পর্য্যন্ত গুরুশ্রম করিতে হইয়াছিল। ডিগ্‌বীর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও গবর্মেণ্টের প্রথম অমনোযোগে বহু নরনারীর মৃত্যু হয়। গবর্মেণ্ট স্বীকার

করেন, মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। লোকের বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে মৃতের সংখ্যা আরও অধিক।

সাহায্য-প্রদান শেষ হইল। এত অল্প ব্যয়ে এমন সুচারু ব্যবস্থায় পূর্ব্বে কখনও সাহায্যদান সম্পন্ন হয় নাই। শতকরা বার আনা মাত্র ব্যয়ে বিপুল অর্থ বিতরিত হইয়াছিল; অর্থাৎ ১০০৲ টাকার মধ্যে ৯৯।০ ক্ষুধার্ত্তের জঠরানল-নিবৃত্তির সাহায্য করিয়াছিল। ইহার পরও কেবল একবার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ডের Investor's Review পত্র যে অর্থসংগ্রহ করেন, তাহা সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার্‌বরণের প্রস্তাবে বোম্বাই অঞ্চলে সার্ জষ্টিস্ রাণাড়ে ও সার্ ফিরোজশা মেটা প্রভৃতি কয় জন প্রধান ব্যক্তির দ্বারা বিনা ব্যয়ে বিতরিত হয়।

কার্য্য শেষ হইলে ইংলণ্ডে ভাণ্ডারের সম্পাদককে ও কোষাধ্যক্ষকে পুরস্কৃত করা হইল। এ দেশের অবৈতনিক সম্পাদক ডিগ্‌বীকেও পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব হইল। তিনি পুরস্কার লইতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার এই মহত্ত্বদর্শনে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশদ্বয়ের সমিতির সভ্যদল আপনাদের মধ্যে স্বতন্ত্র চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে ২৭৪৫৲ টাকা প্রদান করেন। এই অর্থ তাঁহার শ্রমের যোগ্য পুরস্কার নহে; সমিতির সভ্যদিগের প্রীতি ও প্রশংসার নিদর্শন মাত্র। তাঁহারা এই কথাই বলিয়াছিলেন। ভারতীয় সমিতির সভাপতি সার উইলিয়ম্ রবিন্সন তাঁহার শ্রমসামর্থ্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গুরুতর ও কষ্টকর কার্য্যে ধৈর্য্য ও শিষ্টতার বিশেষ প্রশংসা করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার Famine Campaign in Southern India গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গভর্মেণ্ট ডিগ্‌বীকে মাদ্রাজ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নিযুক্ত করেন, এবং ফ্যামিন কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করেন। মাদ্রাজবাসীরাও তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় অতর্কিত দুর্ঘটনায় তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান।

মাদ্রাজে ডিগ্‌বীর আর এক কীর্ত্তি,—পশুক্লেশনিবারিণী সভা।

দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ডিগ্‌বী কিছুদিন সংবাদপত্রসংশ্লিষ্ট কার্য্যে লিপ্ত

থাকেন। রাজনীতিতে ডিগ্‌বী স্বয়ং উদারনৈতিক ছিলেন। রক্ষণশীল দলের প্রধান বৈঠক Carlton Clubএর মত কোনও বৈঠকের অভাব উদারনৈতিক দল বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। ডিগ্‌বী উদ্যোগী হইয়া সেই অভাবের নিবারণকল্পে National Liberal Club প্রতিষ্ঠিত করেন; স্থাপন-কাল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদক থাকেন। এই সময় তিনি ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও প্রভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদিগের অভাব ও অভিযোগের কথা ইংলণ্ডে কর্ত্তৃ-পক্ষীয়দিগের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Indian Political Agency সংস্থাপিত করেন। এই কার্য্যে 'অমৃতবাজার' পত্রের অধ্যক্ষগণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের British Commitee ও কংগ্রেসের মুখ-পত্র 'ইণ্ডিয়া' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। যত দূর স্মরণ হয়, তিনি প্রথম এলাহাবাদ কংগ্রেসে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মতান্তর উপস্থিত হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গের অভাব অভিযোগের কথা কংগ্রেসে আলোচিত হয়, ইহা মিষ্টার হিউমের অনভিপ্রেত ছিল। তিনি কংগ্রেসের কার্য্য বৃটিশ-শাসিত ভারতের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এ অবস্থায় দেশীয় রাজন্যগণের অভাব অভিযোগ-জ্ঞাপনের প্রধান পথ Political Agencyর সম্পাদকের হস্তে কংগ্রেসের ইংলণ্ডস্থ সমিতির ভার ন্যস্ত থাকা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া কথা উঠে। ডিগ্‌বী কংগ্রেসের কার্য্য ত্যাগ করেন। একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতার তৃতীয় অধিবেশনে 'অমৃতবাজার' পত্রের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অনুরোধে ও মৃত মিষ্টার কেনের চেষ্টায়, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া, ঝালোয়ারের সিংহাসনচ্যুত রাণার বিষয় আলোচনা করেন।

ডিগ্‌বীর সম্পাদকতায় 'ইণ্ডিয়া' পত্র যেরূপ সুপরিচালিত হইয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের শেষ হইলেও, ডিগ্‌বী কখনও কংগ্রেসকে ভুলিতে পারেন নাই; পরন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবসর পাইলেই কংগ্রেসের হিতসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। National Liberal Clubএর সম্পাদক অবস্থায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক India for the Indians and for England প্রচারিত করেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে জন্ ব্রাইট্ বলিয়া-

ছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন, তাঁহারা সকলেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।

প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় মহাত্মা ব্রাড্‌ল কাশ্মীর রাজ্যের প্রতি অত্যাচারের বিষয় পার্লামেণ্টের গোচরে আনেন। এই উপলক্ষে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ডিগ্‌বী Condemned Unheard গ্রন্থের প্রচার করেন।

ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অভাবের বিষয়ে তিনি আরও কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকার প্রচার করেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার মতামত প্রধানতঃ 'অমৃতবাজার' ও মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রদ্বয়ের ইংলণ্ডস্থ সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকটিত হইত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উইলিয়ম্ হচিন্‌সন্ কোম্পানীর অংশী হয়েন। এই কোম্পানী এ দেশে—মাদ্রাজে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক জন ইটালীয়ের আবিষ্কৃত বায়ুচাপে নল-মধ্য দিয়া দ্রুত পত্রাদিচালনপ্রণালী ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলাফল আমরা অবগত নহি। তিনি Natural Law in Terrestrial Phenomena নামক পুস্তকের রচনা করেন। তাহাতে আব-হাওয়া বিষয়ক অনেক নূতন তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট ছিল।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ Prosperous British India ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লইয়া যেরূপ বাদানুবাদ ও আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় প্রায় কোন পুস্তক লইয়া সেরূপ হয় না। তাহার এক প্রধান কারণ, ডিগ্‌বী স্বয়ং ইংলণ্ডে সুপরিচিত ছিলেন। ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষ ক্রমেই দরিদ্র হইতেছে, ইহারই প্রতিপাদন এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মতের আর দুই জন প্রধান পোষক, দাদাভাই নাওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত। সেই জন্যই ভারতের ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যমতাবলম্বীরা Digby-Dadabhai-Dutt School বলিয়া পরিচিত।* প্রধানতঃ, এই পুস্তক প্রচার করিয়া তিনি ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়েন। তাঁহাদের মতে, তিনি "a dangerous person, whose habits of controversy were as objectionable as his charges were wild and unfair." এই গ্রন্থ প্রধানতঃ সরকারী কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত। সে সকল কাগজপত্র গোপনীয় বলিয়া গণ্য। তাই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ব্রাড্‌ল ঐ

* ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "দেশের কথা" পুস্তকে ইঁহাদিগের মতের সারভাগ জানিতে পারিবেন।

সকল কাগজপত্র চাহিলে, প্রথমে তিনি সে সকল প্রাপ্ত হয়েন নাই। শেষে তিনি ঐ সকল পাইয়া ডিগ্‌বীকে প্রদান করেন। সে সকল যে ডিগ্‌বীর ব্যবহারার্থই লইতেছেন, এ কথা তিনি ইণ্ডিয়া আফিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।

এই স্থলে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রধানতঃ ডিগ্‌বীর সাহায্যেই ভারতবন্ধু ব্রাড্‌ল ভারতের জন্ত সমধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের সকল তত্ত্বই ডিগ্‌বীর নখদর্পণে ছিল; তিনি অবশ্যক হইলেই মিষ্টার ব্রাড্‌লকে সকল বিষয় অবগত করাইতেন। এই জন্তই ব্রাড্‌ল শেষজীবনে ডিগ্‌বীকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ভারতীয় বজেটের বিচারকালে ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্‌টন্‌ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—ইংলণ্ডে ও ভারতে কতকগুলি লোক ক্রমাগত বলিতেছেন যে, ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষ নিরন্ন হইয়া উঠিতেছে। ষ্টেট সেক্রেটারী হওয়া পর্য্যন্ত আমি সর্ব্ববিধ প্রমাণ সংগ্রহ ও বিচার করিয়া এই কথার সত্যাসত্যনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছি। এই অভিযোগ সত্য হইলে—অর্থাৎ ইংরাজ-শাসনে ভারতের যদি আর্থিক অবনতি হইয়া থাকে, তবে আমরা অপরাধী,এবং সেই সাম্রাজ্যের শাসন-ভার রাখা আর আমাদের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাঁহাদের কথার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাই নাই। এই অভিযোগের ক্রমাগত পুনরুক্তিতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ভারতে ও ইংলণ্ডে এক দল লোক এই অভিযোগে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।—ইত্যাদি। লর্ড জর্জ্জের এই উক্তির উত্তরদানে Prosperous British India রচিত ও প্রচারিত হয়। অধিকাংশ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীর মত, ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বর্দ্ধিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে সার্‌ রিচার্ড টেম্পল্‌ অতি অদ্ভুত যুক্তি দেখাইতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তিনি বলেন, ভারতের লোক স্বভাবতঃ সঞ্চয়শীল, সুতরাং লোকে যাহাই মনে করুক, তাহাদের সঞ্চয়ের অভাব হইবে না। * এ বিষয়ের যথাযথ বিচার করিতে হইলে নানা রাজনৈতিক কথার আলোচনা করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই।

আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যেরূপ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইংলণ্ডের অধীনে ভারতে সেইরূপ স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া

---

* Introduction to Keene's Great Anarahy.

* London Indian Societyতে প্রবন্ধপাঠ, ভারত সম্বন্ধে ডিগ্‌বীর শেষ কার্য্য।

অর্থনীতিতে পারদর্শিতা হেতু ডিগ্‌বী Royal Statistical Societyর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ডিগ্‌বী স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ, সহানুভূতি-সিক্ত, বন্ধুবৎসল ও মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজনৈতিক বিপক্ষদিগের প্রতি তিনি কখনও ব্যক্তিগত দোষারোপ করেন নাই। তাঁহার সমাধি-সময়ে তদীয় রাজনৈতিক স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়-দিগের একত্র সমাবেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ডিগ্‌বী ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সরস ও শিক্ষাপ্রদ ছিল। তাঁহার সরস কথায় শ্রোতার হৃদয়ে বিষাদের কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইত। আপনার গৃহে তিনি সর্ব্বদা অতিথিসৎকার করিতেন। তাঁহার সঙ্গ বন্ধু বান্ধবদিগের প্রীতিপ্রদ হইত। সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি ভারতবর্ষের, ভারতবাসীদিগের ও বন্ধুবান্ধবগণের জন্য কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য অত্যন্ত অধিক ছিল।*

ডিগ্‌বী কখনও শ্রমকাতর হইতেন না। তিনি বিশ্রাম বা অবকাশ জানিতেন না। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর লোক যখন বিশ্রাম করে, তিনি তখনও পরিশ্রম করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মতে, শ্রমাতিশয্যই তাঁহার অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। দীর্ঘ দিবাভাগে পরিশ্রমের পর তিনি জনগণের নিকট ভারতের অভাব-অভিযোগ-জ্ঞাপনার্থ বক্তৃতা করিতেন, বা স্বীয় পাঠাগারে ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন রচনায় ব্যাপৃত হইতেন। তখন তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—এখন আপনাকে সজীব মনে হইতেছে; এখন কর্ম্মবন্ধন দূরে। এখন যাহা করিতেছি, তাহা জীবনের অংশ। এই সময় তিনি ভারতে সংবাদপত্রে পত্র লিখিতেন। সে সকল পত্র তাঁহার হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহার হৃদয়শোণিতে লিখিত।

তাঁহার শ্রম করিবার ক্ষমতা ও কার্য্য করিয়া তুলিবার সামর্থ্য উভয়ই অসাধারণ ছিল। তিনি যদি সন্ধ্যার পরিবর্ত্তে অনন্তকর্ম্মা হইয়া সমস্ত দিন

---

* বর্ত্তমান লেখক তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি চাহিয়া পাঠাইলে তিনি দুই প্রকারের দুইখানি প্রতিকৃতি পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, একখানি আপনার ব্যবহারের জন্য, আর এক-খানি আমি দিতেছি বলিয়া রাখিবেন। ইত্যাদি।—লেখক।

ভারতের কার্য্য করিতে পাইতেন, তবে তাঁহার মত ব্যক্তি যে ভারতের অজস্র কল্যাণসাধন করিতে পারিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল কার্য্য আন্তরিকতায় অনুপ্রাণিত ছিল। ভারতের পক্ষে তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদক-ললা।

১

কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ বম্বে সহরের ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ শ্রেষ্ঠী নামক এক জন গুজরাতী বণিক ভারতবর্ষে একটি অ-পূর্ব্বপরীক্ষিত পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিবেন, এইরূপ ঘোষণা করায়, গুজরাতী সমাজে এক ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক আতঙ্ক সহসা বিস্ময়ে পরিণত হইল; কারণ, তাহারা শুনিতে পাইল, ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ শ্রেষ্ঠী বম্বে নগরে সংবাদপত্রের ব্যবসায় খুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে! অতঃপর অনেকে সন্দেহ করিল, শেঠজীর মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকার ঘটিয়াছে। এই সূত্রে তাঁহার গৃহে স্বস্ত্যয়নের জন্য দৈবজ্ঞের ও চিকিৎসার জন্য বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল কি না, আমরা জানি না; 'ইন্দুপ্রকাশে'র তাহা জানা থাকিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে বম্বে সহরে কোন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। দেশীয় যে দুই একখানি পত্রিকা ছিল, রাজনৈতিক ও সামাজিক অভাব অভিযোগাদির আলোচনাই তাহাদের উদ্দিষ্ট। একখানি উৎকৃষ্ট গুজরাতী কাগজ চালাইতে পারে, এরূপ শিক্ষিত গুজরাতীর সংখ্যা বম্বে নগরে তখন অতি অল্প ছিল। শিক্ষিত গুজরাতীর যে অভাব ছিল, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ গুজরাতী ভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; যে ভাষা শিখিয়া সাহু লোকের দোকানে খাতা লেখা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং যে ভাষায় 'কেরণ ঘেলু' প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপন্যাস ভিন্ন স্বাধীন প্রেমের গল্প-পাঠের উপায় নাই, সে ভাষা শিখিয়া হাস্যভাজন হইবার আগ্রহ সেকালের নব্য গুজরাতীদের মধ্যে ছিল না। যাঁহারা

পড়িতে পারিতেন, তাঁহারা লিখিতে পারিতেন না। আবার রচনা জিনিসটি সেকেলে গুজরাতী পরার-বাগীশদিগেরই একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল; পৃথিবীর সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহাদের এক জনকে ধরিয়া 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্বে'র সম্পাদক করিতে শেঠজীর মন সরিত না; শেঠজী অনেক চেষ্টায় সম্পাদক সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, আহম্মদাবাদে তাঁহার এক উকীল বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই গুজরাতী পত্রখানির বঙ্গানুবাদ এই,—

"ভাই হীরাচাঁদ! আমার এই পত্র পাইয়া বোধ করি তুমি কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিবে।

"আমি সংবাদপত্রের ব্যবসায় করিব,—যদি যায় ত কিছু টাকা জলে যাক্। কোম্পানীর কাগজের শতকরা সাড়ে চারি টাকা ছাড়িয়া কিছু টাকা পরীক্ষা-চ্ছলে জলে নিক্ষেপ করা ঠিক প্রকৃতিস্থের লক্ষণ বলিয়া তোমার মনে না হইতে পারে। কিন্তু তুমি জান, আমি ইউরোপীয় বণিক ভ্রাতাদিগের বাণিজ্য-নীতি অনুকরণযোগ্য মনে করি। 'টাইমস্'-এর আয় ও মান কত, তা ত জান। এমন অনেকেরই নাম করিতে পারি। বিলাতে যে ব্যবসায়ে লাভ হয়, এখানে তাহাতে না হইবে কেন? দেশ অশিক্ষিত, কিন্তু লোককে শিক্ষিত করিয়া লইতে কত ক্ষণ? আমরা তাহাদিগকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, কর্ত্তব্যনীতি দান করিব, আর তাহারা তাহার পরিবর্ত্তে সপ্তাহে একটা পয়সা দিবে না? দশ লক্ষ গুজরাতী সংবাদপত্র পড়িতেও বুঝিতে পারিবে; দশ লক্ষ গুজরাতী সপ্তাহে এক পয়সা করিয়া দিয়া আমার কাগজ পড়িবে না? পড়াইব, তবে ছাড়িব। এখন চাই এক জন ভাল সম্পাদক। উপযুক্ত লোক তোমার সন্ধানে আছে? দিতে পার? আমি তাহাকে প্রত্যহ বেতন হিসাবে দু টাকা ও জলখাবার হিসাবে চারি আনা (মাসে পড়ে সাড়ে সাতষট্টি টাকা) দিব, এবং কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারিলে এক বৎসর পরে বেতন আড়াই টাকা বৃদ্ধি করিয়া সত্তর টাকা করিয়া দিব। অধিক বেতন না দিলে সম্পাদকের পদের দায়িত্ব হাল্‌কা হইয়া পড়ে—এ জ্ঞান আমার আছে। আশা করি, শীঘ্র উত্তর লিখিবে।"

শ্রীযুক্ত হীরাচাঁদ মাণিকচাঁদ বি. এ., এল্. এল্. বি. মহোদয়ের উত্তরের অনুবাদ।—

"ঝণ্টু, তোমার পত্র পাইলাম। তোমার উৎসাহের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে; তুমি চিরকালই pushing, সেই গুণেই তুমি তোমার পৈতৃক যাহা

কিছু লাভ করিয়াছিলে, তাহা অত্যল্পকালের মধ্যে আশাতিরিক্ত হাল্‌কা করিয়া তুলিয়াছ। যদি তোমার মত আমার আত্মপ্রত্যয় থাকিত! যাহা হউক, তুমি কি রকম লোক চাও, লিখিবে;—আমি দিলেও দিতে পারি। এমন কল্পতরু তোমার বন্ধুগণের মধ্যে আর কে আছে?—তোমার হীরাচাঁদ।"

ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ লিখিলেন, "আমি ব্যবসায় করিব, ইহা বুঝিয়া লোক পাঠাইবে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত লোক চাই না। কুকুরের মত কামড়াইবার শক্তি থাকিলে বরং মন্দ হয় না। বেশ 'বলিয়ে কইয়ে' হইবে; খুব সামাজিক হইবে। ধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাক, ধর্ম্মধ্বজীদিগকে লইয়া দল পাকাইবার শক্তি থাকা চাই। আবশ্যক হইলে কোনও বড়লোকের মোসাহেবি করিবার জন্য প্রস্তুত থাকাও চাই। বেশী পাশ কাস চাই না, তবে পাশ টাসের চেয়ে বেশী জানে, এটুকু দেখান চাই। লর্ড মেয়োকে নিজের সমকক্ষ জ্ঞান করিবার ভাব-প্রকাশের শক্তি থাকা চাই; সংবাদপত্র রাজ্যের একটা শক্তি, তা ভুলিলে চলিবে না। গৃহে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি না থাক, বাহিরে আমাদের বিষ্ণুলোকের ন্যায় পবিত্র গুর্জ্জরভূমির দুঃখে প্রাণ কাঁদা চাই। সর্ব্বোপরি, গবর্মেণ্টকে প্রাণপণে গালি দেওয়া চাই,—স্বার্থের খাতিরে যে লোক নীতিবিসর্জ্জন দিতে রাজী নয়, এমন নিষ্কর্ম্মা লোক পাঠাইও না।"

২

এই পত্র ডাকে দিবার সাত দিন পরে ধরমচাঁদের আফিসে একটি গুজরাতী যুবকের আবির্ভাব হইল। তাহার পায়ে বিলাতী জুতা, পরিধেয় বস্ত্রখানিও বিলাতী। এই উমেদার যুবকের নাম নটবর নরোত্তম। নটবর আহম্মদাবাদ কলেজে বি. এ. পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন; কিছুদিন 'সৌরাষ্ট্র-বার্ত্তার' সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিনি একটা টোল-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় হীরাচাঁদ মাণিকচাঁদ তাঁহাকে বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন।

ধরমচাঁদ গোকুলচাঁদ বন্ধুর পত্রখানি পাঠ করিয়া একবার একটু বক্র-দৃষ্টিতে নটবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে সম্পাদকতা করিয়াছেন, কাজ ছাড়িলেন কেন?" "আমি সহকারী ছিলাম, বড় সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।" "উত্তম, দেখা যাইতেছে আপনি নির্ভীক; জেলে যাইতে প্রস্তুত আছেন?

"অনাবশ্যক, জেলে যাইবার উদ্যমের পূর্ব্বেই সাবধান হইব।"

"দেখা যাইতেছে, আপনি বিবেচক।—সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া করিলেন কেন ?"

"আমাকে দিয়া গাধার খাটুনি খাটাইয়া নিজে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেন, এবং তিনি নিজে কোন মানহানির মামলার আসামী হইলে আমাকে দায়ী করিতেন ; অথচ তিনি জেল খাটিতে রাজী বলিয়া আমার মাহিনার চারিগুণ টাকা আদায় করিতেন।"

"দেখা যাইতেছে, আপনি ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু আপনাতে স্বদেশ-হিতব্রতের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না কেন ?"

"স্বদেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, আর সেই জন্যই আমি স্ত্রীর পরামর্শে মাকে পৃথক করিয়া দিয়াছি।"

"আপনার উত্তরে আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে।—কিন্তু পায়ে বিলাতী জুতা, পরিধানে বিলাতী কাপড়, এ সকল বিলাতী অনুরাগ কেন ?"

"অনুরাগ নহে, বিলাতের অনুকরণ ও আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে ? পদের মানবৃদ্ধি করিতে বিলাতী জুতাই এখন অগ্রগণ্য, বিলাতী কাপড় ভিন্ন দেশীতে লজ্জানিবারণ করিয়া নিমকহারাম হওয়া উচিত নহে। লিভারপুলের লবণ ত ছাড়িতে পারিব না।"

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "দেখা যাইতেছে, রাজভক্তির তুমি সুন্দর যুক্তি দেখাইতে পারিবে ; তোমাকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলাম।"

৩

নটবর নরোত্তমের সম্পাদনে 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্বে'র কেমন শোভাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহা সে সময়ের মধ্যশ্রেণীর গুজরাতীদিগের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্ব' প্রথমে জনাদর লাভ করে নাই, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিভাবান সম্পাদক নিজের পথ চিনিয়া লইয়া সরোষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন ; পরের নিন্দা কুৎসাও কীর্ত্তন করিতে লগিলেন। কিন্তু যখনই কেহ চোখ রাঙ্গাইয়া পত্র লিখিত, তখনই তাহার প্রশংসা করিয়া তাহার শত্রুর নিন্দা আরম্ভ করিতেন। দেশের লোককে জাতীয়তা বজায় রাখিবার জন্য আহ্বান করিতেন, নিজে কিন্তু বিলাতীর মায়ায় মুগ্ধ। গুজরাতী সমাজে ইউরোপ-যাত্রার স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, অশিক্ষিত দরিদ্র গুজরাতীরা এ ভাবটি বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিত ; এই স্রোতের প্রতিকূলে তিনি লেখনীধারণ করিলেন।

মফঃস্বলের অশিক্ষিত সংবাদদাতাদিগের প্রগল্‌ভতাপূর্ণ সংবাদগুলি তাহাদের নামধামাদি সহ মফঃস্বল স্তম্ভে ছাপিতে লাগিলেন। কোন্ স্থানের কোন্ বণিক শুভ মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণ মাসে) কুকুরকে কত সের জিলিপি ও পিপীলিকা-গর্ত্তে কত সের চিনি ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার সংবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্পাদকের প্রশংসায় গুর্জ্জরভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; প্রত্যহ শত শত নূতন গ্রাহক বাড়িতে লাগিল। শেঠজী খুসী হইয়া নটবরের বেতন এক শত টাকা করিয়া দিলেম।

এইবার নটবরের প্রতাপসূর্য্য দিগন্তে রশ্মিজাল বিকীরণ করিতে লাগিল। মনিবকে ফাঁকি দিয়া তিনি নিজের জন্য কাগজ লিখিতে লাগিলেন। কোথাও কোনও অত্যাচার হইতেছে, জমীদার অত্যাচার করিতেছে, নটবর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করিলেন। জমীদারের কারকুণ আসিয়া নটবরের সহিত সাক্ষাৎ করিল, গোপনে কি কি কথার এবং কথার সঙ্গে অন্য কোন্ সামগ্রীর আদান প্রদান হইল, তাহা বাহিরের কেহই জানিতে পারিল না, তবে পরের সপ্তাহের কাগজে জমীদারের সুখ্যাতির প্যারা বাহির হইল; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মন্তব্যে প্রকাশ করা হইল যে, "কোন একটি নব্য উকীল জমীদারের 'ঘর' না পাওয়াতে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়িতেছে, এবং জমীদারের অন্যায় গ্লানি করিতেছে। এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। জমীদার মহাশয়ের দুর্নাম-প্রচারে তাঁহার রাজভক্ত প্রজাকুলও অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছে! মিথ্যাবাদী উকীলের নামে জমীদার মহাশয় মানহানির নালিশ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমাদের অনুরোধে তিনি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই; বিশেষতঃ তেজস্বী ব্যক্তি মানরক্ষার জন্য কখনও আদালতের আশ্রয় লন না।"

এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে শেঠজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নটবর! একেবারেই যে সুর বদলাইলে! এতে কাগজের প্রেষ্টীজ থাকিবে কি?"

"আর ম'শায় প্রেষ্টীজ!—প্রাণ থাকিলে ত প্রেষ্টীজ্! জমীদার বেটা বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিল—এই তালগাছের মত লম্বা! তার হাতে একগাছি বংশলোচন, লাঠী ত নয় যেন ভীমের গদা! আমি প্রতিবাদ করিতে সম্মত হই, তখন সে যায়। আর দেখুন যদি নালিশই করিত, তবে আপনিই বলিতেন, কেন ও ফেসাদে গেলে?—আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুব তেজস্বীর মত লিখিব, কিন্তু শক্ত দেখিলেই সেলাম করিব।"

শেঠজী প্রীতমনে বলিলেন, "আমিও বলিয়াছিলাম, তুমি খুব ভাল সম্পাদক হইবে। তোমার কথায় বড় পরিতুষ্ট হওয়া গেল। আজ সন্ধ্যার পর আমার 'ঘরে' গোটাকতক লাড্ডু ভক্ষণ করিও।"

নটবর দেখিলেন, এ ভাবে বেশী দিন চালান কঠিন। ধূর্ত্ত শেঠ হয় ত এক দিন তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে; তখন তিনি আর এক ফন্দী করিলেন। শেঠজীর জীবনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'গুর্জ্জর-প্রতিবিম্বে' প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। শেঠজী বাল্যকালে কবে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ভাবাবেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ বলীবর্দ্দকে গিরিগোবর্দ্ধন বলিয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, কবে তিনি কোন্ কদম্ববৃক্ষমূলে আসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার স্মরণমাত্রে প্রেমগদগদভাবে অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী বর্ণিত হইতে লাগিল। নটবর কখনও বলেন, বম্বে-লাট কতকগুলি পরামর্শের জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলেন, সে সকল গুহ্য কথা সংবাদপত্রে বাহির করিবার হুকুম নাই, তাই তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিতেছি না; কোনদিন বলেন, হাই-কোর্টের জজ তেলাং বাহাদুর হিন্দুধর্ম্মের 'প্রমাণ' সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও প্রকাশযোগ্য নহে, তেলাং-এর প্রকৃত ধর্ম্মমত কি, তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার অধিকার তিনি আমাকে দান করেন নাই। নটবরের বেতন আরও পঞ্চবিংশতি মুদ্রা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু নটবরের সহকারীর তিন গুণ কাজ বাড়িয়া গেল, অথচ তাহার তেইশ টাকা বেতনের এক বিন্দু পরিবর্ত্তন হইল না! শেঠজী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর কাজ কর্ম্ম করে কেমন?" নটবর বলিল, "যাচ্ছে তাই, যা ব'লে না দেব—তা কোনও মতে পারিবে না। সংবাদগুলো পর্য্যন্ত সংগ্রহ কর্ত্তে পারে না।" শেঠজী বলিলেন, "তবে ওটাকে সরাইয়া দেওয়া যাক্ না।" নটবর বলিলেন, "কাজ কি! কৃষ্ণের জীব আছে, থাক্; যত দিন আমি আছি, ততদিন চালিয়ে নেব।" শেঠজী বলিলেন, "নটবর! তুমিই মানুষ। এ যুগে তুমিই আদর্শ সম্পাদক।"

এইবার এক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল,—এ যুদ্ধ লইয়া বম্বে অঞ্চলে মহা-হুলস্থূল বাধিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে সম্মতি-আইনের হুজুক এখনও সকলের মনে আছে। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণের মানহানির মকদ্দমা লইয়াও বম্বে প্রদেশে সেই রূপ মহা বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।

বম্বে হাইকোর্টের কোন গুজরাতী উকীলের একখানি গুজরাতী সাপ্তা-

হিক পত্রিকা ছিল। পত্রিকাখানির নাম, 'সংস্কারক'। এই পত্রিকায় অনেক শিক্ষিত গুজরাতী প্রবন্ধ লিখিতেন; এমন কি, ইহা গুজরাতী শিক্ষিত সমাজের মুখপত্ররূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইত। 'প্রতিবিম্ব' 'সংস্কারক'কে চিরদিনই প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিত। 'সংস্কারক' যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই লিখিতেন; সম্পাদক দেশের কল্যাণের জন্য লেখনীধারণ করিতেন; নটবর নিজের জন্য লেখনীতে শান দিতেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্লজ্জের ন্যায় মন্দকে ভাল বলিতেন। কেহ প্রতিবাদ করিলে বলিতেন, "আমি লোকশিক্ষার ভার লইয়াছি,—আমার ব্রত মহৎ, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই ন্যায়সঙ্গত, সাধারণে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।" এ অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত না। 'সংস্কারক' নীরবে উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন। এই সময় বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণের বিরুদ্ধে একটি উৎকট ও অশ্লীল অভিযোগ 'সংস্কারকে' প্রকাশিত হইল। আমরা জানি, এই সংখ্যা 'সংস্কারকে'র পঞ্চাশ হাজার কাপি একদিনে বম্বের রাজপথে বিক্রীত হইয়াছিল। শীঘ্রই হাইকোর্টের সেশনে মানহানির মামলা আরম্ভ হইল।

শেঠজীর মুখে লাল পড়িতে লাগিল, কি করিলে 'সংস্কারকে'র প্রতিপত্তিটুকু আত্মসাৎ করা যায়?—নটবর বলিলেন, "গালি দিয়া।" শেঠজী বলিলেন, "গালাগালিতে উহারা অটল; উহাদের মধ্যে আবার প্রার্থনা-সমাজের দুই একটি লোকও আছে, হঠাৎ রাগিলে তাহারা নালিশ না করিয়া লাঠী তুলিয়া মারিতে আসে। তুমি রোগা মানুষ, উহাদের লাঠী বরদাস্ত করিতে পারিবে না। আমি বলি এক কাজ কর, বল, ধর্ম্ম নষ্ট হইল, যদি বল্লভাচার্য্যের প্রেমলীলা সংহার করিবার জন্য আইন হয়,তবে দেশে ভদ্রলোকে আর বাস করিতে পারিবে না।"

একটা খেই ধরাইয়া দিতে পারিলে নটবর 'গুলি'র শেষ মুড়া পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিতে পারিতেন। প্রতি সপ্তাহে, "ধর্ম্ম নষ্ট হইল", "স্বর্গের পথ রুদ্ধ হইল", "প্রলয়কাল উপস্থিত।" ইত্যাদি শীর্ষক লোমহর্ষণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। গুর্জ্জরভূমি নটবরের লেখনীপ্রতাপে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নটবর দেশের মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিতেন, বল্লভাচার্য্যের মতের সমর্থন করিয়া বহুস্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ তাঁহার পূজা যোগাইতে লাগিল। নটবরের সাংসারিক অস্বচ্ছলতা একেবারে ঘুচিয়া গেল; গৃহিণীর অলঙ্কার হইতে লাগিল।

এ সংবাদে শেঠজীর চোখ ফুটিল; একদিন শেঠজীর মুখও ফুটিল।—শেঠজী বলিলেন, "টাকাগুলা একা খাইও না, অধর্ম্ম হইবে।" নটবর বলিলেন, "আমি ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছি; আহার নিদ্রার সময় নাই; প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে হাতে কড়া পড়িয়া গেল;—আর আপনি বলেন, আমি টাকা খাইতেছি। আর কেহ এ কথা বলিলে আমি সহ্য করিতাম না।"

শেঠজী দেখিলেন, সম্পাদকের ক্রোধ হইয়াছে, এমন গুণের সম্পাদক চলিয়া গেলে আর মিলিবে না। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমাদের লেখা খুব বলিহারি রকমের হচ্চে।"

ইহার অল্পদিন পরেই, কি জন্য বলিতে পারি না, গোস্বামি-শিষ্যেরা হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। হাইকোর্টে তাঁহাদের পরাজয় হইল। 'সংস্কারকে'র প্রতিপত্তি তিনগুণ বাড়িয়া গেল। নটবরের ধর্ম্মরক্ষার বক্তৃতা শিকায় উঠিল। তখন সে নিজের স্বার্থসাধনের জন্য ভিন্ন দিকে হাত বাড়াইল। কুলমহিলা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া কাগজে ছড়া লিখিতে লাগিল। তাহাতে একটি ফৌজ-দারীর সম্ভাবনা ঘটিল। শেঠজী এবার আন্তরিক চটিয়াছিলেন। তিনি দেখি-লেন, এ ব্যয়ভার বহন করা সহজ নহে। তিনি নটবরকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নটবর ক্ষমা প্রার্থনা করিল; কিন্তু অপমানিত ব্যক্তিগণ ক্ষমা করিলেন না। শেঠজী শেষে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন, কিন্তু নটবরকে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিতে হইল।

৪

নটবর হঠাৎ মধ্যাকাশ হইতে যেন একেবারে নিবিয়া গেলেন। শেঠজীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুগণকে ধরিতে লাগিলেন। কিন্তু শেঠজী আর সন্তুষ্ট হইলেন না। কেহ বেশী পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিতেন, "যেতে দাও ভাই! ও কথা, আমি খবরের কাগজ উঠাইয়া দিব। উহা ছাড়িয়া বরং " * * * " তৈলের ব্যবসায় করিলে অধিক লাভ আছে।"

নটবর ধীরে ধীরে খাটে আসিয়া শুইলেন। মেয়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! অসুখ কচ্চে কি?" নটবর বলিলেন, "হুঁ।"

মেয়ে মাকে বলিল, "বাবার অসুখ।"

সম্পাদক-গৃহিণী কক্ষে আসিয়া সাগ্রহে স্বামীর ললাট স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ?"

"অসুখ নয়। একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। স্বপ্নটা ভাঙিয়া গিয়াছে।—চাকরীটি খোয়াইয়াছি; কি খাই এখন, তোমাকেই বা কি খাওয়াই?"

সম্পাদক-গৃহিণী বহুমুক্তাবিভূষিত স্থূল নথটি নাড়িয়া বলিলেন, "চাকরী গিয়াছে! যাক্, আপদ গিয়াছে। আমি ভাবছিলাম, কবে আমার প্রাণনাথকে সরকারের লোকেরা হমিলাট সাহেব করে নিয়ে যাবে। যাক্, ভালই হয়েছে, চল, তল্পি তাল্‌পা বেঁধে দেশে যাই। তাড়াতাড়ি কোলাবা ষ্টেশনে পঁহুছিলেই বাঁচি! দেশে গিয়া আবার টোল খুলিও। অধ্যাপকের ছেলের কি সম্পাদক হওয়া সাজে? গরুর পিঠে জিন কোন কালেই শোভা পায় না।"

নটবর নরোত্তম অতঃপর আহম্মদাবাদে ফিরিয়া গিয়া এক টোল খুলিয়াছেন। কিন্তু এতদিনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই, টোলে এখন শাস্ত্রচর্চ্চার পরিবর্ত্তে রাজনীতির আলোচনা চলে, এবং কি করিয়া গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বিরাগ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের সুখ ও সুবিধায় নিয়োগ করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া তর্ক হয়। দুই পক্ষের এক পক্ষ বলে, "যোগবলেই আমরা বিশ্বজয় করিব।" আর এক পক্ষ বলে, "আমরা অশ্রুজলে বিশ্বপ্লাবন করিব,—তাহার পরই প্রলয়!" নটবর মধ্যস্থ, তিনি বলেন, "তৈলই বিশ্বজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও অমোঘ উপায়!"

নবীন গল্পলেখক।

বেদান্তদর্শন।

বেদের দুই ভাগ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত, বা চরম ভাগ। সেই জন্য ইহার সাধারণ নাম বেদান্ত।

পূর্ব্বমীমাংসা যেমন কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ড বেদের (বেদান্তের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপৃত। সেই জন্য, এ দর্শনের অপর নাম উত্তরমীমাংসা। ব্রহ্মই বেদান্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য। সেই জন্য, ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ। এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশরতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পাণিনির ৪।৩।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক ভিক্ষু-সূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারাশর্য্য যে পরাশরতনয় বেদব্যাসেরই সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ ব্যাস পারাশর্য্যের উল্লেখ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, 'ভিক্ষু-সূত্র' বেদান্তদর্শনেরই নামান্তর। কারণ, প্রাচীনকালে বেদান্তদর্শন সংসারত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল। চতুর্থাশ্রমীর পারিভাষিক নাম ভিক্ষু। অতএব, বেদান্তদর্শনকে ভিক্ষু-সূত্র বলা অসঙ্গত নহে। এখনও দেখা যায়, দণ্ডী বৈদান্তিকেরা সংসারীকে বেদান্ত-দর্শন অধ্যাপনা করিতে অনিচ্ছুক। অতএব, বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদান্তদর্শনে সর্ব্বসমেত ৫৫৬টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চতুষ্পাদ। প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়,—সমন্বয়; দ্বিতীয় অধ্যায়ের,—অবিরোধ; তৃতীয় অধ্যায়ের,—সাধন; ও চতুর্থ অধ্যায়ের—ফল। প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য দার্শনিক মতের দোষপ্রদর্শন-পূর্ব্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত-মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের (সগুণ ও নির্গুণের) লক্ষণনির্দ্দেশপূর্ব্বক মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি, এবং সগুণ ও নির্গুণের উপাসনার ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্য, রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যই যথাক্রমে অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর নিকট আদরণীয়। শারীরকভাষ্যের উপর আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা 'ভামতী' দার্শনিকসমাজে সমাদৃত। সুদর্শনের 'শ্রুতপ্রকাশিকা' শ্রীভাষ্যের সুপ্রচলিত টীকা। বেদান্তদর্শনের অন্যান্য ভাষ্য-কারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর, যাদব মিশ্র, নিম্বার্ক, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও

অভাব নাই। নীলকণ্ঠের 'শৈবভাষ্য', 'বেদান্তপারিজাত' নামক সৌরভাষ্য ও বলদেবের 'গোবিন্দ' (বৈষ্ণব) ভাষ্যের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেদান্তদর্শনের যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈত মত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য। কিন্তু প্রধান হইলেও তাঁহারা ঐ ঐ মতের প্রবর্ত্তক নহেন। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক; কিন্তু শঙ্করের পূর্ব্বেও অদ্বৈত মত সুপ্রচলিত ছিল। তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরকভাষ্যে তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্য ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ও সূতসংহিতায় অদ্বৈত মতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে।*

এইরূপ রামানুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক মনে করা সঙ্গত নয়। † কারণ, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার 'শ্রীভাষ্য' যে বোধায়নের প্রাচীন ভাষ্যের অনুসরণ, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী ও যমুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। তবে

* Shankara's is one only of the many traditional interpretations of the Sutras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.—Max Muller's Indian Philosophy page 284.

† In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita:—a vritti by the great Rishi Bodhayana, a Vasya of the Brahma Sutras by Dramiracharjya and a vartika by Tankacharjya. There were besides other works by Bharuchi, Guhadeva and other Acharjyas but these too having perished through the destroying agency of time, the siddhitraya &c. were composed by the venerable Yamunacharyja in order to explain the purport of the lost treatises. In these viz siddhitraya &c. were controverted the vashya and other writings of Bhartri × × Subsequently the illustrious commentator and holy sage Sri Ramanujachajya × × advanced the knowledge of the Visista dwaita in the world by the composition of his great work called the sri vashya—M. M. Ram Misra Shastre's preface to his edition of Vedartha Sangraha.

যমুনাচার্য্য-কৃত 'সিদ্ধিত্রয়' সম্প্রতি মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অন্যান্য গ্রন্থেরও উদ্ধারসাধন হইতে পারে। এইরূপ আচার্য্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রবাহিত ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মত অতি সুপ্রাচীন। *

বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুগম করিবার জন্য রামানুজ বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, গদ্যত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর উপজীব্য রহিয়াছে। এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ততত্ত্বসার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত মত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, চিৎসুখী বা তত্ত্বপ্রদীপিকা, পঞ্চপাদিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলি ও বেদান্তসার সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে; অথচ উভয় মতই একই বেদান্তসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই প্রমাণ-স্থলে উপনিষৎসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্যদিগের এই মত-দ্বৈধে মূলসূত্র অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুরূহ। সেই জন্য বেদান্তদর্শনের বিবরণস্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অদ্বৈত মত।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বেদান্তদর্শনেরও ভিত্তি দুঃখবাদ। বেদান্তদর্শনের

---

* There is evidence to shew that it (the Vishistadwaita school) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times—Preface to Rungacharya's Translation of Sree bhasya.

যথোদিত-ক্রম-পরিণতঃ ভক্তৈকলভ্য এব ভগবদ্-বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি-ভারুচি-প্রভৃতিভিরবগীতঃ * * * শ্রুতিনিকরনিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ।

[রামানুজ-কৃত বেদার্থসংগ্রহ ; ১৪৮ পৃষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্য।

The individual philosopher is the month piece of tradition and that tradition goes back farther and farther the more we try to fix it chronologically.—Indian Philosophy. page 245.

মতেও সংসার দুঃখময়। শঙ্করাচার্য্য সংসারকে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল আবর্ত্ত-বহুল নক্র-কুম্ভীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে। * ইহা হইতে তাহার উদ্ধারের কি উপায় নাই?

অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম;—

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্।—বেদান্তসার।

শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত। †

এই মতের সমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতিবাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্রুতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥—ব্রহ্মবিন্দু ১২।

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবম্ অজোঽয়ম্ আত্মা॥

'একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একরূপ ও বহুরূপে দৃষ্ট হন।'

'যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন, উপাধিকৃত তাঁহার এই ভেদ; সেইরূপ দ্যুতিমান্ অনাদি পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।'

সেই জন্যই বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— 'তুমি হও তিনি', 'এই আত্মা ব্রহ্ম', 'আমিই তিনি', 'আমি হই ব্রহ্ম'— ইত্যাদি। অর্থাৎ, জীব কেবল যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা নহে;—

* 'অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।—বেদান্তসার;—১১।

† বাঙ্‌মনসাতীতম্ অবিষয়ান্তঃপাতি প্রত্যগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং ব্রহ্ম।

The true Self, according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms.—Max Muller's Indian Philosophy. p. 207.

জীবই ব্রহ্ম। * জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় লিখিয়াছেন ;—

জীবাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্ ॥—মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।১৩।
মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ ন তথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানোহি মর্ত্ততাম্ অমৃতো ব্রজেৎ ॥—ঐ ৩।১৯।
অজম্ অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে,
ন পরমার্থতঃ; তস্মান্ন পরমার্থসৎ দ্বৈতং।—শঙ্কর।

অর্থাৎ, 'জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দার্হ। তবে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়িক মাত্র। ভেদ যদি বাস্তব হইত, তবে যিনি অমৃত, তিনি মর্ত্ত্য হইতেন।' তবে যে ভেদের প্রতীতি হয়, তাহা উপাধি-কৃত। † কোষরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই জীব বলা হয়।

---

* অদ্বৈতবাদীরা স্থানে স্থানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ ঃ—

স্বমরীচিবলোদ্ভূতাজ্জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম! ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ ॥—
যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ১৪।২২।

মেরুমন্দরসঙ্কাশা বহবো জীবরাশয়ঃ।
উৎপত্যোৎপত্যসংলীনাস্তস্মিন্নেব পরে পদে ॥—ঐ, ঐ, ১৫।৮।

গৌড়পাদ কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে (যেহেতু আকাশ অখণ্ড বস্তু), সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে।

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥—
মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৭।

† Sankara, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badarayana also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva), * * With him the soul's reality is Brahman, and Brahman is one only.

[Max Muller's Indian Philosophy, page 244].

কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।—পঞ্চদশী—৩।৪১। *

কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরুপাধি; অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উপাধিমুক্ত।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং।

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যত্রাপীহ ব্রহ্মলক্ষণং।—পঞ্চদশী; ৩।২৮।

'জীব স্বপ্রকাশ; অজ্ঞেয় অথচ অপরোক্ষ; 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত' এই ব্রহ্মলক্ষণ জীবেও বিদ্যমান'। কারণ জীব ও ব্রহ্মে নামমাত্র প্রভেদ, যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ।

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতেন হি।

ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে নহি ক্বচিৎ।—পঞ্চদশী; ৬।২৩৬—৭।

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসারদুঃখ কেন? কিসের জন্ম সে সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়? কেন সে সংসার-অনলের দাব-দহনে সন্তপ্ত হয়? অদ্বৈতবাদীরা ইহার উত্তরে বলেন যে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইলেও অবিদ্যাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়।

এবং পরমার্থতোঽবিকৃতম্ একরূপমপি সদ্ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ভজতে ইব উপাধি-ধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্।—৩।২।২০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম্ম—জীব (আত্মার) ধর্ম্ম নহে। কিন্তু জীব দেহসংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী রোগী শোকী মনে করে।

গৌড়পাদ বলিয়াছেন;—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।

তথা ভবত্যবুদ্ধানাম্ আত্মাঽপি মলিনং মলৈঃ।

'যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ অজ্ঞানেরা আত্মাকে মলা-মলিন ভাবে।'

সেই জন্ম পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন, যে মহেশ্বরের যে মায়া, তাহার মোহ-শক্তিবলে জীব মোহিত হয়; এবং সেই মোহের বশে ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া দেহ-সংলগ্ন জীব শোকের অধীন হয়।

---

* এই মর্ম্মে গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় লিখিয়াছেন;—

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।

আকাশে সংপ্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি।—মাণ্ডুক্যকারিকা; ৩।৪।

দেহাদিসংঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ

জীবানাম্ ইহাত্মনি প্রলয়ঃ।—শঙ্কর।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি। পঞ্চদশী ৪।১১—২।

'এই অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা, সুখী দুঃখী ইত্যাদি সংসারজড়িত মনে করে; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম। রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম, সেইরূপ মর্ম্মান্তিক ভ্রম।

অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসারসম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা।—বেদান্তসার।

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি? অবিদ্যাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিদ্যার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে। * জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে। অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়।

গৌড়পাদ বলিতেছেন;—

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥—মাণ্ডুক্যকারিকা; ১।১৬।

'অনাদি মায়াবশে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, সেই স্বয়ং জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু'।

জীব মুক্ত-স্বভাব—পূর্ব্বাপর মুক্ত। তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা কল্পনা-মাত্র, বাস্তব নহে। সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন;—

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

---

* জীব আত্মবিস্মৃত। সে নিজেকে নিজে জানে না। যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন;—

হেতুবিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ॥—উৎপত্তিপ্রকরণ; ৯৫।৮।

জীবগণ যে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি।

This is indeed the real object of the Vedanta philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been namely Brahman— Max Muller's Indian philosophy page 236.

This primeval Avidya is left un explained it is not to be accounted for, as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman it has to be accepted as existent but it differs from Brahman in sofar as it can be destroyed by Vidya.—Max Muller's Indian Philosophy p. 225.

'বস্তুতঃপক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই, সাধনা নাই ও মুমুক্ষা নাই।'

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চদশীকার লিখিয়াছেন,—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাং।—পঞ্চদশী; ৬।২৩৪।

'জীবের যে বন্ধ বা মোক্ষ, বাস্তবিক এ কথা শ্রুতিসিদ্ধ নহে।' সেই জন্য অদ্বৈত মতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তু। জীব স্বতই মুক্ত। তাহার পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনামাত্র। কারণ, জীব সর্ব্বদাই মুক্ত। এ কথা বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। "—কণ্ঠচামীকরবৎ"। তাঁহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল। শিশুর একদা ভ্রম উপস্থিত হইল যে, তাহার হার কে চুরি করিয়াছে। সে ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও হারের সন্ধান পাইল না। তখন তাহার এক আত্মীয় বলিয়া দিলেন যে, যে হারের অন্বেষণে তুমি পণ্ডশ্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই লম্বিত রহিয়াছে। তখন সেই অতি নিকটস্থ বস্তু, যাহাকে সে অতি দূরস্থ মনে করিয়াছিল, তাহাকে লাভ করিয়া সেই শিশু কৃতার্থ হইল। মুক্তিও এইরূপ। মুক্তি জীবের স্বভাব-সিদ্ধ। অথচ জীব নিজেকে সংসার-জালে আবদ্ধ ভাবিয়া হাহাকার করে। তখন সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দেন। তাহার ফলে তাহার অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এবং সে নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব উপলব্ধি করে।

অদ্বৈতবাদীরা এই তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এক সিংহশিশু ঘটনাক্রমে এক মেষের দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সে মেষ-সাহচর্য্যে ভ্রান্তিবশে নিজেকেও মেষ কল্পনা করিল, এবং মেষের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে জলাশয়ের ধারে লইয়া গেল, এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে মেষ নহে, সিংহ। তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহবিক্রমে হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল।

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ। জীব উপাধিসংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" —ঈশ্বরভাব হারাইয়া শোক মোহের অধীন হয়। যদি সদ্‌গুরু তাহাকে

বলিয়া দেন যে, 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এবং সে যদি বুঝিতে পারে, 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' তবেই তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হয়, এবং সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—মুণ্ডক উপনিষদ; ১।২।১২।

'সেই জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপস্থ হইবে।'

এই ব্রহ্ম, যাঁহার সহিত জীব ঐক্য উপলব্ধি করিবে, তাঁহার স্বরূপ কি?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন। একটি—নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ ভাব, অপরটি—সবিশেষ সগুণ ভাব। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবের স্বরূপ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কোন চিহ্নেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেই জন্য এই ভাবকে নির্ব্বিকল্প নিরুপাধি বলা হয়। এই ভাবের পরিচয়স্থলে শ্রুতি 'নেতি নেতি'—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশস্থলে নঞের অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্।—বৃহদারণ্যক; ৩।৮।৮।
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।—কঠ; ৩।১৫।
তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্।—
বৃহদারণ্যক; ২।৫।১৯।

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই। ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ
শ্রোত্রং তদপাণি পাদম্।—মুণ্ডক; ১।১।৬।

'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।'

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্য মগ্রাহ্য মলক্ষণ মচিন্ত্য
মব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।—মাণ্ডুক্য ; ৭।

'যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ; যিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত ; আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত, শিব, অদ্বৈত ;—তাঁহাকে তুরীয় বলে।'

সেই জন্য তাঁহাকে অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়।

এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে।—তৈত্তিরীয় ; ২। ৭।
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।—কঠ ; ৬। ১২।

তিনি বাক্যের, মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত। তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন ;—

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।—কেন ; ১।৩।

তাঁহার উদ্দেশে ইহাও বলা হইয়াছে,—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ
কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।—কঠ ; ২। ১৪।

'তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন, এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্য।'

সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্‌বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন।—মাণ্ডুক্যকারিকা ; ৩। ৩৬।

উপচার—ভাষান্তর দ্বারা ঈদৃশত্বনিরূপণ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অন্যান্য শ্রুতির উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্বিশেষভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই। সন্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ লিঙ্গাঃ। 'অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।

'ব্রহ্ম বিষয়ে দুইপ্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয় ; এক সবিশেষলিঙ্গ শ্রুতি ;

যেমন তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। অন্য, নির্ব্বিশেষলিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন।

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্মপ্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষ মেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য; ৩।২।১১।

অতএব, উভয়-লিঙ্গ-নির্দ্দেশ থাকিলেও, সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন। কারণ, উপনিষদ্-বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি) সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা বচনের লক্ষণের নির্দ্দেশের অতীত। কিন্তু শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায়। তিনি নিবিশেষের মত মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য নহেন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।—কঠ উপনিষদ্; ৩.১২।

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন'।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।—কঠ; ২.১২।

'অধ্যাত্ম যোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন'।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌লৃপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ; ৬।৯।

'তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়'।

এই সগুণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ্ নানা সুন্দর গম্ভীর মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং বৃ— ৫।১৩।

তিনি, নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।'

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।'

'তিনি অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান্।'

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কণীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়।—বৃহদারণ্যক; ৪।৪।২২।

'ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি; সাধুকর্ম্মের দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্মের দ্বারা অপচয় হয় না; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূত-পাল; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক-সেতু।'

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।
—মাণ্ডুক্য; ৬।

'ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান।'

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।—শ্বেতাশ্বতর; ৩।১৯।

'[তাঁহা]র হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন; পদ নাই, অথচ গমন করেন; চক্ষু নাই, অ[থ]চ দর্শন করেন; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই মহান্ পরম পুরুষ বলে।'

এষ [আ]ত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।—ছান্দোগ্য; ৮।১।৫।

'এই আত্মা অপাপ-বিদ্ধ, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোক-হীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন; ইনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।'

এই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র—ইঁহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছু নহেন। * সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন,—

* The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience
— Maxmuller's Indian Philosophy, p. 207.

মায়াখ্যায়া কামধেনো র্বৎসৌ জীবেশ্বরা বুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং ত্বদ্বৈত মেব হি ॥—পঞ্চদশী ; ৬,২৩৬।

'মায়া-রূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর; অর্থাৎ, উভয়ই মায়িক অবস্তু। তদ্দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব।'

যেমন ব্রহ্ম মায়া-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ তিনি অবিদ্যা উপাধিতে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন। এ প্রতীতিও অলীক।

সত্যং জ্ঞান মনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বস্তু জীবত্বম্ উপাধি দ্বয় কল্পিতং।—পঞ্চদশী ; ৩।৩৭।

'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বস্তু, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত (অবস্তু)'।

উপাধির পরিহার করিলে আর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকেন না।

মায়া বিদ্যে বিহায়ৈবং উপাধী পর জীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে।— পঞ্চদশী ; ১।৪৮।

ব্রহ্ম, বস্তুতঃ, নিরুপাধিক। যখন তাঁহাতে মায়া শক্তির উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন কোষ উপাধির যোগ হয়, তখন তিনি জীব-পদ-বাচ্য হয়েন।

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
তৎশক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥
কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ॥—পঞ্চদশী ; ৩,৩৮।৪০।৪১।

এই যে মায়া—ইহা ব্রহ্মের শক্তি। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—'শক্তি-শক্তি'-মতোরভেদাৎ

It sometimes seems as if Shankara * * admitted two Brahmans also; Shaguna and Nirguna;—with or without quality; but this would again apply to a state of Nescience or Abidya only * * The true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified, * * In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). * * Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as everything else exists, as phenominally only, not as absolutely real. * * When personified by the power of Abidya or Nescience he rules the world, though it is a phenominal world and determines though he does not cause rewards and punishments. Ibid, p. p. 220 to 223).

শঙ্কর। অতএব, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; কারণ, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদীরা মায়ার পরিচয়স্থলে বলেন,—

সদসত্ত্যাম্ অনির্ব্বাচ্যা মিথ্যা ভূতা সনাতনী।

'মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে ;—সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়।' ইহার স্বরূপ নিরাকরণ করা যায় না। সেই জন্য বেদান্তসার বলিতেছেন,—

সদসত্ত্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।

'মায়া ভাবরূপী কোন কিছু—ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে'। *

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ; ২।১।১।

'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'।—বৃহদারণ্যক ; ৩।৯।২৮।

ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের-স্বরূপ লক্ষণের নির্দ্দেশ করিতেছে। আর তাঁহাকে যে 'তজ্জলান্ (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। "তজ্জলান্" অর্থে—তজ্জ, তল্ল, তদন ;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ; ৩।১।

'যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।'

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদারণ্যক ; ২।১।২০।

'যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু উদ্গিরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।'

'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ব্রহ্মসূত্র ; ১।১।২।

এই সূত্র দ্বারা বেদান্তদর্শন তটস্থ লক্ষণেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।' বলা বাহুল্য, ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ। কারণ, পরব্রহ্ম যখন শক্তিযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ইত্যাদি লক্ষণের লক্ষণীয় হন।

তবে কি অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে, যাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে? অদ্বৈতবাদীরা জগতের সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু;—আর সমস্তই অসৎ-অবস্তু। ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,—'কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই—অন্য কিছু নহে।' কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্;" অর্থাৎ, ব্রহ্মই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই অসৎ। বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, পরশ্বও থাকিবে না। যাহা গত কল্য ছিল, তাহা আজ নাই। এই-রূপ, যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, সুষুপ্তিতেও থাকিবে না। অতএব, তাহা অসদ্ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল কালে সকল অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, ছিলেন, এবং থাকিবেন। অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।
একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য; ৬।২।১।

'আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন।'

আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ।—ঐতরেয়; ১।১।

'আদিতে এক আত্মাই ছিলেন।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।—নৃসিংহতাপনি; ৭।

'ব্রহ্মই এই সকল।'

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য; ৭।২৫।২।

'আত্মাই এই সমস্ত।'

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহদারণ্যক; ৪.৪।১৯।

'এখানে ভেদ নাই, সবই এক।'

যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেতাশ্বতর; ৩.৯।

'যাঁহার পর অপর কিছুই নাই।'

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এবেদম্ সর্ব্বম্ * *। আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাদ্ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য; ৭-২৫।১-২।

তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে; তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে; তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে; এ সমস্তই তিনি। আত্মাই অধে, আত্মাই উর্দ্ধে; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে আত্মাই উত্তরে; যাহা, কিছু সমস্তই আত্মা।'

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত-ভেদ-রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত,—এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরুপাধি,—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত,—এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য। *

সেই জন্য যোগবাসিষ্ঠ (উৎপত্তি প্রকরণে) বলিয়াছেন,—"দেশ, কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন; জাতও নহেন, অজাতও নহেন; সৎও নহেন, অসৎও নহেন, ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্ত নহেন।" তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চিরসমন্বয়, সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান। †

বিপত্নীক।

১

নলিন বাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া আরাম করিতেছিলেন। নলিনের পুত্র বিজয় বাতায়নপথে পিতার তৎকালীন অবস্থা একবার দেখিল।

নলিন বাবু পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে র‍্যা?"

সাত বৎসরের বালক সভয়ে উত্তর করিল, "আমি বিজয়।"

নলিন বাবু। কি দরকার?

বিজয়। মা'র জ্বর হয়েছে।

দুই দিন রাত্রিজাগরণের পর নলিন বাবুর ঘুম আসিতেছিল।

---

* The three ultimate categories of time, space and causality. Time = কাল, Space = দেশ এবং causality = নিমিত্ত, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

† সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

নলিনবাবু বলিলেন, "কখন?"

বিজয়। আজ তিন দিন।

নলিন বাবু। ও জ্বর কিছু নয়। তুই থার্ম্মোমিটার্ দিয়া কত ডিগ্রী দেখিয়া আয়।

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নলিন বাবু বিরক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ পড়িয়া রহিলেন।

নলিন বাবু তিন দিন বাড়ী আসেন নাই। কোথায় ছিলেন, তাহা সকলে জানিত না। আজ প্রত্যূষে রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া নলিন বাবু বৈঠকখানার এক পার্শ্বে নির্জ্জনতার সুখভোগ করিতেছিলেন।

নলিন বাবুর একমাত্র সন্তান বিজয়। হঠাৎ পিতার একখানি জমিদারী পাইয়া নলিন বাবু বি. এ. পাশ্ করাটা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নলিন বাবু কলিকাতায় স্থায়িরূপে তিন বৎসর আমোদে আহ্লাদে যাপন করিলেন।

পয়সা কড়ি প্রচুরপরিমাণে থাকিলে ভাল মন্দ উভয় প্রকারেরই বন্ধু জুটিয়া থাকে। নলিন বাবুর বন্ধু উমেশ একদিন বলিল, "নলিন, স্ত্রীকে ছাড়িয়া তোমার কলিকাতায় থাকাটা বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার স্বভাবটা পশুর মত দাঁড়াইতেছে।"

একটু বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে সত্যকথাটা মনে আঘাত করিবার স্থান পায়, কাজেই কথার খাতিরে স্ত্রী সরলা ও পুত্র বিজয়কে স্বদেশ হইতে লইয়া আসিয়া নলিন বাবু কলিকাতায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিলেন।

ইহাতে নলিন বাবুর আত্মত্যাগটা কত দূর অসাধারণ রকমের হইয়াছিল, তাহা তাঁহার তৎসাময়িক বন্ধুগণ সকলে বুঝিতে পারে নাই। সাহিত্যবীর ও কর্ম্মবীরের গৌরব সচরাচর বহুকাল পরে ইতিহাসেই স্থান পাইয়া থাকে।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় থার্ম্মোমিটার লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল। বিজয় পিতাকে যমের মত ভয় করিত।

চক্ষু দুটি কিঞ্চিৎ খুলিয়া নলিন বাবু দেখিলেন, থার্ম্মোমিটারের নলে পারদ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

নলিন বাবু বলিলেন, "ম্যালেরিয়া জ্বর ঐরূপ হইয়া থাকে। তোর মাসীমাকে ও বাড়ী হইতে ডাকিয়া আন্। আর ভুবন ডাক্তারকে খবর দে।"

সরলা নলিনের স্ত্রী। সরলা শিক্ষিতা, সুশীলা ও সুন্দরী। তবুও সরলা নলিনচন্দ্রের মন পায় নাই।

মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব একটু না ফুটিয়া উঠিলে তাহা পাওয়া যায় না। নলিনের যৌবনকালে সেটা ফুটে নাই।

প্রতি বৎসর পূজার ছুটীর সময় নলিন বাবু বাড়ী আসিয়া আমোদপ্রমোদে, গান বাজনায় ও শিকারে কাটাইতেন। কখনও সময় পাইলে স্ত্রীলোক-দিগের স্নান করিবার ঘাটের নিকট বজরা লাগাইয়া বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে হার্মোনিয়ম বাজাইতেন। নলিন বাবুর ঈদৃশ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় অনেক স্ত্রীলোকই পাইয়াছিল, কেবল সরলার ভাগ্যে ঘটে নাই।

অন্দরমহলে গেলে নলিন বাবু নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িতেন। দুঃখিনী সরলা স্বামীর ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানি দেখিয়াই কৃতার্থ হইত। নলিন বাবু কলি-কাতায় থাকিলে সরলা নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার দুই একখানি জীর্ণ পুরাতন পত্র অতি সাবধানে খুলিয়া একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিত। সেগুলি যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে নলিনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপে শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত কাটিয়া যাইত, এবং তাহার সঙ্গে সরলার দুঃখময় জীবনও কাটিত। সরলার সুখের মধ্যে সে বিজয়কে পাইয়াছিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া মাতা অনেক দুঃখ ভুলিয়া যায়। সরলা সকালে বৈকালে বিজয়কে পড়াইত, এবং বিজয় ঘুমাইলে, স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত।

সরলার শ্বশুর প্রাণধন মুখোপাধ্যায় পুত্রবধূকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার ভয় ছিল যে, তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী থাকিবেন না। মরিবার সময় তিনি পুত্র নলিনচন্দ্রকে দেখিতে পান নাই। সেদিন নলিনের কলিকাতায় প্রবে-শিকা পরীক্ষার দিন।

বৃদ্ধ মৃত্যুকালে সরলাকে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, "মা, তুমি দুঃখ করিও না। ঈশ্বর বুঝি স্ত্রীলোককে দুঃখ সহিতেই গড়িয়াছেন। স্ত্রী ঈশ্বরের দৈবী প্রকৃতি। যাতে নলিন একটু ভাল হয়, তাহাই করিও।"

তার পর সরলার জ্বর হইল। সে জ্বর সারিল, আবার হইল। সরলা কলিকাতায় আসিয়া নলিনকে দেখিয়া কিছুদিন ভাল ছিল। কিন্তু নলিনচন্দ্র পুনরায় পূর্ব্ব অভ্যাস অবলম্বন করিলে, সরলা আবার জীবনকুটীর অন্ধকারময় দেখিল। আবার সরলার বিষম জ্বর হইল।

ভুবন ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

নলিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

ডাক্তার। আপনি একটু কাছে থাকুন।

নলিন। যদি প্লেগ হয়?

ডাক্তার। তথাপি আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা উচিত।

নলিন। আচ্ছা দেখা যাবে এখন।

ডাক্তার চলিয়া গেল।

নলিনচন্দ্র সরলার কাছে গেলেন না।

সরলার ছোট বোন বিমলা মামার বাড়ী হইতে দিদির কাছে আসিল। উভয়ের পিতামাতা ছিল না। পিতার অর্থাভাববশতঃ বিমলার বয়স বেশী হইলেও বিবাহ হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর বিমলার ভার তাহার মাতুল লইয়াছিলেন। বিমলার মাতুলালয় কলিকাতায়।

বিমলা অতি সুশ্রী। লেখাপড়া শিখিলে বড় ঘরে পড়িতে পারে, এই আশায়, বিমলার মাতুল বিমলাকে বেথুন স্কুলে পড়াইতেন। বিমলা ষোল বৎসর বয়সে ফাষ্টআর্টস্ পাশ করিয়াছিলেন।

বিমলার স্বভাব স্থির, শান্ত, দৃঢ়। বিমলাকে কখনও কেহ কাঁদিতেও দেখে নাই, হাসিতেও দেখে নাই। হৃদয় স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ থাকিলেও বিমলা তাহা কাহাকেও কখনও জানিতে দেয় নাই। বিমলার যেমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য ছিল, তেমনই একটা স্বভাবগত অমানুষিক তেজ ছিল; সুতরাং সকলেই বিমলাকে একটু ভয় করিত।

বিমলা গাড়ী হইতে নামিয়াই সরলার ঘরে গেল।

বিমলা বলিল, "দিদি, তোমার কি হয়েছে?"

বিমলা জ্বরতাপ দগ্ধ কোমল ওষ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বিমল, এই আমার শেষ।"

বিমল। মুখুর্য্যে মহাশয় কোথায়?

সরলা চখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি বাহিরে বোধ হয়।"

বিমলা। তিনি দেখিতে আসেন নাই?

সরলা। বিমল! তিনি আমাকে কখনও বাঁচিয়া থাকিতে ভালবাসিবেন না। মরিলে যদি বাসেন। বিমল! ঈশ্বর করুন, সেই দিন যেন আজ হয়। আমার কপালে তোমার বিবাহটাও দেখা হইল না, ইহাই কেবল দুঃখ রহিয়া গেল।

সরলা আবার কাঁদিল। উভয় ভগ্নী আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্গস্থ জনক-জননীর কথা কহিল।

রাত্রি দুইটার সময় সরলা বিজয়কে ডাকিয়া বলিল, "বিজয়! তোকে তোর মাসীমার হাতে দিয়া যাইতেছি।" বিমলা বিজয়কে কোলে লইয়া অধীরভাবে চুম্বন করিল।

বিজয় কাঁদিল। বিমলা বুদ্ধিমতী। বিমলা দৃঢ় পাষাণের বাঁধ বাঁধিয়া শোকের স্রোত হৃদয়দ্বারে রুদ্ধ করিল।

তাহার পর দুই দিন ধরিয়া অনেক ডাক্তার আসিল, অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইয়া গেল। বিমলা ঘুমাইল না, আহার করিল না, কেবল অনিমেষনয়নে সরলার পার্শ্বে বসিয়া ভগ্নীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল।

সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে নলিনবাবু আসিলেন। বিমলাকে নলিনবাবু অনেক দিন দেখেন নাই। বিমলার অসীম সৌন্দর্য্য ও অঙ্গমাধুরী লক্ষ্য করিয়া নলিন বাবু বারংবার মুগ্ধনয়নে তাহার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

নলিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা, তুমি নাকি এল্. এ. পাশ করেছ ?"

বিমলা কেবল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ভগিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

যতক্ষণ সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নলিন বাবু বিমলাকে দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ সরলা দুইটি নির্ব্বাণোন্মুখ চক্ষুর জ্যোতি স্বামীর মুখে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার নিকট সংসারে শেষ বিদায় লইতেছিল। বিমলা সেই চক্ষু দুইটির ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ বুঝিতেছিল।

সরলা অজ্ঞান হইয়া গেল। মুখে কি কথা বলিতে চাহিতেছিল, তাহা আর বলিতে পারিল না। তাহার পর সংসারের একটি সুবাস বহিয়া কোথায় গেল, কেহ জানিল না। একটি স্বর্গের মন্দির জগৎ হইতে স্থানভ্রষ্ট হইল। ঈশ্বরের একটি মধুর জ্যোতি চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল।

সন্ধ্যার তারকাগুলি মলিন হইয়া গেল। সরলা যে আর নাই, তাহা বিমলা বুঝিয়াছিল। বিমলা আর থাকিতে পারিল না। তীব্র কঠিন স্বরে নলিনচন্দ্রকে বলিল, "আপনি একবার ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকুন!"

নলিন বাবু হুকুম তামিল করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। তখন বিমলা ভগ্নীর মৃতদেহ কোলে জড়াইয়া ধরিল, এবং অতি ভগ্ন ও শোকার্ত্ত স্বরে অন্তরীক্ষে চাহিয়া বলিল, "নাথ! তোমার জগতে কি ধর্ম্ম নাই? তবে তুমি কে?"

আহত ফণিনীর ন্যায় বিমলা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার ভূমিতে লুটাইল। তখন সরলার চিরসাধের বিজয় ঘরে আসিয়া ডাকিল, "মা, বিজয়া-দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছি!" সে দিন দশমী। তখন মহাশক্তির প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বঙ্গসন্তান ঘরে ফিরিতেছিল।

বিমলার তাহা মনে পড়িল। বিমলা বলিল, "বাবা! আমার কোলে আয়!"

বিমলা বিজয়কে কোলে করিয়া মৃতদেহের শীতল চরণ দুইটিতে মস্তক স্পর্শ করিল। তার পর বিমলা অধীর হইয়া কাঁদিল। জীবনে সেই এক দিন বিমলা কাঁদিয়াছিল। বিজয় বুঝিতে পারিল।

অনেকক্ষণ পরে বিজয় বলিল, "মা বুঝি আর নাই?"

বিমলা স্থিরভাবে বলিল, "না।"

বিজয়। তবে কোথায় যাব?

বিমলা। তোমার বাবার কোলে কখনও যাও নাই?

বিজয়। না।

বিমলা। এইবার যাবে।

বিজয়। বাবা, লইবেন না।

বিমলা। আমি লইয়া যাইব।

বিজয় আর একবার ভগ্নহৃদয়ের ব্যথা সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিল। গৃহের আলোক ক্ষীণতর হইয়া আসিল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। অনেক ক্ষণ পরে বিমলা বলিল, "বাবা! কাঁদিতে নাই। কাঁদিও না। কাঁদিলে মাকে আর দেখিতে পাইবে না।"

বিজয়। মাকে আবার দেখ্‌ব?

বিমলা। নিশ্চয়। আমার কথা শুনিও; তাহা হইলে আমরা দুই জনেই তাঁকে দেখিতে পাইব।

সরলার যথারীতি সৎকার হইয়া গেল। বিমলা বিজয়কে লইয়া মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। বিমলার স্নেহে বিজয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বিজয়ের বিশ্বাস, মাসীমার কথা শুনিলে তাহার মা ফিরিয়া আসিবে। বিজয় শ্লেট ও বহি একত্র বাঁধিয়া স্কুলে যাইত; মাতার নিকট যাহা পড়িয়াছিল, সেই পুরাণো পড়া বিমলাকে শুনাইত। বিমলা বিজয়কে নূতন পড়া দিত, এবং নূতন কথা শিখাইত।

বিজয় অনেক শিখিল। বিজয় বিমলার সর্ব্বস্ব। বিজয়কে মানুষ করিতেই বিমলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হৃদয়ের যত স্নেহ, যত ভালবাসা, যত যত্ন, যত স্বার্থত্যাগ, বিমলা বিজয়ের উপরেই ন্যস্ত করিল।

বিমলার উন্নত চরিত্র, অসাধারণ স্নেহ, বাৎসল্য ও সুশিক্ষায় স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণের মুখ উজ্জ্বল হইতে লাগিল।

অনেক ধনী জমীদার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিমলার পাণিগ্রহণের জন্য বিমলার মাতুলের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বিমলার একই কথা, "না।"

এক বৎসর কাটিয়া গেল। বোধ হয়, নলিন বাবুর মনে অলক্ষ্যে একটা আঘাত লাগিতেছিল; কিন্তু তাহা যে কি, তিনি বুঝিতে পারে নাই। নলিন বাবু বৈদ্যনাথে হাওয়া বদলাইতে গেলেন, এবং সেখানে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ সুরার মাত্রা কিছু বাড়াইয়া ফেলিলেন।

বন্ধু উমেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া একদিন নলিন বাবুকে বলিলেন, "নলিন, তুমি কি এই ভাবে জীবন কাটাইবে?"

নলিন। তবে কি করিব?

উমেশ। বরং বিবাহ কর।

নলিন। আমার বিবাহের বড় সাধ নাই, তবে এক জনকে পাইলে করি।

উমেশ। কে?

নলিন। বিমলা। আমার শ্যালী।

উমেশ। তুমি তাহার পদরেণুরও যোগ্য নও। তাহার ভগ্নীরও ছিলে না।

নলিন। তবে আর কোন কথা নাই।

উমেশ কলিকাতায় গিয়া সেই কথা বিমলার মাতুলকে বলিল। সন্ধ্যা-কালে বিমলার মাতুলানী বিমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, একটা কথা বলিতে ভয় হয়।"

বিমলা। ভয় কি মা?

মামী। নলিন তোমাকে বিবাহ করিতে চায়। তার জীবনটা অপদার্থ হইয়া যাইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ।

বিমলা। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি।

মামী। কি স্থির করিয়াছ?

বিমলা। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত।

তাহাই স্থির হইল।

নলিনচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইলেন। কলিকাতায় অনেকের মুখ মলিন হইয়া গেল। যাহা হউক, বিজয়ের কথা মনে করিয়া কেহ বিমলার নিন্দা করিল না।

সকলেই নলিনচন্দ্রকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিল। বিমলার মত অসামান্ত রূপ, যৌবনপ্রভা, বিদ্যা ও বুদ্ধি তৎকালে কোনও বালিকার ছিল কি না সন্দেহ। বিমলা পাশকরা মেয়ে। বিমলা সুন্দর গাহিতে পারিত, হার্মোনিয়ম বাজাইতে পারিত, ইংরাজী ভাষায় সুন্দর বাক্যালাপ করিত। বিমলা বিবাহ করিয়া পর্দ্দানশীন থাকিল না। স্বামীর সহিত জুড়িগাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইতে লাগিল।

নলিনচন্দ্র বিমলার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। তিনি যাহা চাহিতেন, বিমলার মধ্যে সকলই পাইলেন।

বিমলা নলিনচন্দ্রের নাসিকায় রজ্জু বাঁধিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে লাগিল। বিমলার সহিত অনেক মেমের আলাপ হইয়াছিল, অনেক সাহেবেরও আলাপ হইল। বিমলার সুপারিশে নলিনচন্দ্র অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

একদিন বিমলা গাহিতেছিল,—

"তুমি চিরদিন মধুপবনে, চিরবিকশিত বনভবনে
যেও মনোমত পথ ধরিয়া তুমি নিজসুখস্রোতে ভাসিও!
আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া—"

শয়নগৃহে সেই সঙ্গীতস্বর তীব্রবিষাক্ত সুধার ন্যায় নলিনের কর্ণ দিয়া মর্ম্মে লাগিতেছিল। নলিনের ঘুম হইল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া নলিন বাবু বলিলেন, "আজ একবার বাগানবাড়ীতে যাব।"

বিমলা বলিল, "যাও।"

নলিন বাবু বাগানবাড়ীতে গিয়া পুরাতন কৌচে লুটাইয়া পড়িলেন। রাত্রিকালে তাঁর খুব জ্বর আসিল।

প্রভুভক্ত খানসামা হরি এক জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বলিলেন, "এটা decided plague case."

হরি বিমলাকে খবর দিল। বিমলা ডাক্তার ব্যানারজীকে সঙ্গে করিয়া নলিন বাবুর কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নলিনচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, বিমলা ডাক্তার ব্যানারজীর সোনার চশমা-খানি সযত্নে স্বীয় রুমালে মুছিয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল।

বিমলা ব্যানারজীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার এ সময় শয্যার নিকট যাওয়া উচিত কি? প্লেগটা ছোঁয়াচে রোগ। তুমি একবার চশ্‌মা দিয়া ভাল করিয়া দেখ।"

ব্যানারজী গদগদস্বরে বলিলেন, "তোমার রোগীর নিকটে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

নলিন বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। শতবৃশ্চিকদংশন অপেক্ষাও এ যাতনা, এ প্রায়শ্চিত্ত কঠিন!

নলিন বাবু অজ্ঞান হইলে বিমলা তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিল। তিন রাত্রি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ দিনে একবার অন্তরীক্ষে চাহিয়া বিমলা বলিল, "দিদি, তোমার স্বামীকে বাঁচাও, যেন বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার ব্যথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যাইতে পারেন।"

বিমলার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বিমলার অসাধারণ সেবায় নলিন বাবু বাঁচিলেন।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। চুণারের পুরাতন দুর্গে নলিন বাবু, বিজয় ও বিমলাকে লইয়া হাওয়া বদলাইতে গিয়াছেন।

পূর্ব্বগগনপটে বসন্তনিশীথিনী সূর্য্যকরস্পর্শে প্রভাত হইতেছিল। সময়টা একই, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য্যের সংস্পর্শে রাত্রি দিন হয়। নলিনের অন্ধকারময় জীবনে চন্দ্র সূর্য্যের সংস্পর্শ ছিল না, কিন্তু বিমলা তাহা দেখাইয়া দিয়াছিল।

নলিন বাবু বিজয়কে ডাকিলেন। বিমলা তাহাকে লইয়া আসিল।

বিজয় পিতার কোলে গেল।

বিমলা বলিল, "নলিন! বিজয়কে প্রণাম করিতে দাও; কাল বিজয়া-দশমী গিয়াছে। তুমি তখন ঘুমাইয়াছিলে।

নলিন বিজয়কে কোলে করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। বিমলা বাতায়নের দিকে গিয়া মুখ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া রহিল। বিমলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঈশ্বরের বাণী মানবহৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, আজ বিমলার তাহাই গৌরব!

নলিন বিজয়ের পড়া লইল, বিজয়ের মাতার দর্পণস্বরূপ সুন্দর মুখখানি বার-বার চুম্বন করিল, এবং বিজয়ের অসাধারণ শিক্ষা ও নম্রতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

বিমলা বলিল, "বিজয় তাহারই প্রতিচ্ছবি। যত দিন বাঁচিয়া থাক, এই দর্পণে মুখ দেখিও। তাহার কত আত্মত্যাগ ছিল, কত সহিষ্ণুতা ও স্বামিভক্তি ছিল; তাহা আমি শত জীবনে দেখাইতে পারিব না। আমি দাসীমাত্র। সে মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহারই হৃদয়বেদনা লইয়া চিরদিন কাঁদিব।"

নলিন। আমি এই দেশেই থাকিব। জনসমাজে আর মুখ দেখাইব না।

বিমলা। তাহাই থাক। এবং তাহার জ্যোতি ও স্নেহ স্মরণ করিয়া তুমি ঈশ্বরকে মাঝে মাঝে দেখিও। আমার জীবনে এইমাত্র সাধ। আমার সহিত ইহজীবনে তোমার অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই। বিজয় যদি তাহার মাতাকে ভুলিতে পারে, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হইবে, নচেৎ এ জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ নামক একপ্রকার পদার্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জিনিসটা কি, জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, নিম্নে বিবৃত হইল।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ শব্দের অর্থ, যাহার অগ্নিতে ধ্বংস হয় না। ইহার উৎপত্তি ও উপাদান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তবে আম্ফিবিওল বা হরণব্লেণ্ড (amphibiole Hornblende) নামক ধাতুর অন্তর্ভূত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ প্রধানতঃ সিলিকা ম্যাগ্‌নিসিয়া য়্যালিউমিনা ও ফেরস্‌ (Ferrous oxide) এই সকল ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে এই সকল উপাদানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যে য়্যাস্‌বেস্‌-টোজে লোহের আধিক্য থাকে, তাহা সহজেই অগ্নির উত্তাপে দ্রব হয়।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ কতকগুলি শুভ্র স্ফটিকবৎ ও স্থিতিস্থাপক আঁশের সমষ্টিমাত্র।

ইহাতে রেশমের স্তায় আভা থাকে। সাধারণতঃ শুভ্র, ধূসর ও হরিত বর্ণের য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটিমাত্র আঁশ অগ্নির উত্তাপে শুভ্র এনামেলের আকার ধারণ করে, কিন্তু কতকগুলি একত্র করিলে সাধারণ অগ্নিশিখায় কিছুতেই দ্রব হয় না।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ দ্বারা অতি উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে বস্ত্র কখনও অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে বস্ত্র পরিষ্কৃত করিতে হইলে রজকের সাহায্য লইতে হয় না। মলিন বস্ত্র কিয়ৎ-কাল অগ্নিতে ফেলিয়া রাখিলেই, তাহা অচিরাৎ পূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। ইহা দ্বারা দস্তানা, টেবিলের চাদর, তোয়ালে, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এমন কি, কেহ কেহ ইহা দ্বারা পরিধেয় পরিচ্ছদও প্রস্তুত করিয়া-ছেন। কথিত আছে, পুরাকালে মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ চিতার আবর্জ্জনা হইতে পৃথক রাখিবার জন্য, য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্-নির্ম্মিত বস্ত্রে মৃতদেহ আবৃত হইত।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়প্রকার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ;—

(১) য়্যামিয়েন্থস্ (Amianthus)—এই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ দেখিতে অতি সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য। ইহার আঁশগুলি অতি শুভ্র, অধিকতর দীর্ঘ, নমনীয় ও সুন্দররূপে সজ্জিত। এই জাতীয় য়্যাস্‌বেস্‌টোজ ইউরোপের মধ্যে পিরিনিস্, আল্পস্ ও ইউরাল পর্ব্বতে, আমেরিকার সেণ্টগথার্ড পর্ব্বতে, সুইডেনের সার্‌পেণ্টাইন পর্ব্বতে ও সিলিসিয়া, নিউসাউথ্‌ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইটালীর স্যাভয় ও কর্সিকা দ্বীপ হইতে এই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস-টোজ প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। লম্বার্ডি ও টিউরিনে একপ্রকার য়্যামিয়েন্থস্ পাওয়া যায়, তাহা এক গজেরও অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে। কথিত আছে, মিশর দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসীরা য়্যামিয়েন্থস্ দ্বারা শবদেহের আচ্ছাদনবস্ত্র প্রস্তুত করিত। প্রাচীন গ্রীসেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

(২) সাধারণ য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্ (Common asbestos)—ইহার বর্ণ প্রথম শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজের স্তায় উজ্জ্বল নয়, এবং ইহা ওজনেও অপেক্ষাকৃত লঘু। ইহার আঁশগুলি বড়ই বিষমভাবে সজ্জিত, এবং বড়ই অনমনীয়। বস্তুতঃ, প্রথম শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। এই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ স্বর্ণকারদিগের বক্রনলের সাহায্যে বিশেষ আয়াসে দ্রবীভূত

করা যাইতে পারে। এই জাতীয় য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ ওয়েল্‌স্‌, কর্ণওয়াল ও স্কটল্যাণ্ডে পাওয়া যায়।

(৩) Mountain Leather and Mountain Cork—ইহার আঁশগুলি পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ অপেক্ষা কম নমনীয়। ইহা পিঙ্গল ও শ্বেতাভবর্ণ বিশিষ্ট। প্রথমোক্তটি (Mountain Leather) দেখিতে পাতলা চাদরের ন্যায় বলিয়া উহার 'মাউণ্টেন লেদার' আখ্যা হইয়াছে। ছিপির সহিত শেষোক্তটির সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া উহা 'মাউণ্টেন কর্ক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল য়্যাস্‌বেস্‌টোজ এতই লঘু যে, জলে ভাসে। ইহা লেনর্কশায়ারে পাওয়া যায়।

(৪) Mountain Wood :—ইহা কোমল, অস্বচ্ছ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। শেষোক্ত য়্যাস্‌বেস্‌টোজ অপেক্ষা অনেক ভারি, এবং বক্রনলের সাহায্যে দ্রবীভূত হয়। এই জাতীয় য়্যাস্‌বেস্‌টোজ অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, পোর্টসয় ও কিলড্রিমিতে পাওয়া যায়।

বহুদিন ধরিয়া য়্যাস্‌বেস্‌টোজের সাহায্যে অদাহ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। পূর্ব্বকালে য়্যামিয়েন্থস্‌ য়্যাস্‌বেস্‌টোজের দ্বারা কেবল বস্ত্রই নির্ম্মিত হইত। প্রথমে য়্যাস্‌বেস্‌টোজের আঁশের সহিত পাটের আঁশ মিশাইয়া লইয়া বস্ত্র বয়ন করা হইত। তৎপরে উক্ত বস্ত্র হাপরে ফেলিয়া রাখিলে পাটগুলি পুড়িয়া যাইত। এই অদ্ভুত পদার্থ সম্বন্ধে একটি বিস্ময়জনক গল্প আছে। কথিত আছে, ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজয়ী সম্রাট সার্লেমেনের (Charlemagne) য়্যামিয়েন্থস্‌-নির্ম্মিত একখানি টেবিলের চাদর ছিল। তিনি নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবকে যখন ভোজ দিতেন, তখন সেই চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। ভোজ শেষ হইলে তিনি সেই চাদরখানি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অভ্যাগতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।

ইটালীর মিলান দেশের আলডিনি নামক প্রসিদ্ধ নাইটের টুপি, দস্তানা, জামা, মোজা প্রভৃতি সমস্ত পরিচ্ছদই য়্যাসবেস্‌টোজ-নির্ম্মিত ছিল।

য়্যাস্‌বেস্‌টোজে অতি উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এই কাগজে সনন্দ ও অপর দলীলাদি প্রস্তুত হইলে অদাহ্য হইতে পারিত, কিন্তু কিয়ৎকাল প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে রাখিলে লেখা অদৃশ্য হইয়া যায়। গৃহের ছাদ ও মেজে এই বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে অগ্নিভয় একেবারে তিরোহিত হয়।

অনেকেই জানেন, শীতপ্রধান দেশে শীতনিবারণের জন্য গৃহে অগ্নিকুণ্ড থাকে। ধূমনির্গমের জন্য প্রত্যেক অগ্নিকুণ্ডের চিম্‌নী থাকে। ঐ চিম্‌নীর আবরণ যাহাতে তাপসঞ্চালন না করে, এই জন্য চিম্‌নী ও আবরণের মধ্যভাগে য়্যাস্‌বেস্‌টোজ-নির্ম্মিত বস্ত্রের একটা আবরণ থাকে। তাহাতে চিম্‌নীর বহিরাবরণ তাপসঞ্চালন করিতে না পারাতে, অভ্যন্তরস্থ বাষ্পের উত্তাপ বাহিরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। ঠিক এই কৌশল প্রয়োগ করিলে লৌহনির্ম্মিত সিন্ধুকের ভিতর অগ্নির উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। কিছু দিন হইতে বাষ্পীয় যন্ত্রের পিষ্টন (piston) এই য়্যাস্‌বেস্‌টোজ দ্বারা আবৃত করিয়া দিবার কল্পনা হইতেছে।

ডাক্তার ব্যাল্‌ফোর বলেন, মান্দ্রাজের সালেম জেলায় ও মহীশূর রাজ্যে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে য়্যাস্‌বেস্‌টোজ পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুরে একপ্রকার পরিবর্ত্তনশীল (metamorphic) পর্ব্বত আছে; সেই সকল পর্ব্বতে, বিশেষতঃ মানভূম জেলার ঐ শ্রেণীর পর্ব্বতে, পূর্ব্বে প্রকৃত য়্যাস্‌বেস্‌টোজ পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধান করিয়া যত দূর জানা গিয়াছে,এখন আর তথায় অপর্য্যাপ্তপরিমাণে এই পদার্থ পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্‌ বেডেন পাউয়েল (Badden Powell) বলেন, পঞ্জাবের পানাম জেলায় যে রেশমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট আঁশাল একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা এই য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লাহোর শিল্পপ্রদর্শনীতে কোনও অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কর্কশ রকমের একপ্রকার য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গাড়ওয়াল প্রদেশে উক্ষিমনাথের সন্নিকটে একপ্রকার য়্যাস্‌বেস্‌টোজ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা পর্ব্বতের এত অভ্যন্তর প্রদেশে জন্মিয়া থাকে যে, সহজে সংগ্রহ করা যায় না। পার্ব্বত্য-ভূমির অধিবাসীরা ইহা দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করে, এবং আলোকের পলিতা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ডাক্তার ব্যালফোর বলেন, আফগানিস্থানের অন্তর্গত জেলালাবাদে য়্যাস্‌বেস্‌টোজ্‌ পাওয়া যায়। মিউজিয়মের ভূতত্ত্ববিভাগে য়্যাস্‌বেস্‌টোজের যে একপ্রকার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্প্রতি জিউবারমজল দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ঐ দেশে য়্যাস্‌বেস্‌টোজের দ্বারা সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুহ।

ভারত-ইতিহাসের এক অংশ।

[আইন-আকবরী হইতে সঙ্কলিত।]

৪২৯ বিক্রম সংবতে তোমর-বংশীয় অনঙ্গপাল দিল্লী নগরের পত্তন করিয়া ন্যায়পরতার সহিত রাজত্ব করেন। ৮৪৮ সংবতে দিল্লীর নিকটে পৃথ্বীরাজ তোমর ও বীলদেব চৌহানের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে চৌহান-বংশের হাতে দিল্লী রাজ্য যায়। রায় পিথোরার (পৃথ্বীরাজের) রাজত্বকালে মইজ-উদ্দিন স্তাম, হিন্দুস্থান বারংবার আক্রমণ করেন; কিন্তু শেষ যুদ্ধ ব্যতীত একটি যুদ্ধেও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ৫৮৮ হিজরা সনে থানেশ্বরের নিকট অষ্টম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হন। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধকাল এক শত সামন্তরাজ উপস্থিত থাকিতেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা কেহই উপস্থিত ছিলেন না।

কনোজরাজ রাঠোর জয়চন্দ্র, সেই সময় ভারতভূমির সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া আপনাকে প্রচারিত করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে জয়চন্দ্রের এত দূর উদারতা ছিল যে, পারস্য ও তুর্কীস্থানের অনেক লোক তাঁহার কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইত না। জয়চন্দ্র এই সময়ে রাজসূয়যজ্ঞসম্পাদনের মানস করিয়া তাহার উদ্যোগ করেন। যজ্ঞান্তে রাজকন্যার স্বয়ংবরেরও উদ্যোগ হয়। পৃথ্বীরাজ ব্যতীত সমুদয় রাজা জয়চন্দ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে রাজগণকে সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। রাজসূয় করিবার অধিকার চৌহান-দের আছে কি রাঠোরদের আছে, ইহা লইয়া সে সময়ে একটা তর্ক উপস্থিত হয়। অস্ত্রবলে এই তর্কের মীমাংসা করিতে হইলে দীর্ঘকাল লাগিবে, এবং যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবে মনে করিয়া, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারদেশে দ্বারপালকের স্থানে স্থাপিত করিলেন। পৃথ্বীরাজ এই সংবাদশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ শত অসমসাহসিক বীরপুরুষের সঙ্গে ছদ্মবেশে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই স্বর্ণমূর্ত্তি হরণ করিলেন। এই কার্য্যে বহুসংখ্যক নরহত্যা হয়। রাজকন্যা পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্বের

বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তিনি অন্য রাজাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। জয়চন্দ্র কন্যার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া স্থানান্তরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই ব্যাপার পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি রাজকন্যার উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজের সভাসদ চাঁদ কবি গায়কবেশে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ কতিপয় নির্ব্বাচিত অনুচর সহ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজকন্যার অবরোধস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার করিলেন। পৃথ্বীরাজের এক শত সামন্ত সকলেই ছদ্মবেশে নিকটে উপস্থিত ছিলেন। জয়চন্দ্রের সেনাগণ পলায়িত দলপতির অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। গিহ্লোট গোবিন্দ রাও, সাত হাজার শত্রু বধ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। নরসিংহদেব, চন্দনদেব, সোলাঙ্কিরাজ, পলয়ানদেব, তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য সামন্তগণ অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকন্যা ও পৃথ্বীরাজ ও চাঁদ কবির সহ নির্বিঘ্নে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা পূর্ব্বেই স্বর্ণময়ী পৃথ্বীরাজ-মূর্ত্তির গলে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন। এই বিবাহ পৃথ্বীরাজের কাল হইল।

পৃথ্বীরাজের সাহসী সঙ্গিগণ নিহত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে রাজকন্যার প্রণয়ে এত দূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িলেন। মৈজউদ্দিন এই সংবাদে নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি জয়চন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের রাজ্যের কতিপয় অংশ অধিকৃত করিলেন। কেহ পৃথ্বীরাজের নিকট এই সংবাদ দিতে সাহসী হয় নাই। ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিলে, সম্ভ্রান্তগণ রাজধানীতে সমবেত হইলেন। তাঁহারা চাঁদ কবিকে রাজার নিকট পাঠাইলেন। পৃথ্বীরাজ এখন প্রবুদ্ধ হইলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের জয়লাভে এত অহঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অল্পমাত্র সেনা লইয়া শত্রুসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চাঁদ কবিও রাজার সঙ্গে গজনীতে নীত হইলেন। চাঁদ শীঘ্রই মৈজউদ্দিনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন চাঁদ, পৃথ্বীরাজের ধনুর্বিদ্যার সুখ্যাতি করিলে, মৈজউদ্দিন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষী হইলেন। পৃথ্বীরাজ সুলতানের সমীপে আনীত হইলেন। তাঁহার হস্তে শরাসন অর্পিত হইল। তিনি

সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুলতান নিহত হইলেন। হিন্দু ঐতিহাসিকেরা এরূপ বলেন; কিন্তু পারসীক ঐতিহাসিকেরা ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন যে, পৃথ্বীরাজ যুদ্ধস্থলেই বীরের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ হইতে চৌহান-বংশের শেষ হইল। মৈজউদ্দিন হিন্দুস্থানের প্রধান অংশ অধিকার করিলেন, এবং মল্লিক কুতুবউদ্দিনকে নিজের প্রতিনিধি রাখিয়া উত্তর দিকের পার্ব্বত্য প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে দেশে ফিরিয়া গেলেন। কুতুবউদ্দিন এই বৎসরেই দিল্লী ও তদধীন কতিপয় সামন্তরাজ্য অধিকার করিলেন। মৈজউদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ফেরোজ শাহ হইতে কুতুবের নিকট রাজছত্র ও অন্যান্য রাজচিহ্ন প্রেরণ করিলেন। কুতুবউদ্দিন, লাহোরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সাহস, সদ্বিচার ও দানশীলতার জন্য কুতুবউদ্দিন যশস্বী হইয়াছিলেন। চৌগাঁতে ক্রীড়ার সময় তিনি নিহত হন। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুতুবউদ্দিনের পুত্র আরাম শাহকে রাজা করিলেন। অন্য দল মল্লিক আলতামাসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। আলতামাস কুতুবউদ্দিন কর্তৃক দাসরূপে ক্রীত হইয়াছিলেন; পরে কুতুবউদ্দিন তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আরাম পলায়ন করেন, আলতামাস সামসুদ্দিন উপাধিধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, আলতামাস এক তুর্ক সর্দ্দারের পুত্র ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া জোসেফের ন্যায় তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। নানা মনিবের হাতে পড়িয়া আলতামাস এক বণিকের নিকট বিক্রীত হইলেন। বণিক আলতামাসকে গজনীতে লইয়া যান। সুলতান মৈজউদ্দিন স্যাম, এই দাসকে ক্রয় করিতে চাহেন, কিন্তু বণিক এত মূল্য চাহিয়া বসেন যে, সুলতান বিরক্ত হইয়া আদেশ করেন যে, কেহ এই দাসকে ক্রয় করিতে পারিবে না। কুতুবউদ্দিন গুজরাট জয় করিয়া গজনীতে উপস্থিত হইলে, সন্তুষ্ট সুলতানের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চমূল্যে আলতামাসকে ক্রয় করেন, এবং তাঁহাকে আপনার পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আলতামাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তিনি নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায় সম্ভ্রান্তগণ সামসুদ্দিনের কন্যা রিজিয়াকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। পুত্রগণকে পানাসক্ত দেখিয়া সামসুদ্দিন জীবদ্দশায় রিজিয়াকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

মৈজউদ্দিন ব্রেহামের রাজত্বকালে জজিল খাঁর সৈন্যগণ লাহোর প্রদেশ উজাড় করিয়া ফেলে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ গোলযোগের সময় ব্রেহামকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এবং পরে সেখানে তাঁহাকে বধ করে।

সুলতান আলাউদ্দিন মসায়ুদের রাজত্বকালে এক দল মোগল তিব্বতের পথ দিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করে; কিন্তু তাহারা মসায়ুদের সেনাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। অন্য সময়ে তুর্কীস্থানের শাসনকর্ত্তা ভারত আক্রমণ করেন, সুলতান তদ্বিরুদ্ধে সসৈন্য বিপাশা নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শুনিতে পান যে,আক্রমণকারী চলিয়া গিয়াছেন। সুলতান দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন। মসায়ুদ, পরে কুমন্ত্রিপরিচালিত হওয়ায়, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং সেখানে তাঁহার অস্তিত্ব শেষ হয়।

অনন্তর নাসিরউদ্দিন মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসিরউদ্দিন বিজ্ঞ ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। আবুওমার মনহাজাল জোরজানি স্বকৃত তবকত-ই-নসিরি গ্রন্থ ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে মোগলেরা পঞ্জাব আক্রমণ করে, কিন্তু সুলতানের আগমনবার্ত্তা পাইয়া চলিয়া যায়। নাসিরউদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন বালিনকে উজীর করেন। বালিন প্রথমে দাসত্ববদ্ধ ছিলেন, পরে উন্নতিলাভ করিয়া উজীর হন। নাসিরউদ্দিন, বালিনকে উলুখ খাঁ উপাধি দেন। নাসিরউদ্দিনের পুত্রসন্তান না থাকায়, তাঁহার মৃত্যুর পর, উজীর বালিনই সিংহাসনে আরোহণ করেন। বালিন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা করেন। মহম্মদের সুশাসনগুণে পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হয়। মীর খসরু মহম্মদের সঙ্গী ছিলেন। মহম্মদ পিতার সহ সাক্ষাতের পর পঞ্জাবে গমনকালে পথিমধ্যে আক্রান্ত ও হত হন। মীর খসরু বন্দী হন, কিন্তু পরে পলায়ন করেন।

বালিনের মৃত্যুর সময়, তৎপুত্র বগরা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অমাত্যেরা তৎপুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

মহম্মদের পুত্র কৈখসরুকে, বালিন নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান; কিন্তু অমাত্যেরা গৃহবিবাদের ভয়ে, তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিল। কৈকোবাদ পিতাকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্য সরযূতীরে উপস্থিত হইল। বগরা, কুমন্ত্রীদের পরামর্শে, পুত্রকে সাম্রাজ্য উপভোগ করিতে দিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া গেলেন।

মীর্জ্জা খসরু নিজের কিরাণ-আস্‌সেকেইন্‌ গ্রন্থে পিতা ও তদীয় পুত্রের এই সাক্ষাৎবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মদ্যপানে কৈকোবাদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রকে সামসুদ্দিন উপাধি দিয়া রাজা করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কৈকোবাদের শবদেহ যমুনায় নিক্ষিপ্ত হয়। সাম্রাজ্য খিলিজি বংশ আশ্রয় করে, সেনাদের বেতনদাতা জিলালউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-কাব্য।

রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধামোদে ভরা,
কি বিরাট বিশ্ব-কাব্য অনন্ত সুন্দর!
সুধাসিক্ত কি সুষমা নিত্য চিত্তহরা,
বিকাশিছে কি বৈচিত্র্য যুগ যুগান্তর!
প্রভঞ্জনে, মেঘমন্দ্রে, কূজনে, কল্লোলে
কি গভীর কি মধুর ছন্দের ঝঙ্কার!
তারকা তপন চন্দ্র দামিনীহিল্লোলে
এ কি রুদ্র, স্নিগ্ধ, মুগ্ধ মাধুরীসঞ্চার!
কি গাম্ভীর্য্য অন্ধকারে নিশীথসাগরে,
প্রেমে মোহে শোকে হর্ষে এ কি উদ্দীপনা!
স্তম্ভিত নিখিল-চিত্ত ভীতি-ভক্তি-ভরে—
লোকাতীত কল্পাতীত কি মহাকল্পনা!
ভূমানন্দে পূর্ণ হৃদি—নয়ন আমার,
নিরখিছে কবি-কাব্য দোঁহে একাকার!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী।

সে দিনের কথা নাথ! পড়ে কি হে মনে?
রাধার সৌভাগ্যসুখ নিরখি' নয়নে,
অসূয়া জাগিল চিতে, হইল বাসনা,
সেবিতে প্রেমের কুঞ্জে রাঙ্গা পা দুখানি,
হৃদয়-পিঞ্জরে তব হ'তে পোষা পাখী,
পোড়াইতে কামধূপ প্রেম-হোমানলে!
কি আনন্দ! প্রাণ মন হইল অধীর,
ভাবি' সেই দেবভোগ্য সম্পদের কথা!
চন্দ্রাবলী-হৃদয়ের শুভ্র পূজাগৃহ,
ভরি যাবে পরাভক্তি গুগ্‌গুল সৌরভে!
ফেলি' দিনু সাজসজ্জা অঙ্গনা-বিভ্রম;
ললাটে বৈষ্ণবী টীকা, করে জপ-মালা,

গাত্রে হরিনামাবলি ; দীপ্ত অনুরাগে
যৌবনে সাজিনু নাথ! নব সন্ন্যাসিনী!
মনে আছে? তপঃকুঞ্জ যমুনার ধারে,
নিভৃত, কপোত তথা ডাকে মুহুর্মুহু!
পরভৃত ধরে সদা কুহু কুহু তান,
আলাভোলা পতঙ্গেরা করে কভু গান,
উদাসী কাঠ্‌ঠোক্‌রা দেয় কভু সাড়া!
মধুর নিকুঞ্জ সেই! কদমে কদমে
সমাচ্ছন্ন, পরিবৃত তমালে, পিয়ালে!
আম্রমুকুলের গন্ধে, বনতুলসীর
মৃদুগন্ধে, হয় নাথ! প্রাণ মাতোয়ারা!
হেন সাধনার স্থল নাই বৃন্দাবনে!
সেই মনোহর কুঞ্জে, বিরচি' কুটীর,
যমুনা-মৃত্তিকা আনি, হে মনোমোহন,
গড়িলাম তব মূর্ত্তি! হাতে দিনু বাঁশী;
রঙ্গ ফলাইয়া আহা দিলাম ঢালিয়া
শ্যামল জলদ কান্তি; শ্রীঅঙ্গে আ মরি!
দিলাম পরায়ে নাথ! পীতাম্বর ধটী!
চরণে নূপুর দিনু আনন্দে উতলা,
হে গোবিন্দ! কণ্ঠে দিনু বরগুঞ্জমালা!
হে হরি! আনন্দ-অশ্রু বহিল অজস্র
দু' কপোলে, হেরি' সেই মোহন বিগ্রহে!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' দেব, 'জয় কৃষ্ণ!' বলি'
নাচিলাম, করিলাম হরিগুণগান!
এইরূপ, এক মাস, পূজিনু সাদরে
মম ইষ্টদেবে নাথ! বিরলে বসিয়া।
স্নান করি' নিত্য পূত কালিন্দীর নীরে,
পত্রপুষ্পে দেবতার করিয়া অর্চ্চনা,
করিতে লাগিনু নাথ! যোগ-আরাধনা!
কি তাহে নিবিড় সুখ, শান্তি ও আরাম,
কেমনে বুঝাব? কভু বোঝে কি অপরে,
যোগানন্দসুখ যাহা ভুঞ্জে যোগী জন!
পতিসম্মিলনসুখ বোঝে কি কুমারী?
কোকিলের যেই সুখ কুহু কুহু করি'
প্রাণপণে,—প্রাণ আনি' ওষ্ঠের আগায়,
অভাগা বায়স তাহা বুঝে কি গো কভু?
মর্ত্ত্য-মন্দাকিনী গঙ্গা শত বাহু মেলি',
করে যবে আলিঙ্গন বঙ্গোপসাগরে,
দুর্জ্জয় আনন্দে তার ভরি' যায় বুক!
হায়! সে কল্লোলানন্দ বুঝিতে কি পারে,
ক্ষীণপ্রাণা লঘুকায়া নদী কর্ম্মনাশা!
একদিন, মধ্যরাত্রে, তপঃকুঞ্জে বসি'
কহিলাম, "আর কেন? হৃদয়-সরসী-
মাঝে, প্রবেশি' সূর্য্যের বেশে, দয়াময়,
কর হে ভাস্বর এরে সহস্র কিরণে,
ফুটুক মৃণাল-বৃন্তে ভকতি-নলিনী।"
অভিমানে, অবসাদে, উন্মাদিনী পারা,
করিনু অপূর্ব্ব গান নাচিয়া নাচিয়া!—

গান—কীর্ত্তনের সুর।

ঘৃণায় অঙ্গুলি, সকলেই তুলি,
বলে, "এ যে আশী বিষ!
শঠের আকার, অধম্ম ব্যাভার,
পাপ করে অহর্নিশ"!
হে দয়াল হরি, তব নাম করি',
এই কি ঘটিল শেষে?
গোময় কপালে, চূণকালী গালে,
কলঙ্ক রটিল দেশে!
সকলেই বলে, তোমারে ডাকিলে,
নাহি থাকে পাপলেশ!
আমার কপালে, এ কি এ ঘটালে,
নাহি দুর্দ্দশার শেষ!
আর না ডাকিব, আর না করিব
তোমার মধুর নাম;
থাকে যদি ভয়, হরি দয়াময়,
হরি' পাপ, ত্যজ মান!

পরদিন, উষাকালে, যমুনার জলে
স্নান তরে অবগাহি', ভাসিতে লাগিনু,
যেন গো অপরাজিতা সমীরহিল্লোলে।
হেন কালে, সাশ্রুনেত্রে সদয় অন্তরে,
নিরখিনু, আহা পড়ি' তরঙ্গের চক্রে,
ভাসিয়া যাইছে এক দীন দুঃখী বিছা!
মিছা ভয় পরিহরি', দুই হস্তে তারে
সাপটিয়া, মহাহর্ষে তুলিলাম তীরে।
কত সন্তর্পনে নাথ! জিয়াইনু তারে!
কিন্তু খল অকস্মাৎ পাই' নব বল
দংশিল আঙ্গুলে মোর! চীৎকারি' সহসা
ছাড়িনু বৃশ্চিকে! তীরে এক গোপকন্যা,
'উন্মাদিনী! বলি' মোরে পাড়িতে লাগিল
শত গালি!—কিন্তু নাথ, আকাশ হইতে
হইল কুসুমবৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে আমার!
শুনিনু আকাশবাণী—"ওলো চন্দ্রাবলী!
অচিরে ফলিবে তোর তপস্যার ফল;
পাইবি করুণাময়ে লো করুণাময়ী!"
সন্ধ্যাকালে যথাবিধি শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে,
আরতি করিয়া মম ইষ্টদেবতার,
বসিলাম ধ্যানে। হেন কালে এ কি শব্দ
বিকট গর্জ্জন করি', আইল রাক্ষস!
লাল চক্ষু, রুক্ষ কেশ, ভীষণমূরতি!
চাহিল গ্রাসিতে মোরে বদন বিকাশি'!
জয় হরি!" বলি' আমি দানার চরণে
পড়িলাম; কহিলাম, "এ কি লীলা তব
ভয়হারী রামচন্দ্র, রাক্ষস রাবণ,
একাধারে তুমি! তুমি শত্রু, তুমি মিত্র
তুমি ভয়, তুমিই অভয়! হে নৃসিংহ,
কেন আজি সাজিয়াছ হিরণ্যকশিপু?"
কথা শুনি' দৈত্যরাজ খিলখিল করি'
উচ্চ হাসি', মহাশূন্যে গেল মিলাইয়া;
যেন কোন দুঃস্বপন নিদ্রা-অবসানে!

সহসা হইল কুঞ্জ কৃষ্ণদেহ-গন্ধে
ভরপূর! শিহরিল সর্ব্বাঙ্গ পুলকে!
মধ্যরাত্রে, "এস হরি! এস হরি!" বলি'
ডাকিলাম নেত্র বুজি'; আকুল আহ্বানে।
যোগিনী ডাকিনী সহ, অট্ট অট্ট হাসি',
দেখা দিলা দিগম্বরী ভৈরবী কালিকা।
অসি তুলি' মহারোষে, নৃমুণ্ডমালিনী;
দুই খণ্ড করি' মোরে চাহিলা কাটিতে।
"হে শ্রীহরি, এ কি রঙ্গ? কোথা গেল বাঁশী
কোথা তব পীতাম্বর? ছি ছি! মরি লাজে,
হে ত্রিভঙ্গ, এই সাজে, দিগম্বরী হয়ে
হাসিছ নাচিছ রঙ্গে! ছাড়হ কৌতুক!"
এত বলি' ভৈরবীর চরণকমল
ছুঁইনু! অমনি দেবী অদৃশ্য হইলা
দলে বলে! শ্যামকণ্ঠে বরগুঞ্জমালা
দোলে যাহা, তাহারই সৌরভে অতুল,
বিপুল নিকুঞ্জ আহা হইল আকুল!
শেষ রাত্রি! জ্যোৎস্নার মধুর প্লাবন
পড়িয়াছে নিকুঞ্জের অযুত বিতানে!
হেসে সারা হইতেছে চম্পক, করবী,
নিশিগন্ধা! হেনকালে আইল তথায়
জটাজুটবিমণ্ডিত নবীন সন্ন্যাসী!
অশ্বথের ঝুরী সম দীর্ঘ বিলম্বিনী
পড়েছে বিশাল কাঁধে জটার সে ঘটা!
হাসি' বিদ্রূপের কহে যোগিরাজ,
"নাহি লাজ চন্দ্রাবলী? ছি ছি! এ কি সাজ?
সাজিয়াছ কার লাগি' যৌবনে যোগিনী?
চঞ্চল, প্রগলভ সেই রাখালের রাজা,
শঠশিরোমণি আর চোরচূড়ামণি!
অঙ্গের বরণ তার কোকিলের মত,
দেহের গঠন তার কুবুজার মত!
তার তরে এ তপস্যা? হায় উন্মাদিনী!
নবীন বয়স মম, তরুণ অরুণ

সম নিরুপম, হের আনন্দদায়িনী
দেবকান্তি মম ! সে অধমে পরিহরি',
বর বর হে বরোরু, পুরুষ-উত্তমে।"
এত বলি, যোগিবর হাসিয়া মৃদুহাসি,
বাঁধিয়া ফেলিল মোরে বাহুর বাঁধনে !
আমি কহিলাম, "ছি ছি ! এত দিন পরে,
চিনিয়াছ চিন্তামণি ! এ অধিনী জনে ?"
শিরে কৃষ্ণচূড়া, আর গুঞ্জমালা গলে,
অমনি হইলা যোগী দেব বংশীধারী !
সে আশ্লেষে, সে সোহাগে, গেলাম গলিয়া,
মধুময় বীরখণ্ডি গলে গো যেমতি !
জাহ্নবীর জলে ভরা কনক-কলসে !
গলে যথা, গলে যথা, চন্দ্রকান্তমণি,
সুধাংশুর চল চল তরল পরশে !
যুগলমিলন হ'ল প্রেমতপোবনে,
বসিল শ্যামের বামে চন্দ্রাবলী দাসী !

হে যোগেন্দ্র ? সব কথা গিয়াছ
কি ভুলে !
আমার যৌবন-রাজ্যে দুরন্ত দুর্ভিক্ষ
পশিয়াছে, বসিয়াছে শত পঙ্গপাল,
মুড়াইয়া বসন্তের শ্যাম লতা পাতা !
কত কাল, কত কাল, থাকিব পড়িয়া,
উপবাসে ; শীর্ণকায়া অনাথার মত !
এ তীব্র বিরহজ্বালা পারি না সহিতে !
এস নাথ, এস নাথ, বসন্তের মত ;
কুহু কুহু কুহু শব্দে এ প্রেম-কোকিলে
আবার জাগায়ে নাথ ! আবার মাতায়ে
এস শ্যাম, আষাঢ়ের জলধর-রূপে ;
জিয়াও অমিয়া ঢালি' এ মরা চাতকে !
কণ্ঠাগত প্রাণ মম, শফরীর মত,
করিতেছি হা-হুতাশ, এ শূন্য তড়াগে !
কোথা তুমি ? কোথা তুমি ? জলধির বারি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

কোরিয়ার রাজধানী।

মিষ্টার জর্জ্জ কেনান্ "আউট্-লুক্" পত্রে কোরিয়ার রাজধানী সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

চেমুলপো বন্দরে উপনীত হইবার অত্যল্পকাল পরেই তত্রত্য জাপানী দূত কোরিয়ার সম্রাটের পক্ষ হইতে আমাদিগকে রাজধানী-দর্শনের আমন্ত্রণ করিলেন। সম্রাটের "ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মের লীলা-নিকেতন" প্রাসাদে পর দিবস আমাদিগকে আহার করিতে হইবে, দূত মহাশয় আমাদিগকে এই অনুরোধ করিলেন। চেমুলপো-স্থিত বৈদেশিকদিগের নিকেতনের বহির্ভাগে ধর্ম্মভাবের সামান্য নিদর্শন আমাদের নয়নপথে পতিত হইল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না। এ অবস্থায় রাজধানীর ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, আমরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কতিপয় এংলো-স্যাক্সন ভ্রমণকারী সম্প্রতি কোরিয়ার রাজধানী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "রাজপথসমূহ

পরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য, সুকৌশলে নির্ম্মিত। পথিপার্শ্বে উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান। রাজধানীর বর্ত্মসমূহের কোনও স্থানে ধূলি বা কর্দ্দমের চিহ্নমাত্র নাই। বায়ু নির্ম্মল ও স্নিগ্ধকর। রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোকে দীপ্ত, এবং বহু অশ্বযানের চক্রনির্ঘোষে মুখরিত। তাড়িততার সর্ব্বত্র প্রসারিত। রাজপথের দুই পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহদাকার হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত। রাজধানীর জনসাধারণ শিল্প-কার্য্যে নিরত।" সুতরাং, এরূপ আলোকদীপ্ত, পরিচ্ছন্ন নগরের রাজপ্রাসাদ যে "ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন" হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

নিমন্ত্রিত জাপানী ভদ্রলোকগণ সান্ধ্য-পরিচ্ছদ (Evening suit) ও রেশমনির্ম্মিত টুপি পরিধান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজধানীর সুদৃশ্য রাজপথ, সুরম্য হর্ম্ম্যমালা, কাচ-নির্ম্মিত বাতায়ন ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের সহিত আমাদিগের পরিচ্ছদাদির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আমরা সাধ্যানুরূপ যত্ন করিয়াছিলাম। ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম যে কেবল কোরিয়ার রাজ-প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ নহে, এ কথাটা কোরিয়ার সম্রাটকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার বাসনাও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল।

শনিবার প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটার সময় আমরা জাহাজ হইতে অবতরণপূর্ব্বক জেলে-ডিঙ্গিতে আরোহণ করিলাম। অত্যল্পকালমধ্যে নৌকা সিকতাময় নদীতটে উপনীত হইল। আমরা ধূলিসমাকীর্ণ নদীতীরপথ অতিক্রম করিয়া পরিচ্ছন্ন "শল চেমুলফো" রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চেমুলফোর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য তেমন রমণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইল না। রেলপথের পার্শ্বে অনুচ্চ পিণ্ডাকার শৈল; শৈল-শরীর লোহিতাভ বালুকারাশিতে সমাকীর্ণ। এই প্রদেশে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বড় অল্প বলিয়া মনে হইল। কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণ, কোথাও বা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকার শালবৃক্ষ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। শৈল-শ্রেণীর কোনও স্থানেই অন্য কোনও প্রকার উচ্চ বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না। স্থানে স্থানে উপত্যকাভূমি কিঞ্চিৎ উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল। এই সকল স্থানে জলসেচনের ব্যবস্থা থাকাতে, মটর, ধান্য, ভুট্টা, যব প্রভৃতি শস্য-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের ট্রেণ এই সকল শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে-ছিল। শস্যক্ষেত্রের প্রান্তে গ্রামসমূহ শোভা পাইতেছিল। মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট পর্ণকুটীরগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন কেহ বৃহদাকার পাংশুবর্ণ দ্বারশোভিত চতুষ্কোণ ও পরম্পরা-বিন্যস্ত মধুচক্রসমূহ নির্ম্মিত করিয়াছে।

জাপানের কৃষককুলের কুটীরসমূহ উচ্চ ও দুরারোহ; কিন্তু কোরিয়ার কুটীরগুলি তৃণ-নির্ম্মিত, অনতিউচ্চ ও ক্রমনিম্ন। জাপান ও কোরিয়ার কুটীরগুলি তৃণাচ্ছাদিত। বাতায়ন কাগজে নির্ম্মিত; কিন্তু জাপানী কুটীরের বহির্দ্বার রাজপথের দিকে স্থাপিত, সর্ব্বদা উন্মুক্ত; পথিক ইচ্ছা করিলে এই দ্বারপথে গৃহমধ্যস্থ যাবতীয় দ্রব্য দেখিতে পান। কিন্তু কোরিয় কুটীরের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে। অথবা, কৃষকেরা বাঁশের একটা বেড়া দ্বারের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। কোরিয়ার গ্রাম্য রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী পয়ঃপ্রণালী তেমন ঢালু নহে। অপরিষ্কৃত-জল-নির্গমের পক্ষে পয়ঃপ্রণালী তেমন উপযোগী নহে। এ জন্য উহাতে প্রায়ই দূষিত জল ও আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে। আবর্জ্জনার পূতিগন্ধ পথিকের

ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে। কোরিয় কৃষকদিগের ক্ষেত্রে প্রচুরপরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও গৃহস্থের বাটীর সম্মুখস্থিত ক্ষেত্রে কর্কী প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, দেখিতে পাইলাম।

কোনও স্থলে উলঙ্গমস্তক তাম্রাভ কোরিয়ানেরা, মলিন শ্বেতবস্ত্র পরিয়া ধান্ত বা যব বুনিতেছিল। অন্ত স্থলে বালকবৃন্দ পুষ্করিণী হইতে বাঁশের ত্রিপদের মধ্যে বিলম্বিত ডোঙ্গার সাহায্যে জল তুলিয়া নালার মধ্যে ঢালিতেছিল।

প্রত্যেক কোরিয় পল্লীর মধ্যে একটি করিয়া সাধারণ কূপ আছে। সেই কূপ এমনই ভাবে অবস্থিত যে; পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসমূহের আবর্জ্জনারাশি তাহাতে গিয়া পতিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কূপ হইতে স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত বাল্‌তির সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া চতুষ্কোণ কেরোসিন-টিনের মধ্যে ঢালিতেছিল। তাহার পরে সেই জলপূর্ণ পাত্রগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া গৃহে লইয়া গিয়া সেই জল প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ জালার মধ্যে সঞ্চিত করিতেছিল। কোনও গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে বিস্তৃত মাদুরের উপর ভুট্টা শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। কর্দ্দমাক্তদেহ শূকরশাবক সেই সকল বিস্তৃত মাদুরের উপর যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছামত শস্তভক্ষণ অথবা শস্ত নষ্ট করিতেছে। চেমুলফোর পরে কোরিয় পল্লীর এইরূপ গার্হস্থ্যসঞ্চয়শীলতা (economey) দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, জাপানী গৃহ ব্যতীত আমি কোরিয় পল্লীর কোনও গৃহে খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় স্পর্শ করিব না।

যতই আমরা সিউওল নগরীর সন্নিহিত হইতে লাগিলাম, শৈলমালা ততই দূরে অপসৃত হইতে লাগিল।

সহসা বামপার্শ্বে নবধান্যাঙ্কুরশ্যামল বিশাল শস্যক্ষেত্র নেত্রপথে পতিত হইল। এই সীমান্তবিস্তৃত শস্তক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তদেশে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত শৈলরাজি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই শস্তশ্যামল ক্ষেত্রটি হান নদীর তীরে অবস্থিত। আধ ঘণ্টা পরে আমরা লৌহসেতুর উপর দিয়া হরিদ্বর্ণ হান নদী উত্তীর্ণ হইলাম। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ধূলিবহুল রাজধানীর উপকণ্ঠে উপনীত হইল। এক দল পণ্যসম্ভারবাহী অশ্ব নদীতীরপথে তাহাদের ক্ষুরক্ষুণ্ণ ধূলিজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। রাখালেরা মন্থরগামী বলীবর্দ্দদিগের পৃষ্ঠে শুষ্ক তৃণরাশি স্থাপিত করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতেছিল। তৃণরাশির প্রাচুর্য্যে বলীবর্দ্দসমূহ প্রায়ই দৃষ্টিপথের অতীত। কোথাও কোরিয় কুলীগণ, কোথাও বা অবগুণ্ঠনহীনা কুলীরমণীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। কোথাও আত্মীয়বিয়োগবিধুর ব্যক্তিবৃন্দ শোকজ্ঞাপক টুপী মস্তকে ধারণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বা নিষ্কর্ম্মা কোরিয় ভদ্রলোকেরা সুদীর্ঘ নলের সাহায্যে ধূমপান করিতে করিতে হস্তস্থিত তালবৃন্তসঞ্চালনে ভ্রমণজনিত শ্রান্তির অপনোদন করিতেছিল। সকলেরই পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণ। তখন প্রভাত না হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলে এই উপনগর প্রেতলোক বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আমাদের জাপানী সহযাত্রিবর্গের অধিকাংশই প্রথমে সিউওল ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া জাপানী দূতনিবাসে গমন করিবার জন্ত জিন্‌রিক্‌স বা নরযান ভাড়া করিলেন। ডাল্‌নি-স্থিত দূত মিঃ মর্‌গ্যানের পরামর্শ-অনুসারে রাজপথের প্রান্তে উপনীত হইয়া, নগরপ্রাচীরপার্শ্বস্থ, পরিচ্ছন্ন নিভৃত হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এম্‌বারনি নামক জনৈক মার্কিণ এই হোটেলের স্বত্বাধি-

কারী। সেখানে আমার দ্রব্যাদি রক্ষা করিয়া আমি মিষ্টার হ্যামিল্টন-বর্ণিত সুপরিচ্ছন্ন, সুদৃশ্য, পয়ঃ-প্রণালীসম্পন্ন রাজপথ, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও কাচনির্ম্মিত সুরম্য বাতায়ন প্রভৃতির সন্ধানে বহির্গত হইলাম।

সিউওল নগরীর লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। নগরটি হান নদীর তীরবর্ত্তী একটি প্রশস্ত উপ-ত্যকার উপর স্থাপিত। রাজধানীর এক পার্শ্বে সমুন্নত শৈলশ্রেণী, অন্য পার্শ্ব বৃক্ষহীন; সূচ্যগ্র শৈলরাজি দেখিবামাত্র যুক্তরাজ্যের মরু প্রদেশের চিত্র স্মৃতিপথে উদিত হয়। আন্দাজ ২০৩০ফিট্ উচ্চ একটি পাষাণপ্রাচীর দ্বারা সেই নগরীর চারি দিক ও অদূরবর্ত্তী শৈলশ্রেণীর কিয়দংশ পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের স্থানে স্থানে এক একটি অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি তোরণ আছে। এই তোরণবৃত্তের উভয় পার্শ্ব চীন-দেশীয় প্যাগোডার অনুকরণে নির্ম্মিত। নগরীর মধ্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিকগণ ঐ সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহাতে বাস করিতেছেন। একটি বিস্তৃত রাজপথের মধ্য দিয়া একটি বৈদ্যুতিক ট্রামের লাইন চলিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ইহাও নাকি বৈদেশিকদিগের উদ্যোগে ও যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদেশিক দূতনিবাস ও রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান ব্যতীত, দেশীয়দিগের আবাসস্থান চেমুলকোর ন্যায় আবর্জ্জনাপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন রাজধানীটিকে মিঃ হ্যামিল্টনের বর্ণিত "সুদৃশ্য সুরম্য রাজধানী" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে হইল।

আমার মতে, সিউওল-বাসীদিগের পরিচ্ছদবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নবাগত বৈদেশিকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। পরিচ্ছদের শিল্পচাতুর্য্য কৌতূহলোদ্দীপক নহে। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ত নাই; অধিকন্তু অধিবাসীদিগের মলিনবেশদর্শনে দর্শকের হৃদয়ে স্বতঃই বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। কিন্তু কোরিয় রাজপথের দৃশ্য, বিশেষতঃ পুরাতন নগরের অসংস্কৃত অংশের রাজপথের দৃশ্য সত্যই বিচিত্র। এরূপ বৈচিত্র্যবহুল দৃশ্য প্রাচ্য দেশের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে আমি শ্বেতপরিচ্ছদধারী নাগরিক, শোকপরিজ্ঞাপক-শিরস্ত্রাণধারী আত্মীয়বিয়োগবিধুর ব্যক্তিবৃন্দ, ঈষদনাবৃতদেহ রমণীকুল ও বালিকাসুলভকোমলমুখশ্রী বালকবৃন্দের উল্লেখ করি-য়াছি। কিন্তু সিউওলের রাজপথে আর এক প্রকার লোক দেখিলাম। তাহাদিগের পরিচ্ছদ পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছদধারীদিগের বেশভূষার অপেক্ষা অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহাদের একটি চক্ষু বসনে আবৃত। এই একনয়না রমণীসমূহের পরিধানে তৃণশ্যামল আংরাখা। শুভ্রবসনা কোরিয় ললনার কুঞ্চিত পরিচ্ছদ, অর্দ্ধনগ্ন বাহু ও ঈষৎ-অনাবৃত বক্ষঃস্থল দর্শনে আগন্তুক যেমন বিস্মিত হইয়া উঠেন, তৃণশ্যামলপরিচ্ছদধারিণীদিগকে দেখিয়াও নবাগতকে তেমনই অপূর্ব্ব বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

তৃণশ্যামলবসনা রমণীর পরিচ্ছদের বহির্ভাগমাত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। এই আংরাখাটিকে একটি রেশমী water-proof আবরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীগণের গল-দেশের শুভ্র "নেকইয়োক" ও হাতের কফ চারিটি ফিতার বন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ। এই বন্ধনচতুষ্টয়ের মধ্যে দুইটি ঘোর রক্তবর্ণ ও অবশিষ্ট দুইটি লোহিতাভ। ফিতাগুলি এত দীর্ঘ যে, তাহা প্রায় ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে। সুন্দরীগণ এই তৃণশ্যামল আংরাখা ও বৈচিত্র্যবহুল লোহিত ফিতার বন্ধনী মার্কিণ প্রণালীমতে পরিধান করিলে তাহাদিগের পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য নয়নাভিরাম হইত; কিন্তু কোরিয় ললনারা মার্কিণ প্রণালীমতে উহা পরিধান করেন না। তাঁহারা

তৎপরিবর্ত্তে উক্ত কলার (neck-yoke) মস্তকের উপরিভাগে স্থাপিত করেন, এবং আংরাখাটির দ্বারা মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্ব এমন ভাবে আবৃত করেন যে, নেত্রযুগলের মধ্যে একটিমাত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। আংরাখার উভয় পার্শ্বের হাতা কানের কাছে ঝুলিতে থাকে। এরূপ অপূর্ব্ব তৃণশ্যামলপরিচ্ছদধারিণী রমণীমণ্ডলীর অপেক্ষা বিচিত্রবেশধারিণীর কথা কল্পনারও অতীত। কোনও জনাকীর্ণ রাজপথে বা বাজারে বেশবৈচিত্র্যবহুল অসংখ্য রমণী দর্শকের নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকে। অনুরূপসংখ্যক শোকচিহ্নপরিজ্ঞাপক-শিরস্ত্রাণধারী ব্যক্তিবৃন্দ শুভ্রবসনা রমণীকুলের পার্শ্ব দিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। শুভ্রবসনা প্রেতমূর্ত্তিরূপিণী ললনাকুল যখন তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, বা দীর্ঘনলের সাহায্যে ধূমপানে রত হন, তখন স্বতঃই দর্শক চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখেন, তিনি সত্যই স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন, না জাগরিত? এই তৃণশ্যামলবসনধারিণী রমণীকুল কোরিয়ার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের গৃহলক্ষ্মী।

প্রবাদ আছে, বহুপূর্ব্বে একবার নিশীথকালে সিউওল নগর শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই সময়ে নগরে একটিও যোদ্ধৃপুরুষ উপস্থিত ছিল না। বিপদ দেখিয়া নগরের ললনাকুল পতিদিগের ব্যবহৃত জ্যাকেট দ্বারা মস্তক ও শরীর আবৃত করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নগরপ্রাচীরের সমীপে উপনীত হন। শত্রুরা তখন পুরপ্রাচীর আক্রমণ করিয়াছিল। বীর্য্যবতী নারীগণ তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে থাকেন। অরাতিবৃন্দ তাঁহাদিগের লোকাতীত বীরত্ব ও সাহস দর্শনে এবং ছদ্মবেশবশতঃ নারীগণকে পুরুষ ভাবিয়া দুর্গজয় অসম্ভব মনে করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিবার পর, সিউওলের যোদ্ধৃগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ললনাদিগের সাহস ও বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়। তদবধি কোরিয়ার রমণীসমাজ শিরোদেশে কলার ও গ্রীবাদেশে বিচিত্রভঙ্গিতে জ্যাকেট পরিধান করিয়া থাকে। তৃণশ্যামল আংরাখা পরিধান প্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই উপকথাটি রচিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

বেলা ১টার সময় রাজপ্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। ১২টা বাজিবার অত্যল্পকাল পরে আমরা জাপানী দূতনিবাসে সমবেত হইলাম। কেহ নরযানে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা শকটে আরোহণ পূর্ব্বক "ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন" রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সিউওলের জনসাধারণ এরূপ বৈচিত্র্যবহুল মিছিল বা জনযাত্রা পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ! পুরাতন নগরের অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন রাজপথের মধ্য দিয়া আমরা দ্রুতপদে পূর্ব্বতোরণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। বৈদেশিক নৌবিভাগীয় দূতনিচয়, জাপানী সিভিলিয়ান, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী সামরিক কর্ম্মচারীরা সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া অনুগমন করিতেছিলেন। আমাদের সহিত জাপানী ও অন্যান্য বৈদেশিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণও রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ আবর্জ্জনাপূর্ণ অসংস্কৃত রাজবর্ত্মের দুই মাইল পথ অতিবাহন করিতে আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অবশেষে আমরা কোরিয় শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রক্ষিত ও প্রাচীরে বেষ্টিত একটি উদ্যানে উপনীত হইলাম। তথা হইতে পদব্রজে আমরা সযত্নরক্ষিত স্বাভাবিক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমাদের সম্মুখে একটি বিস্তৃত শকট পরিচালনোপযোগী পথ দেখিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে

স্বর্ণতরু। অদূরে শত শত বৎসরের বিশালকায় তরুশ্রেণী বহুল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। এই সুরম্য বীথিটি একটি স্বাভাবিক শৈলের শিখরদেশ অতিক্রম করিয়া নিম্নে উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। বৃক্ষবহুল এই অচল দর্শনে আমার মনে হইল, আমি যেন স্বদেশের কোনও চিরপ্রিয় অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এই অরণ্যের বৃক্ষ, তরু, পুষ্প, সকলই যেন আমেরিকার অরণ্যের মত। শালতরুশাখায় উপবিষ্ট বায়সকুলের কা কা ধ্বনি আমার চিরপরিচিত বলিয়া মনে হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত আমি বিস্ময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিলাম। আমি যে আজ কোরিয়া রাজ্যের অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছি, এ কথা ভুলিয়া গেলাম। স্বদেশের সমস্ত চিত্র আমার নয়নসমক্ষে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইল। কিন্তু এ স্বপ্ন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল দিয়া একটি চতুষ্কোণাকৃতি কমলদলসমাচ্ছন্ন জলাশয় আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। স্বচ্ছ বাপীনীরে বৃহদাকার পদ্মপত্র-সমূহ শোভা পাইতেছে। অদূরে জলাশয়তটে দুইটি সুরম্য হর্ম্ম্য বিরাজিত। প্রাচীন ও রহস্যময় প্রাচ্যদেশের এই বিচিত্র দৃশ্য দর্শনমাত্র আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

দ্বিতল অট্টালিকা দুইটি চীনের আদর্শে নির্ম্মিত। কক্ষপ্রাচীরে কৃষ্ণ, পীত, গোলাপী, বেগ্নি প্রভৃতি বর্ণে চিত্রিত। চিত্রকরের বর্ণবিন্যাসকৌশল প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু মনের উপর তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করে না। বৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্বত্র এইরূপ বর্ণচিত্র, কিন্তু চিত্রকরের তূলিকাস্পর্শে কোনও বর্ণই তেমন উজ্জ্বলভাব ধারণ করে নাই!

দ্বিতলে উঠিবার সোপানশ্রেণীর নিকটে কতিপয় রাজভৃত্য শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। আমরা জনৈক পরিচারকের হস্তে আমাদের কার্ড দিলাম। গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে আমাদের করমর্দ্দন করিলেন। এই কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদও শ্বেতবর্ণ, তাঁহার মস্তকেও অনুচরবর্গের অনুরূপ শিরস্ত্রাণ দেখিলাম। তিনি সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদিগের অভ্যর্থনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আলাপ পরিচয়ের পর আমরা কমলদলশোভিত জলাশয়ের চারি দিকে স্বেচ্ছামত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। জাপানী পার্লামেণ্টের সদস্যবর্গ তরুতলে স্থিত চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ বা ধূমপানার্থ কক্ষান্তরে গমন করিলেন। রাজধানীর যাবতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও নগরস্থ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত বৈদেশিক ভদ্রলোকও রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজসভায় সামরিক ও নৌ-বিভাগীয় বহুসংখ্যক কর্ম্মচারীকে দেখিলাম। পরিচ্ছদের বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভোজসভাটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ইংরাজীভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন, দেখিলাম। কেহ কেহ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। যে সকল জাপানী ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই মুখশ্রী প্রতিভাদীপ্ত; দেখিবামাত্র মনে হয়, তাঁহারা দৃঢ়চেতা, কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান। কিন্তু কোরিয়দিগের মুখমণ্ডলে সে সকল চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তাঁহাদিগের মুখাকৃতি আদৌ কৌতূহলোদ্দীপক বা চিত্তাকর্ষক নহে।

বেলা এক ঘটিকার পর আমাদিগের জলযোগের আয়োজন হইল। ভোজগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তিন চারিটি সুবৃহৎ মার্কিন টেবিলের উপর ইউরোপীয় খানা সজ্জিত রহিয়াছে। কোরিয় সম্রাট ইউরোপীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলে, মিস্ সণ্টান্ নাম্নী একটি ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ মহিলার উপর ভোজের ভার অর্পিত হইয়া থাকে। এই মহিলাটি ঘটনাক্রমে রুসরাজ্য হইতে সুদূর প্রাচ্যভূমিতে আসিয়া কোরিয় সম্রাটের নিকট চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদিগের ভোজের সমুদয় কার্য্যভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং কোরিয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের জন্য ইউরোপীয় প্রথামত খাদ্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। রন্ধনাদি অতি পরিপাটীরূপেই সম্পাদিত হইয়াছিল। কোন দ্রব্যেরই অভাব আমরা বোধ করিতে পারি নাই। চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্য, কিছুরই ক্রটী ছিল না; পেয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তবে শ্যাম্পেন ও ক্লারেট ব্যতীত অন্য কোনরূপ পানীয়ের আয়োজন করা হয় নাই! কোরিয় সম্রাটের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যতই ক্রটী থাকুক না কেন, অতিথিসেবায় কিন্তু কোন ক্রটী লক্ষিত হইল না। তাঁহার রন্ধনশালার কার্য্য যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, কোষাগারের কার্য্য বোধ হয় তেমন শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয় না!

এখনও 'ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতনস্বরূপ' রাজপ্রাসাদটি আমাদের দেখা হয় নাই। আহারাদির পর আমরা উহার সন্ধানে বহির্গত হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমরা 'ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের নিকেতন'টি দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকাটি অরণ্যের একটি নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত। ভূতপূর্ব্ব রাণীর পরিত্যক্ত শূন্য প্রাসাদ দর্শনে আমরা হতাশ হইলাম। অনতি-উচ্চ একতল অট্টালিকা; উল্লেখযোগ্য শিল্পচাতুর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ কক্ষসমূহের কারুকার্য্য বাপীতটস্থ প্রাসাদের তুলনায় অতি সামান্য। অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি মরুবৎ। আমি ত প্রশংসা করিবার মত অট্টালিকাতে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু পরিত্যক্ত প্রাসাদটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি পরম রমণীয়।

প্রাসাদটি যেখানে অবস্থিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অরণ্যের শোভা বিচিত্র। অরণ্যের চতুর্দ্দিকে বিশাল, বিরাট তরুশ্রেণী দণ্ডায়মান। স্নিগ্ধপবনে নানাজাতীয় পুষ্পপরিমলের কোমলগন্ধ, শ্যামল পুষ্পভারাবনত কুঞ্জের বিচিত্র শোভা ও কমলদলচিত্রিত বাপীসলিল প্রকৃতই দর্শকের চিত্তহরণ করিবার উপযোগী। কিন্তু লোকবিশ্রুত 'রাজপ্রাসাদটি' একেবারেই উল্লেখযোগ্য নহে। অট্টালিকা হয় ত 'ধর্ম্মের বাসভূমি' ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের কোনও চিহ্ন আমি ত আদৌ এখানে দেখিতে পাইলাম না। মিষ্টার মর্গানকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সম্রাট কেন এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন আবাসে গমন করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'সাপের ভয়ে। বিশাল বৃক্ষগুলি সর্পসমাকুল। সেই ভয়ে তিনি এই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।' আমি ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিলাম, কোরিয়া রাজ্যের ঐন্দ্রজালিকেরা এই স্থানটি দুষ্টপ্রেতযোনিতে পরিবৃত বলায় সম্রাট ভয়ে স্থানত্যাগ করিয়াছেন। সিউওলের অধিবাসীদিগের তুলনায় ভূতযোনির সংখ্যাই অধিক, এইরূপ একটা জনশ্রুতি আছে। প্রায়

তিন হাজার ঐন্দ্রজালিক বহুসংখ্যক সমাধিস্থলে মৃত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকার্য্যে না কি নিযুক্ত আছে। জাপানীরা যখন এই সকল ঐন্দ্রজালিককে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে, তখন বৃক্ষস্থ সর্পভূত ও অন্যান্য প্রেতযোনিদিগের কি অবস্থা হইবে, বলা যায় না। জাপানীদিগের প্রভাব যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে সম্প্রতি ঐন্দ্রজালিকেরা একখানি জাপানী মানচিত্র মন্ত্রপূত আগুণে পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু হায়! তাহাদের আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। জাপানীদিগের শক্তির হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা রুষদিগকে পরাজিত করিয়া আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

'ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের নিকেতন' দর্শন করিবার পর আমরা নরযানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। অপরিসর আবর্জ্জনাপূর্ণ পথের মধ্য দিয়া প্রায় আধ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমরা আর একটি পরিত্যক্ত জনশূন্য রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলাম। এই অট্টালিকাটিকে 'হত্যা ও অপঘাতমৃত্যুর নিকেতন' বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই প্রাসাদের কোনও কক্ষে কোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাণীকে নিতান্ত পৈশাচিক ভাবে হত্যা করা হয়। জাপানী সচিব ভাইকাউণ্ট মিউরা এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন বা সাহায্য করেন নাই বটে, কিন্তু রাণীকে যে হত্যা করা হইবে, এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। জাপানী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরূপ কলঙ্কপূর্ণ নারকীয় অভিনয়ের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত লোমহর্ষক ঘটনার পর কোরিয়ার রাজাও (তখন তিনি সম্রাট উপাধি লাভ করেন নাই) পলায়নপূর্ব্বক রুসীয় দূতনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হত্যা ও অপঘাত মৃত্যুর প্রাসাদটিকে সিউওল-প্রবাসী বৈদেশিকেরা 'পুরাতন রাজপ্রাসাদ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রাসাদটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'দরবার গৃহ' ও 'গুম্ভমন্দির' উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্রই চীনের শিল্পাদর্শ প্রকটিত। কিন্তু এগুলির শিল্পসৌন্দর্য্য জাপানের প্রাচীন মন্দিরনিচয়ের ভাস্কর-শিল্পের সহিত তুলনীয় নহে। জাপানের প্রত্যেক প্রাচীন মন্দিরে চীনের লোকপ্রসিদ্ধ শিল্পচাতুর্য্য বিদ্যমান।

প্রদোষকালে আমি একাকী নগরের মধ্যে পর্য্যটন করিতে বাহির হইলাম। নগরের বাজারে ও রাজপথের পার্শ্বস্থ দোকানে কোরিয়া-জাত দ্রব্যাদি দেখিয়া আমার কৌতূহলনিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলাম। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও দুই প্রকার রাজপথ দেখিলাম। কোন কোন রাজপথের উভয়পার্শ্বস্থ অট্টালিকায় নাগরিকেরা বাস করেন; এ গুলিকে আবাসপল্লী বলা চলে। আবার কতিপয় রাজপথের দুইধারে কেবল দোকান ও কার্য্যালয়। জনতাবহুল রাজপথের মধ্যে কতিপয় পথ প্রশস্ত বটে, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকানিচয় সুরম্য বা সুবৃহৎ নহে। একতলা গৃহের সংখ্যাই অধিক। প্রায় সকল গৃহেই খোলা বা পাতার চাল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিদেশজাত দ্রব্যের সংখ্যাই অধিক। নানারূপ শিরস্ত্রাণ, দীর্ঘাকার ধূমপানোপযোগী নল, ছোট ছোট ছুরি, কাঠের চিরুণী, মসৃণ কাগজের tarpulins, সামুদ্রিকশঙ্খনির্ম্মিত চামচ, বহুবিধ ধান্য ও মাদুর ব্যতীত অন্য কোন কোরিয়া-দেশজাত দ্রব্য কোনও দোকানে দেখিলাম না। এক সময়ে জাপান

কোরিয়ার নিকট হইতে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে কোরিয়া-দ্বীপবাসী জাপানীদিগকে ভাস্করশিল্প, সূক্ষ্মশিল্প, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, বস্ত্রবয়নপ্রণালী,রেশমের চাষ ও নানাবিধ ধাতু দ্রব্যের উপর সূক্ষ্ম খোদকারীর কার্য্য শিখাইয়াছিল, এখন তাহার এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে, কোরিয়াজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যও ভ্রমণকারীর বাক্‌সে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত নহে। আমি যে সকল দ্রব্য দেখিলাম, তদ্ব্যতীত আরও উৎকৃষ্ট স্থানীয় দ্রব্য থাকিতে পারে, কিন্তু আমার চক্ষে একটিও তখন পড়ে নাই। অন্যান্য দ্রব্যাদি জাপানের আমদানী।

পরদিবস কোরিয় সম্রাট তাঁহার অধিকৃত প্রাসাদের মধ্যে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। প্রাসাদটির চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত। বৈদেশিক দূতনিবাস ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদটি দেখিতে আমেরিকার কোন সাধারণ বৃহদাকার দ্বিতল অট্টালিকার মত। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় আমরা একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এই কক্ষটি অভ্যাগতদিগের বিশ্রামার্থ নির্দ্দিষ্ট। পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে কক্ষটি সজ্জিত। কক্ষপ্রাচীর সুচিত্রিত, গৃহতল একখানি সুরম্য মার্কিন গালিচায় আবৃত। কক্ষটি সুসজ্জিত হইলেও আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। কারণ সর্ব্বত্রই একটা অসামঞ্জস্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সম্রাট একটি প্রশস্ত কক্ষে অমাত্যবর্গসমাবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা একে একে তথায় নীত হইলাম। কক্ষটি গালিচাবৃত। বাতায়নগুলি পীত ও রক্তাভ রেশমী যবনিকায় শোভিত। গৃহের এক প্রান্তে একটি অত্যুচ্চ মঞ্চ। রক্তবস্ত্রে মঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে আবৃত। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি পীত ড্রাগনমূর্ত্তি। মঞ্চের পশ্চাতে একখানি রেশমী যবনিকা শোভা পাইতেছে। যবনিকার উপরে একটি বৃক্ষরাজিশোভিত নদীর চিত্র অঙ্কিত। নদীনীরে নানাবিধ জলচর পক্ষী বিচরণ করিতেছে। এই মঞ্চোপরি সম্রাট, যুবরাজ ও আর একটি ব্যক্তি দণ্ডায়মান। শেষোক্ত ব্যক্তিটির মুখাকৃতি রমণীসুলভ। কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে পীড়া, অশান্তি ও দুঃখের বিষাদ-কালিমা যেন পরিস্ফুট। এই কর্ম্মচারীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে তুর্কীস্থানের খোজা বলিয়াই আমার অনুমান হইতেছিল। সমবেত পারিষদবর্গ সকলেই শ্বেতবস্ত্রপরিহিত। সকলেরই চরণে শ্বেতবর্ণের পাদুকা, এবং মস্তকে প্রায় দেড়তলা উচ্চ শ্বেতপক্ষাবৃত শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছে। কোরিয় রাজসভার সকলকেই উক্তরূপ শিরোভূষণ মস্তকে ধারণ করিতে হয়। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার সময় আমরা সকলেই একে একে সম্রাটকে অভিবাদন করিলাম। দ্বার পার হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার আমরা সম্রাটকে অভিবাদন করিলাম। আসনে উপবেশন করিবার সময়ও আর একবার অভিবাদন করিতে হইয়াছিল।

প্রথম দর্শনেই সম্রাটকে বিনয়ী, সদালাপী বলিয়া মনে হয়। সম্রাটের বর্ণরাগহীন প্রোঢ় মুখমণ্ডল দেখিলে মনে হয় না যে,তাঁহার মানসিক শক্তি বা প্রবল নৈতিক বল আছে। কিন্তু যখন তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সম্রাটের চিত্ত তাদৃশ দুর্ব্বল নহে। আত্মসংযম, রহস্যপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্গুণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপকালে আপনি পরিস্ফুট হয়। সম্রাট সদালাপী, তাঁহার কথোপকথনভঙ্গিতে একটি আকর্ষণ আছে

আমাদের সহিত তাঁহার অত্যল্পকালই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার আমার অবকাশ হয় নাই। তথাপি আমার মনে হয়, সম্রাট আরামপ্রিয়, আত্মসুখতৎপর, কিন্তু সুবুদ্ধিশালী। যুবরাজের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশবর্ষ হইবে। তাঁহারও মানসিক শক্তির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। জনপ্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তিনি যে কোরিয়ার ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। যুবরাজের পার্শ্বে যে রাজঅনুচরটি দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া আমার মনে হইল। তাঁহার শীর্ণ বিবর্ণ অশান্তিছায়াচ্ছন্ন নারীজনসুলভ মুখমণ্ডলের উপর দুরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার আভাস দেখিতে পাইলাম। কোরিয় সম্রাটের হৃদয় ভাব অপেক্ষা আমি এই কর্ম্মচারীর হৃদয়নিহিত ভাবের কিয়দংশ জানিতে পারিলে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার মুখচ্ছবি এখন আমার ভাল স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু যদি আমি উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে এই অনুচর বা কর্ম্মচারীর মুখমণ্ডল বর্ণরাগে এরূপ চিত্রিত করিতাম যে, সহস্রচিত্রপরিপূর্ণ চিত্রশালিকার মধ্যে স্থাপিত হইলেও সেই মুখ প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিত।

রাজপ্রাসাদে কিছু জলযোগ করিয়া আমরা বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তার পর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা পরস্পরের নোটবুক মিলাইয়া দেখিলাম।

সিউওলে অবস্থানের শেষ দিবসে জাপানী দূতনিবাসে আমাদের উদ্যানবিহারের নিমন্ত্রণ হইল। দুই শত ফিট উচ্চ একটি শৈল-শিখরে ভোজের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা বৃক্ষ-চ্ছায়ায় বসিয়া, বেড়াইয়া, গল্প করিয়া দেড় ঘণ্টা কাল কাটাইয়া দিলাম। আমাদিগের মনো-রঞ্জনের জন্য কোরিয়ার ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। পবনে সঙ্গীতের সুমধুর ঝঙ্কারে একটা মোহজাল রচনা করিতেছিল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া ক্রমে সমুদ্রের নীল জলবিস্তারের উপর প্রসারিত হইতেছিল। ধীরে ধীরে চারি দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শৈলশিখর হইতে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কনকরশ্মিতে সিউওল নগরটি পরিচ্ছন্ন ও পরম রমণীয় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ;—তখন নগরপথে আবর্জ্জনা দেখা যাইতেছিল না। সেই সান্ধ্যমুহূর্ত্তে সিউওলকে পরম পবিত্র ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইল।

বলরাম-চূড়া।

উচ্চ তরুশাখে তার আবীরের কি বাহার!
চমৎকার বলরাম-চূড়া!
রেবতীরমণ-আঁখি হ'ত যথা ঘোর লাল
উপহাসি' লাজে লাল সুরা!

কি সুন্দর তরুবর! মনোহর! মনোহর!
গুচ্ছে গুচ্ছে শোভে রাঙ্গা ফুল,
শিরে চূড়া, নীল ধড়া, যেন দেব হলধর,
কানে দোলে বীরবৌলি দুল!

হে চিরসুন্দর হরি! চারি ধারে, মরি মরি!
কি সৌন্দর্য্য ছড়ায়ে রেখেছ!
হে চিন্ময়, হে অরূপ, এ কি হেরি অপরূপ,
বিশ্বরূপ হইয়া বসেছ!

ইচ্ছাময়! ইচ্ছা করি' প্রকাশিলে আপনারে,
আকাশ হইল ঘট পট;
মায়ার মুখস পরি' সাজিলে গো, মরি মরি!
বহুরূপী ছদ্মবেশী নট!

কোথাও বা অতি ভীমা লোলজিহ্বা শ্যামা বামা,
উলঙ্গিনী উন্মাদিনীবেশা,
মায়াবিনী কাচি' কাচ, নাচিছ তাণ্ডব নাচ,
আলু থালু অতিমুক্তকেশা!

রাধিকার রূপ ধরি' কভু রাসরাসেশ্বরী,
লীলাময়ী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী;
ব্রীড়ারক্ত হ' অধরে হাসিছ মোহন হাসি,
চরণে নূপুর রিণি ঝিনি!

কভু মা গো! গৌরকান্তি নিরুপমা উমা সাজি'
দশভুজা অম্বুজ-চরণা;
রূপে দিক আলো করি' চুরি কর ভক্ত-চিত্ত,
ভাবে ভোর উল্লাস-মগনা!

কভু ম্যাডোনার বেশে শিশু খৃষ্টে ক্রোড়ে করি'
করিতেছ বদন-চুম্বন;
কভু মা যশোদা সাজি' শিশু কৃষ্ণে বুকে ধরি'
সোহাগে কহিছ যাদু ধন!

তা থেই তা থেই নৃত্য! পরি' শুধু দিগম্বর,
কভু তুমি পাগল মহেশ!
কভু গলে বনমালা, শিরে চারু কৃষ্ণচূড়া,
ধরিছ রাখাল-রাজ-বেশ!

আজি হেরি প্রেম-চক্ষে ভাবে দুটি আঁখি মুদি'
সাজিয়াছ এ কি অভিরাম?
কি সুন্দর! কি সুঠাম! শিরে শোভে লাল চূড়া,
মদিরলোচন বলরাম!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চিত্তে লঘুতা" নামক সুদীর্ঘ শিরোনামে যে 'বহ্বারম্ভে'র সূত্রপাত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই, উপসংহারে তাহা 'লঘুক্রিয়া'য় পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, "এক কারণে প্রতীচ্য দেশ সকলের সাহিত্যে লঘুতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহা জীবনসংগ্রামের তীব্রতা ও তজ্জনিত কার্য্যে ব্যস্ততা।" বঙ্কিম বাবুর ওস্তাদজী উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় বলিতেন, "এক কারণ ছোড়কে দুই কারণ হুয়া!" প্রতীচ্য "দেশ সকলের" সাহিত্যের মধ্যে তিনি কেবল প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাধারণ সাহিত্যে 'লঘুতা' থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারই নিম্ন স্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর স্রোত প্রবহমান, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। কোন্ প্রবাহে বুদ্বুদ নাই? কেবল উপরের বুদ্বুদ দেখিয়া সাহিত্য-প্রবাহের 'স্বরূপ' নির্ণীত হইতে পারে না। শাস্ত্রী মহাশয়, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশকে 'প্রতীচ্য দেশ সকলে'র তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন। য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য এত উন্নত, গুরুতার তুলনায় তাহার লঘুতা এত অল্প, আমাদের ইদানীন্তন শিশু-সাহিত্যের তুলনায় সে সাহিত্য এমন বিরাট যে, আমাদের সাহিত্যের প্রসঙ্গে সে সাহিত্যের উল্লেখ করিলে, আমাদের লঘুতাই সূচিত হয়। য়ুরোপের তুলনায় য়ুরোপে জীবনসংগ্রাম তীব্র হইতে পারে; কিন্তু সেখানে এক প্রবল সম্প্রদায় জীবনসংগ্রামে সাহিত্যকেই আপনাদের অস্ত্র করিয়াছেন। বাহিরের যুদ্ধের সহিত তাহার সংস্রব নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সে সংগ্রামের জয়-পরাজয় সীমাবদ্ধ, সাহিত্যের সেবক-বর্গই তাহার ফলভাগী। ব্যক্তিগত পরাজয়ে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি,—কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনার পরাজয়ে সাহিত্যের ক্ষতি নাই; বরং জেতার জয়ে সাহিত্যেরই জয় হইতেছে। আমাদের জীবন্মৃত সমাজে এ বীরত্বের অবকাশ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"আমাদের

জাতীয় চিত্তে লঘুতা প্রবেশ করিবার কথা নহে। তবে যদি লঘুতা আসে, তাহার অন্তর্বিধ কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে।" সে কারণ এই,—(১) "কি এক প্রকার অবসাদ জাতীয় চিত্তকে ঘিরিয়া রহিয়াছে;" (২)"একখানি বহু শত মণ প্রস্তরের যাঁতার ন্যায় একটি বিদেশীয় শক্তি আমাদের উপর চাপিয়া রহিয়াছে;" (৩) "হিন্দু প্রকৃতিই আশাশীল নহে।" শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যাহারা জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত, তাহাদের সাহিত্যে লঘুতা প্রবেশ করে। এখানে বলিতেছেন, যাহারা জীবনসংগ্রামে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যেও লঘুতা প্রবেশ করিবে। তবে কোন পথ অবলম্বন করিব? মধ্যপথ? শাস্ত্রী মহাশয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। লেখক চিন্তার উদ্রেকমাত্রেই প্রবন্ধ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অবকাশ পান নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় চিন্তাশীল লেখকের প্রবন্ধেও এই কারণে 'লঘুতা প্রবেশ' করিয়াছে সে লঘুতা ভাষাকেও ক্ষমা করে নাই। "গভীর আলোচনার প্রতি অসহিষ্ণু", "যাহাতে ক্ষণেক হাস্যের উদয় করে" ও "মাসিক সাহিত্যের কাথ নিঙড়াইয়া দেয়" প্রভৃতিই তাহার সাক্ষী। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "গ্যালিলিওর মন্ত্র" কোন মতেই লঘু নহে। লেখক প্রবন্ধটিকে 'জীবনচরিতের খাতা-ভুক্ত' করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদেরও সে দুরভিসন্ধি নাই। ইহাতে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, বক্তৃতা প্রভৃতি বিবিধ দুরূহ বিষয়ের সমাবেশ আছে। তাহার উপর ভাষার অত্যাচারে অনেক স্থলে বক্তব্য বিষয়ের সন্ধানই পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রবন্ধটিকে দুরূহ-খাতে জমা করিয়া লইলে বোধ করি কোনও ক্ষতি নাই। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের "আর্য্যজাতির আদি দেবতা" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "সংযম" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তুর সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। গল্পটি বিকশিত হইবার অবকাশ পায় নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "লায়েক ছেলে"রও আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ইহাও বিজয় বাবুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুঃখের বোঝা" পত্রে রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু সামান্য;—সতীশচন্দ্র ইংরাজী পোষাক পরিয়া স্বদেশ-উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন। সতীশের দিদি রাধারাণী ভাইকে প্রায় সাহায্য করিতেন। সতীশের ইঙ্গ-বঙ্গ-বেশ রাধারাণীর চক্ষুঃশূল ছিল। ভগিনীর শত অনুরোধেও ভ্রাতা সে মোহন বেশ ছাড়িলেন না; কিন্তু টালার দাঙ্গায় এক জন মুসলমান গোরা-ভ্রমে যখন সতীশকে তাড়া করিল, সতীশ তখন প্রাণের দায়ে গৌর-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রাধারাণীর একখানি শাড়ী পরিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। সেই অবধি তিনি আর বিলাতী পোষাক ব্যবহার করিতেন না। এরূপ গল্প যেরূপ সুশাণিত ভাষায় জমিতে পারিত, গল্পের ভাষায় সেরূপ 'ধার' নাই। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-শিক্ষা" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "রত্নাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী" সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক রচনা। বামনদাস বাবু এই প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বাঙ্গালী" প্রবন্ধ লেখকের অনুসন্ধান-পটুতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের "অজণ্টা গুহায় দুইদিন" সংক্ষিপ্ত ভ্রমণকাহিনী,—উল্লেখযোগ্য।

ভারতচন্দ্র।

কবি ও কাব্য।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরস্থট পরগণাস্থ পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এক জন ধনবান ভূম্যধিকারী ও 'রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। জনরব, তাঁহার প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। (১) স্বীয় সম্পত্তি ও ধনরক্ষার জন্ত তাঁহাকে কালোপযোগী ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজধানী পরিখাবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। (২) ভবানীপুরে ও পেঁড়োয় তাঁহার দুর্গও ছিল। নরেন্দ্রনারায়ণের চার পুত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ।

"সত্যপীরের কথা"য় ভারতচন্দ্র নিজ পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥"

"বিদ্যাসুন্দরের"ও আছে,—

"ভুরসিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর।"

বর্দ্ধমানরাজের সহিত অধিকারের সীমা-নির্ণয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর সম্বন্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। অপমানিতা রাজমাতার আদেশে বর্দ্ধমানের সেনাদল ভবানীপুরের ও পেঁড়োর গড় আক্রমণ করিয়া হস্তগত করে; নরেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বনাশ হয়।

(১) বিশ্বকোষ।
(২) R. C. Dutt—Literature of Bengal.

সম্পদসৌভাগ্যচ্যুত ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণায় গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে গমন করেন। তথায় অবস্থিতিকালে তাজপুরস্থ টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হয়েন। তাঁহার সংস্কৃতভাষায় অধিকারের প্রমাণ তাঁহার সকল রচনাতেই স্বপ্রকাশ।

এই সময় ভারতচন্দ্র তাজপুরের নিকটবর্ত্তী শারদাগ্রামবাসী জনৈক কেশর-কুণী আচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে ভারতচন্দ্রের বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সেই কারণে ও অর্থকরী পারসী শিক্ষা না করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করাতে তিনি সহোদরগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েন, এবং অভিমানে গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষমাত্র।

গৃহত্যাগী, অভিমানী, তরুণ যুবক ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে হুগলী জেলায় বাঁশ-বেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুরগ্রামবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে উপনীত হয়েন, এবং গৃহস্বামীর যত্নে পারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। "সত্যপীরের কথা"য় তাহার উল্লেখ আছে।—

"দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥"

কৃতজ্ঞ কবি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতে কোথাও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই সময় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। কিন্তু পারসী-পাঠেই তাঁহার প্রাণপণ ছিল। তিনি তাহাতেই বিশেষ চেষ্টিত হইতেন। তখন তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইত। "একবার রাঁধিয়া দুবেলা খাইতেন—একটী বেগুণ পোড়ার আধখানি দিনমানে খাইয়া আর আধখানি রাত্রির জন্য রাখিয়া দিতেন।" (৩)

এই সময় একটি ঘটনায় ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা গগনমণ্ডলে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "ভারত যে নিগূঢ় কবিত্বরত্নের আকর, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না"। (৪) মুন্সীবাবুদিগের গৃহে সত্যনারায়ণের সির্ণি উপস্থিত হয়। পাঁচালী পড়িবার জন্য আদিষ্ট হইলে ভারতচন্দ্র প্রচলিত পুঁথি না পাঠ করিয়া ত্রিপদী ছন্দে গ্রথিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাহাতে

(৩) চরিতাষ্টক।

(৪) রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

সকলেই তাঁহার কবিত্বশক্তিদর্শনে বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। আর একবার সির্ণি উপলক্ষে পূর্ব্ববারের মত অনুরুদ্ধ হইলে তিনি চৌপদী ছন্দে আর একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই শেষোক্ত "ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা", অর্থাৎ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে।

বিংশবর্ষ বয়সে পারসীতে কৃতবিদ্য হইয়া তবে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট সামান্য কিছু সম্পত্তি ইজারা লইয়াছিলেন। তিনি ঐ সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমানে প্রেরিত হয়েন। যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় ঐ সম্পত্তি বর্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক খাস করা হয়। ভারতচন্দ্র যুবকসুলভ ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত আপত্তি করেন, এবং ফলে কারারুদ্ধ হয়েন। বর্দ্ধমান রাজদরবারে উকীলের দুর্দ্দশার কথা ভারতচন্দ্রের ভুলিবার কথা নহে সত্য। কিন্তু যদি রচনায় তিনি তাহার আভাষ দিয়া থাকেন, তবে স্বীকার করিতে হয়, কবি বৈষ্ণবোচিত ক্ষমায় দরবারের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া আপনার স্মৃতিতে বিদ্রূপের প্রগাঢ় প্রলেপ দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভারতচন্দ্রকে অধিক দিন কারাক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহায়তায় তিনি রাত্রিযোগে পলায়ন করেন, এবং ভৃত্য সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমানাধিকার ত্যাগ করিয়া কটকে মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয়ে উপনীত হয়েন। কিছু দিন পরে ভারতচন্দ্র তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচলে গমন করেন। শিবভট্ট দয়াপরবশ হইয়া আদেশঘোষণা করেন যে, ভারতচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য বিনাকরে শ্রীক্ষেত্রবাসী হইতে পারিবেন; যখন যে মঠে ইচ্ছা, সসম্মানে থাকিতে পারিবেন; এবং প্রত্যহ একটি করিয়া বলরামী আট্‌কে (৫) পাইবেন। ভারতচন্দ্র কিছু কাল শঙ্করাচার্য্য-মঠে বাস করিয়া দেবপ্রসাদ ও রাজপ্রসাদ ভোগ করেন। এই সময় বৈষ্ণবসহবাসে তিনি বৈষ্ণব মতের আলোচনা করেন, এবং বৈষ্ণবমতের অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণবমতানুরক্তি সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বঙ্গসাহিত্যের এক জন ইতিহাসলেখক বলেন, ভারতচন্দ্র সত্য সত্যই বৈষ্ণবমতের অনুরক্ত হইয়াছিলেন। (৬) কিন্তু তিনি বলেন, "অন্নদামঙ্গলে" ব্যাসের মতান্তরগ্রহণের কথায় কবি

(৫) এক নাগরী আতপ চাউলের অন্ন, এক কাটরা ঝালের তরকারী ও এক কাটরা অরহরের দাউল।

(৬) R. C. Dutt—Literature of Bengal.

আপনার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ব্যাস "ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব।" তাহাতে শিব বলেন,—

"হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

ভারতচন্দ্র অন্য ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিবার পূর্ব্বে, তিনি কোন্ মতাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক। (৭) যদি তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি মতান্তর গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ পরে বিবৃত করিব। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় যেরূপ বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্যাসের মতান্তর-পরিগ্রহণের কথায় ভারতচন্দ্র স্বীয় মতান্তর-পরিগ্রহণের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, সেইরূপ বিচারে পরবর্ত্তিগণও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে, বহুদিন কৈফিয়তের মধ্যে বাস করিয়া বহু কৈফিয়ৎ লইয়া ও দিয়া তিনি সহজ ব্যাপারকেও কৈফিয়তের জটিলতামুক্ত করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র প্রকৃত বিশ্বাসবশে ব্যাসের মতান্তর-পরিগ্রহণচ্ছলে হরিহরের অভেদত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, মনে করিলেই, সহজ মীমাংসা হয়।

বঙ্গসাহিত্যের আর এক জন ইতিহাসলেখক ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণবমতগ্রহণের আন্তরিকতায় সন্দিহান। (৮) ভারতচন্দ্রের নীলাচলবাসের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"এই সময় তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে (৯) অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে,কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিদ্রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়,—'চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে'। (১০) এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয়।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,— "তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধুয়াতে পরিণত হইয়া যায়।"

---

(৭) আমরা চেষ্টা করিয়াও ইহা জানিতে পারি নাই। কোন অভিজ্ঞ পাঠক এ বিষয় জানাইলে বাধিত হইব।—লেখক।

(৮) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(৯) বৈষ্ণব ধর্ম্ম না মত? বৈষ্ণব মত কি হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত নহে?

(১০) সম্পূর্ণ কবিতাটি পাঠ করিলে ইহাকে বিদ্রূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকে কি না সন্দেহ। আমরা উদ্ধৃত করিতেছি;—

পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়,—দুর্ভাগ্য ভারতচন্দ্রের, না আমাদের? যখন মনে করা যায়, ভারতচন্দ্র যে সমাজে ও যে সভায় আপনার কাব্য-সম্পদ-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছিলেন, সে সমাজে ও সে সভায় বোদ্ধার অভাব ছিল না, তখন বোধ হয় দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা বহুদেশের বহু টীকা সংগ্রহ করিয়া বিদেশীয় গ্রন্থকারদিগের রচনার ভাবগ্রহণের চেষ্টা করি, কিন্তু স্বদেশীয় কবিদিগের রচনা যথোচিত মনোযোগ সহ পাঠ করা আবশ্যক মনে করি না।

ভারতচন্দ্রের সমস্ত রচনায় কোথাও বৈষ্ণবমতের প্রতি বিদ্রূপ দেখা যায় না। "বিদ্যাসুন্দরে" ভারতের কৃষ্ণভক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। "ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ", "পরিণাম হরিনাম" ইত্যাদি নানা পদে সে ভক্তির প্রমাণ স্বপ্রকাশ। "মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি"র মধ্যেও ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমস্তিকে।" তাঁহার

"চল চল সব ব্রজকুমারী
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি"

ইত্যাদি পদ আজও অনেকের কণ্ঠস্থ। অন্নদামঙ্গলের আরম্ভে দেবদেবীবন্দনা আছে। গণেশবন্দনায় কবি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাবে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।"

শিববন্দনায় এই কথাই পুনরুক্ত হইয়াছে। সূর্য্যবন্দনায় তিনি বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণচন্দ্রভূপে চাহিবে স্বরূপে ভারতচন্দ্রের স্তবে।" লক্ষ্মীবন্দনায় তিনি বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণচন্দ্র বাসে থাক সদা হাসে রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে।" যে অন্নপূর্ণার মহিমা-কীর্ত্তনে অন্নদামঙ্গল রচিত, তাঁহার বন্দনায় কবির উক্তি,—

"রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস।"

"চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে॥
মহাপ্রভু জগনাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয়বটতলে॥
খাইয়া প্রসাদভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতুহলে॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন ভারত ভূমণ্ডলে॥"

কৃষ্ণচন্দ্র কালীভক্ত,—“কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।” কৌশিকীবন্দনায় কবি বলিয়াছেন,—“ভারতে করহ দয়া” ; “কৃষ্ণচন্দ্ররায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে অভয় দেহ অভয়া।” কেবল “সরস্বতীবন্দনায়” কবি বলিয়াছেন,—“ভারতের ভারতী ভরসা।” আর “বিষ্ণুবন্দনায়” তিনি ব লয়াছেন,—

“ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।”

“বিদ্যাসুন্দর” কি কেবল অশ্লীলতার চারুশিল্প? সে পুস্তক কি গোবিন্দ-গীত নহে?

“খাইয়া প্রসাদভাত মাথায় মুছিব হাত নাচিব গাইব কুতূহলে” ইহাই কি বিদ্রূপ? বৈষ্ণব কবির পক্ষে ইহা বলাই কি স্বাভাবিক নহে? জগন্নাথের রথযাত্রাকালে পুরীর রাজা স্বয়ং আসিয়া সম্মার্জ্জনী লইয়া চণ্ডালের কার্য্য করেন। এই ভক্তিপ্রকাশ রাজবংশের কুলাচার। (১১) এই দেবতার প্রসাদ কখনও পবিত্রতাভ্রষ্ট হয় না। সে প্রসাদভক্ষণকালে জাতিবিচার থাকে না। চণ্ডালও ব্রাহ্মণকে সে প্রসাদ দিতে পারে। পুরীর পুরোহিত ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বি-দত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করেন। (১২) এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস বুঝাইবার জন্য বিদেশীয় ভিন্নধর্ম্মী ঐতিহাসিক ডাক্তার হণ্টার কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত গল্পটি প্রদান করিলাম। তিনি তাঁহার উড়িয়া ভৃত্যের নিকট ইহার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একবার এক জন গর্ব্বিত যাত্রী জগন্নাথধামে আসিয়া প্রসাদভক্ষণে অসম্মত হয়েন। ফলে নগরের বহির্দ্দেশে সেতু অতিক্রমকালে তাঁহার হস্ত পদ দেহচ্যুত হইয়া পড়ে। তিনি সেই অবস্থায় দীর্ঘ দুই মাস রাজপথে পতিত রহেন। তাহার পর এক দিন একটি সারমেয় সেই পথে গমন করিতেছিল ; তাহার মুখচ্যুত লালাসিক্ত প্রসাদকণা রাজপথের ধূলায় পতিত হয়। সেই হতভাগ্য গর্ব্বান্ধ ব্যক্তি তখন কোন রূপে সেই স্থান পর্য্যন্ত যাইয়া সেই সারমেয়বদনভ্রষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করেন। তখন তাঁহার নূতন হস্তপদাদি আবির্ভূত হয়। (১৩) এই মহাপ্রসাদ সর্ব্বপাপহর। শুষ্ক মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধে পিণ্ডে প্রদত্ত হয়। ইহা এমনই পবিত্র। (১৩) ভক্তগণ যে প্রসাদ এইরূপ পবিত্র মনে করেন, তাঁহারা সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, অন্য খাদ্যভোজনের পর যেমন হস্তমুখাদি প্রক্ষালিত

(১১) Stirling—Orissa.
(১২) Hunter—Orissa.
(১৩) Hunter—Orissa.
(১৪) Rajendra Lala Mittra—Orissa.

করেন, সেরূপ না করা অস্বাভাবিক নহে, বরং স্বাভাবিক। ইহার পর "নাচিব গাইব কুতূহলে"—ইহাই কি বিদ্রূপ? নৃত্যাদিসহকৃত সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবমত-প্রচারের এক প্রধান অঙ্গ। দরবেশ-নৃত্যের মত বৈষ্ণবসঙ্কীর্ত্তনও ধর্ম্মমত্ততার সোপান। (১৫) 'ভাবলাগা'র দৃষ্টান্ত এখনও এ দেশে বিরল নহে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগেরও এইরূপ 'ভাব লাগে'—এই সময় (moments of ecstasy) তাঁহারা যেন সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। (১৬)

শেষ কথা, ভারতচন্দ্রকে ভণ্ড মনে করিবার কারণ কি? বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনযাত্রায় তাঁহার কি স্বার্থ সিদ্ধ হইত? তখনও ধর্ম্ম হিন্দুর নিকট পার্থিব সকল সম্পদ অপেক্ষা আদরের। তখনও ভ্রাতৃবিচ্ছেদে গৃহবিগ্রহের জন্য সকলেই অনেক সম্পত্তি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেন। ধর্ম্ম তখনও ইচ্ছায় পরিধান ও ইচ্ছায় পরিহার করিবার মত আবরণমাত্রে পরিণত হয় নাই। বিশেষ বৈরাগীর গৈরিক বেশ তখনও দেশে ও বিদেশে 'ফ্যাশন' হয় নাই।

বৃন্দাবনের পথে ভারতচন্দ্র খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গোপীনাথ জীউর মন্দিরে গমন করিলেন। সেই স্থানে ভক্তদল কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি প্রসাদ খাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্য জানিত, সেই গ্রামে তাঁহার শ্যালীপতির বাস। ভারতচন্দ্র যখন তন্ময় হইয়া নামামৃতপানে বিভোর, সেই অবকাশে ভৃত্য তাঁহার শ্যালী-পতিকে সংবাদ দিয়া আসিল। তিনি আসিয়া বহু যত্নে ভারতচন্দ্রকে গৃহে লইয়া যাইলেন। তাঁহার অনেক অনুরোধেও ভারতচন্দ্র স্বীয় গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, উপার্জ্জন করিতে না পারিলে আর গৃহে যাইবেন না। চরিত্রের এই দৃঢ়তা কবির জীবনে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

শ্যালীপতি ভারতচন্দ্রকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃতপাঠকালে ভারতচন্দ্র স্বীয় মনোনীতা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর, সংস্কৃতপাঠ ও সেই বিবাহ, এই দুই কারণে, তিরস্কৃত হইয়া তিনি গৃহ-

---

(১৫) দরবেশ-নৃত্যে নর্ত্তকের দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধ দিকে ও বাম বাহু নিম্ন দিকে থাকে। ঊর্দ্ধমুখ বাহুতে করতল যাচ্ঞার ভাবে ও অধোমুখ বাহুতে করতল দানের ভাবে প্রসারিত থাকে। স্বর্গ হইতে দেবপ্রভাব লাভ করিয়া পৃথিবীতে তাহার দানই যেন অভিপ্রেত, ইহাই ইহার ব্যাখ্যা (Simpson—Buddhist Praying Wheel.) বৈষ্ণবদিগের ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্যে মানবাত্মার স্বর্গকামনা সূচিত হইতে পারে।—লেখক।

(১৬) Oldenburg—Buddha.

ত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি নানা বিপদে পতিত হয়েন। দীর্ঘকাল পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। যিনি ভারতচন্দ্রের তরুণ হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র পুনরায় "সর্ব্বোপকারক্ষম" গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতৃগণের পূর্ব্বব্যবহারের স্মৃতি অভিমানী যুবকের হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই; তাই তিনি শ্বশুরকে নিষেধ করিলেন, যেন তিনি তাঁহার পত্নীকে ভারতের পিতৃগৃহে প্রেরণ না করেন। সংসারী হইয়া ভারতচন্দ্র আবার উদরান্নসংস্থানের চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রণেতা ভারতচন্দ্রের বৃন্দাবনযাত্রায় বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার শ্বশুরালয়-গমনের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না,—নিজের অভ্যস্ত ব্যঙ্গসহকারে এক স্থলে লিখিয়াছেন—'দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর।" (১৭) যে পত্নীর ব্যবহার সংসারবিরাগী ভারতচন্দ্রকে পুনরায় সংসারী করিয়াছিল, সেই পত্নীর আদরে তিনি "বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না" সন্দেহ! আপ্যায়িত না হইলে তিনি সংসারী হইতেন না; শেষজীবনে রাজসভার কোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে সেই পত্নীর সাহচর্য্যে জীবনসায়াহ্ন শান্তিসুখস্নিগ্ধ করিতেন না। যিনি সহোদরদিগের দুর্ব্ব্যবহার ক্ষমা করিতে পারেন নাই, তিনি পত্নীর দুর্ব্ব্যবহার বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহুবিবাহকারিগণকে বিদ্রূপ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন,—

"এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥"

বিস্ময়ের বিষয়,বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসলেখক ভারতচন্দ্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসকে বিদ্রূপ ও শাণিত বিদ্রূপকে গম্ভীর মতাভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন!

ইহার পর ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় উপনীত হইলেন। তিনি গোন্দলপাড়ার কোন ব্রাহ্মণগৃহে আহার করিয়া ফরাসী গভর্মেণ্টের দাওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কর্ম্মের উমেদারী করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের পরিচয় ছিল; মহারাজ সময় সময় আবশ্যকমতে তাঁহার নিকট ঋণগ্রহণ করিতেন—সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বাধ্যবাধকতাও ছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বশক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রতি

(১৭) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত ছন্দোবিষয়ে বিকৃত পাঠ আমরা কোথাও দেখি নাই।—লেখক।

কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে স্বীয় সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। এত দিনে ভারতচন্দ্রের প্রতিভাপদ্ম-বিকাশের অন্তরায় জলদজাল অপসৃত হইল; তিনি ভারতী ভরসা করিয়া যশ-অর্জ্জনের সুযোগ পাইলেন।

ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতজ্ঞতার ঋণ সুদ সহ পরিশোধ করিয়াছেন; তাঁহাকেও বঙ্গসাহিত্যের অক্ষয় স্বর্গে আসনদান করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি-রূপে ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল", "বিদ্যাসুন্দর" ও "মানসিংহ" রচনা করিলেন, এবং কৌশলে তিনখানি এক সূত্রে গ্রথিত করিলেন। প্রীত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ভারতচন্দ্র স্ত্রীপরিবারের কোনও তত্ত্ব লয়েন না দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে আপনার সকল কথা জানাইয়া বলিলেন, গঙ্গাতীরে বাস করিবার সুযোগ পাইলে তিনি পরিবার লইয়া সংসারধর্ম্ম করেন। ইহা অবগত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয় কবিকে গঙ্গাতীরে স্বীয় অধিকারস্থ মূলাযোড় গ্রাম বার্ষিক ৬০০৲ টাকা রাজস্বে ইজারা দিলেন, এবং তাঁহার গৃহ-নির্ম্মাণের সাহায্য করিলেন।

সুদীর্ঘকাল নানারূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ভারতচন্দ্র পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাদ লাভ করিবার অবকাশ পাইলেন।

এই সময় বর্দ্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদের মাতা বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে রাজধানী ত্যাগ করিয়া মূলাযোড়ের পার্শ্ববর্ত্তী কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহার অশ্বগজাদি মূলাযোড়ের বৃক্ষাদি নষ্ট করে, এবং তিনি ব্রহ্মস্বহরণ-পাপে পতিত হয়েন, এই ভয়ে স্বীয় কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় গ্রাম পত্তনী লইলেন। নাগের অত্যাচারে প্রজাগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। ভারতচন্দ্র সেই উপলক্ষে নাগাষ্টক নামে পরিচিত অষ্টশ্লোক রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এই শ্লোকসমষ্টি, করুণ ও হাস্য, এই দুই রসের ছায়ালোকে ক্রীড়ামধুর। পাঠ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র নাগের অত্যাচারনিবারণের উপায় করিলেন, এবং ভারতচন্দ্রকে মূলাযোড়ে ১৬ বিঘা ও আনারপুরের অন্তর্গত গুস্তে গ্রামে ১৫০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিলেন।

ভারতচন্দ্র মূলাযোড় হইতে গুস্তেয় যাইয়া বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু মূলাযোড়বাসীরা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে যাইতে দিল না। ভারতচন্দ্র মূলাযোড়েই বাস করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্র মূলাযোড়েই স্বীয় পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কয় বৎসর পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তিশালী ভারতচন্দ্র ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে গঙ্গাতীরে তনুত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র হইতে তাঁহার রোগ শেষে ভস্মক বা বিষমাগ্নিতে পরিণত হইয়াছিল।

কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি-রূপে ভারতচন্দ্র রাজচিত্তবিনোদনার্থ বহু ক্ষুদ্র কবিতার রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, "রসসাগরে"র মত সমস্যা-পূরণ ভিন্নও তিনি প্রত্যহ একটি করিয়া ক্ষুদ্র কবিতা রাজসভায় উপহার দিতেন। সে সকল এখন লুপ্ত। প্রতিভার পরিশ্রমের অবকাশরঞ্জনার্থ রচিত সেই সকল অকিঞ্চিৎকর কবিতা জলবুদ্বুদেরই মত ক্ষণস্থায়ী হয়। তাহার অনেক কবিতা আবার সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত,—মুহূর্ত্তের হাস্য পরিহাসেই তাহার লয়। কাল সে সকল শুষ্কপত্রের মত উড়াইয়া বিস্মৃতির অন্ধকার অতলে লইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য, তিন ভাষায় রচিত সেই সকল কবিতার মধ্যে, অবিলুপ্ত কয়েকটি কবিতা ছাড়িয়া দিলে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে আমরা কেবল নিম্নলিখিত কয়খানি পাইয়াছি—দুই প্রকার "সত্যপীরের কথা", "রসমঞ্জরী", অসমাপ্ত "চণ্ডী" নাটক, "চোরপঞ্চাশতে"র বঙ্গানুবাদ, "অন্নদামঙ্গল", "বিদ্যাসুন্দর" ও "মানসিংহ"। "চণ্ডী" নাটক বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত মিশ্রিত।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক কবিদিগের রচনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের রচনা অধিক নহে। আমাদের মনে হয়, ইহাতেও তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদল সকল বিষয়েরই আতিশয্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডের ইতিহাস ও উপকথা লইয়া তাঁহারা স্নেহ, প্রেম, করুণা, ভীতি, সকলেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন; মানব-চরিত্রের দেবত্ব ও দানবত্ব উভয়ই অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন; পুণ্য ও পাপ উভয়েরই আতিশয্য দেখাইয়াছিলেন। আতিশয্যের উৎপীড়নে পাঠক-সমাজ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম সন্ধান করিতেছিলেন। টেনিসন তাঁহাদিগকে সেই শান্তি দিয়াছিলেন। টেনিসন স্বয়ং প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ যেরূপ অতিবিস্তৃতিদোষদুষ্ট রচনার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সংক্ষিপ্ত না হইলে, তিনি পাঠকসমাজে আদর পাইবেন না। (১৭) তিনি তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অক্ষয় যশ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

(১৭) Tennyson—A Memoir.

অতিবিস্তৃতি ও পুনরুক্তি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিদিগের অনেকেরই রচনার সর্ব্বপ্রধান দোষ। যে স্থানে সংক্ষিপ্ত হইলে রস গাঢ় হইত, সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, সে স্থানে তাঁহারা রচনাকে অনাবশ্যক বিস্তৃত করিয়া ফেনাইয়া রসের প্রগাঢ়তা নষ্ট করিয়াছেন, সৌন্দর্য্য ম্লান করিয়াছেন। একটি মধুর ভাব, চিন্তা, বা কথা পাইলে তাঁহারা কখন অতিবিস্তৃতিতে, কখনও বা পুনরুক্তিতে তাহাকে তিক্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

রামের বনগমনের পর ভরত ও শত্রুঘ্ন যখন নাথবিরহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন, তৎকালে কুব্জার প্রতি শত্রুঘ্নের ব্যবহার মূল রামায়ণে এইরূপ,—

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন যখন রামবনগমনে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন চন্দনসারলিপ্তাঙ্গী, সর্ব্বাভরণভূষিতা কুব্জা রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। দৌবারিক তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে আকর্ষণ করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিল,—

"যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি॥" (১৮)

অর্থাৎ, যাহার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের পিতা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপাচারিণী নৃশংসস্বভাবা কুব্জা, আপনি ইহার যেরূপ ব্যবস্থা হয় করুন।

কুব্জা ইহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করুক,—

"এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্‌গৃহমনাদয়ৎ॥"

ইহা বলিয়া শত্রুঘ্ন বলপূর্ব্বক সখীজনসমাবৃতা কুব্জাকে ধরিলেন। সে চীৎকার করিয়া গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

কুব্জার সখীরা ভীতা হইয়া কৌশল্যার আশ্রয় লইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এ দিকে—

"স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুনাশনঃ।
সঞ্চকর্ষ তদা কুব্জাং ক্রোশতীং পৃথিবীতলে॥"

তাহার ভূষণসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। শত্রুঘ্ন কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীও ভীতা হইয়া ভরতের আশ্রয় লইলেন। তখন ভরত বলিলেন, "অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি।" অর্থাৎ, রমণী প্রাণিমাত্রেরই অবধ্যা। ইহাকে ক্ষমা কর। তিনি আরও বলিলেন,

---

(১৮) অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥

নারীহত্যা করিলে রামচন্দ্র সম্ভাষণও করিবেন না, নহিলে তিনি পাপস্বভাবা জননীকে সংহার করিতেন। তখন

"ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষণানুজঃ।
ন্যবর্ত্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্চ্ছিতাম্॥"

ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষণানুজ শত্রুঘ্ন দোষ প্রযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন,—এবং সেই মূর্চ্ছিতাকে মুক্ত করিলেন।

ক্রোধাতিশয়ে শত্রুঘ্ন কুব্জাকে বলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং ভরত মাতৃ-হত্যার কথাও মনে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তখনই সে কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" মূল "রামায়ণের" অমৃতময়ী কথা সহজ ও সরল করিয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে সুধাবিতরণ করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—

"শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুজীরে ফেলিল ভূমিতলে॥
হিঁচড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥
মরি মরি ডাকে কুজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল সে কৈকেয়ীঘরে ঢোকে॥
কুজী বলে কৈকেয়ী করহ পরিত্রাণ।
ভরত শত্রুঘ্ন মম লইল পরাণ॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকয়ীর ঘর।
চুলে ধরি কুজীরে সে আনিল সত্বর॥
চুল ধরি লয়ে যায় কুজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড়॥"

কৈকেয়ীর ভয়, "চেড়ীরে মারিয়া পাছে প্রহারে আমায়।" ক্রোধমত্ত শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া শেষে বলিলেন,—

"যদি তোমায় বধি প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর সেই শোকে॥"

সুতরাং চেড়ীর আবার দুর্গতি আরম্ভ হইল ;—

"চুলে ধরি চেড়ীরে মাটীতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে॥
বুকে হাটু দিয়া সে কুজীর ধরে গলা।
মুষলের বাড়ীতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা॥
একে ত কুৎসিত কুজী তার হৈল খোঁড়া।
সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্ত বেড়া॥
অচেতন হৈল কুজী শ্বাসমাত্র আছে।"

তখনও তাহার নিস্তার নাই। এমন সময় ভরত "সুবচন" বলিলেন, তিনি কেবল

"শ্রীরামের ডরে" মাতৃহত্যায় বিরত। "নারীহত্যা মহাপাপ"—সে পাপ করিলে পাছে শ্রীরাম বর্জ্জন করেন! তখন শত্রুঘ্ন নিরস্ত হইলেন। ইহাতে রামের প্রতি ভরত শত্রুঘ্নের যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শ্রদ্ধার আতিশয্য তাঁহাদিগের চরিত্র হইতে অসহায়া রমণীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারজনিত পাপের কলঙ্ককালিমা অপসৃত করিতে পারিল না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে রমণীর প্রতি যেরূপ অনাবিল শ্রদ্ধা উপদিষ্ট হইয়াছে, তেমন আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে হইয়াছে কি না সন্দেহ। সেই শ্রদ্ধার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্মণে। তাই তিনি রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার অলঙ্কারদর্শনে বলিয়াছিলেন ;—

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ॥" (২০)

অর্থাৎ, আমি কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনি না। নিত্য তাঁহার পাদবন্দনা হেতু নূপুরই চিনি। সেই ক্ষত্রিয়কুমার লক্ষ্মণের তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রে এই কলঙ্ক একান্তই অপ্রযোজ্য। কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালীর আতিশয্যপ্রিয়তা পরিতৃপ্ত হয়। তাই বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় কবি এই চিত্র অঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কৃত্তিবাসের "রামায়ণ", কাশীরামের "মহাভারত" যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমন আর কোন পুস্তক করে নাই। কাশীরামের কাব্য হইতে কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি ;—

ভীম পদ্মান্বেষণে গমন করিয়া সরোবরকূলে উপনীত হইলেন। সেই সরোবর অতি মনোহর উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত,—

"নানা পুষ্প বনে, মধুকরগণে
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ পক্ষীর রব।
* * * *
সুবাসিত জলে কনককমলে
মধু পান করে ভৃঙ্গ।
তথি লাখে লাখ হংস চক্রবাক
বিহরে রমণীসঙ্গ ॥" (২১)

(২০) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।
(২১) বনপর্ব্ব।

আবার শূরসেন বনে "ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা"য়—

"দেখি সরোবর হরিষ অন্তর
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখ হংস চক্রবাক
বিরাজে রমণীসঙ্গ॥" (২২)

ডিম্ব হইতে "আচম্বিতে" গরুড়ের জন্ম হইলে,—

"দেখিতে দেখিতে অঙ্গ লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতে হৈতে ক্রমে যেন সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিক জোড়ে॥" (২৩)

আবার সাগরমন্থনে শেষ যখন "অত্যন্ত ঘর্ষণ" সহ্য করিতে অসমর্থ হইল, তখন তাহার সহস্র মুখপথে গরল বহিতে লাগিল,—

"সিন্ধুর ঘর্ষণ অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস অগ্নি মন্দার অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সিন্ধু হৈতে আচম্বিতে বাহির হইল॥
প্রাতঃকাল হৈতে যেন সূর্য্যতেজ বাড়ে।
দাবানল বাড়ে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥" (২৪)

"অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবে আমার" এই উক্তি বহু জনের মুখে বহুবারই উক্ত হইয়াছে। যখনই কোন বীর বাণবর্ষণ করেন, তখনই "বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধরে।" দুই দলে কোলাহল "প্রলয়ের কালে যেন উথলে অর্ণব।" দুই জন বীরের যুদ্ধ হইলেই "পূর্ব্বে যুদ্ধ হৈল যেন রাবণ শ্রীরাম।"

পাত্রমিত্রপারিষদাদিবেষ্টিত রাজসভায় সিংহাসনোপবিষ্ট দুষ্মন্ত যখন তপোবন-পালিতা সরলা শকুন্তলাকে পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, তখন লজ্জাম্রিয়মাণা, ক্রোধকম্পিতা, অভিমানস্ফুরিতাধরা উপেক্ষিতা বলিতে লাগিলেন,—

"পূর্ব্ব মুনিগণ উক্তি শুন নরবরে।
প্রতিমূর্ত্তি হৈয়া পুত্র জন্মায়ে উদরে॥
তে কারণে ভার্য্যারে জননীসমা দেখি।
বহু দোষ কৈলে ভার্য্যা পণ্ডিতে উপেখি।
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস॥
ভার্য্যাবন্তলোক ইহলোকে বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পরলোকে॥
স্বামীর জীয়ন্তে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে॥

(২২) বনপর্ব্ব।
(২৩) আদিপর্ব্ব।
(২৪) আদিপর্ব্ব।

ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি মর্ত্ত্যলোকে ।
পরম সহায় সতী পতিব্রতা নারী ।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি ॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায় ।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায় ॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস ।
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে ।
হেন নীতিশাস্ত্রে আছে কহে মুনিবর্গে ॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ ।
যে পুত্র হইতে লোক ভুঞ্জে স্বর্গসুখ ॥
ভার্য্যা বিনা করে পুত্র কাহার শকতি ।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি ।”

এত ক্ষণে যদি বা ভার্য্যার মহিমাকীর্ত্তন শেষ হইল, তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার পুত্রের গুণকীর্ত্তন আরব্ধ হইল ;—

“পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে ।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে ॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার ।
হেন রীতি আছে রাজা বেদের ব্রহ্মার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণে ।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গনে ॥
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন ।
হৃদয়ের সর্ব্ব দুঃখ হয় ত খণ্ডন ॥
হেন পুত্র দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে ।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে ॥ (২৫)

তাহার পর আবার পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবিত কীর্ত্তির পরিচয় আরব্ধ হইল। দুষ্মন্ত স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন। এই ধৈর্য্যগুণে কি তাঁহার পত্নীপ্রত্যাখ্যানপাপের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত হইল না ?

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে—শ্রীকৃষ্ণ—

“আকাশমার্গেতে রৈয়া বিবিধ বসন লৈয়া
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায় ।
যত দুঃশাসন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে
আচ্ছাদন করি সর্ব্বগায় ॥
লোহিত পিঙ্গল পীত নীল শ্বেত বিরচিত
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে ।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী দুঃশাসন ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ বাস দেখি লোকে লাগে ত্রাস
চমৎকার হইল সভাতে ।” (২৬)

মূলে আছে—

“ততস্তু ধর্ম্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ ।
আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাস্তু বিশাম্পতে ।
তদ্রূপমপরং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ ॥

(২৫) আদিপর্ব্ব ।
(২৬) সভাপর্ব্ব ।

নানারাগবিরাগাণি বসনান্যথ বৈ প্রভো।
প্রাদুর্ভবন্তি শতশো ধর্ম্মস্য পারিপালনাৎ ॥"

অর্থাৎ, মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া বিবিধ সুবস্ত্রে তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। মহারাজ দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিলে তদ্রূপ অনেক বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইল। হে প্রভো, ধর্ম্মের প্রতিপালন হেতু নানারাগরঞ্জিত শত শত বসন প্রাদুর্ভূত হইল।

কাযেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কাশীরামের অত্যুক্তি মূলানুসরণের ফল, এমন কথা বলিবারও অবকাশ নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।—শিববিবাহে নাগরীদিগের বরদর্শনে গমন ও নারীগণের পতিনিন্দা, এবং খুল্লনার বিবাহে বর-দর্শনে রামাগণের বিভ্রম ও রামাগণের পতিনিন্দা, একই রূপ। ধনপতির ও শ্রীমন্তের বিনিময়দ্রব্যের তালিকা পাঠককে চার বার পাঠ করিতে হইয়াছে। শ্রীমন্তের পিতার বিবাহবর্ণনায় ও শ্রীমন্তের বিবাহবর্ণনায় প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর। শ্রীমন্ত যখন পিতার অন্বেষণে সিংহলযাত্রা করিলেন, তখন তিনি পিতার গমনপথেই গমন করিলেন। পিতাপুত্রের সিংহলের প্রথম অভিজ্ঞতাও একই রূপ। কবিও পূর্ব্ববর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিয়া আপনার শ্রমলাঘব করিয়াছেন। কিন্তু নিরপ-রাধ পাঠকের শ্রমবিষয়ে তিনি উদাসীন। সপত্নীর আদরে ব্যথিতহৃদয়া লহনা কেবলই বলেন,—

"উহারি হাতে রাঙ্গা শাঁখা অই বরণে গোরী।
অই কি জানে স্ত্রীছলা মোহন চাতুরী।
অব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।"

তাঁহার ভর্ত্তা দৃঢ় হইলে "উহার নাকে দিত পদ।" চণ্ডী যখন কালকেতুর ভবনে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার কাঁচুলি-বর্ণনায় কবি ১২ ছত্রে দশাবতারলিখন করিয়াও নিরস্ত হয়েন নাই, আরও ৬২ ছত্রে অন্যান্য বিবিধ লিখন সম্পন্ন করিয়াছেন। বিবিধ লিখনের মধ্যে মুনি হইতে শুশুক পর্য্যন্ত সকলেরই স্থান আছে।

ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে অম্বিকার কাঁচুলি-বর্ণনায় মুকুন্দরামকে নিষ্প্রভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। "হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচুলি লিখন।" কবি ৩৬ শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে জলপিপি, ফিঙ্গা, ফামি, চাঁস, বাঁশ-পাতা, এমন কি, বৃক্ষশাখায় সবৎস দোলক্রীড়া-পরায়ণ বানর,—সবই বর্ত্তমান। অধিকন্তু আমরা অবগত হই যে, "ডাহুক ডাহুকী নাচে ডিমে দিয়া তা।" (২৭)

---

(২৭) আখড়া পালা।

ভক্তবৎসল দেবতা তপ্ত হৈলে সুধন্নাকে অমলে ও প্রহ্লাদকে শৈলে ও জৌগৃহে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তেমন কর্ম্ম তিনি আর কখনও করেন নাই। কারণ, তাঁহার মুখে ও তাঁহার ভক্তের মুখে "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" এই সব কীর্ত্তিকথা আমাদিগকে ছয়বার শুনিতে হইয়াছে।

"সংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা" কথাটি ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহার একই গ্রন্থমধ্যে পুনরুক্ত হইবার বিশেষ যোগ্যতা কোথায়?

"দয়ায় তরল"—ইহাতে ভাবপ্রকাশপ্রণালীটি মৌলিক ও মনোরম হইতে পারে। "তরাসে তরল" উক্তিতে অনুপ্রাসের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয় হইতে পারে; কিন্তু ইহাতেও কবি নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি "ভাবিয়া তরল" পর্য্যন্ত লিখিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

ব্যাঘ্রের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও "দেখিল সংসারচিত্র ফলার উপর।" (২৮)

ময়না সহরে "নিদাটী"র ফলবর্ণনা এত বিস্তৃত যে, পাঠ করিতে করিতে পাঠককেও সে ফল অনুভব করিতে হয়। (২৯)

কাশীরাম দাস বলিয়াছেন, "নখচ্ছেদ্যে কি কাজ কুঠারপরিগ্রহ।" (৩০) ঘনরাম সেই কথাই গ্রন্থমধ্যে একাধিকবার বলিয়াছেন,—

"নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠার॥"

ভারতচন্দ্রের রচনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সরস; সম্পূর্ণ, অথচ স্বল্প। ইহা ভারতচন্দ্রের রচনার এক প্রধান গুণ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, এই গুণ তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচনায় বিরল।

কোন শ্রদ্ধেয় সমালোচক ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই গ্রন্থগুণে ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গকবিসমাজে যেরূপ উন্নত আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই আসন তিনি কবিকঙ্কণসম্মুখে পাইবার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দিহান।" (৩১) কোন কবির রচনা সম্বন্ধে মতান্তর বিস্ময়কর নহে। কিন্তু আমার স্মরণ হইতেছে, কোন সমালোচক এই দুই কবির রচনার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, কবিকঙ্কণের রচনা স্রোতস্বতীর সহিত ও ভারতচন্দ্রের রচনা

(২৮) কামদল বধ পালা।

(২৯) জাগরণ পালা।

(৩০) বনপর্ব্ব।

(৩১) গঙ্গাচরণ সরকার—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা।

সরসীর সহিত তুলনীয়। তিনি মনে করেন নাই যে, যে কাব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিরচিত নহে, তাহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য সৌন্দর্য্যসঞ্চারে চিত্তরঞ্জন। সে কার্য্য কাননকন্দরাদিমধ্যবাহিনী বক্রধারায় প্রবাহিতা স্রোতস্বতীর অপেক্ষা উপবনপ্রহ্লাদিনী সরসীর দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়। বিশেষ কবিকঙ্কণের কাব্য উপাদেয় হইলেও, বঙ্গদেশের সমতল ভূমিতে প্রবাহিতা সাগরসান্নিধ্যে মন্দ-বেগবতী নদীর দশাগ্রস্ত। সে নদীগর্ভে নক্রাদির অভাব নাই; আবার সেই জলমধ্যে শৈবাল জন্মিয়াছে, শৈবালমূলে পঙ্ক সঞ্চিত হইতেছে। ভারতচন্দ্রের রচনা অজস্র বিকচকুসুমশোভাময় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত উপবনের মধ্যভাগে অবস্থিতা সরসীরই মত। সেই সরসীর স্ফটিকবারিবক্ষে প্রমোদ-তরণী বসন্তবায়ুবিকম্পিতাঞ্চলা হাস্যপরিহাসস্মিতাননা শুদ্ধান্তশোভিনীদিগকে অঙ্কে লইয়া রাজহংসীর মত ভাসিয়া যায়। বায়ুহিল্লোলে তরুশাখাসীন বিহগের কলগান তাঁহাদিগের শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করে। তীরের সুমনসসুষমাদর্শনে তাঁহাদিগের দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নে আনন্দালোক বিকশিত হইয়া উঠে। যক্ষের উদ্যানমধ্যস্থ সরসীর মত সে সরসীর সোপানমার্গ মরকতশিলাবদ্ধ। তাহার স্বচ্ছ সলিলে স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালসমন্বিত বিকশিত কনককমল শোভমান। সেই কমলদলশোভিত সলিলে ক্রীড়াশীল হংসদল মানসসরসেও যাইতে ইচ্ছুক নহে। আবার সেই সরোবরতীরে ইন্দ্রনীল-রচিত-শিখর, কনককদলীশোভিত ক্রীড়াশৈল বিদ্যমান। সেই ক্রীড়াশৈলে কুরুবকপরিবৃত মাধবীমণ্ডপের সন্নিধানে চলকিশলয় রক্তাশোক ও কেশরতরু দণ্ডায়মান। বৃক্ষদ্বয়মধ্যে স্ফটিকপীঠসম্পন্ন মণিময়ী বেদিকায় বদ্ধমূল অনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রায় কাঞ্চনবাসদণ্ড,—তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, নিম্ননাভি, শ্রোণাভারালসগমনা, পীবরযৌবন-ভারাবনতা যক্ষনারীর বলয়শিঞ্জনসহকৃত করতালবাদ্যে নৃত্য করিয়া কলাপী দিবাবসানে সেই বাসযষ্টিতে আশ্রয় লয়। সে সৌন্দর্য্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কবির ক্ষমতাবলে আনীত সুরলোকের এক খণ্ড সমুজ্জল সারাংশ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ফিরিঙ্গি বণিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাতন বাণিজ্যপথ।

In no year does India drain our Empire cf less than fifty-five millions of *Sesterces* giving back her own wares in exchange, which are sold at one hundred times their prime cost.—Pliny.

জগদ্বিখ্যাত রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালেও তাহার সুপরিচিত ইতিহাস-লেখক মর্ম্মপীড়িত হইয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন,—অগ্নিমূল্যে ভারতবর্ষের শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া, রোমক সাম্রাজ্য প্রতি বর্ষেই ভারতবর্ষকে অকাতরে অর্থদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে! সে দিনের কথা এখন স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়াই মনে হয়।

তথাপি তাহা স্বপ্ন নহে; ঐতিহাসিক সত্য। কোন্ পুরাকালে ভারতবর্ষ এইরূপে শিল্পদ্রব্য-বিনিময়ে বিবিধ দূরদেশ হইতে অর্থলাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এত পুরাতন কাহিনী কোন দেশেই লিপিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন প্রাচ্যের তুলনায় অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি বলিয়াই পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে তাহার নাম "ম্লেচ্ছদেশ"। সে দেশের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সাহিত্যের কোনরূপ প্রয়োজন বা আগ্রহের কারণ বর্ত্তমান ছিল না। এখন ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে সেই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। যে দেশ গ্রহণ করিত, সেই দেশ এখন মুক্তহস্তে দান করিতেছে। যাহারা শীতার্ত্ত পশুচর্ম্মাবৃত অসভ্যদেহে যথা-বিন্যস্ত পট্টবস্ত্র সংযুক্ত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহারাই এখন নগ্নদেহে বিদেশের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিয়া কোনরূপে লজ্জারক্ষা করিতেছে! কিরূপে কত দিনে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইল, তাহার ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার জন্য কাহার না কৌতূহল উপস্থিত হয়?

সে ইতিহাস সর্ব্বথা শোচনীয় হইলেও, সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। তাহার উপকরণ নিতান্ত অপ্রচুর। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানকৌশলে ক্রমশঃ নানা বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের সহিত ম্লেচ্ছদেশের পুরাতন বাণিজ্য-সংস্রবের পরিচয় প্রকাশিত করিয়া, সভ্যসমাজকে বিস্মিত করিয়া

তুলিতেছেন। দিন দিন যে সকল পুরাতত্ত্ব সংকলিত হইতেছে, তাহার গতি কেবল এক দিকেই প্রবাহিত। এ কালে যেমন প্রতীচ্য জনপদ হইতে শিক্ষা-দীক্ষা-শিল্প-বাণিজ্য অবিচ্ছিন্ন প্রবল প্রবাহে নিয়ত প্রাচ্য জনপদের দিকেই অকুতোভয়ে প্রধাবিত হইতেছে, সেকালে ইহার বিপরীত অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। যে সকল প্রাচ্য-জনপদ হইতে শিক্ষা-দীক্ষা-শিল্প-বাণিজ্য নিরন্তর প্রতীচ্য জনপদে প্রধাবিত হইয়া, সভ্যতা-বিস্তারে প্রতীচ্য মানবসমাজের সমুন্নতিসাধনের সহায়তা করিয়াছিল, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম-শিল্প ভারতবর্ষের নাম জগদ্বিখ্যাত করিলেও, তাহার কথা সুদূর পাশ্চাত্য দেশে সকলের নিকট সুপরিচিত হইতে পারে নাই। যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যত সীমানিবদ্ধ, সেই বিষয়ে কল্পনার প্রাবল্য তত অধিক হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অধিকাংশ পাশ্চাত্যদেশে ভারতবর্ষ অলৌকিক রত্নভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি এসিয়া, কি ইউরোপ, যে কোনও মহাদেশের সমৃদ্ধ জনপদ পুরাকালে পাশ্চাত্য-সমাজে সুপরিচিত ছিল, সকল জনপদই ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার স্পর্শমাত্র লৌহপিণ্ড সুবর্ণময় হইত, তাহা যে কত বহুমূল্য, তাহার ইয়ত্তা কি? এইরূপে সভ্যতা-বিকাশের প্রথম প্রভাত হইতেই পাশ্চাত্য মানবসমাজ ভারতবর্ষের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া, কল্পনা-বলে তাহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

পুরাতন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ, কল্পবৃক্ষের মতই বিবিধ কাম্যফল বিতরণ করিয়া, পাশ্চাত্য জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস অটল করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিশ্বাস এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কল্পবৃক্ষ ক্রমে ক্রমে ফুল-ফলশূন্য শাখাপত্রহীন নীরস কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে; তথাপি পাশ্চাত্য-সমাজের বদ্ধমূল পূর্ব্বসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। "কোম্পানী বাহাদুরে"র জন্মদিনে এই বিশ্বাস সমধিক প্রবল ছিল। কিরূপে "কোম্পানী বাহাদুর" এ দেশের পুরাতন সুখসৌভাগ্যের বিপর্য্যয় সংঘটিত করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, ভারতবর্ষের পুরাতন বাণিজ্য-কাহিনীর আলোচনা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের পুরাতত্ত্ব-সংকলনের অসীম অধ্যবসায়ে এ বিষয়ের নানা ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনসমাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া জলে স্থলে নানা পথে বাণিজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে কোন্ পথে কত দূর

পর্য্যন্ত ভারত-বাণিজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সংস্রব নাই। পশ্চিমাঞ্চলে কোন্ পথে কত দূর পর্য্যন্ত ভারত-বাণিজ্যে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তাহার অধিকাংশ কেবল উত্তালতরঙ্গ-তাড়িত সমুদ্রবেলা। যে অল্পাংশে স্থলভাগের সহিত সংস্রব, তাহাও নদ, নদী, পর্ব্বত ও মরুভূমির আধিক্যবশতঃ দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া রহিয়াছে। জলপথ ভিন্ন স্থলপথে ভারত-বাণিজ্য পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইবার পক্ষে বিঘ্নবাধার অভাব না থাকিলেও, স্থলপথই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বাণিজ্য-পথ বলিয়া প্রতিভাত হয়। (১) সে পথে ইচ্ছামত বহু পণ্যদ্রব্য বহন করা সবিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া ক্রমে জলপথে বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে পূর্ব্বকথা বিলুপ্ত ও তাহার রহস্যভেদ করিবার উপায় তিরোহিত হইয়াছে। যত দিনের কথা অবগত হইবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অতি পুরাকাল হইতে জল স্থল উভয় পথেই ভারতবাণিজ্য প্রবাহিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকগণ এই সকল পুরাতন বাণিজ্য-পথের নানারূপ নামকরণ করি-তেছেন। পুরাতন সাহিত্যে এই সকল নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বুঝিবার ও বুঝা-ইবার সুবিধার জন্যই এইরূপ নামকরণ আবশ্যক হইয়াছে।

স্থল-বাণিজ্য-পথের আরম্ভ সিন্ধুতীরে। তথা হইতে গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া এই পথ বহির্ভাগে বিভক্ত হইয়া, ক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হইবার জন্য কাস্পীয় হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তটেই প্রধাবিত হইত। কাস্পীয় হ্রদের উত্তর তটের বাণিজ্যপথ ভল্গানদী ও কাস্পীয় হ্রদের সঙ্গমস্থলে জলপথে পরিণত হইত। কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণতটে বাণিজ্যপথের এক শাখা কৃষ্ণসাগরতটে উপনীত হইয়া জলপথের সহিত মিলিত হইত;—অপর শাখা স্থলপথে দক্ষিণাবর্ত্তে পুরাতন কাস্পীয় রাজ্যে উপনীত হইয়া তথা হইতে ভূমধ্যসাগরতটে ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, পুনরায় দক্ষিণাবর্ত্তে মিশর দেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। এই সর্ব্বপ্রাচীন স্থল-বাণিজ্যপথের "কাস্পীয় পথ" নামকরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রধান লক্ষ্য ভূমধ্যসাগর বলিয়া, ইহাকে "ভূমধ্যসাগর-পথ" বলিলেই সুসঙ্গত হয়। এই পথে

---

(১) The most ancient of the three routes was the middle one through Syria. —Hunter's History of British India. জলপথই যে সর্ব্বপুরাতন বাণিজ্যপথ, তাহার কোনও প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া এই সিদ্ধান্তে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস হয় না। স্থলপথই স্বাভাবিক সুপরিচিত পুরাতন বাণিজ্যপথ।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্য কেবল কাস্পীয় হ্রদ, কৃষ্ণসাগর, বা ভূমধ্যসাগরতীরে প্রবাহিত হইয়াই নিরস্ত হইত না; তথা হইতে আধুনিক ইউরোপের সকল দেশেই নানা পথে প্রবাহিত হইয়া, পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্যসূত্র বন্ধন করিয়া দিত। ভারতবর্ষ যে এই পুরাতন বাণিজ্য-পথে কত দেশের ধনাহরণ করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিত, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। অন্যান্য দেশের উদ্যমশীল বণিক সম্প্রদায় ভারতীয় বণিকদিগের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া, তাহা জলে স্থলে বিবিধ পথে বিবিধ দেশে বিক্রয় করিয়া ধনশালী হইত।

স্থল-বাণিজ্য-পথ অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের নিকট সুপরিচিত ও সুনিশ্চিত হইলেও, এই পথে পণ্যদ্রব্য বহন করিবার অসুবিধার অবধি ছিল না। কখন শকটে, কখন নৌকায়, কখন অশ্ব বা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, কখন নিবিড় অরণ্যে, কখন দুর্লঙ্ঘ্য গিরিসঙ্কটে, কখন বা উত্তপ্ত মরুমরীচিকায় পরিশ্রান্ত হইয়া, বণিকেরা অতি অল্প দ্রব্যই স্থলপথে বহন করিতে পারিতেন। তাহাও আবার দস্যুতস্করের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ভয়ে অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইত না। জলপথ নিয়ত তরঙ্গসঙ্কুল; অপরিচিত ও অনিশ্চিত। কখন সুধীর সমীরণ, কখন বা প্রবল প্রভঞ্জন তাহাকে নিরতিশয় অব্যবস্থিতচিত্ত মহাদৈত্যের মত পরাক্রমশালী করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি নৌবিদ্যাবিশারদ নাবিকগণের চালনকৌশলে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই সমধিক লাভের পথ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এই পথ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল হইতে পারস্য, আরব ও মিশর দেশের বিবিধ "বন্দর" পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ইহার দুই শাখাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এক শাখা পারস্যোপসাগরে, অপর শাখা লোহিতসাগরে প্রধাবিত হইত। পারস্যোপসাগরের শাখা কাল্দীয়-রাজ্যে উপনীত হইয়া, স্থলপথের সহিত মিলিত হইত; লোহিতসাগরের শাখা মিশর-রাজ্যে উপনীত হইয়া, স্থলপথের সহিত মিলিত হইত। এই দুই জল-বাণিজ্যপথ যথাক্রমে "কাল্দীয় পথ" ও "মিশরীয় পথ" নামে অভিহিত হইতে পারে। স্থলপথের ন্যায় জলপথেও অন্যান্য দেশের নাবিকবর্গ ভারতীয় বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। জল স্থল উভয় পথেরই এক লক্ষ্য,—প্রাচ্য রাজ্যের পণ্যবিনিময়ে প্রতীচ্য রাজ্যের ধনাহরণ। এই লক্ষ্য দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিয়া, ভারতবর্ষের নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল।

সুদূর পাশ্চাত্য জনপদে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য সকল সময়ে ভারতবর্ষের নামে

পরিচিত হইত না; যে দেশ বা বন্দর হইতে তাহা আনীত হইত, তাহার নামেই পরিচিত হইত। এক্ষণে যে রক্তবস্ত্র "টর্কি রেড" নামে পরিচিত, এক সময়ে তাহা "এড্রিনোপোলিস্ রেড" নামে পরিচিত ছিল; অথচ তাহা ভারতবর্ষে সুরঞ্জিত হইয়াই পাশ্চাত্য জনপদে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত! অনেক প্রতীচ্য রাজ্যের পুরাতন সাহিত্যে ভারতবর্ষের নাম উল্লেখিত না থাকিবার প্রকৃত কারণ কি, এই একটি-মাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, হোমরের অমর কাব্যে ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত না থাকায়, অনেক পাশ্চাত্য লেখক হোমরের তিরোধানের পর ভারতবাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল,এই মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সকলেই এই মত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (২) ভারতীয় শিল্প-দ্রব্যই যে প্রতীচ্য জনপদকে সভ্যজনোচিত বিবিধ ভোগ্যবস্তুর সন্ধান প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ভোগাভিলাষী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে সকল বাণিজ্যপথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বাহিত হইত, তাহার উভয় পার্শ্বেই বিবিধ সম্পন্ন জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়া-ছিল। এইরূপে কাল্দীয় রাজ্যের অভ্যুদয়; এইরূপে ব্যাবিলনের সৌভাগ্যগর্ব্ব; এইরূপে ফিনিসীয় বণিকবর্গের অসাধারণ বাণিজ্যোন্নতি; এইরূপেই মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পুরাতন সাম্রাজ্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যবিকাশ। প্রাচীন মিশর যে মৃতদেহসংরক্ষণকৌশলের জন্য জগদ্বিখ্যাত, তাহার উপকরণ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত। প্রাচীন ইহুদীয় নরপতি সলমন যে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য-বিজ্ঞাপক বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ইতিহাসে সুপরিচিত, তাহা ভারতবর্ষ হইতেই অগ্নি-মূল্যে ক্রীত।—এ সকল কথা এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ভারতবর্ষের পুরাতন বাণিজ্যপথ অধিকার করিবার আশায় নিরন্তর এত সমরকোলাহলে এসিয়ার পশ্চিম প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইত! এই বাণিজ্যপথ যখন যে জাতির অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি শুল্কসঞ্চয় করিয়া, পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে অর্থসঞ্চয় করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই বাণিজ্যপথ যখন যে জাতির অধিকার-বিচ্যুত হইয়াছে, তখনই

(২) Homer does not mention the name of India, but he was acquainted with the art-wares of Sidon, a Mediterranian out port of the eastern trade. —Hunter's History of British India. vol. I. P. 19.

সেই জাতি দেখিতে দেখিতে বায়ুতাড়িত ধূলিপটলের ন্যায় সৌভাগ্যবেলা হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে! তাহাদের পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি কত স্থানে নীরবে এই পুরাকাহিনীর অতীতসাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান আছে। এই সকল কারণে ভারতীয় বাণিজ্যপথ করতলগত করিবার প্রবল প্রয়াস সকল জাতির মধ্যেই অল্পাধিকমাত্রায় লক্ষিত হইয়াছে। এই পথ কখন কাল্দীয় রাজ্যের অধিকারে, কখন ইহুদীয় জাতির অধিকারে, কখন বা পারস্য, গ্রীস ও রোমের অধিকারে আনীত হইয়াছে। সেকালে এই সকল পুরাতন জাতি ভারতবর্ষের শিল্পদ্রব্যের ন্যায় বহুমূল্য দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে নাই; তাহারা কেবল ভারতবর্ষের নিকট ক্রয় করিয়া অন্যত্র বিক্রয় ও তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্যই পুরাতন বাণিজ্যপথ অধিকার করিবার আশায় শত সমরক্ষেত্রে বীরশোণিতে বসুন্ধরা রুধিরাক্ত করিয়াছে! পাশ্চাত্য জাতির এই সকল অন্তর্বিপ্লব ভারতীয় স্থল-বাণিজ্যের অপকারসাধন করে নাই; বরং বিবিধ জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধিত হইয়া, ভারতবর্ষের অর্থাগমের পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়াছে।

স্থলপথের ন্যায় জলপথেও নানা প্রতিদ্বন্দ্বী কলহ-কোলাহলে লিপ্ত হইত। তাহারা কেবল বহন করিবার, কেবল ক্রয়বিক্রয়ের "দালাল" হইবার, কেবল ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য বিদেশে বিস্তার করিবার অধিকারলাভার্থই কলহ-কোলাহলে লিপ্ত হইত। ইহাতে মিশর ও আরব দেশের লোকে ক্রমে ক্রমে সাগরপথে নৌচালন-কৌশল আয়ত্ত করিয়া, শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ভূমধ্যসাগরতীরের ফিনিসীয় বণিক ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার আশায়, অর্ণবপোত সুসজ্জিত করিয়া, বাণিজ্যপথগামী অশ্ব বা উষ্ট্রশ্রেণীর খরখুরোত্থিত ধূলিপটলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, দিনগণনা করিত। আরবীয় নাবিকগণ প্রথমে স্বদেশের উপকূল-ভাগে ভারতীয় অর্ণবপোতের সমাগমপ্রতীক্ষায় কালক্ষয় করিতে করিতে, অবশেষে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া, বিদেশে বিক্রয় করিবার অধিকার সংস্থাপিত করিয়াছিল।

তখন সমুদ্রযাত্রার প্রবল প্রভাব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। তখনও অনুদার সংকীর্ণ শিক্ষা ভারতবাসীকে গৃহকোটরনিবদ্ধ পেচকের ন্যায় অলীক গাম্ভীর্য্যসম্ভোগকেই মানবজীবনের পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনুষ্যত্বহীন দাস-জাতিতে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই! তখন তাহারা যে পথে উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া দ্বীপোপদ্বীপে পদার্পণ করিয়াছে, সেই পথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের

সহিত শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ বহুদূরদেশে প্রধাবিত হইয়া, কত অজ্ঞাত মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছে; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে, কত অজ্ঞাত রাজ্যের ধনরত্ন আহরণ করিয়া, ভারতবর্ষের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের চরণরেখাঙ্কিত সেই পুরাতন বাণিজ্যপথ অদ্যাপি বর্ত্তমান। কিন্তু সে পথে আর ভারতীয় বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইতেছে না! কোন্ সময় হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তাহার ইতিহাস সযত্নে সংকলিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইস্‌লাম-বিপ্লব।

The Caliph's curtains were of brocade with elephants and lions embroidered in gold. Four elephants caparisoned in peacock-silk stood at the palace-gate, and on the back of each were eight men of Sind.—Sir. W. Hunter.

ইস্‌লামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। ইস্‌লামের নামে যাঁহারা ইতিহাসে বিবিধ কলঙ্কের আরোপ করিয়া ইস্‌লাম-দিগ্বিজয়-কাহিনী নিতান্ত ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের মর্য্যাদারক্ষার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই। যাহার নাম পুরাতন পৃথিবীর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, এরূপ অভিনব জাতি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া এসিয়া খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিবামাত্র দেখিতে না দেখিতে এসিয়া হইতে আফ্রিকা এবং আফ্রিকা হইতে ইউরোপে আত্মশক্তিবিস্তার করায়, ইউরোপীয় লেখকবর্গও সেই উদ্যমোন্মত্ত প্রবল জাতির প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে সম্মত হইতেন না। সে অনুদার ধর্ম্মান্ধ সংকীর্ণ সংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। মূলসূত্রের অনুসন্ধান করিলে, ইস্‌লামের অভ্যুদয়কেই পরোক্ষভাবে আধুনিক ইউরোপের অচিন্তিতপূর্ব্ব অসীম অভ্যুদয়ের মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইস্‌লাম বহুজাতির সম্মিলিত শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ। যাহারা বৌদ্ধ, সৌর বা মূর্ত্তিপূজক রূপে এসিয়া খণ্ডের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে বিবিধ সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় ও উন্নতি অবনতির ভিতর দিয়া ধীরে

ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারাই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সহসা এক অজেয় মহাশক্তিরূপে পৃথিবীর ইতিহাস উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আরবের অনুর্ব্বর মরুভূমির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া এই শক্তি যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়, তখন ভারতীয় পুরাতন বাণিজ্য-পথ ইস্‌লামের অধিকারভুক্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই। ইস্‌লাম যাহাদিগকে ধর্ম্মদীক্ষায় দলভুক্ত করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, তাহারা কেবল অসিহস্তে ধরাতল রুধিরাক্ত করিয়াই জীবনযাপন করে নাই। তাহারা পূর্ব্বেও বাণিজ্য করিত, পরেও বাণিজ্য করিতে বিস্মৃত হয় নাই। মুসলমান খলিফাগণের বসোরা, বোগদাদ প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান স্থান এইরূপেই জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফা ওমরের সংস্থাপিত বসোরা নগরী, এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলিফা অল্ মন্‌শূরের বোগদাদ নগরী ভারতীয় স্থল-বাণিজ্য-পথের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। জলপথে যে সকল পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে পারস্যোপসাগর দিয়া এক সময়ে "কাল্‌দীয় পথে" পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, বসোরা নগরী তাহারই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ক্রমশঃ স্ফীত হইতে লাগিল। ইউরোপ যাহা কিছু ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইত, তাহা ইস্‌লামের অধিকারভুক্ত হইল, এবং ইউরোপের পুরাতন সুখসৌভাগ্য তিরোহিত হইবার উপক্রম ঘটিল।

খৃষ্টজন্মভূমি মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইবার পর, ইউরোপের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত বীরপুঙ্গবগণ তাহার উদ্ধার-সাধন করিবার আশায়, অকুতোভয়ে যুদ্ধযাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার মুখ্য লক্ষ্য ধর্ম্মকলহ বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও, তাহার সহিত বাণিজ্যকলহও সম্মিলিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য-পরায়ণ নাবিকবর্গ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মযুদ্ধোন্মত্ত বীরবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া, কিছু দিনের জন্য ভারতীয় বাণিজ্যপথ পুনরায় হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হইয়া অল্প দিনেই হয় ত পুরাতন বাণিজ্যপথে ইউরোপীয় বণিকবর্গের পুরাতন বাণিজ্যাধিকার সুসংস্থাপিত করিতে পারিত। কিন্তু মধ্য এসিয়ার তুর্কিগণ প্রবল হইয়া, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্থল-বাণিজ্যপথ হইতে ইউরোপের সমস্ত সংস্রব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। "মিশরীয় পথে" ভারতীয় বাণিজ্য প্রবাহিত করিয়া, তদ্দ্বারা পুরাতন স্থল-বাণিজ্য-পথের প্রাধান্য লোপ করিবার জন্য বহুকাল নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুয়েজ হইতে নীল নদ পর্য্যন্ত জলপ্রণালী খনিত হইয়াছিল; লোহিতসাগরতীরে

নূতন বন্দর সংস্থাপিত হইয়াছিল;—মিশর দেশই ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে, এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল। ইস্‌লামের অভ্যুদয়ে তাহাও ক্রমে ক্রমে ইউরোপের হস্তবিচ্যুত হইয়া গেল। রাজ্যাধিকার অপেক্ষা বাণিজ্যাধিকারের চেষ্টাই ভূমধ্যসাগরতীরের পুরাতন জনপদবাসিগণের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই কলহ-কোলাহলের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ইস্‌লাম স্থলপথে বিজয়পতাকাহস্তে দেশ হইতে দেশান্তরে অধিকারবিস্তার করিল। ইস্‌লাম জলপথেও রণতরণী সজ্জীভূত করিয়া, জলযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পুরাকালে ভূমধ্য-সাগরতীরের যে সকল জাতি নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহাদের মধ্যে কেহ বাণিজ্যের জন্য, কেহ বা বাণিজ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিবার জন্য, বাণিজ্যপোতকে রণপোতে পরিণত করিতে আরম্ভ করিল। এক দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমর-কোলাহল, অন্য দিকে প্রতীচ্য দলদস্যুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন-কৌশল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভূমধ্য-সাগরে অরাজকতার অত্যাচার ক্রমে বদ্ধমূল করিয়া দিল।

একদা যে বাণিজ্য-পথ হিন্দু ও বৌদ্ধের অধিকারভুক্ত থাকিয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রাজ্যের মধ্যে বিবিধ পণ্যসম্ভার বিনিময় করিতে গিয়া জ্ঞানবিস্তারে পুরাতন সভ্যসমাজকে সমুন্নত করিত; সর্ব্বত্র সুখসৌভাগ্য বিবর্দ্ধিত করিয়া, শান্তি-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের আশায় সমগ্র মানব-সমাজকে এক অখণ্ড মহাপরিবারে পরিণত করিবার আয়োজন করিত;—সে শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল। নূতন আশা, নূতন উৎসাহ, নূতন নীতি, নূতন পথে প্রতীচ্য মানব-সমাজকে প্রাচ্য-বিদ্বেষে পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহাই ইতিহাসে "ইস্‌লাম-বিপ্লব" বলিয়া পরিচিত।

প্রতীচ্য লেখকবর্গ যে ভাবে এই "ইস্‌লাম-বিপ্লব" লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাতে পাঠকচিত্ত ইস্‌লামের নামে ঘৃণা, ঈর্ষ্যা ও অসঙ্গত ইস্‌লাম-বিভীষিকায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইস্‌লাম কেবল ধ্বংসলীলার দানবশক্তি বলিয়াই প্রতিভাত হইত। নিয়ত কৃপাণস্কন্ধে বসুন্ধরা নরশোণিতে প্লাবিত করাই যেন ইস্‌লামের ধর্ম্ম; কুঠারহস্তে পৃথিবীর পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন খণ্ড-বিখণ্ডিত করাই যেন ইস্‌লামের পুণ্যব্রত; জলে স্থলে ছল-প্রতারণায় নিয়ত পরস্বাপহরণ করাই যেন ইস্‌লামের প্রধান লক্ষ্য;—অধিক কি, মানব-সভ্যতার উজ্জ্বল প্রদীপ ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া, উন্নতি-সোপান তমসাচ্ছন্ন করাই যেন ইস্‌লামের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কত পাশ্চাত্য ভাষায় কত অপূর্ব্ব ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও

মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল! সে দিন ধীরে ধীরে সুদূরে চিরপ্রস্থান করায়, আধুনিক সত্যানুসন্ধানপ্রীতি নূতন ভাবে ইসলামের অভ্যুদয়-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

ইস্‌লাম সত্য সত্যই কৃপাণকরে বহুদেশের বহু সমরক্ষেত্র নরশোণিতে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। ইস্‌লাম সত্য সত্যই কুঠার-হস্তে বহু পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লাম সত্য সত্যই জলে স্থলে ছল-প্রতারণায় পরস্বাপহরণের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাই পৃথিবীর সকল জাতির প্রথম অভ্যুদয়কালের সাধারণ কাহিনী। তাহা ঝটিকা-সমাগমের প্রথম প্রকোপ। সে প্রকোপ প্রশমিত হইবার পর, ইস্‌লাম জ্ঞান-বিস্তারে ইউরোপের নবজীবনদানের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লামের ধ্বংসলীলার অভাব নাই; ইস্‌লামের গঠনপ্রতিভার সমুচিত সমাদর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইতিহাস যথাযোগ্য আয়োজন না করায়, ধ্বংসলীলাই ইস্‌লামের একমাত্র ঐতিহাসিক চিত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের সহিত ইস্‌লামের প্রথম সংস্রব কেবল বাণিজ্য-সংস্রব। সে সংস্রবে ভারতবর্ষ বিক্রেতা, ইস্‌লাম ক্রেতা; ভারতবর্ষ বণিক্‌-রাজ, ইস্‌লাম তাহার পণ্যবাহক। পুরাকাল হইতে যাহারা পারস্যোপসাগর ও লোহিতসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পুরাতন "কাল্‌দীয়" ও "মিশরীয়" পথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহারা মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে ইস্‌লামের নবধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। স্থলপথে ও জলপথে তাহাদের পুরাতন বাণিজ্যযাত্রা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত ছিল। এই বাণিজ্যপ্রবাহ সেকালের সমগ্র এসিয়াখণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সুদৃঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিল। সুদূর চীন, জাপান ও প্রশান্তমহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য সিংহলে সংগৃহীত হইত, তাহার সহিত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের শিল্পসম্ভার মিলিত হইয়া, সিংহলকে প্রাচ্য-পণ্যদ্রব্যের অনন্ত ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল। এই পণ্য-সংগ্রহের জন্য আরবীয় নাবিকগণ তৎকালে এসিয়া-খণ্ডের সমগ্র সমুদ্রোপকূলে গতিবিধি করিত। তাহাদের অর্ণবপোত সিংহল হইতে মালাবারতীরসংলগ্ন সমুদ্রবক্ষে সিন্ধু-সাগরসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী পুরাতন পথেই পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করিত। এই সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাহাদিগকে পণ্য-সংগ্রহের জন্য, পণ্য-বিনিময়ের জন্য ও খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ বন্দরে উপস্থিত হইতে হইত। তাহাদের বাণিজ্যপোতে

বণিক ভিন্ন তীর্থযাত্রিগণও ইস্‌লামের পুণ্যতীর্থ দর্শন করিবার আশায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপে ইস্‌লাম-বাণিজ্য-পোত সিংহল হইতে সিন্ধুসাগর-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী হইলে, সিন্ধুনিবাসী হিন্দুগণ তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায়, ইস্‌লাম-শক্তি জলপথে সিন্ধুরাজ্য আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইহাই ইস্‌লামের প্রথম অভিযান। তাহার সহিত অকারণ নর-শোণিতপিপাসা বা দিগ্বিজয়-লালসার সংস্রব ছিল না;— তাহা কেবল অত্যাচারের প্রতিবিধানকামনায় অত্যাচার-প্রয়োগ। তাহাই মানবসমাজের চিরন্তন ঐতিহাসিক তথ্য। এই অভিযানে সিন্ধুদেশের সহিত ইস্‌লামসাম্রাজ্যের যে সংস্রব সংস্থাপিত হয়, তাহা ইস্‌লামের বোগদাদ রাজধানীকে জ্ঞানালোচনায় সমুন্নত করিবার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। খলিফাগণ হিব্রু, গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জ্ঞানাহরণ করিবার আশায় আরবীয় ভাষায় গ্রন্থানুবাদ করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, অল্পকালেই আরবীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া, তাহার গৌরবঘোষণায় সুদূর ইউরোপের দ্বারদেশে উচ্চচূড় বিদ্যামন্দির-নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখন ইউরোপ পূর্ব্বাশিক্ষা-বিচ্যুত অনুন্নত অর্দ্ধশিক্ষিত কলহকোলাহলময় মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত। তাহারা ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মান্ধ হইয়া নিরপরাধ নরনারীকে চিতামঞ্চের যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া, জীবিতাবস্থায় অগ্নিসংকার করিত; তাহারা ধর্ম্মমতের প্রাধান্যরক্ষার্থ, স্বাধীন সত্যনিষ্ঠ বিমল জ্ঞানজ্যোতিকে পাশবশক্তিবলে পরাহত করিয়া, ধর্ম্মবিস্তার করিত; তাহারা গ্রীস ও রোমের পুরাতন সাহিত্যনিহিত জ্ঞানভাণ্ডারকে কুসংস্কারলব্ধ অলীক উপাখ্যানবোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া বর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লামের বিবিধ বিদ্যালয় ইউরোপের অন্তর্গত স্পেনরাজ্যে যে জ্ঞানবিস্তারে ব্যাপৃত ছিল, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও গণিতবিজ্ঞান সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইবার সূত্রপাত হইল। ভারতবর্ষ, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি পুরাতন সভ্য দেশের সযত্নসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে ইস্‌লাম বহুশ্রমে যে জ্ঞানরত্ন-সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে এসিয়া হইতে আফ্রিকা ও আফ্রিকা হইতে ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া, পাশ্চাত্য মানবসমাজের সমুন্নতিলাভের কারণ হইয়া উঠিল। সমগ্র মানবসমাজের সভ্যতার ইতিহাসে ইহাই ইস্‌লামের অতুল কীর্ত্তি; তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

যখন ইস্‌লাম এইরূপে আধুনিক ইউরোপকে নবজীবনদানে প্রবৃত্ত, তখন ইউরোপীয় মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহে ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতে

লাগিল। ভারত-বাণিজ্য হস্তগত করিবার উপায়-উদ্ভাবন করাই সমগ্র ইউরোপের প্রধান ও প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠায় পরিণত হইল। সেকালের এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেকালের ইউ-রোপীয় জনসমাজ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশলে ভারতবর্ষের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইবার আশা কল্পনা করিতেও সাহস করিত না। তাহারা কেবল নির্ব্বিবাদে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-বহন ও তাহার ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলেই পরিতৃপ্ত হইত। ইস্‌লাম-বিপ্লব সে আশা নির্ম্মূল করিয়া, সমস্ত সুপরিচিত পুরাতন বাণিজ্যপথ করতলগত করিয়া-ছিল। তাহা আর সহসা ইস্‌লামের হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইস্‌-লামের রণতরণী জলপথে নবশক্তির বিকাশ-সাধন করিয়া, সর্ব্বত্র অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল;—ইস্‌লামের সেনাবল স্থলপথকে ইউরোপীয় জনসমাজের পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়া, ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ এসিয়ার মুসলমানের সহিত যে সকল যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইতেন, তাহাতে কখন কখন জয়লাভ করিলেও, তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হইত না। অবশেষে ইস্‌লামের হস্তে পুরাতন বাণিজ্যপথ সমর্পণ করিয়া, ইউরোপীয় জনসমাজ নূতন পথের আবিষ্কার করিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া পড়িল। পুরাতন পথ রুদ্ধ হইল না; সে পথে ভারত-বাণিজ্য ধীরে ধীরে ইউরোপে বিস্তৃত হইতে লাগিল;—কিন্তু তাহার প্রধান লভ্যাংশ আর ইউরোপীয় খৃষ্টানগণকে সমৃদ্ধিদান করিল না। তাহা ক্রমে ইস্‌লামের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ইহাতেই ইউরোপকে কেবল ক্ষতিস্বীকার করিয়া, অগ্নিমূল্যে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে হইত; ইহাতেই ইউরোপ দিন দিন অর্থমোক্ষণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

এই সময়ে ইউরোপে শিল্পচর্চ্চার সূত্রপাত হয়। কিন্তু শিল্পদ্রব্যের অধিকাংশ উপকরণের জন্য ইউরোপকে প্রাচ্যরাজ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। ইস্‌লাম ইউরোপকে যে তীব্র তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তাহা যদি ইউরোপকে উদ্যমশূন্য করিতে পারিত, তাহা হইলে ইস্‌লামই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মহাশক্তিরূপে অদ্যাপি মানবসমাজের শীর্ষ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। ইস্‌লামের নবোদ্যম যাহা অধিকার করিয়াছিল, তাহা অধিকদিন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইউরোপ বাহুবলে পরাজিত হইলেও, হৃদয়বলের অপরাজিত উৎসাহে স্বাধীনতালাভের উপায়-উদ্ভাবনে নিয়ত যত্ন-

শীল হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবসমাজের এই প্রকৃতিগত প্রবল পার্থক্যই ইস্‌লামের অধঃপতনের ও ইউরোপের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক কারণ। এক পথে প্রতিহত হইয়া, অন্য পথের আবিষ্কারের জন্য ইউরোপ যে অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছে,তাহা মানবসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

অভিনব বাণিজ্যপথের আবিষ্কার-কামনায় ইউরোপ জল স্থল উভয় পথেই ধাবিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নাম বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের নাম অদ্যাপি লোক-সমাজে সুপরিচিত, তাঁহারা কিরূপে উদ্যমে, কত ক্লেশে, কত অধ্যবসায়ে, স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

একের চেষ্টায় যাহা কিছু সংসাধিত হইতে পারে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। রাজা ভিন্ন জনসমাজের অন্য কাহারও একাকী কোন বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া সফলকাম হইবার আশা নাই। নানা কারণে বাণিজ্যব্যাপারে বহু জন একত্র মিলিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইতে লাগিল। ইস্‌লাম-বিপ্লবই ইউরোপকে এই মহাশিক্ষা প্রদান করিবার প্রকৃত কারণ। বণিকবর্গের সমবেত শক্তি একত্র প্রয়োগ করিবার প্রথম প্রয়োজন ইস্‌লাম-বিপ্লব-কালেই অনুভূত হইয়াছিল। সে প্রয়োজন যেমন বাণিজ্যরক্ষার্থ সমবেত শক্তির একত্র প্রয়োগের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেইরূপ নূতন বাণিজ্যপথের আবিষ্কারকালেও সমবেত শক্তির একত্র প্রয়োগের উপকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাই ইউরোপীয় বিবিধ কোম্পানীর মূল-রহস্য;—ইহাই ইতিহাস-বিখ্যাত "কোম্পানী বাহাদুরে"র জন্মলাভের ঐতিহাসিক মূলসূত্র।

মাতৃপূজা।

শুধু অশ্রুজলে, শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে,
শুধু, তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র হীন উপচারে
শ্যামা কি প্রসন্ন হবে ভাবিয়াছ মনে—
জাগিবে জীবনজ্যোতিঃ অমা-অন্ধকারে?
কার পাপে স্নেহহীন মায়ের অন্তর,
অন্ধ ত্রিনয়ন,—মাতা নগ্না শবাসনা?
নাহি খড়্গ,—রক্তশূন্য ও মহাখর্পর;
শিখাসম ঝলসিছে তৃষার্ত্ত রসনা!
জ্বাল' মাতৃভক্তি বুকে—হোম-অগ্নিশিখা,
ভস্ম হোক্ যুগব্যাপী আত্মদ্রোহ পাপ!
ঢাল রক্ত—কণ্ঠে বক্ষে হানহ ছুরিকা,
মৃত্যু হতে মুক্তি হোক্—যাক্ অভিশাপ!
পুত্ররক্তে অভিষিক্তা—অমানিশিশেষে
দেখা দিক্ শ্যামা রাজরাজেশ্বরী বেশে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

৩। তাল-নারিকেলের দেশে।

রথযাত্রার আয়োজন।

এই ত আমি শ্রীরাগমে আবার ফিরিয়া আসিলাম। এখন রাত্রি। সম্মুখে বৃহৎ বিষ্ণুমন্দিরের প্রাচীর। যেখানে কেবল ব্রাহ্মণেরা বাস করে—ইহা সেই গণ্ডির মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং আমি এক্ষণে বীথির সেই অংশে উপস্থিত হইয়াছি, যেখান হইতে সমস্ত মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করা যায়। এইখানে চন্দ্রালোকে রথটি অপেক্ষা করিতেছে। উহার উপর একপ্রকার সিংহাসন কিংবা একপ্রকার চূড়া-বিশিষ্ট মঞ্চ;—উহার গায়ে লাল রঙ্গের, পাণ্ডু রঙ্গের, রাংতা ঝক্‌মক্ করিতেছে; উহার ছাদ মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। ঐ সমস্তের তলদেশে যে আসল রথটি অবস্থিত, উহা ব্রাহ্মণ-ভারতের ন্যায় পুরাতন ;—উহা উৎকীর্ণ কাষ্ঠফলক-সমূহের একটা গুরুভার প্রকাণ্ড স্তূপ ;—এরূপ প্রকাণ্ড যে, মনে হয় না, উহাকে কেহ কখন নড়াইতে পারে। কিন্তু, এই বিভূষিত স্তূপটি—এই ঝক্‌মকে অতি প্রকাণ্ড চূড়াসমন্বিত মঞ্চটি আজ বেশ শোভনভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এখন উহাকে, রেশম ও রাংতায় ঢাকা, বাঁশের কাঠামে কাগজ মোড়া, খুব হাল্‌কা অথচ একটা খুব জম্‌কালো জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে। রথের চারিধারে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল শুক্ল-বেশধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে:—এই সকল ভারতবাসী রাত্রিকালে প্রায়ই সূক্ষ্ম মল্‌মল বস্ত্রে স্বকীয় গাত্র ও মস্তক আবৃত করিয়া উপছায়ার ন্যায় বিচরণ করে; কিন্তু যেন চন্দ্রালোকও যথেষ্ট নহে, উহারা আবার মশাল লইয়া আসিয়াছে। কেন না, বিকট বিরাট কূর্ম্ম-সদৃশ এই রথটির গায়ে, বৎসরের মধ্যে একবার, চাকা লাগাইবার জন্য উহা-দিগকে আজ বিশেষরূপে খাটিতে হইবে। এই রথচক্রগুলি, উচ্চতায় মনুষ্যের অর্দ্ধ-শরীর ছাড়াইয়া উঠে; এই চক্রগুলি পুরু কাষ্ঠফলকের দুই স্তবকে নির্ম্মিত; কাষ্ঠফলকগুলি উল্টা-উল্টিভাবে সন্নিবেশিত, এবং লোহার ক্রেক্ দিয়া আবদ্ধ। ইতিমধ্যেই উহারা রথ টানিবার রসি ভূমির উপর লম্বা করিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে; এই রসি ব্রহ্মার জঙ্ঘার ন্যায় স্থূল; বিরাট রথ-যন্ত্রটি নাড়াইবার জন্য তিন চারি শত উন্মত্ত লোক এই রসিতে আপনাদিগকে জুড়িয়া দিবে।

এই সময়ে মন্দিরটি—এই প্রস্তররাশির প্রকাণ্ড স্তূপটি একেবারেই জনশূন্য, নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শব্দগভীরতায় ও নিস্তব্ধতায় ভীষণ। জনপ্রাণী নাই, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণ উৎসব-উপলক্ষে আসিয়া এইখানে আশ্রয় লইয়াছে; এবং সাদা চাদর মুড়ি দিয়া, সানের উপর সটান পড়িয়া মড়ার মত ঘুমাইতেছে। দূর-দূরান্তরে লম্বমান মিট্‌মিটে প্রদীপগুলা জ্যোৎস্নালোকের সহিত যেন পালা করিয়া, পুত্তলিকা-সমূহের ও স্তম্ভারণ্যের অনন্ততা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে।

যে বীথি-পথটি দিয়া, কাল প্রভাতে, রথযাত্রা আরম্ভ হইবে, উহা মন্দিরের ভীষণ দস্তুর প্রাকারের চারিধার দিয়া গিয়াছে। এই প্রশস্ত সরল পথটি, প্রাকার ও ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন গৃহ-সমূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; ছোট ছোট থাম, বারাণ্ডা, বিকট-প্রস্তর-মূর্ত্তি-বিভূষিত সোপান-ধাপ—এই সকলের জটিল মিশ্রণে গৃহগুলি পূর্ণ। পথটি আজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে; কেন না, আজ রাত্রে প্রায় কেহই নিদ্রা যাইবে না। এই সকল শুভ্র-বসন-ধারী লোকেরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মনে হইতেছে যেন, চন্দ্রমার বিরাট ছায়া-মূর্ত্তিখানি উহারা প্রত্যেকে আংশিকভাবে নিজ নিজ দেহে প্রকটিত করিতেছে, এবং দেব ও পশুসমূহের "পিরামিড্"—সেই প্রকাণ্ড বিরাট গুরুতর বিষ্ণু-মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলি সর্ব্বোপরি রাজত্ব করিতেছে। উচ্চবর্ণের রমণীরা, বালিকারা, গৃহ হইতে বাহির হইতেছে; যে ভূমিখণ্ড চষিয়া—গভীর মাটি খুঁড়িয়া, বিষ্ণুদেবের রথ কাল যাত্রা করিবে, সেই পুণ্যভূমিকে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করিবার জন্য, উহারা স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া চলা-ফেরা করিতেছে; সচরাচর উহারা প্রাতঃকালেই ঐ লাল মাটি বিচিত্র রঙ্গের রেথায় অঙ্কিত করে; রথটি খুব প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে। আজ রাত্রিটি কি পরিষ্কার! এই চাঁদের আলোয় দিনের মত সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর এই রমণীদিগের নিকট—এই বালিকাদিগের নিকট এত জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে—এত ফুলের হার তাহাদের কণ্ঠে ঝুলিতেছে যে, মনে হয়, যেন তাহারা ধূপাধার সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

ঐ দেখ এক জন নবযুবতী—গঠনটি বেশ ছিপ্‌ছিপে—জরির কাজ করা কালো রঙ্গের মলমল-শাড়ী পরিয়াছে; দেখিতে এমন সুশ্রী যে, না ইচ্ছা করিয়াও, তাহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। যতবার সে মাটির দিকে নীচু হইতেছে—যতবার সে উঠিতেছে, ততবারই তাহার বাহু ও চরণদ্বয় হইতে নূপুর বলয়ের মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে; যে সকল মনঃকল্পিত নক্‌সা সে ভূমির উপর আঁকিতেছে, তাহাতে তাহার অপূর্ব্ব কল্পনা-লীলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। * * * আজিকার রাত্রে যে ব্যক্তি

আমার প্রদর্শক, তাহার নাম "বেল্লনা"—উচ্চবর্ণের লোক ; স্ত্রীলোকটির সহিত সে সাহস করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং আমার হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল —তাহার সাদা গুঁড়া আমাকে সে কিছু দিতে পারে কি না,—যদি দেয়,তাহা হইলে আমিও তাহার গৃহের সম্মুখস্থ ভূমিটি চিত্রিত করিয়া দিই। সে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া সঙ্কোচের সহিত তাহার চূর্ণাধারটি আমার নিকট পাঠাইয়া দিল, সে স্বয়ং আমার হস্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইল। আমার হস্ত হইতে কিরূপ নক্সা বাহির হয়, দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া, এই সকল উপছায়াবৎ শুভ্রবসন-ধারী লোকেরা আমার চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বিষ্ণুর সাঙ্কেতিক চিহ্নটি আমি অতি পরিপাটীরূপে লাল মাটির উপর চিত্রিত করিলাম। তখন, বিস্ময় ও মমতা-সূচক অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি চারি দিক হইতে সমুত্থিত হইল। তখন সেই রূপসী ভারত-ললনা স্বয়ং সেই চূর্ণাধারটি আমার হস্ত হইতে ফিরিয়া লইল ; এমন কি, তাহার কল্পিত নক্‌সা-রচনার কাজে আমাকে সহকারী করিতেও সম্মত হইল :—চারিধারে গোলাপ ফুলের ও তারার নক্‌সা কাটিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যবিন্দুতে এক একটি Ibiscus ফুল বসাইয়া দিতে হইবে।—ইহাই তাহার নক্‌সার কল্পনা।

যাহা হউক, ইহাই যথেষ্ট—যথেষ্ট অপেক্ষাও বেশী। একটা অবিবেচনার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমার সহিত জড়িত কোন কষ্টকর স্মৃতি তাহার মনে না থাকিয়া যায় ; এবং তাহার নিকট হইতে অন্ততঃ শিষ্টাচার-সম্মত একটি বিদায়-দৃষ্টিও যাহাতে লাভ করিতে পারি—এই হেতু আমি এই সময়ে সরিয়া পড়াই শ্রেয় মনে করিলাম।

ও দিকে সমুজ্জ্বল চূড়াসমন্বিত কনক-পত্র-মণ্ডিত বিষ্ণু-রথের চারিধারে, শুক্ল-বসনধারী লোকেরা দলে দলে সম্মিলিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহর রাত্রি আগতপ্রায়। এইবার কি একটা রহস্য ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। আমার তাহা দেখিবার অধিকার নাই। উৎসব-ঘটা ও জাঁকজমক বর্দ্ধিত করিবার জন্য, বড় বড় সুলক্ষণ হস্তী (তন্মধ্যে একটির বয়স শতবর্ষ) রথের নিকট সমানীত হইয়াছে, উহারা জরির কাজ করা সাজে সুসজ্জিত ; চন্দ্রালোকে শরীর দুলাইতেছে —যেন প্রকাণ্ড কতকগুলা কর্দ্দমের ঢিপি। এই ঘোর নিশাকালেও বৃহৎ ছত্র সকল উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—ছত্রের প্রান্তদেশে তাঁবার চাকতি। অষ্টাদশবর্ষীয় এক দল ব্রাহ্মণযুবক ত্রিশূলের অনুকরণে নির্ম্মিত ত্রি-শাখা ও ত্রিশাখা-বিশিষ্ট মশাল লইয়া উপস্থিত হইল।

এইক্ষণে যে রহস্যব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা এই:—ইতর-সাধারণের অদর্শনীয় সেই পবিত্র সাঙ্কেতিক বিগ্রহটিকে—শ্রীরাগমের সেই অনন্যসাধারণ প্রকৃত বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে আজ মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র যে স্থান—সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। এই বিগ্রহটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে গঠিত,—পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের উপর শয়ান। রথের সম্মুখে একটি মঞ্চের উপর প্রাচীন ধরণের একটি মন্দিরাকার গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইবে; গৃহটি এই উদ্দেশ্যেই বিশেষরূপে নির্ম্মিত; বিগ্রহের পাদদেশে দীপমালা জ্বলিবে, এবং পুরোহিতেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার পর কল্য প্রভাতে, যাত্রোৎসবের সময়ে, বিগ্রহটিকে ঐ মন্দির-গৃহের একটা জান্‌লার ভিতর দিয়া বাহির করিয়া রথের উপর—মন্দির-চূড়ার ন্যায় একটা চন্দ্রাতপের নীচে—বসান হইবে। বিগ্রহটি উহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগৃহে ফিরিবার সময় যতবার এই শ্রীরাগমের বিষ্ণুমূর্ত্তি বীথিটি পার হইবে, বলা বাহুল্য, ততবারই উহাকে কাপড় দিয়া খুব ঢাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কাপড় দিয়া ঢাকা হউক, বা না হউক, সে একই কথা; কেন না, যাহাতে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ বিগ্রহটিকে দেখিতে না পায়, এই জন্য উহাকে রাত্রিতেই গৃহান্তরিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর, পূর্ণিমা তিথিতে উৎসবের দিনটা পড়ায়, লোকেরা আমাকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিল; কারণ, আমিই এখানে একমাত্র বিধর্ম্মী; আর বাস্তবিকই রাত্রিটা খুব পরিষ্কার।

তখন আমি, অন্য ব্রাহ্মণ পথিকদিগের ন্যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরেই (যে প্রস্তর-ময় গলির উপর দিয়া রথ চলিবে, তাহা হইতে অবশ্য বহুদূরে) শয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি দিক ঘোর নিস্তব্ধ; সেখানকার শৈত্য প্রায় যেন গোরস্থানের ন্যায় স্থিতিশীল। মধ্যে মধ্যে, অর্দ্ধ-নিঃশব্দ পদক্ষেপে লোকেরা নগ্নপদে অতি সাবধানে মন্দিরের সানের উপর যাতায়াত করিতেছে। প্রার্থনা মন্ত্রাদির অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে মন্দিরের সেই শব্দযোনি খিলান-মণ্ডলের নীচে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। * * *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার সংসার।

সুখের চেয়ে সোয়াস্তি বরং ছিল ভাল। বিবাহ করিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছি। তবে কি আমার বিবাহ নিষ্ফল হইয়াছে? রাম বল! এমন কথা কোন

গণ্ডমূর্খ বলে? এই ছয় বৎসর বিবাহ হইয়াছে, ফলে ফুলে এরি মধ্যে পাঁচটি! সে ফলের অপ্রতুল নাই। ফল বুঝিতে আমি অন্য ফলের কথা ভাবিতেছিলাম।

অনূঢ় অবস্থায় আমার সংসারে বিশৃঙ্খলা ছিল না, বিবাহের ফলে এখন শৃঙ্খলা সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তখন সকালে উঠিয়া খবরের কাগজের সঙ্গে চা-টুকু বা কোকোটুকু নিয়মমত টেবিলের উপর পাইতাম, তার সঙ্গে দুখানা টোষ্টও পাইতাম, দুটা ডিমও থাকিত। এখন অনেক মাথা খোঁড়া ও সাধ্য সাধনায়ও একটু নেবুর রস, বা চিরেতার জল, বা দুটো আদা ছোলাও মেলা দায়। কে দেয়? সবাইকারই হাত জোড়া; কেউ ত আর বসে' নাই। অথচ এই সব ঝি চাকর বামুন তখনও ছিল। তখন আমি স্নানাগার হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর ভাত বাড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এখন স্নান করিয়া পূজা আহ্নিকের মত নিজের "ঠাঁই" নিজে করিয়া লওয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। "ভাত কই" "ভাত কই" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে গলা ভাঙ্গিয়া গেলে খবর পাওয়া যায়, "এই নিয়ে যাচ্চি।" খাইয়া উঠিয়া গেলে আঁব ছেঁকা বা নুন-নেবুর পাতা আসিয়া পড়ে। আঁচাইবার জল বাহিরের কলে পাওয়া যায়, যদি ১১টার মধ্যে আহার শেষ করিতে পারি। আহারান্তে পান বা মসলা যে আসে না, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু সে বমি হইয়া যাইবার পর। বাড়ীতে ভদ্রলোক আসিলে পান সুপারির মিতব্যয়িতা দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করে। অথচ খাতা দেখিয়াছি, পান সুপারির বাবদে যে খরচ পড়ে, তাহাতে অন্যত্র এই খরচে পানের সদাব্রত করা যায়। *

পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে এমন লোকটা জনটা আলাপী বন্ধু বান্ধব সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসিত, এবং চিনিবাস খানসামা ও ইদু বাবুর্চিতে মিলিয়া হয় ত বা দুটো চপ, নয় ত বা দুখানা কাটলেট, নিদেন গরম অমলেট ভাজিয়াও তাহাদিগকে কিছু জলযোগ করাইয়া দিত। এখন শুধু এক গ্লাস খাবার-জল চাহিলে গোলযোগের সম্ভাবনা।

আগে যে জিনিসে সম্পূর্ণ সুপ্রতুল হইত, এখন তাহার তিন গুণ জিনিসেও থই পায় না। কারণ?—আমার বেজায় লোক খাওয়ান ও চাকর বাকরের চুরি।

---

* স্ত্রী-নিন্দা মহাপাপ। পাপের ভরা আর বাড়াইব না। সত্য কথাই বলি, পান কয়টি আমার স্ত্রী আর কাহাকেও সাজিতে দেন না; নিজেই সাজেন। তাই দেশের ঝিয়ের সাজা পান তাঁর সাজা পানের তুলনায় অমৃত।

অথচ এই চাকর বাকরের হাতেই পূর্ব্বে আমার যথাসর্ব্বস্ব ন্যস্ত ছিল, এবং কখনও একটি পয়সার এ দিক ও দিক হয় নাই। চাকরেরা আর আগেকার মত কাজ করে না। "চিনিবাসকে রাখার কি দরকার? দুখানা কাপড় কোঁচান আর কাচা, এই ত ওর কাজ। মাতাদিনটা কি করে? কেবল তামাক সাজে, আর পাখা টানে। সমস্ত দিনে খুকীটাকে একবার ধরতে পারে না।" অথচ ডাক,—"ওরে মাতাদিন! মহেন্দ্রবাবুকে তামাক দিয়ে যা।"

"নেই।"

"কেন? কোথা গেল?"

"খুকীকে মাসীমার রকে হাওয়া খাওয়াচ্চে।"

"চিনিবাস?"

"আজ নতুন ঝি আসেনি, তাই বৌমার ঘরের কাজ কচ্চে। বল্লুম, বাবা ডাকচেন; বল্লে, আমি এখন ছারপোকা বাচ্চি, তার পর বালিসের তুলো বেরিয়ে পড়েছে—শেলাই করে দিয়ে তবে যাব।"

"কেন, বুড়ী কি কচ্ছে?"

"সে এখন গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিতে গেছে—তার পর গঙ্গা নেয়ে আসবে। বৌমা তাকে বিছানা ছুঁতে দেয় না।"

সুতরাং খাটুনিটা সমস্তই আমার স্ত্রীর, অতএব তাঁর সাধা মেজাজ যদি সপ্তমে চড়েই থাকে, তবে তাতে দোষের এমন কি আছে?

শুতে আমার একটু রাত্তির বরাবরই হয়। আগে ভোরের দিকের ক' ঘণ্টা ঘুমাইতাম ভাল, এবং উঠিতেও একটু বিলম্ব হইত। এখন ঠিক তার বিপরীত। পাশের ঘরে লোক থাকিলে কি হইবে? তাঁর ঘরে আমি সন্ধ্যা থেকে গিয়ে না থাকলে ভয়ে আমার স্ত্রীর ঘুম হয় হয় না, এবং আমি ঘরে যাবামাত্রই তাঁর নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হয়। বই বা কাগজ নিয়ে প্রথম রাতটা কাটাই, তার পর ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সে কতটুকু? শেষ রাত্রে খুকীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং সে হাঙ্গাম জোড়ে; সুতরাং তাকে humour করতে হয়; তার মাকে জাগান ungallant হবে, সুতরাং তা ত আর হয় না। ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে যখন খুকী বা খোকা থাকে, তখন এই রকম করে' তার তুষ্টিসাধন করতে গিয়ে প্রায়ই ফরসা হয়ে যায়, সুতরাং বাইরে বেরিয়ে পড়ি। তার পর চপেটাঘাতে যখন সব ছেলে মেয়েদের পিঠের কুলো ও গলার শাঁখ বেজে ওঠে, তখন বোঝা যায়, আমার স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। তার পর প্রাতঃকৃত্যাদিতে মনঃসংযোগের পালা। এ

দিকে "নাগা সন্ন্যাসীর" দল সব হয় ত শীতের কুয়াসায়, নয় ত বর্ষার ধারার ভিতর দিয়া "নগ্নদেহে কুতূহলে" আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি কোনও দিন কোনও গতিকে খুঁজিয়া পাতিয়া তাদের গায়ে জামা ও পায়ে জুতা নিজে পরাইয়া দিতে না পারি, তবে এই সকল বিলাসসামগ্রী সে দিন তাহাদের অঙ্গে উঠিয়া চরিতার্থ হইবার অবকাশ পায় না। তোমরা বলাবলি করিতেছ, কেন, ঝি চাকরগুলা কি করে? আমিও তাই বলি, কিন্তু তোমাদের বা আমার বলাতে কি আসে যায়? তা ছাড়া, ঝি চাকরেরাই যদি এই সব কুকার্য্য করিয়া বেড়ায়, তবে আমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মআচরণের যোগাড় করিয়া দিবে কে? দাঁত পরিষ্কার করিবার জন্য খোড়ের সূতা, প্রত্যেক নখ সাফ করিবার জন্য এক ঘড়া করিয়া জল, এবং যে বাসী দালান দিয়া চলিয়া অশুচি হইবার অপরাধে ছেলে মেয়েরা ধনঞ্জয় ভোগ করে, তাহার পবিত্রতাসাধন করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবে কে?

খোদাবক্স দরজীর দেনাও শোধ হয় না, আমার স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে জ্যাকেট সেমিজও ওঠে না। কেশবিন্যাস দূরে থাক, চুলটা আঁচড়ে একটা ফাঁস দিবার সময়ও আমার কর্ম্মিষ্ঠা গৃহিণীর হইয়া উঠে না।

সেফ্‌টি-পিনের খরচ আমার কিছু অতিরিক্ত। কারণ, ছেলেপুলের জামার বোতাম একবার ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাদের বোতাম-জন্ম ঘুচিয়া সেফটি-পিন-ত্ব লাভ হয়। যদি রিপুকর্ম্মওয়ালা ডাকাই, তবে আমার স্ত্রীর ক্রোধের সীমা থাকে না; কেন না, তিনি মনে করেন, তাঁর গতরের প্রতি আমার নজর পড়িতেছে! কিন্তু গলায় একটা কিছু জড়াইয়া রাখিবার আবশ্যক হউক, এবং একটি পিন চাও, নিঃসঙ্কোচে "নাই" বা "দেখ্‌তে পাচ্চি না" বলিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে যাইবেন।

সকল বাপেই ছেলেদের খেলনা আনিয়া দেয়, আমিও দি। কিন্তু খেলনা আসিবা-মাত্রই তাহা চাবির মধ্যে গিয়া পড়ে। ছেলেরা যদি তাহার জন্য বায়না করে, তবে তাহারা আর এক খেলা দেখিতে পায়, তাহার ফলে কারও বা পিঠে, কারও বা গালে, আঙ্গুলের দাগ পড়ে।

বিস্তর দাম দিয়া সুপরিচিত শিল্পীদের আঁকা যে সব ছবি কিনিয়া টাঙ্গাইয়া-ছিলাম, সে সব ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া দুরন্ত ছেলের মত দাঁড়াইয়াছে। তার পরিবর্ত্তে কালীঘাটের পট ও মেলিন্স ফুডের রাধা-কৃষ্ণ প্রকোষ্ঠের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বিছানা নিভাঁজ টানা হওয়া চাই, তাই কর্ণার-শেল্‌ফ্‌ ও তাহাদিগের শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ কারুকার্য্যময় অলঙ্কার সকল

দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ল্যাজারসের বাড়ীর সেক্রেটেরিয়েট টেবিল এখন দুধের বাটি, ঝিনুক, জলের গেলাস, চিনি মিছরী বাতাসা, পানের গামলা, দোক্তার কৌটা, দড়ি, চিরুণী, আরসী, সিঁদুর, প্রভৃতি রাখিবার পেতেন হইয়াছে। টেনিসনের গ্রন্থ এখন দুধের বাটী চাপা দিয়া সরপোষের কাজ করে, এবং রস্‌কিনের "সেভ্‌ন ল্যাম্পস্‌" মাথা দিয়া তাঁর সিঁদুরের কাগজ চাপিয়া থাকায় আমার সহধর্ম্মিণীর সধবা-জীবন বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে মহিমান্বিত হইয়া উঠে।

বিবাহের যৌতুকে যে পালঙ্ক পাইয়াছিলাম, তাহা এখন কাছারীঘরে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহেন্দ্র সরকার শোয়। কেন না, তাহাতে অত্যন্ত ছারপোকা।

রোগ হইলে আমার স্ত্রীর ঔষধে অরুচি হয়, এবং আরোগ্যের মুখে কুপথ্যে রুচি দেখা দেয়। কাল্পনিক রোগে ছেলেদের ঔষধ দিতে বিলম্ব হইলে আমার স্ত্রীর মাতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া সংসার ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে; কিন্তু আসল ব্যাধির সময় ঔষধ খাওয়াইতে ভুল হইয়া যায়;—মায়ে ঔষধাদি খাওয়াইলে ফল হয় না, এই সকল শাস্ত্র বাহির হয়।

আমাদের যে ঝি তিন পুরুষ মানুষ করিয়াছিল, তাহার মাহিয়ানা ছিল এক টাকা। মরিবার আগে তার দুই টাকা করিয়া পেন্সন বরাদ্দ হইয়াছিল। আমার স্ত্রীও ঝি সরবরাহ করিয়া থাকেন। কেহ দু' দিন থাকে, কেহ দশ দিন; অর্থাৎ, মেজাজের পরিচয় পাইতে দশ দিনের বেশী কাহারও লাগিতে দেখি নাই। বেতন ৩৲ টাকার বেশী নয়। জলখাবারের চারি আনা মাসে, এবং আর চারি আনা নারকেল তেলের জন্য। পান ও পানের মশলা, দশমীর জলখাবার, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ভাতের বদলে রুটি, তিনখানি গামছা, ছয়খান কাপড়, রাত্রে ৯টার আগে ছুটি ও সকালে ৭টার পর আসা, এবং বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ঘুম, এবং তত্ত্বতাবাসে লাভের লোভ, এই সকল সর্ত্তে বদ্ধ হইয়া, আমার স্ত্রী ঝি আমদানি করিয়া থাকেন, এবং রপ্তানীও খুব চটপট হয়। বৎসরের মধ্যে মহেন্দ্র সরকারকে বিস্তর নাম ফাঁদিতে ও অনেক জমাখরচ করিতে হয়। স্বজাতি-(পুরুষ)-প্রীতির-উপরোধে একবার এই ঝিয়ের প্রসঙ্গ ইঙ্গিতে উত্থাপন করিয়াছিলাম; ফলে চিনিবাস তিন দিন মুখে দুটা ভাত গুঁজিবার অবসর পায় নাই। গাড়ীভাড়ার বাকি, ধোবার বাড়ী দিবার কালে পকেটে ও ঘর ঝাড়িবার সময় টেবিলের উপর হইতে কুড়িয়ে পাওয়া রেজকির খাতিরে আজও টেঁকিয়া আছে। ছেলেটার উপর মায়াও পড়িয়াছে, তাই ছাড়িয়া যাইবার নোটিস দেয় নাই। কিন্তু সে জন্য ভাবনা নাই, শীঘ্রই দিবে।

স্ত্রীর আমার বুদ্ধি যেমন প্রখর, স্মরণশক্তিও তেমনই তীক্ষ্ণ ও আশ্চর্য্য। গয়লা যখন পাঁচ সেরের দরে হিসাব ধরে, তখন তিনি বলেন, "রসো, পাঁচ সের ক'রে হ'লে এক টাকায় ক' সের হ'ল ?" ভিখারীকে মুষ্ট্যন্ন দিবার কালে মনে পড়ে, জ্ঞাতি-দের মধ্যে অমুকের সন্তান হইয়াছে, আমাদের শুভাশৌচ, ভিক্ষা দিতে নাই। কিন্তু যখন আর পাঁচ ঘরের মেয়েদের নিন্দা করিয়া হরমণি ঠাকরুণ দু'জনের মত সিদে একলা বাঁধিয়া লইয়া যান, তখন বোধ হয় অশৌচত্ব কাটিয়া গিয়া শুভটা শুভতর হইয়া উঠে। এ দিকে আমার স্ত্রী হিসাবী খুব। সংসারে দিলে পাছে মারা যায়, বা আদায় হইতে বিলম্ব হয়, এ জন্য আবশ্যক হইলে নিজের ছেলের জন্য এরারুট কিনিতে. বা জায়ের মেয়ের জন্য দুইখানা বিস্কুট কিনিতে দুইটা পয়সা বাহির হয় না ; কিন্তু তাঁর ভাই আসিলে সেই একই দিনে দু' টাকা খরচ করিয়া চপ কাটলেট সন্দেশ রাবড়ী ইত্যাদি আনাইয়া খাওয়াইয়া দেন ; ঘরে খাবার করিলে পাছে অন্যে ভাগ পায় ! বুদ্ধিমতী গৃহিণী অভাবের মুখে চাপা দিয়া সম্মানের শঙ্খে ফুৎকার দেন। অন্য বোকা স্ত্রীর মত তাঁর নিকট অমন মুড়ি মিছরীর একদর নয়। সংসার করা কি সামান্য কথা ? একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা চালান বরং সহজ ! এখানে চক্ষুলজ্জা করিলে ঠকিতে হয়। *

টাকা ধার দেওয়া ও তাহার সুদ আদায়ের ব্যাপারটা আর তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই। কেন না, তাহা হইলে তোমাদের স্ত্রীরা শিখিবে, —আমার স্ত্রীর ব্যবসা মাটী হইবে। সুতরাং সে কথা আর বলিব না। সাংসারিক অবস্থার উন্নতিকল্পে আমার স্ত্রীর এরূপ ছোট খাট আরও অনেক ব্যবসা আছে।

আগে যখন তহবিল সরকারের কাছে ও হুকুম আমার কাছে ছিল, তখন ডাকিবামাত্র গাড়ী পাইতাম। এখন আর আমি পাই না, কিন্তু আমার স্ত্রী একখানার স্থলে দশখানা পাইয়া থাকেন ; অর্থাৎ, অবৈতনিক হাকিমকে ঘণ্টা হিসাবে বাঁধা সোয়ারী দেওয়া ও "মা-জী"কে আরোহী করায় প্রভেদ অনেক। এ দিকে হচ্চে ঘরের খেয়ে বনের মহিষ চরাণ, অপরটি কালীঘাট ও গঙ্গাস্নানের পুণ্যসঞ্চয়। চাকরদিগের মধ্যে শুকলাল দরওয়ানই গৃহিণী ঠাকুরাণীর প্রিয়পাত্র ; কেন না, সে তার নিজের কর্ত্তব্য ছাড়া "মা-জীর" দরুণ সকল কাজ করিবারই সময় পায়। অর্থাৎ, চিঠি বহা বা বাড়ী চৌকি

* বাড়ীর জামাই, অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতি আসিলে, ব্যবস্থা অন্যরূপ। তখন চপ কাটলেটের জন্য টাকা পড়ে না ; লুচি আলুর দম্ ধোঁকা প্রভৃতির জন্য পয়সা বাহির হয়।

দিবার কালে দেখিতে পাইবে, সে হয় ভুট্টাওয়ালী খোট্টানীর দোকানে দাঁড়াইয়া গম ভাঙ্গাইতেছে; নয় ত গঙ্গামৃত্তিকা আনিতে গিয়াছে; নয় ত গঙ্গার পুণ্যসলিলে রাঁধিবার ইন্ধন ধুইয়া পবিত্র করিয়া রাখিতেছে; নয় ত ভিজা কাপড়ে "মা-জী"র জলখাবার আনিতে গিয়াছে; নয় ত "মা-জী"র সোয়ারীর সঙ্গে গাড়ীতে যাইবে বলিয়া পাগড়ী বাঁধিতেছে। যখন এই সকল সৎকর্ম্মে শুকলাল নিযুক্ত না থাকে, তখন দেখিবে, সে "মা-জী"র আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে, তাহার তত্ত্ব লইয়া ফিরিতেছে। *

শুকলালকে তাড়াইয়া একটা মুসলমান দরওয়ান রাখিবার প্রসঙ্গ একবার উত্থাপন করিয়াছিলাম। ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা যেন তোমাদের ভাগ্যে না ঘটে।

আমার সহিত কথা কহিবার কালে আমার স্ত্রীর অবগুণ্ঠন অকস্মাৎ দেড় হাত বাড়িয়া গিয়া কলা-বৌএর ঘোমটার মত লম্বা হইয়া পড়ে, দেখিতে পাই। কিন্তু বাড়ীতে যখন কোনও লোক আসে, ঠিক সেই সময় আমার সুমধুরভাষিণীর কল কণ্ঠস্বরে সপ্তস্বরের সুরগ্রাম খেলিতে থাকে। আমার লজ্জাবতীর অভিধানে ইহারই নাম লজ্জা।

ছেলেরা দুষ্টামী করে, এবং আমার স্ত্রী যখন তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে না পারেন, তখন তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য আমাকে বাহির হইতে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গিয়া দেখি, তাহারা নিতান্ত নির্দ্দোষ শিশুসুলভ আমোদে ব্যস্ত। শাসন করিব কি, তাহাদের সে আমোদে যোগদান করিয়া আমি নিজেই অনেকটা আনন্দ উপভোগ করি। আমার স্ত্রী তাহা দেখিয়া মহা ক্ষাপা হইয়া উঠেন। কিন্তু যে সময় সত্যই তাদের শাসন প্রয়োজন, সে সময় তাঁর নিজের অভিলষিত কাজের খাতিরে তাদের অন্যায় বায়নাকে প্রশয় দেওয়া ও ঘুস দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করা হয়। আমার স্ত্রীর মতে ইহাই শিশুশিক্ষা।

যদি বলি, "আচ্ছা সূর্য্যমুখী ও তোমার মত সোনামুখীতে তফাৎ কি, বল দেখি?" তার উত্তর পাই, "আর যাই হ'ক, বরণডালা সাজাবার বিষয়ে আমরা দু'জনে এক; পার ত একটা কুন্দর যোগাড় দেখ না।" যদি বলি, "বল দেখি, 'যাও প্রফুল্ল! একবার জয়ন্তীর পাশে গিয়া দাঁড়াও, উভয়ে মিলিয়া সনাতন ধর্ম্ম পূর্ণ কর,' এর মানে কি?" তবে তিনি বলেন, "কেন, আমি কি তোমার কাছে এগজামিন দিতে এসেছি নাকি?"

মেজাজ গরম করিয়াও দেখিয়াছি। কচিৎ ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উল্টা উৎপত্তি হয়। অধিকন্তু আমার বন্ধু অনাথের মতে, এরূপ মেজাজ

শেখান কাপুরুষতামাত্র। অনাথ বলেন, বয়স হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু সে বয়স কবে হইবে, অনাথ তাহা বলিতে পারেন না। অধিকন্তু তিনি নিজের বেলায় যে হাঙ্গাম জোড়েন দেখিয়াছি, তাহা এত গুরুতর যে, তাহার প্রতিকার করিতে গিয়া অনাথ বেচারী যে সকল বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন, তাতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গিনীরা অনাথকে গ্রাম্যভাষায় স্ত্রৈণ বলিয়া থাকেন, এমনও শুনিয়াছি।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্ত্তি করিয়া দিতে আমার স্ত্রী নারাজ। কেন না, সেখানে কেবল হাত পা নাড়া, অর্থাৎ ব্যায়াম, এবং আকাশের রঙ্গ নীল, ও গাছের পাতা সবুজ, অর্থাৎ অবজেক্‌ট্‌ লেস্‌ন্‌-শেখান হয় মাত্র। বলেন, "তার চেয়ে ওদের দুপুরবেলা একটু ক'রে ঘুম পাড়াও।"

বামাবোধিনী, পরিচারিকা, অন্তঃপুর প্রভৃতি সাময়িকপত্র, ভূদেব বাবুর গার্হস্থ্য প্রবন্ধ, ললনা-সুহৃদ প্রভৃতি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক আনিয়া স্তূপাকার করিয়াছিলাম। পুরাতন বঙ্গদর্শনের "নবীনা প্রাচীনা" দাগ দিয়া পড়িতে দিয়াছিলাম; কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রতিবেশিনীর, স্বদেশী ও বিদেশী আদর্শচরিত্র বহু মহিলার উদাহরণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছিলাম; এমন কি, নারীনীতি ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়া বেনামী ছোট ছোট গল্প প্রকাশ করিয়া পড়িতে দিয়াছিলাম,—যদি ক্রমে অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আমার জীবনতোষিণী তুষ্ট হইয়া তাঁর নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পরিহার করিয়া সনাতন অমৌলিক নারীকর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু হায়! ভবী ভুলিল না। মরীচিকায় প্রতারিত হইবার পাত্রী আর যেই হউন, আমার প্রতিভাবতী সরস্বতী নয়।

সহযোগী সাহিত্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও মস্‌লেম্‌ সাহিত্য।

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামক সাময়িক পত্রে হায়দ্রাবাদ-বাসী শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বি. কে. যোশী মহাশয় "The Bengal Academy and Moslem Literature" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

বোম্বাই নগরের "ইণ্ডিয়ান স্পেক্‌টেটার" পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ।—"দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্‌ লিটারেচার বা কলিকাতার সুপরিচিত 'সাহিত্য-পরিষৎ' অধুনা আরবী ও পারসী শব্দের পরিশুদ্ধ বর্ণান্তর বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। বঙ্গভাষায় শত শত আরবী ও পারসী শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে ; এই শব্দনিচয় বঙ্গাক্ষরে—(যাহা দেবনাগর অক্ষরেরই প্রতিলিপি) বর্ণান্তরিত করা হইবে। কলিকাতার 'সাহিত্য-পরিষৎ' 'ডেকান পোষ্টে'র সম্পাদক মিঃ এস্. এম্. মিত্র এম্. আর্. এ. এস্. মহোদয়কে বর্ণান্তরবিষয়ক নিয়মাবলী প্রণয়নার্থ মনোনীত করিয়াছেন। মিঃ মিত্র পারসীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত, এবং বঙ্গভাষার খ্যাতনামা লেখক। এক বৎসর পূর্ব্বে 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' নামক সাময়িকপত্রে তিনি বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মিঃ মিত্র এক্ষণে বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রচলিত মস্‌লেম্‌ শব্দসমূহের বানান-সংশোধনে ব্যাপৃত আছেন। এ বিষয়ে তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্টারন্যাশনাল ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেস্‌' বা আন্তর্জ্জাতিক প্রাচ্য মহা-সমিতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতেছেন। গ্রেট বৃটেনের 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী'ও উক্ত বর্ণান্তর-প্রণালীর অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গুজরাটী ও মারাঠী পণ্ডিতদিগের কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাষায় মস্‌লেম্‌ শব্দের বর্ণবিন্যাস বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।"

আমি বিশেষ অভিনিবেশসহকারে উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিয়াছিলাম। আমার এরূপ আগ্রহ-প্রকাশের কারণ আছে। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য-পরিষৎ পরিশেষে মস্‌লেম্‌ শব্দাবলীর বর্ণান্তর বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহা, বঙ্গভাষার ন্যায়, আমার মাতৃভাষা মারাঠীর পক্ষেও ফলোপধায়ক হইবে। বঙ্গভাষার ন্যায় মারাঠী ভাষাতেও বহুসংখ্যক বৈদেশিক শব্দ অল্পাধিক বিকৃত উচ্চারণ সহ ব্যবহৃত হইতেছে ; এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ঋণলব্ধ বৈদেশিক শব্দসমূহ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বিদ্যমান না থাকাতেই এইরূপ উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। আমার বিবেচনায়, বৈদেশিক শব্দের বর্ণান্তর বঙ্গভাষার পক্ষে যেরূপ আবশ্যক, মারাঠী ভাষার পক্ষেও তদনুরূপ প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য আমি স্বয়ং মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ তথ্য অবগত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলাম। দেবভাষার সহিত যাঁহাদিগের মাতৃভাষার সম্পর্ক আছে, তাঁহাদিগের নিকট, মিত্রমহাশয়ের সহিত আমার এতৎসংক্রান্ত আলোচনার বিবরণ হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, এবং যাঁহারা পরকীয় ভাষার বর্ণান্তর কার্য্যে নিরত আছেন, এই আলোচনা তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলে অনেক অত্যাবশ্যক তত্ত্ব ও সমালোচনাও প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, এই মনে করিয়া, আমি ইহা সাধারণ্যে প্রচার করিতেছি।

প্রশ্ন। মিঃ মিত্র, আমার মনে হয়, আপনি পারসীক সাহিত্যের আলোচনা প্রীতিকর জ্ঞান করেন ?

উত্তর। পারসীক অতি শ্রুতিমধুর ভাষা, স্যার উইলিয়ম জোন্সের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। আমার বিবেচনায়, পারসীক ভাষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। এই ভাষা ভবিষ্যতে সমগ্র এশিয়াখণ্ডের ভাষা হইবে। সম্যক্‌রূপে প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলন না করিলে, আমার বিবেচনায়, কোন ব্যক্তির শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। এই জন্য ইতিহাস-পাঠকের নিকট পারস্যের ইতিহাস বিশেষ আদরের সামগ্রী। একবার কোন দেশের অধঃপতন ঘটিলে, সে দেশ আর উন্নতি-শিখরে অধিরোহণ করিতে পারে না ; কিন্তু পারস্য তিনবার অধঃপতিত ও পুনরুত্থিত হইয়াছে।

প্রশ্ন। আপনি বলিতেছেন, পারসীক ভাষা ভবিষ্যতে সমগ্র এশিয়ার ভাষা হইবে, কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আপনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন?

উত্তর। আমার অভিমত অপেক্ষা ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দের উক্তি আপনার অধিকতর আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। "ট্রান্সেক্শন্ কণ্ডে"র মিঃ আর্বুথনট্ বলিয়াছেন, পারস্যদেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে; এই দেশের অতীত ইতিহাস উত্থান, পতন প্রভৃতি বহুভাগ্যবিপর্য্যয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। পারস্যের ভৌগোলিক সংস্থান যেরূপ, তাহাতে উহার ভাবী ইতিহাসেও বিবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার সমাবেশ হইবে। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, পারস্যের অবস্থা ও রাজনীতি বিষয়ে অনেক কথা লোকের শ্রুতিগোচর হইবে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ইংলণ্ডেরই পারস্যের উপর তীব্রতর দৃষ্টি রহিয়াছে।

প্রশ্ন। আপনি কি সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলিতেছেন?

উত্তর। তিব্বত অভিযান শেষ হইয়াছে; এখন যদি লর্ড কর্জ্জন পারস্যের ব্যাপারে চিত্তনিবেশ করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে অবিলম্বে পারস্যে একটি বাণিজ্য-মিশন প্রেরিত হইতেছে। অধুনাতন পারস্যের ভাষা, সমগ্র মধ্যএশিয়ার "সার্ব্বভৌম ভাষা"। ট্রিনিটী কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক মিঃ ষ্ট্যান্লি লেন্ পুল আধুনিক পারসী ভাষাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান্ মিঃ ব্রেন্ফোর্ড স্বপ্রণীত (Hidayat-un Nahvi) "হিদায়েৎ আন্ নাহ্তি" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভূমিকায় আরবী ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, ইসলামধর্ম্মাবলম্বী—যাহারা সংখ্যায় খৃষ্টানদিগের অপেক্ষা অধিক—তাহাদিগের ধর্ম্মের ভাষারূপে, ভারতের সুশিক্ষিত মুসলমানদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিজ্ঞাপনের সহায়-রূপে, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সমৃদ্ধিবৃদ্ধির অনন্ত উৎস-রূপে, ও অন্যান্য কারণে পারসীক ভাষা আমাদিগের অনুশীলনের বিষয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারসীক ভাষার যথোচিত আদর নাই। পারসী ভাষার অনুশীলনে ঔদাস্যপ্রকাশ হিন্দুদিগের পক্ষে ত সনাতন নিয়ম, আর মুসলমানদিগের প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি বর্ত্তমান পারসী ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন কি না সন্দেহস্থল। ভারতীয় মৌলবীর 'ইয়া-ই-মজহুল'ই (Ya-i-Majhul) ভারতবর্ষে এই ভাষার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

প্রশ্ন। কি প্রকারে এই সর্ব্বনাশ ঘটিল?

উত্তর। ভারতের মৌলবীর পারসী উচ্চারণ সুললিত ও শ্রুতিমধুর নহে। সেনাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে এই দোষ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। শুনিয়াছি, যে সকল সামরিক কর্ম্মচারী পারসী ভাষায় উচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিবার জন্য পারসী ভাষার অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পারসী ভাষার যথাযথ উচ্চারণ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে বলা হইয়াছে। যে সকল শিক্ষকের মাতৃভাষা পারসী, তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত এই কার্য্য সুসাধ্য নহে। কিন্তু ভারতে এরূপ শিক্ষকের অভাব প্রতিপদে পরিলক্ষিত হয়। পারসী ভাষার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সেনা-বিভাগের প্রত্যেক রেজিমেণ্টে যে এক জন করিয়া মুন্সী নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কোনও কাজই হয় না। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মুসলমান গ্রাজুয়েটেরাও এ বিষয়ে কোনও অংশে উন্নত বলিয়া বোধ হয় না।

প্রশ্ন। তবে কি আপনি পারস্যদেশীয় শিক্ষকের নিকট পারসী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?

উত্তর। হাঁ, গত পঞ্চদশ বৎসর আমি এক জন পারস্যদেশীয় শিক্ষকের নিকট পারসী সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছি।

প্রশ্ন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইংরাজেরাই পারসী ভাষার অধিকতর অনুরাগী নহেন কি? আপনি কি বলেন?

উত্তর। হাঁ; তবে জার্ম্মনীর সুপ্রসিদ্ধ মনীষী হার্ম্মেন এথি (Herman Ethe) অথবা প্রাচ্য-তত্ত্ববিৎ ফরাসী ড্রামেষ্টেটার (Dramestetter) পারসী ভাষার অনুশীলনকল্পে যেরূপ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, ইংরাজেরা সেরূপ পরিশ্রম করেন নাই। অন্যান্য প্রাচ্য ভাষা অপেক্ষা পারসী ভাষায় যে ইংরাজদিগের অধিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, তাহারও একটা কারণ আছে। পারসী ভাষার প্রতি ইংরাজের এই অনুরাগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ওমার খৈয়ামের লোকপ্রিয়তার কথা কি আপনি শুনেন নাই? ইংলণ্ডের প্রত্যেক পরিবারে ওমার খৈয়ামের নাম সুপরিচিত। তথাপি কবি-গণনায় ওমার পারস্যের তৃতীয় শ্রেণীর কবি। আরবের মহাকবি হারিরির (Hariri) নাম ইংরাজেরা জানেন না বলিলেই হয়। ভারতের অমর কবি কালিদাসও তাঁহাদের উপাস্য হইতে পারেন নাই। ওমার কিন্তু লোকের উপাস্য হইয়াছেন। অনেক ভক্ত এখন তাঁহার পূজা করিতেছে। আপনি বোধ করি মান্দ্রাজের মিঃ আর্ডলে নর্টনকে (Eardley Norton) জানেন। আপনি যেমন গীতার আবৃত্তি করিতে ভালবাসেন, ওমারের আবৃত্তিতে তাঁহার সেইরূপ অনুরাগ দেখা যায়। সাধারণ ইংরাজ পাঠকেরা কেবলমাত্র ওমারের কাব্যপাঠে প্রাচ্য কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। ভাগ্যগুণে ওমার ফিট্‌জেরাল্ডের ন্যায় অনুবাদক পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত আদর হইয়াছে। ফিট্‌জেরাল্ড, কাল্ডারন্ (Calderon) ও এইস্‌কাইলাসের (Aeschylus) রচনা ভাবান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উঁহারা লোকপূজ্য (Cult) হইয়াছেন কি? বিভিন্ন ভাষা আর্য্যভাষাসম্ভূত বলিয়া আপনি সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন না। বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাস ইংরাজ-দিগের আর্য্যজ্ঞাতি, তবে তাঁহারা ইংরাজদিগের উপাস্য নহেন কেন? জেন্দ (Zend) ও পল্‌হবী (Pahlavi) একই মূল আর্য্য-ভাষার বিভিন্ন শাখা, কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল ফলিয়াছে? প্রাচীন পারসী সাহিত্যও ইংরাজের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। সেমিটিক ভাব আর্য্যভাষায় নিবদ্ধ হইয়াই ইংরাজদিগের চিত্তহরণ করিয়াছে। বোধ করি, আরবী ভাষার সাহায্যে Semetic ভাবসমূহ পারসী ভাষায় প্রবেশ করিবার পর, পারসী ভাষা ইংরাজদিগের নিকট সমাদৃত হয়। কারণ, ইংরাজেরা এক দিকে যেমন আর্য্যবংশীয়, অন্য দিকে তেমনি Semetic ধর্ম্মাবলম্বী।

প্রশ্ন। আপনি ওমারকে তৃতীয় শ্রেণীর কবি বলিলেন কেন?

উত্তর। পারস্য-কবি-কুলে ফিরদউসিই সর্ব্বোত্তম মণি, এবং অদ্ভুত রহস্যবাদের (Mysticism) অবতারণায় অমর কবি হাফেজ, ভাবগৌরবে ও কোমল-কান্ত পদাবলীর নিপুণ বিন্যাসে ওমারকে অতিক্রম করিয়াছেন।

প্রশ্ন। কলিকাতার সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে সুদূর হায়দ্রাবাদ হইতে নির্ব্বাচিত করিলেন কেন?

উত্তর। ইহার কারণ আমি সম্যক্ অবগত নহি। আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম

সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করি, এবং বঙ্গীয় পাঠকের নিকট মুসলমান ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা করি। আমার প্রবন্ধসমূহ কলিকাতার অগ্রগণ্য সাময়িকপত্র 'সাহিত্য' ও 'ভারতীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন। আপনি বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে সংপ্রতি 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই জন্য, অথবা আপনি গ্রেট বৃটেনের রয়েল্ এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য বলিয়াই আপনাকে মনোনীত করা হইয়াছে ?

উত্তর। ইহার সহিত আমার রচিত প্রবন্ধের কোনও সংস্রব নাই। 'সাহিত্য' নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদক সাহিত্য-পরিষদে আমার নামোল্লেখ করেন। আমি M. R. A. S. বলিয়াই যে পারসী শব্দের বঙ্গভাষায় বর্ণান্তর কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছি, এমন নহে। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐরূপ উপাধিধারী অনেক ব্যক্তি আছেন। এই সাহিত্য-পরিষৎ অল্পদিনের নহে। প্রায় দশ বৎসর হইল, উক্ত সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবর্গের মধ্যে সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবরণ, সার্ জর্জ্জ বার্ডউড্, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারহীন তাড়িতবার্ত্তার উদ্ভাবনকর্ত্তা ডাক্তার জে. সি. বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডাক্তার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি মিঃ মিত্র, বিচারপতি মিঃ ঘোষ, মিঃ আর. সি. দত্ত সি. আই. ই., বঙ্গদেশের লীগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার মিঃ বি. এল্. গুপ্ত আই. সি. এস্., মিঃ বি. দে এম্. এ., আই. সি. এস্, সোলাপুরের ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ মিঃ এস্. এন্. ঠাকুর আই. সি. এস্. ও অন্যান্য আরও অনেক লোক আছেন। সাহিত্য-পরিষদের ছয় শত সদস্য ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানগৌরবে সমগ্র বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্থানীয়, ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। আপনি বোম্বাইয়ের অধিবাসী, বঙ্গদেশ যে জ্ঞানসম্পদে ভারতের প্রদেশসমূহের অগ্রণী, এ কথা বোধ করি স্বীকার করিবেন।

প্রশ্ন। এই ছয় শত সদস্যের মধ্যে পারসীভাষায় অভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি অবশ্যই আছেন?

উত্তর। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবর্গের মধ্যে কতিপয় পারস্যভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। আমার পিতৃব্যপুত্র মিঃ বি. দে আই. সি. এস্. মহাশয়ের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তিনি পারসী ভাষায় 'অনর' পরীক্ষায় সম্মানসহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং গবর্মেণ্টের নিকট হইতে চারি সহস্র টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ বি. এল্. গুপ্ত, আই. সি. এস্. মহোদয় পারস্য ভাষায় পারদর্শী। কলিকাতায় বহুসংখ্যক বঙ্গবাসী মুসলমান গ্রাজুয়েট আছেন। ইঁহারাও পারসী জানেন।

প্রশ্ন। আপনি কি বলিতে চাহেন, এই সদস্যবর্গের মধ্যে কেহই মাতৃভাষার এই অভাব-পূরণের চেষ্টা করেন নাই ?

উত্তর। তিন জন সদস্য পারসী শব্দের বর্ণান্তর বিষয়ে কতিপয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিষৎ উক্ত মন্তব্যসমূহ সংশোধনার্থ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্তব্য নির্ভুল নহে। সংশোধন করিতে গেলে মন্তব্যগুলিকে আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

প্রশ্ন। সাহিত্য-পরিষৎ আপনার দ্বারা কোন্ কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে চাহেন?

উত্তর। আমার দ্বারা বঙ্গাক্ষরে আরবী ও পারসী শব্দের যথাযথ বর্ণান্তর কার্য্য সম্পাদন

করাই পরিষদের অভিপ্রেত। সংস্কৃত ও বঙ্গীয় বর্ণমালার পার্থক্য অতি সামান্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য মহাসমিতির অধিবেশন হয়। সমিতি বর্ণান্তর বিষয়ে যে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি ঐ রীতির অনুসরণ করিব, স্থির করিয়াছি।

প্রশ্ন। বঙ্গীয় বর্ণমালা কি সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ?

উত্তর। একপ্রকার অনুরূপ বলা যাইতে পারে। কেবল কতিপয় বঙ্গীয় বর্ণের ও সংস্কৃত বর্ণের মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য লক্ষিত হয়।

প্রশ্ন। পরিষৎ বর্ণান্তরপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আপনাকে মনোনীত করিবার পরেই কি ঐ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে?

উত্তর। বর্ণান্তরবিষয়ক নিয়মাবলী প্রচলিত না থাকাতে বিগত দশ বৎসর হইতে আমি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমি পারসী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। ইংরাজ লেখকেরা সাধারণতঃ ফিরদউসির সময় হইতে পারসী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। আমি ঐ রীতির অনুসরণ করি নাই। পারস্য দেশের হোমার ফিরদউসির সময় পর্য্যন্ত আসিয়াই আমার রচিত ইতিহাস শেষ হইয়াছে। পারস্য ও সিরীয় শিলালিপি হইতে ইতিহাসের সূচনা করিয়াছি। পারসী শব্দাবলী ইংরাজী অক্ষরে বর্ণান্তরিত করিতে আমাকে কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যসমিতির অধিবেশনে এই সমস্যার মীমাংসা হয়। কিন্তু ইহাতেও আমার অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। মস্‌লেম সাহিত্য সম্বন্ধে সন্দর্ভ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে পাইলাম, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর নির্দ্দিষ্ট বর্ণান্তর-প্রণালী তত কাজে লাগিতেছে না। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমি বর্ণান্তর বিষয়ে কতিপয় নিয়ম-প্রণয়নের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে সাহিত্য-পরিষৎ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করায়, আমার নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

প্রশ্ন। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে আপনার কত সময় লাগিবে? কাজটি অনায়াসসাধ্য নহে।

উত্তর। প্রাচ্য-সমিতি ইউরোপীয় বর্ণমালার সাহায্যে প্রাচ্য অক্ষরসমূহের বর্ণান্তর-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিরূপে আরবী ও পারসী 'ধ্বনি' (Sound) সংস্কৃত (বাঙ্গালা) অক্ষরে যথাযথ প্রকাশিত করা যায়, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। যাহাতে মনীষিগণ আমার প্রণীত বর্ণান্তরপদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়া দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে না পারেন, তজ্জন্য আমাকে গুরুতর শ্রমস্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন। মিঃ মিত্র, আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার শক্তি ও রুচির অনুযায়ী বটে। ভবিষ্যতে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনি যশস্বী হইবেন। কিন্তু কাজটি বোধ করি অনায়াসসাধ্য নহে?

উত্তর। না; কাজটি সহজসাধ্য নহে। 'ঐতিহাসিক ব্যাকরণে'র অনুশীলনলব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত এবং বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য করিয়া আমাকে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই কার্য্যসম্পাদনকালে 'নিরুক্ত' (Etymology) বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী এবং উচ্চারণের

(Sound) সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের প্রতি আমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বঙ্গভাষায় যে সকল আরবী ও পারসী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আমি ইতিমধ্যে তাহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উক্ত শব্দাবলীর মধ্যে কতিপয় শব্দ অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি শব্দ এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের স্বরূপনির্ণয় অতীব দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যেরা শব্দসমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই তালিকাটি সংশোধনার্থ পরিষৎ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি পরিষৎকে বলিয়াছি যে, আন্তর্জাতিক সমিতির উচ্চারণ-পরিবর্তন-বিষয়ক নিয়মানুসারে আমাকে কার্য্য করিতে হইবে।"

প্রশ্ন। আপনি কি মনে করেন, পরিষৎ সকল বিষয়ে আপনার মতানুবর্ত্তী হইবেন?

উত্তর। আমার মতের দৃঢ়তা কিরূপ, তাহা আপনি অবগত আছেন; কি সাহিত্য, কি রাজনীতি,—কোন বিষয়েই আমি কখনও অন্ধভাবে কাহারও অনুসরণ করি না। আমি বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে কার্য্য করিব। কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিই আমার কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার অবকাশ পাইবেন না। আমি বর্ণান্তর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন। আরবী ও পারসী শব্দের বর্ণান্তর বিষয়ে আমি সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির ষত্ব ও ণত্ব বিধানের অনুবর্ত্তী হইব না, এ কথা আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারাও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। পারসী ও বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণগত সাম্যসংক্রান্ত নিয়মাবলীর অনুশীলন, উভয় ভাষার বহুবর্ষব্যাপিনী আলোচনা ও বিবিধ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। সাধারণতঃ প্রচলিত পদ্ধতি বজায় রাখিতে গিয়া বর্ণান্তর কার্য্যে অনেকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হন। অনেকে আবার শৈথিল্যবশতঃ বৈদেশিক শব্দের যথেচ্ছ বর্ণবিন্যাস গ্রহণ করিয়াও ভ্রান্ত হন। ইংরাজী ভাষাতে আরবী শব্দের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করাও অতীব দুরূহ কার্য্য। কিন্তু বর্ণান্তরকালে যথাসাধ্য প্রকৃত উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়মের অনুসরণকে অতিবিজ্ঞতা বলা যাইতে পারে না। শব্দের বিকৃত বর্ণবিন্যাসের সংশোধনের কাল অতীত হইয়াছে বলিয়া তর্ক উপস্থিত করিলে ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের অসুবিধার বৃদ্ধি করা ভিন্ন আর কিছু হয় না। যখন ইংরাজী K ও Q এই দুইটি অক্ষরের ব্যবহার করিলে সুচারুরূপে কাজ চলিতে পারে, তখন কেবল C দ্বারা তিনটি আরবী অক্ষরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রয়োজন কি? এবং যখন ইংরাজী অক্ষরসমূহের উপরে ও নিম্নভাগে বিন্দু প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিলে ইংরাজী ভাষায় অপরিচিত শব্দের উচ্চারণ চলিয়া যায়, তখন ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে আরবী ও পারসী শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃত অক্ষরে বহুপরিমাণে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারা যায়। পারসী বর্ণমালায় বাক্যের পরিচালক স্বরবর্ণের অস্তিত্ব নাই। পারসী ভাষায় সর্ব্বসমেত বত্রিশটি অক্ষর (তন্মধ্যে আটাশটি আরবী) ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। তবে স্বরবর্ণ কিরূপে উচ্চারিত হয়?

উত্তর। প্রথমে যে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে স্বরবর্ণের (সাঙ্কেতিক) চিহ্ন ছিল না। কোরাণের ঐরূপ পাণ্ডুলিপি এখনও প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দেখিতে পাওয়া

যায়। রেনা (Renan) ও লেনর্মে। (Lenormaut) বলেন, উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ Senaitic অক্ষরের অনুরূপ বর্ণমালায় লিখিত। আরবী বর্ণমালায় স্বরবর্ণের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই অভাবের প্রতিকারকল্পে (১) উচ্চারণের বিশেষত্বব্যঞ্জক বিন্দুসমূহ, (২) স্বরবর্ণের সাঙ্কেতিকচিহ্ন ব্যবহৃত হইতেছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তদ্দ্বারা সিরীয়, হিব্রু ও আরবী, এই তিনটি Semetic ভাষার বহুপরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উচ্চারণজ্ঞাপক বিন্দুসমূহ ব্যবহৃত হওয়ায় সমআকৃতিসম্পন্ন অক্ষরসমূহের পার্থক্যনিরূপণ অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। আর স্বরবর্ণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় পরিবর্ত্তনযোগ্য শব্দের নির্দ্দেশ ও বিভিন্ন প্রকৃতির উচ্চারণ-পরিজ্ঞাপনের সুবিধা হইয়াছে। আরবী ও পারসী ভাষায় স্বরবর্ণের কেবল তিনটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। দশটি সংস্কৃত স্বরবর্ণের উচ্চারণ পরিব্যক্ত করিতে তাহাদের দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণের উপরিভাগে, এবং একটি উহার নিম্নভাগে সন্নিবেশিত হয়। পারসী ভাষায় দশটি বিভিন্ন কণ্ঠধ্বনি (Vocal Sound) আছে। আলিফ্ (áliph) বে (wáw) ও ইয়ায় (yá) সাহায্যে সময়ে সময়ে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রশ্ন। ব্যঞ্জনবর্ণের বিষয়ে আপনার কোনও অসুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় আপনি কোন আশঙ্কা করেন না ?

উত্তর। উক্ত ভাষা দুইটির ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের উচ্চারণগত সাম্য-বিধান অনায়াস-সাধ্য নহে। ইংরাজী বর্ণ z যথাযথ ব্যক্তিত করিতে পারে, বঙ্গ ও সংস্কৃত বর্ণমালায় এমন কোন বর্ণ নাই। তদ্ভিন্ন দুরুচ্চার্য্য আরবী অক্ষর "অইন্" (ain) ও "কাফ্"এর (qáf) এর যথাযথ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে আমাকে বিশেষ ক্লেশস্বীকার করিতে হইবে। সমগ্র ইউরোপীয় বর্ণমালায় "অইন্" (ain) অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ-পরিজ্ঞাপক কোনও বর্ণই নাই। এই জন্য ডাক্তার ফর্বস্ (Forbes) রোমান বর্ণ (') সাহায্যে উহার উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিব্রু 'অইন' (ain)এর উচ্চারণ সম্বন্ধে অদ্যাপি কেহ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আরবী "অইন" উচ্চারণ সম্বন্ধে উহার অনুরূপ কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। আরবী "অইন্" কণ্ঠের নিম্নতর ভাগের পেশীসমূহের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয়। qáf সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। পূর্ব্বে K এর নীচে একটি বিন্দু সন্নিবিষ্ট করিয়া উহার উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা হইত। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে Q ব্যবহৃত হইতেছে। আরবী অক্ষর লাম (Lám) সাধারণতঃ ইংরাজী Lএর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু আরবী article ('সর্ব্বনাম') আল-(al = the)-এর অন্তর্নিবিষ্ট হইলে, উহার পরবর্ত্তী অক্ষরের প্রকৃতি-অনুসারে লাম্-এর প্রকৃত উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারে 'লাম'-এর (Lám) উচ্চারণের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু উহার আকৃতি অবিকৃত থাকে। 'নান্' (N) অক্ষরটির সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যবশে উহার উচ্চারণেরও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। ফরাসী রেঁদ্রে (rendre) শব্দের অন্তর্গত 'এন্'-(N)-এর মত সময়ে সময়ে ইহার উচ্চারণ অনুনাসিক হইয়া থাকে। কখন কখন অক্ষরটি 'এম্'-এর (M) উচ্চারণও প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আরবী শব্দনিচয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে উচ্চারিত হয় না। টাইগ্রীস নদীর তীর হইতে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলে গমন করিলেই উভয় দেশের অধিবাসীদিগের আরবীশব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ আরবী চতুর্থ অক্ষর 'থা'র (thá) উল্লেখ করা

যাইতে পারে। এই অক্ষরটি নানাভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তুরকী, পারসী ও ভারতীয় মুসলমানেরা এই অক্ষরটিকে 'এস্'-এর (S) ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সিরিয়া ও মিশর দেশে এই অক্ষরটির উচ্চারণকালে প্রায়ই লোকে উহাকে ভ্রমক্রমে আরবী ব্যঞ্জনবর্ণ 'টা'র (tā) ন্যায় উচ্চারণ করে। আরবী অক্ষর 'টা'র উচ্চারণ সংস্কৃত ষোড়শতম অক্ষরের উচ্চারণের অনুরূপ, এবং ইংরাজী অক্ষর 'টি'র (T) অপেক্ষা ইহার উচ্চারণ অধিকতর দন্ত্য ও কোমল। আধুনিক আরবী ও পুরাতন আরবীর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আধুনিক গ্রীক্ ও থুসিডাইডিস্ (Thucydides) ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য, এই পার্থক্য তাহার অনুরূপ।

পারসী ভাষার উচ্চারণেও বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। Lūrī, Nâīnī, Khūzī, Gīlī, Rázī, Závulī, Sūghdī প্রভৃতি পারসী ভাষার নানাপ্রকার উপভাষা (dialects) আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের পাঁচদে বিভ্রাটের পর রুসীয় পণ্ডিত M. Shukovski কয়েক বৎসর পারস্যে অবস্থিতি করেন, এবং ১১টি বিভিন্ন উপভাষার অনুশীলন করিয়া তৎসম্বন্ধে রুসীয় ভাষায় পাঁচখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি এইরূপে উপভাষাসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন :—

(১) সিরাজ; (২) কাশান ; (৩) সেম্নান-তিহ্রাণ ; (৪) ইস্ফাহান। আমি যত দূর অবগত আছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, ঐ পুস্তকসমূহ অদ্যাপি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই। Ibnul Muqaffa হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় মুসলমান লেখকই পারসী, পহ্লভী ও দারীর আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের আলোচনা অধুনাতন ভাষাবিজ্ঞানের মতে সন্তোষকর হয় নাই। এই উপভাষানিচয়ের প্রধান প্রধান বিশেষত্ব-সমূহ আদর্শ পারসী ভাষার সহিত উক্ত উপভাষা-সমূহের সম্পর্ক নির্দ্দেশপূর্ব্বক শব্দগত পরিবর্ত্তন নিরূপিত করিয়া থাকে। M. Shukovskiর পরেই পারসী উপভাষাসমূহে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে M. Clément Huart ও অধ্যাপক ব্রাউনির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ণান্তর বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ণ করিতে হইলে, এই সকল উপভাষার ও অধুনাতন পারসী প্রাকৃত ভাষাগত ধ্বনিসমূহের পরিবর্ত্তনের অনুশীলন করা আবশ্যক। উজির-ই-লান্কারাণের কৃষক জিলানীর চরিত্র ও মিরজা আফার কোরারাজা ডাঘি প্রণীত নাটকের মাস্তা আলি শা চরিত্র পারসী ভাষার ধ্বন্যাত্মক নিয়মাবলীর সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিরজা হবিব্ প্রণীত 'দস্তুর-ই-সুখন্' নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পারসীরা আরবী ভাষার চতুর্থ, দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ অবিকল ইংরাজী 'S'এর মত, এবং ainকে aliph-এর ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন পুস্তকের সাহায্যেই পারসী প্রাকৃত ভাষার ধ্বনি-সমূহ যথাযথ আয়ত্ত করা যায় না। প্রত্যেক ধ্বনির স্বরূপনির্ব্বাচন ও উহার [illegible] নিরূপণোপযোগিনী বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি, বিবিধ ভাষার ধ্বনিনিচয় ও পারস্যবাসী [illegible] ও অশিক্ষিত [illegible]সমূহের সহিত কথোপকথনে শ্রু[illegible] ও অবিকৃতশক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কেবল এই কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করা যায়। যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে অধুনাতন পারসী ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন, সিরাজি ভাষায় লিখিবার সময় nān (bread) লেখা হয় বটে, কিন্তু উচ্চারণকালে লোকে উহাকে nūn উচ্চারণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ নামি-শাভাড্ (Nami-Shavad), উচ্চারণকালে Nami-Shad উচ্চারিত হয়। আমার

মৌলবী এক জন শিক্ষিত সিরাজী (Shirâzi), কিন্তু দ্রুত কথোপকথনকালে তিনি প্রায়ই ক্রিয়ার অতীতকালজ্ঞাপক 'লঙ্'-এর বিভক্তি dálএর 'd'র উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন,—নামিয়াড্ বলিতে নামিরা বলিয়া বসেন। যাঁহারা পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, এই সকল উপভাষার আলোচনা তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক।

আরবের অধিবাসীরা যে ভাবে আরবী শব্দের উচ্চারণ করে, পারসী ভাষায় উক্ত শব্দ সেইরূপ যথাযথ উচ্চারিত হয় না। পারসীরা তাহাদিগের মাতৃভাষার ধ্বনিবিষয়ক নিয়মানুসারে আরবী অক্ষরের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া, উক্ত অক্ষরসমূহ পারসী ভাষায় প্রচলিত ও অনুরূপ-ধ্বনিবিশিষ্ট অক্ষরনিচয়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ain এই অক্ষরটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অক্ষরটি আরবী ভাষায় দীর্ঘ-উচ্চারণ-সম্পন্ন কণ্ঠ্যবর্ণ, কিন্তু পারসী ভাষায় উহা সামান্য (hiatus): মাত্র। * উভয় ভাষার বর্ণের এইরূপ উচ্চারণগত বৈষম্য থাকাতেই আমাকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইতেছে। বর্ণান্তর যথাযথ না হইলে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে ; যথা, amadanএর অর্থ আগমন, কিন্তু amdan = ইচ্ছাপূর্ব্বক। সুতরাং আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, এই কার্য্য কিরূপ কঠিন।

প্রঃ। অভিধানের সাহায্যে কি আপনার অসুবিধা দূরীভূত হয় না ?

উঃ। হইলে ভালই হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় না, কোন অভিধানই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। অনেক সময় অভিধানের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয়। কেবল তাহাই নহে, কোন কোন অভিধানে শব্দসমূহের অপ্রচলিত উচ্চারণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। Mr. Wollaston প্রণীত Persian-English Dictionary এই শ্রেণীর বর্তমান অভিধান-সমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু বৈদেশিকের পক্ষে অভিধানখানি সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। Wollaston লিখিয়াছেন,—marz bartarf shudan ; সিরাজের কোনও অধিবাসী তাঁহার এই লিপিপ্রণালী দেখিলেই বলিবে, তিনি প্রথম শব্দের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শব্দটি (Maraz) মারাজ্ হওয়া উচিত ছিল।

প্রঃ। তাহা হইলে অক্ষর ও শব্দের যথাযথ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে শ্রুতিনৈপুণ্য ও কঠোর পরিশ্রম আবশ্যক ; অথবা স্বভাবসিদ্ধ শক্তি না থাকিলে কেবল প্রভূত শ্রম স্বীকার করিলেও ঐ কার্য্য সাধিত হইবার নহে।

উঃ—সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, তালব্য বর্ণের উচ্চারণ অনায়াসেই পরিব্যক্ত করা যায়, কিন্তু কতিপয় উচ্চারণবৈচিত্র্যসম্পন্ন কণ্ঠ্যবর্ণ এবং রাসন (lingual) Zádর উচ্চারণ কিরূপে পরিব্যক্ত করা যায় ? রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী উচ্চারণ লিখন বিষয়ে যে বিন্দু-বিন্যাস-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, বৈদেশিক ধ্বনির পরিজ্ঞাপনার্থ আমাকে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। সেই জন্য আমি ধ্বনিবৈচিত্র্যসম্পন্ন আরবী ও পারসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার জন্য রেখা (—) প্রণালীর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৈদেশিক শব্দ লিখিবার জন্য ইংরাজীতে ইটালিক্ অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি বাঙ্গলা ভাষায় ঐ

* Hiatus পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ এই,—concurrance of two vowels in two successive syllables or words.

প্রণালীর অক্ষর ব্যবহার করিবার জন্য বঙ্গীয় বর্ণমালার আকার পরিবর্ত্তন বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

প্রঃ। তাহা হইলে, আপনি এমন একটি প্রণালীর উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছেন, যাহা নিয়মাবলীর সামঞ্জস্যের সহিত বিস্তৃতির ও ঐক্যের সম্মিলনে লোকের আদরণীয় হইবে।

উঃ—আমি ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু জানি না, আমার চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইবে। সম্পূর্ণরূপে আরবী বর্ণমালার অনুশীলন করিতে হইলে, পুরাকালের ফিনীসীয় বর্ণমালারও আলোচনা আবশ্যক। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ Rehatsek, প্রাচীন ফিনিসীয় বর্ণমালা ও অধুনাতন আরবী (Naskhi) অক্ষরসমূহের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। ফিনিসীয়ান বর্ণমালা হইতে অন্যান্য সেমেটিক বর্ণমালা উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ হেলিভি (Halévy) বলিয়াছেন, ফিসিনীয় বর্ণমালা মিশরের চিত্রাক্ষর (Hieroglyphs) হইতে উৎপন্ন। কিন্তু মিঃ ডিকি (Deecke) বলেন, ফিনিসীয় বর্ণমালা আসীরীয় শিলালিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দক্ষিণ আরব হইতে ডামস্কসের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত দেশসমূহে বিভিন্ন আরবী বর্ণমালা প্রচলিত আছে; সাফা বর্ণমালা—উক্ত বর্ণমালাসমূহের একটি বিশেষ সংযোগসূত্রস্বরূপ। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে Waddington, Wetzstein ও Devogüé বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে উক্ত বিভিন্ন বর্ণমালার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট, ব্যাপক ও প্রকৃষ্ট বর্ণান্তরপ্রণালীর প্রণয়ন গুরুতর পরিশ্রম ও অনুশীলন সাপেক্ষ।"

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এক্ষণে যে সকল দোষ বিদ্যমান, প্রস্তাবিত বর্ণান্তরপ্রণালীর সাহায্যে তাহার অপনোদন কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভাষা-সংস্কারপ্রয়াসী মারাঠী পণ্ডিত লিখিত আলোচনা হইতে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতে হইলে, পারসী ভাষায় প্রগাঢ় বুৎপত্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায় আবশ্যক। যিনি ধ্যানরত তপস্বীর ন্যায় নিভৃত কক্ষে বসিয়া মুসলমান সাহিত্যের অনুশীলনে চিত্তসমাধান করিয়াছেন, তাঁহাকে উত্তরকালে বঙ্গবাসী বঙ্গের Grimm নামে অভিহিত করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে স্মরণ করিবে।

কথা।

ধর্ম্মাধর্ম্ম।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া একটা কথা আছে। সময় পাইলেই আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হই। সংসার-আশ্রমে শিশুর অর্থহীন কলরবের জ্বালায় অনেক সময় আমাদিগকে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিতে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তদপেক্ষাও বিরক্তিকর। কিন্তু মনেরও একটা ধর্ম্ম আছে। সেটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

ধর্ম্ম কি, আমরা জানি না। আমরা যাহা বকি, তাহার বার আনার অর্থ জানি না। অথচ কোথা হইতে বকিবার প্রবৃত্তি আসিয়া জুটে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মধুর কথায় বলিলে ধর্ম্মের গৌরব অনেকটা রক্ষিত হয়। কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম কি কখনও অনুভব করে নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মের ধার ধারে না, তাহাদিগের নিকট মধুরতার আশা করা বিফল। ধর্ম্ম-জগতে কর্কশবাক্যসংগ্রামের ফল যে কখনও ভাল হইয়াছে, তাহা শুনা যায় নাই।

শৈশবকাল হইতে আমরা যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, এবং এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই একবার ধীরভাবে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে, বোধ হয় বড় তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পুরানো পড়া মনে রাখা বড় দুষ্কর। ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের কথার একটাও যে এখন মনে আছে, তাহা অধ্যাপক ভিন্ন কয় জন সাহস করিয়া বলিতে পারেন ?

এই বিরাট বিশ্বের গোটাকতক নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে অনেক সন্দেহ মিটিয়া যায়।

কষ্ট না করিলে সুখ হয় না, পরিশ্রম না করিলে আনন্দ হয় না,—এটা অতি পুরাতন কথা। পরিশ্রম কিংবা কষ্টের অর্থ, দান। আমাদিগের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা দান করিলে, তৎপরিবর্ত্তে আনন্দলাভ হয়। দেওয়াটা কষ্ট, কিন্তু পাওয়াটা সুখ। তর্কালঙ্কারের সন্দেহ হইয়াছিল যে, গ্রীষ্মকালে গাত্র ঘামে কেন ? এবং দ্বিতীয় সন্দেহ যে, গাত্র ঘর্ম্মপরিপ্লুত হইলে গৃহিণী বাতাস করেন না কেন ? ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোনও প্রচ্ছন্ন বিধান আছে। যদি ঘর্ম্ম বাহির না হইত, তাহা হইলেও কষ্ট, এবং বাহির হইলে যদি প্রাণপ্রিয়ার কোমল-করব্যঞ্জিত পাখার বাতাস না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কষ্ট। কাজেই হয় ত নিজের হাতে সারারাত্রি পাখা করিতে হইবে, কিংবা পাখাওয়ালা রাখিতে হইবে। উভয়ই কষ্টকর। উপরন্তু গৃহিণীর নিদারুণ স্বভাব লক্ষ্য করিয়া মনের কষ্টও না হইয়া যায় না। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, এবং কোন্‌টা অধর্ম্ম, তাহার বিচার করিতে গেলে, গৃহিণীকেও মনের কথা বলিতে হয়। এবং তাহার উত্তরে জানা যায় যে, গৃহিণীর সমস্যাও কর্ত্তার ন্যায়। কাজেই অবশেষে চটাচটি হইয়া উঠে, এবং ঘর্ম্মস্রোত বাড়িতে থাকে। ইহার মধ্যে জগদীশ্বরের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখাইতে গিয়া প্রবীণ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, উভয়ে উভয়কে বাতাস কর। ইহার নাম সহানুভূতি। সহানুভূতি না হইলে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কখনও হয় নাই।

প্রাচীনকালে গার্গী যাজ্ঞবল্কের সেবা করিতেন, এবং যাজ্ঞবল্ক গার্গীর সেবা করিতেন। কাজেই যোগশাস্ত্রের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইত। এ কালের বিজ্ঞান এক স্বরে বলিতেছেন যে, শক্তি এক রকমে ব্যয় করিলে তাহা অন্য রকমে আসে। গ্রীষ্মের চোটে ঘাম হইলে শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, কাজেই দুঃখ হয়; কিন্তু গাত্র শীতল হইলে আবার সুখ হয়। পাথার বাতাস করিলে চটপট সুখ হয়; কিন্তু সেটা প্রকৃতির চালাকী। পাখা-সঞ্চালনের পরিশ্রম দিয়া সেই সুখটুকু খরিদ করিতে হয়। অন্য লোকে করিলে শারীরিক পরিশ্রমের মূল্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাতাসে ও শিশিরে পড়িয়া থাকিলে রোগের উৎপত্তি হয়। কাজেই গৃহিণীর বাতাস ছাড়া আর কোন উপায় নাই। স্বতী সাধ্বী তৎপরিবর্ত্তে প্রতিদান চাহেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কোন রকমে তাহার মূল্য গৃহিণীর প্রাপ্য। তাহা না দিলে দ্বিগুণ ঘামিবার সম্ভাবনা। এই সকল কচকচি ও জঞ্জালের মধ্যে পড়িয়া অনেকে অবশেষে ঘামিলেও কষ্ট পান না। তাঁহারা সংযমী। তাঁহারা জানেন যে, সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম—"মাত্রাস্পর্শের ফেরফার"। তাহার স্থিতি মনে। অতএব নিজে কোন সুখের আশা না করিয়া, এবং দুঃখ সুখ উভয়েই জলাঞ্জলি দিয়া কেবল গৃহিণীকে বাতাস করিতে থাকেন। ইহাতে যে আনন্দ হয়, তাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়। সেটা তবে কি? যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের মতলব গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, ধর্ম্ম-জগৎটা এইরূপ। কেহ এই কথা বুঝিতে পারিলে, এমন শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি গুরুস্থানীয় হইয়া পড়েন। অর্থাৎ, জড়ের মধ্যে থাকিয়াও তিনি জ্ঞানী, সুখের মধ্যে থাকিয়াও তিনি নিঃস্পৃহ, ইত্যাদি—এবং পরমানন্দ অমর।

সুখ দুঃখের লক্ষণ বেতর। শাস্ত্রের মতে সুখ দুঃখ উভয়কেই মন হইতে বাদ দিতে হইবে। নতুবা বাস্তবিক আনন্দ কি, তাহা বুঝা যাইবে না। অন্যমনস্কভাবে গোঁফে তা দিলে অনেকটা এই আনন্দের ভাব বুঝা যায়। দেহের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। ইহার প্রমাণ অতি সোজা।

[কতকগুলি সুখ দুঃখের লক্ষণ।]

১। পরের সুখে দুঃখিত হওয়া। ইহা অতি নিকৃষ্ট, এবং ফলে আনন্দজনক নহে।

২। পরের দুঃখে সুখী হওয়া। ঐ।

৩। পরের সুখে সুখী হওয়া। মাঝারি গোছ, যদি প্রাপ্তির আশা না থাকে।

৪। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া। ঐ। কিন্তু প্রাপ্তির কোনও আশা নাই।

৫। নিজের সুখে সুখী হওয়া। কাজেই হইতে হয়। কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী।

৬। নিজের দুঃখে দুঃখী হওয়া। ঐ

৭। নিজের সুখে দুঃখী হওয়া। বিতরণ করিলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। তাহাতে আনন্দ আছে।

৮। নিজের দুঃখে সুখী হওয়া। ইহা নং ৭ এর ফল, কেন না, বিতরণ করিয়া যে আনন্দটুকু হয়, ইহা তাহাই।

৯। পরের সুখে দুঃখে এবং নিজের সুখে দুঃখে সমভাব। মোটের মাথায় শেষটা ভাল, কিন্তু প্রথমটা যেন কেমন কেমন।

Law of conservation of Energy and dissipation of Energy নামক একটা দুরূহ বিধান বহুকাল হইতে বহু গ্রন্থে দেখিয়া আসিতেছি। দান না করিলে জ্ঞানও হয় না, আনন্দও হয় না, অস্তিত্বও থাকে না। এই জগতের মূলে, শুনিতে পাওয়া যায় যে, অতি পুরাতন একটা শক্তি আছে, যাহার এক অংশ বিচ্ছুরিত হইলে দুঃখের সৃষ্টি হয়; অন্য অংশে তৎপরিবর্ত্তে সুখের উৎপত্তি হয়। ইহারই জন্য তুমি মরিয়া গেলে আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি, এবং কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে ভাবনা ও ভয়ে অধীর হইয়া পড়ি। এই মায়াময় শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াও যাহার জ্ঞান হয় নাই, তাহার সম্মুখে এখনও অনন্ত পাঠ্যদশার ক্লেশ বিস্তৃতভাবে পড়িয়া আছে।

জগতের যে কোনও উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, সৃষ্টির মূলে যাহাই থাকুক না কেন, শাস্ত্র অতি ধীরভাবে বলেন যে, আমরা কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি, এবং কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ খাটিয়া মরিতে আসিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্য, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, সকলেই খাটিয়া খাটিয়া সারা। আমরা পরিশ্রমের মূলধন কিংবা পুঁজি স্বরূপ কিছু লইয়া আসি, সেইটুকু ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে জগৎ বলে, অমুক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেইটুকু ব্যয় করিতে করিতে তৎপরিবর্ত্তে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে জগৎ বলে, অমুক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বিরাট বিশ্বে অসংখ্য জীবের এই দান প্রতিদান ও ব্যবসায়ের নাম জন্ম মৃত্যু। যত দূর ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যাহা লাভ হয়, তাহার নাম জ্ঞান। মূলে অজ্ঞান, শেষে জ্ঞান। ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ প্রভৃতি আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে সকল কৌশল শিক্ষা করে, তাহাও জ্ঞান। কষ্ট পাইয়া, দৈহিক সুখের লালসায় ধাবিত হইয়া, এবং তাহার ফলভোগ করিয়াও যে আনন্দলাভের নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্র, তাহার মূলে যে কত

বড় বিপরীত রেখা আমরা টানিয়া গিয়াছি, তাহা কাহারও মনে থাকে না। থাকিলে সংসার বিস্মৃতি-মায়া-বিচ্যুত হইয়া কোনকালে অদৃশ্য হইয়া পড়িত। এই বিস্মৃতির কারণ ইহাই বোধ হয় যে, আমাদিগের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে নাই। এখনও অনেক দিন পড়িয়া আছে। অনেক সহিতে বাকি আছে। অনেক আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করিতে হইবে। একটা জীবের ইতিহাস, একটা সমাজের ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেও ইহার আদি অন্ত পাওয়া যায় না। এই পৃথিবী ছাড়া অনেক পৃথিবী আছে, এই সৌর জগৎ ছাড়া অনেক সৌর জগৎ আছে। কোথা হইতে জীব পুঁজি লইয়া আসে, কোথায় যায়, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া হাস্যাস্পদ ব্যাপার। এই চতুর্দ্দশভুবনব্যাপী, মহাশক্তিশালী শাস্ত্রোক্ত ও সকলধর্ম্মপূজ্য ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এবং ধর্ম্ম কি, তাহা আমাদিগের সামান্য পুঁজি দিয়া নির্ণয় করা যায় না। যদি ঈশ্বর সর্ব্বময় হন, তবে তাঁহারই একভাগ দুঃখে, অজ্ঞানে, মর্ম্মাহত ও প্রপীড়িত হইয়া অন্যভাগে যাহা সঞ্চয় করিতেছে, তাহারই হয় ত কতকটা লক্ষণের নাম জ্ঞান। এই মহাসংগ্রাম ও মায়ার মধ্যে পড়িয়া একভাগের পুনঃপুনঃ বিস্মৃতি ও অজ্ঞান, এবং অন্যভাগের পুনঃপুনঃ জাতিস্মরতা ও জ্ঞান, বহুশাস্ত্রের ও দর্শন প্রভৃতির বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আমরাও সেই পথ ধরিয়া মধ্যে মধ্যে মন নামক পদার্থটাকে খাটাইয়া ও শূন্য গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া দুঃখ ও সুখ উভয় ফল লাভ করিয়া থাকি।

শরীর বেমালুম ক্ষয় হইলে সুখ হয়, কিন্তু ক্ষয় হইতেছে দেখিলে দুঃখ এবং ভয়ও হয়। বহু-স্ত্রী বিবাহ করিয়া মুখুয্যে মহাশয় এবংবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, অবশেষে শাস্ত্ররূপ পুরাতন দর্পণে আত্মার রূপ দেখিয়া, পূর্ব্বপুণ্যফলে যেন তেন প্রকারেণ অমানিশায় নির্ব্বিঘ্নে মানবলীলা সংবরণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। মরিবার পর মুখুর্য্যের পুনর্জন্ম লইয়া গোল বাধিল।

গোলযোগের কারণ কর্ম্মদেবতাগণের মতামত। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এবং তাঁহারাই বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মত সর্ব্বত্র প্রচারিত। এই বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করিয়া অনেকেই ঈশ্বরের সম্পূর্ণত্বের উপর সন্দেহ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর স্বয়ং মানবরূপ তার্কিকগণের মুখে স্বীয় অস্তিত্ব-সন্দেহরূপ অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লন। কিংবা দার্শনিক ভাষায় তাঁহার অস্তিত্ব এই অপূর্ব্ব কৌশল দ্বারা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মা আত্মপ্রকাশক। অগ্নি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে, কাষ্ঠ, চকমকির পাথর ও দীপশলাকা ও ধূম প্রভৃতি পদার্থসমূহ প্রথমে রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া যায়। মুখুর্য্যের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। বাহাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে মুখুর্য্যের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ মুখুর্য্যে

"দেহরূপ কাঠ খড় ও ধূম প্রভৃতির দর্প চূর্ণ করিয়া জ্ঞানাগ্নিরূপে কিঞ্চিৎ জ্বলিয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি লুপ্ত হইলেও বিশ্বক্ষেত্রে নিহিত থাকে। সেটার পুনর্বিকাশ কর্ম্মে। অর্থাৎ, যদি দেহরূপী কাঠ খড় প্রভৃতি পরস্পর রঙ্গালয়ে আবার বিশেষপ্রকারে সংঘর্ষিত হয়, তবে সেইরূপ কর্ম্মে মুখুর্য্যের মত অগ্নিকণার পুনরাবির্ভাবের কথা। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি কোথা হইতে আসে, তাহা আমাদিগের মত ক্ষীণবুদ্ধি মানবের আবিষ্কার করা সুকঠিন। কিন্তু মুখুর্য্যেরূপী অগ্নিকণার তারতম্য আছে। মুখুর্য্যে যতটুকু কম জানিতেন, এবং যতটুকু বেশী জানিতেন, ঠিক সেই রকমের লোক সংসারে পাওয়া দুষ্কর ; এবং মুখুর্য্যে যে সময়ে মরিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞানের যে অবস্থা, তাহার উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোনও পুত্র মুখুর্য্যের জন্মে নাই। প্রকৃতির বিধান এই যে, বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ ঠিক মৃত্যু-কালে, কাহারও পুত্রসন্তান জন্মে না। মুখুর্য্যেরূপী-বৃক্ষের যে পুত্রফল জন্মিয়াছিল, তিনি পূর্ব্বজন্মে তিব্বতদেশীয় লোমের ব্যবসায় করিতেন। সুবিধা পাইয়া মুখুর্য্যের ও তদীয় প্রথমা গৃহিণীর যুক্ত ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া একটা ব্যবসায়ের উপযোগী দেহলাভ করেন। মধ্যে মুখুর্য্যের চুরি করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কনিষ্ঠা স্ত্রী তাঁহাকে বাধা দিত। সেই সময় কনিষ্ঠার ঔরসে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি চুরি করিতে গিয়াও বাধাবশতঃ সফলকাম হইতে পারেন নাই।

এইরূপে একই অগ্নি হইতে অনেক প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলেও, একই বৃক্ষ হইতে বহু ফল জন্মগ্রহণ করিলেও, স্বয়ং মুখুর্য্যের মৃত্যুকালের ধ্বনি ভবসাগরের অন্তপারে আটকাইয়া থাকিল, এবং কর্ম্মদেবতাগণ সম্পূর্ণ-মুখুর্য্যে মহাশয়ের বাহাদুরী জগতে দেখাইবার জন্য প্রতিধ্বনি-সঞ্চারের বন্দোবস্ত করিলেন। মতভেদের কারণ এই যে, মরণকালে মুখুর্য্যে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আবার পুনরভিনয় করিবার আবশ্যকতা ছিল কি না।

অর্থাৎ, মুখুর্য্যের এক দিকে যেমন জ্ঞান হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই সন্দেহও ছিল। বহুবিবাহ করা যে একটা জঞ্জাল, এবং পাপ, তাহা মুখুর্য্যে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু মুখুর্য্যে মোটে তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। হয় ত চারিটি বিবাহ করা পাপ না হইতে পারে। হয় ত দুইটি বিবাহ করিলে পাপের মাত্রা কমিয়া যাইতে পারে। হয় ত বিবাহ করাই পাপ, কিংবা দুইটি বিবাহ করিলে একটি সাধ্বী পুণ্যবতী হইয়া গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। এই প্রত্যেক সন্দেহের নিমিত্ত কোন শ্রেণীর কর্ম্মদেবতাগণ মুখুর্য্যের চারিটি বিবাহের ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করি-লেন, কেহ দুইটি, এবং কেহ একটি। স্বয়ং মুখুর্য্যে জড়ভরতের মত, প্রেমাক্রান্ত

যোগীর মত, দ্যুলোকে বসিয়া কর্ম্মদেবতাগণের এই অপূর্ব্ব রহস্য পর্য্যালোচনা করিয়া কসিয়া গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

ফলকথা, মুখুর্য্যের ঠিক কত দূর জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এবং ঠিক কত দূর জন্মে নাই, তাহা মুখুর্য্যে স্বয়ং জানিতেন না, এবং চিত্রগুপ্তের পুরাতন যুগের বহিগুলি নূতন যুগে অন্য আকার ধারণ করাতে কর্ম্মজগতের রীতি নীতি প্রভৃতির বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু জগতের বিধান লুপ্ত হইবার নহে। কাযেই মুখুর্য্যে আবার জন্মিলেন। পূর্ব্বজন্মে মুখুর্য্যে জানিতেন যে, তিনটি গৃহিণীর কলরবে যাহা হয়, তাহার নাম ভয়। এ জন্মে জানিলেন যে, একটি গৃহিণীই পূর্ব্বজন্মের তিনটির সমান, সুতরাং অনর্থক তিনটি বিবাহ না করিয়া একটির উপর ভরসা করিলেই যথেষ্ট। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা জানেন, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা না করিয়া এক ঈশ্বরের চরণে মন সমর্পণ করিলেই যথেষ্ট। কাজেই যুগধর্ম্ম-অনুসারে, একবিংশতিহস্ত মানবদেহ, সহস্রাধিকবর্ষ পরমায়ু প্রভৃতি খাটো হইয়া রেলের গাড়ীর ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লী হইতে আগ্রায় লইয়া আসে, এবং যায়। ধর্ম্মাধর্ম্মেরও সেইরূপ তারতম্য হয়।

পুরাকালের সহিত তুলনা করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের মাত্রার যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কথা ছাড়া আর সকলগুলিই সংক্ষিপ্ত। ঈশ্বর ক্ষুদ্র, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্ক বৃহৎ। পরমাণুও ছোট, কিন্তু পরমাণুর কথা বড়। পুরাকালে দেহটা বড় ছিল, কাজেই পাতঞ্জলের একটা সূত্রে একবিংশতিহস্তপ্রমাণ দেহ অধীর হইয়া পড়িত। কথা কহিবার যো ছিল না। দেহটা ক্রমে কমিয়া কথাটা বাড়িয়াছে। কথার বোঝা বহা যায়, কিন্তু দেহের বোঝা বহন করা শক্ত। আয়ু ক্ষুদ্র, কিন্তু আয়ু-রক্ষা-প্রণালী বড়। এই সকল উদাহরণ দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যে, জ্ঞানের মাত্রা প্রসারিত ও কর্ম্মের মাত্রা আকুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। পুনর্জন্ম ঘন ঘন হওয়াতে মানবসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মহাকাল এ যুগের ইতিহাসের পাতাগুলি দ্রুতগতি উল্টাইয়া যাইতেছেন। শেষ পরিচ্ছেদ কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র, কেহ ভাল করিয়া দেখে না। সুখ দুঃখ এত শীঘ্র পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম এরূপভাবে কালপথে দৌড়িতেছে যে, অবসানের বড় দেরি নাই। বোধ হয়, কর্ম্মদেবতাগণ কথাগুলা দেহ হইতে পিটিয়া বাহির করিয়া নূতন যুগের গোড়াপত্তন করিতেছেন। এই দুর্দ্দিনে কথাটা কমাইয়া দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কিংবা অন্ততঃ চুপ করিয়া বসিয়া বেকুফের মত ইতস্ততঃ তাকাইলেও, ভগবানের ও ধর্ম্মের বিধান পালন করা হয়। তবে একটা কথার পৃষ্ঠে কথা আছে, সকলই নিয়তি, সকলই নিয়তি।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। পৌষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষা"—দ্বিতীয় প্রবন্ধে অনেকগুলি সমীচীন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উত্তরাধিকার" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। কিন্তু আখ্যানবস্তুর অনুপাতে ভারতউদ্ধার-পরামর্শের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। "মার্কিনের অতিশ্রমশীলা শিক্ষিতা মহিলা" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। আরম্ভে দেখিতেছি,—"অনেকের ধারণা, এ দেশের সেটী কুসংস্কার বলিলেও চলে যে, স্ত্রী-শিক্ষা দিলে রমণীর রমণীয়তা, গৃহবধূর ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাব এবং তাঁহার স্ত্রীজাতিসুলভ সৌন্দর্য্য লোপ পায়।" না; স্ত্রী-শিক্ষার ফল এমন শোচনীয় হইতে পারে না। "স্ত্রীশিক্ষা"র ছদ্মনামে যে কুশিক্ষা ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহারই ফল এইরূপ। শিক্ষার নামে দুর্নীতির সমর্থন করিবেন না;—"সমালোচকের সুর" যদি "সপ্তমে চড়ে", তাহা ঢাকিবার জন্য গোঁড়ামীর জয়ঢাক বাজাইবেন না। মার্কিন মহিলার দৃষ্টান্তেই প্রতিপন্ন হয়,—আমাদের দেশে প্রচলিত 'স্ত্রী-শিক্ষা' শিক্ষানামেরই যোগ্য নয়। শিক্ষিতসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নাই;—বিরোধ শুধু শিক্ষার স্বরূপ লইয়া। স্ত্রীশিক্ষা ও 'স্ত্রীস্বাধীনতা'র নেতা স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার অপচারে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবি করিবার ব্যবস্থা তাঁহারও চক্ষুঃশূল ছিল। কেশব বাবু কি স্ত্রী-শিক্ষার শত্রু ছিলেন? সংস্কারকগণ ভুলিয়া যান, যাঁহারা নূতনমাত্রেরই গোঁড়া,—তাঁহারাও পুরাতন গোঁড়াদেরই মত দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষার নামেই যাঁহারা মাতিয়া উঠেন, তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না,—"পিতলক কাটারী কামে নাহি আওল, উপরহি ঝকমক সার।" সম্পাদকের "আগামী কংগ্রেস" পাঠযোগ্য, চিন্তনীয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন,—"রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ফল, ইহা বলাই ভুল।" মন্তব্যটি "জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ" নহে, তাহা না বলিলেও চলে। রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্কুরেই যাঁহারা ফলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা মরীচিকায় ভ্রান্ত। আপাততঃ আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায় নিষ্ফল, এবং এই সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থসর্ব্বস্ব 'ইম্পীরিয়ালিজমে'র যুগে সম্ভবতঃ আরও বহুকাল আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ফলই থাকিবে। কংগ্রেস যে বীজবপন করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহার ফল ফলিবে,—যদি আমরা নিষ্কাম সাধনায় মগ্ন থাকিতে পারি; যদি আমরা চারিত্রের চর্চ্চা করিতে পারি; যদি আমরা অম্লানবদনে মাতৃভূমির চরণে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে শিখি। আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব স্বার্থপরের আন্দোলন কোলাহলমাত্র। মনে রাখিতে হইবে, অসংযত কোলাহল 'আন্দোলন' নহে। ত্যাগশূন্য বৃথা চীৎকারের একমাত্র পুরস্কার,—জেতার বিদ্রূপ।

ভারতী। পৌষ। "সম্পদের প্রতি" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি চলনসই কবিতা। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "জুলিয়াস সিজারে"র অনুবাদ করিতেছেন। এবার দ্বিতীয় অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা শিথিল ও প্রাণহীন। অনুরূপ অনুবাদে মূলের কতকটা অঙ্গহানি অপরিহার্য্য। কিন্তু সুষমাশূন্য ভাষায় ভাবের সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া যায়। তথাপি যাঁহারা মূলের রসাস্বাদে অক্ষম, জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অনুবাদে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। শাস্ত্রেও ত মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা আছে। যাহা অসম্ভব,—দুর্ল্লভ, তাহার অনুকল্পও প্রশস্ত। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা আমাদের আদর্শ হউক। বাঙ্গালা সাহিত্যে জ্যোতি-

প্রিয়নাথ বাবুর ন্যায় একনিষ্ঠ সাধক নিতান্ত দুর্লভ, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল এবার "পশ্চিম ভারতে নাগপূজা"র পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ সঙ্কলিত প্রবন্ধে প্রমাণের উল্লেখ আবশ্যক। তাহাতে প্রবন্ধের গৌরবই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নূতন লেখকগণ মূল উৎসের নামনির্দ্দেশে এত সঙ্কুচিত হন কেন, বলিতে পারি না। "যাঁহারা না বলিয়া পরের দ্রব্য" নিজের করিয়া লন, এখন তাঁহাদিগকেও ত লেখক বলিতে হয়; অবশ্য 'দ্বিতীয় ভাগে' তাঁহাদের অন্য অভিধান আছে। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর "তৃপ্তি" কবিতাটি বুঝিতে পারিলাম না।—

> "এই যে নিখিল ধরা কর্ম্মপাকে ঘুরিতেছে,
> এই যে গগনমার্গে কোটী তারা ছুটিতেছে।"

একবারে গদ্য; কিন্তু তত্ত্বটি বড়ই গুরুতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন-বিজ্ঞানের মাত্রা রচনাটিতে এত অধিক যে, পাঠকের পক্ষে অন্ততঃ কতকটা ঘুরপাক নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেহারী উপকথা" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত "বর্লি'ন-অবরোধ" নামক গল্পটি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ বটে, কিন্তু ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়ের "শঙ্কর চক্রবর্ত্তী" বিবরণগুণে গরীয়ান। স্বদেশী মহাপুরুষের চরিতকীর্ত্তন করিয়া লেখক স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, আমাদেরও ধন্য করিয়াছেন। উপসংহারে ভাষার উদ্দীপনা আছে। কিন্তু প্রবন্ধের প্রারম্ভে ভাষার ঘোরতর ঘর্ঘর শব্দে কানে তালা ধরিয়া যায়,— "বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্যরথিগণের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসা জাতীয় জীবনের উন্নতিস্রোতে ভাষা ও ভাবের বক্তব্য ও কর্ত্তব্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ও সমাহারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য আয়াসসাধ্য হইলেও স্বকীয় কার্য্যকারিতা দ্বারা সমাধান প্রয়াস শিক্ষাবৈষম্যে বঙ্গীয় মস্তিষ্কে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, ইহাই দুঃখ।" তাহার উপর আবার এইরূপ ভাষা বুঝিবার দুঃখ! কিন্তু দুঃখই সার, বুঝিতে পারিলাম না। "অস্তিত্বসংরক্ষণের পারম্পর্য্যসেবিত নির্ম্মল যুগ" কি? লেখকের ভাষায় ওজস্বিতা আছে, এবং উপসংহারের উদ্দীপনাও উপভোগ্য বটে। তাই ভবিষ্যতের আশায় ভাষার দোষনির্দ্দেশ করিলাম। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "গোবিন্দ দাস" নামক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। "সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় মিথিলায় গোবিন্দ দাসের অনেকগুলি পদ পাইয়া স্থির করিয়াছেন, সেগুলি গোবিন্দ ঝা নামক মৈথিল কবির রচিত।" আলোচ্য প্রবন্ধে দীনেশ বাবু বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"বাঙ্গালা দেশেই বহুসংখ্যক গোবিন্দ দাস পদ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এক জন বিশিষ্ট পদকর্ত্তা। মিথিলার গোবিন্দ ঝা নামক কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অনাস্থা প্রদর্শন করি না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস যে বুধুরী নিবাসী, তৎসম্বন্ধে আমাদের দ্বিধামাত্র নাই।" 'হারানিধি' গোবিন্দকে মাতৃভাষার অঙ্কে ফিরাইয়া দিয়া দীনেশবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

জাহ্নবী। পৌষ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "প্রপক" নামক শিক্ষাপ্রদ ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর "সন্ধ্যার" নামক কবিতাটির মাধুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীযুক্ত জলধর সেন "লক্ষ্ণৌ-ভ্রমণে"র প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন, "বর্দ্ধমান হইতে মেলগাড়ী ছাড়িল।" হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এ যাত্রা মুক্তিলাভ করিল, আমরাও আশ্বস্ত হইলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, জাহ্নবীর প্রবাহ চিরপ্রবাহিত থাকুক।

ফিরিঙ্গি বণিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টা।

The modern first-class Powers,—France, Germany, Austria, Russia, Italy, Great Britain,—were not yet built up. Spain was still divided between Castile, Aragon and the Moors. Europe remained a continent of principalities, duchies, counties, little oligarchies, and little republics.
—*Sir W. Hunter.*

ইস্‌লাম-বিপ্লব-বিপর্য্যস্ত ইউরোপীয় খৃষ্টান-সমাজ যখন ভারত-বাণিজ্যের অভিনব স্থলপথ আবিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় পূর্ব্বাভিমুখে পর্য্যটক প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন ইউরোপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রভঙ্গ খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখনও ইউরোপীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া, খৃষ্টান-শাসনকে পর্য্যাপ্তরূপে শক্তিশালী করিতে সমর্থ হয় নাই। যে বলে বলীয়ান্ হইয়া আধুনিক ইউরোপ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানবল সঞ্চিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্যরাজ্যের তুলনায় প্রতীচ্য রাজ্য অশিক্ষিত। এক দিকে নানা নূতন শিক্ষার সন্ধানলাভ করিয়া, অন্য দিকে বলদৃপ্ত মুসলমান-শক্তির নিকট উপর্য্যুপরি অপদস্থ হইয়া, সমগ্র ইউরোপেই শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল বাণিজ্যপ্রধান ইউরোপীয় মহানগর একদা ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া, আশাতীত ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে খৃষ্টানজগতের নরনারীকে নিয়ত প্রলুব্ধ করিত, ইস্‌লাম-বিপ্লবে তাহা জনশূন্য অরণ্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া, সমগ্র ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইউরোপ তাহার জন্য হাহাকার করিয়াছিল; সেই করুণ আর্ত্তনাদ পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে অদ্যাপি থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা অসমর্থ অপদার্থ আত্মগৌরব-বোধশূন্য অবসন্নজাতির চিত্তক্ষোভ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বেদনায় ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ব্যথাই ব্যথামোচনের উপায়-উদ্ভাবনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত করিয়াছিল। ইউরোপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হইলেও, ধর্ম্মাচার্য্য পোপ খৃষ্টান ইউরোপের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রধানপুরুষ বলিয়া তখনও সুপরিচিত ছিলেন।

পোপ হইতে নগণ্য নাবিক পর্য্যন্ত সকলেই স্বতন্ত্রভাবে একই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। নূতন স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টা এইরূপে আরব্ধ হয়।

আরব হইতে মুসলমান-ধর্ম্ম এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মই এসিয়ার অধিকাংশ নরনারীর প্রচলিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত ছিল। দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে, শাক্যসিংহের দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত কত লোকাচার দেশাচার জড়িত হইয়া, এসিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মকে বহুসংখ্যক বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইস্‌লাম পশ্চিম-এসিয়াখণ্ডে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তৃত করিবার সময়, সকল স্থান খলিফাগণের রাজশাসন স্বীকার করে নাই;—ধর্ম্মে এক হইয়াও, রাজাতন্ত্রে স্বতন্ত্র থাকিয়া, এসিয়ার মুসলমান-গণ দেশভেদে নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহারা খৃষ্টজন্মভূমি অধিকার করিয়া, সমগ্র ইউরোপের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে আহূত হইয়াছিল; তাহাদের পদোন্নতি লক্ষ্য করিয়া, তাতার দেশের মুসলমান বীরগণ তাহা অধিকার করিবার আশায় দলে দলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাঞ্চলে ধাবিত হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব দিক্ হইতে তাতার ও পশ্চিম দিক হইতে ইউরোপ যুগপৎ আক্রমণ করিয়া, উদীয়মান ইস্‌লামশক্তিকে চূর্ণ করিয়া, এসিয়ার পুরাতন বাণিজ্যপথ ভাগ করিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। যে মন্ত্রে উত্তরকালে ইউরোপ সমগ্র এসিয়াখণ্ডে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রথম সংঘর্ষকালেই সেই মন্ত্র প্রথমবার ব্যবহৃত হয়। তাতারদেশের মুসলমানকে দিয়া ইস্‌লামের মূলশক্তি পরাস্ত করিবার জন্য ইউরোপ উপহার উপঢৌকন সমভিব্যাহারে খাঁ-সাহেবদিগের জয়স্কন্ধাবারে দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন!

তাতারগণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যদেশে, কাস্পীয়ান-তীরে ও কৃষ্ণসাগর-তটে অধিকার বিস্তার করিয়া, অধিকাংশ বাণিজ্যপথ করতলগত করিয়াছিল। ভল্গা নদী ও কাস্পীয়ান হ্রদের সঙ্গমস্থল এসিয়া-ইউরোপের বাণিজ্য-পথের সর্ব্বপ্রধান সন্ধিস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাতারগণ ভল্গা নদীর সন্ধিস্থলেও শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সেই পথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য অনায়াসে সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে ভাবিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম্মাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত প্রধান শিষ্য ফরাসী নরপতি সেণ্ট লুই তাতার-দিগের সহিত মিত্রতাসংস্থাপনের জন্য নানারূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। *

দৌত্য সফল হইল না। এসিয়া আত্মবিক্রয় করিল না। তাহা বাহুবলে অপহরণ করিবার শক্তি না থাকায়, ইউরোপকে অগত্যা ক্ষুণ্ণহৃদয়ে তাতার-সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করিতে হইল। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগ্নমনোরথ হইলেও, এই দৌত্যকার্য্যে ইউরোপ অনেক শিক্ষালাভ করিল। কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয়ান্ হ্রদের তীর হইতে মধ্যএসিয়ার মরুভূমি পর্য্যন্ত যে পুরাতন বাণিজ্য-পথ প্রচলিত ছিল, তাহার সমগ্র ভৌগোলিক-বিবরণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহা লিখিত ও অনুবাদিত হইয়া, ইউরোপের বিবিধ প্রদেশে সযত্নে অধীত হইতে লাগিল। মুসলমান-শক্তির অভ্যন্তরেই যে তাহার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসবীজ গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহারও নানা পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই দৌত্যকার্য্য, সফল হইলে, মধ্যএসিয়ার ন্যায় ইউরোপকেও স্থলযুদ্ধের কৌশল-উদ্ভাবনে চিরনিবিষ্ট করিয়া, অশ্বশালার অশ্বপালকরূপে জীবনযাপন করিতে বাধ্য করিত। জলপথ উপেক্ষিত হইয়া, ইউরোপের আধুনিক সমুন্নতিলাভের প্রধান পথ চিররুদ্ধ করিত। এসিয়ার ন্যায় ইউরোপকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র জয়পরাজয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে হইত। দৌত্য সফল হইল না বলিয়াই, ইউরোপকে বাধ্য হইয়া নূতন স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সামান্য ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ইউরোপের ইতিহাসের একটি নগণ্য ঘটনা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু আদ্যন্তের সহিত একত্র পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাকেই আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনাবলীর সংখ্যাভুক্ত করিতে হয়। মনীষিগণ সেই ভাবেই এই দৌত্য-বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইউরোপ পথভ্রান্ত হইবার প্রথম উপক্রমেই সাবধান হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

কৃষ্ণ-সাগর-পথে ভারতীয়-পণ্যদ্রব্য-বহনের অভিনব স্থল-বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করিবার আশায়, রাজদূত ব্যতীত নানা ধর্ম্মাচার্য্য ও পরিব্রাজকগণও পদব্রজে ভূপ্রদক্ষিণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে "মার্কো পোলো"র নাম জগদ্বিখ্যাত। তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অদ্যাপি সযত্নে মুদ্রিত ও অধীত হইয়া থাকে। তিনি স্থলপথে চীনদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, ভারতবর্ষের উপকূল-সংলগ্ন সমুদ্রপথে পারস্যরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ভারত-বাণিজ্যের জল স্থল সকল পথেরই সন্ধানলাভ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক যখন স্বদেশে

উপনীত হইলেন, তখন স্থল অপেক্ষা জলপথের কথাই আলোচিত হইবার সূত্রপাত হইল। কৃষ্ণসাগরের তীরে স্থলবাণিজ্য-পথের সন্ধান করিবার চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে, আর এক দল অনুসন্ধাননিপুণ পরিব্রাজক ভূমধ্যসাগর-পথে মিশরদেশে উপনীত হইয়া, তথা হইতে সিরিয়ার বাণিজ্য-পথের অনুসন্ধান করিবার জন্য যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপে বিবিধ উপায়ে স্থল-বাণিজ্য-পথের সন্ধানচেষ্টা পরিচালিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনও অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার-সাধন করিতে হইলে, পরিণামে সর্ব্বথা সফলকাম হইবার মূলসূত্র "অধ্যবসায়"। তাহা বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কালে কাম্যফল প্রদান করিয়া, সকল শ্রম সফল করিয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই। ইউরোপ যে অকুতোভয়ে অপরাজিত অধ্যবসায়ে ভারতবাণিজ্যপথের সন্ধান-চেষ্টায় তিন শত বৎসর অক্লান্ত-চরণে এসিয়ার মরুগিরি ও মহারণ্যে বিচরণ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে অধ্যবসায় বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করায়, অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপ বুঝিয়াছিল, -স্থলপথে সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা নাই।

তখনও বাষ্প-যান প্রচলিত হয় নাই; তখনও লৌহবর্ত্মে পৃথিবীর পূর্ব্ব-পশ্চিমকে অনায়াস-গম্য করিয়া, কৌতূহল-প্রিয় ভুবনভ্রমণশীল বিলাসিবর্গের বিলাসক্ষেত্রে সমগ্র এসিয়াকে উৎসর্গ করিবার কৌশল ইউরোপের অধিগত হয় নাই। সে দিন ইউরোপের শ্বেতচর্ম্ম ও রক্তনেত্র, এসিয়াবাসীকে সভয়ে সন্ত্রস্তচরণে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সমুচিত সমাদরপ্রদর্শনের শিষ্টাচারশিক্ষায় মনুষ্যত্বহীন করিয়া, দৃষ্টিমাত্রে দিগ্বিজয়সাধনের অব্যর্থ কৌশল উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে দিন বড় কঠিন দিন বলিয়াই পরিচিত ছিল। তখন বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইয়া, সৌজন্য-সদাচার তিরোহিত হইয়াছিল। তখন কৃষক তাহার হলফলক লইয়া তরবারি নির্ম্মাণ করিত;—এসিয়া তাহার পুরাতন প্রফুল্লবদন ভ্রূকুটীকুটিল বিভীষিকার আধার করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে প্রতীচ্য-বিজয়ে যাত্রা করিবার জন্য অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মধ্যএসিয়ার জীবনপ্রভাত; ইউরোপের জীবন-সন্ধ্যা। তখন এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে—সর্ব্বত্র—কেবল এসিয়ার কথাই সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য কথা। সে দিন যাহারা ইউরোপ হইতে এসিয়ার উপনীত হইয়া বাণিজ্য-পথের সন্ধান-

চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার আশা ছিল না বলিয়া, সে চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ব্যর্থচেষ্টাই জলপথের দিকে লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিয়া, ইউরোপের অভ্যুদয়সাধনের কারণ হইয়াছিল। ব্যর্থ-চেষ্টার ইতিহাসই চেষ্টা-সাফল্যের প্রকৃত ইতিহাস। সে কথা বিস্মৃত হইয়া, অধ্যবসায়শূন্য অব্যবস্থিতচিত্ত অকর্ম্মণ্য আধুনিক ভারতবাসিগণ বাণিজ্যোন্নতিসাধনের জন্য আহূত হইবামাত্র ব্যর্থ-চেষ্টার উল্লেখ করিয়াই উদ্যমহীন হইয়া পড়িতেছে। দেখিয়াছি—করিয়াছি—যথেষ্ট হইয়াছে—আর কেন—আশা নাই— এ সকল কথা যে ইউরোপে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা বলিতে হইলে ইতিহাসের অবমাননা করা হয়। ইউরোপেও কত লোকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, কত লোকে ব্যর্থচেষ্টার বিষময় ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কত কবি, কত নাট্যকার উপহাসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গদ্যে পদ্যে বিদ্যা প্রকাশ করিয়া "গণ্ডের উপর পিণ্ড" সংযোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যে বসিয়া পড়িয়াছিল, সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে;—এক পথে প্রতিহত হইয়া, অন্যপথে ধাবিত হইয়াছে;—পুনঃপুনঃ ব্যর্থমনোরথ হইয়াও, পুনঃপুনঃ সামর্থ্যবলে আত্মজয় করিয়া, পরিণামে সাফল্য-লাভে কৃতার্থ হইয়াছে। ইউরোপীয় অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক মূল সূত্র এই সকল ব্যর্থ-চেষ্টার বিলুপ্ত ঘটনাবলীর মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।

স্থলপথে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া জলপথের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সময়ে, স্থলপথের আশা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। ইউরোপ অদ্যাপি সে আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। রুসিয়া যে সুদীর্ঘ লৌহবর্ত্মে এসিয়ার সহিত ইউরোপকে সংযুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পুরাতন স্থল-বাণিজ্যপথের ভারত-সৌভাগ্যচরণাঙ্কিত সুপরিচিত পুণ্যপথ। সেই পথে বৌদ্ধ শ্রমণ জগদ্ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, বণিগ্বর্গের আশ্রয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে মুক্তিমন্ত্র প্রচারিত করিতেন। তাহার উভয় পার্শ্বে অদ্যাপি যে সকল পুরাকীর্ত্তি ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বৌদ্ধবিজয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস-সূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পুনরায় আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতেছে। তাহাকে এসিয়ার পুরাতন পুণ্যপথ ভিন্ন কি বলিব? যে পথে গমনাগমনকালে এসিয়াবাসিগণ পৃথিবীর ইতিহাসে শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান বৈরাগ্য শিল্পবিজ্ঞান গৌরবে পরাক্রান্ত হইয়া ইতিহাসে [illegible] লাভ করিয়াছে, তাহাই এসিয়ার

পুরাতন পুণ্যপথ। সে পথের পার্শ্বে এসিয়ার অতীত গৌরব অদ্যাপি যেন ছায়া-কলেবরে দণ্ডায়মান।

ইউরোপ যখন জলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে, সেদিন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ইউরোপীয়গণ দেখিয়াছিল,—স্থলপথে তাহাদের কোন কোন স্বদেশী পর্য্যটক তখনও ভারতবর্ষে উপনীত হইতেছে! যাহারা মিশরীয়-পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাও সহসা অধ্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। জলপথ আবিষ্কৃত হইবার পর প্রয়োজনের অভাবেই স্থল-বাণিজ্যপথের সন্ধান-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় জনসমাজ ভূমণ্ডলের বিবিধ অবিজ্ঞাত প্রদেশ আবিষ্কৃত করিবার জন্য লালায়িত হইবার কথা ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন অবিজ্ঞাত নূতন দেশের আবিষ্কার-কামনা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহা কেবল চির-পরিচিত ভারতবর্ষের অভিনব বাণিজ্যপথের সন্ধানচেষ্টার আকস্মিক ফল। এই সকল অভিনব আবিষ্কার-ব্যাপার যদি ইউরোপের পক্ষে উত্তরোত্তর উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইবার কারণরূপে উল্লিখিত হয়, তবে ভারতবর্ষকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

স্থলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পক্ষে যে সকল বাধাবিঘ্ন ইউরোপের পক্ষে তৎকালে পুরাতন বাণিজ্য-পথ নিরতিশয় দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল, জলপথে সেরূপ বাধা বিঘ্নে ইউরোপকে পরাস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না। এসিয়া কোন্ পুরাকালে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিবার জন্য নৌচালন-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভ করিবার উপায় নাই। সমুদ্রোপকূলের সকল দেশই তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল স্মরণাতীত পুরাকাল হইতেই সমুদ্র-যাত্রা-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত। ভূমধ্যসাগরতীরের পুরাতন পরাক্রান্ত মানবসমাজ অতি পুরাকাল হইতেই সমুদ্রপথে বিচরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি এসিয়া ও ইউরোপের নৌবিদ্যার পার্থক্য ছিল। ইউরোপীয়গণ যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিতেন, তাহা ভূবেষ্টিত বৃহদায়তন হ্রদ ভিন্ন মহাসাগর নামে কথিত হইতে পারে না। এসিয়ার সমুদ্রোপকূলনিবাসী নাবিকগণের পক্ষে এরূপ ভূবেষ্টিত সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাদিগকে নিয়ত মহাসাগরে বিচরণ করিয়া, দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিতে হইত। এই পথে প্রতি-

দ্বন্দ্বীর সংখ্যা অল্প; তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য ভারতবাণিজ্যের কল্যাণে অর্থোপার্জ্জন। সুতরাং এসিয়ার সমুদ্রযাত্রা কেবল জলযান-গঠন-কৌশল, এবং সীমাশূন্য সমুদ্রপথে জলযানচালন-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াই নিরস্ত হইয়া রহিয়াছিল। জলযুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই বলিয়া তাহার কৌশলজালবিস্তার করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা আরব্ধ হইবার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই। ইউরোপে পুরাকাল হইতেই সে প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। সংকীর্ণ প্রণালী-পথের সংঘর্ষ-সম্ভাবনা পরস্পরকে পরস্পরের পরাজয়সাধনের কৌশল-উদ্ভাবনার্থ উত্তেজিত করিয়া, ইউরোপীয়-গণকে জলযুদ্ধনিপুণ বীরজাতিতে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই সমধিক শৌর্য্যপ্রকাশ করিতে পারিত। তথাপি তাহারা মহাসাগব সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন জলপথের সন্ধান-চেষ্টা ইউরোপকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, তখন ইউরোপের সুবিখ্যাত নাবিকবর্গও মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জলপথ আবিষ্কার করা সম্ভব বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরাতন জল-বাণিজ্য-পথ।

Certain men have supposed, following a foolish tradition, that the Atlantic is united on the south with the Indian Ocean.—*Joannes Philoponus.*

বিদ্যালয়ের বালকগণের বিশ্বাস,—ভাস্কো ডি গামাই ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ আবিষ্কৃত করিয়া ইউরোপের অধিবাসিগণকে নূতন জল-বাণিজ্য-পথের সন্ধান প্রদান করেন। কিন্তু অতি পুরাকালেও এই পথের সন্ধান ইউরোপে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মিশরদেশের পণ্ডিতবর্গের নিকট তাহার জনশ্রুতি সুপরিচিত ছিল। তথা হইতে সে কথা সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যযুগের জ্ঞানগৌরব-বিচ্যুত ইউরোপীয় মানবসমাজ সে জনশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন করিতে সম্মত হইত না। তাহারা আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের অত্যল্প স্থানের সহিত পরিচিত ছিল। তাহার দক্ষিণে কোথায়ও যে স্থলভাগের শেষ হইয়া পশ্চিম

সমুদ্রের সহিত পূর্ব্ব সমুদ্রের সংযোগ থাকিতে পারে, সে কথা অল্প লোকেই চিন্তা করিতে সম্মত হইত। তাহারা ভাবিত,—দক্ষিণে কেবল অত্যুত্তপ্ত মরুস্থল; সে দেশে মানবসমাজ অবস্থান করিতে পারে না! সুতরাং সে পথে অগ্রসর হইবার জন্য কাহারও কোন কৌতূহল বা সাহস হইত না।

স্থল-বাণিজ্যপথ অধিকার করিবার আশা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা ক্রমে প্রবল হইয়া, ইউরোপকে জল-বাণিজ্য-পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই সময়ে জলবাণিজ্যপথের পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। মিশর হইতে লোহিতসাগরের পথে ভারতবর্ষে যাতায়াতের পুরাতন জলবাণিজ্যপথের কথা ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই পথে ভারতবর্ষের বহু বণিক সাগর পারের মিশর রাজ্যে গমনাগমন করিতেন। এই পথে কোন কোন রাজদূত রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করিত, এ কথাও শুনিতে পাওয়া যাইত। এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া, মিশর দেশ ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান পণ্যশালা বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। ভূমধ্যসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে গমনাগমনের পথ সুপরিচিত ছিল। সেই পথে রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে বিলাসলোলুপ রোমান নাগরিকগণের রসনাতৃপ্তিদায়ক শুক্তি-শুক্তি ইংলণ্ড হইতে আনীত হইত। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে বা দক্ষিণে কেবল অনন্ত জলরাশি দিগ্‌বলয়ে বিলীন হইয়া, সে পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার জন্য কাহাকেও প্রলুব্ধ করিত না। সেই এক দিন, আর এই এক দিন। এ দিনের বালকবৃন্দও সে দিনের ইউরোপীয় জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতবর্গের এই অকারণ বিভীষিকা ও অসঙ্গত অজ্ঞতার কাহিনী পাঠ করিতে বসিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারে না। তথাপি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, ইউরোপের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল। ইউরোপের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। *

---

* বিগত পাঁচ শত বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও, সমগ্র সভ্য দেশের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল পুরাতত্ত্ব প্রমাণের সংগ্রহ ও সমালোচনা করিয়া, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যর ডবলিউ হণ্টার বৃটীশভারতের যে সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সূচনামাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতেই ঐতি-

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর্য্যটকরাজ ইবন বতোতার নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছে। তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এসিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে সকল বিবরণ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহা ইউরোপীয় বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া সভ্যসমাজের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। তাহাতে পুরাতন জল-বাণিজ্যপথের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইবন্ বতোতা পৃথিবীতে পাঁচটিমাত্র বাণিজ্য-প্রধান প্রসিদ্ধ বন্দর দেখিতে পাইয়াছিলেন। একটি কৃষ্ণসাগরতীরে; একটি মিশর দেশে; একটি চীন সাম্রাজ্যে; এবং দুইটি ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে। তন্মধ্যে একটি "কালিকট" নামে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বন্দর প্রাচ্যবাণিজ্যের বিজয়-গৌরবে ভারতবর্ষের নাম সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সেকালের বাণিজ্যের কথা কেবল ভারতবর্ষের কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে সকল পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইত, তাহার একাংশ প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও চীন জাপানাদি সুদূর দেশে প্রেরিত হইত; অপরাংশ প্রতীচ্য রাজ্যে প্রেরিত হইত। যাহা পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হইত, তাহার বিনিময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের বিবিধ পণ্যদ্রব্য আনীত হইয়া তাহাও পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। ভারতবর্ষ কাহারও নিকট ক্রয় করিত না; পূর্ব্বে পশ্চিমে আপন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত; এবং পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যও পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় করিয়া স্বদেশের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব বিবর্দ্ধিত করিত। এই বাণিজ্যব্যাপারে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তজ্জন্য মিশরদেশের ন্যায় সিংহল দ্বীপও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্মিলনক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। ইস্লাম ইহার অংশ ভোগ করিবার জন্য সমুদ্রপথে শীঘ্রই প্রাধান্যলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের যে সকল দ্বীপপুঞ্জ একদা শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্মের শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে মুখরিত ও ধূপ-গুগ্গুল-গন্ধে আমোদিত হইয়া, শিক্ষা দীক্ষা, ভাষা সাহিত্য ও আচার ব্যবহারে, দ্বীপবাসিগণকে ভারতীয় সভ্যতায় সমুন্নত করিয়া, ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছিল,

---

হাসিকের নশ্বর জীবন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার সংকলিত সুবৃহৎ গ্রন্থের যে অত্যল্পাংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইবে। ভারতবর্ষের আধুনিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিহাস-সঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে, সকল লেখককেই হণ্টারের নিকট কৃতজ্ঞহৃদয়ে ঋণ-স্বীকার করিতে হইবে।

সেখানে ক্রমে ক্রমে ইস্‌লামের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্যে, অদ্যাপি মুসলমানের বিজয়ঘোষণা করিতেছে।

পুরাতন জলবাণিজ্যপথে মুসলমানের আধিপত্য প্রবল হইলে, মুসলমানাধিকৃত মিশর দেশ ভারতবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে পথে খৃষ্টান ইউরোপের অগ্রসর হইবার আশা তিরোহিত হইয়া গেল। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ইউরোপে আনীত হইত, তাহা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলে খৃষ্টান ইউরোপের পক্ষে পুরাতন জলবাণিজ্যপথের প্রধান প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। ভূমধ্যসাগরে ইস্‌লাম শক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। স্থলপথের ন্যায় জলপথেও, প্রাচ্য এসিয়া প্রতীচ্য ইউরোপকে পদে পদে অপদস্থ করিয়া, এসিয়ার বিজয়-গৌরবে ইউরোপকে অবসন্ন করিবার উপক্রম করিল!

এই সঙ্কট-কাল ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষা-কাল। এই সময়ে অপদস্থ হইয়া, ইউরোপ অধ্যবসায়হীন অবসন্ন অবস্থায় আপন দুর্ভাগ্যকে চিরসহচর করিয়া উদ্যম-প্রয়োগে অসম্মত হইলে, ইউরোপের ইতিহাস ভিন্ন ভাবে লিখিত হইত;—ভারতবর্ষের ইতিহাসও ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিত। ইউরোপ কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াও, লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। তাহাই ইউরোপের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ।

এই সময়ে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। গ্রীসের জ্ঞান-গৌরব ও রোমের রাজশক্তি এক সময়ে ইউরোপকে সমুন্নত করিবার আয়োজন করিলেও, সে আয়োজন সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। প্রধান প্রধান মহানগর ভিন্ন, সমগ্র দেশ সে পুরাতন সভ্যতার ফললাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।* যাহারা মহানগরে বাস করিয়া সভ্য হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারাও সভ্যতার প্রকৃত অমৃতফলে বীতরাগ হইয়া, তাহার বিবিধ কুফল লাভের জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল! সম্ভোগ-লালসা প্রবল হইয়া সংযম-সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল। জ্ঞান কেবল সম্ভোগের উপায়-উদ্ভাবন করিত; ধর্ম্ম কেবল বাহ্যাড়ম্বরে সম্ভোগকে সম্ভজনীয় করিয়া তুলিত; লোকাচার কেবল মানবসমাজকে নিয়ত

* What we call Greeks and Romans are chiefly the citizens of Athens and Rome.—MaxMuller's India, what can it teach us, p. 121.

পশু-স্বভাবের দিকেই প্রাণপণে আকর্ষণ করিত! ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব ঘটিল না। ইউরোপ শীঘ্রই সৌভাগ্য-বিচ্যুত হইল। অজ্ঞানতার অন্ধকারে পূর্ব্বশিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এসিয়ার খৃষ্ট-ধর্ম্ম ইউরোপে প্রচারিত হইবা-মাত্র, তাহার স্বভাবসুন্দর সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! ইউরোপ ধর্ম্মান্ধ হইয়া উঠিল; নিয়ত শয়তানের কথা চিন্তা করিতে করিতে শয়তানের কথারই প্রচার করিতে লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে চিরবিরোধ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যাহা কিছু নূতন, তাহা শয়তানের কুটিল কৌশল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবামাত্র, জনসাধারণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়া, আত্মার সদ্গতিরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িল! ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিবার আশায়, অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য নানারূপ ধর্ম্মান্ধতার আবরণ-সৃষ্টি করিয়া, লোক-লোচন আচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইস্‌লামের সহিত খৃষ্টান-সমাজের ধর্ম্মযুদ্ধ বিঘোষিত হইলে, খৃষ্টানের ধর্ম্মান্ধতা অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল!

দুর্দ্দশার দিনে দুর্ম্মতি আসিয়া মানবসমাজের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া দেয়। ইউরোপের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া উঠিল। ইউরোপ স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে জলপথে নৌচালন করিত; ভূমধ্যসাগর ইউরোপের নিকট স্থলপথের ন্যায় সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় অর্ণবপোত কেবল ক্ষেপণীবলেই পরিচালিত হইত। বায়ুবলে সমুদ্রপথে পোতচালনা করিবার কৌশল অতি পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যপোত সেই নৈসর্গিক বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়াই, ভারতবর্ষ হইতে বর্ষান্তরে গমনাগমন করিত। প্রয়োজনের অভাবে ভূমধ্যসাগরে সে উপায়ে পোতচালন-কৌশল অবলম্বিত হইত না। দিগ্‌দর্শনশলাকা আবিষ্কৃত হইলেও, ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান নাবিকগণ তাহাকে শয়তানের যন্ত্র মনে করিয়া, তাহার ব্যবহার করিতে সম্মত হইত না। কেহ সে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া পোতচালনা করিতে সাহস করিলে, কোনও খৃষ্টান নাবিক সেরূপ অর্ণবপোতে পদার্পণ করিয়া তাহার পরকালের সদ্গতিকে সঙ্কটাপন্ন করিতে সাহসী হইত না! এরূপ অবস্থায় পুরাতন জলবাণিজ্যপথে প্রতিহত হইয়া, নূতন জলবাণিজ্য-পথের অনুসন্ধান করা অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মান্ধ ইউরোপের পক্ষে কত না কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল!

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে ভূমধ্যসাগরে ফিনিসীয় বণিগ্বর্গের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে, একদা পুরাতন মিশররাজ্যই ভূমধ্যসাগরের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া, সমগ্র ইউরোপে বাণিজ্য-যাত্রা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিত। মিশর কালক্রমে সেই পুরাতন জলবাণিজ্যপথের অধিকার-বিচ্যুত হইলে, নূতন জলবাণিজ্য-পথের সন্ধান-চেষ্টায় নানারূপ আয়োজন করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দিকে ভূমধ্যসাগর, অন্য-দিকে লোহিতসাগর নামক দুইটি ভূবেষ্টিত ক্ষুদ্র উপসাগরের সহিত সুপরিচিত থাকিলেও, মিশরবাসিগণ ভারতমহাসাগরের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিল্প বিজ্ঞান গণিত দর্শন বিদ্যায় মিশরদেশ পুরাকালেই উন্নতিলাভ করে। তখন কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার মিশরবাসিগণকে অভিনব তত্ত্বালোচনায় নিরস্ত করিত বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা আফ্রিকার একাংশে বাস করিয়া, অপরাংশের সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে ভৌগোলিক জ্ঞান-সঞ্চয়ে সফলকাম হইয়াছিল। তাহারা আফ্রিকার চতুর্দ্দিকে সাগরজলরাশির অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগরপথে ভূমধ্যসাগরে উপনীত হইবার সম্ভাবনায় কোনরূপ সংশয় প্রকাশ না করিয়া, অভিনব জলবাণিজ্যপথের সন্ধান-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য-ব্যাপারে ফিনিসীয় বণিগ্বর্গের প্রাধান্য লুপ্ত করিয়া মিশরের প্রাধান্যসংস্থাপনের প্রবল প্রলোভন মিশরের রাজা প্রজা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই নূতন জলবাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত করিবার জন্য আগ্রহের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টাবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে মিশরাধিপতি ইতিহাসবিখ্যাত ফ্যারাও নিকো লোহিতসাগর হইতে এক দল নাবিক প্রেরণ করেন। তাহারা লোহিতসাগর হইতে ভারতসাগর, তথা হইতে আটলাণ্টিক সাগর, এবং তথা হইতে ভূমধ্য-সাগর অতিক্রম করিয়া, পুনরায় মিশরদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। সেকালের গঠনকৌশলহীন ও চালনকৌশলহীন ক্ষুদ্রকায় অর্ণবপোতের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অল্পকালে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিবার সম্ভাবনা না থাকায়, নূতন জলবাণিজ্যপথের সন্ধান লাভ করিয়াও, মিশরাধিপতি তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারিলেন না। নাবিকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এক অলৌকিক কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহাদের সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার প্রথমভাগে, সূর্য্যদেব বাম দিক হইতে উদিত হইতেন; শেষভাগে, সেই সূর্য্যদেব দক্ষিণ দিক হইতে উদিত হইতেন।*

নাবিকগণ ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু জনসাধারণ সে কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারিল না। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের সমুদ্র-পথে মিশর হইতে দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিবার সময়ে, সূর্য্যদেবের বাম দিক হইতে উদিত হইবার কথা। আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের সমুদ্রপথে উত্তরাভিমুখে পোতচালনা করিবার সময়ে, সূর্য্যদেবের দক্ষিণ দিক হইতেই উদিত হইবার কথা। ইহা একালের বালকবৃন্দও অলীক কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু সেকালে হেরোদোতসের ন্যায় মনীষিবর্গও ইহাতে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন! আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য জনপদে বাণিজ্যপোত চালনা করিবার এই সকল পুরাতন প্রমাণ ইউরোপের অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ইউরোপ তাহাতে আস্থা-স্থাপন করিতে পারিত না। এরূপ পুরাকাহিনী অলীক কাহিনী বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইত। বিষুব-রেখা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে;—সে কথা অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বিষুব-রেখা যে সকল জলস্থলের উপর দিয়া অবস্থিত আছে, তাহার স্বাভাবিক তাপাধিক্য-সম্বন্ধে নানারূপ অতিশয়োক্তি প্রচারিত হইয়াছিল। এত উত্তাপ যে, তাহা মানবশক্তিকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে! বিষুব-রেখার নিকটে যখন এত উত্তাপ, তাহার দক্ষিণে হয় ত উত্তাপাধিক্যের অবধি নাই! এই সকল জ্ঞানান্ধ ভ্রান্ত-সংস্কার ইউরোপকে বহুকাল পর্য্যন্ত আফ্রিকার দক্ষিণাংশে গমনাগমনের কল্পনা পরিত্যাগ করিতেই শিক্ষাদান করিয়াছিল। ইউরোপীয় পুরাতন সাহিত্যে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের সমুদ্রপথ অবিজ্ঞাত! আটলাণ্টিক মহা-সাগর যেন এক অভেদ্য কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন! তাহা অপরিজ্ঞাত—অপরিজ্ঞেয় —অন্ধকার! এই বিশ্বাস কেবল ইউরোপকেই উপহাসাস্পদ করে নাই;— ইস্‌লামের পক্ষেও ইহা উপহাসের বিষয় হইয়া রহিয়াছে! ইস্‌লাম এক সময়ে প্রতীচ্য মানবসমাজে জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াও, স্বয়ং বহু বিষয়ে অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিতেন। মুসলমান মনীষিগণ বলিতেন,—আটলাণ্টিক মহাসাগরে অধিক দূর অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই! মুসলমানগণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, আটলাণ্টিক সাগরপথে ইউরোপে পদার্পণ করিবার সন্ধান-লাভ করিল, মুসলমানকে ইউরোপ হইতে তাড়িত করা সহজ হইত না। কিন্তু ইস্‌লাম-প্রতিভা সে পথে পরিচালিত হয় নাই; তাহা কেবল বিষুব-রেখার উত্তরপার্শ্বের জলস্থল লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিল। ইউরোপের এই পুরাতন

ভ্রান্তসংস্কার সহসা বিদূরিত হয় নাই। ইহার জন্য যেরূপ আত্মত্যাগ ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা ইউরোপের ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অপরাজিত আত্মত্যাগ ইউরোপের এই চিরসঞ্চিত ভ্রান্ত-সংস্কার বিদূরিত করিয়া, মহাসাগর-পারের বিবিধ অভিনব রাজ্যে ইউরোপীয় অধিকার-বিস্তারের পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, তিনি আধুনিক ইউরোপের নবজীবনদাতা। তাঁহার কথা ইউরোপের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার জীবনকাহিনী ইউরোপের দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র ইউরোপের পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার নাম রাজকুমার হেন্‌রী। তিনি নাবিক-রাজ বলিয়াই সুপরিচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অপরাজিত অধ্যবসায়।

The mystery, which since creation had hung over the Atlantic, and hidden from man's knowledge one half of the surface of the globe, had reserved a field of noble enterprise for Prince Henry the Navigator.—
R. H. Major's Prince Henry the Navigator.

আটলাণ্টিক মহাসাগর-তীরে পর্ত্তুগাল নামক যে ক্ষুদ্র স্থান অদ্যাপি মানচিত্রে একটি স্বতন্ত্র ইউরোপীয় রাজ্যরূপে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে, তাহা একদা রোমক-সাম্রাজ্যের একটি নামগোত্রহীন নগণ্য উপবিভাগ বলিয়াই পুরাতন সভ্যসমাজে পরিচিত ছিল। লোকসংখ্যা অধিক ছিল না। যাহা ছিল, তাহারও অধিকাংশ কেবল দীনদরিদ্র নিরক্ষর নরনারী। তাহারা কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, রোমকসাম্রাজ্যের পাদুকা বহন করিত। তাহারা যে কদাপি শিক্ষায় সমুন্নত হইবে; তাহারা যে রণকৌশলে অজেয় হইয়া উঠিবে; তাহারা যে নৌবিদ্যাবিশারদ প্রধান পুরুষ বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবে; তাহারাই যে ইউরোপের নবজীবনলাভের পথপ্রদর্শন করিয়া, ইতিহাসে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপে অমরপদবী লাভ করিবে;—সে কথা ভবিষ্যতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ইস্‌লাম-শক্তি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, এই দেশ ইস্‌লামের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্পেন্ ও পর্ত্তুগাল ইস্‌লাম-গৌরবে জগদ্বিখ্যাত হইলেও, দেশের লোক,

তাহাতে গৌরবলাভ করে নাই। সে গৌরব ইস্‌লাম একাকী উপভোগ করিত। দেশের লোক কেবল বিস্মিত-নেত্রে ইস্‌লামের অভ্রভেদী মন্দির-চূড়ার গঠনকৌশলের প্রশংসা করিয়া, ইস্‌লামের ক্রীতদাস হইয়াই, মানব-জীবন চরিতার্থ করিত!

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই অনুন্নত মানবসমাজ সহসা সমুন্নতি-লাভের উপায় প্রাপ্ত হইল। ইস্‌লামই তাহার পরোক্ষ কারণ। ইস্‌লাম বিবিধ বিদ্যালয়ে জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, খৃষ্টান ইউরোপকে মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রদানের চেষ্টা করায়, সমগ্র ইউরোপে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধর্ম্মান্ধ সমর-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টান ইউরোপের যে দেশ যত নিরক্ষর, সেই দেশ তত নরশোণিতলোলুপ অশান্তহৃদয়ে মুসলমানের কণ্ঠচ্ছেদ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল! খৃষ্টধর্ম্মের বিমল শান্তিপিপাসা তিরোহিত হইয়া গেল। জনসমাজ রাজ্য চাহিল না, বাণিজ্য চাহিল না, সম্ভোগ চাহিল না, ঐশ্বর্য্যলালসায় অশান্ত হইল না;—চাহিল কেবল ক্ষমাশূন্য সীমাশূন্য দয়াশূন্য অগণ্য ধর্ম্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধোন্মাদ জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহাতেই পর্ত্তুগাল মুসলমান-শাসন উৎখাত করিয়া, বাহুবলে স্বাধীন হইয়া উঠিল।

স্বাধীন শক্তি উভয় হস্তে সম্মুখের অভেদ্য অন্ধকার ঠেলিয়া, দৃঢ়পদে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষালাভ করিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্ত্তুগাল সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-শাসন-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, আল্‌-ফন্‌সো নামধেয় তৃতীয় নরপালকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিল। শান্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল; সমৃদ্ধি করতলগত হইল; যে দেশ রোমক-সাম্রাজ্যের নিতান্ত নগণ্য প্রদেশ বলিয়া উপেক্ষিত হইত, তাহাই ইউরোপের প্রধান রাজ্য-রূপে পরিচিত হইল। পর্ত্তুগালের ইতিহাসের এই অভিনব অভ্যুদয়-যুগের বিস্তৃত কাহিনী নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া, সভ্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।

যাঁহারা বাহুবলে মুশলমান-শক্তি প্রতিহত করিয়া পর্ত্তুগালকে স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মবীর-নামে সুপরিচিত। খৃষ্টান-সমাজপতি ধর্ম্মাচার্য্য পোপ খৃষ্টানধর্ম্মের কল্যাণকামনায় নবোদগত ইস্‌লাম-শক্তির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানগণকে নিয়ত উত্তেজিত করিতেন। তাহাতে ইউরোপের সকল দেশেই বহুসংখ্যক ধর্ম্মবীর মুসল-মানের সহিত সমরকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা দেশ হইতে

নানা পথে খৃষ্টজন্মভূমির উদ্ধারসাধনার্থ সমরক্ষেত্রে মিলিত হইবার জন্য যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, বা যুদ্ধান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন ইউরোপীয় জনসমাজ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবীর-রূপেই পূজা করিতে ধাবিত হইত। এই সকল ধর্ম্মবীরদিগের মধ্যে পর্ত্তুগালের ধর্ম্মবীরগণ বিশেষ সমরনৈপুণ্য লাভ করিয়া, ইউরোপের সকল দেশেই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ইস্‌লাম-বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল, তাঁহাদের ধর্ম্মোন্মাদ স্বদেশপ্রীতির সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যেখানে মুসলমান, সেইখানেই পর্ত্তুগালের ধর্ম্মবীরগণ অসিহস্তে ধাবিত হইবার জন্য লালায়িত; মুসলমান-নিপাত-সাধনই যেন তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বারাধ্য মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল! তাঁহাদের ধর্ম্মোন্মাদের পুরাকাহিনীর কীর্ত্তন করিতে হইলে, আধুনিক ইতিহাসলেখকবর্গও ইহার উল্লেখ করিয়া থাকেন।* পর্ত্তুগালের স্বদেশবৎসল সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক পর্ত্তুগালের রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তারের মূল কারণ বিবৃত করিবার সময়ে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"যাঁহারা ধর্ম্মার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পবিত্র শোণিতেই রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তার সুসম্পন্ন হইয়াছিল।"† মুসলমান-বিজয় সুসম্পন্ন হইলেও, এই ধর্ম্মোন্মাদ সহসা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। নিকটের মুসলমান বিজিত হইলে, দূরের মুসলমানকে জয় করিবার জন্য, এবং মুসলমানের অনধিকৃত রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবল উৎসাহ প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা প্রজা সকলেই তাহার জন্য অর্থদান করিতেন; বীরপুরুষগণ আহূত হইবামাত্র ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন-বিসর্জ্জন করিবার জন্য সগর্ব্বে ধাবিত হইতেন; কখন বা নিতান্ত তুচ্ছকারণে যুদ্ধকলহের সৃষ্টি করিয়া, জীবন্মুক্তিলাভের সহজ পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যাকুলতা-প্রদর্শন করিতেন!

---

* In the stern school of adversity the latent energies of the race had been gradually developed. Religion, or rather religious fanaticism was the inspiring principal, the very main-spring of every movement, of every heroic exploit. Their wars were rather *Crusades* than patriotic struggles. They fought the Moor rather as an enemy to the faith, than as the invader of their country.—*Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. D'Orsey. B. D.*

†"The Kingdom was founded in the blood of Martyrs and by Martyrs was spread over the globe."—*De Barros.*

তৎকালে স্পেন্-পর্ত্তুগালের অপর পারে আফ্রিকার উপকূলে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভূমধ্যসাগরেও মুসলমান-রণতরণী জলপথে আধিপত্য বিস্তার করিত। মুসলমান-বিদ্বেষ যেমন স্থলপথে ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন-বিসর্জ্জন করিবার জন্য ইউরোপকে উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইরূপ জলপথেও রণতরণী সজ্জীভূত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। পর্ত্তুগাল অল্পদিনের মধ্যেই জলপথেও প্রবল হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগালের প্রথম রণতরণী নির্ম্মিত হইল। ইউরোপীয় জনপদনিচয়ের মধ্যে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াও, পর্ত্তুগাল জলে স্থলে বৃহৎ বিজয়-গৌরব-লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ পর্ত্তুগালের এই অসাধারণ কৃতিত্বলাভের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া, তাহার মূলে ইংলণ্ডের সংস্রব থাকা ব্যক্ত করিবার জন্য, নানা ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মবীরগণ কখন কখন পথিমধ্যে বিশ্রামলাভার্থ কিছুক্ষণের জন্য পর্ত্তুগালে অবতীর্ণ হইতেন; তাঁহারা কখন বা ধনুর্বাণহস্তে পর্ত্তুগালের প্রজাবৃন্দের পক্ষাবলম্বন করিয়া মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতেন; রাজকুমার হেন্‌রীর জননী ইংলণ্ডের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—এই সকল পুরাতত্ত্বের উল্লেখে পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়ের মূলে ইংলণ্ডের প্রবল প্রভাব আবিষ্কার করিবার জন্য যাঁহারা ইতিহাসরচনা করিতেছেন, তাঁহারা ইংরাজ। ইহাতে তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি অভিব্যক্ত হইলেও, ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধির প্রাখর্য্য অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। *

পর্ত্তুগাল ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার ক্ষুদ্রতার মধ্যেই প্রবল শক্তি-বীজ গুপ্ত-ভাবে বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে কেবল ধর্ম্মোন্মাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; পর্ত্তুগালের ধর্ম্মোন্মাদের সহিত স্বদেশপ্রীতিও মিলিত

* The English alliance formed the key-stone of the policy of John the Great. The friendship of Portugal and England had, indeed, been of slow and solid growth. Towards the close of the twelfth century a body of London crusaders halted on their way to the Holy Land to help the Portuguese against the Moors. The end of the thirteenth and beginning of the fourteenth centuries found king Diniz. 'The Labourer" in close correspondence with our Edwards I and II. &c &c.—*Sir W. Hunter's History of British India vol. I. 58.*

হইয়াছিল। পর্ত্তুগালের স্বদেশ-বৎসল ইতিহাস-লেখকের মতে ধর্ম্মবীরগণের আত্মোৎসর্গই পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক মূল-সূত্র। তাহা কেবল অপরাজিত অধ্যবসায়ের বিজয়-কাহিনী। পর্ত্তুগালের আধুনিক অভ্যুদয়-কাহিনী যত সংক্ষেপে ও সরলভাবে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, প্রকৃত অভ্যুদয় তত সংক্ষেপে বা সরলভাবে সাধিত হইতে পারে নাই। তাহার জন্য আল্‌ফন্‌সো নামধেয় তিন জন নরপতি দীর্ঘকাল কেবল পূর্ব্বসূচনার সূত্রপাত করিয়াই জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাঙ্কো ও ডিনিজ নামধেয় নরপালদ্বয়ের সময় কৃষি-শিল্পবাণিজ্যের সমুন্নতিসাধন-চেষ্টায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। চতুর্থ আল্‌ফন্‌সো নামধেয় নরপালকে স্পেন-পর্ত্তুগালের গৃহকলহ শান্ত করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া জীবনক্ষয় করিতে হইয়াছিল। এই সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিলেও, পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়-পথে আরও অনেক প্রবল বিঘ্নবাধা বর্ত্তমান ছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্মযুদ্ধার্থ উৎসাহদান করিতেন; সামন্তগণ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, ধর্ম্মার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিতেন;—এই উভয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই, নরপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারা রাজশক্তিকে গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইয়া, পর্ত্তুগালে যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত করেন, তাহাতেই পর্ত্তুগালের সকল আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইত। পতিত জাতির অভ্যুদয়লাভের পথে যাহা কিছু বিঘ্ন বাধা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, পর্ত্তুগালের পক্ষে তাহার অভাব ছিল না। কে কাহাকে মানিতে চাহিত? মুসলমানবিদ্বেষ কেবল ধর্ম্মযুদ্ধকালেই সকল পক্ষকে সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এক পথে পরিচালিত করিত। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর, সকলে স্বস্বপ্রধান হইয়া, রাজশক্তির সর্ব্বাংশে অবমাননা করিতে ত্রুটি করিতেন না। খৃষ্টীয় ১৩৮৫ অব্দে আল্‌জুবারোটার সমর-ক্ষেত্রে রাজশক্তি জয়-যুক্ত হইয়া, পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়লাভের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। পর্ত্তুগালের ইতিহাস-বিখ্যাত জন-দি-গ্রেট এইরূপে রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা-সংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইলে, পর্ত্তুগালের ইতিহাস জগদ্বিখ্যাত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত না। *

---

* Yet all the efforts of the Kings, though occasionally Successful, failed to curb the turbulance of the feudatories till the battle of Aljubarrota in 1885, gained by John I. over the rebels, effectually crushed insubordination, and restored the dignity of the Crown.—*Dialogos-de-varia-Historia.*

জন-দি-গ্রেট যথার্থই চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। তাঁহার সুদৃঢ় শাসন কিঞ্চিদূন অর্দ্ধশতাব্দীকাল পর্ত্তুগালকে ভূমণ্ডলের সকল প্রদেশেই সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই নরপতি ১৩৮৫ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি যখন সিংহাসনে পদার্পণ করেন, তখন তরুণজীবন। তখন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সুযোগ্য পুত্র জন-অব্-ঘণ্ট ইউরোপে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্পেন্-দেশের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেও, স্পেন্-পর্ত্তুগালের গৃহকলহে পর্ত্তুগালের পক্ষাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সে কলহের অবসানে জন্-দি-গ্রেট পর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করিলে, জন্-অব্-ঘণ্টের দুহিতার সহিত তাঁহার পরিণয়-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় রাজ-কুমার ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে দুহিতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে পর্ত্তুগালে উপনীত হইয়া কন্যা-দানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন! স্পেন্-পর্ত্তুগালের অধীশ্বরদ্বয় তাঁহার জামাতৃদ্বয় বলিয়া মনোনীত হইবামাত্র, শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই বিবাহ-সূত্রে স্পেন্-পর্ত্তুগালের গৃহকলহের পুরাতন সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। যে বৃটনরাজকুমারী পর্ত্তুগালের রাজমহিষী হইলেন, তাঁহার নাম ফিলিপা। তিনি রূপেগুণে রাজলক্ষ্মী বলিয়াই ইতিহাসে উল্লিখিত। তাঁহার ধর্ম্মজীবন আড়ম্বরশূন্য আত্মত্যাগের জন্যই সুবিখ্যাত। তিনি রাজমহিষী হইয়াও ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মেই জীবন-যাপন করিতেন। ইতিহাস-বিখ্যাত রাজকুমার হেন্‌রী ইঁহারই পঞ্চম পুত্র। তিনি সর্ব্বাংশে জননীর ধর্ম্মজীবনের আত্মত্যাগপ্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া, তরুণজীবনে চিরকুমারব্রত গ্রহণ করিয়া, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাই আধুনিক ইউরোপের নবজীবন-দাতার জন্ম ও বাল্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মাল্য-দান

শুক্লুল জহরলাল জীবিকার লাগি'
স্বদেশের নিরাময় জলবায়ু ত্যজি'
বঙ্গের অস্বাস্থ্য কোলে—ক্ষুদ্র পল্লীমাঝে

অজ্ঞাত ধনীর গৃহে সভয়ে সঙ্কোচে
যেদিন দর্শন দিল, সেদিন তাহার
লাঠি লোটা গালপাট্টা সম্বল কেবল!
কর্ত্তা সেকালের লোক, বনেদী ভূস্বামী,
অঙ্গনে ঘুরিতেছিলা, সঙ্গে আগে পাছে
হিন্দুস্থানী রক্ষিবর্গ; এমন সময়
ব্রাহ্মণ জহরলাল সহাস্য-আননে
ভাবী প্রভু পাশে আসি' উপবীত ছুঁয়ে
আশীর্ব্বাদ জানাইয়া দাঁড়া'ল নীরবে।
জহরের দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন
সহজ সচ্ছন্দ ভাব বিনম্র স্বভাব
লাগিল বুড়ার চোখে; সেই দিন হ'তে
জহর ধনীর গৃহে পাইল প্রবেশ।
আজ ত সে জমাদার, দলের প্রধান!
এ দিকে সে মহাজন, দশগুণ সুদে
প্রজাদের ধার দেয় আপদে বিপদে;
নিজ প্রাপ্য বুঝে লয় হিসাবীর মত;
বাকী আদায়ের লাগি' লাঠি কাঁধে ফেলি'
আপনি বাহির হয় রৌদ্র বৃষ্টি ভুলি'!
আপনা নিগ্রহ করি' ক্লেশে প্রাণপণে
আসিছে সঞ্চয় করি' কৃপণের মত;—
রূপসী ষোড়শী কন্যা আজিও অনূঢ়া
রয়েছে দরিদ্র-গৃহে; এ ভাবনা তারে
দিন দিন করিতেছে পীড়ন তাড়ন!
তদুপরি মাতা, গৃহকর্ত্রী ভ্রাতৃজায়া
দূর হ'তে প্রবাসীরে বার বার করি'
'সুরজ হয়েছে বড়' স্মরণ করায়ে
দিতেছে গঞ্জনা।
কোথায় পণের কড়ি?
সে দুর্ম্মূল্য আজিও ত হয় নি সঞ্চিত!

কে বুঝে সে কথা ? অভাবের অভিযোগ
ধৈর্য্যক্ষমাহীন।

পাঠক, পশ্চিমে চল ;
ভগ্ন তনু, রুগ্ন মন বাঙ্গালিনী ছাড়ি
দেখে আসি কবিচিত্র মানবের ঘরে
রূপের সার্থক স্বপ্ন—তরুণীর ছবি,
স্বাস্থ্য-উদ্ভাসিত কান্তি সজীব হৃদয় !
দেখে আসি, একাকিনী কেমনে সুরজ
গম ভাঙ্গে গুঞ্জরিয়া মধুর কজরী ;
সুখস্পর্শে হর্ষভরে কাকলী করিয়া
মর্ম্মে মর্ম্মে চরিতার্থ, ঘুরিতেছে জাঁতা ;
কাঁকন বাজিছে তালে, নাচিছে বেশর,
আঁটা-কাঁচলীতে আঁটা বক্ষ দুলিতেছে,
কালো কেশ এলো হ'য়ে পড়েছে ছড়ায়ে !
অড়হর-শীর্ষগুলি কাঁপায়ে তখন
ফিরিছে পশ্চিম বায়ু ; আহীর-বালক
গৃহ-মহিষের পাল চরাইছে গোঠে,
মন ঘুরিতেছে, যেথা শিশু বৃদ্ধ মিলে
ফাঁদ পাতি বসি' আছে ধরিতে বুল্‌বুল্ !
—থামিল কজরী ; লুণ্ঠিত নিচোলবাস
সরমে আকুল হ'য়ে এলো কেশপাশে
চাহিল লুকাতে।

প্রতিবেশী বংশীলাল
কখন দাঁড়াল আসি নিঃশব্দচরণে ;
বিমুগ্ধ দেখিতেছিল পাদপদ্মতলে
তুচ্ছ গম ব্যর্থ জন্ম করিছে সার্থক
আপনারে চূর্ণ করি'। চারি চক্ষে হ'ল
চকিতে মিলন দীর্ঘ বিরহের তরে ;
ধীরে ফিরে চলে গেল যুবক নীরবে।
উল্লাস-তরল-কণ্ঠে তৃপ্তি-সুখোচ্ছ্বাসে

মধ্যাহ্নেরে বিদ্ধ করি' অদূরে মধুরে
কে ওই উঠিল গাহি' গজলে সহসা
মিলনের আবাহন অভিমান ভরা ?
যুবতী হাসিয়া পুন ধরিল কজরী
মৃদুস্বরে। ধীরে ধীরে এলো কেশ হ'তে
নিচোল পড়িল খসি'; বুঝি সাথে সাথে
কর্ম্ম হ'তে মনটিও পড়েছে খসিয়া !
দূর হ'তে দূরান্তরে সঙ্গীতের তান
হইল করুণতর; যেন গায়কের
তপ্তঅশ্রুভারাক্রান্ত অব্যক্ত হৃদয়
রসালমৃণাললোভী মরালের মত
বাঞ্ছিতেরে বেড়ি' বেড়ি' লাগিল কূজিতে !
সেই সুরে সেই ছন্দে সেই তান-লয়ে
কি মিনতি কি বিনতি, ব্যাকুল প্রকাশ
ক্রমে ক্ষীণ—ক্ষীণতর সঙ্গীতের রেখা
শূন্যে মিলাইয়া গেল স্বপনের মত !
যুবতী উঠিয়া, গৃহে পশিল নিশ্বাসি'।
বংশীলাল একমাত্র যুবা বংশধর
নিরভিভাবক, শূন্য সম্পন্ন-গৃহের।
সহৃদয় রঙ্গপ্রিয় সদানন্দ মন,
তবু শিশুটির মত সরল নির্ম্মল।
তিতির লড়ায়ে আর তোতারে পড়ায়ে
ধনীর দুলাল এই দোবে-নন্দনের
স্বচ্ছন্দে কাটিত দিন। নিদাঘ-নিশায়
গৃহে গৃহে শয্যাগুলি পড়িত বাহিরে,
জ্যোৎস্নাযামিনীর সেই প্রশান্ত নিশীথে
বংশী বাজাইত বাঁশী নিজ গৃহে বসি';
নীরবে শয্যায় পড়ি' মোহিতা সুরজ
করিত শ্রবণ ভরি' স্বরসুধা পান,
স্বপনে স্বপনে দিত নিশি কাটাইয়া!

কত দিন কত মিষ্ট বসন্তপ্রভাতে
যখন আমের বাগে পশি' মত্ত বায়ু
সুঘ্রাণ উড়ায়ে দিত, শাখা-অন্তরালে
যুগ্ম বন-কপোতের প্রথম কূজন
আসিত সমীরে ভাসি'। বংশী সাধ ক'রে
আসিত আপন ক্ষেতে 'জনার' তুলিতে।
সেই ভোরে আম-বাগে বাজিত ঘুঙ্গুর,
উড়িত কেশের সাথে মিশি' নীলাম্বরী,
ঝরা-আম কুড়াইতে এসেছে সুরজ,
যত করে, নাহি ভরে অবাধ্য আঁচল!
এইরূপে দুই জনে মাঠে ঘাটে বাটে
চকিতে মিলন হয়। কভু সে মিলন
শুধু মিষ্ট-অনুভূতি অব্যক্ত প্রাণের;
কভু চোখে চোখে শুধু প্রশ্ন সুগভীর;
কভু হাস্যবিনিময়! কিন্তু কোন দিন
এ অপূর্ব্ব যুগলের প্রেমের মন্দিরে
ভাষার মঙ্গল-শঙ্খে বাজে নি আরতি!
তবু দোঁহে প্রাণে প্রাণে কত আপনার!
মূক-প্রেম ধরা দেয় মৌনী প্রকৃতির
নিঃশব্দ ইঙ্গিত সম শান্ত মহিমায়;
ভাষা সে প্রকাশাতীত রহস্যে পশিয়া
আপনারে করি' তোলে জটিল আবিল!
এ দিকে পণের মুদ্রা হ'ল যবে জড়,
প্রবাসী জহরলাল চলিল স্বদেশে।
পথে দু' একটি তীর্থে লভিয়া বিশ্রাম
সুকৃতি সঞ্চয় করি' হ'ল অগ্রসর;
নিজ পল্লীসন্নিকটে লব্ধ-আশা সম
অধীর বাষ্পীয় রথ থামিল যখন,
জহর নিশ্চিন্ত সুখে ফেলিয়া নিশ্বাস
নামিয়া পড়িল ত্রস্তে। গৃহ-অভিমুখে

চলিল চঞ্চলপদে ; আনন্দ-চপল
মন তার কোন্ কালে চলে গেছে ঘরে!
স্বদেশের মায়ামাটী মায়াকাটী সম
পরশি' জাগায়ে দিল সুপ্ত কল্পনারে ;
মনে এল কত কথা ; কত প্রিয় মুখ!
সেই মাতৃহীন মেয়ে! বংশের প্রদীপ,
একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র অভিরাম শিশু!
জহর কন্যারে ডাকি' প্রবেশিল গৃহে ;
সুরজ সে স্নেহাহ্বানে ব্যাকুল বিস্ময়ে
বহুক্ষণ পারিল না কহিবারে কিছু!
বৃদ্ধা মাতা কাছে বসি' প্রৌঢ় শিশুটিরে
সানন্দে কম্পিত কর লাগিলা বুলাতে ;
ভ্রাতৃবধূ মৃদু হাসি' প্রীতিসম্ভাষণে
তুষিলেন প্রবাসীরে। সাত বছরের
বংশের প্রদীপ সরি সংশয়ে সঙ্কোচে
ভীত কৌতূহলী নেত্রে আগন্তুক পানে
রহিল চাহিয়া! শেষে একান্ত নির্ভয়ে
স্নেহাদরে ধরা দিল নিমেষের মাঝে।
মুহূর্ত্তে বৈচিত্র্যহীন দীনের কুটীরে
নীরব উৎসবস্রোত লাগিল বহিতে।
সহসা জহরলাল মুমূর্ষুর মত
উঠিল বিবর্ণ হ'য়ে ; প্রাণ হ'তে স্নেহে
বাঁচায়ে এনেছে যাহা দীর্ঘ পথ হ'তে,
সেই চিরকষ্টার্জ্জিত পরিপূর্ণ থলি
কোন্ অসতর্ক ক্ষণে এসেছে হারায়ে!
কিছুক্ষণ নিরুদ্দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
ঘুরিয়া জহরলাল ফিরে এল ঘরে।
মিলনকৌতুকদীপ্ত প্রবাসীর গৃহ
একেবারে হ'য়ে গেল বিষাদমলিন।
জ্বলিল না সন্ধ্যাদীপ আর ; পিতা পুত্রী

আর দুটি সমদুঃখী বিলাপিনী নারী
অনাহারে সে রজনী করিল যাপন।
পরদিন অপরাহ্নে বংশীলাল আসি'
বয়োবৃদ্ধ জহরের পাদস্পর্শ করি'
বসিল নিকটে। রহিল সে মিতভাষী
বহুক্ষণ অন্যমনে চিন্তায় বিভোর;
অবশেষে স্থান কাল কিছু নাহি গণি'
অধীর উৎকণ্ঠাতপ্ত বিশুষ্ক অধরে
জড়িত স্খলিত কণ্ঠে আশায় নিরাশে
কহিল অ-বাক্‌পটু,—কর যদি দান
তব কন্যারত্ন দীনে, করিবে উদ্ধার
উদাসীন লক্ষ্যহীন একটি জীবন!—
রত্নলোভী দুরাকাঙ্ক্ষ কাঙ্গাল, দাতারে
জানায়ে বাঁচিল যেন মর্ম্মের প্রার্থনা!
আপনার ভাবে ভোর, সরল-উৎসাহে
সে সংসার-অনভিজ্ঞ লাগিল কহিতে,—
ভাবিও না পণ লাগি'; আমি ঘৃণা করি
শুল্ক লয়ে শোণিতের আদান প্রদান!—
না বুঝি' জহরলাল উত্তরিল রোষে,—
দু'দিনের অর্থবল, হে ধৃষ্ট বালক,
তারি এত অহঙ্কার! চাহিছ ঘুচাতে
চিরন্তন কুল-দৈন্য? পঙ্গু নহি আমি,
জানি আমি আপনাতে করিতে নির্ভর;
তব অযাচিত কৃপা রাখ তুলে কোন
পরমুখাপেক্ষী তরে, দাম্ভিক যুবক!
ক্ষোভে রোষে যুবকের ফুটিল না কথা,
হ'ল মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ; অমনি স্মরণে
ভাসিয়া উঠিল কার মোহিনী প্রতিমা;
সেই চিরসুধাময়ী কৃপা-নির্ঝরিণী
সে কি হতে পারে এই পাষাণের মেয়ে!

শুদ্ধ বালকের মত, বদ্ধ পাগলের
প্রায়, অকস্মাৎ প্রলাপ উচ্চারি' শূন্যে
দ্রুতপদে হ'ল যুবা গৃহের বাহির।
গৃহে গিয়া আদরের পোষাপাখীগুলি
দিল উড়াইয়া সব; সেই প্রিয় বাঁশী
কত উৎসবের দিনে, স্তব্ধ অবসরে,
কত মধুযামিনীর জ্যোৎস্নায় মিশিয়া
খুলেছে যে হৃদয়ের নিরুদ্ধ দুয়ার,
কত গজলের তানে আকুল আহ্বানে
হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে ফিরিয়াছে সাথে,
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তারে নির্ম্মমের মত!
দ্বার দিয়া শয্যা'পরে লাগিল লুটিতে!
দুঃখছায়াস্পর্শহীন একান্ত ভঙ্গুর
পেলবজীবনবৃন্তে প্রথম আঘাত,
এই প্রবল আঘাত! বহুক্ষণ পরে
বাহিরিল দ্বার খুলি' অভিমানী যুবা
বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখ, যেন ঘনঘোর
সদ্য ঝঞ্ঝারণ-শান্ত গম্ভীর গগন!
দুই মাস গেল চলি'। এই দীর্ঘ দিন
সুরজেরে বংশীলাল দেয় নাই দেখা;
এক দিন সুরজেরে নিভৃতে পাইয়া
জানা'ল সকল কথা। সেদিন প্রথম
দুটি রুদ্ধ বাসনার নিঃসহ উত্তাপ
বিষাদের অশ্রুজলে পূত প্লুত হ'য়ে
মূর্ত্তি ল'য়ে ধরা দিল ভাষার বন্ধনে।
কহিতে লাগিল যুবা,—জানিও, এ দেহে
যতদিন এক বিন্দু বহিবে শোণিত,
পারিব না তব আশা করিবারে ত্যাগ,
দুরাশারে বুকে করি' করিব পালন!
শোন, যাহা স্থির ক'রে আসিয়াছি আজ,

তোমার পিতার সাথে কাল উষাকালে
করিব বিদেশযাত্রা, তোমারি লাগিয়া
দীর্ঘ প্রবাসের মাঝে রহিব বিলীন
তোমাহারা অন্ধকারে। ফিরিব যখন
তোমার পিতার মন করি' অধিকার
তোমারেও পাব না কি চির-অধিকারে?
কিন্তু তার আগে তুমি কর অঙ্গীকার,
যাবৎ না ফিরি আমি, রহিবে আমারি?
দেহে মনে ততদিন কেবল—আমারি?
হারাবে না আপনার কুমারী-গৌরব
মিষ্ট ছল কিংবা রুষ্ট বলের নিকটে?
উত্তরিল দৃঢ়স্বরে প্রেমগর্ব্বস্ফীতা,—
করিলাম অঙ্গীকার। কহিল যুবক,—
হাতে হাত দিয়ে ওই চন্দ্রপানে চাহি'
করহ শপথ তবে, ভুলিবে না কভু
এই শান্ত রজনীর নিস্তব্ধ বাসরে
উঠিল নক্ষত্রলোকে যে মিনতি মোর!—
ভুলিব না অঙ্গীকার।—কহিল যুবতী।
সেই প্রথম পরশ; রহিল স্তম্ভিত
করপুটে করপুট, গগনবিহারী
মিলন-উৎসুক দুটি মেঘের মতন!
মুহূর্ত্তে বহিয়া গেল তাড়িত-প্রবাহ
দুটি থর-থর দেহে। মাথার উপরে
চকোর উড়িতেছিল; বহিয়া আসিল
গ্রামের নেপথ্য হ'তে কোকিলকাকলী;
আসন্নবিরহত্রাসে দুটি মুগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেক বিহ্বল রহি', স্বপ্ন হইতে জাগি'
মৃগমিথুনের মত সচকিত হ'য়ে
দুই জনে দুই পথে দ্রুত গেল চলি'।

তার পরে যথাকালে প্রতিবেশী দুটি

সুদূর প্রবাসে এল। কবে ধীরে ধীরে
বংশী প্রৌঢ়-জহরের অশ্রান্ত সেবায়
আপনারে সঁপি' দিল ভক্ত ভৃত্য সম।
পাকশালে প্রবেশিয়া পাইত জহর
যথাস্থানে রন্ধনের উপচারগুলি,
দেখিত শয়নকালে শয্যা আছে পাতা!
প্রথম ধনীর হাতে হেন সেবা নিতে
ব্যস্ত সঙ্কুচিত হ'ত দরিদ্র জহর;
সনির্ব্বন্ধে বংশীলালে করিত বারণ।
ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের অজ্ঞাত নেশায়
সঙ্কোচের গুরুভার লঘু হ'য়ে এল,
কৃতজ্ঞতা শুষ্ক হ'য়ে প্রভুত্বে দাঁড়া'ল
পরুষ কঠিন হ'য়ে। যুবা ধৈর্য্য ধরি'
সহিতে লাগিল সেই অন্যায় বিচার।
জহর পড়িল রোগে। দীর্ঘ দিন ধরি
রোগীর নিঃসঙ্গ ক্লিন্ন রোগশয্যাপাশে
অবহিত শুশ্রূষায় নিপুণ সেবায়
লগ্ন মগ্ন হ'য়ে ছিল যুবা বংশীলাল।
জহর নীরোগ হ'য়ে কহিল সস্নেহে,—
শোধিতে নারিব কভু তোমার এ ঋণ!
বংশীর অন্তর হ'তে কি যেন প্রার্থনা
সহসা ফুটিতে চেয়ে রহিল নীরব।
নববর্ষ এল বঙ্গে। এবার জহর
কন্যা-বিবাহের লাগি' হইল ব্যাকুল;
আপন সঞ্চিত অর্থ মিলিল যখন
প্রভুর সদয় দানে, ভাবিল জহর,
কোনমতে শুভকর্ম্ম হ'য়ে যাবে শেষ।
স্বদেশযাত্রার দিন স্থির করি' শেষে
কহিল সে বংশীলালে,—চল, একসাথে
যেমন এসেছি দোঁহে, ফিরি সেইরূপে।

বংশী নতজানু হ'য়ে কহিল বিনয়ে,—
সকলি তোমার হাত! যদি দাও আশা,
তবেই ফিরিব ঘরে! নহে এই শেষ!
অকস্মাৎ জহরের পা দুটি জড়ায়ে
ঝর্ ঝর্ অশ্রুজলে লাগিল ধোয়াতে।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষে নীরব মিনতি
প্রহত হইতেছিল কঠিন প্রাচীরে!
কহিল জহরলাল,—ছাড় তার আশা;
ধিক্ যুবা, এই তব বলের বড়াই?
ছিঁড়িতে পার না ক্ষীণ একটি বাঁধন?—
বালকের মত যুবা সাধিল, কাঁদিল।
অটল জহরলাল।—সহসা বঞ্চিত
উঠিয়া, ক্ষিপ্তের প্রায় খর-দৃষ্টি হানি'
চলে গেল কক্ষ হ'তে, অস্ফুট-ভাষায়
উচ্চারিয়া অভিশাপ মর্ম্মান্তিক খেদে,—
যাও, যাও; এই স্পর্দ্ধা এ কঠিন পণ
একটি কুসুম-করে চূর্ণ, দেখে এস!
তখন এ অনাদৃতে আসিবে সাধিতে!
　　এ দিকে জহরলাল ফিরে এল দেশে;
শুভদিনে শুভক্ষণে শেষে একদিন
জহরের নির্ব্বাচিত সুসজ্জিত বর
আনন্দ বিশাল আর জ্বলন্ত মশাল
অন্তরে বাহিরে ল'য়ে, ধীরে বাহিরিল
সচকিত পল্লীপথে কন্যামৃগয়ায়!
দস্যু যেন প্রবেশিছে গৃহস্থের ঘরে,
পশিল সদলবলে বিবাহ-প্রাঙ্গণে!
একটি বিহ্বল আর্ত্ত নারী-হৃদয়ের
সমস্ত গৌরবগর্ব্ব আশা শান্তি সুখ
দস্যুরি মতন বলে লইল লুটিয়া!
　　যথাকালে কর্ম্মস্থলে ফিরিল জহর।

ললাটের ঘর্ম্ম মুছি' ঝোলা-ঝুলি রাখি'
বংশীলালে হেরি' কাছে কহিল নিশ্বাসি',—
এতদিনে পরিত্রাণ!—ঘরের লক্ষ্মীরে
দিয়েছি পরের করি' জনমের মত!
প্রৌঢ় একবিন্দু অশ্রু ফেলিল মুছিয়া!
যুবা দেখিল না তাহা, তখন তাহার
বিমথিত হৃদয়ের প্রচণ্ড বিপ্লবে
একদণ্ডে বিশ্বভূমি হ'য়ে গেছে লয়।
উত্তপ্ত বেদনাক্লিষ্ট মাথার ভিতরে
প্রলয়ের শঙ্খনাদ হতেছে সঘনে!
একবার মনে হ'ল, নিষ্ঠুর জহর
করিয়াছে পরিহাস! দেখিল চাহিয়া,
সে মুখ অম্লান স্থির চাতুরীবিহীন।
বৃশ্চিকদষ্টের প্রায় সহসা ছুটিয়া
উপাধানে মুখ ঢাকি' কহিতে লাগিল
গুমরি' আপন মনে,—ওরে উপাধান,
ওরে মোর চির-সাথী আজন্ম-আশ্রয়,
তোর কোলে মাথা রাখি' সোনার শৈশবে
দেখেছি সোনার স্বপ্ন; কৈশোরে যৌবনে
কত আনন্দের দিনে একান্তে নীরবে
তোর বুকে লুকায়েছি অধীর উচ্ছ্বাস
উচ্ছল সুখের! দুর্দ্দিনে আহত সম
কতবার তোর বুকে লুকায়েছি মুখ!
ওগো লজ্জনিবারণ, আজ ঢাক মোরে
বাহিরের কৌতূহলী খর-দৃষ্টি হ'তে!
হে দুঃখ, হে প্রিয়, তোর ব্যর্থ অশ্রু দিয়ে
করিব না অবমান। নিব প্রতিশোধ;
তার পরে এস তুমি অনন্ত অপার
হতাশের চির-সাথী হে মৌন-রোদন!
মনে হ'ল, বিশ্বমাঝে যত নারী আছে

সবাই প্রলয়ঙ্করী ; সবাই পাষাণী ;
দেবী ব'লে পূজা পায় মূঢ়ের নিকটে !—
হা পুরুষ, প্রাণভরা অভিমান ল'য়ে
এস না বুঝিতে তুমি রমণী-হৃদয় !
স্বজন সমাজ আর ধর্ম্মেরে লঙ্ঘিয়া
নারী যবে ভালবাসে, আপনার কাছে
থাকে যে সে অপরাধী ; শুষ্ক কর্ত্তব্যেরে
দ্বিগুণ আবেগে তাই ধরে সে আঁকড়ি' !
প্রাণ দিয়ে প্রাণাধিকে ভাণমাত্র ল'য়ে
শূন্য দেহ ডালি দেয় সংসারের পায়।
প্রথম ভাবিল যুবা, যোগ্য প্রতিশোধ,
রূপসী বিবাহ করি তারে বিস্মরণ।
পরক্ষণে মনে হ'ল, দু'বার কি কেহ
পারে ভালবাসিবারে ? তবে কেন মিছে
একটি কোমল প্রাণ করিব নিষ্ফল ?
শেষে যাহা হ'ল স্থির, তার ফলে যুবা
জানিল, প্রেমের শুভ্র তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে
সহসা গভীর পঙ্কে এসেছে নামিয়া !
সুতিক্ত ঔষধে যেন রোগীর নিকটে,
চিরপ্রেমপরায়ণ কল্পনা-প্রবণ
হৃদয়ে লিপ্সার স্পর্শ লাগিল তেমন !
শেষে তাতে শক্তি এল ; তবু তাহা যেন
প্রাণহীন শুধু এক উদাস বিলাস।
বার বার মোহঘোরে অন্ধকারাগারে
একটি সুদূর-স্মৃত দেবীর প্রতিমা
মুক্তির আলোক ল'য়ে পশিত সস্নেহে ;
বংশী তারে জোর ক'রে দিত তাড়াইয়া।
বহুদিন গেল চলি ; তবু বংশীলাল
সুরজেরে কোন মতে নারিল ভুলিতে ;
প্রেমের নিকটে কাম হারায়ে গরিমা

ছলে বলে আপনারে রাখিল জাগায়ে !
তাই জীর্ণবস্ত্রসম, এক প্রেম ছাড়ি'
নিত্য নূতনের পাছে লাগিল ঘুরিতে।
বাঁকে না সরল বাঁশ ; বাঁকালে তাহারে
থামে না সে মধ্যপথে, যাবৎ না করে
আপনারে বিনাশের অতলে নিক্ষেপ !
বারেক সরল যুবা বুঝিল যখন
অকারণে হয়েছে সে বঞ্চিত লাঞ্ছিত,
আপনারে একেবারে দিল ভাসাইয়া
দিশাহারা অন্ধকার নিপাতের স্রোতে।
কত বর্ষ গেছে চলি' ; এর মাঝে কত
ঘটেছে ঘটনা। মরেছে জহরলাল ;
কন্যার বৈধব্য তারে হয় নি সহিতে।
বিবাহান্তে তিন বর্ষ না হইতে গত
স্বরজ বিধবা হ'য়ে তপস্বিনী সাজি'
মর্ম্ম মাঝে অগ্নি জ্বালি' করিতেছে তপ,
কোন্ দেবতার লাগি ?—সুধায়ো না তাহা !
সে রহস্য থাক্ ঢাকা শোকের তিমিরে !
গুরু কর্ত্তব্যের ভরা আলোহীন পথে
অবিশ্রান্ত শ্রান্ত পান্থ বহিতে বহিতে
রঙ্গিল অতীত পানে যদি চেয়ে দেখে
বারেক, ক্ষণেক তরে, ক্ষমা নাই তার ?
পঞ্চদশ বর্ষ পরে স্বদেশের পানে
চলিয়াছে বংশীলাল ! এ কি সেই যুবা,
পবিত্র সুন্দর শুভ্র প্রভাতের মত ?
এ যে রোগে অত্যাচারে ভগ্নজীর্ণ-তনু ;
পাপে তাপে অবসন্ন অকালস্থবির !
সর্ব্বশেষে যে নারীরে নির্ভর মানিয়া
করিল সে শয্যাসখী, সেও কিছুদিনে
দুই দিবসের শিশু দিয়ে উপহার

তারে ছাড়ি' বহুদেশে করিল ভ্রমণ !
বহুযত্নলালিত সেই প্রাণাধিক পুত্রে
অন্ধের যষ্টির মত বক্ষে আঁকড়িয়া
ফিরিছে সে গৃহপানে। দীর্ঘ পথ বাহি'
বাষ্পোদ্গারী রাজারথ থামিল যখন,
স্বদেশের পুণ্যভূমি ঠেকিল চরণে ;
উদাস উদ্দেশ্যহীন চলিল প্রবাসী
ধীরপদে গৃহমুখে। পথে যেতে তারে
কেহ সুধাল না ডাকি' ! ক্রূর কৌতূহলে
অজ্ঞাত অপরিচিত খর-দৃষ্টিগুলি
বিঁধিতে লাগিল তারে ! শুনায়ে শুনায়ে
ক্রীড়ামত্ত এক পাল অশিষ্ট বালক
তার পককেশ ল'য়ে ব্যঙ্গ আরম্ভিল !
পরলোকপ্রত্যাগত প্রেতাত্মার মত
অভাগা ভাবিতেছিল, কি না ছিল মোর ?
প্রেম হয়েছিল ব্যর্থ, কি ছিল তাহায় ?
পবিত্র সমাধিসম তবু যদি আহা !
আমার সে অনাবিল শুভ্র অতীতেরে
শুধু সাজাতাম, শুধু করিতাম পূজা
কল্পনার সুরভিত কুসুমে কুসুমে,
জীবন কাটিয়া যেত সৌরভে গৌরবে !
আমার অতীতে কই স্মৃতির সুঘ্রাণ ?
আজ কিছু নাই মোর ; কেহ নহি আমি !
সজীব সরস এই জনস্রোতঃপ্রবাহে
কি বাহুল্য কি নীরস অস্তিত্ব আমার !
এই কর্ম্মকোলাহলে মত্ত লোকালয়ে
কত স্ফূর্ত্তি, কত মূর্ত্তি, কত আয়োজন
নব নব আনন্দের ! কোথা আছি আমি ?
সকলি বিভিন্ন এ যে সকলি নূতন !
হায় হায় পুরাতন, হায় পরিত্যক্ত

হে আমার জন্মভূমি, তুমি কি গো সেই ?
বল বল কোন্ দোষে, যে মোহিনী বেশে
রাখিয়া গিয়াছি তোমা বিদায়-প্রভাতে,
কেন দেখিলাম আজি মিলন-সন্ধ্যায়
রূপহীনা বর্ষীয়সী তোমারে রূপসী !
শৈশবের সুখ-স্বপ্ন, শৈশবের সাধ,
যৌবনের লীলাগার, প্রৌঢ়ের স্মরণ,
তুমি সেই জন্মভূমি !—আন্, ফিরে আন্
তোর সাথে সেই দিন ! সেই প্রিয় মুখ,
সেই হাসি, সেই বাণী, সেই গল্প-ভাঙ্গা,
মায়ামৃগ ধরাধরি স্বপন-গহনে !
বালকেরে ক্রোড়ে ল'য়ে আবিষ্টের মত
দৌড়িতে লাগিল প্রৌঢ় ; যেন কারো সাথে
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে নাহি হ'বে দেখা !
যখন থামিল পদ, দেখিল চাহিয়া,
জহরের গৃহাঙ্গনে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
বুঝিতে নারিল, কোন্ ঝঞ্ঝার আবেগ
দিশাহারা জলমগ্ন নাবিকের মত
আনিয়া ফেলেছে তারে পরিত্যক্ত কূলে !
এসেছিল পিত্রালয়ে দেখিতে সুরজ
পীড়িত পিতৃব্যপুত্রে ; আজ ফিরে যাবে
পুন পতিগৃহে। শিবিকা প্রস্তুত দ্বারে ;
সুরজ অঙ্গনে ছিল, কারে দেখি' যেন
উঠিল সে চমকিয়া,—এ যে সেই মুখ !
আগন্তুক একদৃষ্টে চাহি কিছুক্ষণ
সহসা উঠিল ডাকি',—সুরজ ! সুরজ !
হা স্ফুটন্ত লাবণ্যের জীবন্ত সমাধি !—
অশ্রুহীন বিষাদের নিবিড় ছায়ায়
একান্তে মিলিল দুটি প্রবীণ প্রবীণা !
দোঁহে চিরপরিচিত, তবু দুই জনে

কি বিচ্ছেদ ব্যবধান আজ কায়-মনে ;
কি অন্তর কি বিচ্ছিন্ন দুটি নরনারী !
একটি গোলাপটিরে যত্নে তুলে রাখ,
শেষে পঞ্চকাল পরে পূর্ব্ব-স্মৃতি ল'য়ে
দেখ তারে, যত দেখ, যত লও ঘ্রাণ,
কিছুতে সে আদর্শের নাহি পাবে দেখা ;
মনে হবে, যেন কোথা—কত দূর এসে
অতীতের মায়া-সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেছে !
    সুরেজ সঙ্কেত করি' গৃহের সকলে
কহিল, রহিতে দূরে। নিভৃতে নীরবে
মুখোমুখী দুই জন বসিল নিশ্চল,
বিরহি-যুগল আজ কি পরিবর্ত্তিত !
পূর্ব্বের আবেগ ল'য়ে স্মৃতির সেতার
যতই বাজাতে যায় প্রাণপণ বলে,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় তার, আসে না ঝঙ্কার !
দোঁহার জীবন-মেঘে তবু দুই জনে
দুই কেন্দ্রে নির্ব্বাসিত দুটি তারা সম
আছে জাগি'। আর যত গত-ইতিহাস
দুর্ভাগ্য দুঃস্বপ্ন ভ্রান্তি মিথ্যা বুঝি সব !
খুলে গেল দু' জনের হৃদয়-নির্ঝর ;
কহিল সুরজ,—মোরে করিও বিশ্বাস,
পরুষ বলের কাছে ভীরু বলহীন
ক্ষুদ্র নারী-হৃদি ল'য়ে বহু দিন বুঝি'
করিয়াছি তার পরে আত্মবিসর্জ্জন।
কেমনে কাহার সাথে হ'ল পরিণয়,
বিহ্বলা বিবশা আমি নাহি জানি কিছু।
বংশীর হৃদয়াকাশে সংশয়ের মেঘ
এক দিনে গেল নামি'। আজ বংশীলাল
বুঝিল, রহস্যময় নারীপ্রকৃতির
ভিন্ন-শালীনতা, নহে ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা।

নারীর জয়শক্তি, আত্ম-বিসর্জনে ;
নহে তাহা ব্যর্থতার বিদ্রোহঘোষণা !
তীব্রবেগে মর্ম্মোত্থিত সুপ্ত অনুতাপ
লাগিল দহিতে তারে ; জীবনের ভার
বড় গুরু মনে হ'ল ! কহিল কাতরে
অনুতপ্ত বংশীলাল,—আমি ?—হায় হায়,
এই আমি ?—আজ তব করিব বিচার ?
দশের উচ্ছিষ্টভোজী অস্পৃশ্য কুকুর
মন্দির-বাহিরে পড়ি' দীননেত্রে থাকে
শুধু কৃপা-প্রতীক্ষায় ; যা পায় প্রসাদ
দেবতার, ধন্য মানি' করে তা গ্রহণ !—
তোমার পবিত্র স্মৃতি কলঙ্কিত করি
আমি শুধু—আমি দেবী—কৃপার ভিখারী !
ধীরে ধীরে শোচনীয় আত্ম-ইতিহাস
শিশুসম অকপটে করিল প্রকাশ।
সঙ্গী বালকের পানে চাহি' অকস্মাৎ
তর্জ্জনীনির্দ্দেশে তারে দেখায়ে কহিল
পূর্ণ পিতৃগর্ব্বভরে,— এই শিশু মোর
রসাতলজাত এই শেষচিহ্নলেশ,
কলঙ্কমণ্ডিত এই নির্দ্দোষ বালক,
গরল-মথিত সুধা, আছে মোর সাথে !
দৈব-আশীর্ব্বাদ সম দীর্ঘ অভিশাপে,
করুণাকোমল কণ্ঠে কহিল সুরজ
পুলকিত চমকিত করি' বংশীলালে,—
এ নারীর প্রেম-স্বর্গে কল্পনা-নন্দনে
যে দেবতা কৃপা করি' দিয়াছিল দেখা,
অদীন অম্লানকান্তি অকলঙ্ক যুবা,
আমি ভালবাসিয়াছি সেই বংশীলালে !
চিরকাল সেই ছবি আঁকা রবে প্রাণে।
পুরুষের প্রেম—কর্ম্মক্লান্ত জীবনের

[illegible]! জান না নারীরে,
ভালবাসা জীবনের সর্ব্বস্ব তাদের।
সতৃষ্ণনয়নে চাহি' বালকের পানে
কহিল,—একটি ভিক্ষা মাগি তব কাছে,
মাতৃহীন শিশুটিরে কর মোরে দান ;
ওর স্মিত-বিভাসিত অকলঙ্ক মুখে
তোমার কিশোর-মূর্ত্তি দেখিতেছি আঁকা।
বাৎসল্য-ক্ষুধার গ্রাস কাড়িনু তোমার,
লইও না অপরাধ পূর্ব্বস্নেহ স্মরি' ;
এই ভেবে ক্ষমা দিও, স্বার্থান্ধ হৃদয়
কারো শেষ স্মৃতিচিহ্ন নারিল ছাড়িতে !
এত বলি', ক্রোড়ে টানি' বিস্মিত শিশুরে
সোহাগে আবেগে স্নেহে চুম্ব-আলিঙ্গনে
মাতৃস্নেহলালায়িত আজন্ম-তৃষিতে
করিল নিমেষ-মাঝে চির-আপনার !
বংশীলাল সকাতরে উঠিল চীৎকারি',—
পাষাণী, পাষাণ-কন্যা, আজ ভিখারীরে
তার শেষকণা হ'তে করিবে বঞ্চিত ?
এই শূন্য জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়
কি রহিল মোর ? মোর সন্ধ্যাদীপটুকু
থর থর কম্পান্বিত শত বিঘ্নপাতে
এনেছিনু বাঁচায়ে কি হারাতে এরূপে ?
আসি' বংশীলালপাশে, সাদরে স্বরজ
[illegible] কণ্ঠ হ'তে খুলি' রুদ্রাক্ষের মালা
স্বহস্তে তাঁহার গলে দিল পরাইয়া ;
ঠিক সেইক্ষণে নিকটের শিবালয়ে
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ ! চমকি' বিধবা
বালকেরে ক্রোড়ে চাপি' শিবিকায় উঠি'
রুদ্ধ করি' দিল দ্বার ; চলিল শিবিকা ;
যতক্ষণ দেখা গেল, মুগ্ধ বংশীলাল

রুদ্ধ শিবিকার পানে রহিল চাহিয়া ;
শিবিকা অদৃশ্য হ'য়, সেও মৃদুপদে
আপনার শূন্যমুখে চলিল ফিরিয়া।
সে করুণ অপরাহ্নে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
পথিকের সাথে তার স্তিমিত স্তম্ভিত
মোহময় অশ্রুময় কল্পনা-স্বপনে
উদাস স্মৃতির মত চলিল ভাসিয়া !
পথে যেতে মালাগাছি চুমি' বার বার
রাখিল মাথায় ধরি' ; কহিল আবেগে,—
আজ যাহা পাইয়াছি এ বুকের কাছে,
এ প্রাণের মাঝে, তাই ল'য়ে জীবনের
অবশিষ্ট দিনগুলি পারিব কাটাতে।
এই ক্ষমা এই দয়া এই স্নেহবলে
বিধাতার চির-ক্ষমা লইব মাগিয়া !—
এত বলি', মালাটিরে চুম্বিল আবার।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

বেদান্ত দর্শন।

অদ্বৈত মত।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় বস্তু—আর যাহা কিছু সকলই অবস্তু। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই, ইহাই স্থির হইল, তবে যে এই বিবিধবৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা আসিল কোথা হইতে ? এ জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি ? তদুত্তরে অদ্বৈতবাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন,—রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, মরীচিতে (সূর্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইতেছে। ইহা অধ্যাস—এতদ্বারা জগতের

বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। * রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে আমরা সন্ত্রস্ত হই, শুক্তিতে রজত-ভ্রমে আমরা প্রলুব্ধ হই, মরীচিতে মরীচিকা-ভ্রমে আমরা আশ্বস্ত হই; কিন্তু তা' বলিয়া সে ভ্রম, ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কারণ, যে আধারে সেই ভ্রমের 'অধ্যাস', সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সর্প, রজত, মরীচিকা—ইহারা ভ্রমের বিজৃম্ভণমাত্র; রজ্জু, শুক্তি, মরীচিই সত্য পদার্থ। এইরূপ যখনই জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞান আয়ত্ত হয়, তখনই ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগদ্-ভ্রম বাধিত হয়। তখন

* এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ,—

স্বপ্নে জাগ্রদসদ্রূপঃ স্বপ্নো জাগ্রত্যসন্ময়ঃ।

মৃতির্জন্মন্যসদ্রূপা মৃত্যাং জন্মাপ্যসন্ময়ং॥—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪।২৫।

ন কদাচন যন্নাস্তি তদ্ ব্রহ্মৈবাস্তে তজ্জগৎ।

তস্মিন্নন্যে পতন্তীমা ভ্রান্তয়ঃ সৃষ্টিনামিকাঃ॥—ঐ। ঐ। ঐ। ২৮।

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।

উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥

তস্মাদ্ ভ্রান্তিময়াভাসে মিথ্যাত্বম্ অহমাত্মনি।

মৃগতৃষ্ণা জলচয়ে কৈবাস্থা সর্গজন্মনি॥

ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রাঙ্গাত্তা তদেব পরং পদম্।—ঐ। ঐ। ঐ। ২৯-৩১।

অন্যত্র কিন্তু যোগবাসিষ্ঠ বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা সূর্য্যোদয়ে গেহে ত্রসন্তি ত্রসরেণবঃ।

তথেমে পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডত্রাসরেণবঃ॥—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২৯-৩৭।

জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য-কারিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন;—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে।

সদসৎ সদসদ্বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে।—মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৪।২২।

আদৌ অন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।—ঐ, ৪।৩১।

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥—ঐ, ১।১৭।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতা।—ঐ, ২।৬।

[বিতথৈঃ—মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাৎ—শঙ্কর।]

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই প্রতীতি থাকিবে না। * সেই জন্য প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-কার বলিয়াছেন,—

যৎ জ্ঞানং নিদ্রায়াং নিমীলতি জগৎভ্রম্‌ভোগিভোগোপমম্।

'যেমন রজ্জু-জ্ঞানের বলে সর্প-ভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে জগদ্‌ভ্রম বাধিত হয়।'

এবেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ না থাকিয়াও, আছে—এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। কিসে এরূপ হয়? তদুত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মের যে মায়া-শক্তি, সেই শক্তির দুইটি সামর্থ্য আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ-শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং বিক্ষেপ-শক্তির বলে এই জগদ্-ভ্রম-রূপ অঘটন-ঘটন সাধিত হয়। সেই জন্য তাঁহারা মায়াকে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। জগৎ নাই, অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে—মায়ার এতই সামর্থ্য। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইন্দ্রজালক্রীড়ায়ও এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐন্দ্রজালিক যখন দর্শকের নিকটে ভেল্কির বিস্তার করে, তখন ত দর্শকের মনেও প্রতীতি হয়, যেন সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে। অথচ, দৃষ্ট শ্রুত—সমস্তটাই ভ্রম; বস্তুতঃ, সেখানে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই। †

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ।—ঐ, ২।১৭-১৮।
স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ।—ঐ, ২।৩১।

* All this is not real but phenomenal ; it belongs to the realm af Avidya—Nescience and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained, * * It has been called a general cosmical Nescience. * * Shankara looks upon the whole objective world as the result of Nescience, he nevertheless allows it to be real for all practical purposes (Vyabaharatham). But apart from this concession, the fundamental doctrine of Shankara always remains the same. There is Brahman and nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy, pages, 199, 201, 202 & 209.

† সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে রাবণ ইন্দ্রজাল-শক্তিপ্রভাবে রামের মায়া-মুণ্ড ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রত্নাবলীতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মিত্র জনৈক ঐন্দ্রজালিক আকাশের শূন্যে সিংহাসন-সমাসীন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেখাইয়া দর্শককে মোহিত করতঃ অবশেষে কাল্পনিক অগ্নিভয় উৎপাদন করিয়া কারাবদ্ধা নায়িকার উদ্ধারসাধন করিয়াছিল।

এই কথা বিশদ করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রজালের এক চমৎকার ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন—শূন্যমার্গে সূত্রক্রীড়া। *

---

* এ বাজী এখনও প্রচলিত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক জন সাহেব এই খেলার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজী সাময়িকপত্রে ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইন্দ্রজালের যে কিরূপ অঘটন-ঘটন-পটুতা—তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian *fakir* but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows :—We have all heard of the wonderful trick of the Indian *fakirs* whereby a person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine. Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open—in any field or square.

The *fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and what not.

Having selected his site the *fakir* begins operations by producing a ball of string apparently from no-where, and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears from observation. To all appearances it has sailed up until it reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeaed than the *fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet of the ground to heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs and tugs remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers, climbing hand over hand of a line of cotton twine about the thickness of a large pin. up and up, higher and higher, he goes, until he also appears to vanish behind the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing, and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy ? Allah forbid ! I will teach them both ; they may not trifle with one so old and wise." That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most

অঘটন-ঘটনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই।

পাশ্চাত্য-দেশে কিছুদিন হইতে হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে। ইহা আমাদের সেই প্রচলিত যাদু-বিদ্যারই রূপান্তর। হিপ্‌নটিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও মায়ার অঘটন-ঘটন-পটুত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

---

murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently he, too, disappears. By that time his audience, European as well as Native, are gaping skywards like so many idiots. There is half a minute's absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord, It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly-cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebrae were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped.

The doctor said the *Fakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife, still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff : he had not yet received any *bakshish* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in mind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

কোন ব্যক্তিকে ‘হিপ্‌নটাইজ’ করিয়া যদি যাদুকর সংকল্প দ্বারা তাহার ভ্রম-উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাদুকর হিপ্‌নটিক-নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প রহিয়াছে; সে অমনই ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় শীত; সঙ্কল্প-মাত্রে সে অমনই শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই, বলিলেন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; সে অমনই ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ দ্বারা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এমনই সংকল্প-বলে ব্রহ্ম মায়া-শক্তি দ্বারা জীবের জগদ্‌-ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক-চূড়ামণি; ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন।

য একো জালবান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ।
সর্ব্বান্‌ লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩.১।

‘যিনি এক মায়াবী সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা পালন করেন।’

ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডের বার্‌কলি প্রথম এই মতের প্রচার করেন; পরে হিউম, মিল প্রভৃতি এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বৌদ্ধের অনুরূপ শূন্য-বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত-বাদ কিন্তু শূন্য-বাদ নহে। এ মতে জগদ্‌-ভ্রমের আধার শূন্য নহে,—ব্রহ্ম। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মই জগদ্‌-রূপে বিবর্ত্তিত হন। দুগ্ধ

On looking for traces of the recently committed tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware, only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir's* tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their audience, placing them in such mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

যেরূপ দধি-রূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়, এ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি কোনরূপে বিকৃত বা পরিণাম-গ্রস্ত হন না। তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ব্যত্যয় হয় না; অথচ তিনি জগদ্-রূপে বিবর্ত্তিত হন। ইহারই নাম বিবর্ত্ত। *

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য শূন্য-বাদ-পরিহারের উদ্দেশ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ন তাবদ্ উভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ।

অথাতো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদনমিদম্ ইতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদং হীদং সমস্তকার্য্যং 'নেতি নেতি' ইতি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণ শব্দাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনম্ ন তু ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বকল্পনা-মূলত্বাৎ * * তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ, 'জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে; কারণ, তাহা হইলে শূন্য-বাদের প্রসঙ্গ হয়। কোন পরমার্থ আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে। "নেতি নেতি" দ্বারা কার্য্যেরই প্রতিষেধ সুসঙ্গত; কারণ, কার্য্য অসৎ, কল্পিত, কথামাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয়। নেতি নেতি—"ইহা নয়, ইহা নয়"—এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য,—ব্রহ্ম যাহার আস্পদ বা আধার,—সেই কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতিষিদ্ধ হইতে পারেন না। † যেহেতু, তিনি সকল কল্পনার মূল। অতএব,

* As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.

—Max Muller's Indian Philosophy, p. 209.

† বিবর্ত্তবাদ যে শূন্যবাদ নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য ব্র. সূ. ৩।১।৩ ও ব্র. সূ. ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যেও প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real, but it is real in so far as it is phenomenal, for nothing can be phenomenal except as the phenomenon of somthing that is real. * * All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible without

ইহাই স্থির যে, ব্রহ্মে কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে; —ব্রহ্ম (যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন।'

তবে কি জগৎ স্বপ্নের মত অলীক? এ কথাও শঙ্কর স্বীকার করেন না। তিনি ৩।২।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্ মায়াময়ীতি। * * তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সংধ্যে সৃষ্টিরিতি। এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মায়ামাত্রং তু কাৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (ব্র. সূ. ৩।২।৩)। মায়ৈব সংধ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি * * তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্। * * পারমার্থিকস্তু নায়ং সংধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদ্ ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপি আত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ. ২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বং। প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাদ্ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি সংধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি। অতো বৈশেষিকমিদং সংধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।—৩।২।৪ সূত্রের ভাষ্য।

'জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি, অথবা মায়া-ময়ী সৃষ্টি? "স্বপ্নেও সত্য সৃষ্টি" এই মতের নিরাস করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন, "মায়ামাত্রন্তু" ইত্যাদি (৩।২।৩)। স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র; তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্ন-দর্শন মায়ামাত্র। সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নহে; ইহাও প্রতিপন্ন হইল।' পাছে এইমাত্র বলিলে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, 'কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে। ২।১।১৪ সূত্রে

---

the noumenal, that is without the real Brahman, it was in that sense real also, that is, it exists and can only exists, with Brahman behind it. * * It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. * * The danger with Shankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken for purely fictitious * * Maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world. (Max Muller's Indian Philosophy, pp 211, 214, 215 & 243.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires a real substratum which is Brahman just as the appearence of the snake in the simile requires the real substratum of a rope * * Buddhist philosophers held that everything is empty and unreal and that all we have and know are our perceptions only. * * Shankara himself argues most strongly against this extreme idealism and * * enters into full argument against the nihilism of the Buddhists. * * The Vedantist answers that though we perceive perceptions only, these perceptions are always perceived as perceptions of something.

Max Muller's Indian Philosophy, p- 209-11.

সমস্ত প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির প্রভেদ এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয়; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব না হইলে বাধিত হয় না। অতএব স্বপ্ন-সৃষ্টি বিশেষভাবে মায়িক।'

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ কিন্তু জগৎকে স্বপ্ন-সৃষ্টির ন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ॥
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥*

স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাণ হয়, তাহা যে মনঃ-কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাগ্রতেও দ্বৈত ভাণ নিশ্চয়ই ঐরূপ। চরাচর যাহা কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃ-কল্পিত। মন যদি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে না। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নহি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং গ্রাহকং চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকে নাস্তি। জাগ্রদপি তথৈব। পরমার্থ সদ্ বিজ্ঞান মাত্রাবিশেষাৎ।

অর্থাৎ, 'স্বপ্নে গ্রাহ্য গ্রাহক—বিষয় ইন্দ্রিয়, এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে। জাগ্রতেও ঐরূপ। উভয় অবস্থাতে বিজ্ঞানমাত্রই সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞান পরমার্থ সৎ—আত্যন্তিক সত্য।' তবেই জগতে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ সত্তা নাই। বিজ্ঞানই জগদ্-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। গৌড়পাদ এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—

জাগ্রচ্চিত্তে ক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে।—গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৬৬।

'জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অনুভবের বিষয়। তাহার চিত্ত হইতে পৃথক্ সত্তা নাই। এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিষয়), ইহা জাগ্রত দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।' যোগবাসিষ্ঠও অনেক স্থলে এইরূপ মতেরই উপদেশ করিয়াছেন;—

যস্তু চিন্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্।
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যো যথা ভাস্বরতেজসঃ।
সর্ব্বা দৃশ্যদৃশোর্দ্রষ্টুর্ব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ।—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২৯।

---

* গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা। ৪।৩০,৩১।

যথা স্থিতম্ ইদং বিশ্বম্ নিজভাবক্রমোদিতং।
ন তৎ সত্যং ন চাসত্যম্ রজ্জুসর্পভ্রমো যথা॥
মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যং অসত্যং সৎপরীক্ষিতং॥— ঐ ঐ ৪০।৪১।

'এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা (সঙ্কল্প) মাত্র। * * যেমন মরীচিকা সৌরকর ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য-দর্শন, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিখিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাবমাত্রে উদিত। ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। মিথ্যার যখন অনুভূতি হইতেছে, তখন সত্য; কিন্তু সত্যের পরীক্ষায়' অবশ্য অসত্য।'

এই মর্ম্মে প্রকাশানন্দ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,—

প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।
জ্ঞান-জ্ঞেয়-প্রভেদেন যথা স্বাপ্নং প্রতীয়তে।
বিজ্ঞানমাত্রমেবৈতৎ তথা জাগ্রচ্চরাচরম্॥
রজ্জুর্যথা ভ্রান্তদৃষ্ট্যা সর্পরূপা প্রকাশতে।
আত্মা তথা মূঢ়বুদ্ধ্যা জগদ্রূপঃ প্রকাশতে॥

'এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইহা প্রতীতিমাত্র।* যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদ্-দৃষ্ট চরাচর জগৎও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। যেমন রজ্জু দৃষ্টি-ভ্রমে সর্প বলিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধি-মোহে জগদ্-রূপে প্রতীত হয়।'

অবশ্য অদ্বৈতবাদীরা জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। ব্যবহার-ভাবে যে জগৎ সত্য, এ কথায় তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু জগৎ যে পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি।† "প্রাক্‌ব্রহ্মাত্মতা-প্রতিবোধাদ্ উপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ",—শঙ্কর। 'জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে।' কিন্তু তা বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, "একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ"। 'যে বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা একরূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ'; অর্থাৎ, যাহার কোন কালে কোন অবস্থায় বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে পারে?

---

* Its essi is percipi.

† ব্যবহার ও পরমার্থের ভেদ জার্ম্মান দর্শনের noumenon ও phenomenonএর প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ।

তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে নির্ব্বাধ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই পরমার্থ। "একত্বমেব এবং পরমার্থিকং দর্শয়তি"—শঙ্কর। 'একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যাবহারিক।' পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥

এই স্ব-প্রকাশ সংবিৎ (ব্রহ্ম) কোন কালে মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—কোনকালে উদিত বা অস্তমিত হন না।' অতএব, তিনি একমাত্র পরমার্থ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে,—সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি? কি চিহ্ন দেখিয়া আমরা চিনিয়া লইব যে, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা? তাঁহাদের মতে, যাহার বাধ আছে, সেই মিথ্যা; যাহার বাধ নাই, সেই সত্য।* পথের ধারে একগাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে আমি সেটাকে ভাবিলাম সর্প; এবং ভয়ে চকিত হইয়া পলাইতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় এক জন পথিক দীপহস্তে সেই পথে উপস্থিত হইল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম যে, আমি যাহাকে সর্প মনে করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে—রজ্জুমাত্র। তখন আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। এইরূপে আমার সর্প-ভ্রম রজ্জু-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল। অতএব, এ স্থলে আমার সর্পানুভূতি মিথ্যা বুঝিতে হইবে।

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম যে, একটা অজগর ফণাবিস্তার করিয়া ভেককুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে। কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ দেখিলাম;—সর্পরাজ তন্ময় হইয়া স্বকার্য্যসাধনে নিরত রহিয়াছেন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল। আমি তদ্দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলাম। তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এ স্থলে আমার সর্প-জ্ঞান কোনরূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বুঝিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের সহিত পরিচিত। কোন বস্তু যদি আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু এক মাস পূর্ব্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই

---

* পাশ্চাত্য দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সরও তাঁহার First Principles গ্রন্থে সত্য মিথ্যার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। যাহা persistent (নির্ব্বাধ) তাহাই সত্য।

বা কি সত্য বলিব ? এই আমার দেহ ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল না, আবার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না ; ইহা সত্য, না মিথ্যা ? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়নবিনোদন করিতেছে, আকবর বাদশাহের সময় তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোনও ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবে না ; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব ? অদ্বৈতবাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্ব্বাধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্ত্তমানে, অতীতে, কিংবা ভবিষ্যতে বাধ আছে, ছিল, বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটি অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা আমার জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে ত তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারি অবস্থাতেই নির্ব্বাধ–কোন কালে, কোন অবস্থাতে যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্মবস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব, ব্রহ্মই সত্য ;—অন্য সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ যখন মায়ামাত্র, কাল্পনিক অসত্য, তখন অদ্বৈতমতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-ব্যথা হইবে কিরূপে ? অতএব, জগতের সৃষ্টি অনেকটা "রাহো শিরঃ"—শিরোহীন রাহুর শিরঃ—এই ধরণের কথা। *

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাবঃ। বিকারজাতস্যানৃতাভিধানাৎ * * মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতনানাত্বম্।—২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য।

'ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। কার্য্য, বিকার,—অসত্য ; মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ।' তথাপি ব্যাবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির

* The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for the Vedantist. The effect is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy.

কথা বলা হইয়াছে। এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। সাংখ্যেরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত নহে। *

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, তাহাতে ও ব্রহ্মে কেবল নাম রূপের ভেদ। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। † যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিবিধ-বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদমাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়; কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ এক প্রকার, বলয়ের রূপ আর এক প্রকার, পর্ব্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার;—কেবল এইমাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ সুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যেও নাম ও রূপের প্রভেদ। কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্ব্বত, কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই জন্য বলা হইয়াছে,—

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।—ছান্দোগ্য, ৬।১।৪।

'বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ। মৃত্তিকা -ইহাই সত্য।'

অনেনৈব জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩।

'তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদসাধন করিলেন।'

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭।

'তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।'

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা।—ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১।

'আকাশই (ব্রহ্ম) নাম রূপের নির্ব্বাহক।'

* "ঈক্ষতের্নাশব্দং" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন। 'নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাৎ জগজ্জনি-স্থিতি-প্রলয়া নাচেতনাৎ প্রধানাদ্ অন্যস্মাদ্বা।

† The substance of the world can be nothing but Brahman—It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy.

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈত-মতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য। উভয়ের অবিদ্যা-জনিত ব্যাবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—পারমার্থিক (Real) সত্তা নাই। * শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্য তিনি পারমার্থিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যাবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ 'তদনন্যত্বম্' ইত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু 'স্যাল্লোক-বদ্' ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি।"—২। ১। ১৪ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত-মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মেরও পারমার্থিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যাবহারিক (Phenomenal) মাত্র। †

অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যেই জীব সেই ব্রহ্ম, তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে? সেই জন্য দেখা যায়, অদ্বৈতী নিশ্চলদাস স্বকৃত বিচারসাগর গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্টপ্রণালী নমস্কারপ্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আমিই তিনি—'সোঽহং আপে আপ' যখন—

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২। ১। ১৪। সূত্রের ভাষ্যে)—

এবমবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধ্যনুরোধী ঈশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপ-কৃত-কার্য্য-করণ-সংঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যা-ত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ; ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্ত সর্ব্বোপাধিস্বরূপ আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে * * পরমার্থাবস্থায়াম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তুক্তঃ শ্রুতাবপি ঈশ্বরব্যবহারঃ এব সর্ব্বেশ্বর এবঃ ভূতাধিপতি ইত্যাদি।

† The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedanta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It.

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold Thous, the many individuals and the immense variety of the objective world? * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience.

—Max Muller's Indian philosophy p 223.

অব্ধি অপার বরুণ যম, লহরী বিষ্ণু মহেশ।
বিধি রবি চন্দা বরুণ যম, শক্তি ধনেশ গণেশ॥

'যে সমুদ্রের—ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, সূর্য্য চন্দ্র বরুণ যম শক্তি কুবের গণেশ প্রভৃতি লহরীমাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র'—'তখন কাকু করু প্রণাম'—কাহাকে প্রণাম করিব? যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে না হয় প্রণাম কর, তাহাও সম্ভবে না; কারণ,—

জা কৃপালু সর্ব্বজ্ঞকো হিয় ধারত মুনি ধ্যান।
তাকো হোত উপাধিতেঁ মোমেঁ মিথ্যা ভাণ॥

'মুনিরা এক জন কৃপালু সর্ব্বজ্ঞ (ঈশ্বরকে) চিত্তে ধ্যান করেন বটে, কিন্তু তিনি ত উপাধির উপঘাতমাত্র—অলীক পদার্থ, মিথ্যা জ্ঞানের সৃষ্টি তাঁহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায়?' সেই সব ভাবিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অদ্বৈতবাদে উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে যাহা বুঝি, সে উপাসনা নহে। অদ্বৈতবাদীর উপাসনা,—'বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রচার'। এই উপাসনা ত্রিবিধ। অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা। সাধক যজ্ঞের অঙ্গসমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারেন। "ইদং উদ্গীথং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" 'এই উদ্গীথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম-ভাবনায় উপাসনা করিবে'—ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ। এইরূপ—"লোকেষু পঞ্চ-বিধং সমোপাসীত" (ছান্দোগ্য, ২।২।১), "বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত" (ছান্দোগ্য, ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয়। গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

অর্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কর্ম্ম ব্রহ্ম,—সাধক এইরূপে সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা। "মনো ব্রহ্ম ইতুপাসীত," 'মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে', "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে'—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপসনার মর্ম্ম এই, যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে, প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা। আত্মা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, "সোহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ভাবসাধনই আত্মগ্রহ উপাসনা। "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।
ন প্রতীকে ন হি সঃ।
ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।
আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-৬ ॥

সেই জন্য ন্যায়মালায় উক্ত হইয়াছে,—"বাস্তববিরোধাভাবাৎ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্"। 'যেহেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা কর।'

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। যত্তু উক্তম্ ন বিরুদ্ধগুণয়োরন্যোন্যাত্মত্বসংভব ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধগুণতায়া মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ।—৪।১।৩ সূত্রের ভাষ্য।

"আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধ-গুণ-ভাব মিথ্যা (মায়িকমাত্র)।"

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন জীব ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে জীবন্মুক্তির অধিকারী হন। কারণ, "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি"। শ্রুতি বলিতেছেন, 'যে যাহাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়।' অতএব, ব্রহ্মভাবনারূপ চিন্তার ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ এবং ক্রিয়মান কর্ম্মের অশ্লেষ হয়।* তাহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে। তদ্ যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।

সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে।
উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি।

* তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।
ইতরস্যাপ্যেবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু।
অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩-১৫ সূত্র।

'যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না।'

'যেমন ঈষিকা (নল) তূলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হয়।'

'তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন।'

কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের জন্য জীবন্মুক্ত দেহধারণ করিয়া থাকেন। কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না। ঐ ভোগান্তে যখন তাঁহার দেহপাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়েন।

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে।

'জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন।'

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ কর্ম্মী দক্ষিণ মার্গে ধূমযানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা উচ্চ সাধক —সগুণ-ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা উত্তর মার্গে দেবযান দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। তাঁহাদের আর আবর্ত্তন করিতে হয় না—আর মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সত্যলোকে অবস্থানকালে তাঁহারা স্বারাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

"আপ্নোতি স্বারাজ্যং আপ্নোতি মনসস্পতিং সর্ব্বে দেবা তস্মৈ বলিম্ আহরন্তি।"

"সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তে। সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা ভবতি।"

'তিনি স্বরাট হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন।'

'সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন।'

'তাঁহার সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাবিহার) হয়।'

'ব্রহ্মলোকে ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া রমণ করেন, এবং স্বেচ্ছা-ক্রমে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ করেন।'

ঐ সত্যালোকে সগুণ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, এবং মহা প্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রমমুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন।'

কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, প্রাণাত্যয় হইলে তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।

'তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; এখানেই বিলীন হইয়া যায়।' তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।

'ঐ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব স্ব-রূপে অবস্থিত হন।'

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে সগুণ ও নির্গুণ সাধনার ফলের তারতম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি * * জগদুৎপত্ত্যিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বাঽন্যদ্ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি।

'সাধকগণ সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার ফলে মনের সহিত ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন; মুক্তদিগের অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্যে) অধিকার জন্মে না।' *

ঐরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রমমুক্তি হয়। কিন্তু

বিদুষঃ ঐকান্তিকী কৈবল্যসিদ্ধিঃ। ৩,৩।৩৩ সূত্র।

'ব্রহ্মজ্ঞানীর কিন্তু কৈবল্যসিদ্ধি (বিদেহমুক্তি) হয়।'

অতএব বিদ্যাই একমাত্র পুরুষার্থ।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ।—৩।৪।১ সূত্র।

---

* তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়—কেবল সৃষ্টি স্থিতি সংহারে অধিকার হয় না।
জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্র[illegible] অসন্নিহিতাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭।

অর্থাৎ, অদ্বৈত-মতে নির্গুণ উপাসনা—যদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়—তাহাই শ্রেষ্ঠ।

কারণ, এইরূপ নির্গুণ সাধকের ক্রম-মুক্তি হয় না; জীবন্মুক্তির পর দেহপাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন।

অবিভাগো লোকবৎ।—ব্র. সূ. ৪।২।১৬।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।—ব্র. সূ. ৪।৪।২।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনে র্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম (কঠ, ৪।১৫) ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি। নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ।

'যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই হয়, হে গৌতম! তত্ত্বজ্ঞানী মুনির আত্মাও ঐরূপ হইয়া থাকে। কঠ উপনিষদের এই বাক্য ও অন্যান্য শ্রুতিবাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে) মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (নদী সমুদ্রে মিলিত হইলে যেরূপ সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়) এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিতেছে।'

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,

ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষ অকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫।

'মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায়; তখন সেই (মিলনের আস্পদ) পুরুষ, এইরূপে বর্ণিত হন। সেই জীব অকল (কল—অবয়ব-হীন), অমৃত (মৃত্যুহীন) হন।'

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন,—

'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।'

যে ব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়।*

ইহাই অদ্বৈত-বাদীর মুক্তি।

---

* মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্।—ন্যায়মালা, ৪।৪।৪। নতু তদ্ দ্বিতীয় মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। বৃহ. ৪ ৪ ২৩।

'মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।'

'তাঁহা ভিন্ন ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় কিছুই নাই, যাঁহার কামনা করিবে।'

সহযোগী সাহিত্য।

তিব্বতে বাঙ্গালী।

জানুয়ারী মাসের "ডন" নামক দ্বৈমাসিক পত্রে "তিব্বতে বাঙ্গালী" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সার-সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বাঙ্গালী জাতি কোমলহৃদয়, শান্তস্বভাব, প্রায়ই অনেকের এইরূপ অপবাদ মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলদেহ, কষ্টসহিষ্ণুতা তাহাদের আদৌ নাই; যে কার্য্যে পুরুষকার, সাহস প্রভৃতি গুণ আবশ্যক, বাঙ্গালী জাতি সেরূপ কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না;—বাঙ্গালীর প্রতি অনেকেই এইরূপ কলঙ্কের আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশের সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুধীগণের কল্যাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বাঙ্গালী জাতির উদ্যোগে ও অধ্যবসায়-প্রভাবেই সিংহলে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও বর্দ্ধিষ্ণু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে,—ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল জলধি বাঙ্গালীজাতির অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষে যেরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, উত্তরদিকবর্ত্তী হিমাচলশ্রেণী সেরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি যে সকল তিব্বতীয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও তিব্বতে শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনে বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীই প্রধানতঃ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিব্বতের ইতিহাস ও আখ্যায়িকা গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তিব্বতীয় লামাগণের মধ্যে যাঁহারা এখন আপনাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মগুরু ও সার্ব্বভৌম শাসনকর্ত্তা দালাই লামা পূর্ব্বজন্মে প্রথমতঃ বঙ্গদেশের রাজপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী দুই জন্মে উক্ত রাজবংশে ক্রমান্বয়ে জন্মপরিগ্রহ করেন। তিনি বদান্যতা ও আত্মত্যাগের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাসিলামা পূর্ব্বজন্মে দুইবার বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। একবার তিনি আচার্য্য অভয়াকর গুপ্ত নামে, আর একবার সুমতিকৃতি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণবশতঃ বঙ্গদেশ তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে। তত্রত্য লামাগণ বঙ্গদেশের যে কোনও নামের পূর্ব্বে 'শ্রীযুক্ত' (মহৎগুণযুক্ত) অর্থব্যঞ্জক শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পালবংশের রাজত্বকালে, প্রায় তিন শত বর্ষ ব্যাপিয়া, বঙ্গদেশ বিদ্যানুশীলন ও অস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দের কোনও তিব্বতীয় ঐতিহাসিকের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়েশ্বর দেবপাল বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত সেনাবলের সাহায্যে মগধ ও বরেন্দ্রভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন। উক্ত তিব্বতীয় ইতিহাস ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কাষ্ঠফলকে মুদ্রিত হইয়াছিল।

সে সময়ের বাঙ্গালীরা বিদ্যা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও মহৎ চরিত্রের জন্য লোকসমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন। যে সকল মহৎগুণের জন্য সে কালের বাঙ্গালীরা এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন,

আজ তাঁহাদের বংশধরগণ সে সকল গুণে বঞ্চিত! উচ্চশ্রেণীর তিব্বতীয় ও প্রসিদ্ধ লামাগণ এখনও অবগত নহেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে 'বাবু' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'বাবু' শব্দটি মুসলমানদিগের প্রদত্ত। উহা 'আলস্যপরায়ণ ধনবান ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিব্বতে জনসাধারণের বিশ্বাস, যে সকল বাঙ্গালী 'বাবু' শব্দ ব্যবহার করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান।

তিব্বত বা ভোট দেশে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের ইতিহাসে আমাদের দেশের কতিপয় পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিবরণ পাঠ করিলে মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়; আত্মসম্মানজ্ঞান ও আত্মনির্ভরশীলতা স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই, 'কোমল' বঙ্গের এমন বহু শ্রমসহিষ্ণু সন্তান আছেন, যাঁহারা জগতের যে কোনও জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের ন্যায় অকুতোভয়ে হিমারণ্যের বিপদসঙ্কুল তুষারবেষ্টন অতিক্রম করিতে পশ্চাৎপদ নহেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দুইটি রাজনন্দিনীর যত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের রশ্মিরেখা তিব্বতে প্রথম প্রতিভাসিত হয়। এই উভয় রাজনন্দিনী বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগিণী ও ভক্তিমতী ছিলেন। এই রাজকুমারীদ্বয়ের মধ্যে এক জন নেপালাধিপতি অমসুবর্ম্মণের কন্যা, অপরা চীনরাজবংশীয়া। এই চীনরাজনন্দিনীর নাম ওয়েমচেং। রাজনন্দিনীযুগলের সহিত তিব্বতরাজ স্রোমাউগামেপোর পরিণয় হইলে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিব্বতে এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইল বটে, কিন্তু রাজকুমারীদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মালোকশিখা চিরপ্রচলিত কুপ্রথার ঘনান্ধকার দূরীভূত করিতে পারিল না। তিব্বতীয়দিগের হৃদয়ে তখনও 'বন্' ধর্ম্মের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিতেছিল।

উক্ত ঘটনার এক শত বৎসর পরে তিব্বতরাজ স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য মগধেশ্বরের দীক্ষাগুরু গৌড়-নিবাসী পণ্ডিত শান্তিরক্ষিতকে আমন্ত্রণ করেন। শান্তিরক্ষিত তখন দেশ-প্রসিদ্ধ নালন্দামঠের পুরোহিতাচার্য্য ছিলেন। তাঁহারই উপদেশ-অনুসারে তিব্বতাধিপতি নালন্দা মঠের গুরু-পদ্মসম্ভবকেও তিব্বতে লইয়া যান। উভয়ে মিলিয়া প্রথমতঃ মঠাধ্যক্ষ লামার পদের সৃষ্টি করেন। শান্তিরক্ষিত এখনও তিব্বতে আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মঠের শান্তিরক্ষা ও ধর্ম্মানুশাসনের শিক্ষা প্রভৃতির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। পণ্ডিতগুরু পদ্মসম্ভব বৌদ্ধধর্ম্মের তান্ত্রিক অনুশাসনের ব্যাখ্যা ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক পণ্ডিত তিব্বতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, পবিত্র, বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মে সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে লাগিল। নানাবিধ কুপ্রথা ও ব্যভিচারে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম নিতান্ত কলুষিত হইয়া উঠিল। তখন পবিত্র ধর্ম্মকে পুনরায় সংশোধিত ও প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে তিব্বতরাজ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে খ্যাতনামা মহাপণ্ডিত অতিশা বা দীপঙ্কর জ্ঞানশ্রীকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন। অতিশা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা'র অন্তর্গত বিক্রমপুর নামক নগরে

গৌড়ীয় রাজবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। বাঙ্গালা বজ্রসভার (বুদ্ধগয়া) পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। অতিশা ভারতবর্ষে বিদ্যার্জ্জন করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার অভিপ্রায়ে কতিপয় বণিকের সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণদ্বীপাভিমুখে (সুধর্ম্ম নগর, ইহা পেগুর অন্তর্গত; ইহাকে এক্ষণে থেটন্ বলে) যাত্রা করেন। তথায় কোনও প্রথিতনামা পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি সিংহলদ্বীপে গমন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মগধের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া গ্রহণ করেন। মগধ সে সময়ে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রধান নগরের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। মগধের তদানীন্তন নৃপতি ন্যায়পাল অতিশাকে বিক্রমসীতা নামক মঠের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ প্রদান করেন। তিব্বতের অধিপতি স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃসংস্কারের অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন অতিশার যশঃসৌরভে সমগ্র ভূখণ্ড আমোদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয়-গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, মহাজ্ঞানী অতিশাকে লইয়া যাইবার জন্য তিব্বতরাজ বহুবার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বহুমূল্য উপঢৌকন, রাশি রাশি সুবর্ণের প্রলোভনে অতিশা মুগ্ধ হন নাই। তিনি স্বদেশের কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে গমন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু অবশেষে তিববতরাজের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ও অনুনয়ে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। অতিশা তিব্বতে উপনীত হইলে রাজা প্রজা সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি অশিক্ষিত ও ভ্রান্ত তিব্বতীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাযানপন্থা অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গভীর ও নিগূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অতিশা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তিব্বতের কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে তিব্বতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়। অতিশা অতঃপর কদাপা নামক একটি 'বিশুদ্ধ' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ব্রমটম্ এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ প্রাপ্ত হন। প্রায় তিন শত বৎসর পরে উক্ত সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্ত্তিত হয়। এখন উহা 'জেগুল-পা' বা ধর্ম্মসম্প্রদায় নামে পরিচিত। বর্ত্তমান কালে জেগুল-পাই তিব্বতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। অতিশা বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বোধি-পাঠ-প্রদীপ' নামক গ্রন্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতিশা দ্বাদশ বৎসর কাল তিববতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তত্রত্য যাবতীয় প্রধান প্রধান নগর ও তীর্থে পর্য্যটন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। লাসা নগরের সন্নিহিত নেথাস নামক স্থানে অতিশা ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ অশোকের ধর্ম্মগুরু উপগুপ্ত ব্যতীত অতিশার ন্যায় কোনও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক কোনও বৈদেশিক জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এরূপ গৌরবসমুজ্জ্বল স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম এসিয়া মহাদেশের যে যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় এই বঙ্গদেশীয় মহাপুরুষের নাম গভীরভক্তিসহকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানযুগেও আমাদেরই বঙ্গদেশে হইতে এক জন বাঙ্গালী হিমারণ্য অতিক্রমপূর্ব্বক সার্দ্ধ অষ্ট শত বৎসরের প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান লাসা নগরে প্রবেশ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় কালে

সমগ্র সভ্যজগৎ আজ রহস্তময়ী নিষিদ্ধ নগরী লাসার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছে। তাঁহার নাম রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই। 'কোমল ও দুর্ব্বলচেতা' অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালী হইয়াও দাস মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে, বাঙ্গালীও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে ভীত নহে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চক্রশালার আলমপুর নামক গ্রামে কোনও সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস বলেন, 'বাল্যকাল হইতেই শরচ্চন্দ্র বিপদকে ভালবাসিতেন। এই জন্যই তিনি ভাবী জীবনে সফলতা লাভ করিয়াছেন।' শরচ্চন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিবার প্রবল বাসনা থাকায়, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত্তশিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দার্জ্জিলিঙ্গে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত মিঃ সি. বি. ক্লার্কের অনুরোধে তিনি তত্রত্য ভুটিয়া বোর্ডিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার তিব্বত বাসের ইতিহাস 'ভিন' পত্রে বারান্তরে বর্ণিত হইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। মাঘ। "পূর্ব্ব বঙ্গে মেয়েলী ব্রত" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের সঙ্কলিত জাপানী ব্যায়াম-প্রণালী—"যিউজিৎস্থ" প্রবন্ধে জানিবার ও শিখিবার কথা অনেক আছে। "হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস" প্রবন্ধটি চিন্তাশীল সামাজিকগণের দ্রষ্টব্য। লেখক ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার রিপোর্টে নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, "ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা দুই কোটীর উপর কমিয়াছে, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮.৯ বাড়িয়াছে।" আমরা এই প্রবন্ধের কিয়দংশ আবশ্যকবোধে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেন্সস্ রিপোর্টে এই হ্রাসের যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম কারণ:—যে যে প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব বেশী, সেই সেই প্রদেশে ১৮৯১—১৯০১ এই দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু খুব বেশী হইয়াছিল; আর যে যে স্থানে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, তথায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই। যেমন, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, যুক্তপ্রদেশদ্বয়ের মীরাট ও রোহিলখণ্ড ডিবিজনে দুর্ভিক্ষ হয় নাই; কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, রাজপুতানা, মধ্যভারত প্রভৃতিতে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। প্রথমোক্ত প্রদেশগুলিতে হিন্দু কম, মুসলমান বেশী; শেষোক্ত প্রদেশগুলিতে মুসলমান কম, হিন্দু বেশী। কিন্তু দুর্ভিক্ষই হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। ইহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সেই সকল স্থানেও মুসলমান যত বাড়িয়াছে, হিন্দু তত বাড়ে নাই। দ্বিতীয় কারণ:—অধিকাংশ হিন্দু জাতির (castes) মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। সুতরাং অনেক গর্ভধারণক্ষমা নিঃসন্তান থাকিয়া যান। তৃতীয় কারণ:—অল্পবয়স্ক বালকবালিকার বিবাহ। চতুর্থ কারণ:—অনেক হিন্দুর মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম

অবলম্বন, বিশেষতঃ শেষোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন। ১৮৯১ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ৬ লক্ষের উপর হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আধুনিক সন্ন্যাসী"র সহিত পরিচয়ে আমরা প্রীত হইতে পারিলাম না। প্রভাত বাবুর গল্পে প্রভাতী ফুলের মত একটু freshness থাকে এ গল্পটিতে তাহা নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দুই দিক" হোমিওপ্যাথিক 'গ্লবিউলের' মত একটি অতি ক্ষুদ্র গল্প। ইহাতেও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর শিরোনামহীন সুদীর্ঘ কবিতা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার" তৃতীয় প্রস্তাবে অনেক কাজের কথার অবতারণা করিয়াছেন। শিক্ষার সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র সংস্রব আছে, এই প্রবন্ধটির আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখার "প্রবন্ধচিন্তামণি" উল্লেখযোগ্য।

ভারতী। মাঘ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত "জুলিয়স সীজর" এবার তৃতীয় অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদ পূর্ব্ববৎ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের "কলঙ্কিনী" নামক গল্পটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "যৌবন-স্বপ্ন" রবির ছায়া। কিন্তু ছন্দের ঝঙ্কার রমণীয়। জনৈক প্রবাসীর সঙ্কলিত "খুবংক জাতির বিবরণ" সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৈশালী" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "সাময়িক কথা" হইতে ডিরোজিওর প্রসঙ্গ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিগত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, কলিকাতা ওভারটুন হলে, মিঃ ই. ডাবলু ম্যাজ্ সাহেব, হিন্দুকলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিও সম্বন্ধে অনেক নূতনতত্ত্বসংবলিত একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

"১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জগতে অনেক বড়লোক জন্মগ্রহণ করেন।—মেণ্ডেল সোহন, গ্ল্যাডষ্টোন, টেনিসন, ডারউইন, এডগার এ্যালেন পো, ওলিভার ওয়েণ্ডল হলমস্, ফ্যানি কেম্বেল, লিংকলন প্রভৃতির সঙ্গে উক্ত বৎসর ডিরোজিও-ও ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা কলিকাতা লোয়ার সারকুলার রোডের উপর এখনও বিদ্যমান। উহা নব-প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট টেরেসার রোমান ক্যাথলিক ভজনালয়ের ঠিক সম্মুখভাগে অবস্থিত।

ডিরোজিওর পিতামহ মাইকেল ডিরোজিওর নাম, আমরা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 'সেণ্ট জনস্ ব্যাপ্টিস্ম্যাল রেজেষ্টারি' বহিতে 'এতদ্দেশীয় (native) খৃষ্টান' বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল ডাইরেক্টরী'তে ইনি 'পর্ত্তুগিজবণিক' বলিয়া অভিহিত।

"হেনরি ডিরোজিওর জীবনী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিনে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার এই সংখ্যায় তাঁহার একখানি সুন্দর ছবিও প্রদত্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

"হেনেরি ডিরোজিও 'ড্রামণ্ড একাডমি' নামক বিদ্যালয়ে পাঠ করেন। এই বিদ্যালয়ে ইনি কয়েকবার মেডেল প্রাপ্ত হন। হেনেরির পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও খেসরস্ জেম্‌স্ স্কট্ এণ্ড কোম্পানির দোকানে উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। হেনেরি প্রথমতঃ তথায় একটী কর্ম্ম

গ্রহণ করেন ; কিন্তু দুই বৎসর পরে সেই কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক ভাগলপুর জেলায় কারাপুরের নীল কুঠীতে প্রবেশ করেন। এই নীলকুঠির নিম্নবাহিনী মধুরস্বরা নদীর তরঙ্গ এবং চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম্যদৃশ্যাবলী, নবযুবক ডিরোজিওর কল্পনাকে কাব্যপ্রভায় আবিষ্ট করিয়াছিল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশবর্ষমাত্র। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই সময়ে একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন। এই কবিতাপুস্তকে তিনি সহসা সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া গেজেটের একটী প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়, ডিরোজিওর কবিতাপুস্তক, বিলাতেও তাঁহাকে পরিচিত করিয়াছিল। সদ্যঃস্ফুরিতগুম্ফ যুবকের পক্ষে, এই যশঃ, বিশেষ শ্লাঘার কারণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই অল্পবয়সেই, ডিরোজিও, ইণ্ডিয়া-গেজেট পত্রের সহকারিসম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে হিন্দুস্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

"তরুণবয়স্কশিক্ষক, যে প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন, তাহা ছাত্রদিগকে জ্ঞানের পথে অপূর্ব্ব-মত্ততা প্রদান করিয়াছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে লক, রিড, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি দার্শনিক-গ্রন্থকারগণের বড় বড় পুস্তক, এমন ভাবে পড়িয়া শুনাইতেন যে, তাঁহার স্বীয় আগ্রহাতিশয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত। বিষয় যত দূর কঠিন হউক না কেন, তিনি তৎপ্রতি কৌতূহল ও মনযোগ সজাগ করিয়া তুলিতেন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত উইলসন, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনতিক্রান্ত বিংশবর্ষবয়সে ক্যাণ্টের দর্শনের প্রতিবাদ করিয়া, যে একখানি পুস্তক রচনা করেন, কলিকাতার তৎকালীন প্রবীণ ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাহা পড়িয়া বুঝিয়াছিলেন, ডিরোজিও শুধু কবি নহেন, তিনি এক জন উচ্চদরের দার্শনিক।

"তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকের নামই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ডিরোজিওর প্রতি যেরূপ অনুরাগী ছিলেন, একালে অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সেরূপ সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি অল্পদিনমাত্র হিন্দু-স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রভাব ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে ভাবে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন,—তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি ছাত্রদিগকে নাস্তিক করিয়া তুলিতেছেন,—এই অভিযোগের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেরূপ অকুণ্ঠিত, তেমনই সুস্পষ্ট ও প্রবল। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, বিরুদ্ধপক্ষগণের চেষ্টাই সফল হইয়াছিল। নাস্তিকতা-শিক্ষাদানের অভিযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—'এই সকল জঘন্য অভিযোগের উত্তরে আমি স্পষ্টভাবে 'না' বলিতেছি। ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে দার্শনিক-পণ্ডিতদের অবিশ্বাসের কারণগুলি আমি ছাত্রদের নিকট বলিয়াছি, ইহা স্বীকার করিতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহি। আমি এই অবি-শ্বাসের হেতুগুলি যেরূপ বুঝাইয়া বলিয়াছি, আবার সন্দেহ কিরূপে দূর হয়, তাহাও দেখাইতে ত্রুটি করি নাই ;—সুতরাং এ কথা বলিতে আমার লজ্জা হওয়ার কোন বিষয় নাই। আমাকে যে, ঘোর অবিশ্বাসী ও নাস্তিক সংজ্ঞা দেওয়া হইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কারণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারাই একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই চিরকাল এই ভাবে অভিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমার এইটি মাত্র বিস্ময়ের প্রধান কারণ, যে সকল বিশ্বাস বা ধারণা আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত, সেইগুলিই আমার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে।'

"ডিরোজিওর পদচ্যুতির পরেও, তাঁহার ছাত্রগণ, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও তাঁহার কথা অনুসারে কাজ করিতেন।"

"১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর কলেরারোগে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষমাত্র ছিল। এই অত্যল্প বয়সে তিনি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। ডিরোজিওর ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাঁহার শ্যামবর্ণ সুকুমার বালকের ন্যায় মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে গুচ্ছগুচ্ছ কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ দুলিত হইত, চক্ষু দুটি বড় এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিল, তিনি কতকটা খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, এবং পরিচ্ছদের পারিপাট্যসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে 'জাঙ্গিরার ফকির' শীর্ষক কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক ইংরেজ সমালোচক তাঁহাকে 'প্রাচ্যদেশের বাইরণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ডিরোজিওর প্রতিভায় বাইরণের তেজস্বিতা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রতিবিম্বিত হইত। সেকালের নবীন কবিগণ, বাইরণ, মুর্ ও স্কটের কবিতার অনুকরণ করিতেন ; ডিরোজিও-ও সেই আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু হৃদয়ের গভীর উদ্বেল ভাব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁহার নিজস্ব। অনেক লেখায় তাঁহার নিজের একটা মৌলিক সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহা, কালে কি অপূর্ব্বসঙ্গীত-লহরীর সৃষ্টি না করিতে পারিত!

"তাঁহার কবিতা, মাইকেল স্থলে-স্থলে অনুকরণ করিয়া গুরুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, একটি স্থান উঠাইলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।"

'Gone to that narrow cell
Whose gloom no lamp hath broken nor shall break.
Whose secrets never spirits came to tell—
Oh ! that their day might dawn for then they would awake.'

ডিরোজিওর এই কবিতাটি অবশ্য মনে রাখিয়া মাইকেল লিখিয়াছেন,—

'আসিছে রজনী, নাহি যার কেশপাশে
তারা-রূপ মণি ;
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা, তপনের দূতী অরুণরমণী।'

উদ্ধৃত অংশে "দুলিত" প্রভৃতি আজগুবি ভাষার নমুনাগুলি অবশ্য পাঠকের উপরি লাভ।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর "মুক্তি" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটির শেষ চরণ শেষ করিয়া যথার্থই মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলাম।

"আর নাই! কেন নাই? আছে, আছে, আছে,
বিস্তৃত হয়েছে হের এই বিশ্বমাঝে"

এই দুই চরণের মিল দেখিয়া রবিরাহুর 'যা পদ্য যা মিলে যা'ও লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।

আরতি। পঞ্চমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ। আমরা 'আরতির' পুনরাবির্ভাবে আনন্দলাভ করিলাম। "বাণী আরাধনা" নামক সুদীর্ঘ কবিতাটিতে কবিতা অপেক্ষা বক্তৃতার মাত্রা অধিক—কিন্তু এই বক্তৃতায় উদ্দীপনা আছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "কালিদাস ও রঘুবংশ" নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "শ্রী" স্বাক্ষরিত "খুকী" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের 'খেদা' নামক প্রবন্ধে অনেক কৌতুকাবহ তথ্য আছে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের "ময়মনসিংহে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ" নামক উপাদেয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। আজ কাল মফঃস্বল হইতে যে সকল মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে প্রাদেশিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ প্রায় দেখিতে পাই না। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রাদেশিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জনশ্রুতি প্রভৃতির অনুশীলনই প্রাদেশিক পত্রগুলির মুখ্য কর্ত্তব্য। আরতি কর্ত্তব্য পথের পথিক হইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের 'নূপুর' নামক ক্ষুদ্র সনেটটি-অতি সুন্দর।

> কোমল চরণদুটি' জড়ায়ে যতনে
> দুখানি অলক্ত-আভা-বিম্বিত নূপুর;
> বসন্ত-সঙ্গীত যেন বাঁধিয়া চরণে
> নিমেষে নিমেষে ঐ বাজে সুমধুর।
> কি সৌভাগ্য নূপুরের সার্থক জীবন—
> মগ্ন হয়ে আছে সুধা-পরশের রসে!
> শতদল দল ঘিরে ভ্রমর যেমন
> তাই বুঝি শতবার গুঞ্জরে হরষে।
> অথবা কি, হে কল্যাণি, নারীরূপ লয়ে
> আপনি পরেছ পদে মায়ার বন্ধন,
> তুমি স্বেচ্ছাকৃত বন্দী মানব-আলয়ে
> গৃহ-কারাগার তুমি করেছ নন্দন।
> নূপুর দুখানি বুঝি তাই শত ছলে
> তোমারি মহিমা. নারি, গায় কুতুহলে।

নবনূর। মাঘ। নবনূর ক্রমেই উজ্জ্বল হইতেছে। পুরাতন মাসিকে অবসাদের অবনতির চিহ্ন দেখিয়া নিরাশার সঞ্চার হয়। নূতনের নবোৎসাহে জরা স্পর্শ করিতে পারে না। নবনূরের এই উদ্যম হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিবর্দ্ধনের সহায় হউক এই আমাদের আন্তরিক কামনা। জাতিবিদ্বেষে ভারতবর্ষ দগ্ধ হইয়াছে সে অনলে আর ইন্ধন দিবার আবশ্যক নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান একথা বিস্মৃত নহেন। "ঐসলামিক যৎকিঞ্চিৎ" উল্লেখযোগ্য কিন্তু লেখকের ধীরতার অভাব শোচনীয়। শ্রীযুক্ত মহাম্মদ-মহৎসরবিল্লা চৌধুরী সার্দ্ধসপ্ত পরিবারের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। "মেথরাণীর আবেদন" ভদ্রসমাজের যোগ্য নহে।

ফিরিঙ্গি বণিক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অসাধারণ আত্মত্যাগ।

The institution of chivalry, one which has so much elevated human nature, that love of glory instead of mere country, that spirit purified from the contamination of surrounding barbarism appeared upon the banks of the *Tagus*, with all the splendour which had characterised its origin in France and England. The Portuguese Monarchs strove to preserve it, and to extend its power by the establishment of various orders formed upon the old models, and whose spirit was the same.—that is to say,—a union of heroism, gallantry, and devotion,—*Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. D'Orsey. B. D.*

অসাধারণ আত্মত্যাগই অধিকাংশ মানব-সমাজের অভ্যুদয়ের মূল কারণ বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত। সম্ভোগ মানব-সমাজকে স্বার্থপর করিয়া সমগ্র দেশের অভ্যুদয়ের পথ সংকীর্ণ করিয়া রাখে। স্বার্থচিন্তা প্রবল হইয়া, কখন কখন প্রধান পুরুষগণকে স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত করিয়া, অধঃপতনের সূত্রপাত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার উদাহরণের অভাব নাই। পর্তু-গাল যখন মুসলমান-শাসন উৎখাত করিয়া স্বাধীনতা-লাভের আয়োজন করিয়াছিল, সে সময় আধুনিক ইউরোপের নবজীবন-লাভের প্রথম প্রভাত। তখনও মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। তথাপি আশার তরুণ কিরণ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। স্বদেশ অপেক্ষা স্বকীর্ত্তি যেন সমধিক প্রবলপ্রতাপে মানব-সমাজে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নূতন শিক্ষা প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেখানে অত্যাচার, সেখানেই জন-সমাজ তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান;—প্রতীকার-কামনায় জীবনবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত;—প্রয়োজন হইলে, দলে দলে পতঙ্গের ন্যায় অনলশিখায় আত্মোৎসর্গ করিতে লালায়িত! এই শিক্ষা এক দিকে অকুতোভয়তায়, অন্য দিকে অকৃত্রিম গৌরবলালসায়, ইউরোপীয় জনসমাজকে অসাধারণ আত্মত্যাগ-স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। রাজকুমার হেন্‌রী এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা ও সাধুদৃষ্টান্তে শৈশব হইতেই সাহসী, অধ্যবসায়শীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সেকালের ধর্ম্মোন্মাদ তাঁহাকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান-বিদ্বেষ তাঁহার তরুণহৃদয়ে জিগীষার জন্মদান করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য উত্তেজনা উপস্থিত করিয়াছিল। সেকালের লোকচরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া, লোকসমাজের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিতে হইলে, সেকালের এই সকল বিমিশ্র চিত্তবৃত্তির কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যে কেহ ধর্ম্ম-রাজ্য-সংস্থাপন-কামনায় আত্মোৎসর্গে অগ্রসর, সে কেবল সন্ন্যাসী হইয়া, এক গণ্ডে চপেটাঘাত সহ্য করিয়া, অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিয়া, খৃষ্টধর্ম্মের প্রেমের শাসনের মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে সম্মত হইত না; বরং স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অপরের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেও ইতস্ততঃ করিত না। যে কেহ সমস্ত বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সন্ন্যাসীর ন্যায় কঠোর তপস্যায় খৃষ্টান-সমাজের সেবার ভার গ্রহণ করিত, সে কেবল ভিক্ষালব্ধ তিলতণ্ডুলে সেবাব্রত উদ্‌যাপিত করিত না; বরং সময় সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, বাহুবলে পরস্বাপ-হরণেও কুণ্ঠিত হইত না!

সেকালের ইউরোপে যেরূপ ধর্ম্ম-নীতি খৃষ্টান-সমাজকে উত্তরোত্তর পরাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এসিয়ার শান্ত শীতল খৃষ্টধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্যাপি সে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। রাজকুমার হেন্‌রীর আবির্ভাবসময়ে তাহা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

হেন্‌রী যখন ধাত্রীক্রোড়ে শৈশবক্রীড়ায় অবসরশূন্য, হেন্‌রীর জন্মভূমি তখন মুসলমান-বিজয়ের এক নূতন পথে দণ্ডায়মান। মুসলমান পর্ত্তুগাল হইতে তাড়িত হইয়া, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলে রাজ্যভোগ করিত। অশান্ত পর্ত্তুগাল সেখানে উপনীত হইয়া, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। এই কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া, খৃষ্টান ইউরোপ জয়ধ্বনি করিয়া, পর্ত্তুগালকে উত্তেজিত করিয়া দিল। ইংলণ্ডের ধনুর্ধরগণ ইংলণ্ডাধিপতির জামাতার এই সমরবিজয়ের সহচর হইবার জন্য সগর্ব্বে আস্ফালন করিয়া উঠিল। আয়োজনের ত্রুটি হইল না; জীবনবিসর্জ্জ-নের অবধি রহিল না; অসাধারণ আত্মত্যাগের পুণ্যকীর্ত্তিতে খৃষ্টান-সমাজের ধর্ম্মোন্মাদ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল;—তথাপি মুসলমানশক্তি পিপীলিকার ন্যায় পদবিদলিত হইল না। অভেদ্য কিউটা-দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া, মুসলমান অসিহস্তে আত্মরক্ষার জন্য বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল; তাহার সম্মুখে

সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় শত্রুসেনাতরঙ্গ প্রবলগর্জ্জনে পুনঃপুনঃ আস্ফালন করিয়া আঘাত করিতে লাগিল; তথাপি মুসলমানবীরবৃন্দ বিচলিত হইল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দীর্ঘকাল এইরূপ শক্তিপরীক্ষায় পর্ত্তুগালের দিগ্বিজয়-লালসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজকুমার হেন্‌রী অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই সেনানায়ক হইয়া, মুসলমান-বিজয়ের জন্য আফ্রিকার উপকূলে প্রেরিত হইলেন।

হেন্‌রী বিজয়লাভ করিলেন। যে মুসলমান-দুর্গ অভেদ্য বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল, তাহা অবরুদ্ধ হইল। হেন্‌রী দুর্গজয় করিয়া, মুসলমানের শেষ আশ্রয়স্থল অধিকার করিবার জন্য স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। হেন্‌রীর স্বধর্ম্মানুরক্ত চরিতাখ্যায়ক এই দুর্গজয়কাহিনী বর্ণন করিবার সময়, হেন্‌রীর অসাধারণ আত্মত্যাগের কথা পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেদিন মুসলমান-সেনা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের প্রবল প্রতাপে খৃষ্টান-সেনা পুনঃপুনঃ দুর্গমূল হইতে তাড়িত হইয়াছিল। কেবল এক জন খৃষ্টান-সেনানায়ক দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অকুতোভয়তার প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সেই খৃষ্টান-সেনানায়ক স্বয়ং রাজকুমার হেন্‌রী! দুর্গজয় সুসম্পন্ন হইলে, এই অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী যখন ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন পোপ, জর্ম্মন-সম্রাট, স্পেন্ ও ইংলণ্ডের অধীশ্বর, সকলেই রাজকুমার হেন্‌রীকে সেনাপতি করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগালের অধীশ্বরের পঞ্চম পুত্রের পক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, সেনাপতি হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অলৌকিক বীরকীর্ত্তি সম্ভোগ করিবার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হেন্‌রী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অসাধারণ আত্মত্যাগে ইউরোপকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তিনি চিরকুমারব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন!

রাজকুমার হেন্‌রীর এই অলৌকিক আত্মত্যাগ ইউরোপের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা অসাধারণ সন্ন্যাস-কাহিনী। পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়-কামনাই তাহার মূলমন্ত্র। কিরূপে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, কিরূপে স্বদেশের পদমর্য্যাদা বিশ্বব্যাপ্ত হইবে, কিরূপে স্বদেশের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব স্ফীত হইয়া উঠিবে, তাহার উপায়-উদ্ভাবন করিবার জন্য ও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বদেশের অভ্যুদয়সাধন করিবার জন্যই হেন্‌রী সন্ন্যাস গ্রহণ

করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান-রাজ্য দক্ষিণাংশের নানা স্থান হইতে ধনাহরণ করিত। হেন্‌রী সেই সকল দেশে গমনাগমনের জলপথ আবিষ্কৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা তাঁহাকে গণিতবিজ্ঞানের অনুরক্ত করিয়া, এই কার্য্য-সাধন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য দান করিয়াছিল। তিনি রাজকোষ হইতে যে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা এই কার্য্যে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হেন্‌রীর ধর্ম্মানুরাগই তাঁহার সকল কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া সুপরিচিত। এ ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপের "ড্রুইড্"-পুরোহিতগণ জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য নানারূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করিতেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ পুরোহিতবর্গের অলীক কাহিনীতে কোনরূপ অনাস্থা প্রকাশ করিত না। "সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট" নামক পর্ত্তুগালের একটি অন্তরীপ পুরোহিতগণের পবিত্র সাধনক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। তথায় তাঁহাদিগের মন্দিরে প্রতি রজনীতে দেবতাদিগের সমাগম হইবার কথা জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিত,—সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত! খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পরেও, এই পুণ্যক্ষেত্র লোকসমাজের নিকট অলৌকিক শক্তিলাভের সাধনক্ষেত্র বলিয়াই সুপরিচিত ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, রাজকুমার হেন্‌রী এই পুরাতন পুণ্যক্ষেত্রেই আশ্রম সংস্থাপিত করিলেন;— কি উদ্দেশ্যে হেন্‌রী এই স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। *

আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনন্ত নীলাম্বুকল্লোল আশ্রমনিবাসী, তরুণ সন্ন্যাসীর কর্ণপুটে নিয়ত ধ্বনিত হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর মহাসাগরের

---

*In days long past there had stood upon the sister head-land of St. Vincent, at about a league's distance, a circular Druidical temple, where, as Strabo tells us, the old Ilberians believed that the gods assembled at night, and from the ancient name of Sacrum Promontorium, hence given to the entire promontory by the Romans, Cape Sagres received its modern appelation. As may be imagined, the motive for the Prince's choice could not have been an ordinary one.—*Major's Prince Henry the Navigator. p. 2.*

রহস্যভেদ করিবার জন্য উত্তেজিত করিত। হেন্‌রী আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের সন্ধানলাভার্থ জলযাননির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া, অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে পোতচালনা করিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বিস্তারের আয়োজন করিলেন। তাঁহার আশ্রম নৌবিদ্যালোচনার প্রধান পাঠশালায় পরিণত হইল। ইউরোপের নানা স্থান হইতে প্রবীণ নাবিকগণ সে পাঠশালায় উপনীত হইয়া, বিবিধ অভিনব জ্ঞানলাভে সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। হেন্‌রী ধর্ম্মবীর; হেন্‌রী সন্ন্যাসী; হেন্‌রী সমগ্র ইউরোপে সুপরিচিত স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহার নিকট অভিনব জ্ঞানশিক্ষা করিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন খৃষ্টান-নাবিকগণের ইতস্ততঃ রহিল না। পর্ত্তুগালের জনসাধারণ এত দিনের পর সুদূর সমুদ্রপারের অজ্ঞাত রাজ্যের ধনাহরণ করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিবে; চিরশত্রু মুসলমানকে পরাজিত করিয়া মুসলমানাধিকৃত বহুদেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার করিতে পারিবে;—এই অভ্যুদয়ের আশার আলোকে পর্ত্তুগালের রাজা প্রজা সমভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। * হেন্‌রী তাঁহাদের নায়ক হইয়া আবিষ্কারব্রত গ্রহণ করিলেন।

পর্ত্তুগাল ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় রাজ্যের পক্ষে এই সকল সুযোগ তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং ক্ষুদ্র হইয়াও, পর্ত্তুগাল এই দুষ্কর কার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিচিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অদম্য উৎসাহ, অপরাজিত অধ্যবসায় ও অসাধারণ আত্মত্যাগ ভিন্ন হেন্‌রীর অন্য সম্বল অধিক ছিল না। যে সকল জলযান প্রচলিত ছিল, তাহা ক্ষুদ্রকায়; তাহা কেবল ক্ষেপণী-বলে পরিচালিত হইত। যে সকল নাবিক বহুদর্শী বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিত, তাহারা কেবল উপকূলপথে পোতচালনায় সিদ্ধহস্ত। সুদূর সমুদ্রপথে অবিজ্ঞাত নূতন দেশে পোতচালনা করিতে হইলে, দীর্ঘকালের জন্য অন্নজল সঞ্চিত করা আবশ্যক। সেকালের ক্ষুদ্র-পোতে তাহার স্থান হইত না। পোতের আয়তন বর্দ্ধিত করিলে, ক্ষেপণীবলে তাহাকে চালিত করা কঠিন হইয়া উঠিত। এই সকল বিঘ্ন বাধা হেন্‌রীর

---

*The war-like character of the population, the long range of coast bordered by the unknown Atlantic, and the desire to avenge the thraldom under which their native land had groaned, inspired the Portuguese with a desire to carry the war into the enemy's country, and to subdue the territory of the infidel to the Faith of the Cross.—*Portuguese Discoveries by Rev. Alex. J. D. D'Orsey. B. D. p.* 7-8.

নিকট এক সময়ে অনতিক্রমণীয় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার অধ্যবসায় অবসন্ন হয় নাই। তিনি বায়ুবলে পোতচালনা-কৌশলের শিক্ষাদান করিয়া, অর্ণবযানের আয়তন-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুদূর সমুদ্রপথে পোতচালনা করিতে হইলে, সর্ব্বদা উপকূলভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিবার উপায় থাকে না। কখন কখন অনন্ত মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়। হেন্‌রী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য যন্ত্রনির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। একালের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও, সে কালের নাবিকগণের পক্ষে তাহাই একমাত্র সহায় বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করিতে কত সময়, কত অর্থ, কত শ্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু হেন্‌রী তাহাতে বিস্মিত হইলেন না। তাঁহাকে এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য দীর্ঘকাল কত আয়োজন করিতে হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার জন্য ঐতিহাসিক স্যার ডব্‌লিউ হণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন,—হেন্‌রীর জীবনের অধিকাংশ ভাগই এই কার্য্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল! তাঁহাকে মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল; নৌ-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া, গণিতবিজ্ঞানের শিক্ষাদানে সুদক্ষ নাবিকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল।* অসহিষ্ণু জনসাধারণ এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা বীজ-রোপণ করিবামাত্র ফলভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। তাহারা কিছুদিন পরে হেন্‌রীর জলযানসমূহের বিবিধ দুর্দ্দশার ও ব্যর্থবিজয়চেষ্টার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া, হেন্‌রীর বিপুল উদ্যমকে উন্মত্ততা ও অবিমৃষ্যকারিতা

---

*On that barren spur of rocks and shifting sands and stunted juniper, with the roar of the Ocean for ever in his ears, and the wide Atlantic before him inviting discovery from sunrise to sunset, he spent his remaining forty-two years, a man of one high aim, without wife or child. Amid its solitude he built the first observatory in Portugal, established a naval arsenal, and founded a school for navigation, marine mathematics and chart-making. Thither he invited the most skilful pilots and scientific sailors of Christendom, from Bruges near the North Sea to Genoa and Venice on the Mediterranean. Thence, too, he sent forth at brief intervals exploring expeditions into the unknown South: expeditions often unfruitful, sometimes calamitous, even denounced as folly and waste.—*Sir W. Hunter's History of British India, Vol. I, p.* 62-63.

বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল! সন্ন্যাসী সমুদ্রপথের ঝঞ্ঝাতাড়নার ন্যায় জন-সমাজের এই সকল তীব্রতাড়না অকাতরে সহ্য করিয়া, সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মধ্যযুগে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলের অত্যল্প অংশই ইউরোপের নিকট সুপরিচিত ছিল। হেন্‌রী যখন সেই উপকূলভাগ অন্বেষণ করিবার আশায় পোত-প্রেরণের অয়োজন করেন, তখন জিব্রাল্‌টারের দক্ষিণে অধিক দূর পোত-চালনার সম্ভাবনা আছে, তাহা নাবিকদিগের সুপরিচিত ছিল না। তাহারা জানিত,—জিব্রাল্‌টারের দক্ষিণে ৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নিরাপদে গমনাগমন করা যায়। তাহার দক্ষিণে বোজাডর অন্তরীপ। সেই সীমাই শেষ সীমা। তাহা অতিক্রম করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায় এক দল জেনোয়া-নিবাসী সাহসী নাবিক ১২৯১ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তাহাদের সাহস বাতুলতা-নামে পরিচিত হইয়াছিল; কাব্যে ইতিহাসে সেরূপ সাহস কেবল অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়াই কীর্ত্তিত হইত। হেন্‌রী সেই পথেই ভারতবর্ষে পোত-প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! প্রচলিত জনশ্রুতি যে নিতান্ত অলীক, তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, কেহই সে পথে ভারত-যাত্রায় সক্ষম হইত না। হেন্‌রী সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেন্‌রীর সুশিক্ষিত নাবিকবর্গ বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে উপনীত হইলে, ইউরোপের চিরসঞ্চিত ভ্রান্তসংস্কার দূর হইয়া গেল। বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী হইলে যে ভস্ম হইবার আশঙ্কা নাই, সে কথাও জনসমাজে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। হেন্‌রীর সাধনা সিদ্ধ হইল। ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিলেই যে ভারতযাত্রার জলপথ আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সংশয় রহিল না। কেবল এই কার্য্য সাধন করিতে যত আবশ্যক, তত সময় হেন্‌রীর নশ্বরদেহ ধরাধামে রহিল না! তাঁহার তিরোভাবে সমগ্র ইউরোপ ও তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি হাহাকার করিয়া উঠিল। পুণ্যাশ্রমের সাগরসৈকতের দুর্গদ্বারে হেন্‌রীর অলৌকিক আত্মত্যাগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক অত্যুন্নত জয়স্তম্ভ অদ্যাপি মহাসাগরকল্লোলে প্রতিনিয়ত স্তূয়মান হইয়া সন্ন্যাসীর সম্মানরক্ষা করিতেছে। *

* রাজকুমার হেন্‌রীর তিরোভাবকাল-নির্ণয়ে এখনও নানা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। জয়-স্তম্ভের প্রমাণ-অনুসারে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দই তাঁহার তিরোভাব-কাল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উত্তমাশা অন্তরীপ।

So strangely were right and wrong compounded by these pioneers of so called Christianity that the fifth part of the proceeds of the sale of human beings was granted to the. Grand Master of the Order of chaist,—*Portuguese Discovery in Fifteenth Century.*

রাজকুমার হেন্‌রীর সমসাময়িক গোমেজ-ইয়ানেজ-ডি-অজুরারা এক জন সুনিপুণ ইতিহাস-লেখক বলিয়া সুপরিচিত। তিনি হেন্‌রীর গুণমুগ্ধ অনুরক্ত স্বদেশভক্ত খৃষ্টান লেখক। তাঁহার গ্রন্থে এই যুগের বিবিধ রহস্য সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

খৃষ্ট-ধর্ম্মাচার্য্য পোপ চতুর্থ ইউজিন এই সকল অভিনব আবিষ্কারবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া, হেন্‌রীকে আফ্রিকার ও আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলের সমগ্র রাজ্যে অধিকার দান করিয়াছিলেন। মুসলমান সম্রাট আপন সেনাপতি বা অমাত্যবর্গের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে পৃথিবীর যে কোন অংশ দান করিতেন। সে দেশ স্বাধীন বা অনাবিষ্কৃত হইলেও দানের ব্যাঘাত হইত না। সম্রাটের দান প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি বা অমাত্যবর্গ সেই সকল নূতন রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করিতেন। জয় করিতে না পারিলেও তদ্দেশের অধিপতি বলিয়া আপনার উপাধিসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার ত্রুটি হইত না। ভারতবর্ষ বিজিত হইবার পূর্ব্বেই কুতবুদ্দীন ভারতসম্রাট-উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; বঙ্গদেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই বক্তিয়ার খিলিজি "সনন্দ" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন কোন ইংরাজ সেনাপতি স্বাধীন কান্দাহার রাজ্যের অধিপতি বলিয়া উপাধি লাভ করিয়া থাকেন! সেকালেও এইরূপে রাজকুমার হেন্‌রী সমগ্র প্রাচ্যরাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে পর্ত্তুগালের অধিবাসিবর্গের ধনলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যে কোন উপায়ে ধনোপার্জ্জনের জন্য খৃষ্ট-ধর্ম্মের উদারনীতি অতল সাগর-জলে নিক্ষেপ করিয়া, দেশ-লুণ্ঠনে বহির্গত হইয়াছিল।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সন্ধানলাভ করিবামাত্র পর্ত্তুগালের ধর্ম্মোন্মত্ত নাবিকদলের অর্থোন্মাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিশেষ কোন পণ্যদ্রব্যের সন্ধান না পাইয়া, সে দেশের কৃষ্ণকায় বর্ব্বরগণকে ধৃত করিয়া স্বদেশে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতে ও তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে শিক্ষা

করিয়াছিল। এইরূপে ইতিহাসবিখ্যাত "দাস-ব্যবসায়ে"র সূত্রপাত হয়। এই ব্যবসায়ের লাভাংশের পঞ্চম ভাগ রাজকুমার হেন্‌রীকে প্রদান করিতে হইত। তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস লেখক ইহার উল্লেখ করিবার সময়ে হেন্‌রীর পক্ষসমর্থনের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—ক্রীতদাসগণ খৃষ্ট-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনীত হইয়া পরিত্রাণের সুসমাচার প্রাপ্ত হইত!

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পুরাকাল হইতে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। তাহারা ধর্ম্মের আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত না। খৃষ্টান ইউরোপ "দাস-ব্যবসায়ে" প্রবৃত্ত হইবার সময়ে ধর্ম্মের ভাণের সৃষ্টি করিয়া অর্থোপার্জ্জনে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহার ফল অল্পদিনেই ফলিতে আরম্ভ করিল। পর্ত্তুগালের অধিবাসিবর্গ ক্রীতদাসের হস্তে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র সমর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ে ও অর্থান্বেষণে ভুবনভ্রমণে বহির্গত হইল! ধর্ম্মোন্মাদের সহিত ধনোন্মাদ মিলিত হইল; ধনাহরণের ছলকৌশলকেও ধর্ম্মানুমোদিত করিতে বাধ্য হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম তাহার সমুচ্চ সোপান হইতে অধঃপতিত হইতে লাগিল। ধনের সঙ্গে সম্ভোগ-লালসা বিবর্দ্ধিত হইয়া, জনসমাজের চিত্ত-বিকার উৎপাদিত করিয়া দিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহারা আত্মত্যাগে ভুবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা দেখিতে না দেখিতে সম্ভোগের ক্রীতদাস হইয়া জলে স্থলে রুদ্রমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। হেন্‌রীর নশ্বর দেহ সমাধি-নিহিত হইল; তিনি যে উদ্দাম দিগ্বিজয়লালসা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা পর্ত্তুগালের অধিবাসিগণকে উত্তরোত্তর অধিক উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

এই সময়ে হেন্‌রীর সুশিক্ষিত নাবিকগণ সমগ্র ইউরোপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বনামখ্যাত কলম্বস্ পর্ত্তুগালে উপনীত হইয়া, হেন্‌রীর জনৈক প্রধান নাবিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, গোপনে পর্ত্তুগালের নৌ-বিদ্যালয়ের মানচিত্রাদির সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে অনন্ত জলরাশি বর্ত্তমান থাকিয়া, ইউরোপের জনসমাজের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া পরিচিত ছিল। দক্ষিণভাগে পোতচালনা করিয়া রাজকুমার হেন্‌রী ইউরোপের কুসংস্কার দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলম্বস্ পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, পশ্চিম সমুদ্রপারেই ভারতবর্ষ। পশ্চিম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলে নিশ্চয় স্থলভাগ প্রাপ্ত

হওয়া যাইবে,—এই বিশ্বাস তৎকালের ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট বাতুলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইত। কলম্বসের সুযোগ্য পুত্র ফর্দ্দিনন্দ লিখিয়া গিয়াছেন,—পর্ত্তুগালে অবস্থান করিবার সময়েই তাঁহার পিতার মনে এই বিশ্বাস প্রথমে উদিত হইয়াছিল। * মার্কোপোলো স্থলপথে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চীনদেশে আসিয়া সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগালে আসিয়া ইউরোপের স্থলভাগের শেষ হইয়া সমুদ্রের আরম্ভ দেখিয়া কলম্বস্ ভাবিয়াছিলেন,—পর্ত্তুগাল হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া সমুদ্র পার হইতে পারিলেই এসিয়াখণ্ডে উপনীত হইবেন।

কলম্বস্ এই বিপদ-সংকুল সমুদ্রযাত্রার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, পর্ত্তুগালের অধীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিতীয় জন্ নামক নরপতি তখন পর্ত্তুগালের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার অমাত্যবর্গ নিরতিশয় দীর্ঘসূত্রী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কলম্বসের সমুদ্রযাত্রার সংকল্প অবগত হইয়া তাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বাতুলতা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। নরপতি স্বয়ং কোনরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন না। তিনি তখন আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সম্ভাবনায় আশান্বিত হইয়া, পশ্চিম সমুদ্রে পোত-প্রেরণের প্রয়োজন স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন। পশ্চিম সমুদ্রপথে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব কি না, গোপনে গোপনে তাহারও পরীক্ষাকার্য্য আরব্ধ হইল। সে পরীক্ষা সফল হইল না। নাবিকগণ ঝঞ্ঝাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কলম্বস্ তখন পর্ত্তুগাল পরিত্যাগ করিয়া স্পেন্-রাজ্যে গমন করিলেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ স্পেন্‌রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া আমেরিকা-আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিলেন। তাহা তখন ভারতবর্ষ নামেই পরিচিত হইল; অদ্যাপি তাহা পশ্চিম-ভারত বলিয়া কখন কখন কথিত হইয়া থাকে। এই আবিষ্কার-বার্ত্তা পর্ত্তুগালের জনসমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সহজ পথ শীঘ্র আবিষ্কৃত না হইলে, ভারতবাণিজ্য যে স্পেন্‌রাজ্যের করতলগত হইবে, এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল।

---

*It was in Portugal that the Admiral began to surmise that if the Portuguese sailed so far south, one might also sail westwards and find land in that direction.

আফ্রিকার কোন এক নিভৃত প্রদেশে একটি খৃষ্টান জনপদ বর্ত্তমান থাকিবার প্রবল জনশ্রুতি সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে জনপদের খৃষ্টভক্ত নরপতির নাম "প্রেষ্টার জন"। ইহার অধিক আর কোন কথা জানিবার উপায় ছিল না। রাজকুমার হেন্‌রী এই খৃষ্টান জনপদের সন্ধানলাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। সন্ধানলাভের পূর্ব্বেই রাজকুমার হেন্‌রীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু তাঁহার সে সাধু সংকল্প পর্ত্তুগাল-রাজ পরিত্যাগ করিলেন না। দ্বিতীয় জন সিংহাসনারূঢ় হইবার পর হইতেই হেন্‌রীর এই শুভ সংকল্পের সহায় হইয়াছিলেন। হেন্‌রীর স্বর্গা-রোহণের পর, জল স্থল উভয় পথেই সন্ধান-চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইল।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বারথোলেমু ডায়া নামক নাবিকবর দক্ষিণ সমুদ্রপথে প্রেরিত হইলেন। মিশরপথে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কোভিল্‌হাম ও পয়ভা নামক স্থলপর্য্যটকদ্বয় বহির্গত হইলেন। ডায়া যখন জলপথে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে এই দুই স্থলপর্য্য-টক ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, লোহিতসাগরতীরের সুবিখ্যাত এডেন্‌-বন্দরে উপনীত হইলেন। কোভিল্‌হাম তথা হইতে একখানি আরবীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তাঁহার সহচর লোহিত-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আবিসিনীয় রাজ্যে গমন করিলেন।

কোভিল্‌হাম ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের বিবিধ বন্দর পরিদর্শন করিয়া, তথা হইতে আফ্রিকার পূর্ব্বদক্ষিণ "সোফালা" বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। সেকালে সোফালা হইতে মাদাগাস্‌কর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে যাতায়াতের সমুদ্রপথ সুপরিচিত ছিল। এই পথে ভারতবাণিজ্য আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের বিবিধ জনপদে পরিচালিত হইত। কোভিল্‌হাম্‌ বুঝিলেন,—আফ্রিকার দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়া "সোফালা" বন্দরে উপনীত হইবার জলপথ আবিষ্কৃত হইলেই, পর্ত্তুগালের পক্ষে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা সফল হইবে। তিনি এই সুসমাচার বহন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে মিশরে উপনীত হইয়া সহচরের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কোভিল্‌হামের স্বদেশযাত্রা রহিত হইল! তিনি সমস্ত সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া, স্বদেশে প্রেরণ করিলেন; এবং আবিসিনীয়া রাজ্যে গমন করিবার জন্য পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কোভিল্‌হামই ভারতবাণিজ্যের অভিনব জলপথের প্রকৃত আবিষ্কার-কর্ত্তা। কিন্তু তিনি আবিসিনীয় রাজ্যে

বিবাহ করিয়া, তদ্দেশেই জীবনক্ষয় করিয়া, ইতিহাসে অপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন!

কোভিল্‌হামের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্ত্তুগালে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই নাবিকবর ডায়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমাগত অকুতোভয়ে দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিতে করিতে আফ্রিকার দক্ষিণসীমা-সংলগ্ন সমুদ্রপথে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অর্ণবপোত সে ঝটিকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, বহুদূরে নীত হইয়াছিল। ঝটিকা-শেষে নাবিকবর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার অর্ণবপোত আফ্রিকার দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের ভারতসাগরে উপনীত হইয়াছে! তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। নাবিকগণ অশান্ত হইয়া উঠিল। অজ্ঞাত সমুদ্রপথে বহুদূরে আসিয়া ঝটিকাতাড়নায় তাহাদের জীবনের আশা তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অগত্যা ভারতবর্ষে উপনীত হইবার গৌরবলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নাবিকবর ডায়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ঝটিকাতাড়িত হইয়া, আফ্রিকার দক্ষিণসীমার "ঝটিকান্তরীপ" নামকরণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালের নরপতি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ভারত-বাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত হইবার আশার সন্ধানলাভ করিয়া, তাহাকেই "উত্তমাশা অন্তরীপ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন।

কোভিল্‌হামের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্ত্তুগালে উপনীত হইবামাত্র জনসাধারণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের গমনাগমনের অভিনব জলপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি রহিল না। কোভিল্‌হাম যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই ভারতযাত্রার পথ-প্রদর্শক হইল। তিনি লিখিয়াছিলেন,—গিনি প্রদেশের উপকূল পর্য্যন্ত যে সকল অর্ণবপোত প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহারা অধ্যবসায়ের সহিত দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই আফ্রিকার দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়া, ভারতসাগরে উপনীত হইবে। তথায় "সোফালা" বন্দরের সন্ধান করিয়া লইতে পারিলেই, ভারতবর্ষে উপনীত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। এই সুসমাচারের পর্ত্তুগাল ভারতযাত্রার যথাযোগ্য আয়োজন করিবার জন্য উৎসাহিত হইল। রাজকুমার হেনরীর অসাধারণ আত্মত্যাগ সফল হইল;—পর্ত্তুগালের অকুতো-

ভগ্ন নাবিকবর্গের দীর্ঘ অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইল ;—ইউরোপের নব-জীবনলাভের এই প্রথম প্রভাতে, এসিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হইল! "উত্তমাশা অন্তরীপ" ইউরোপের ও এসিয়ার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে ; তাহার কথা এখন বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দেরও কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

এখনই আমাদিগের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে, পরিণাম ভাবিয়া কিছু ব্যাকুল হইবার কারণ উপস্থিত হয়। একবার কল্পনা করুন যে, আমাদিগের পদের অঙ্গুলি নাই ; কেবল পদতল দ্বারা পদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে! তাহা হইলে কিরূপ বোধ হয়? আমার মনে ত একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মনে হয়, যেন প্রত্যেক পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইতেছি ; অন্ততঃ পিচ্ছিল স্থানে যে কিরূপে চলিব, তাহা সম্পাদকমহাশয়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না! কিন্তু এই অঙ্গুলিহীন কাল্পনিক অবস্থাই বোধ হয় আমাদিগের যথার্থ পরিণাম ; আর নানা কারণে সেই দিকেই আমাদিগের চরণ অগ্রসর হইতেছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

আমাদিগের অব্যবহিত নিম্নতম জীবগণের হস্ত ও পদের অঙ্গুলির সহিত আমাদের কর-চরণের অঙ্গুলির তুলনা করুন। সেই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের ভক্তবৃন্দের পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠগুলি অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে একটু ব্যবধানে স্থিত, এবং পদের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কোণ থাকে যথা।/। অর্থাৎ, আমাদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যেমন তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে ও একটু ব্যবধানে অবস্থিত, তাহাদিগের পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অবস্থানও সেইরূপ। কিন্তু আমাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তন দেখুন। উহা পদের তর্জ্জনীর দিকে অনেকটা সরিয়া আসিয়াছে। এখন আর ব্যবধান নাই বলিলেই হয়। তর্জ্জনীর সহিত ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর সূক্ষ্ম কোণ নাই, এখন প্রায় সমান্তরাল-

ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বানরাদি জীবের ন্যায় পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমরা আর পার্শ্বের দিকে বেশী ব্যবহার করিতে পারি না, কিংবা উহা দ্বারা জোর করিয়া কোনও দ্রব্য ধরিতে পারি না। উহার সঞ্চালিত হইবার শক্তি ও অন্য বস্তু ধরিবার বলের অনেক হ্রাস হইয়াছে। আমরা নির্ভয়ে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি। সুতরাং পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বানরগণের ন্যায় ফাঁক করিয়া দিয়া ভূমিতে জোর করিয়া দাঁড়াইবার ও সেই ভাবে দেহের ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখিবার আবশ্যক হয় না।

বিড়ালাদি জীবগণ উঠিয়া দাঁড়ায় না। আমাদিগের ন্যায় তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থি নাই। কেবল তাহার স্থলবর্ত্তী নখমাত্র আছে। অন্য নখের সহিত তাহার সংস্রব নাই। তাহা ভারবহনও করে না; কেবল অস্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহার পরে, বানরাদি পশু; যাহারা কথন কথন দাঁড়ায়, কিন্তু ভাল করিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। তাহাদিগের দেহ-ভার বহন করিবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে একটু ব্যবধানে ও পদের সহিত বক্রভাবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কোণে থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের ভার বহিবার জন্য আশ্রয়ের স্থানের বিস্তৃতি হয়; তাহাতে ভার-কেন্দ্র ঐ আশ্রয়ের বাহিরে যায় না। গণিতজ্ঞ জানেন যে, এরূপ না হইলে, ঐ সকল জীব পড়িয়া যাইত, দাঁড়াইতে পারিত না।

সর্ব্বশেষে মানুষ; নির্ভয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়। তাহার পদের পেশী ও শিরাতে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার বাহু, স্কন্ধ ও মস্তকের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবার আবশ্যক হয় না। সেই জন্য মানবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, জীবের প্রয়োজনবশতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলির নিকট-বর্ত্তী স্থান হইতে সূক্ষ্ম কোণে সরিয়া গিয়াছিল; পরে ঘুরিয়া আসিয়া সমান্তরালভাবে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। উহার বলক্ষয়ও ঘটিয়াছে। কারণ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আমাদিগের আর কিছুই ধরিবার আবশ্যক না হওয়ায় উহা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়াছে। কিন্তু কেবল বলক্ষয় নহে, উহার অঙ্গক্ষয়ও ঘটিয়াছে। আমাদিগের পদের অথবা হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিগুলির প্রত্যেকের তিন তিনটি অংশ আছে। অর্থাৎ, যে ভাগ অঙ্গুলিনামে খ্যাত, তাহার প্রত্যেকটিতে তিনটি সন্ধি (গাঁইট) ও তিনটি ভাগ বা অংশ আছে। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলির তাহা নহে; উহার দুইটি সন্ধি (গাঁইট)

ও দুইটি ভাগ বা অংশ আছে। সুতরাং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একটিকে হারাইয়াছেন। পদতল এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কুব্জ অথবা 'খাল' হইয়াছে। আর পদপৃষ্ঠে অঙ্গুলির মূলের সহিত সংলগ্ন যে সকল অস্থি রহিয়াছে, যাহাদিগকে গূঢ়াঙ্গুলি বলা যাইতে পারে, (Metatarsus) তাহা প্রায় পূর্ব্ববৎ থাকিলেও, প্রকৃত অঙ্গুলি ভাগের খণ্ডাস্থি সকল মধ্যস্থলে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শেষে তাহার কি অবস্থা হইবে, তাহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দশা দেখিলে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অঙ্কিত চিত্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ১ ও ২ এই দুই খণ্ড; অন্যান্য অঙ্গুলির ১। ২। ৩ প্রত্যেকের এই তিনটি খণ্ড। গূঢ়াঙ্গুলির সহিত গণনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য অঙ্গুলির ৪।৪ ভাগ বা অংশ, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অংশ তিনটি মাত্র।
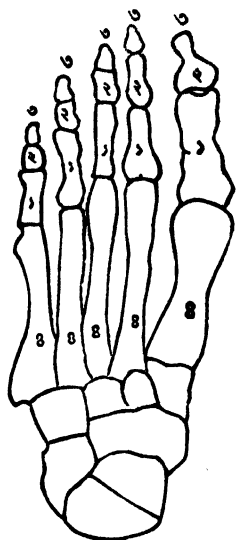
বাম পদ।

সুতরাং বৃদ্ধ একটি হারাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের যেমন একটি অঙ্গ গিয়াছে, তেমনই আবার স্থূলতায় তিনি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন! হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির তুলনায় অথবা হস্তপদের অন্যান্য অঙ্গুলির তুলনায় পদাঙ্গুষ্ঠ অত্যন্ত স্থূল হইয়াছে। আর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিও একটি অংশ খোয়াইয়াছেন, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত স্ফীত না হইলেও, অপর বৃদ্ধের সমব্যবসায়ী বলিয়া, এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই চিত্রের আর এক ভাগ দেখুন। সকল খণ্ডাস্থিরই (Phlanges) আগা ও গোড়া মোটা ও মাঝখানটা সরু হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রভাগের খণ্ডাস্থিগুলি অর্থাৎ (৩) চিহ্নিত খণ্ড সকল অতীব ক্ষুদ্র হইয়াছে, এবং মধ্যভাগ এত সরু হইয়াছে যে, প্রায় খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। গূঢ়াঙ্গুলিই কিছু দীর্ঘ ও সুস্থকায়। তাহাও বড় জোর করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক, তাহাই যেন ধরিয়া লওয়া গেল। কিন্তু যেগুলি অঙ্গুলি নামে খ্যাত, সেগুলির প্রত্যেক খণ্ডাস্থি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ; এবং হস্তের অঙ্গুলির খণ্ডাস্থির সহিত তুলনায় দেখা যায়, পদের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা

অঙ্গুলির খণ্ডাস্থি নিতান্তই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এত বড় দেহের ভারটা পদযুগলকেই বহন করিতে হয়। ব্যাপারটা গুরুতর নয় কি? তাহার পর পদের যিনি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, একবার তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে, অশ্রুসংবরণ করা যায় না। তিনি এত ক্ষুদ্র যে, তাঁহার তিনটি খণ্ডাস্থি এক রকম তাঁহাকে জবাব দিয়াছে, বলিলেও চলে। তাহারা ক্ষুদ্রতম ও ক্ষীণতম। কনিষ্ঠের নড়িবার চড়িবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। তিনি এখন কেবল না থাকার মত কোনও রূপে দেহধারণ করিয়া আছেন! তাঁহার পেশীগুলি প্রায় কোনও কাজই করে না। সকল অঙ্গুলিরই পেশীগুলি মৃতকল্প। সুতরাং অঙ্গুলিগুলির পরিণাম ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। অস্থিগুলি ক্ষুদ্র হইতেছে; তাহাদিগের মধ্যভাগ ক্ষীণ হইতে হইতে প্রায় খসিয়া পড়িবার উপক্রম ঘটিয়াছে। পেশীগুলি আর তেমন কাজ করে না। বৃদ্ধ যিনি, তিনি ত একাংশ হারাইয়াছেন; কনিষ্ঠ মুমূর্ষুর অপেক্ষাও সঙ্কটাপন্ন। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি অঙ্গুলি হীন-পদতল-বিশিষ্ট জীব হইতে চলিলাম? তাহা হইলে শ্রীচরণকমল যে বড় কদাকার হইয়া উঠিবে! পুরুষ অপেক্ষা নারীর পদাঙ্গুলির পরিবর্ত্তন আরও বিস্ময়াবহ। এই দুর্দ্দিনে একমাত্র আশার স্থল পদের তর্জ্জনী। তিনি এখনও আর সকলের অপেক্ষা অবিকৃত আছেন। ইনি আরও বহু দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিবেন, এমন ভরসাও করা যায়। তর্জ্জনীর অদৃষ্ট যদি এইরূপ প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে হয় ত একবারে অঙ্গুলিহীন না হইতেও পারি। অন্ততঃ তর্জ্জনীটি থাকিতে পারে। সেই ভবিষ্যতের চরণ দেখিতে কতকটা এইরূপ হইতে পারে। * কিন্তু ইতোমধ্যেই পদশত্রু ট্রাম, বাইসিকল, মোটর প্রভৃতি যেরূপ সাংঘাতিক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই পায়ের কপাল ভাঙ্গিয়াছে! তর্জ্জনীও যদি অন্যান্য অঙ্গুলির গতি অবলম্বন করে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ভবিষ্যতের বাম পদ।

---

* ডাক্তার ওয়েডারকোম আর একটু আশা দিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, তর্জ্জনীর সহিত বৃদ্ধটিও বা থাকিতে পারে। "It might therefore be predicted of the human foot that it may end by possessing only two two-jointed toes, the great toe and its neighbour.—*Weidershian's structure of man.*" Translated by *Bernard* p. 90.

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিতান্ত অনুন্নত জীবগণের পদের ব্যবহার প্রধানতঃ ভ্রমণকালে দেহ-বহন। কিন্তু বানরাদির পদ, ভ্রমণ ও বস্তুগ্রহণ এই উভয় কার্য্যই সম্পাদন করে; আবার, মানুষের পা বস্তুগ্রহণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং প্রয়োজনভেদে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও নানা-অবস্থাপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ বিড়ালাদি জীবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থি নাই, কেবল সূক্ষ্মাগ্রযুক্ত নখমাত্র আছে; বানরাদির বৃদ্ধাঙ্গুলির অস্থি হইয়াছে, কিন্তু তাহা তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে অবস্থিত। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি উহার সহিত সমান্তরালভাবে স্থিত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সহিত পেশী সকলও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষের পা প্রধানতঃ ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়ায়, পায়ের নলী-সংযুক্ত পেশী সকল দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু পদের অঙ্গুলি বস্তু-গ্রহণ কার্য্য পরিত্যাগ করায়, অঙ্গুলি-সংযুক্ত পেশী সকল ক্ষীণ অথবা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; কোনটি বা অঙ্গুলির সংযোগ ত্যাগ করিয়াছে। * যে সকল পেশী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা ক্ষীণও হইয়াছে; এবং যে সকল পেশী অঙ্গুলির সংযোগ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হওয়ায়, অঙ্গুলির সঞ্চালন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, কালক্রমে অঙ্গুলিও অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। দুর্ব্বল, ক্ষীণ, ভগ্ন ও লুপ্ত হওয়া কেবল কালসাপেক্ষ, এইমাত্র।

তাহার পর, হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর এক অবস্থা কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার খণ্ডাস্থি যেন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রস্তুত হয়। ঐ দুই খণ্ড অস্থি যেন একত্র জুড়িয়া দিলে একটি গোটা অঙ্গুষ্ঠ হয়। ইহাতে উভয় বৃদ্ধেরই বলহানি ঘটে, এবং বর্ত্তমান অবস্থা লোপ পাইবার

---

* A further consequence of the transformation of the hind limb into a supporting and ambulatory organ is that some of the flexor muscles which originally ran down without interruption to the sole of the foot have become interrupted at the protuberantia calcanei by the dorsal flexion entailed * * * * The short flexor has shifted its point of origin further and further down, till at last, on the acquisition of the upright gait, it has reached the calcareal tuberosity. * * * At present it shows in many ways, e, g, in the variaton of its terminal tendors and the frequent absence of that to the fifth toe, evidences of a retrogressive tendency.

Structure of Man. p. II0. III.

সাহায্য করে। ইহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উন্নতির পরিজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কখনও কখনও বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বে পৃথক আর একটি অঙ্গুলি হয়। ইহা হাতেরই হইয়া থাকে। তজ্জন্যও বৃদ্ধের বলক্ষয় ও অবনতির সূত্রপাত হয়।

পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দুর্দ্দশার কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ইহার অস্থি, পেশী, সকলই ইহাকে অধোগতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আমাদিগের সমক্ষে ঘটিতেছে; অথচ ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। এই অঙ্গুলি কখনও কখনও নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলির সহিত মাংস ও চর্ম্ম দ্বারা জড়িত হয়। তাহাতে উহার ক্ষীণ অস্তিত্ব ক্ষীণতর হয়। উহার কার্য্য ও চেষ্টা আরও পরায়ত্ত হইয়া পড়ে। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও কখনও কখনও তর্জ্জনীর সহিত চর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যায়। তাহাতে বৃদ্ধেরও স্বাধীন কার্য্য ও চেষ্টার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইহাকেও একটি অবনতিসূচক ঘটনা বলিতে হইবে। সুতরাং নানা কারণে এ কথা একরূপ নিশ্চিত হইতেছে যে, অঙ্গুলি সকলের অন্য কারণে উন্নতিবিধান না হইলে, ইহাদিগের লোপ অবশ্যম্ভাবী। ডাক্তার ওয়েডারকোম ও অধ্যাপক টমসন প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও একবারে আশাশূন্য হন নাই। ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যখন আমাদিগের পদ আর বানরাদির পদের ন্যায় বস্তুগ্রহণ কার্য্য না করাতেই প্রধানতঃ এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তখন বস্তু-গ্রহণ কার্য্যে আবার পায়ের অঙ্গুলি সকলকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেই, ক্রমে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। জাপানী স্ত্রীলোকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। জাপানীগণ সকল বিষয়েই জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছেন। অঙ্গুলিগণের পুনর্জীবনপ্রাপ্তিও কি তাঁহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে? জাপানী নারী শেলাই করিবার সময় পদের অঙ্গুলি সুতা টানা কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যবহার করিতে পারেন; পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা বেশ চিম্‌টি কাটিতে পারেন! বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্বতন্ত্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চালন করিতে ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু জোরে ধরিতে পারেন। * এইরূপে ক্রমে পদাঙ্গুলির

---

* The use made by the Japanese of the great toe as a thumb is very remarkable. It can be independently moved and strogly pressed against the second toe that even small objects can be firmly held between them. A woman when sewing may hold the stuff with her

ব্যবহার-বৃদ্ধির সহিত এই দুর্দ্দশারও অবসান হইতে পারে। অধুনা ব্যবসায়-ভেদে মনুষ্যের পদাঙ্গুলির প্রয়োজন বাড়িতেছে, এবং ক্রমে বাড়িবে, বোধ হইতেছে। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের যুগে শুধু হাতে বোধ করি আর কুলাইবে না। সুতরাং পাঠকগণ, বিশেষতঃ অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-চরণা পদারবিন্দ-গৌরবময়ী পাঠিকাদিগের বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই! আমি কেবল ভয় দেখাইতে আসি নাই, কিয়ৎপরিমাণে আশাও দিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের অধিক দোষ। কারণ, পদাঙ্গুলির অ-ব্যবহার তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদিগের প্রকৃতি স্থিতিশীল; সুতরাং পুরুষের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অঙ্গুলি সকল খর্ব্ব ও ক্ষীণ। পুরুষের অঙ্গুলি বড় ও সবল, তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল।* যদি সত্যই কখনও অঙ্গুলিগুলির উচ্ছেদ ঘটে, তবে তাঁহারাই সে জন্য দায়ী।

শ্রীশশধর রায়।

স্মৃতি।
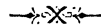
১

সমস্ত দিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গম্ভীর, নিস্তব্ধ। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া 'সিভিল' সাহেবের গম্ভীর মুখশ্রীর সহিত আকাশের গাম্ভীর্য্যের তুলনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে খাস্‌কামরা হইতে আমার ডাক পড়িল।

অনেক চেষ্টায় চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরীটি জুটাইয়াছিলাম। সে চেষ্টার বর্ণনা করিতে গেলে, কাহারও ধৈর্য্য থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। এত কষ্টে যে চাকরীরত্ন লাভ করিয়াছি, নবীনমেঘে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ সিভিল সাহেবের মেঘাচ্ছন্ন বদনে দন্তপংক্তির বিকাশ দেখিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'কেও বিসর্জ্জন দিবার স্পৃহা প্রবল হইয়া

---

toes, * * * and can pinch effectively with them. Balz. The bodily characteristics of the Japanese quoted by weidustein.

* Structure of Man. p. 89.

উঠিত। তথাপি পোষ্যবর্গের কথা স্মরণ করিয়া, বহুকষ্টে আত্মসংযম করিতাম।

আমি দরিদ্রের সন্তান। পিতা ধনীর পুত্র হইয়াও ভাগ্যদোষে আজ নিঃস্ব। আমার বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য, আমার একখানি পাঠ্যপুস্তকের জন্য বাবা যখন ম্লানমুখে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সেই ক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি বাঁচিয়া থাকি, পরিবারের এ দুঃখ দূর করিব। সেই প্রতিজ্ঞা চল্লিশ টাকার চাকরীটিতে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'অদৃষ্ট' বলিয়া একটা কথা আছে। স্মিতি ক্যাম্বেল হইতে বাহির হইয়াই বিনা কষ্টে পঞ্চাশ মুদ্রার চাকরীটি লাভ করিয়াছিল। এই দুর্ল্লভ চাকরী ও তদুপরি অতিদুর্ল্লভ সিভিল সাহেবের অনুগ্রহ, উভয়ই তাহার 'অদৃষ্টে' ছিল, বলিতে হইবে। আমিও প্রায়ই যাহা লাভ করিতাম, তাহাও আমার 'অদৃষ্ট'! অতএব অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া পোর্টম্যাণ্টো হইতে আর্য্যমিশনের গীতাখানি বাহির করিয়া মনকে নির্ব্বিকার করিবার চেষ্টা করিতাম। তাহার ফলে, মনের বিকার উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিত। আজ তাহা বিষম-বিকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় খাস্-কামরার আহ্বান আমার নিকট উপস্থিত হইল।

দেখিলাম, সাহেবের গলায় গলাবন্ধ বেষ্টিত হইয়াছে, এবং পদতলে ফোমেণ্ট হইতেছে। এ দৃশ্য আমার চক্ষে নিতান্ত নূতন নহে। যদি এই ঘোরতর বর্ষার সময়ও অসুখ না হয়, তবে বিধাতার অসুখ-সৃষ্টিটাই মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব বর্ষা ও সিভিল সাহেবের পীড়া ও এ অধীনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ, এ সমস্তই পঠিত পুস্তকের চিরপরিচিত পংক্তির মত পূর্ব্ব হইতেই আমার বিদিত ছিল। সুতরাং ব্যাপার বুঝিতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না।

আমার প্রভু নাকের উপর হইতে চশ্‌মাখানি একটু ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; স্বরে ও দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কোমলতা-প্রকাশের জন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার! এই পত্র পড়িয়া দেখ। কেস্ বড় কঠিন। মিস্ সেনকে লইয়া শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না; আমার শরীর যে নিতান্ত অসুস্থ, এ কথাও জানাইও। এরূপ অসুস্থ শরীরে বাহিরের ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইতে পারে, এ জন্য আজ আমি যাইতে পারিলাম না।"

স্মৃতির সঙ্গে ‘কলে’ যাইবার সুযোগ পরিত্যাগ ডাক্তার সাহেবের পক্ষে এই প্রথম। তাই আমার মনে হইল, আজিকার অসুস্থতার মূলে কিঞ্চিৎ সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া স্মৃতির সন্ধানে চলিলাম।

হাঁসপাতালের অতি নিকটেই স্মৃতির আবাস। স্মৃতির এক জন দাসী ছিল, কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় কখনই তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইত না। দুই একবার ঘণ্টা বাজাইয়াও যখন কোনও উত্তর পাইলাম না, তখন আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত মনে না করিয়া, আমি পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

স্মৃতি নতজানু হইয়া কার্পেটের উপর বসিয়া ছিল। হাত দু'খানি অঞ্জলিবদ্ধ, দৃষ্টি উর্দ্ধে, চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। আমার উপস্থিতি সে বুঝিতেও পারিল না।

লোকের সঙ্গে লোকের সর্ব্বদাই দেখাশুনা ও আলাপ হয়, তথাপি কেহ কাহারও পরিচয় পায় না। এতদিন আমি স্মৃতিকে কেবল এক জন ধাত্রী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আজ তাহার নূতন পরিচয় পাইলাম।

২

বর্ষা ও ডাক্তার সাহেবের অসুখ বাড়িয়াই চলিল; আমাকে ও স্মৃতিকে তিন রাত্রি রোগীর কক্ষে রাত্রিজাগরণ করিতে হইল।

তিন দিনের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইল। সূর্য্যের প্রসন্ন মুখচ্ছবি প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, একটা দীর্ঘ সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যেন সহসা জাগিয়া উঠিলাম। এই তিন দিনে জগতে যেন কতই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যেন এই তিন রাত্রির মধ্যে আমার নীরস জীবনের পরিবর্ত্তে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছি; পুরাতন জীবনের সহিত আর কোনও মতেই তাহার মিল হইতেছে না।

ডায়েরী খুলিবামাত্র একখানি অর্দ্ধলিখিত পত্রে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। তিন দিন পূর্ব্বে পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিতে পারি নাই। পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমি তিন দিনের ছুটীতে বাড়ী গিয়া বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলাম। পত্রখানি আমার নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি প্রথম-সম্ভাষণ। ডায়েরী হইতে বাহির করিয়া পত্রখানি একবার পড়িয়া দেখিলাম, তাহার পর দেশলাই জ্বালিয়া তাহার অগ্নিকৃত্য সম্পন্ন করিলাম।

মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনের অস্থিরাবস্থায় পাদচারণটা নিতান্ত স্বাভাবিক। আমি ছাতে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

নানারূপ তত্ত্বকথার মীমাংসা করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া পড়িলাম। সহসা আমার দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হইয়া পদযুগলকে যেন আকর্ষণ করিয়া বাগানের দিকে লইয়া গেল।

৬

স্মৃতি ঝাউগাছের তলায় দাঁড়াইয়া ছিল। তিন রাত্রি জাগরণের পরও এমন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যে তাহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া ঝাউগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল।

স্মৃতিরও সেইরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বোধ হইল, তাহার মনে বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দের মাত্রাটাই অধিক।

ডাক্তার সাহেব সময়ে অসময়ে স্মৃতির সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেন, স্মৃতিকে তখন বড়ই অল্পভাষিণী বলিয়া বোধ হইত। আমি পূর্ব্বে কখনও তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করি নাই, দূর হইতে উভয়ের সম্ভাষণ দেখিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইতাম। কিন্তু এই তিন দিনে বুঝিয়াছিলাম, স্মৃতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল বকিয়া যাইতে পারে।

স্মৃতি বলিল, "আমার বাবার সমাধির উপর ঠিক্ এইরকম একটি ঝাউগাছ আছে। এই ঝাউগাছটি দেখিলেই আমার সেই গাছটির কথা মনে পড়ে। আমার এখানে আসিতে বড় ভাল লাগে। বাড়ীতে আমি যখনই অবসর পাইতাম, তখনই বাবার সমাধির কাছে সেই ঝাউগাছের নীচে বসিয়া থাকিতাম।"

আমি ঝাউগাছটির দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। কি জানি কেন, বাবার সেই বিদায়কালের অশ্রুনিরুদ্ধ দৃষ্টি সহসা মনে পড়িয়া গেল।

স্মৃতি বলিতে লাগিল, "বাবার সমাধির পাশেই আমার মার সমাধি। মার সমাধির পাশে একটি যুঁই গাছ আছে, গ্রীষ্মকালে রাশি রাশি সাদা যুঁই সাদা পাথরের উপর পড়িয়া থাকে। মায়ের কথা আমার ভাল মনে পড়ে না; তিনি যখন স্বর্গে যান, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। তাঁর একখানি 'ক্রস্' ছিল, সেই ক্রস্‌খানি তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বাবা

সেখানি সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন। বাবা মৃত্যুকালে সেখানি আমাকে দিয়া গিয়াছেন। সেই ক্রস্ আর বাবার ছোট ফটোখানি, বাবা ও মার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাকে।"

এই বলিয়া স্মৃতি তাহার লকেটটি খুলিয়া আমার হাতে দিল। লকেটের সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের ক্রস্ ছিল। লকেটটি খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর ছোট একখানি ফটো। সেইটি তাহার পিতার প্রতিকৃতি।

স্মৃতি তখন অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। স্মৃতির অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে অশ্রুর সঙ্গে কি মুক্তার তুলনা হইতে পারে? আমার মনে হইল, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা এই অশ্রুবিন্দু দুইটির মূল্য অধিক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই তিন দিনের পরিশ্রমের পর বাগানে না আসিয়া তোমার একটু বিশ্রাম করা উচিত ছিল।"

তিন দিনের মধ্যে শিষ্টাচার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং আত্মীয়তার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল।

স্মৃতি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া বলিল, "বিশ্রামের কথা বল্ছেন? আপনি ব্যবস্থা দিতেছেন, কিন্তু নিজে তাহা পালন করিতেছেন না কেন?"

আমি উত্তর দিবার উপক্রম করিতেই স্মৃতি আবার বলিল, "আমার বাবা দিনরাত যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, সে কথা মনে করিলে এ সামান্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে হয় না। কি আশ্চর্য্য! এত পরিশ্রমের পরেও তাঁহাকে কখনও ক্লান্ত কি বিরক্ত হইতে দেখি নাই, তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও হাস্যময় থাকিত। ধর্ম্মে তাঁহার কি শ্রদ্ধা—যীশুর প্রতি তাঁহার কি প্রবল প্রেমই ছিল!" বলিতে বলিতে স্মৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"ওঃ! সে চিঠির কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।—বাবার কথা মনে হইলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না।—আমার ধর্ম্মপিতাকে ডাক্তার সাহেবের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা জানাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি আমাকে এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিতে লিখিয়াছেন।"

"চিঠি পড়িয়া তুমি কি স্থির করিলে?"

"এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, মনে করিয়াছিলাম। আপনি কি বলেন?"

"আমি—" বলিয়া আমি কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলাম। এই কয়েক মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্কে প্রবলবেগে এক সঙ্গে এত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল যে, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এই রকম করিয়াই মানুষ পাগল হইয়া যায়। সহসা উন্মত্তের মত স্মৃতির হাত ধরিয়া বলিলাম, "স্মৃতি, স্মৃতি, বল, আমি যদি তোমাকে জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী করিতে চাই, তাহাতে কি তুমি সম্মতি দিবে না?"

৪

আমার নিয়ম ছিল, বাবাকে নিয়ম মত দুই দিন অন্তর পত্র লিখিতাম। শত কাজের ভিড়েও এ নিয়ম চিরদিন পালন করিয়া আসিয়াছি। যখন মনে হইত, বাবা কত ব্যাকুলতার সহিত সেই কয়েকটি কালীর অক্ষর দেখিবার জন্য পিয়নের পথ চাহিয়া আছেন, তখন অসময়ের মধ্যেই সময় পাইতাম। কিন্তু এবার আমার দুই সপ্তাহ বাবাকে পত্র লেখা হইল না।

এই দুই সপ্তাহ যে আমার কি ভাবে কাটিয়াছিল, আমি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেও, তাহা স্মরণ করিতে পারি না।

সিভিল সাহেব তিন সপ্তাহের ছুটী লইয়া গিয়াছেন, আমার উপরেই সমস্ত কাজের ভার ছিল। স্মৃতি সর্ব্বদা আমাকে সাবধান করিয়া না দিলে রোগীদের অবস্থা যে কি হইত, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সুখের মধ্যে এই, কাজকর্ম্মের বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু ডেস্কের ভিতর বাবার দুখানি চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে, সে দুখানি খুলিয়া পড়াও হয় নাই।

অনুতপ্তচিত্তে চিঠি খুলিলাম। এমন সময়ে হাস্যময়ী স্মৃতি আসিয়া আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "চিঠিখানি কার?"

"আমার বাবার চিঠি।"

দেখিলাম, স্মৃতির প্রফুল্লবদনে একটু অন্ধকার ছায়া পড়িল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি খৃষ্টান হইলে তোমার বাবার মনে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হইবে।" স্মৃতি মৌখিক হাস্যে তাহার আন্তরিক বিষাদ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কেন খৃষ্টান হইব? তুমিই ত হিন্দু হইতেছ!"

স্মৃতি ভাবিতে ভাবিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হিন্দু হ'লে তো আর যীশুকে ভালবাসিতে পারিব না, সে কেমন ক'রে হ'বে?"

"কেন, হিন্দু হ'লে কি যীশুকে ভালবাসা যায় না? আমি তো যীশুকে কত ভালবাসি।"

"সত্য তুমি যীশুকে ভালবাস?" বলিতে বলিতে স্মৃতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৫

পরদিন প্রত্যূষেই স্মৃতি বলিল, "কাল ভাবিতে ভাবিতে আমার সারারাত্রি ঘুম হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "এত ভাবনা কিসের?"

"আচ্ছা, আমাকে বিবাহ করিতে তোমার বাবা কি মত দিবেন? যদি তিনি মত না দেন, তুমি কেমন করিয়া তাঁর মনে কষ্ট দিয়া বিবাহ করিবে?"

এ কথাটা যে আমিও না ভাবিয়াছি, এমন নয়; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

স্মৃতি ডেস্কের ধারে আসিয়া বাবার চিঠিখানি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বলিল, "কি সুন্দর হাতের লেখা। আমার তাঁকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি তাঁকে খুব ভালবাসিব, খুব ভক্তি করিব, তিনি আমাকে যেমন ভাবে থাকিতে বলিবেন, সেই রকমই থাকিব। তবুও কি তিনি আমাকে ভালবাসিবেন না?"

আমি অন্যমনস্কভাবে স্মৃতির কথাগুলি শুনিতেছিলাম, এমন সময় স্মৃতি বলিয়া উঠিল, "তিনি যে লিখেছেন, 'বধূমাতাকে আনিতে হইবে', বধূমাতা কে?"

আমি কাপুরুষ, এ পর্য্যন্ত বিবাহের কথা স্মৃতিকে বলিতে সাহস করি নাই, কিন্তু এখন আর না বলিলে চলে না।

আমি বলিলাম, "বধূমাতা কে, শুনিতে চাও স্মৃতি? তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র, আমি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করি না।"

"সে কি?" বলিয়া স্মৃতি চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অতিকষ্টে বলিল, "এতদিন এ কথা কেন আমাকে বল নাই?"

আমি বলিলাম, "একবার ভ্রম করিলে আর কি তাহার সংশোধন নাই? এই সামান্য ভ্রমের জন্য কি আমার জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিব?"

স্মৃতি মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কি খেলার ঘর যে, একবার ভাঙ্গিয়া আবার গড়িবে ?"

এই কথা বলিয়া স্মৃতি মৃদুপাদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার প্রতি পদক্ষেপ যেন আমার বুকে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ নিশ্বাস ফেলিতে পারিলাম না।

৬

সেদিন সমস্ত দিন স্মৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্মৃতির দাসীর নিকট শুনলাম, তাহার মাথার যন্ত্রণা বড়ই বাড়িয়াছে, সে জন্য সে শয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই। স্মৃতির মাঝে মাঝে মাথার অসুখ হইত।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলাম। দীর্ঘ রাত্রি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, ঘড়ি বুঝি খারাপ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বদিনের মত অতি প্রত্যূষেই স্মৃতির দেখা পাইলাম। কিন্তু একদিনে তাহার আকৃতিতে কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্মৃতি, মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমিয়াছে ?"

স্মৃতি আমার মুখের দিকে চাহিল না। নতনেত্রে আমার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল, অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আজ আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, বলুন, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"

আমি পাষাণ, তবু চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্মৃতির হাত ধরিয়া তুলিতে সাহস হইল না। গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলাম, "ওঠ স্মৃতি, ওঠ, তোমাকে দিব না, এমন আমার কি আছে ?"

"তবে আমার কাছে এই অঙ্গীকার করুন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সংসারী হইবেন। আর—" বলিয়া স্মৃতি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কাল আমি কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমার একখানি ফটো ও একগোছা চুল আপনার কাছে আছে, ফিরাইয়া দিন। বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করেন নাই ?"

আমরা এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সিঁড়ির উপরে জুতার শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই; এখন সশরীরে সিভিল সাহেবকে গৃহমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া

চমকিত হইলাম। সাহেব ক্রোধকুটিলনেত্রে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গহাস্যের সহিত বলিলেন, "এ ব্যবহার অতি উত্তম!"

* * * * *

ইহার ফলে এই হইল যে, আমার বেতন চল্লিশটি মুদ্রার স্থলে রূপান্তরিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বিংশতি মুদ্রায় পরিণত হইল। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

এখন বহু কষ্টে বেতন কিছু বাড়িয়াছে; সেই সঙ্গে পরিবার ও বাড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর যত্নে এই সামান্য আয়েও সংসারের বিশেষ কষ্ট নাই। এখন আমার তিনটি সন্তান। স্মৃতির সহিত আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, সে এখন চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। অনেক সময় আমি একটি কথা মনে করি, "সব যায়, স্মৃতি কখনও যায় না।"

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

বেদান্ত দর্শন।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈত মতের বিরোধী। আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের স্বরূপ,—নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন যে,—শ্রুতি স্মৃতি, সর্ব্বত্র, যিনি সমস্ত-দোষ-রহিত ও সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণমভিধীয়তে : নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব-কল্যাণ-গুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য; ৩।২।১১।

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

ননু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভি নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যত্র সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যকামত্বাদিকং নেতি নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিসিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যং, তৎ কথং কল্যাণ-গুণাকরত্বনিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি তত্রাহ।—শ্রীভাষ্য; ৩।২।১৪-১৭।

'কেহ কেহ বলেন যে, "ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষ স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "নেতি নেতি" এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্য-সংকল্পত্ব, জগৎ-কারণত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব—ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সে ভাব অবাস্তব, ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাণ গুণের আকর, এবং সমস্ত-দোষ-রহিত, তাঁহার এই উভয়-লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?'

এই পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত-দোষ-রহিত এবং কল্যাণ গুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন, এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতীরা বলেন যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাভাব; সবিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক।* ব্রহ্ম সর্ব্বদাই মায়া-বিশিষ্ট।

মায়িনন্তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

এই মায়া অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্ব্বচনীয় অনাদি ভাব-রূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকর্ত্রী গুণাত্মিকা প্রকৃতি।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

রামানুজের ভাষায়, ব্রহ্ম "নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক" ও "কল্যাণ-গুণগণাকর।" তবে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয় গুণের লেশমাত্র নাই।*

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥
ইত্যাদিভি নিখিল-হেয় প্রত্যনীকত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বঞ্চ অবগম্যতে। * *
সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ॥

---

* কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি, নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

অতোঽপি মায়াশবলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্ব্বদা বিশিষ্টমেব ইতি সিদ্ধম্। * * তর্হি সর্ব্বদা সবিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

* নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

ন হি তস্য গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈর্মুনিগণৈরপি।
বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্য সত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ॥

"এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা", "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভির্নারায়ণস্যৈব পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত-হেয়-গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনেনৈকস্যৈবাবগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্ব্বচনমিতি দিক্॥
—বেদান্ততত্ত্বসার।

"কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম" ; "মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম" ;—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ হেয় গুণের বিপরীত ও কল্যাণ গুণের আধার—ইহাই জানা যায়। এবং নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতিবচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণগুণ-সংযোগে সগুণ ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নির্গুণ ; অর্থাৎ,—সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু সগুণ ও নির্গুণ, ইহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম দ্বিবিধ—ইহা বলা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা,—"বিষ্ণুই সগুণ ও নির্গুণ, তিনি জ্ঞানগম্য।" "তিনি সত্ত্বাদি-অখিল-গুণ-বিযুক্ত। তাঁহার সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না।" "এই পরমাত্মা পাপ-স্পর্শ-হীন।" "ইঁহার বিবিধ পরা শক্তি শ্রুত হয়।" "নারায়ণই পরতত্ত্ব"—ইত্যাদি।*

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান।

---

* With Ramanuja also, Brahman is the highest reality, omnipotent, omniscient : but this Brahman is at the same time full of compassion or love. * * According to Ramanuja, Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him ; while with Shankara, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being. Besides these qualities Brahman is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Ramanuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta. * * Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

[Max Muller's Indian Philosophy, pp. 245, 247-248]

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and, according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one ; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid, p. 251.

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

'কল্যাণগুণান্বিত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম। তিনি ভুবন সকলের উপাদান, কর্ত্তা ও অন্তর্য্যামি-রূপে জীবের নিয়ামক।'

অর্থাৎ, ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি, এবং তাঁহাতেই জগতের লয়।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

অর্থাৎ, 'যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।' ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। সেই জন্য সূত্রকার বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

জন্মাদ্যস্য যতঃ।—ব্রহ্মসূত্র; ১।১।২।

'যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।'

যতো যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি সূত্রার্থঃ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

ঐ সূত্রের অর্থ এই,—'যে সর্ব্বেশ্বর, সকল হেয় গুণের বিপরীত, সত্য-সংকল্পাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণ গুণের আকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম)'।

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম", ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়,—এই তিন পদার্থ।

দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবেশভেদাৎ।

দ্রব্য দ্বিবিধ—জড় ও অজড়। অজড় বা চিতের—জীব ও ঈশ্বর—এই দুই বিভাগ।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ, এবং জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের ন্যায় অবিদ্যার পরিকল্পনা মাত্র; ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনু-মোদিত নহে।

এষো হি তস্য সিদ্ধান্তঃ চিদচিদ্ ঈশ্বরভেদেন ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ামক-ভেদেন ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি। তদুক্তম্,—

ঈশ্বর শ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি॥—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন।

'রামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—পদার্থ এই তিনটি। চিৎ=ভোক্তা, অচিৎ=ভোগ্য ও ঈশ্বর=নিয়ামক; ইহার সমর্থন জন্য তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।—"ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটি; হরি হন ঈশ্বর, জীব চিৎ ও দৃশ্য (জড়) অচিৎ।'

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদ্গীত মেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

'এই যে পর-ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর; ইঁহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদ্গীত হইয়াছে।'

এই তিনটি কি কি? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর)। কারণ, অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।

সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যং ইতরৎ সর্ব্বম্ প্রেরিতা অন্তর্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি।

অর্থাৎ, 'পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।'

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, তাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। কারণ, ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েতেই অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত আছেন।

পরমেশ্বরস্যৈব ভোক্তৃভোগ্যয়ো রুভয়োরন্তর্য্যামিরূপেণাবস্থানম্।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'পরমেশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়েই অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থান করিতেছেন।' অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অন্তর্যামী।

সেই জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। *

---

* Chit and Achit, what perceives and what does not perceive—soul and matter, form, as it were, the body of Brahman, are in fact modes (Prakara) of Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্।—২।১।১৫ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

'কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত বস্তুই পর-ব্রহ্মের শরীর।'

এ কথার সমর্থনের জন্য শ্রীরামানুজ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * যস্য পৃথিবী শরীরং * * যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ * * যস্য বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মনি তিষ্ঠন্ যস্যাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি।—অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ।

'জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে'. 'যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ' 'তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ'; 'তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ'; 'সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ'।

'যিনি (অন্তর্যামি-রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর; যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন, আত্মা যাঁহার শরীর।'

'সমস্ত জগৎ তোমার শরীর'; 'যে অম্বু (কারণার্ণব) বিষ্ণুর শরীর'। 'সে সমস্তই শ্রীহরির তনু'; 'সে সমস্তই তাঁহার বপু'। 'তিনি অনুধ্যান করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন'।

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, এই তিন পদার্থ স্বীকার্য্য হইল, তবে যে শ্রুতি—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ।

"এখানে নানা (বহুত্ব) নাই", "ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়", "অগ্রে এই পরমাত্মাই ছিলেন" ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ঐ সকল একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই নানাত্ব-নিষেধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এই জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনামাত্র; কিন্তু এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র।

একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতম্।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'একই ব্রহ্মের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকারভেদ। তিনি নানারূপে অবস্থিত।'

একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্ব্বং চেতনাত্মকং বস্তু।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

'চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকারমাত্র।'

শ্রুতি যে ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়

এরূপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য বস্তু নাই। সেই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে।

'প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয়।'

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন,—

বস্ত্বন্তরবিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্য এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন,

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টিং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্তে ইদমীশ্বরঃ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।

* * * *

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥
অক্ষরং তমসি লীয়তে। তমঃ পরে দেবে একীভবতি।
ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে।
আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্॥
একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

'নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয়। তিনি মায়াবলে পূর্ব্ব-সৃষ্ট জগৎ কালকলার দ্বারা কল্পান্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত থাকেন। সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন থাকে।'

'আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমাতেই সমস্ত বিলীন হয়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই।'

'অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয়।'

'যখন ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সর্ব্বাত্মা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বিরাজিত থাকেন; তিনিই নারায়ণ প্রভু।'

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্। * * জগদনাদিত্বেঽপি অবিভাগ উপপদ্যতে, যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু তদানীং পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যপদেশানর্হমতিসূক্ষ্মম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

'প্রলয়ে সূক্ষ্মভাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে। তদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সেই জন্য তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্ উপলব্ধি হয় না।'

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন। যখন প্রলয়ে জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই সূক্ষ্ম দশাতে তাহাদের নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা। সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য জড় জগৎ), ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন (দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে।

নামরূপ-বিভাগানর্হ সূক্ষ্মদশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্মকারণাবস্থং জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্থূল-চিদচিদ্-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধ-স্থূলভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

'কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদ-রহিত সূক্ষ্ম-দশাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ শরীর; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর; ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবকেই সৃষ্টি বলে।'

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থং সূক্ষ্মস্থূলচিদচিদ্‌বস্তুশরীরতয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মভূতম্।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

'পর ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার শরীর। অতএব, তিনি সর্ব্বদাই সকলের আত্মা রূপে অবস্থিত।'

অতএব, --

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।

'আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না'--ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল; ইহা দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না। জগৎ স্থূল-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-রূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ। *

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয় (তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫) এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল, এইরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?

কার্য্যমপি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতীতি এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্য উপপন্নতরত্বাৎ।—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

'সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্ম; তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই কার্য্যেরও জ্ঞান হয়। শ্রুতি যে এক বস্তু জানিলেই সকলই জ্ঞাত হইবে—এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এই ভাবে সঙ্গত হইতেছে।'

---

* ননু 'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ', ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্-বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইতি পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ। 'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি' ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মন্যেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্‌গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ।

' "আদিতে এ জগৎ আত্মাই ছিল", এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মাই ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—"যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, এবং যাঁহার দ্বারা প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-বাক্যে জগৎ স্থূল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না। "তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়,"—এই বাক্যে তমঃ-শব্দবাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। একীভাব অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থায় বস্তুর পৃথক্-রূপে নাম গ্রহণ করা যায় না।'

অত্রেদং তত্ত্বং চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দাভিধেয়ং। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াঽপি পৃথগ্ ব্যপদেশানর্হ সূক্ষ্মদশাপন্ন চিদচিদ্বস্তুশরীরং তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম। কদাচিদ্ চ বিভক্তনামরূপ ব্যবহারার্হ স্থূলদশাপন্ন চিদচিদ্বস্তুশরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থমিতি কারণাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ।—২.১.১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্ বস্তু শরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যমিতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ।—২.১.২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

'এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ। ব্রহ্মই সর্ব্বদা "সর্ব্ব" শব্দের বাচ্য; কারণ, চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার। তাঁহার কখনও কারণাবস্থা, কখনও কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-দশাপন্ন, নাম-রূপের স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল-দশাপন্ন নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর। কারণ, পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্য জগৎ অভিন্ন।'

'অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর। কারণ-ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জীব ও জড় শরীর; কার্য্য-ব্রহ্মের (যাহার নাম জগৎ) স্থূল জীব ও জড় শরীর। এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপপন্ন হইতেছে।'

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞানমাত্র—মায়িক অবস্তু। জগৎকে অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ যখন পরিণামী ও বিকারশীল, যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্ব্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্তু বই আর কি?

"বিকারজননীমজ্ঞাম্" "নিত্যঃ সততবিক্রিয়াসি ত্যাদিভিরস্যাঃ সবিকারত্বেন সতত-পরিণামিত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমানসত্তাকত্বম্। অতএবেয়মনৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে।—বেদান্ততত্ত্বসার।

'জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি যখন বিকারী জড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিয়তই পরিণামী, যখন প্রকৃতি একরূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেরূপ অবস্থান করেন),—তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে?'

জগৎ যে ভ্রম নহে—মায়ার বিজৃম্ভণ, বিজ্ঞানমাত্র নহে, এ কথা প্রতি-পাদিত করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্ ন বাহ্যার্থোঽস্তি ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে নাভাব উপলব্ধেরিতি।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অভাবো বক্তুং ন শক্যতে কুতঃ উপলব্ধেঃ জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষব্যবহার-যোগ্যতাঽপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলব্ধেঃ * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * * যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তং তত্রাহ * * বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুং—* * ন ভাবোঽনুপ-লব্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র; ২।২।২৯।

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ কচিদপ্যনুপলব্ধেঃ।

'যদি কেহ বলেন, বাহ্যার্থ (External world) নাই—বিজ্ঞান-মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি,—"নাভাবঃ" এই ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত পদার্থের সত্তা নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। বিষয় না থাকিলে এরূপ হয় কিরূপে? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র হয়। * * বিরুদ্ধ-বাদীরা যে বলেন যে, যখন স্বপ্ন-জ্ঞান নিরালম্বন—তখন জাগরিত-জ্ঞানও আলম্বন-শূন্য, তাহার উত্তর—"বৈধর্ম্ম্যাচ্চ" সূত্র (২।২।২৮)। স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক-ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। অতএব, স্বপ্ন-জ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত-জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন) বলা সঙ্গত নহে। * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের "ভাব" সম্ভব নহে। কারণ, কোথাও না কোথাও তাহার বাধ হইবেই।'*

অদ্বৈত-বাদীর মতে, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। * *

জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি।

---

* ভাবে . উপলব্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র; ২।১।১৬। অসদিতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, .১।১৭; তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫; ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামা-[নু]জাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন।

* * The souls as individuals possess reality. The human spirit is [d]istinct from the Divine spirit.—Max Muller's Indian Philosophy.

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা ইত্যাদ্যাঃ। "ভেদব্যপদেশাৎ, উভয়েঽপি ভেদেনৈনমধীয়তে, ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ, অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদিষু সূত্রেষু চ "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি" "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্যপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়াৎ।*—১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

অর্থাৎ, 'দেহ ও আত্মার যেরূপ স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও ব্রহ্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রসমূহ জীব ও ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপনির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত। শ্রুতি স্মৃতি যথা,—সহযোগী সখ্যশালী দুইটি পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে এক জন স্বাদু ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে। লোকে, সুকৃতের "ঋত"-পানকারী দুই জন পরম পরাৎপর স্থানে গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব্বাত্মা জনগণের শাস্তা অন্তর্যামী। ভেদব্যপদেশহেতু উভয়েই উপদেশ দিতেছেন। ভেদ-ব্যপদেশ হেতু ভিন্ন। ভেদনির্দ্দেশহেতু অধিক ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র। "যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তরে—যাঁহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা যাঁহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্যামী।" "প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত" ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ-সমর্থন জন্য নিম্নোক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং" "আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ"—'বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অখিলের আশ্রয়।'

অন্যত্র রামানুজাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আধ্যাত্মিকাদিতঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকম অর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম কুতঃ ভেদনির্দ্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরব্রহ্ম * 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ * * য আত্মানম্ অন্তরো

---

* জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু—এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নোক্ত সূত্রের উপরও নির্ভর করেন।

ইতরব্যপদেশাদ্ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।—২।১।২১ ব্রহ্মসূত্র।

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন।—১।৩।৪২ সূত্র।

পত্যাদিশব্দেভ্যশ্চ।—১।৩।৪৪ সূত্র।

'যন্নতি স তু আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ' 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা' 'স কারণং করণাধিপাধিপঃ' * 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ' * * 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' * * 'যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যম্ অব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরম্ অন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ এষ সর্বভূতান্তরাত্মা, অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ' ইত্যাদিভিঃ।*

অর্থাৎ, ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র। জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের অধীন। সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে? সেই জন্য শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের জীব হইতে ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা ; জীব ও নিয়ামক (ঈশ্বর) পৃথক্ মনন করিয়া ; তিনিই কারণ ও করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি ; দুইটি অজ ঈশ ও অনীশ, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ। তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু। যিনি প্রকৃতির অন্তরে সঞ্চরণ করেন, প্রকৃতি যাঁহার শরীর, প্রকৃতি যাঁহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের (জীবের) অন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পাপস্পর্শশূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন জীব ব্রহ্ম-খণ্ডও হইতে পারে না। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ—(বেদান্ত-তত্ত্বসার)। তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে,—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২।

ইহার এই অর্থ যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি। যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ। *

---

* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্ত্তা লিখিয়াছেন,—"নৈবং পর" ইতি যথাভূতো জীবস্তথাভূতো ন পরঃ ; যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাত্মতস্তথা প্রভাস্থানীয়-তদংশাৎ জীবাদ্ অংশী পরোপ্যর্থান্তরভূতঃ। "নৈব পরঃ" ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব যেরূপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ। প্রভাস্থানীয় জীব অংশ, এবং পরমাত্মা অংশী, সুতরাং ভিন্ন তত্ত্ব।

* প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫) সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন,—প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ। যথাগ্ন্যাদিত্যাদ্, ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি * যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদের্দেহোঽংশস্তদ্বৎ। * * এবং জীবপরয়োর্বিশেষ্য-বিশেষণয়োরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে।

শ্রুতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; যেমন, সোঽহং, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি। এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্ম-ব্যাপ্য, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক।

ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে।—বেদান্ত-তত্ত্বসার। *

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-কার রামানুজ-দর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরস্তসমস্তদোষমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাস্পদং জগদুদয়বিভবলয়-লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ সমানাধি-করণ্যাং; ত্বং পদং বা চিদ্‌বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুপরত্বাৎ সমানাধি-করণ্যস্য।

অর্থাৎ, তত্ত্বমসি—এই বাক্যে, তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন অসংখ্য অনধিক কল্যাণ গুণের আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহার লীলা-বিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায়। কারণ, তৎ ঐক্ষত—এখানে তৎ-পদে ব্রহ্মকেই বুঝাই-তেছে। তত্ত্বমসি স্থলেও তৎ পদে সেই একই বস্তুকে বুঝায়। ত্বং পদ দ্বারা যিনি চিদ্‌-বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর, সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়। একই বস্তু, অথচ তাঁহার প্রকারের ভেদ আছে,—সমানাধিকরণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে অবশ্য জীব নিত্য-বস্তু।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।

'জীব জন্মেও না, মরেও না।'

এই শ্রুতির বলে তাঁহারা বলেন, জীবের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। এ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী-দিগের সহিত তাঁহাদের এক মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা যে জীবকে বিভু (সর্ব্ব-ব্যাপী) বলেন, ইহাঁরা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত। তাঁহারা বলেন, জীব অণু; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন,—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।

'সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়।'

বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি॥

আরাগ্রমাত্রঃ পুরুষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ।

* তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদিষু তচ্ছব্দবদ্ব্রহ্মশব্দবৎ 'ত্বম্' অয়ম্ আত্মা শব্দোঽপি জীবশরীরকব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ।

'কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

'জীব আরাগ্রমাত্র—অণুপরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে।'

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ। জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয়। সে সিদ্ধি পুনরাবৃত্তি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ।

স্বভক্তং বাসুদেবোঽপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি॥

'বাসুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন।'

তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সোঽয়ং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসঞ্চয়ক্ষীণাশেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিততদাভিমুখ্যস্য সদাচার্য্যোপদেশোপবৃংহিতশাস্ত্রাধিগততত্ত্বযাথাত্ম্যাববোধপূর্ব্বকাহরহরুপচীয়মানশমদমতপঃশৌচক্ষমার্জ্জবভয়াভয়স্থানবিবেকদয়াঽহিংসাদ্যাত্মগুণোপেতস্য বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারাধনবেষনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপসংহৃতিনিষিদ্ধপরিহারনিষ্ঠস্য পরমপুরুষচরণারবিন্দযুগলন্যস্তাত্মাত্মীয়স্য তদ্ভক্তিকারিতানবরতস্তুতি-স্মৃতি-নমস্কৃতি-বন্দন-যতন-কীর্ত্তন-গুণশ্রবণ-বচন-প্রণামাদিপ্রীতপরমকারুণিক-পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বিধ্বস্তস্বান্তধ্বান্তস্যানন্যপ্রয়োজনানবরত-নিরতিশয়প্রিয়বিশদতম প্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানরূপ ভক্ত্যেকলভ্যঃ। তদুক্তং পরমগুরুভির্ভগবদ্‌যামুনাচার্য্যপাদৈঃ—উভয়পরিকর্ম্মিতস্বান্তস্যৈকান্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগলভ্য ইতি॥

'সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিম্নোক্তরূপ সাধকের পক্ষে অন্য প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অনুধ্যান-রূপ যে ভক্তি, তদ্দ্বারাই লভ্য (তাঁহাকে লাভের অন্য উপায় নাই)। কিরূপ সাধক? যাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ-রাশি (ইহজন্মে) অশেষ পুণ্য-পুঞ্জের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে; যিনি পরম পুরুষের চরণারবিন্দে শরণাগতিবশতঃ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সর্ব্বদা আচার্য্যের উপদেশে বিশদীকৃত

* উভয়পরিকর্ম্মিতস্বান্তস্য = জ্ঞানকর্ম্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্য।

শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ভয়, অভয়, বিবেক, দয়া, অহিংসাদি সদ্‌গুণ যাঁহার নিত্য উপচিত হইতেছে; যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের উপ-সংহার এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন; যিনি পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্ব্বস্বকে ন্যস্ত করিয়াছেন; ভগবদ্‌-ভক্তি-প্রণোদিত অবারিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্ত্তন, গুণ-শ্রবণ, বর্চন, ধ্যান, অর্চ্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই।' এই মর্ম্মে ভগবান্‌ যামুনাচার্য্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়-বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জানেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন'—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিদ্যা (কর্ম্ম) ও বিদ্যা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহারা বলেন,—

উপাসনা কর্ম্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন ভ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভক্তস্য তন্নিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বযাথাত্ম্যানুভবানুগুণনিরবধিকানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি।

'উপাসনা-রূপ কর্ম্ম-সহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্দ্বারা যে ভগবদ্‌-ভক্তের ভ্রষ্টৃ-দর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্ত-কালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তি-রহিত স্বপদ প্রদান করেন।' তখন সেই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন।

এই জ্ঞান বাক্য-জন্য আপাত-জ্ঞান নহে। ইহা ধ্যান-উপাসনাদি-শব্দ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার। এই কথার সমর্থনের জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি।

'এই আত্মা, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্য নহেন; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য,—তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

যোঽয়ং মুমুক্ষুর্বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি।

'যখন বেদান্ত-বিহিত বিজ্ঞান-রূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর সেই অনুধ্যানে সুমহতী নিরতিশয় প্রীতির অনুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম পুরুষকে লাভ করেন।'

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল। তিনি লীলাবশে অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামী, এই পঞ্চ রূপে অবস্থান করিতেছেন। অর্চ্চা=প্রতিমাদি; বিভব=রামাদি অবতার; ব্যূহ= বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই চতুর্ব্যূহ; সূক্ষ্ম=সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ * পরব্রহ্ম; এবং অন্তর্য্যামী=সকল জীবের নিয়ামক। সাধক, অর্চ্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্য্যামি-উপাসনায় অধিকারী হয়।

অর্চ্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্মষেঽধি ততো ভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্‌ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্‌॥
সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্য্যামিণমীক্ষিতুমিতি॥—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

সাধক, 'অর্চ্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার অধিকারী হয়; তদন্তর ব্যূহ উপাসনার অধিকারী হয়; তাহার পর সূক্ষ্ম উপাসনায় নিরত হয়; শেষ উপাসনা—অন্তর্য্যামীর।'

অদ্বৈত-বাদীরা যেরূপ সগুণ ও নির্গুণ—উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অনুমোদিত নহে। সেই জন্য রামানুজাচার্য্য প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্‌। ফলঞ্চ একরূপমেব।

অর্থাৎ, সর্ব্বত্র পরাবিদ্যায় সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়, এবং উপাসনার

---

* ষড়্‌গুণম্‌—গুণাঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ। সোঽপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ।

'ষড়্‌গুণ কি কি? পাপহীনতা, রজোশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষরত্ব ও সত্যকাম-সত্যসংকল্পত্ব।'

রূপ একরূপই কথিত হইয়াছে।' এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন ভাষ্য-কার বোধায়ন ও বাক্য-কার টঙ্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণ (সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞত্ব) লাভ করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না।

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥

'মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয়; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বকর্তৃত্ব সম্ভবে।'

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনন্যথাসম্ভবাৎ।—১ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

'এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও, পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না; অবিদ্যার আধারের পক্ষে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি?'

তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্ম-ভাব বা ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব-প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারা তিনি স্বরাট্, অনন্যাধিপতি, সংকল্প-সিদ্ধ হয়েন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। * কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাঁহার অধিকার জন্মে না। বেদান্তের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ। স বা এষ দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বে অস্মৈ দেবাঃ বলিম্ আহরন্তি।

'পশ্য (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় প্রাপ্ত হন, তিনি, ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ করেন। যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই পিতৃগণ উপস্থিত হন; সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্য বলি উপহার দেন।'

---

* সংকল্পাদেব তুচ্ছ্রুতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র,—৪।৪।৮।

অতএব চানন্যাধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র,—৪।৪।৯।

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর মুক্তি *; অদ্বৈত-বাদীর কথিত মুক্তি হইতে ইহা বিভিন্ন। কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয়।

গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং।—৩।৩।২৮ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।

'ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুক্ষুর) লক্ষ্য।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

তিব্বতে বাঙ্গালী।

বিগত ১৮৮১ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এফ্. ক্রফ্ট শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের আদেশ অনুসারে বাবু শরচ্চন্দ্র দাস দার্জ্জিলিঙ্গের তিব্বতীয় বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দাস মহাশয় তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত্তবিভাগের এক জন ছাত্র ছিলেন। প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করিয়া শরচ্চন্দ্র তিব্বতীয়-ভাষা-শিক্ষার্থ প্রভূত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি স্বাধীন সিকিমরাজ্যের অন্তর্গত মঠ-পরিদর্শনে গমন করেন। এই সময়ে তত্রত্য রাজা, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সিকিম-বাসীদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পেমাইয়াংসি নামক মঠের উগায়েন-গায়াৎসু নামক জনৈক লামা সন্ন্যাসী উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত মঠের সন্ন্যাসীরা বিবিধ উপঢৌকন সহ তাঁহাকে তাসিলুনাপো ও লাসা নগরীতে প্রেরণ করেন। দাস মহাশয় তিব্বতে গমন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে

---

* The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise.—Max Muller's Indian Philosophy, page 251.

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their souls being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and alwys remain, one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shamkara, however prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja.—Ibid, page 252.

যদি তিনিও নিষিদ্ধ নগরী লাসায় গমন করিতে পারেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। লামা উগায়েন-গিয়াৎস্থ লাসা নগরীতে উপস্থিত হইয়া বাবু শরচ্চন্দ্র দাসের পক্ষে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইল না। লামা উগায়েন গিয়াৎস্থ ভগ্নোদ্যম হইয়া তাসি লামার দীক্ষাগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাসি-লুন্‌পোতে গমন করিলেন। দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসারে তাসিলামা দাস মহাশয়কে তথায় লইয়া যাইবার জন্য উগায়েন-গিয়াৎস্থর দ্বারা একখানি আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস তাসিলুনপো নগরের প্রধান মঠের এক জন ছাত্রস্বরূপ পরিগৃহীত হইলেন। তিনি যে পথে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহার অনুমতিপত্রও প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত তাসিলামা এরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে কোনও 'জঙ্পন' (বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা) বা তিব্বতবাসীকে উক্ত পত্র প্রদর্শিত হইবে, তিনিই এই ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য করিবেন; এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যে সকল জিনিসপত্র থাকিবে সমস্ত নিরাপদে পৌছিয়া দিবেন।

এই আমন্ত্রণলিপি প্রাপ্ত হইয়াই দাস মহাশয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লামা উগায়েন-গিয়াৎস্থর সমভিব্যাহারে একটি Photographic camera যন্ত্র ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও উপহার দ্রব্যাদি লইয়া তাসিলুনপো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে তিন মাস অবস্থানের পর দাস মহাশয় সদলবলে বৎসরের শেষভাগে দার্জ্জিলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাসিলুন্‌পোর প্রধান সচিব যথাযোগ্য সম্মানসহকারে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে শরচ্চন্দ্রকে পুনরায় তাসিলুন্‌পোতে গমন করিবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন. কিন্তু বিগত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

তাসিলুন্‌পোর যাত্রাকালে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত লামা উগায়েন-গিয়াৎস্থ, এক জন পথপ্রদর্শক ও দুই জন কুলি অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার সহিত একটা পকেট সেক্‌সটাণ্ট বা কোণ-পরিমাপক যন্ত্র, একটি Prismatic compass, দুইটি hypsometers, একটি থার্ম্মোমেটার, একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নগদ দেড় শত টাকা ছিল।

নানাবিধ ঘটনায় এখন দেখা যাইতেছে যে, দাস মহাশয়ের তিব্বত গমনের মধ্যে কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, 'তুষারাবৃত হিমালয় গিরিশ্রেণীর অপরপার্শ্বস্থিত এই অজ্ঞাত নিষিদ্ধ নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় কোনরূপ রাজনীতিক অভিসন্ধি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় নাই। নিষিদ্ধ নগরীতে প্রবেশ করিবার আনন্দ, বিপদকে আলিঙ্গন করিবার আহ্লাদ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আমার মনে তখন স্থান পায় নাই। ঈশ্বরের অবতার লামাদিগকে দেখিবার জন্য এই পবিত্র নগরীর অভিমুখে যখন আমি যাত্রা করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলাম, তখন কোনরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থলাভের আশা, বা উচ্চ রাজপদলাভের প্রলোভন আমার মনে স্থান পায় নাই।

'দার্জ্জিলিঙ্গের তিব্বতীয় বোর্ডিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিবার সময়

(১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) আমি তিনবার সিকিমরাজ্যে গমন করিয়াছিলাম। যখন চিরতুষারাচ্ছন্ন ধূসর বিরাট ও দিগন্তপ্রসারিত গিরিশ্রেণীর ভীমকান্ত রূপ, বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য ও কল্পনাতীত উচ্চতা অবলোকন করিতাম, তখন আমার হৃদয় একটা মহান ভাবে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত! এই অনন্ত হিমারণ্যের অজ্ঞাত অপরিচিত পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে যে সকল ঋষিকল্প পণ্ডিতগণ অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পুণ্যধামে গমনের জন্য, অদৃশ্য অশ্রুতপূর্ব্ব বৌদ্ধ-মঠের অভ্যন্তরে সযত্নরক্ষিত প্রাচীন ভারতের অমূল্য সাহিত্য-রত্নের আবিষ্কারের জন্য, আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। * * * যখনই আমি তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া তিব্বতের সুনীল গগনপ্রান্ত অবলোকন করিতাম, তখনই এই সকল দেব-কল্প লামা ও তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরসমূহ দর্শন করিবার জন্য আমার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিত।

'তিব্বতীয় বোর্ডিং বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে লামাদিগের সম্বন্ধে আমি কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সকল গ্রন্থে একাদশ খৃষ্টাব্দের মহাত্মা অতিশা ও মিলার্পার কথাই গল্পচ্ছলে বিবৃত হইয়াছিল। অতিশার চেষ্টা কিরূপে ফলবতী হইয়াছিল, এবং মিলার্পা কিরূপ লোকাতীত বিস্ময়কর ক্রিয়া দ্বারা স্বকার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে তিব্বতে যাত্রা করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া থাকিতাম।

'সিকিমের ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিপাঠে ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথনে তিব্বতীয় ভাষায় আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস ছিল যে, তিব্বতে গমন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি শুনিয়াছিলাম, যাহারা তিব্বতীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে ভালবাসে, তিব্বতীয়গণ তাহাদিগের অনুরক্ত। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাসিলুনপো ও লাসা নগরীর কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নিকট আমার তিব্বতগমনের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার সহকারী শিক্ষক রায়বাহাদুর লামা উগায়েন-গিয়াৎসু উক্ত পত্রাদি সহ তিব্বতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গমন করেন।

'ইতিমধ্যে আমি দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিশনরের নিকট আমার তিব্বত-গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। বৃটিশ রাজত্বের বহির্ভাগে যাইতে হইলে তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। মেজর হার্ব্বার্ট লিউইন মহোদয় আমার আবেদনের উত্তরে বলিলেন যে, তিব্বত-বাসী ব্যতীত কাহাকেও সিকিম-সীমান্তের বহির্ভাগে গমনের আদেশ দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, তিব্বতীয়গণ বৃটিশ গবর্মেণ্টের হিতৈষী নহে। সেখানে ইংরাজপ্রজার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মহারাণীর কোনও প্রজাকে বৈদেশিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া ষ্টেট্-সেক্রেটারীও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিলাভে বঞ্চিত হইয়াও আমি ভগ্নোদ্যম হইলাম না। আমি লামা উগায়েন-গিয়াৎসুর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে ছায়াচিত্র (Photography) শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটি ক্যামেরা ক্রয় করিলাম। অবসর-কালে আমি ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন মাস পরে লামা দৌত্যকার্য্যে সাফল্য

লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন আমি তাসি লামার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র (pass) শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ (এখন মাননীট্ স্যার এ,) ক্রফ্‌ট্ মহোদয়কে দেখাইলাম। সেই অনুমতিপত্রদর্শনে স্যার অ্যাস্‌লি ইডেন মহোদয় আমাকে তিব্বত-গমনের আদেশ প্রদান করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুরকে অনুরোধ করিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমি বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের সহিত কালিম্‌পঙ্গ দরবারে তিব্বতীয় ভাষার প্রধান দ্বিভাষীর কার্য্য করিবার জন্য অনুগমন করিলাম। সিকিমরাজের সহিত লামাদিগের 'নেওয়ার' সংক্রান্ত বিষয়ের গোলযোগ মীমাংসার জন্য এই দরবার বসিয়াছিল।'

দাস মহাশয় নবেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় সার্ভে আফিসে জরীপ-সংক্রান্ত নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করেন। পর বৎসর মে মাসে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। সিকিমরাজ্যের জঙ্গরি নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক নেপাল রাজ্যের ইয়ামপাঠসালে উপনীত হন। উক্ত নগর তাম্বুর নদীর তীরদেশে অবস্থিত। এই স্থান হইতে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্ব্বক গিয়ানসুর নামক গ্রামের সন্নিহিত তাসি চোড়িং নামক মঠে উপনীত হন। তথা হইতে নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্ত্তী দুরারোহ সুদুর্গম চাথাংলা নামক গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া জেমু নদের মালভূমিতে উপস্থিত হন। এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রমকালে তাঁহাকে কিরূপ দুঃসহ ক্লেশ ও অনশনের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত হইল।

'২৭শে জুন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। এমন আমরা চিরস্থায়ী তুষাররাশির শেষ প্রান্তে-পৌঁছিয়াছি। আমাদিগের বামে ও দক্ষিণে দুই সারি অনন্তবিস্তৃত হিমারণ্য। এই তুষার অরণ্যের মধ্য দিয়া আমরা ক্রমশঃ অতিকষ্টে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, তুষারগিরিশ্রেণী উত্তর হইতে উত্তরপশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকা-ভূমি Conical তুষারস্তূপে সমাবৃত। এ সকল তুষারস্তূপ অন্যূন পঞ্চাশ ফুট উচ্চ। আমার মনে হইল, এই স্তূপসমূহ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। তুষাররাজ্যের তিন মাইল অতিক্রম করিবার পর আমি ক্লান্ত ও শ্রান্তদেহে ভূমিতলে বসিয়া পড়িলাম। বায়ুমণ্ডলের লঘুতা-বশতঃ আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা ১৯০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ ও দুরারোহ পথ অতিবাহনে আমার শ্বাসযন্ত্র যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষে সবুজ চস্‌মা পরিয়াছিলাম, তথাপি সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত তুষাররাশির ঔজ্জ্বল্যে আমার নেত্রপীড়া উপস্থিত হইল। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আমি আর কখনও পড়ি নাই। লামা উগায়েন-গিয়াৎসুর অবস্থা আমার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল। লামা স্থূলোদর, সুতরাং পথশ্রমে তিনি একান্ত কাতর হইয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা আমরা এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তুষাররাশির উপর পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে লামা আমাদিগের পথ-প্রদর্শক ফুরচঙ্গকে বলিলেন, সে যদি আমাকে কিছু দূর স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন। পুরস্কারের লোভে ফুরচঙ্গ আমাকে স্কন্ধে করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ লইয়া গেল। তথায় বড় অধিক তুষার ছিল না। আমাকে নামাইয়া দিয়া

পথপ্রদর্শক তাহার মোট লইয়া আসিল। আবার আমরা হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। তখন অপরাহ্ন ছয়টা বাজিয়াছিল, কিন্তু যে পর্ব্বতে আমরা বিশ্রাম করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা বহু দূরে অবস্থিত। আমার তখন আর চলিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিশ্রাম করিবার উপযোগী স্থান ত এখানে নাই! এক বিন্দু জল যে পান করিব, তাহারও কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। যেরূপ বেগে তখন তুষারপাত হইতেছিল ও বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে অনাবৃত শিলার উপর রাত্রিবাস করাও নিরাপদ নহে। আবার আমরা অতিকষ্টে পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এক মাইল পথ অতিবাহন করিবার পূর্ব্বেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তখনও তুষারে প্রতিফলিত অল্প অল্প আলোক ছিল বলিয়া আমরা কোনরূপে পথ দেখিতে পাইতেছিলাম। সাতটার সময় আমরা একটা প্রকাণ্ড শিলার নিকট উপস্থিত হইলাম। উক্ত শিলাখণ্ড কঠিন বরফের উপর অবস্থিত ছিল। পথপ্রদর্শক বলিল, রাত্রির মধ্যে উহা পড়িবে না। কারণ, এখন বরফ গলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। তুষাররাশির উপর আমরা কম্বল বিস্তৃত করিলাম। গতপূর্ব্ব দিবস আমি কিছুই আহার করি নাই, কিন্তু তথাপি আমি ক্ষুধা বোধ করিলাম না। আমি তখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

'২৮শে জুন। অতি প্রত্যুষে আমরা পুনরায় তুষারবেষ্টনের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলাম। চারি দিকে কেবল তুষার। বৃক্ষ লতার কথা দূরে থাকুক, তখন যদি কেবল একখানিও প্রস্তর দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও মনটা কতক নিশ্চিন্ত হইত। কেবল তুষার দেখিয়া আমাদের নয়ন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু হায়! একখানিও প্রস্তর আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল না! শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই আমরা শ্রান্তদেহে ভূমিতলে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। আবার উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। আবার রৌদ্রদীপ্ত তুষারের উপর বসিয়া পড়িলাম। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। উগায়েন গিয়াৎস্থ প্রফুল্লভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার প্রফুল্লতা কোথায়? আমার জানুদ্বয় স্পন্দরহিত হইয়া আসিল; পা আর চলে না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় অতিকষ্টে আমি চাথাংলা গিরি-সঙ্কটের ক্রমোচ্চ স্থানে উপনীত হইলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া ফুরচঙ্গের অনুকম্পার উদয় হইল। সে তুষাররাশির উপর তাহার বোঝা ফেলিয়া দিয়া দৃঢ়হস্তে যষ্টি ধারণপূর্ব্বক আমায় পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। আমি তাহাকে আমার চস্‌মা জোড়া দিলাম। তার পর নিমী-লিতনেত্রে নিস্পন্দভাবে আমি তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলাম। চাথাংলা গিরিসঙ্কট হইতে এক মাইল দূরে পৌঁছিলে আমি চক্ষু চাহিলাম। এখানে নয় ইঞ্চি পরিমাণ তুষার জমিয়াছিল। ফুরচঙ্গের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তখনও আমার ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতেছিল। ফুরচঙ্গ তাহার মোট আনিবার জন্য আবার পূর্ব্বস্থলে ফিরিয়া গেল। তখনও তুষারপাত হইতেছিল। আমরা ভাবিলাম, বেচারীর মোট বোধ হয় এতক্ষণ তুষারে ডুবিয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন-রবির প্রখর তেজে ও প্রদীপ্ত তুষারের আলোকে আমাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তিনী গিরিমালার

অস্তরাগে সূর্য্য অস্ত গেল। তখন আমরা ভয়াবহ দুর্গম ক্রমোচ্চ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিতে ছিলাম। অবশেষে আমরা যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিব, স্থির করিয়াছিলাম, সেই পর্ব্বতের বিপরীত ভাগে উপনীত হইলাম। অতিকষ্টে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে আমাদের পদস্খলন হইতেছিল, আর অমনি আমরা গড়াইয়া নীচে পড়িতেছিলাম। ফুরচঙ্গ কুকরি (নেপালী ছোরা বিশেষ) দ্বারা বরফ কাটিয়া পথ করিতেছিল, এবং এক হস্তে আমাকে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উপরে উঠিতেছিল। ক্রমশঃ তুষারপাতের আধিক্য হইতে লাগিল। তখন আমাদের মনে ভয় হইল, এইবার বুঝি তুষারসমাধি লাভ করিতে হয়। যাহা হউক, অতঃপর ছয়টার সময় আমরা নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার সমীপে উপনীত হইলাম। গত রাত্রিকালে আমরা যেরূপ স্থলে বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা এ গহ্বরটি প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। পথপ্রদর্শক তখন আমাদিগকে বলিল, সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্নসঙ্কুল ও দুর্গম পথ এখন আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। অবশিষ্ট পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় আমি তিব্বতগমনকালে চাথালাং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়াছিলাম। এরূপ ভীষণ, দুর্গম ও বিঘ্নসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম আর নাই। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু যেন বিকট বদন ব্যাদানপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। সে রাত্রির মত আমরা কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। শীতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দপ্রায় হইয়াছিল। গহ্বরের মধ্যে তুষার, বাহিরে তুষার; আবার গহ্বরের ছিদ্রপথে তুষার গলিয়া গলিয়া বৃষ্টিধারার মত আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে পতিত হইতেছিল।

আমাদের প্রতিভা।

সে গেছে,—সে তারি সাথে নিয়ে গেছে সব সুখ;
রেখে গেছে ব্যথা সুধু জ্বা'লাতে এ ভাঙ্গা বুক।
আশা সে নিবায়ে গেছে, রেখে গেছে হাহাকার
শূন্য করি' গেছে বুক;—সে ত পূরিবে না আর!
শুষ্ক মরুভূমি মাঝে সেই ফুটায়েছে ফুল,
বহায়েছে স্রোতস্বতী;—শুনায়েছে কুল কুল;
তারি সাথে গেছে চলি' সে মায়া-নন্দন তার,
শুধু শূন্য মরুভূমি—দীপ্ত বালু চারিধার।
কি নিয়ে কাটিবে দিন? জ্বালা শুধু বুক ভরা;
লক্ষ্যহীন দীর্ঘ পথ—শূন্য এ নিষ্ঠুর ধরা।
কি আশে চলিবে আর—হৃদয়ে বাঁধিবে বল?
কি নিয়ে থাকিবে আর মুছিবে নয়নজল?
স্মর তারে, মুছ আঁখি, বাধ বল হৃদি মাঝে—
আছে সে হৃদয় মাঝে—তা'রে স্মরি' চল কাজে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।
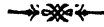
প্রবাসী। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর লিখিত "অক্ষয়কুমার দত্ত" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এবারকার "প্রবাসী"তে আর কোনও উল্লেখ-যোগ্য সুখ-পাঠ্য প্রবন্ধ দেখিতেছি না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর সহিত দত্তজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আজকাল, বোধ করি, আমাদের 'স্বদেশী-সমাজে' এরূপ বন্ধুত্ব বিরল। এখন আমরা কন্যাকুমারীর সহিত হিমালয়ের বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উৎসুক; সুতরাং আমাদের ভারতব্যাপী হৃদয়ে ব্যক্তিগত তুচ্ছ বন্ধুত্বের অবকাশ নাই। বসুজের সহিত দত্তজার পত্র-ব্যবহার ছিল। অক্ষয়কুমারের লিখিত কতিপয় পত্রের কিয়দংশ আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে উভয় বন্ধুর আন্তরিক মিত্রতা যেন মুদ্রিত হইয়া আছে। একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার বন্ধুকে লিখিতেছেন—"মধ্যে মধ্যে আপনাকে স্মরণ হইয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অনেক দিন আর আপনার সহিত সদালাপ করিতে পারি নাই। আপনার তপস্যার কুশল, শরীরের কুশল, আশ্রমের কুশল, ব্যবসায়ের কুশল লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার 'ছোট্ট খাট্ট' ব্রাহ্মসমাজটি কেমন আছে? আপনার চতুষ্পাঠীর শিষ্য-গুলি কেমন শিখিতেছে? গত দুই মাসের পত্রিকা তো পাঠ করিয়াছেন? তাহা আপনার মনোগত হইয়াছে কি না? আপনার মনঃপূত হইয়াছে কি না? এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।" আর একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন.—"আপনকার প্রণয়রসাভিষিক্ত সানুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হইলাম এবং তন্মধ্যে আপনকার প্রেমময় ভাব মূর্ত্তিমান দেখিয়া আর্দ্র হইলাম।" আর একখানি পত্র এই,—"আপনার লিখিত ২৯ অগ্রহায়ণের অনুগ্রহ-পত্র পাইয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইলাম। আপনি তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে যে অনুপম অনির্ব্বচনীয় বন্ধুবাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। অবনীমণ্ডলে এতাদৃশ বন্ধু এক জন থাকিলেও সকল সন্তাপ শীতল হইয়া যায়।" অক্ষয়কুমারের নম্রতাও আধুনিক সাহিত্যসমাজের আদর্শ। লেখক বলিতেছেন,—"অক্ষয়কুমার বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যকারদিগের নেতৃশ্রেণীভুক্ত হইয়াও অহঙ্কারী ছিলেন না; এ সম্বন্ধে তাঁহার যে সরল বিনয়ভাব, তাহা তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ সালের ১৪ই ফাল্গুনে লিখিত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন;—'আপনার স্নেহময় প্রীতিপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। এবারকার সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা যে আপনার মনঃপূত হইয়াছে ইহা আমার শ্লাঘার বিষয়। আমার কোন রচনায় যাবৎ আপনারা সন্তোষ প্রকাশ না করেন, তাবৎ তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতেই প্রত্যয় জন্মে না। আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।' * * * এই বিনম্রতা অনেক গ্রন্থকারের আত্মম্ভরিতা ভাবের সহিত তুলনা করিলে কেমন সুমধুর বোধ হয়।" অন্যত্র লেখক বলিতেছেন,—"অক্ষয়কুমারের পত্রাবলীর নানা স্থলে তাঁহার সুরসিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। * * * কোন বিষয়ের জন্য ছয়টি টাকা দানের অনুরোধ অক্ষয়কুমার

এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—'আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।' স্বপ্রণীত 'উপাসক-সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন ;—'আপনি উপাসক-সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা ভাগ সমগ্র পাঠ করিয়া উঠিয়াছেন শুনিয়া চমকিত হইলাম। ভাগ্যে তাহার মধ্যে দু একটি Oasis আছে, তাহা না হইলে আপনার কি উপায় হইত তাহা বলিতে পারি না'।" এইরূপ প্রবন্ধে মাসিকপত্রের গৌরব-বৃদ্ধি হয়, তাহা না বলিলেও চলে। বহু দিনের পর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "গুরুজনের কথা" নামক গল্পটি বড় আগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। প্রভার শাড়ী গাউন ঢাকিতে পারে নাই। স্বদেশী গঙ্গাজলে বিলাতী 'ঘোট্‌কা' গন্ধ ধৌত করা যায় না। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঞ্জিত চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামক প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব কিছু নাই। তাহার কিয়দংশ মহর্ষির স্বরচিত জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত, এবং মহর্ষির লিখিত পত্র দুইখানি "সঞ্জীবনী" হইতে না বলিয়া সঙ্কলিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। একাদশ ভাগ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগরের "গৌতমের প্রতিভা" নামক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি অনুশীলনের যোগ্য। বেদান্তবিদ্যাসাগর মহাশয় যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ন্যায় গালাগালি বিদ্যাতেও বিশারদ, তাঁহার "প্রতিভায়" তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। জয়পুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্যের "বিদ্যাধর" নামক প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। "বিদ্যাধর এক জন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অম্বর রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর নগরের পত্তন তাঁহারই।" পত্রিকা হইতে "আয়ুধ-রাজবংশের" 'ন্যাজা' ও "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা"র 'মুড়া' বাদ দিয়া পরিষদ আমাদের উপহাস করিয়াছেন। ছেলেরা বলে, 'ন্যাজা খেলে রাজা হয়' ; পরিষদের দপ্তরীই কি রাজা হইয়াছে? 'মুড়া খাইলে বুড়া হয়,'—'মুড়া'টি কাহার পাতে পড়িল? পরিষদের সম্পাদক আত্মসাৎ করেন নাই ত? তাঁহার মাথায় কাল চুলের একান্ত অভাব। যাক্, শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য এই গ্রাম্য কবিতার বনফুলগুলি এক সাজিতে চয়ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

"মাসী পিসী বনকাপাসী বনের ভিতর টিয়ে। মাসী গেছে বৃন্দাবনে দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন। জনম ভরে জেনো যাদু মা বড় ধন॥"

এই ঘুমপাড়ানিয়া গানটির পাঠান্তর আছে। আমাদের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মুখস্থ আছে,—"মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাল্মীকির উদাত্ত সামগান। কিন্তু বলিতে কি, এই ঘুমপাড়ানিয়া গানের "মা বড় ধন" তাহা অপেক্ষাও বেশী জোরে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসুর "পয়ার ছন্দের উৎপত্তি" হইতে বাজে কথা বাদ দিলে পরিষৎপত্রিকার অনেকটা ভার কমিত। লেখকের উপমা কালিদাসের অপেক্ষাও বিচিত্র। তদ্‌যথা,—"এই সময়ে কেন্দুবিল্বের অমরকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'পয়ার' ছন্দের ডিম্ব হইতে পক্ষী (?) শাবকের উৎপত্তির ন্যায়, অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল।" উপমা রোগ সংক্রামক, অতএব আমরাও উপমা দিয়া বলি, পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত কি, তাহাও অশ্বডিম্বের ন্যায় আমাদের অগোচর হইয়াই রহিল।